ইংরাজী সাহিত্যের আলোকধারা

প্রথম ভাগ

সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনায়

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
এস. সরকার
বিজন পাবলিশার্স
৮২/সি, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক ঃ
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০/বি, ভুবন সরকাব লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

উৎসর্গ

আমার এই সামান্য গ্রন্থখানি
পরমারাধ্য পিতা সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
পরমারাধ্যা মাতা ঊষারাণী দেবী
ও
জ্যেষ্ঠভ্রাতা নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মরণে উৎসর্গীকৃত হইল।

এইসঙ্গে প্রণাম জানাই
পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ও
পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা বেলারাণী দেবীকে
এবং স্মরণ করি
লোকান্তরিত জ্যেষ্ঠ শ্যালক সুশান্ত মুখোপাধ্যায়-কে

পথ চলি, পথ চলি,——
নিত্য পাই সুদূরের স্বাদ ;
কত না বিচিত্র হাতে লেখা আছে
মানুষের দুঃখ-সুখ-আনন্দ-বিষাদ।

ভূমিকা

সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইংরাজী সাহিত্যের আলোকধারা' বইটি প্রকাশনার পূর্বেই পড়বার সুযোগ হল। প্রকৃতপক্ষে এটি বাংলা ভাষায় লেখা ইংরাজী সাহিত্যের একটি সুবিস্তৃত ইতিহাস। গ্রন্থকার চারখণ্ডে বইটি প্রকাশ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রথম খণ্ড এই প্রকাশিত হল। বর্তমান গ্রন্থটিতে আদিযুগ (৬৫০-১০৬৬ খ্রীঃ), মধ্যযুগ (১০৫০-১৩৫০ খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ), প্রাক্-আধুনিক যুগ (১৩৫১-১৫০০ খ্রীঃ, চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং পঞ্চদশ শতাব্দী), এবং আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব (১৫০১-১৫৭৫ খ্রীঃ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ) এই চারটি অংশ পরপর বিন্যস্ত হযেছে। বোঝা যায় বাকি তিন খণ্ডের বিস্তৃত আলোচনায় তিনি আধুনিক যুগের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিযে পাঠককে নিয়ে যাবেন। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণত গ্রন্থবদ্ধ হলে বাংলা ভাষায় লেখা ইংরাজী সাহিত্যে সর্ববৃহৎ ইতিহাস রূপে গণ্য হবে। এর পূর্বেও বাংলা ভাষায় ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ বইই ছাত্রদের পাঠক্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখা। এদেশে এক সময়ে সাম্মানিক (অনার্স) বাংলায় ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য ছিল। ঐ বইগুলি সেদিকে লক্ষ্য রেখেই লেখা; খানিকটা পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হবার জন্য তৈরী ছোটখাটো খেয়া নৌকো।

সংকীর্ণ অভিপ্রায়ের বাইরে আমাদের ভাষায় ইংরাজী সাহিত্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গোপাল হালদার তাঁর লেখা "ইংরাজী সাহিত্যের রূপরেখা" নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুক্ত করেছেন। সমাজ ও সাহিত্যের অগ্রগতির এই যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাকে মার্কসবাদী ইতিহাসবোধের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে অন্বিত করেছেন গ্রন্থকার। কাজটি মৌলিক এবং চিন্তা উদ্রেককারী।

অধ্যাপক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইংবাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' বইটিও আকারে বড় নয়। কিন্তু ইংরাজীর এই ডাকসাইটে অধ্যাপক মাঝারি এবং বড় বহু লেখকের রচনাবলীর বিশ্লেষণে এমন গভীর ভাবনা প্রকাশ করেছেন, এমন অভিনব মন্তব্য করেছেন যার অসাধারণত্বে স্মৎকৃত হতে হয়। পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের পাশে এই নব্য ভাবনা সূত্রটি সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত করার গৌরব অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালিকে দান করেছেন।

গ্রন্থটিকে আমরা এইরূপই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে অভিহিত করতে চাই। তবে পূর্বোক্ত দুটি বই ছিল আকারে ক্ষুদ্র, ফলে অনেক লেখক থেকে গিয়েছিলেন অনুল্লিখিত এবং অনেক লেখকের সম্পর্কে উল্লেখ মাত্র ছিল। বর্তমান গ্রন্থটি তুলনায় অনেক বিস্তৃত। বাংলা ভাষার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়বার

সুযোগ এবার পাঠক পাবেন। এরই মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে লেখকের মৌলিকতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—যেমন

(১) ঐতিহাসিক পটভূমিটির সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট উপস্থাপনা।

(২) ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রধান রচনাগুলির উপস্থাপনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে দু'য়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(৩) যুগ বিভাগটি করা হয়েছে এমনভাবে যাতে কোন যান্ত্রিক বিভাজনের মধ্যে না গিয়ে ওভার ল্যাপিং বা এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সীমারেখা অতিক্রমের ব্যাপারটিও ধরা পড়েছে। যুগ বিভাগ ছাড়া সাহিত্যের ইতিহাস পড়া যায় না। কারণ পাঠক সেক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের স্তরগুলি ঠিকঠাক বুঝে ওঠার সুযোগ পায় না। লেখক সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুশৃঙ্খল এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনরূপ যান্ত্রিকতার বশবর্তী না হয়ে যুগ বিভাগ করায় পাঠকেরা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার যে বিশেষ মেজাজ, সেটি লাভ করবে।

(৪) সাহিত্যের ইতিহাস তো 'সাহিত্যেরই' ইতিহাস। অতএব এ জাতীয় গ্রন্থে লেখকের গভীর সাহিত্যবোধ প্রত্যাশিত। সে বিষয়ে বর্তমান লেখক আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন।

আলোচ্য পর্যায় পর্যন্ত যে সব উল্লেখযোগ্য লেখক সামনে এসেছেন তাঁদের রচনাবলীর বিচার পাঠককে আনন্দিত করবে। সাহিত্য সম্ভোগ করতে জানা এবং অন্যকে সম্ভোগ করানো বড় সহজ কাজ নয়, সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি সাফল্যের সঙ্গে করেছেন এই বই-এর তা একটা মস্তগুণ।

বাংলা সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়, কারণ ঐ সাহিত্যের কাছে ঋণও অনেক সম্পর্কও বহুমুখী। সে কারণেই আরো বিশেষ করে এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার আসরে "সুস্বাগতম্"।

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
এম. এ. (ট্রিপল), এম. ফিল., পি-এইচ. ডি.,
ডি. লিট., এফ. জি. এস. আই.

নিবেদন

শিক্ষিত, অনুসন্ধিৎসু, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকদের জন্য বইটি লেখা। বইটি বাংলায় লেখা হয়েছে এই কারণেই যে আমি বাংলাতেই লিখতে চাই। এক ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস অন্য ভাষাতেও লেখার দ্বারা একটা যোগাযোগ, আদানপ্রদান ও নৈকট্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে। যে কোন ভাষার সাহিত্য সব মানুষেরই জন্য। বাঙালী পাঠক যদি অনায়াসে অন্য সাহিত্য সম্পর্কিত সুবোধ্য বই প'ড়ে আনন্দ পান, এবং দৃষ্টি ও বোধের আয়তন প্রসারিত করতে পারেন, তবে তা হবে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই প্রীতিপদ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের বাইরেও অনেক কিছু আছে বইটিতে। মেধাবী ছাত্ররা পড়ে খুশী হবেন। বৃহদায়তন মূলগ্রন্থগুলির থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করা পরিশ্রমসাধ্য। আমি পাঠকের হয়ে যথাসাধ্য সে কাজ করে দিয়েছি। গ্রন্থনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নতুন ও অ-গতানুগতিক।

সহৃদয় প্রকাশক মহাশয় আন্তরিকভাবে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব সকলের শুভেচ্ছা বইটির আষ্টেপৃষ্ঠে।

আলো আর আনন্দের যে পরিবেশে আমি লিখতে পেরেছি তা গড়ে দিয়েছে আমার স্নেহাস্পদ জামাই শ্রীমান প্রভাত, মেয়ে সুতপা, ছোট মেয়ে মালা, আর আমার আদরের নাতনী শুচিস্মিতা অভিষিক্তা।

উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে এবং বহু ত্যাগ স্বীকার করে আমার স্ত্রী শ্রীমতী শান্তি ব্যানার্জী বইটির দ্বিতীয় রূপকার হয়ে গেছেন।

বইটি কখনও এবং কোনভাবেই পণ্ডিত মানুষদের জন্য নয়। তা আমার সাধ্যাতীত। তবে পণ্ডিত মানুষদের ভিতরেও জাতিভেদ আছে। বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেক করেও যাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে পারেন তাঁরা মহৎ। অনভিজ্ঞ সাহিত্যিকের তাঁরাই দিশারি। আমার সৌভাগ্য যে এমনই দুজন মহৎ মানুষ এগিয়ে এসেছেন আমাকে সাহায্য করতে।

এঁদের একজন শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ (ট্রিপল), এম. ফিল., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট. এফ. জি. এস. আই. এবং অপরজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুখেন্দু পান এম. এ. (ট্রিপল) বি.এড. মহাশয়।

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের একটি সুপরিচিত নাম। উচ্চতর নানা বিষয়ের শিক্ষায় এঁর গ্রন্থাদি অবশ্য পাঠ্য। পাণ্ডিত্যের অভিমানবর্জিত, জ্ঞানের আকর এই মানুষটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার অকিঞ্চিৎকর বইখানি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পাঠ করেছেন এবং তাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। আমার কাছে এটা অবশ্যই অভাবনীয় ছিল। বইটি প্রকাশিত হয়ে এবং তাতে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত করতে পেরে আমি স্বস্তি পেয়েছি এবং গৌরববোধ করেছি। এই ধরনের মানুষ কারোর ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেন না, নিজগুণেই আনন্দ সঞ্চারী হয়ে থাকেন। কৃতজ্ঞতার পরেও যদি

কিছু কথা থাকে আমি তাঁকে তা অর্পণ করছি। আমি নিজেই আমার এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুখেন্দু পান মহাশয় এম. এ. (ট্রিপল), বি. এড, ব্যাণ্ডেল বিদ্যামন্দিরের সুযোগ্য ও সুখ্যাত শিক্ষক এবং হুগলী মহসীন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক (আংশিক)। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ অপ্রত্যাশিত, এবং তাঁর দ্বারা আমার সামান্য বইটির বিচার-বিশ্লেষণ অভাবিত।

বইটিতে অসংখ্য ত্রুটি ; আয়তনও সংক্ষিপ্ত। তবে হয়ত পাঠক সম্প্রদায় আমার এই চেষ্টাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন, এই আশায় বইখানি তাঁদের নিবেদন করলাম।

আমি আমার আশা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার কথা বললাম। আমার প্রত্যাশা অনেক বেশী। সমবোদ্ধা পাঠক পাঠিকাগণ আমার বই পড়লে যেমন খুশী হব, তেমনি সমালোচনাকেও আমি আবাহন জানাব। সমালোচনা তাঁরাই করবেন, যাঁদের বইটির ব্যাপারে আগ্রহ থাকবে। সমালোচনায় শুধু তিক্ততা থাকে, —এ আমি বিশ্বাস করি না ; বরঞ্চ সহযোগিতার কথাই বেশী করে থাকে বলে আমি জানি। আসলে, প্রস্তাব বা পরামর্শ যে আকারেই আসুক না কেন, তা আমার ভালোর জন্য, তথা বইটির উৎকর্ষ সাধনের জন্য।

আরও একটি কথা বলি। আলোচ্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় আরও দু'চারখানি বই আছে। লেখকদের দু'একজন অতি বিখ্যাত মানুষ। এঁদের প্রতিযোগী হবার কথা চিন্তাও করা যায় না। আমার একমাত্র চিন্তা পাঠকপাঠিকাদের কাছে তাঁদের ভাল লাগার মত কিছু উপহার দেওয়া। সততা এবং আত্মনির্ভরশীলতা নিয়ে আমি কাজ করছি, —এটা আমি জোর করে বলতে পারি। তবে সেই পুরানো ছক তো মানতেই হবেঃ লেখক আসামী, পাঠক বিচারক। আশাকরি আসামী সসম্মানে ছাড়া পেয়ে যাবে।

সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"সুধাবিতান"
আন্দুল দক্ষিণপাড়া
পোঃ আন্দুলমৌড়ী
জেলা ঃ হাওড়া
পিন কোডঃ ৭১১৩০২
ফোনঃ ৬৬৯-৬২৮১

প্রস্তাবনা

নানান দেশে নানান ভাষা, নানান সাহিত্য। বাঙালীর প্রাণের ভাষা, মনের ভাষা বাংলা সাহিত্যে মূর্ত হয়েছে। কিন্তু ঔৎসুক্য ও আন্তরিকতার এখানেই শেষ নয়। অসীম, অনন্ত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল মানুষের মনে। তাই মানুষ স্বদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যও পাঠ করে, এবং তাতে আনন্দ পায়। এইখানেই মানুষের আন্তর্জাতিক রূপ। সাহিত্য এমনই একটা জিনিষ যা দেশ, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়---সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করেও অতিক্রম করে যায়। এ উপলব্ধি কেবল বাকচাতুরী নয়, আমাদের অন্তরের উপলব্ধি।

বাংলা সাহিত্য আজ পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। ভারতের অন্যান্য অনেক সাহিত্য,—হিন্দী, তামিল, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় ইত্যাদিও আজ শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি পাওয়ার পর্যায়ে এসেছে। এদের প্রাচীনতাও অনস্বীকার্য। পাশাপাশি ইংরাজী সাহিত্যের কথাও আসে। ভারতের কয়েক লক্ষ মানুষের বংশানুক্রমিক মাতৃভাষা ইংরাজী। তাই ইংরাজী ভাষা, ও সেই সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য আমাদের কাছে বিদেশী নয়। আমরা ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশকে যেমন অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না, তেমনি সেই অংশের মানুষদের ভাষা এবং সাহিত্যকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আজ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যকে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার অন্যতম শরিক বললে হয়ত ভুল হয় না। ঠিক তেমনই, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য মানুষদের—বিশেষতঃ শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মানুষদের—নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে এক ঐতিহাসিক ও অনস্বীকার্য ঘটনা। এটাও মেনে নিতে আমরা যেন দ্বিধাগ্রস্ত না হই।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৪৫ কোটি লোকের মাতৃভাষা ইংরাজী। এর চেয়ে আরও বেশী সংখ্যক মানুষ ইংরাজীতে কথা বলে ও মত বিনিময় করে। অনুরূপ সংখ্যক মানুষ সারা পৃথিবীতে ইংরাজীকে তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ইংরাজী ভাষায় মূল শব্দসংখ্যা প্রায় ৬০০০০।

ইংরাজী সাহিত্যও দেড় হাজার বছরের পুরাতন। এর উদ্ভব, বিকাশ ও বর্ধন ঔৎসুক্য বাড়ায় ও বিস্ময় সৃষ্টি করে। তাই এই সাহিত্যের ইতিহাস জ্ঞানান্বেষী মানুষকে আনন্দ দেয় ও উৎসাহিত করে।

ভাষা সাহিত্যের বাহন। সুতরাং যে কোন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করতে গেলে সেই সাহিত্যের ভাষার উদ্ভব, বিবর্তন ও উন্নতির পরিচয় নিতে হয়। ইংরাজী ভাষা বর্তমান ইংল্যাণ্ড তথা গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডে বহিরাগত। দেশীয় ভাষা হিসাবে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের কেল্ট জাতীয় নানা ভাষা ও উপভাষা থেকে শুরু করতে হয়। বৃটনদের এই আদি ভাষায় বিভিন্ন যুগে যুক্ত হয়েছিল ল্যাটিন, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এবং পুরাতন ও মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ফরাসী শব্দ। ইংরাজরা বৃটেনে এসে এই মিশ্রভাষার মুখোমুখী হয়েছিল। প্রথমদিকে যাওয়া আসা করলেও পরবর্তী যুগে এই দেশেই তারা নতুন স্বদেশ খুঁজে

পেয়েছিল। তাই প্রাচীন যুগের শেষ দিকে এবং মধ্যযুগে ইংরাজী ভাষায় এই মিশ্র বৃটিশ ভাষার বহুল মিশ্রণ ঘটেছিল। আজ যে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তা অধিক অংশে টিউটনিক এংলোস্যাক্সন হলেও হিব্রু থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর তাবৎ ভাষার এক অপূর্ব সমন্বয়। ইংরাজী ভাষা আন্তর্জাতিক হওয়ার অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিশেষে একটি প্রয়োজনীয় কথা পাঠকপাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করছি। সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষ বা গ্রন্থবিশেষের কথা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সামগ্রিক গঠনের কালানুক্রমিকতা বজায় রাখা তার থেকে কম আবশ্যিক নয়। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের চিন্তা, প্রবণতা, বিশ্বাস, ধারণা কখনও ধীরে ধীরে কখনও দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে গেলে দেখা যাবে গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনার এই প্রথম ভাগটি একদিকে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি আরও এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ এবং পরবর্তী পঁচিশ বছর ইংরাজী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ডে সেই যুগের ইতিহাস থাকবে। আমাদের পরিকল্পনা বিংশ শতাব্দীর অন্ততঃ প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন খণ্ডে সাহিত্যের ইতিহাস বিন্যস্ত করা। এই সবগুলিই গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। আশাকরি ওই দ্বিতীয় খণ্ডটিও সহৃদয় পাঠকগণের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে।

এই প্রেক্ষাপটে আমি আশা করবো আমার পরবর্তী প্রজন্মের লেখকরা বিংশ শতাব্দীর সমগ্র চেহারা এবং নবাগত একবিংশ শতাব্দীকে আমার চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে রূপায়িত করবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার তা দেখবার সৌভাগ্য হবে না ; কিন্তু এই বৃহৎ চলমান স্রোত বহতা থাকবে এই আশা নিয়ে নিশ্চিন্তে যেন বলে যেতে পারি,—

'নিবি তোরা তীর্থবারি সে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে'

আর আশা করবো ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরা, ভিন্ন ভিন্ন যুগের মানসিকতা, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পর-গ্রথিত শৃঙ্খলের মত যেন একটানা এগিয়ে যায় ; বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতি ভক্তিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ যেন চিরকাল নিবেদিত হয়, এবং অদূরকালে বিস্মৃত এই দীন মানুষটির চেতনা যেন সেই মহাচেতনার সঙ্গে মিশে থাকে। মহাকালের কাছে এই থাকবে আমার সবিনয় প্রার্থনা।

গ্রন্থকার

সম্পাদকীয়

ইংরাজী সাহিত্যে মহাপণ্ডিত সদাহাস্যময় মানুষ সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর লেখা 'ইংরাজী সাহিত্যের আলোকধারা' বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। বইটির ভূমিকা আমার লেখা। পরবর্তী লেখা ইংরাজী সাহিত্যের আধুনিক যুগ নিয়ে। এই লেখাটি পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল এবং সঙ্গে কিছু চিঠিপত্র। প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে একটি অখণ্ড সংস্করণ বই আকারে রূপ দেবার চেষ্টা করেন লেখকের স্ত্রী শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রীশিশির কুমার সরকার, আমার সম্পাদনায়। এঁদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। কেননা বইটি প্রকাশিত না হলে একটি অমূল্য সম্পদ আমরা হারাতাম।

বইটির পরিকল্পনা আদিযুগ (৬৫০—১০৬৬ খ্রীঃ) মধ্যযুগ (১০৫০—১৩৫০ খ্রীঃ), প্রাক্ আধুনিক যুগ (১৩৫১—১৫০০ খ্রীঃ), আধুনিক যুগ প্রথম পর্ব, র‍্যানেইসঁস-এর পূর্বাহ্ন (১৫০১—১৫৭৫), দ্বিতীয় পর্ব, মধ্য-গগনে র‍্যানেইসাঁস (১৫৭৬—১৬৫০), তৃতীয় পর্ব, নীতি-যুক্তি গণ-সমীপ্য (১৬৫১—১৮০০), চতুর্থ পর্ব, বিচিত্র রূপ-বিপুল বিস্তার (১৮০১—১৯৫০)।

এই বইটি আসলে একটি সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস। এটি ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স ও এম. এ. পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের পড়া অবশ্যই দরকার।

আগে যদিও ইংরাজী সাহিত্যের বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে বিশেষ করে গোপাল হালদারের লেখা "ইংরাজী সাহিত্যের রূপরেখা" এবং ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইংরাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" যা আকারে ছোট কিন্তু পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের পাশে সমান্তরালভাবে থাকার গৌরব রাখে।

এই বইটিকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে অবিহিত করি। এটি বাংলা ভাষায় লেখা একটি পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) সুশৃঙ্খল এবং বৈজ্ঞানিক ভাগে যুগ-বিভাগ। (২) লেখকের গভীর সাহিত্যবোধ এবং ঐতিহাসিক পটভূমির সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট উপস্থাপন।

সাহিত্য সম্ভোগ করা এবং করানো দুটিই কিন্তু খুব সহজসাধ্য নয়, লেখক সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজটি করেছেন অতি স্বচ্ছন্দে যা তাঁর মস্তগুণ। গ্রন্থটি লেখকের পঁচিশ বছরের অতন্দ্র সাধনার ফসল।

ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার যে রীতির প্রবর্তন করেছেন তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণী শক্তি ও মৌলিকতাকে যুক্ত করে এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে লেখক সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ইংরাজী সাহিত্যের আলোকধারা

সামগ্রিক পরিচয়

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মূল কেন্দ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—যাতে যুক্তরাজ্য, আয়ার্ল্যাণ্ড ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপ অন্তর্ভূক্ত। আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরভাগে উত্তরসাগরে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত।

খৃষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর আগে থেকেই বৃটনরা এই দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করতে শুরু করেছিল। তারা ছিল কেল্টজাতীয় মানুষ। কেল্টদের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কিছু কিছু মিল আছে। তাদের নিজস্ব রীতিতে সভ্যতা, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক ব্যবস্থাদি ছিল। বৃটনদের নাম অনুসারে এই দ্বীপপুঞ্জের নাম হয়েছিল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ।

ওই পুরাতন কেল্টিক ভাষা থেকে কতকগুলি স্থানের নাম যেমন টেমস (Thames), এবং মাত্র ছটি অন্যান্য শব্দ এখনও ইংরাজী ভাষায় থেকে গেছে। সেগুলি হচ্ছে অ্যাস (Ass), ব্যানক (Bannoch), ব্রক (Broch) ডান (Dun), ড্রাই (Dry-a magician) এবং স্লাফ (Slough)। বর্তমান ইংরাজী ভাষায় কেল্টিক শব্দের এত স্বল্পতার কাবণ সম্ভবতঃ এই যে, কোন ভাষাভাষী সম্প্রদায় যখন অন্য ভাষা শেখে তখন তাদের নিজেদের ভাষা ওই বিদেশী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু বহিরাগত ভাষার উপর স্থানীয় ভাষার প্রভাব বিশেষ পড়ে না। তাছাড়া এ-ও দেখা গেছে বিজিত জাতি বির্জয়ী জাতির ভাষা গ্রহণ করে, কিন্তু বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির ভাষা গ্রহণ করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায় না।

খৃষ্টীয় ৪৩ অব্দ থেকে ৪১০ অব্দ পর্যন্ত রোমকরা দক্ষিণ বৃটেন দখল করে রেখেছিল। ওই সময় স্থানীয় ভাষার উপর ল্যাটিন ভাষার প্রভাব পর্ড়েছিল। তবে ল্যাটিন শব্দগুলি ছিল প্রধানতঃ সামরিক বিষয়ের। ওইগুলি শহর, রাস্তা, দুর্গ, পরিখা, বন্দর ইত্যাদির নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু কেল্টিক শব্দ ইংরাজী ভাষাব অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলি এসেছিল ফ্রান্সের কেল্টিকদের কাছ থেকে নর্ম্যানদের মারফৎ। আরও পরে সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে যখন স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে অধিকতর পরিচয় ঘটতে থাকে। তখনও কিছু কেল্টিক শব্দ ইংরাজী ভাষার সঙ্গে মিশে যায়।

রোমক আমলে (৪৩-৪১০) অনেক বৃটন খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে। তারপরে আসে বহু দেবদেবীর উপাসক এংলোস্যাক্সনরা। এদের কোন কোন দেবদেবীর নাম ইংরাজী বারগুলির নামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই এংলোস্যাক্সনরাই বর্তমান ইংরাজদের পূর্বপুরুষ। এদের ভাষাও ছিল আলাদা। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিক থেকে রোম থেকে খৃষ্টান যাজকরা ইংরাজদের ভিতর খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে আসেন। রোমক আমল থেকে শুরু করে যে ধরনের খৃষ্টধর্ম প্রচার কয়েকশ বছর ধরে চলছিল তাকে সাধারণতঃ কেল্টিক খৃষ্টধর্ম বলা হয়। আর ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে যে খৃষ্টধর্ম প্রচার শুরু হ'ল তার নাম রোমক খৃষ্টধর্ম।

কেল্টিক খৃষ্টানদের আচার আচরণের সঙ্গে পরবর্তীকালের রোম থেকে আগত যাজকদের দ্বারা প্রচারিত খৃষ্টধর্মের কিছু কিছু তফাৎ ছিল। ৬৬৪ সালে উত্তরাঞ্চলে হুইটবি মঠে আহূত ধর্মীয় বিচার সভায় (Synod of Whitby) রোমক খৃষ্টানদের আচরণবিধি শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকৃত হয়। এই নতুন ধারার ধর্মবিধি কেল্টিক সাধুদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী ছিল। পুরাতনপন্থী খৃষ্টধর্ম, এবং তার থেকেও বেশী, এই নুতন খৃষ্টধর্ম ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে খৃষ্টীয় মঠগুলিই তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের সংরক্ষণে ও প্রচারে ব্রতী ছিল। কেডমন (Caedmon) ছিলেন ইংলণ্ডে বসবাসকারী ইংরাজদের প্রথম কবি। তিনি সপ্তম শতাব্দীর মানুষ। তিনি প্রথম জীবনে যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না; পরে হুইটবি মঠে আশ্রয় পান। ইংলণ্ডের প্রথম ঐতিহাসিক পরমশ্রদ্ধেয় বীড (venerable Bede) খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জ্যারো মঠে বাস করতেন। তাঁর জীবনকাল ৬৭২-৭৩৫। তিনি 'এ্যাঙ্গলসদের ধর্মীয় ইতিহাস' এবং অন্যান্য বহু ল্যাটিন গ্রন্থ রচনা করেন।

নবম শতকে ডেনমার্ক থেকে জলদস্যুরা এসে বিভিন্ন পর্যায়ে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ক্রমে ক্রমে ডেনরা ইংল্যাণ্ডের বেশ কিছু অংশ অধিকার করে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডেন বা দিনেমারদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ক্যানিউট ইংল্যাণ্ডেও রাজত্ব করেন। ইংরাজী ভাষার উপর ডেন ও অন্যান্য স্ক্যাণ্ডিনেভীয় (আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি দেশের) ভাষাগুলির প্রভাব অপরিসীম।

এই ডেন আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে এংলোস্যাক্সনদের শ্রেষ্ঠতম নেতা ছিলেন ওয়েসেক্সের রাজা মহামতি আলফ্রেড (Alfred the Great)। তিনি শুধু ইংরাজ নৌবাহিনীর স্রষ্টা ছিলেন তা ই নয়, তিনি ইংরাজী গদ্য সাহিত্যেরও জনক বলে স্বীকৃত। নবম শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় 'এংলোস্যাক্সন ধারাবাহিক ইতিহাস' (Anglo-Saxon Chronicle) নামক ইংল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন ও রচনা শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে এই ইতিবৃত্ত লিখিত ও সঙ্কলিত হতে থাকে। এইভাবে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য শুরু থেকেই বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগুতে থাকে।

পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগোষ্ঠীতে ইংরাজী ভাষার স্থান

ইন্দোজার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীকে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ দশটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(১) আর্য (ইন্দোইরাণিয)
(২) টকারিয়ন (অধুনা লুপ্ত)
(৩) হিট্রাইট
(৪) আর্মেনিয়
(৫) গ্রীক
(৬) আলবেনীয়
(৭) ইটালিক
(৮) কেলটিক
(৯) বালটিক স্লাভোনিক
(১০) জার্মানিক (টিউটনিক)

এই দশম ভাগটির অর্থাৎ 'জার্মানিক' শাখাটির ভিতর আছে ঃ

(ক) গথিক ভাষা
(খ) স্ক্যাণ্ডিনেভীয বা উত্তর জার্মানিক ভাষা
(গ) পশ্চিম জার্মানিক ভাষা

উপরোক্ত পশ্চিম জার্মানিক মূল ভাষা পাঁচটি ভিন্নভিন্ন ভাষার সমন্বয ঃ

(১) হাই জার্মান
(২) লো ফ্রাঙ্কোনিযান
(৩) লো জার্মান (ওলড স্যাকসন)
(৪) ফ্রিজিযান
(৫) ইংরাজী

ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

আদি যুগের ইংরাজী সাহিত্যের নমুনা আমরা বর্তমানে প্রধানতঃ চারটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাই। পাণ্ডুলিপিগুলি লিখিত হবার অনেক আগেই মূল রচনার অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। তবে সেগুলির সময-তারিখ সঠিকভাবে নিরূপণ করবার উপায় নেই।

১নং পাণ্ডুলিপি ঃ এর পুরা নাম Cotton Vitellius AXV। এতে বীওউলফ (Beowulf) এবং জুডিথ (Judith) এ দুটির পাণ্ডুলিপি আছে। এর সময় ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। এটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে (British Museum) সুরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপিতে তিনটি গদ্য খণ্ডও আছে।

২নং পাণ্ডুলিপি ঃ এর নাম MS Junius XI। এটি অক্সফোর্ডের Bodleian Libraryতে সুরক্ষিত আছে। এটিকে সংক্ষেপে জুনিয়াস পাণ্ডুলিপি বা বডলিয়ান পাণ্ডুলিপি বলে। ১৬৫৫ সালে এই পাণ্ডুলিপি থেকে বই ছাপা হয়। এতে কেডমন (Caedmon) এর রচনা আছে। এটতে দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত হস্তলিপি আছে।

৩নং পাণ্ডুলিপি ঃ বা The Exeter Book অর্থাৎ এক্সেটার পাণ্ডুলিপি। সম্ভবতঃ ১০৫০ সালে বিশপ লিওফ্রিক (Leofric) এটিকে এক্সেটার চার্চে (Exeter Cathedral) দান করেছিলেন। এতে কিনেউলফ-এর (Cynewulf) দুটি স্বাক্ষরিত কবিতা আছে।

৪র্থ পাণ্ডুলিপি ঃ বা The Vercelli Book বা ভার্সেল্লি পাণ্ডুলিপি। ইটালিতে মিলান এর নিকট ভার্সেল্লির গীর্জার লাইব্রেরীতে (Cathedral Library of Vercelli) এটি সুরক্ষিত আছে। এতেও কিনেউলফ-এর দুটি স্বাক্ষরিত কবিতা আছে। এছাড়া আছে এ্যানড্রিয়াস (Andreas) এবং 'দি ড্রিম অব দি রুড' (The Dream of the Rood)। এটি দশম শতাব্দীর শেষ দিকে লিখিত।

এগুলির কোনটিই মূল রচনা নয়। মূল রচনার অনুলিপি অথবা অনুলিপির অনুলিপি।

১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ক্যাকসটনের (Caxton) মুদ্রাযন্ত্রে বই ছাপা হতে সুরু করে। তার আগে পর্যন্ত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বা পাণ্ডুলিপির নকল ছাড়া বই সংরক্ষণের কোন উপায় ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে ১৪৭৬ সালের আগে লেখা রচনাগুলির বেশ কিছু অংশ ছাপা হয়। এইভাবে আমরা এখন বহু পুরাণ লেখা ছাপা অথবা ফটোকপির আকারে পাই।

চারশ বছর আগে বেকন যে ভাষাকে গণ্য করবার মত গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেন নি, আজ তা শাখায় প্রশাখায়, ফলে ফুলে বিশাল মহামহীরুহে পরিণত হয়েছে। যে সমস্ত মানুষ এই সাহিত্যে তাঁদের স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন বা যাঁরা আন্তবিক প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ফল এই বিশাল ইংরাজী সাহিত্য। খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের বিচারে সব ক্ষেত্রে ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা যায় না। এখানে কোন টলস্টয়ের 'ওয়র এ্যাণ্ড পীস' নেই, কোন ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারেবেলস' নেই। এখানে কোন হোমার নেই, ভার্জিল নেই, দান্তে নেই। গ্যেটের খ্যাতির সমকক্ষ অল্প দু'একজন। এখানে কোন ইবসেন নেই, কোন ফ্রয়েড নেই। তবে যা আছে তা কিন্তু দুর্লভ। এখানে আছেন কৌতুকরসের উদার মানুষ চশার, সমস্ত প্রজ্ঞা ও বোধের সীমান্তেব বহুদূরে ধ্রুবতারার মত সেক্সপীয়র, আছেন মহাতেজস্বী, পরম নিষ্ঠাবান মিলটন। আর আছে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের বিস্ময়কর সমাবেশ যাকে কেবলমাত্র মহাকাশের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। বহু যুগের অগণিত মানুষ যে সাহিত্যকে ধারণ করেছে, লালনপালন করেছে, পুষ্টি জুগিয়েছে সেই ইংরাজী সাহিত্যকে বৃটিশ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক বোধের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলে বলা চলে। সাহিত্যের পাঠক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। ইংরাজী সাহিত্য কোন রাজা-রাজড়ার ইতিহাস নয়, তা জাতির গৌরব, সমগ্র মানবজাতির গৌরব। সুখে দুঃখে, বিজয়ে পরাজয়ে, আনন্দে বিষাদে এই সব মানুষ সাড়া দিয়েছেন। অসংখ্য মানুষের জাগ্রত চেতনার প্রতিফলন এই ইংরাজী সাহিত্য। বাঙালী হিসাবে সহমর্মীদের এই অনবদ্য প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাই।

আদি যুগ

আদি যুগ

(৬৫০—১০৬৬)

ভূমিকা

আদি যুগের ইংরাজী সাহিত্যের কিছু কিছু এংলোস্যাক্সনরা ইংল্যাণ্ডে আসবার আগেই সাগর পারে রচিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ প্রথম দিকে ওইগুলির ভিতর খৃষ্টান উপাদান ছিল না। ওই সাহিত্য যারা সৃষ্টি করেছিল, তারা তখন খৃষ্টান ছিল না। পরবর্তীকালে কিছু কিছু খৃষ্টান উপাদান প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল।

উত্তর ইউরোপের সর্বোত্তরে বাল্টিক সাগরের পশ্চিম উপকূলে বসবাসকারী দুর্ধর্ষ এংলোস্যাক্সনদের পূর্বপুরুষরা অসম্ভব প্রাণবন্ত, দুর্দান্ত সাহসী, কঠিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, নেতার অনুগামী দলবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে জীবনযাপন করত। যুদ্ধে ও আমোদ প্রমোদে প্রচণ্ড জীবনসত্ত্বার পরিচয় দিত। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কতকগুলি নীতি, নিয়মকানুন ও সামাজিকতা ছিল। ইংরাজী সাহিত্যের প্রাচীনতম মহাকাব্য বীওউলফ এ(Beowulf) এই সব বর্ণনা আছে। এছাড়া উন্মুক্ত বিশাল প্রকৃতি, সমুদ্র ও তার রহস্য এবং বেপরোয়া জীবনের যে পরিচয় আমরা অন্য কিছু কিছু রচনায় পাই, তা বর্তমান ইংরাজী সাহিত্যের পরুষ ও বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫০° থেকে ৬০° উত্তর অক্ষাংশের এই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে শীত প্রবল। আর এর চারি ধারে আছে মহাসমুদ্র। তাই শীতের ক্লেশ, বসন্তের স্বস্তি, সমুদ্রের ধূ ধূ বিশালতা ইংরাজী সাহিত্যের অবয়বকে ধারণ করেছে। পাশাপাশি আছে স্নেহ, মায়া, মমতা ঘেরা গৃহের মাধুর্য। আর আছে জাতি হিসাবে, মানুষ হিসাবে গর্ববোধ, মর্যাদাবোধ। ইংরাজী সাহিত্য এই পরিবেশেই সৃষ্টি হয়েছিল, এই পরিবেশেই বেড়ে উঠেছে।

সাড়ে তিনশ বছর দক্ষিণ বৃটেন অধিকারে রাখবার পর পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমানরা বৃটেন ছেড়ে চলে যায়। ওই পরাধীনতার যুগে বৃটনরা ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসে, বৃহত্তর সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বেশ কিছু মানুষ খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে। কিন্তু রোমানরা চলে যাবার পরে বহু বৎসরের পরাধীনতার দরুণ তাদের স্বাধীন কর্মপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই রোমানদের বৃটেন ত্যাগের পর তারা বহিরাক্রমণে বাধা দেবার ব্যাপারে অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হল।

উত্তর দিক থেকে পিক্টরা, আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে স্কটরা বৃটেন আক্রমণ করল। বৃটনরা স্ট্র্যাথক্লাইড (Strathclyde) এবং ওয়েলসের বন্য পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করল। অন্যান্য আক্রমণকারীদের ভিতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উত্তর সাগরের ওপার থেকে যারা এসেছিল সেই এ্যাঙ্গলস, স্যাকসন এবং জুটস। এদের মিলিতভাবে এংলোস্যাক্সন বলা হয়। এরাই বর্তমান ইংরাজদের পূর্বপুরুষ। এদের নাম অনুসারে বৃটেনের দক্ষিণার্ধের নাম হয় এ্যাঙ্গল-ল্যাণ্ড বা ইংল্যাণ্ড। জুটদের নেতা হেনজেষ্ট (Hengest) তাঁর দলবল নিয়ে থ্যানেট (Thanet) দ্বীপের এবসফ্লিট (Ebbsfleet) নামে যে জায়গায় জাহাজ থেকে নেমেছিলেন, ইংরাজদের কাছে তার থেকে পবিত্র কোন জায়গা ইংল্যাণ্ডে নেই।

কেল্ট সাধুদের দ্বারা প্রচারিত খৃষ্টধর্মে কিছু সংখ্যক বৃটন পরিবর্তিত হলেও তখনও পর্যন্ত অধিকাংশ বৃটনের পুরাতন ধর্মবিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী ও কল্পনা অক্ষুন্ন ছিল।

নানান দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের জগতের সম্পর্ক, বীরনেতাদের ধীরে ধীরে দেবোপম চরিত্রে সংস্থাপন ইত্যাদি ছিল বৃটনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই নানা বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে সরল, প্রকৃতিনিষ্ঠ, সহজবিশ্বাসী বৃটনরা নানা কাহিনীর সৃষ্টি করেছিল। সূর্যধানুকী ইজিল (Aegil, the sun archer) সম্পর্কিত পৌরাণিক উপকথা, বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড কিছু কবিতা ও গান, যুদ্ধ ও পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কিত আনন্দ ও বিশ্বাসের স্মৃতি বর্তমান ইংরাজরা বৃটনদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এইগুলির সম্পর্কে কৌতূহল ও মমতা এখনও কোন কোন পরিবেশে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

ওদিকে তখনই বহু দূরে বাল্টিক সাগরের পশ্চিম অঞ্চলে এংলোস্যাক্সনদের পিতৃপুরুষেরা তাদের প্রচণ্ড শক্তিব্যঞ্জক জীবনযাত্রার ধরনধারণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ও অন্যান্য বীরোচিত কাজের সমতা রেখে নানা গান ও কাহিনী রচনা করছিলেন। এইসব গান বাদ্য সহকারে গাওয়া হত। বস্তুতঃ বিভিন্ন নেতার নিজস্ব গীতিকার ও গায়কদল ছিল। গার্হস্থ্য মাধুর্যের ও প্রকৃতির বিস্ময়কর সৌন্দর্যের গানও এই সময়ে রচিত হচ্ছিল। আর ছিল পাশাপাশি মহাকাব্যধর্মী রচনা। তবে জনপ্রিয়তা ও মানুষের স্মৃতি ব্যতীত এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার অন্য কোন উপায় ছিল না। পরবর্তীকালে নানা হাত ঘুরে এবং নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে এই সাহিত্যের অল্প কিছু অংশ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আকারে আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এগুলিতে একাধারে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে এক প্রাচীন সাহিত্যভাণ্ডারের খণ্ডাংশ রক্ষিত আছে।

অনেকে এগুলিকে ইংরাজী সাহিত্যের সূচনা বলে মনে করেন না, অনেকে করেন। আসলে বৃটেনের মাটিতে বসে পরবর্তীকালের খৃষ্টান পুরোহিতগণ ওই সব সাহিত্যের যে সব অংশ সংরক্ষণ ও খৃষ্টীয় ধরনে পরিমার্জন করা উচিৎ মনে করেছিলেন, কেবলমাত্র সেইরকম কিছু কিছু অংশ অদ্যাবধি রক্ষিত আছে। এইসব পরিমার্জনের তলে তলে প্রাচীন এংলোস্যাক্সনদের স্পষ্ট ও বিশিষ্ট মানসিকতার রেশ খৃষ্টীয় মানসিকতার পাশ কাটিয়ে যেন সংগোপনে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে।

খৃষ্টান পুরোহিতদের দ্বারা সংরক্ষিত ও সম্পাদিত প্রাচীন এংলোস্যাক্সন সাহিত্যের নমুনাগুলি পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হয় সপ্তম শতাব্দীতে। ৬৬৪ সালে হুইটবির ধর্মমহাসভাও এই সাহিত্যিক স্বীকৃতির অন্যতম উৎসাহদাতা। মানবতাবাদী কবি ও দার্শনিক বিশপ এ্যালধেলম (Aldhelm) যিনি খৃষ্টানসুলভ ল্যাটিন অনুরাক্তর মধ্যেও এংলোস্যাক্সন শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার পরিত্যাগ করেন নি, তাঁর জীবনকাল ৬৫০ অব্দ থেকে শুরু বলে অনুমান করা হয়। প্রাচীনতর এংলোস্যাক্সন সাহিত্যের খৃষ্টানদের দ্বারা লিখিত অনুলিপি সপ্তম শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে রচিত হতে থাকায় সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতাগণ ৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে এংলোস্যাক্সন সাহিত্যের সূচনা বলে ধরেন।

খৃষ্টান স্বভাব কবি কেডমনের পূর্বের সাহিত্যিক রচনাগুলির, যেগুলির কিছু কিছু খণ্ড অংশ বহু-অনুকৃত পাণ্ডুলিপির আকারে আমাদের হাতে এসেছে, রচনাকারদের কোন সঠিক পরিচয় আমাদের জানা নেই। কেডমন ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর মানুষ। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেকার অখৃষ্টীয় এংলোস্যাক্সন সাহিত্যকে হয় প্রাচীনতম ইংরাজী সাহিত্য বলে ধরতে

হয়, অথবা এংলোস্যাক্সনদের পিতৃপুরুষের সাহিত্য বলে বিবেচনা করতে হয়। ওই সাহিত্যের যে পরিচয়ই আমরা দিই না কেন, ওকে সম্পূর্ণ পৃথক সাহিত্য বলে মনে করলে ইংরাজী সাহিত্যকে কুলহীন, গোত্রহীন সাহিত্য বলতে হয়। ওই সাহিত্যকে যে ভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন ইংরাজদেব পূর্বপুরুষরাই তাঁকে ইংলণ্ডের মাটিতে এনে ফেলেছিলেন, যদিও তা নিজস্বরূপে ইংলণ্ডে বিকাশলাভ করেনি। বালটিক সাগরের উপকূলের চারাগাছ বৃটেনের মাটিতে অনুকূল পরিবেশ পায়নি। সর্বসম প্রখর খৃষ্টান পরিবেশে তা ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল। যে দুটি-একটি বিদেশাগত লতাপল্লব বৃটেনের জল হাওযার বিরোধিতা সত্ত্বেও বেঁচে রয়েছে, সেগুলিকে আমরা মূল জাতীয় চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। মানুষের রোম্যাণ্টিক কল্পনার মোহময় আবেগ সেগুলিকে ঘিরে রেখেছে। তাই এংলোস্যাক্সন সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকেব কাছে শুধু কৌতূহলের বিষয় নয়, কোমল মমতার বস্তু।

এংলোস্যাক্সন সাহিত্যের কাল

৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ সাধারণতঃ এই সাড়ে তিনশ বছরকে এংলোস্যাক্সন সাহিত্যের কাল বলে ধরা হয়। প্রাচীনতম কবিতা যা আমাদের হাতে এসেছে তা হ'ল 'উইডসিথ' (Widsith); এবং নর্মান বিজয়ের (১০৬৬) আগে আনুমানিক ১০০০ সালে রচিত 'ম্যালডনের যুদ্ধ' (Battle of Maldon) সম্ভবতঃ শেষ বড় কবিতা।

দেড় হাজার বছর আগের অখৃষ্টীয় এংলোস্যাক্সন সাহিত্যে গীতিকবিতা, মহাকাব্যধর্মী কবিতা ও কিছু নির্দেশিকা কবিতা (Didactic) আছে। এই সব সাহিত্যিক নিদর্শনের মূল রচনাগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। অধিকাংশেরই সাল তারিখ নির্দিষ্ট করা যায না। প্রথমে সেগুলি লিখিত ছিল না। পরে সেগুলির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে সেগুলির অনুকরণ হতে থাকে।

এংলোস্যাক্সন সাহিত্যকে কালানুক্রমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। খৃষ্টপূর্ব যুগের কবিতা (Pre-Christian poems) এবং ক্রিশ্চিযান কবিতা (Christian Poetry)। এখানে 'খৃষ্টপূর্ব' কথাটির মানে ধরতে হবে ইংরাজরা খৃষ্টান হবার আগে, 'খৃষ্টের জন্মের আগে' নয়।

প্রাক খৃষ্টান কবিতাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য শ্রেণী ছিল বীরধর্মী কবিতা বা বীরোচিত কবিতা। এগুলি ছিল মহাকাব্যধর্মী কবিতা। বীরোচিত (Heroic) এই কবিতাগুলি প্রধানতঃ জার্মানিক উপকথা, কিংবদন্তী এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছিল। স্পষ্ট ও বিশিষ্টভাবে তখনও পর্যন্ত এংলোস্যাক্সন বলে তাকে বলা চলে না। সেগুলি ছিল জার্মানিক জাতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি। তবে ভাষার কিছু কিছু হেরফের ছিল। উত্তর জার্মানীর বিভিন্ন অংশে পরবর্তীকালের ইংরাজদের যে পিতৃপুরুষগণ খৃষ্টজন্মের সমসাময়িককালে বা অব্যবহিত পরে বাস করতেন তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ইংরাজগণ বহুকাল অনুভব করেননি। সেই আত্মীয়তার সূত্র প্রথম ধরা পড়ে এবং স্বীকৃত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তখনই বোঝা যায় ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃতির আদি

শক্তি কোথা থেকে সুরু হয়েছিল। জার্মানীর উত্তর উপকূল, এলব নদীর দুই তীরভূমি জুড়ে রোমক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী যে জাতি গোষ্ঠী বর্তমান ছিল তাদের অভিযান-প্রবণতা, সমুদ্রপ্রিয়তা, প্রকৃতিপ্রিয়তা এবং অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসসমূহ অবশ্যই বর্তমান ছিল। কিন্তু খৃষ্টান বিশ্বাসের দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্তিত সাহিত্যিক নমুনাকে গ্রহণ করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।

তাছাড়া, যাজকদের দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবহেলিত হয়ে অথবা প্রাকৃতিক নানাকারণে লুপ্ত হয়ে গিয়ে সেই প্রাচীন সাহিত্যের অনেকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু একটা প্রশ্নের মীমাংসা করা খুবই দুরুহ। মুখে মুখে হলেও যে সব কবিতা ও গান তখন রচিত হয়েছিল, এবং অবশ্যই অনুমান করা যায়, সকলের কাছে প্রিয় ছিল তা কি করে দুই কিংবা এক শতাব্দীর ব্যবধানে—এংলোস্যাক্সনদের বৃটেনে আসবার ঠিক আগে ও পরে—তাদের বংশধররা ভুলে যায়। এ ব্যাপারে খৃষ্টান ধর্মের বাধ্যতামূলক নিষ্পেষণের কোন কথা তো শোনা যায় না। প্রভাব এক জিনিষ, অনাদর বা বিস্মৃতি আর এক জিনিষ। আমাদের দেশেও তো অনেক আদিবাসী খৃষ্টান হয়েছেন। তাঁদের ভিতরেও তো পূর্বপুরুষদের নানা সংস্কৃতি ও রীতিনীতির এবং পুরাকথার বেশ কিছু অদ্যাবধি অস্তিত্ববান এবং অবিকৃত আছে। অষ্টম শতাব্দীতে ডেনদের আক্রমণে মঠগুলির গ্রন্থাগারের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু তা না হলেও কি আমরা সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত প্রাচীন এংলোস্যাক্সন সাহিত্য পেতাম? বীওউলফের (Beowulf) কথাই ধরা যাক। পশ্চিম স্যাকসন আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত 'বীওউলফ' আমরা পাই; কিন্তু আদি, অবিকৃত বীওউলফ-এর কোন সন্ধান নেই। তাই আমার অনুমান খৃষ্টধর্মের প্রভাব, ডেন আক্রমণ, এমনকি বৃটন সংস্কৃতির প্রভাব ছাড়াও আরও অন্য কিছু ছিল যা প্রাচীন এংলোস্যাক্সন বীরোচিত কাব্য বা অন্য কোন কোন ধরনের সাহিত্যকে প্রায় লুপ্ত করেছিল।

এংলোস্যাক্সন অখৃষ্টান সাহিত্যের বিভিন্ন ধরন

মহাকাব্যধর্মী বীরোচিত কবিতা, গীতিকবিতা, নাট্যধর্মী কবিতা, নানা ধরনের মন্ময় (Subjective) ও তন্ময় (Objective) কবিতা ওই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল।

এংলোস্যাক্সন যুগের বীরোচিত কাব্যের (Heroic Poetry) চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করা এখন সম্ভব নয়। সাহিত্যকৃতির যেটুকু নমুনা আমাদের হাতে রয়েছে তা শুধু পরিবর্তিত ও সম্মার্জিতই নয়, পরিমাণেও কম। কতখানি এবং কি স্তরের সাহিত্য নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা না জানলে বিচারে ভুল থেকে যাবে এবং বিচার খণ্ডিত হবে। এ ব্যাপারে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ডেন আক্রমণের দ্বারা।

বীরোচিত কাব্য (Heroic poems) গুলির ভিতর বীওউলফ (Beowulf), ফিনসবার্গের যুদ্ধ (Fight at Finsberg) এবং ওয়ালধিয়ার (Waldhere) মহাকাব্যধর্মী। এসব কবিতা যে যুগে রচিত হয়েছিল তাকে 'বীরত্বের যুগ' (Heroic Age) বলা হয়।

বীরোচিত কবিতাগুলির (Heroic Poems) সাধারণ পরিচয়

এগুলি চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ওই যুগকে পরবর্তী কালে নাম দেওয়া হয়েছে 'জাতীয় দেশান্তর গমনের যুগ' (The Age of National Migration)। যে কোন দেশের অন্যতম প্রধান জীবন্ত অংশ হচ্ছে সেই দেশের মানুষ। স্যাক্সনদের পূর্বপুরুষদের বহুসংখ্যায় একত্রিত সত্ত্বাকে 'দেশ' ছাড়া আর কী ই বা নাম দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে দেশের মানুষ সুদূর বাল্টিক সাগরের উপকূলের প্রাচীন ভূমিভাগ ছেড়ে যদি বৃটেনে নতুন স্বদেশ খুজে পায়, তবে তাকে জাতীয় দেশান্তর গমন বলা খুবই সঙ্গত।

এযুগের কাব্যগুলিতে অবশ্যই প্রাচীনতর যুগের ঐতিহ্য অনুরণিত হয়েছিল। সে সব বিস্মৃত যুগের জাতিগোষ্ঠীর মানসিক গঠনের এবং চারিত্রিক লক্ষণের অনেক কিছুই বীরত্বের যুগের বা মহাকাব্যের যুগের কাব্যে থেকে গিয়েছিল। কবিতাগুলিতে পূর্বপুরুষানুক্রমিক ভাষাগত সামঞ্জস্য ছাড়াও ছিল তখনকার দিনের, বর্বরোচিত হলেও, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি। নেতার প্রতি আনুগত্যও যেমন ছিল, নেতার সঙ্গে অনুগামীদের নৈকট্যও তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

আমাদের দেশের সাঁওতাল বা মধ্যযুগের ভীলদের কাছে যেমন বন্যজন্তু শিকার প্রাণের থেকে প্রিয়, ইউরোপের মূল ভূখণ্ডবাসী এই সব সমুদ্রোপকূলবর্তী জার্মানিক জাতিগুলির কাছে ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক অভিযান ছিল তেমনই প্রিয়। সমুদ্র ছিল তাদের জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। আজও ইংরাজী সাহিত্যে মহাসমুদ্রের নানারূপ। ইংরাজদের জাতীয় চরিত্রের অন্বেষণে সমুদ্র তাই নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

অবশ্যই অতি পুরাতন যুগ থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত স্যাক্সনদের ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার, ক্রূরতার ও লালসার কোন স্বল্পতা ছিল না; কিন্তু পাশাপাশিই মহত্ত্ব, ঔদার্য এবং আত্মদানের উপাদানও কিছু কম ছিল না। তখনকার সাহিত্যে এ সব কিছুই প্রতিফলিত হয়েছিল। নেতা বা দলপতির প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল বীর অনুগামীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। বীওউলফ এ উইগলাফ (Wiglaf) তার অনুগামীদের কাছে বীওউলফের সঙ্গে সহযোগিতা করবার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে এই বিশ্বস্ততা এবং বীরত্বের আদর্শ প্রতিধ্বনিত। এই বিশ্বস্ততার প্রতিদানে দলপতির দিক থেকে অনুগতদের প্রতি উদারতাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দলপতি তাঁর অধস্তন যোদ্ধাদের সোনা এবং অন্যান্য অনেক কিছু দান করতেন। দলপতিকে তাই বলা হত 'স্বর্ণদাতা', 'সম্পদদাতা' ও 'স্বর্ণবন্ধু'। কিন্তু যে সমস্ত দলপতি উদার দান ও উপহার না দিতেন তাঁরা অন্যদের দ্বারা তিরস্কৃত হতেন। 'উইডসিথ', 'দেওর', এঁরা এইভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। নির্বাসিত জীবনে 'ওয়াণ্ডারার' (Wanderer) নির্বাসনের আগে তাঁর স্বর্ণবন্ধুর দয়ার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন।

এছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট দল বা উপজাতিদের নিজেদের ভিতর বংশানুক্রমিক শত্রুতা ও প্রতিহিংসা এই 'বীরকাব্যের' যুগের অন্যতম পরিচয়। আমরা বিভিন্ন কাব্যখণ্ডে

এইসব যুদ্ধের ইঙ্গিত ও বিবরণ পাই। 'বীওউলফ' কাব্যে এর কযেকটির উল্লেখ আছে। ডেনরাজ হ্রথগার (Hrothgar) এর সঙ্গে ইনগেল্ড (Ingeld) -এর বিবাদ নিষ্পত্তি হয়েছিল ইনগেল্ডের সঙ্গে হ্রথগার-এর কন্যা 'ফ্রিযাওয়ারুর' বিবাহের মাধ্যমে। বীওউলফ (Hygelac) হাইজেলাককে বলেছিলেন যে—এই বিবাদ আবার মাথা চাডা দিয়ে উঠতে পারে।

শুধু বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে নয়, নিজের আত্মীযদের সঙ্গেও স্থাযী বিবাদের কথা শোনা যায। বীওউলফ আনফার্থকে (Unferth) বিদ্রুপ করে বলেছিলেন---যে সে তার ভাইদের হত্যা করেছিল। এইসব যুদ্ধের ফলে অনেকেই দেশছাডা হয়ে যেত। অবশ্য দেশের বাইরে চলে যাওয়ার পিছনে বিপদসঙ্কুল অভিযানের আকর্ষণই ছিল প্রবলতর।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিলটন-এর প্যারাডাইজ লষ্ট (Paradise Lost) প্রকাশিত হবার আগে বীওউলফ এবং অন্য অল্প কযেকটি কাব্যই ইংরাজী সাহিত্যের মহাকাব্যের সম্পদ। হোমারের প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্যের সঙ্গে এই সব কাব্যের প্রকৃতির বড় রকমের তফাৎ নেই। এইব কাব্যের রচনাশৈলীর ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্র বিশেষে এই রচনাশৈলী দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং কঠোব,—যেমন পাই বীওউলফের সঙ্গে গ্রেণ্ডেল (Grendel) এর যুদ্ধের অথবা ফিনল্যাণ্ডের প্রাসাদযুদ্ধের বর্ণনায়। আবার কোথাও বা অপূর্ব রহস্যময সৌন্দর্যে মন অভিভূত হয়। গ্রেণ্ডেল-এর মা যেখানে বাস করত, সেই হ্রদের বর্ণনা এমনই রহস্যময় সুন্দর। হ্রথগার এর রাজসভায বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গমন উপলক্ষ্যে বীওউলফ ও তাব সহযোগীদের সমুদ্র অভিযান গম্ভীর ও মর্যাদাব্যঞ্জকভাবে চিত্তাকর্ষক।

বীরকাব্যের (Heroic Poems) কোন কোন অংশে আমরা বিযোগ বিধুর গীতি কবিতার দেখাও পাই। স্পষ্ট আলঙ্কারিক অর্থে তুলনা [kennings] অপেক্ষাকৃত কম হলেও, বর্ণনামূলক শব্দগুচ্ছের কোন স্বল্পতা এসব কাব্যে নেই। যেমন, বীওউলফ-এর অর্নবপোতকে 'ফেনায়িত গ্রীবাবিশিষ্ট ভাসমান প্রাণী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি কখনও সৌন্দর্যেব আকর, আবার কখনও গুঢ় রহস্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।

খণ্ডিত রূপে এবং মার্জিত রূপে প্রাপ্ত মহাকাব্যধর্মী প্রাচীন এংলোস্যাক্সন কবিতার নিদর্শনগুলির কিছু বিশদ পরিচয় পাওয়া দরকার। আমরা প্রথমেই 'বীওউলফ'-এর সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মহাকাব্যের চরিত্রলক্ষণে আমরা পাই একটি পৌরাণিক বা অতিপ্রাকৃত উপকথা। এতে বর্ণিত কার্যক্রম নিজস্বভাবে বিশিষ্ট হবে, এর পূর্বাপব সম্পূর্ণতা থাকবে, এবং কার্যক্রম হবে মহান ও বিরাট। মাহকাব্যের 'নায়ক' থাকবে। এই 'নায়ক' ব্যক্তিবিশেষও হতে পারে, অথবা একটি সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা জাতির সকল মানুষের একত্রিত সমাহারও হতে পারে। এংলোস্যাক্সন মহাকাব্যে আমরা প্রাচীন টিউটনিক জাতির এক বা একাধিক গোষ্ঠীর সকল মানুষের চারিত্রিক প্রচণ্ডতা, বিক্রম এবং সেই সঙ্গে মানবতাকে ওই মহাকাব্যের নায়ক বলে মনে করে নিতে পারি। এই কাল্পনিক সত্ত্বার প্রকাশ ইংরাজদের জাতীয় চরিত্রে এবং তাদের সাহিত্যে।

বীওউলফ (Beowulf)

পাণ্ডুলিপি ঃ বীওউলফ-এর যে অনুলিপি এখন আমরা পাই তা বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত কটন (Cotton) পাণ্ডুলিপিতে আছে। এটি ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় অনুকৃত হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ, একটি তথ্য জেনে রাখলে কাজের সুবিধা হয়। বর্তমান ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের যে মিলিত রূপকে আমরা 'যুক্তরাজ্য' বলি তা গঠিত হয় ১৬০৩ সালে। দক্ষিণভাগের নাম ইংল্যাণ্ড। সপ্তম শতাব্দীতে এ্যাঙ্গল, স্যাকসন ও জুটরা বৃটেনের দক্ষিণার্ধের অর্থাৎ বর্তমান ইংল্যাণ্ডের প্রায় সবটাই অধিকাব করে। এই অধিকৃত দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ওই তিন বহিরাগত জাতি রাজ্যগঠন করে। এ্যাঙ্গেলসদের অধীনে ছিল তিনটি রাজ্য—নর্থামব্রিয়া, ইষ্ট অ্যাঙ্গলিযা ও মার্সিযা ; স্যাক্সনদের অধীনে ছিল এসেক্স, ওয়েসেক্স ও সাসেক্স ; এবং জুটদের অধীনে ছিল কেণ্ট। নর্থামব্রিয়া ছিল উত্তরাঞ্চলে স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব দিকে। হুইটরি মঠ এই নর্থামব্রিযাতেই অবস্থিত ছিল। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের মধ্যাঞ্চলের পূর্ব অংশে, এবং এসেক্সের উত্তরে ছিল ইষ্ট এ্যাঙ্গলিযা। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের মধ্যাঞ্চলে এবং ওযেসেক্সের উত্তরদিকে ছিল মার্সিয়া। ওয়েসেক্স ছিল দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যভাগে। এসেক্স ছিল ওয়েসেক্সের উত্তরপূর্ব দিকে এবং কেণ্ট-এর উত্তরে। সাসেক্স ছিল কেণ্টের দক্ষিণ পশ্চিমে। বর্তমান 'যুক্তরাজ্যেব' তথা ইংল্যাণ্ডেব দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে ছিল কেণ্ট। ক্যাণ্টারবেরী এই কেণ্ট-এতেই অবস্থিত।

বীওউলফের বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি পশ্চিম-স্যাক্সন আঞ্চলিক ভাষায় অর্থাৎ ওযেসেক্সের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা। অষ্টম শতাব্দীতেই এটি লিখিতকপে প্রকাশ পায। পণ্ডিতেরা বলেন ইংল্যাণ্ডে এটি প্রথম লেখা হয়েছিল মার্সিয়া অথবা নর্থামব্রিয়ার কোন আঞ্চলিক এ্যাংলিকান ভাষায় অর্থাৎ এঙ্গেলসদের ভাষায়। মূল রচনা অবশ্যই ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তারও আগের। তবে তখন গ্রন্থটি লিখিত আকার পায়নি। তাছাডা এর রচনা একজনের দ্বারা বা একই সময়ের তা-ও মনে হয় না। তবে তা লেখা হয়েছিল বৃটেনের থেকে অনেক দূরে বাল্টিকসাগরের পশ্চিম উপকূলে কোথাও, এবং তাতে খৃষ্টান উপাদান ছিল না।

পরবর্তী নানা কাব্যে বীওউলফ-এর কিছু কিছু অংশের প্রভাব আছে। এ থেকে অনুমান হয় 'বীওউলফ' জনপ্রিয় ছিল। এবং প্রথম দিকের অন'ান্য কাব্যের তুলনায় একে ক্লাসিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

৩১৮২ লাইনের বীওউলফ যে অখণ্ড আকারে পাওয়া গেছে তা দিয়ে কিন্তু এটা প্রমাণ হয় না যে কাব্যটি তদানীন্তন কালের অন্যান্য কাব্য থেকে শ্রেষ্ঠতর। তা যা-ই হোক, এটা মানতে হয় যে প্রাচীনতম ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বীওউলফ একটি দিগদর্শন। এ্যাংলিকান ভাষায় লেখা গ্রন্থটির প্রথম অনুকরণ করেন অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে থরকেলিন (Thorkelin)।

নামকরণ ঃ প্রাচীন এংলোস্যাক্সন কাব্যগুলির কোন নাম ছিল না। ১৮০৫ সালে

সারণ টারনার (Sharon Turner) 'বীওউলফ'—এই নাম দেন। ১৮৩৩ সালে বিশিষ্ট পণ্ডিত কেম্বল-ও (Kemble) এই নামই বজায় রাখেন। বীওউলফ-এর নানা বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার বর্ণনা যে গ্রন্থে পাওয়া যায় তার নাম "বীওউলফ" রাখাই সঙ্গত। অনুকরণের প্রথম দিক থেকেই এতে খৃষ্টান ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

গ্রন্থ পরিচয়ঃ বীওউলফ এর মূল রচনা এবং প্রথম লিখিত অনুকরণ অবশ্যই এ্যাংলিকান। পরমশ্রদ্ধেয় বীড এর আমলেই (৬৭২-৭৩৫) তদানীন্তন নর্থাম্ব্রিয়ার সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই আদি অনুকরণ হয়েছিল। কটন পাণ্ডুলিপিতে আমরা এখন যে হস্তলিখিত অনুলিপিটি পাই তার আগে অবশ্যই আরও অনেক অনুলিপি লিখিত হয়েছিল বলে ধরা যায়।

বীওউলফ-এর উৎসঃ বীওউলফ-এর যে পাণ্ডুলিপিটি আমাদের হাতে আছে তাতে খৃষ্টান উপাদান যা ই থাক, তা' জার্মানিক জাতিগুলির জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আধা-ঐতিহাসিক আধা কিংবদন্তীমূলক জনপ্রিয় এক কাহিনী। আবার এতে ভার্জিল-এর প্রভাবের কিছু হদিশ কেউ কেউ পেয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, মূল রচনার উৎস অবশ্যই অন্য রকম। হয়ত নরওয়েতে কিংবা আইসল্যাণ্ডের নর্সদের ভিতরে এর প্রাচীন উৎস ছিল।

'বীওউলফ'-এর কাহিনীঃ বীওউলফ ছিলেন এগথেও (Ecgtheow) এর পুত্র এবং গিটাস (Guetas) এর রাজা। হ্রদবাসী দুর্দান্ত দানব গ্রেণ্ডেল (Grendel) এর আক্রমণে ডেনমার্কের রাজা হ্রুথগার (Hrothgar) বিপর্যস্ত। একদল যোদ্ধা নিয়ে ডেনমার্কে গিয়ে গ্রেণ্ডেলকে হত্যা করে বীওউলফ হ্রুথগারকে বিপদমুক্ত করেন। ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য গ্রেণ্ডেল এর মা বীওউলফ কে আক্রমণ করে। বীওউলফ তাকেও হত্যা করেন। তারপর বীওউলফ হ্রুথগারের প্রাসাদে ভোজ ও আমোদ প্রমোদে যোগদান করেন। তারপর একটি ড্রাগনকে হত্যা করেন। তারপর সেই ড্রাগনের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর দেহ সৎকার ও পারলৌকিক ক্রিয়ার বর্ণনা দিয়ে কাহিনী শেষ হয়।

বীওউলফ-এর বিষয়বস্তুঃ মহাকাব্য বলতে যা বোঝায় বীওউলফ ঠিক তা' নয়, যদিও এংলোস্যাক্সন সাহিত্যের প্রাচীন মহাকাব্য বলেই এর পরিচয় দেওয়া হয়। মহাকাব্যের গঠনগত কতকগুলি নির্দিষ্ট চরিত্র বা লক্ষণ আছে যা' বীওউলফ এর নেই। বীওউলফকে বোধহয় কেবল বীরোচিত কাব্য (Heroic poem) বলাই বেশী সঙ্গত।

বীওউলফ ছিলেন জার্মানিক মহানায়ক। জার্মানিক মহানায়কের অন্যতম চারিত্রিক বিশেষত্ব তাঁর বিষাদ। যুদ্ধজয়ের গৌরবেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর চূড়ান্ত মহৎগুণের প্রকাশ যুদ্ধের মারাত্মক আঘাতে মৃত্যুর মুহূর্তে। যে অর্থে ইলিয়ডে হেকটরের মৃত্যু বা রামায়ণে রাবণ বা মহাভারতে দুর্যোধনের মৃত্যু আমাদের অন্তরের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, জার্মানিক নায়কের মৃত্যু সেই অর্থে ভয়ঙ্কর বেদনাবহ।

বীওউলফ যেন একটি বিষাদময় কাব্য। প্রকাশ-ব্যঞ্জনার পূর্বাপর সমতা এই বিষাদের সুর ধরেই চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। ড্রাগণের সঙ্গে যুদ্ধে গৌরবময় মৃত্যুতেই

বীওউলফ এব জার্মানিক নাযক 'হসাবে সাথকতা'। বীওউলফ কাব্যে নাযকেব জীবনেব পূর্ণ বিববণ দেওযা হযনি, কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ এবং সঙ্কট মুহূর্তগুলিব বর্ণনা দেওযা হযেছে। কাবণ মূল জার্মানিক শ্রোতাদেব কাছে বীওউলফ এব কাহিনী অজানা ছিল না। বীওউলফ এব চবিত্রেব কোন বর্ণনা দেওযা হযনি, কেবলমাত্র ধাবাবাহিক ঘটনাগুলি পবপব গেঁথে দেওযা হযেছে। এই ঘটনাগুলিকে বিষাদময উৎকণ্ঠাব পবিবেশকে বাডানোব জন্যই যেন ব্যবহাব কবা হযেছে।

যে সব শ্রোতাব উদ্দেশ্যে কাব্যটি প্রাথমিকভাবে বাচত হযেছিল, তাবা বিশিষ্ট শব্দ ও ছন্দেব কৌশল জানতেন। আইসল্যাণ্ডেব প্রাচীন নবওযেজীয কবিতা সম্পর্কেও এই কথা খাটে। এই সব শ্রোতা সম্ভবতঃ অভিজাত ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন। প্রাচীন জার্মানিক ইতিহাস ও পুবাণেব উন্নত মৌখিক ঐতিহ্যেব এবা ছিলেন উত্তবাধিকাবী। অতিপ্রাকৃত ধবনেব লোকগীতিও ওই ঐতিহ্যেব অংশ। বৃটেনেব মাটিতেও এই জাতীয শ্রোতা জার্মানিক পটভূমিকায বচিত এই ধবণেব ইতিহাস, পুবাণ ও লোকগীত শুধু যে অনুমোদন কবতেন তা ই নয, কল্পনায নিজেদেব পিতৃপুরুষদেব বিশ্বাস ও সাহিত্যকর্মেব সঙ্গে একাত্মতা অনুভব কবতেন। বীওউলফ শুধু এংলোস্যাক্সনদেব বীবকাব্য নয, সামগ্রিকভাবে প্রাচীন জার্মানিক জাতিগোষ্ঠীব নিজস্ব সম্পদ। এব প্রধান প্রধান চবিত্র এংলোস্যাক্সন নয, স্ক্যাণ্ডিনেভীয। এব কাবণ আইসল্যাণ্ড, নবওযে সুইডেন, ডেনমার্ক, উত্তব জার্মানী সবই ছিল এক মহাজাতিব অন্তর্ভুক্ত। পববর্তীকালে খৃষ্টান গুণসম্পন্ন বীওউলফ এব বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্কবণটি এমনভাবে ঢেলে সাজা হযেছে যে গ্রেণ্ডেল, ড্রাগন এবা যে অন্ধকাবেব জীব, শযতানেব অনুচব তা বুঝতে কষ্ট হয না। আবাব বীওউলফ এব ভিতব দিযেও সেই খৃষ্টানসংস্কাব দেখান হযেছে যে ইহজীবনই সব নয। মানুষ যতই বীব এবং মহৎ হোক না কেন সাফল্যেব পূর্ণতা মবজীবনে সম্ভব নয। খৃষ্টান প্রভাবে পবিমার্জিত বীওউলফ এ অধর্মেব বিরুদ্ধে ধর্মেব বিক্রম ও সাফল্য বৃটেনে ধর্মান্তবিত এংলোস্যাক্সনদেব কাছে তাই বিশেষ ইঙ্গিতবহ। অধর্মেব বিরুদ্ধে ধর্মেব এই নীতিসঙ্গত প্রাতবোধ ডেনমার্কেব বাজকুমাব হ্যামলেটেব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পবিত্রতা ও বীবত্বব্যঞ্জক কাজেব দ্বাবা যশ অর্জন কবা প্রত্যেক খৃষ্টানেবই আকাঙ্খাব বস্তু।

আবাব খৃষ্টপূর্ব যুগেব মানুষেব মনেব বোধ ও প্রকৃতি প্রাচীন জার্মানিকদেব খৃষ্টান সন্তানসন্ততিদেব কাছে কম প্রিয নয। তাই 'নিযতিবাদ' বীওউলফ এবং অন্যান্য প্রাচীন জার্মানিক কাব্যেব একটি বিশেষ লক্ষণ। বহু দেবদেবীব উপাসক প্রাচীন জার্মানিকদেব নিযতিবাদ যেমন এংলোস্যাক্সনদেব কাছে বাইবেব ব্যাপাব ছিল না, তেমনি খৃষ্টীয ঈশ্ববেব ন্যাযবিচাবেও তাবা সমভাবে আস্থাশীল ছিল। কোন মানুষ যদি ধ্বংসেব জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট না থাকে, তবে ভাগ্য তাকে তাব দৃঢ সাহসিকতাব পুবস্কাব দেয।

তাই সেই মানুষই যশ এবং গৌবব অর্জন কববে যে দৃঢভাবে সাহসী হবে এবং নিযতিব অভিশাপমুক্ত হবে। এইখানে খৃষ্টপূর্ব যুগেব ধর্মবিশ্বাস এবং ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস মিশে যায। খৃষ্টীযভাবে পবিমার্জিত বীওউলফেব বচযিতা তাই খৃষ্টান প্রেবণা ও ধর্মবোধেব প্রচাবেব জন্য প্রাক-খৃষ্টান আদি জার্মানিক কাহিনীব উল্লেখ ও উদাহবণ পবিপূর্ণভাবে ব্যবহাব

কবেছেন। আবাব জার্মানিক ও খৃষ্টান মিলিত উপাদান জীবন ক্ষণস্থাযী, জগতেব কোন কিছুই চিবস্থাযী নয় বীওউলফেব আদ্যোপ্রান্ত জুড়ে নিশ্চিত বিশ্বাসে অভিসিঞ্চিত বযেছে।

বীওউলফ-এব গঠনশৈলী: ১০০০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীযভাবে পবিমার্জিত পাণ্ডুলিপিটিতেও মূল বচনাব জার্মানিক চবিত্র এবং বীবকাব্যেব গঠন শৈলী (Heroic style) অনেক পবিমাণেই থেকে গেছে। খৃষ্টান কবিবা এই শক্তিশালী গঠনশৈলী এবং যুদ্ধ ইত্যাদিব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাষাব ধবন এবং শব্দ সঠিকভাবে ব্যবহাব কবেছেন। বীওউলফ, থেকে শুরু কবে 'ম্যালডনেব যুদ্ধ' (Battle of Maldon) পর্যন্ত যেখানে যেখানে প্রযোজন হযেছে যথোপযুক্ত বীবোচিত শব্দ এমনভাবে ব্যবহাব কবা হযেছে যাতে প্রাক খৃষ্টান মূল জার্মানিক ধবন অব্যাহত থাকে।

বীওউলফ এব গঠনশৈলী একাধাবে সংক্ষিপ্ত ও ব্যাখ্যাত। দীর্ঘ শব্দযৌগেব বিশেষণেব দ্বাবা অনেক কিছু সংক্ষেপে বলা হযেছে বা ইঙ্গিত দেওযা হযেছে। শব্দগুলি প্রধানতঃ বস্তুসংশ্লিষ্ট; ভাবসংশ্লিষ্ট নয। বিভিন্ন শব্দেব অর্থেব সামান্যতাব জন্য আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে পবস্পবেব প্রতিশব্দ বলে মনে হলেও বাস্তবে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ কবে। এই গঠনশৈলী যদিও প্রাচীন ক্লাসিক চবিত্রেব নয তবুও এতে মহাকাব্যেব গুণ প্রকাশ পায। চবিত্রগুলিব চিন্তা ও মনোভাব প্রকাশেব জন্য এবং সেগুলিব মুখে ভাষা দেবাব জন্য বচযিতা বহু শ্রম স্বীকাব কবেছেন। সামগ্রিক গঠনে মহাকাব্যেব রূপ পেলেও গঠনশৈলীব মন্ময (subjective) গুণ স্পষ্ট। চবিত্রগুলিব দ্বাবা প্রকাশিত চিন্তা ও অনুভব হযত মূল বচনাকাবেব মানসিকতাব প্রতিফলন।

কাব্যটিতে আদর্শমানেব জীবনযাত্রাব সুব এবং সৌজন্যেব পবিবেশ নজবে পড়ে। এই মহত্ত্বমণ্ডিত সুব কবিতাটিব মর্যাদাজ্ঞাপক গঠনশৈলীব সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বক্তব্য প্রকাশেব ভঙ্গী প্রাযই অপ্রত্যক্ষ কিন্তু বাস্তব জীবনভিত্তিক। শব্দচযন কাব্যগুণমণ্ডিত। শব্দযৌগেব বহুল ব্যবহাব কাব্যকে সদম্ভ প্রসাবী কবেছে। শব্দচযন এমনই যে সেগুলি কাব্যগুণমণ্ডিত গদ্যেও ব্যবহাব কবা যেত। কিছু কিছু শব্দ আদিম রূপেব। হযত শ্রোতাদেব একাংশ বিদগ্ধ ছিল।

বর্ণনামূলক বিশেষণ প্রচুব, কিন্তু রূপকেব সংখ্যা কম। উপমাব সংখ্যা আবও কম। পুবাঘটনা বা বিষযেব উল্লেখ যত্রতত্র।

প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলিব কাহিনীব মত, বা আমাদেব দেশেব বামাযণ গান বা মঙ্গলকাব্যেব মত বীওউলফ-এব কাহিনী আদি শ্রোতাদেব কাছে অবশ্যই জানা ছিল। তাই অপ্রত্যক্ষ পুবাকাহিনীব উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট ছিল। বাক্যেব মধ্যে কর্তা বা সর্বনামেব হঠাৎ পবিবর্তনেও কিছু যেত আসত না; বক্তব্যেব হঠাৎ পবিবর্তনেও না-বলা অংশেব জন্য বোধগম্যতায কোন ফাঁক থাকত না। বর্তমানকালেব পাঠকবা এই ধবনেব কোন কোন অংশ পূর্বাপব মেলাতে অসুবিধা বোধ কবেন। কিন্তু প্রাচীন এংলোস্যাক্সন শ্রোতাবা, উদাহবণস্বরূপ, ফিন এবং হেনজেষ্ট সংক্রান্ত ঘটনাব হঠাৎ উল্লেখে, কিছুমাত্র বিভ্রান্ত হতেন না বলে বোঝা যায।

বীওউলফ-এর ঐতিহাসিকতা: বীওউলফেব কাহিনীব প্লট শিশুদেব

মনোরঞ্জক রূপকথার মত শোনায়। আইসল্যাণ্ডেব মধ্যযুগীয় গদ্যকাহিনীতে, যেমন বীর গ্রেট্টির-এর সম্পর্কিত লোককাহিনীতে, বীওউলফ-এর সাদৃশ্য মেলে। তবে বীওউলফে আরও কিছু বেশী আছে। অতিশয় অবাস্তব গল্পকাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে এখানে পুরাণ সুলভ মর্যাদা ও বাস্তবতা মিশে গেছে।

কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্র ঐতিহাসিকঃ ৫১২ থেকে ৫২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাইন নদীর মোহনার কাছে হাইগেলাক এর (Hygelac) পরাজয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর প্রজারা দক্ষিণ সুইডেনে থাকত। তাদের বলা হ'ত গীটস (Geats)। তবে গীটস জাতির বীর বীওউলফ নামের কোন ঐতিহাসিক চরিত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু বীওউলফ-এ উল্লিখিত সুইডেনের রাজারা বা ডেনদের রাজা হিয়ালফর্ডেন (Healfdene) ঐতিহাসিক চরিত্র। ডেনদেব রাজপ্রসাদ হিওরোট (Heorot) সিল্যাণ্ড (Seeland) দ্বীপের লিযেব এ (Leire) অবস্থিত ছিল, এটা জানা যায।

বীওউলফ এর প্রাপ্ত সংস্করণে খৃষ্টান ধর্মেব সঙ্গে যুক্ত যে সব উল্লেখ পাওযা যায তাব কোন কোনটি সামঞ্জস্যহীন। হ্রথগার-এর সভার গাযক খৃষ্টানদের মত জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে গান গাইছে ; আবাব বীওউলফ এর অন্তিমকৃত্য দেখান হযেছে প্রাক খৃষ্টীয রীতিতে মৃতদেহ চিতায তুলে অগ্নিসৎকার করে।

কারো কাবো মতে খৃষ্টান অংশগুলি মূলকাব্যের ভিতরে পরে যোগ কবা হযেছে। আবার এও হতে পাবে, সমগ্র কাব্যটি এক হাতেবই রচনা। প্রথমদিকে খৃষ্টধর্ম প্রাচীনতব বিশ্বাস ও ধারণাগুলিকে একেবাবে বিতাড়িত করেনি। আলফ্রেড খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু তিনি পুবাতন স্যাক্সন গান শুনতে ভালবাসতেন। খৃষ্টধর্মের প্রসার এবং পুবাতন বিশ্বাসেব সঙ্কোচন— এই দুই অবশ্যই ইংলণ্ডে কিছুকাল পাশাপাশি বর্তমান ছিল। তাই সে যুগের ইংবাজী কাব্যেও এই দুই এর পাশাপাশি অবস্থান অবস্বাভাবিক নয।

দু'এক শতাব্দী পরেই প্রাচীন যুগের ইংবাজী সাহিত্য যা তখনও চলছিল তাতে অখৃষ্টীয বিষয আর স্থান পায়নি। মঠবাসী খৃষ্টান সাধুরা হয়ে উঠলেন কবি, এবং প্রাক খৃষ্টান সভা কবিদের জাত লুপ্ত হয়ে গেল।

বীওউলফ-এ বিয়োগবিধুর উপাদান (Elegiac Note)

বীওউলফকে এক সুগভীর ও সর্বাত্মক বিয়োগবিধুর কাব্য বলে বিবেচনা করতে হয। এটি কোন ধারাবাহিক কাহিনী নয ; ক্লাসিক মাপকাঠিতে মহাকাব্যও নয়। তবুও এ্যারিষ্টটল যে ধারণা অনুযায়ী কাব্যকে ইতিহাসের উপরে স্থান দিয়েছিলেন, দার্শনিকতায় ও মহত্ত্বে যা ইতিহাসের থেকে সত্যতর—সেই ধারণার সঙ্গে বীওউলফ সঙ্গতিপূর্ণ।

বীওউলফের অন্তিম পরিণতি যে বিষাদের মুখোমুখি আমাদের দাঁড করিয়ে দেয় তার প্রস্তুতি যেন কাব্যটির প্রথম থেকেই শুরু হযে গেছে। নানা পূর্বোল্লেখ, নানা মন্তব্য নিয়ে যে কাব্যটির গঠনে কোন অসম্পূর্ণতা নেই তা যেন প্রথম থেকেই হৃদয়বিদারক অন্তিমদৃশ্যের জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করতে থাকে। জীবনের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলিতে গৌরবময় বীরোচিত কর্মোদ্যমের আড়ালে যেন প্রচ্ছন্ন থাকে এক প্রকাণ্ড হাহাকার।

আপাতদৃষ্টির অন্তরালে বিস্তৃত তুলনামূলক নীতি উপদেশ সমন্বিত সামান্য কাহিনী এটি নয়। অন্ধকারের জগতের প্রচণ্ড শক্তিগুলির প্রতীকি অবস্থানে বীওউলফ এক কালজয়ী মহিমায় উন্নীত।

বীওউলফের গুরুত্ব ঃ বীওউলফ এর কাহিনী তার ভিতরের প্রতীকিব্যঞ্জনা বাদ দিলে খুব তুচ্ছ কাহিনী বলে মনে হতে পারে। এর যথার্থ বিচার হবে এর রচনা কালের পটভূমিকায়। এর মহিমা ও পূর্ণ স্বরূপ যাতে জার্মানিক ও খৃষ্টান বীরোচিত গুণের সংমিশ্রণ ঘটেছে তা শুধু মহত্তম শিল্পগুণের প্রকাশ নয়, তা এক কালজয়ী সর্বাত্মক সৃষ্টিতে পর্যবসিত পেয়েছে। যে শ্রোতাদের এই কাব্য প্রথম শোনান হয়েছিল তারা জার্মানিক মহাজাতির, বিশেষ করে এংলোস্যাক্সনদের পুরাকাহিনীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন বীরোচিত ঐতিহ্য এবং পরবর্তীকালের সরলতর খৃষ্টান ব্যাখ্যায় এই কাব্য এক উদার রসে সম্পৃক্ত। সেই প্রাচীন যুগের কঠিন বিশ্বাসে দৃঢ় এবং অতিপ্রাকৃতে সহজ বিশ্বাসী শ্রোতারা যা শুনেছিলেন, যা অনুভব করেছিলেন তার উপলব্ধি বীওউলফ এর বিশালতায় এখনও অনুভব করা যায়। ইতিহাস, পৌরাণিক ইতিকথা এবং লোকসাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয়ে—বীওউলফ সাহিত্যের আশ্চর্য নিদর্শন, মানবিক চেতনার কালজয়ী সত্তার গৌরব।

ফিনসবার্গের যুদ্ধ (Fight of Finnsburh)

এটি আর একটি মহাকাব্যধর্মী রচনা। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে লেখা। এটি খণ্ডিত। মাত্র ৯১টি লাইন পাওয়া গেছে। অর্থ সম্পূর্ণ নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে জর্জ হিকস (George Hicks) এটিকে আবিষ্কার করেন।

এটি সংক্ষিপ্ত একটি গোষ্ঠীযুদ্ধের বর্ণনা। ফ্রিজিয়ানদের সঙ্গে ডেনদের যুদ্ধ। ধারাবাহিক বহু যুদ্ধের মধ্যে এটি একটি। ফ্রিজিয়ান নেতা ফিন ডেনরাজকুমারী হিলডেবার্গকে (Hildeburgh) অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাই থেকেই পারম্পরিক হানাহানির এই ধারাবাহিক যুদ্ধের সুরু। এখানে অবশ্য একটি যুদ্ধের কথাই আছে। এটি খৃষ্টান কবিতা নয়। প্রাচীন এংলোস্যাক্সনদের নিজস্ব জাতীয় লক্ষণই এখানে স্পষ্ট।

ওয়ালদেয়ার (Waldare) বা (Walter of Aquitaine)

দুটি খণ্ড অংশ। মোট ৬৩টি লাইন। এটিও আর একটি মহাকাব্যধর্মী রচনা। বাগাণ্ডীর বীর ওয়ালটার এর (Walter) জীবনের বীরত্বের কাহিনী। কাহিনীর বর্ণনা অতি সুন্দর। সম্ভবতঃ অখণ্ড অবস্থায় এটি একটি পূর্ণ মহাকাব্যধর্মী বীরোচিত কাব্য ছিল। একটি ল্যাটিন অনুবাদ গ্রন্থে পূর্ণ কাহিনীটি আছে।

এছাড়া আর আমরা এংলোস্যাক্সন বীরোচিত কাব্যের তেমন কোন নমুনা পাইনা।

সমসাময়িক কালের মহাকাব্যধর্মী এংলোস্যাক্সন কবিতার প্রধান উপজীব্য ছিল—যুদ্ধ, যুদ্ধাভিযান, এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ। বিপদসঙ্কুল কিন্তু আনন্দময় সেই প্রাচীন জীবনযাত্রাপদ্ধতি পরিত্যাগ, বৃটেনের মাটিতে শান্তিপূর্ণভাবে স্থায়ী বসবাস, ওতপ্রোতভাবে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের অবসান, এবং বিশেষ করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা, নতুন বিশ্বাসের

দ্ব'ব' মানসিক গঠনেব পবিবর্তন, সমভূমিতে বাস, কৃষি এবং পশুচাবণ বৃত্তি অবলম্বন প্রাচীন এংলোস্যাক্সন বীবোচিত কাব্যেব অবসান ঘটাল। যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি অধিকতব প্রিয হল। অভিযান অপেক্ষা গার্হস্থজীবনেব আকর্ষণ প্রবলতব হল। এক কথায, আধুনিক সমাজ জীবনেব মাপকাঠিতে এংলোস্যাক্সনবা তথাকথিত 'সভ্য' হল। তাই তাবা জনপ্রিয বীবোচিত কাব্যেব মূলপ্রবাহ থেকে সবে গেল। টিউটনিক জাতিব সেই অমূল্য সম্পদ নূতন থেকে নূতনতব আব হল না। যা ছিল তা ও বিস্মৃতি ও অবহেলাব পথে লুপ্ত হযে যেতে থাকল। 'বণধাবাবাহি জযগান গাহি উন্মাদ কলববে' যাবা এসেছিল তাবা অতিকায জীবনেব বদলে খৃষ্টান মঠেব ভজনালযে স্বাচ্ছন্দেব সাগ্রতে মগ্ন হল।

এংলোস্যাক্সন বিয়োগবিধুর গীতিকাব্য

দি ওযানডাবাব [ভ্রাম্যমান] (The Wanderer) এটি এক্সেটাব (Exeter) পাণ্ডুলিপিতে পাওযা গেছে। এটি ১১৫ লাইনেব কবিতা। বচনাব তাবিখ ও কবি পবিচয অজ্ঞাত। কবি এখানে একজন বাজকীয দানে ভমাধিকাবী হিসাবে আত্মকথা বলছেন। তাঁব পুবান প্রভু মাবা গেছেন। তিনি নতুন প্রভুব সন্ধানে সমুদ্রপাবে অনির্দিষ্টভাবে ঘুবে ঘুবে বেডাচ্ছেন। ভাগ্যেব নির্দযতা, জাগতিক সব কিছুব অনিশ্চযতা সম্পর্কে দিব্যদৃষ্টি, ঈশ্ববেব উপব নির্ভবতা— এসব আছে। কিন্তু মৃত প্রভুব জন্য কবিব আকুলতা কাব্যটিব সবচেযে উল্লেখযোগ্য উপাদান। এব আবম্ভ ও শেষাংশ খৃষ্টান লক্ষণযুক্ত, কিন্তু অন্তবর্তী অংশ প্রাক খৃষ্টান গুণান্বিত। কবি একটি প্রাচীন ও শক্তিশালী সভ্যতাব ধ্বংসাবশেষ দেখে তাঁব ব্যক্তিগত শোককে সাধাবণীকবণ কবেন।

দি সী-ফেয়ারার (The Sea Farer) 'নাবিক'

এটিও এক্সেটাব (Exeter) পাণ্ডুলিপিতে আছে। ৬৩ লাইন পর্যন্ত প্রাক খৃষ্টীয ছাপ, তাবপব আবও ৬০ লাইন খৃষ্টীয সংযোজন।

এটি এংলোস্যাক্সন গীতিকাব্যেব সর্বাপেক্ষা মৌলিক বচনা। বক্তব্য বিষয কিন্তু স্পষ্ট নয। বক্তব্য বিষযকে নানাভাবে ব্যাখ্যা কবা হয। এমনও হতে পাবে, এটি একটি বিস্তাবিত তুলনামূলক অলঙ্কাবেব কবিতা। এটি একটি কথোপকথন অথবা একজনেবই মনেব পবস্পব বিবোধী আলোড়ন, তা নিযেও সংশয আছে। সমুদ্রেব নানা বিপদ আপদ সত্ত্বেও সমুদ্রেব আকর্ষণ এব বিষয বলে দেখা যায। অথবা এও হতে পাবে যে পার্থিব সুখ যতই সহজে পাওযা যাক অনির্দিষ্ট পবলোকই মানুষেব গতি,—এবকম কোন নীতিশিক্ষা এখানে আছে।

সে যা-ই হোক না কেন, উত্তবসাগবেব মেরু অঞ্চলেব বাত্যাতাড়িত প্রকাণ্ড জলবাশি এবং প্রচণ্ড শীতেব প্রকোপেব যে বর্ণনা এতে আছে তা কবিব নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া দেওযা সম্ভব নয। 'সী-ফেযাবাব' তাই সমুদ্রপ্রেমিক ইংবাজেব জাতীয মানসিক গঠনেব উৎকৃষ্ট উদাহবণ।

রুইন অথবা দি রুইনড বার্গ ‘ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রাপ্ত সহর’ (Ruin or The Ruined Burg)

এটিও এক্সেটার (Exeter) পাণ্ডুলিপিতে আছে। এটি একটি ছিন্নাঙ্গ কবিতা। বিয়োগবিধুর এংলোস্যাক্সন কাব্যগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

রোমক আমলে ‘বাথ’ (Bath) শহর স্নানাগারের জন্য বিখ্যাত ছিল। স্যাক্সন আক্রমণকারীদের হাতে পরে ধ্বংস হয়। দীর্ঘকাল পরে সম্ভবতঃ এই ‘বাথ’ সহরের ধ্বংস স্তূপ দর্শনে কবির মানসিক ভাবাবেগের ফল এই সুন্দব কবিতা খণ্ডটি। বার্গ মানে শহর।

দি ওয়াইফস কমপ্লেণ্ট (The Wife's Complaint) ‘স্ত্রীর অভিযোগ’

এক্সেটার (Exeter) পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত। অস্পষ্ট কিন্তু অনুভবের গভীরতায় সমৃদ্ধ। আন্তরিক বিশ্বস্ততাই শোকের কারণ। বনভূমির পার্বত্য গুহায় স্ত্রী নির্বাসিত। এটি বিচ্ছেদ ক্লিষ্ট পতিগতপ্রাণার বিলাপের উচ্ছ্বাসমূলক কবিতা।

দি হাজব্যাণ্ডস মেসেজ (The Husband's Message) ‘স্বামীর প্রেরিত বাণী’

এখানে স্বামী বহুদূর থেকে স্ত্রীর কাছে সান্ত্বনার বাণী পাঠায। বাণীটি যেন কাঠের পাতের উপর লেখা হযেছে। লেখাটি আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দীর স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ‘রুন’ (Rune) লিপিতে লেখা। কবিতাটিতে ওই কাঠের পাতটিকে দিয়ে কথা বলান হয়েছে। কাঠের পাতটি তার আত্মকথা বলেছে। লিখিত বাণীতে স্বামী যেখানে নির্বাসিত আছে. সেখানে সে স্ত্রীকে আসতে বলছে। সে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সে স্ত্রীকে সুখী করতে সক্ষম। কবিতাটিতে সচরাচর সমগোত্রীয় অন্য কবিতার মত বিলাপ নেই, বরঞ্চ আশা ও সান্ত্বনার কথা আছে।

কবিতাটি এক্সেটার (Exeter) পাণ্ডুলিপিতে আছে।

এংলোস্যাক্সন নাট্যধর্মী গীতিকবিতা

এই শাখায় দুটি কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **উইডসিথ (Widsith) এবং ডেওরস লেমেণ্ট (Deor's Lament)**। এক হিসাবে এ' দুটিকে বীরকাব্য পর্যায়ভুক্তও করা যায়। এক্সেটার পাণ্ডুলিপিতে দুটিকেই পাওয়া যায়।

‘ডেওরস লেমেণ্ট’ যেমন ইংরাজী গীতিকাব্যের প্রাচীনতম উদাহরণ, ‘উইডসিথ’ তেমনই ইংরাজী সাহিত্যের প্রাচীনতম নাট্যধর্মী গীতিকবিতা। ‘উইডসিথ’ ইংরাজী ভাষায় আধুনিক কাল পর্যন্ত রক্ষিত সকল কবিতার মধ্যে প্রাচীনতম। দুটিরই মূল রচনা এংলোস্যাক্সনরা বৃটেনে আসবার আগে। এই কবিতা দুটির ভিতর ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ‘অস্পষ্ট, দূরবর্তী এবং অতীত’—অবলম্বনে রোমাণ্টিকতার আদল লক্ষ্য করা যায়। এদের ভিতরে খৃষ্টপূর্ব যুগের বেশ কিছু সামাজিক লক্ষণ রক্ষিত আছে।

'উইডসিথ' কথাটির মানে 'দূরের পথিক'। এতে বহু দূর দূর দেশভ্রমণের কথা আছে। তবে ইতিহাসের বিখ্যাত যে সব মানুষের উল্লেখ আছে, তাদের দ্বারা এর সময় নিরূপণ করা আদৌ চলে না। এটি প্রায় ১৫০ লাইনের কবিতা।

'উইডসিথ' এবং 'ডেওরস ল্যামেন্ট'-এর রচয়িতারা ছিলেন 'স্কোপ' (Scop)—আমরা যাদের 'বন্দী' (বন্দনাগায়ক) বলতাম অনেকটা সেই রকম। 'উইডসিথ' অবশ্য উঁচু দরের কবিতা নয়।

'ডেওর' তাঁর পৃষ্ঠপোষকের দ্বারা পরিত্যক্ত। পৌরাণিক এবং বঞ্চিত জার্মানিক বীরদের উদাহরণ স্মরণে তিনি সান্ত্বনা পান।

দুটি কবিতাই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য বর্জিত।

এংলোস্যাক্সন নির্দেশিকা কবিতা

'নমিক' পদ্য (Gnomic verses) ঃ এগুলি নীতি ব' আচরণ সংক্রান্ত ছোট ছোট সত্যদর্শন। কটন পাণ্ডুলিপিতে ১১৫ লাইনে এবং এক্সেটার পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি এরকম পদ্য আছে। এগুলিকে কবিতার প্রাথমিক রূপ বলা যায়। এগুলির চিত্রময়তা সুন্দর। কখনও কখনও এগুলি পুরাতন প্রথা এবং ধারণাগুলির উপর আলোকসম্পাত করে।

আমাদের দেশের 'খনার বচন'-এর সঙ্গেও কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

চার্মস (Charms) ঃ অশুভ শক্তির বিতাড়ন এবং অশুভ শক্তির ব্যবহার এগুলির উচ্চারণের দ্বারা সম্ভব হত বলে বিশ্বাস ছিল।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত 'রয্যাল' (Royal) পাণ্ডুলিপিতে, একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের হার্লে (Harley) পাণ্ডুলিপিতে এবং একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের 'কেমব্রিজ' (Cambridge) পাণ্ডুলিপিতে এগুলি পাওয়া যায়।

এগুলি এক প্রাচীন ধরণের পদ্য। কোন কোনটিতে প্রাক-খৃষ্টীয় কালের ছাপ আছে।

রিডলস (Riddles) [ধাঁধা বা রহস্য]

তখনকার দিনের বেতনভোগী এবং পদ্য তৈরী করবার ক্ষমতা সম্পন্ন রসিক মানুষেরা অনেক সময় এগুলি রচনা করতেন বা ব্যবহার করতেন। অষ্টম শতাব্দীতে রিডলস তৈরী করবার একটা প্রবণতা ছিল। এ্যালধেলম (Aldhelm) অনেকগুলি ল্যাটিন রিডল তৈরী করে গিয়েছিলেন।

পুরান রিডলস এক সময়ে থাকলেও আমরা যে সব রিডল পেয়েছি তা খৃষ্টীয় প্রভাবযুক্ত। ৯৪টি রিডল এক্সেটার পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে।

খৃষ্টীয় প্রভাবে রিডলগুলিকে মোটামুটিভাবে কবিতায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু রিডলস-এর সংক্ষিপ্ত আকারের বৈশিষ্ট্য এগুলিতে নেই। এগুলির সাহায্যে আমরা তদানীন্তন কালের নানাধরনের বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে ধারণা পাই।

এছাড়া আর এক ধরনের কবিতার উল্লেখ করতে হয়। এগুলির প্রাথমিক রচনাই দশম শতাব্দীর শেষদিকে। এগুলি সরাসরি ইতিহাসনির্ভর যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতা। স্বভাবতঃই খৃষ্টীয় প্রভাবাধীন। তবুও এদের ভিতরে প্রাচীন এংলোস্যাক্সন গুণ, বিশেষ করে শৌর্যবীর্য সম্পর্কিত লক্ষণাদি আশ্চর্যভাবে থেকে গেছে। এই ধরনের কবিতার ভিতর দুটির উল্লেখ আমরা করব। সে দুটি হচ্ছে—'ম্যালডনের যুদ্ধ' এবং 'ব্রুনেনবার-এর যুদ্ধ'। এগুলি সাধারণতঃ ব্যালাড (Ballad) বা এক ধরনের জনপ্রিয় কাহিনী যাতে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের পূর্ণ মানসিক আবেগ প্রকাশ পায়। স্তবকগুলি ছোট ছোট হয। যুদ্ধের বর্ণনা বা অন্যান্য কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করে দৃঢ় ভাবানুবেগ এগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয। এই দুটি কবিতা হাজার বছর আগের ইংরাজদের জাতীয় কবিতা বলে গণ্য। ডেনদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধের পটভূমিকায় এ'দুটি রচিত।

ব্রুনেনবার-এর যুদ্ধ (Battle of Brunenburh)

৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ওযেসেক্স এর সঙ্গে ব্রুনেনবার্গ নামক স্থানে উত্তরের স্কট এবং আয়াল্যাণ্ড থেকে আগত নর্থমেনদের যুদ্ধ হয়েছিল। "ব্রুনেনবার্গের যুদ্ধ" তারই উদ্দীপ্ত স্মৃতি। স্যাক্সনরা (ওযেসেক্স) এই যুদ্ধে জিতেছিল। এই কবিতাটি দশম শতাব্দীর শেষ দিকের হলেও এবং তখন খৃষ্টান ধর্মের প্রবল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যেন স্যাক্সনদের ঐতিহ্যের শেষ তূর্যধ্বনি। এতে আক্রমণকারী পরাজিতদের প্রতি শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ আছে।

এটি পাওয়া গেছে দশম শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত গদ্য ইতিহাসগ্রন্থের ভিতর। ইতিমধ্যে ক্রমাগত ডেন আক্রমণে এবং অন্যান্য কারণে সাহিত্যের কেন্দ্র উত্তরের নর্থাম্ব্রিয়া থেকে দক্ষিণের ওয়েসেক্সে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ম্যালডনের যুদ্ধ (Battle of Maldon)

আবার 'ম্যালডনের যুদ্ধে' এংলোস্যাক্সনদের পরাজযের কাহিনী ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ম্যালডনের যুদ্ধও বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা। (১১ই আগষ্ট) ৯৯১ সালে এই যুদ্ধ হয়েছিল। কবিতাটি সম্ভবতঃ ৯৯৩ সালে রচনা। অনেকে এই খণ্ডিত কবিতায় প্রাচীন গ্রীককাব্য 'ইলিযাড' এর মত মহাকাব্যিক লক্ষণ দেখেন। ইংলণ্ডের মাটিতে লেখা এংলোস্যাক্সন কাব্যের সম্ভবতঃ এই শেষ নিদর্শন কি করে গ্রীক ক্লাসিক ধাঁচে রচিত হল তা অনুসন্ধানের বিষয়।

কেবলমাত্র এংলোস্যাক্সনদের জাতীয় মহাকাব্যের মত আর কিছু যদি লেখা হয়েও থাকে সেগুলির অস্তিত্ব অদ্যাবধি নেই। "ম্যালডন" জার্মানিক জাতিগুলির সর্বসাধারণের সম্পদ নয়। ধর্মে খৃষ্টান, কাজে অখৃষ্টানদের সঙ্গে বিরোধিতা, অথচ কাব্যে সেই প্রাচীন বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধপ্রীতির ধারা অব্যাহত।

কবিতাটি বডলিয়ান পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত। 'ম্যালডন' এংলোস্যাক্সনদের নিজস্ব জাতীয় কাব্যের অদ্যাবধি বর্তমান একমাত্র খণ্ড নিদর্শন। প্রথমাংশ ও শেষাংশ হারিয়ে গেছে। মাঝখানে ৩২৫ লাইন পাওয়া যায। প্রাপ্ত অনুলিপিটি একাদশ শতাব্দীর শেষদিকের। কবি অজ্ঞাতপরিচয়।

প্রকৃতি সম্পর্কিত কাবিতা

এবাব আমবা আব একটি প্রসঙ্গে এংলোস্যাক্সন কবিতাব সামগ্রিক সত্ত্বাকে উপলব্ধি কবাব চেষ্টা কববো। খৃষ্টানই হোন, নানা দেবদেবীব উপাসকই হোন, বৃটেনে বসবাসীই হোন, বা উত্তব পশ্চিম জার্মানীব মানষই হোন, সপ্তম শতকেব আগেব মানষই হোন বা পবেব মানষই হোন, এংলোস্যাক্সন বা তাদেব উত্তব পুরুষেব কাছে প্রকৃতি এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। প্রকাণ্ড, উন্মত্ত মহাসাগবই হোক, বা শান্ত মেঘমালাব ক্ষেত্রেই হোক, উচুনীচু, বন্ধুব ভূমিতেই হোক, বা গ্রামের কাঁটাঝোপেই হোক ইংবাজেব কাছে প্রকৃতিব আকর্ষণ কোনদিনই কম নয়। ভৌতজগতেব ক্রম প্রসাবণ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকেব সেই বিস্ময়, অথবা অষ্টাদশ উনবিংশ শতকেব 'প্রকৃতিব আপাতদর্শনেব অন্তবালে' কল্পনামূলক সত্যেব আবিষ্কাবঃ সবই সেই প্রকৃতিপ্রেমেব নানারূপ যা দেড় হাজাব বছব আগেব এংলোস্যাক্সনদেব পলকিত ও বোমাঞ্চিত কবে তুলত বা পববর্তীকালেব খৃষ্টান ইংবাজদেব ঈশ্ববেব মহিমায তন্ময় কবে দিত।

এংলোস্যাক্সন কবিতায় প্রকৃতি

প্রকৃতিব কত কল্পনা, কত রূপ প্রাচীন এই এংলোস্যাক্সন কাব্যে। সমুদ্রের [illegible] এংলোস্যাক্সনদেব কল্পনা কবিযেছে ড্রাগনেব এবং নানা অশুভ শক্তিব। [illegible] কবি অস্ত্রেব ঝণৎকাবেব ভিতবেও মেঘেব তলে তলে চাদেব [illegible] ন। 'ওযাণ্ডাবাব' এব কাব মানুষেব বিষাদকে প্রকৃতিব দুঃখ [illegible] কবেছেন। 'সী ফেযাবাব' এব কবি কষ্ট এবং কাম্যকে একাকাব কবে দিয়ে [illegible] গান বেঁধেছেন।

পববর্তীকালেব এংলোস্যাক্সন খৃষ্টান কবিবা মানুষ এবং প্রকৃতিকে একাসনে [illegible] দিযেছেন। কেডমনেব 'জেনেসিস' শৃঙ্খলাহীন বিশ্বজগৎকে প্রকৃতিব আনন্দে [illegible] কবেছে। 'এক্সোডাস' এ মিশবীয ধ্বংসেব চিত্র ভযঙ্কব এবং অনুপম। [illegible] ঝড়ে সন্ত এণ্ড্রুব অভিজ্ঞতা উনবিংশ শতকেব প্রাক ব্যাফেলিয অভিজ্ঞতাব পবিপন্থী।

কোন কোন ত্রুটি হযত ছিল। বাস্তব পটভূমিকা বিসর্জন দিযে কেবলমাত্র [illegible] কল্পনাব আশ্রয এংলোস্যাক্সন কবিবা নেন নি। তাই সেখানে ফুলেব বড অভাব, পাখীব অবশ্য কিছু স্বীকৃতি মিলেছে। 'ফিনিকস' সেখানে আছে, আব তাকে অবলম্বন কবে উনবিংশ শতাব্দীব বোমান্টিক কবিতাব বীজ বোধহয সেখানেই অঙ্কুবোদ্গমেব অপেক্ষায ছিল।

প্রাক খৃষ্টান এংলোস্যাক্সন সাহিত্যেব একটি বড বৈশিষ্ট্যেব কথা আমবা এখানে বলে নিই। তখনকাব কবিতা এবং গান তখনকাব দিনেব সর্ব সাধাবণেব সামাজিক জীবনেব তথা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেব জীবনেব অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। কিন্তু আধুনিক কালেব সাহিত্য কেবলমাত্র সাহিত্যিক এবং সাহিত্যবসিকদেব জীবনেব সঙ্গে যুক্ত একটা অতিরিক্ত বিষয মাত্র। এ সাহিত্য না সর্ব-সাধাবণেব না কাকব জীবনেব অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ সেই প্রাচীন এংলোস্যাক্সনদেব জীবন এবং জীবনবোধেব একটা অংশেই ছিল তদানীন্তন সাহিত্য।

খৃষ্টধর্মের প্রভাবাধীন এংলোস্যাক্সন সাহিত্য

এর পরে আসি আমরা খৃষ্টধর্মের প্রভাবাধীন কাব্যের খোঁজে।

কিছু বৃটন চতুর্থ শতকে খৃষ্টান হয়েছিলেন। পরে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আবার খৃষ্টান হওয়ার ধুম পড়ে গেল। প্রথমে কেণ্ট, তারপরে নর্থাম্ব্রিয়া, তারও পরে ওয়েসেক্স, এবং একে একে ইংল্যাণ্ডের সকল অংশেই খৃষ্টীয় ধ্যানধারণা প্রসার লাভ করল। কাজে কাজেই মানুষের মনোজগতের প্রতিফল পড়ল তার সাহিত্যে। খৃষ্টান ধ্যানধারণার যে বিস্তৃত প্রভাব সাহিত্যে পডতে থাকল তা মানুষের মনের গতিশীলতার প্রকাশ। পরিবর্তন,—তা সে ভৌতই হোক বা বিমূর্তই হোক—তাকে অনুসরণ করা মানুষের প্রকৃতি। তাই এংলোস্যাক্সন কাব্যে খৃষ্টধর্মের প্রভাব তদানীন্তনকালের মানুষের মানসিকতার চলমান ছবি।

প্রথম দিকে কাব্যের গঠন, ছন্দ, এমনকি প্রচলিত অলঙ্কারেও কোন পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু শীঘ্রই কাব্যের মূল প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতা আগের থেকে আলাদা হয়ে গেল। 'বীওউলফ' এর নায়ক অন্তিম মূহুর্তে সহকর্মীদের কাছে তাঁর বিদায় জানিয়েছিলেন, কিন্তু 'ম্যালডনের' নায়ক বিরটনর্থ (Byrhtnorth) শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। এই খৃষ্টান ধরনের আত্মসমর্পণের নীতি সপ্তম শতাব্দী থেকেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। একে শুধু ধর্ম বা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ হিসাবে ব্যাখ্যা না করে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। সভ্যতর মানুষ বেপরোয়া থাকে না; শারীরিক শক্তিতেও দুর্বল হয়ে যায়। তারা স্থায়ী শান্তির আশ্রয় খোঁজে। খৃষ্টান এংলোস্যাক্সন কবিরা তাই রহস্যময় অতিপ্রাকৃতের বদলে ক্ষমা, করুণা, শান্তি ও আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে তাদের কল্পনাকে কেন্দ্রীভূত করল। টিউটনজাতির বীরদের পুরুষ জীবনাদর্শের বদলে তারা যীশু এবং সন্তদের কাহিনীকে আশ্রয় করল। রোমক প্রচারব্রতীরা দমন ও ভীতিপ্রদর্শনের বদলে মহিমা ও আশার কথা শোনাল। জীবনদর্শনে স্নিগ্ধতা এল। 'বীওউলফ'-এর নায়ক খৃষ্টানসাজে তার মূল প্রকৃতির বিরোধী কিছু নতুন কথা শোনাল। এতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি হ'ল জানিনা, কিন্তু পরিবর্তন স্পষ্ট।

পরিবর্তনের রূপ প্রকাশ পেল বস্তুতন্ত্রের বদলে আত্মবাদিতায়, মহাকাব্যের বদলে গীতিকাব্যে। বহির্বিশ্বের অতিপ্রাকৃতের বদলে সন্তমহাপুরুষদের জীবনের রহস্য অধিক আগ্রহের সঞ্চার করল। এঁরাই হয়ে উঠলেন কাব্যের নায়ক। শব্দসংযোজনে অনুপ্রাস একই ভাবে বজায় রইল। এ হল যেন পুরাতন পাত্রে নতুন পানীয়ের প্রবর্তন।

নর্থাম্ব্রিয়ার সুদূর পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে, নদীর তীরে তীরে, রুক্ষ পরিবেশের সুন্দর স্বভাবের দরিদ্র বৃটনদের ভিতর আইরিশ খৃষ্টধর্ম প্রবর্তন এবং সাহিত্য গ্রহনেচ্ছু নতুন মানসিকতা সৃষ্টির ব্যাপারে প্রচারক কাথবার্ট (Cuthbert) এর শ্রম স্বীকার ও অবদান উল্লেখযোগ্য। তবে তিনি কবি ছিলেন না।

সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত অনুলিপির আকারে প্রাপ্ত অধিকাংশ খৃষ্টান কবিতার রূপকার বলে দু'জনের নাম করা হয়। কেডমন (Caedmon) এবং কিনেউলফ

বা কাইনউলফ (Cynewulf)। সম্ভবতঃ অজ্ঞাতপরিচয় কোন কোন কবির কবিতা এঁদের দুজনের নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

কেডমনের কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় ১৬৫১ সালে। আর্চবিশপ উসার (Ussher) একটি পুরাতন ইংরাজীর পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং সেটি ১৬৫১ সালে ফ্রান্সিস ডু জন আমাষ্টারডাম শহরে মুদ্রিত করেন। তবে কেডমনের কথা প্রথম জানা যায় বীড-এর (Bede) বিখ্যাত 'ধর্মীয় ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে। কাজেই সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই কেডমনের নাম জানা ছিল।

বীড (Bede) (৬৭২-৭৩৫) তাঁর 'ধর্মীয় ইতিহাস' নামক বইতে কেডমনের কথা উল্লেখ করে গেছেন। বীড নর্থাম্ব্রিয়ার লোক; কেডমনও তাই। বীড এর লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী আমরা কেডমনের যে পরিচয়টুকু পাই সেটুকুই বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায়। কেডমনের সম্বন্ধে অন্য যা কিছু তথ্য ও ধারণা তা পুরাপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। 'ধর্মীয় ইতিহাস'-এ বীড কেডমন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এই---

ষ্ট্রিওনেসিলের (Streoneshealh) পার্বত্য অঞ্চলে হুইটবী (Whitby) মঠের কাছেই থাকতেন কেডমন। তিনি পুরোহিত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। মর্খ মেষপালক হিসাবে জীবনের অধিকাংশই তখন তাঁর কেটে গিয়েছিল। অনুপ্রাসের শব্দঝঙ্কার যা তাঁর বন্ধু বান্ধবদের সুরসৃষ্টিতে মাতিয়ে তুলত তা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বা গান গাইবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। দিনের কাজের শেষে গ্রামের সেই সব মানুষদের খাওয়াদাওয়ার পরে গানবাজনা যখন সুরু হত, এবং তাঁর পালা যখন কাছাকাছি এসে পড়ত, তিনি তখন লজ্জায় পালিয়ে বাঁচতেন। সেদিন রাত্রে আস্তাবল পাহারা দেবার ভার ছিল তাঁর উপরে। তিনি চুপিসাড়ে পালিয়ে আস্তাবলে চলে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে শুনলেন কেউ তাঁর নাম ধরে ডেকে মধুর স্বরে বলছেন,- "কেডমন, আমাকে গান শোনাও'। কেডমন বললেন, --"আমি তো গাইতে পারি না। তাইত আমি গানবাজনার আসর ছেড়ে এখানে চলে এসেছি।' সেই আশ্চর্য স্বর তখন বলে উঠল,- -"কিন্তু তোমাকে তো গাইতে হবে।" কেডমন বললেন,—"আমি কি গাইব?" অদৃশ্য সেই স্বর বলল,—"সৃষ্টির সূচনার গান গাও।"

পরদিন প্রভাতে তিনি মঠের অধ্যক্ষা হিলড বা হিলডাকে গিয়ে বললেন তাঁর স্বপ্নের কথা। হিলডা এবং মঠের সাধুরা তাঁকে বিশ্বাস করলেন। তাঁরা তখনকার দিনের বাইবেল থেকে সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষায় একটি অংশ অনুবাদ করে দিলেন। এবং কি আশ্চর্য! পরের দিন সকালবেলায় কেডমন সেটি অবলম্বন করে পদ্যের আকারে সকলের কাছে নিয়ে এলেন, এবং গেয়ে শোনালেন। মূর্খ কেডমন একদিনেই ইংল্যাণ্ডের আদি কবিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন।

একে একে তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে থাকল বিশ্বসৃষ্টির প্রথম সঙ্গীত, মানুষের উদ্ভব এবং ইজরায়েলের সমগ্র ইতিহাস। কেডমন আরও এগিয়ে গেলেন। তিনি আরও শোনালেন সুদূর মিশরের নির্বাসন থেকে পবিত্র পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। তাঁর গানে যুক্ত

হল যীশুর আবির্ভাব, তাঁর আকুলতা, তাঁর আত্মত্যাগ, পুনরুত্থান। শেষ বিচারের ভীষণতা, নরকের আতঙ্ক এবং স্বর্গের আনন্দের কথাও শোনালেন কেডমন। কেউ কেউ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গান বাঁধতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা তেমনটি পারলেন না।

কেডমনের নামে প্রচলিত এই সব কবিতা ও গান মূল নর্থাম্ব্রিয় ভাষায় পাওয়া যায়নি; পরবর্তী কালে সুদূর দক্ষিণের পশ্চিম-স্যাক্সনীয় আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত পুঁথির আকারে পাওয়া গেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অষ্টম শতাব্দীর শেষদিক থেকেই সাহিত্যের পীঠস্থান উত্তরের নর্থামব্রিয়া থেকে দক্ষিণে সরে যেতে সুরু করেছিল; এবং অল্পকালের ভিতরেই দক্ষিণের ওয়েসেক্স হয়ে দাঁড়াল ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান কর্মক্ষেত্রে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ওয়েসেক্স এর ভাষাই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে।

পরমশ্রদ্ধেয় বীড তাঁর 'এ্যাঙ্গলসদের ধর্মীয় ইতিহাস' এর একটি খালি পাতায় কেডমনের সেই মুক্তক ছন্দের প্রথম কবিতাটি লিখে রেখে গিয়েছেন। এটি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর-এর পাণ্ডুলিপিতে আছে। আরও তিনটি পাণ্ডুলিপি বীডের 'ধর্মীয় ইতিহাস' গ্রন্থে আছে। 'জুলিয়াস' (বডলিয়ান) পাণ্ডুলিপিতে সংগৃহীত 'জেনেসিস', 'এক্সোডাস' এবং 'ড্যানিয়েল' ও কেডমেনর নামেই প্রচলিত। এছাড়া পরবর্তীকালের 'জুডিথ' যেটি অজ্ঞাত কারণে অনেক আগের সৃষ্টি 'বীওউলফ'-এর অনুলিপির সঙ্গে 'কটন' পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে, - সেটিও কেডমনের নামেই প্রচলিত। তবে অনেকে একে ছন্দ ও অলঙ্কারের বিচারে কিনেউলফ-এর নামের সঙ্গে যুক্ত করেন।

মাত্র ৯ লাইনের সেই 'সৃষ্টির স্তোত্রটি' (Hymn of Creation) ব্যতীত কোনটিই হয়ত কেডমনের লিখিত নয়, —এমনও অনুমান অনেক পণ্ডিত করে থাকেন। কেডমনের নামের সঙ্গে নিজের কবিতা যুক্ত হওয়ার আনন্দে হয়ত অন্য কোন কোন কবি নিজের নিজের নামকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন; কিংবা হয়ত সে সব নাম মানুষের স্মৃতি থেকে অপসারিত হয়ে গেছে।

এসব কবিতা নিয়ে দুএক কথা বলবার আগে কেডমনিয় আদি কবিতার লক্ষণ ও পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। অনুপ্রাস এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উচ্চারণে বিশেষ বিশেষ জোর দেওয়া এর বিশিষ্ট লক্ষণ। কবিতায় বা গানে বক্তব্য ছিল সোজাসুজি, এবং গতি ছিল তীব্র। কঠিন রূপক এবং বহু শব্দের বিজড়িত গঠন কাব্যে সৌন্দর্য অপেক্ষা শক্তি সঞ্চার করেছিল বেশী করে। ঘনসংবদ্ধ আবেগের প্রকাশ কোথাও দীর্ঘ ব্যাখ্যার আকারে ছিল না। প্রতিরূপের (চিত্রকল্প) পর প্রতিরূপের, শব্দগুচ্ছের পর শব্দগুচ্ছের পরুষ, ধ্বনিময়, সারিবদ্ধ ক্ষেপনে সে কবিতা ছিল বেগবান। কেডমনের কবিতা প্রাচীন এংলোস্যাক্সন কাব্যের সঙ্গে আধুনিক কবিতার সার্থক যোগসূত্র। ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনে বিদেশী ল্যাটিনের বদলে দেশীয় ইংরাজীর ব্যবহারের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন কেডমন।

'সৃষ্টি উপলক্ষে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন'—হিম অব ক্রিয়েশন (Hymn of Creation) নিশ্চিতভাবেই কেডমনের। এটির একটি অনুবাদ পাণ্ডুলিপির আকারে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। এর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্য আমরা আগেই দিয়েছি।

কেডমনের নামে প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ

জেনেসিস (Genesis) –অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টিব উপাখ্যান অথবা কিভাবে জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল তাব উপাখ্যান ঃ

১৬৫১ সালে আবিষ্কৃত বর্তমান 'জুনিযাস (বডলিযান) পাণ্ডুলিপি' বলে পবিচিত হাতে লেখা অনুলিপিতে পাওয়া গেছে।

কেডমন যদিও নর্থাম্ব্রিযাব অধিবাসী ছিলেন কিন্তু এই অনুলিপি পশ্চিম স্যাক্সন আঞ্চলিক ভাষায পাওযা গেছে। সম্ভবতঃ অনুলিপিকাব ওযেসেক্সেব লোক। কাজেই তাব বিশেষ ধবনধাবণেব ছাপ এতে পাওযা স্বাভাবিক। ইংবাজী (অথবা ওযেসেক্স এব আঞ্চলিক) ভাষায লেখা খৃষ্টীয কবিতাব ভিতব এটিই প্রাচীনতম।

বর্তমান অনুলিপিটিকে দু'ভাগে ভাগ কবা হয। ১ থেকে ২৩৪ লাইন পর্যন্ত এবং ৮৫২ থেকে ২৯৩৫ লাইন পর্যন্ত প্রথমভাগ অর্থাৎ জেনেসিস 'এ'। আব ২৩৫ লাইন থেকে ৮৫১ লাইন পর্যন্ত দ্বিতীয ভাগ অর্থাৎ জেনেসিস 'বি'। প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয ভাগেব অনুলিপিকাব আলাদা আলাদা বলে অনুমান কবা হয বর্তমান অনুলিপিটি তৈবী কবা হযেছিল সম্ভবতঃ ত্রযোদশ শতাব্দীব প্রথম দিকে।

এটি ইহুদীদেব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ দি ওলড টেষ্টামেণ্ট (পবাতন বিশ্বাসেব কাহিনী), যা খৃষ্টানদেব কাছেও পবিত্র, তাব প্রথম খণ্ডেব ১ থেকে ২২তম অধ্যাযেব ২৯৩৬ লাইনেব ভাবানুবাদ। জার্মান পণ্ডিত সিভার্স (Sievers) এব মতে জেনেসিস 'বি' নবম শতাব্দীব একটি পুবাণ স্যাক্সন কবিতা থেকে সবাসবি অনুবাদ। তবে জেনেসিস 'বি'তে নূতন কিছু নেই। জেনেসিস 'এ'তে যা আছে তাব বিস্তাবিত পুনবাবৃত্তি। মূল জেনেসিস 'বি' যদিও বা নবম শতাব্দীব হয, মূল জেনেসিস 'এ' কিন্তু উত্তবাঞ্চলেব ভাষায সপ্তম শতাব্দীব শেষ দিকে বচিত।

জেনেসিস 'এ'ব বিষযবস্তু আদি সৃষ্টি, দেবদূতদেব বিদ্রোহ ও পতন থেকে সুরু কবে আইজাক এব আত্মত্যাগ পর্যন্ত ধাবাবাহিক কাহিনী। জেনেসিস 'এ'তে স্বতোৎসাবিত উৎসাহ তত নেই। তবে আছে খৃষ্টান এবং প্রাক খৃষ্টান ধাবণাব একত্র সমাবেশ।

কিন্তু জেনেসিস 'বি' যদিও পুনবাবৃত্তি তবুও কোথাও কোথাও তা অদ্ভুত সুন্দব। স্যাতান (Satan) এব বীবর্ষভ চবিত্র এবং অন্যান্য দেবদূতদেব প্রতি তাব উদাত্ত আহ্বান যথার্থ কাব্যগুণে মণ্ডিত। পঞ্চম শতাব্দীব 'ভিযেনে'ব বিশপ এ্যালকিমাস এব ল্যাটিন কবিতাব ছাপ ধবা পড়ে।

'পুবাতন বিশ্বাসেব কাহিনী' ব (The Old Testament) আবও দু'তিনটি অংশ, যেমন এক্সোডাস (Exodus) এবং ড্যানিযেল (Danial) ও কেডমনেব নামেব সঙ্গে যুক্ত। এইসব ভাবানুবাদে সুস্পষ্ট, বাস্তবানুগ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। 'এক্সোডাস' বলতে বোঝায 'মিশব থেকে ইজবাযেলীযদেব প্রত্যাবর্তন'। 'ড্যানিযেল' ছিলেন ইজবাযেলীযদেব প্রাচীন ধর্মগুরু ও বিচাবক। তিনি তাঁব ন্যায বিচাবেব জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

এবার আসি অপর ভক্তকবি **কিনেউলফ বা কাইনউলফ (Cynewulf বা Cynawulf)** (মৃত্যু ৭৮৬)-এর নামে প্রচলিত কাব্যগুলির আলোচনায।

কিনেউলফ মার্সিযার অথবা নর্থামব্রিযার কবি। তাঁর নামে প্রচলিত কবিতাগুলি অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা নবম শতাব্দীতে লেখা।

কেডমনের কবিতায় যে সরলতা ছিল তা কিনেউলফের কবিতায নেই। তবে শিল্প চাতুর্যে এবং পাণ্ডিত্যে তাঁর কবিতা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কেডমনের কবিতা যেখানে পুরাপুরি আত্ম-নিরপেক্ষ ও 'বিষযগত' (Objective), কিনেউলফ এর কবিতা কিন্তু সেখানে আবেগ ও করুণার সমন্বযে আত্মতত্ত্বে ও আত্মগতভাবে ভরপূর।

কিনেউলফ এর দ্বারা লিখিত বলে পরিচিত কযেকটি কবিতাব আলোচনায আসা যাক।—

খ্রাইষ্ট (Christ) ঃ 'এক্সেটার' পাণ্ডুলিপিব (Exeter) প্রথম ১৬৬৪টি লাইনেব প্রচলিত নাম 'খ্রাইষ্ট'। পাণ্ডুলিপিতেই যেন তিনটি স্বেচ্ছাকৃত ভাগ আছেঃ ১ থেকে ৪৩৯ ; ৪৪০ থেকে ৮৬৬ ; ৮৬৭-১৬৬৪ লাইন। প্রথম ভাগে ১২টি খণ্ডাংশ। এগুলিতে আছে খৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত এবং খৃষ্টের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে ধাবাবাহিক প্রশ্নোত্তব পর্যাযে স্তোত্র।

দ্বিতীয ভাগে আছে পার্থিব দেহ পরিত্যাগের পব পুনরুত্থান এবং চত্বারিংশতম দিনে খৃষ্টের স্বর্গে গমন। এটি পোপ গ্রেগরীর ওই বিষযের উপব ধর্মীয আলোচনাব ভিত্তিতে বচিত।

তৃতীয ভাগে কথিত বিষয নানা উৎস থেকে সংগৃহীত। এতে আছে 'শেষ বিচারেব দিন' (The Day of Judgement) সম্পর্কিত ধর্মীয আলোচনা।

এই তিনটি ভাগকে সাধারণতঃ 'আবির্ভাব', 'স্বর্গারোহণ' এবং 'শেষবিচারের দিন' বলে বলা হয। কবি তিন জন কি এক জন বলা মুস্কিল। ৮০০ থেকে ৮০৭ লাইনে কিনেউলফ-এর স্বাক্ষর আছে। তাই এটির প্রণেতার সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ কম সমালোচকরা প্রথম ভাগটিকেও কিনেউলফ-এর লেখা বলেন। তবে তৃতীয ভাগটি তাঁর লেখা নয় বলে অধিকাংশের অভিমত। প্রকৃতির দান এবং সমুদ্রের বিপদ বিষয়ে কযেকটি অংশ সর্ববাদীসম্মতক্রমে সুন্দর।

'খ্রাইষ্ট'-এর দ্বিতীয ভাগ অর্থাৎ 'স্বর্গারোহন' ছাডাও আব তিনটি কাব্যে কিনেউলফ-এব স্বাক্ষর আছে। এগুলি হচ্ছে,—'এলিন' (Elene), 'জুলিযানা' (Juliana) এবং 'যীশুপ্রেরিত দ্বাদশ প্রচারকের ভাগ্য' (The Fates of the Apostles)। স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য ছিল পাঠক বা শ্রোতারা যেন তাঁর নাম করে তাঁর আত্মার সদগতি প্রার্থনা করেন। অনেকটা সেই 'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান'-এর মত।

'এলিন' আছে 'ভারসেল্লি' (Vercelli) পাণ্ডুলিপিতে।

সেন্ট জুলিয়ানা সম্পর্কিত কাব্যে আছে একটানা কাহিনী, ও মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসমূলক বিরতি। এই সব বিরতিগুলির দ্বারা কাহিনীর একঘেয়েমি অনেকটা কাটে।

অনেকে 'ফিনিক্স' (The Phoenix) এবং 'ক্রুশকাঠের স্বপ্ন' (Dream of the Rood)-কেও কিনেউলফ-এর লেখা বলে মনে করেন।

দি ফিনিক্স (The Phoenix)

এটি ৬৭৭ লাইনের সম্পূর্ণ কবিতা। কবিতাটিতে দুটি অংশ। প্রথম অংশটি (৩৮১ লাইন) ল্যাকটানটিয়াস এর (Lactantius) [আনুমানিক ৩৪০ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে তিনি মারা গিয়েছিলেন] 'কারমেন ডি আভে ফিনিক্স' (Carmen de Ave Phoenix) এর ভাবানুবাদ। তবে খৃষ্টান বিশ্বাস অনুসারে বিশদ ও পরিষ্কার বর্ণনা আলোচ্য কবিতায় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ওই একই বিশ্বাস অনুসাবে কবিতাটিব রূপক আকার দেওযা হয়েছে। যীশু পুনরুত্থান-এর সঙ্গে ফিনিক্স-এর নব নব উজ্জীবনের তুলনা করা হয়েছে।

ফিনিক্স পাখীর সম্বন্ধে কিংবদন্তী বোধহয় সকলেরই জানা। এ এক পৌরাণিক পাখী। আরবের মরুভূমিতে থাকে। পাখী একটিই,-- এব কোন দ্বিত্ব বা বিকল্প নেই। পাঁচ থেকে ছয় শতাব্দী বাঁচে। তারপর নিজেই নিজেকে চিতাগ্নিতে দাহ কবে। তারপর দগ্ধজাত সেই ভস্ম থেকে আবার এক নবীন ফিনিক্সের উদ্ভব। সে আবার আব একটি পূর্ণজীবন যাপন করে। এইভাবে একের পর এক ফিনিক্সচক্র আবহমান কাল চলতে থাকে।

কবিতাটির বর্ণনা অংশ খুব সুন্দর। স্বরসঙ্গতি অন্যতম লক্ষণীয় গুণ। এই কবিতায অন্য কোন কবিতার অংশবিশেষ পালটা পালটি হওযার কোন ব্যাপাব নেই, বা মূলের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত অংশও অনুলিপিকাবদের দ্বারা যুক্ত হযনি।

কবিতাটির প্রথম অংশে ফিনিক্সের দেশের বর্ণনা। আনন্দময দেশ। ১ --৮৪ লাইন সে দেশের এক মনোমুগ্ধকর বর্ণনা। তাবপর ফিনিক্সের সৌন্দর্য, তার বার্ধক্য, তারপর সিরিয়ার দিকে তার যাত্রা, সেখানে হবে তার পুণর্জন্ম। কাব্যটিতে এই পুণর্জন্মের বিশেষ বর্ণনা আছে। প্রথম অংশটির উৎস আগেই বলা হযেছে।—চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমাংশে খৃষ্টান কবি ল্যাকটানটিয়াস এর ল্যাটিন কবিতায়।

দ্বিতীয় অংশটিতে আছে শ্রোতা পাঠকদের নৈতিক উন্নতিব জন্য ধর্মীয় তত্ত্বকথা। এটি প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট বিষয়ের এক রকম ব্যাখ্যা বলে ধরা যায়। এর রচয়িতার নাম জানা যায় না। এখানে ফিনিক্সের জীবনকে খৃষ্টানের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং তা যেন অনন্ত মহাজীবনের দিকে অগ্রগতি। আবার, আর একভাবে, ফিনিক্সকে যীশুরই প্রতীক বলে ধরা হয়েছে। শেষের ১১টি লাইনে বৈচিত্র আছে। সেখানে ল্যাটিন শব্দ ও দেশী শব্দ মেশান হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অর্ধেকটা ইংরাজীতে, অর্ধেকটা ল্যাটিনে। এতে প্রচলিত শব্দঝঙ্কার নতুন সুরে বেজেছে। তর্কাতীত না হলেও কবিতাটি কিনেউলফ-এর রচনা বলেই ধরা হয়।

এর পরে আসা যাক 'ক্রুশকাঠের স্বপ্ন' (The Dream of the Rood) বইখানির আলোচনায়।

এটি রচনার কাল সাধারণতঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে বলে অনুমান করা হয়। ক্রুশকাঠের কয়েকটি উক্তি 'রূণ' অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রাচীনতম জার্মানিক বা স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অক্ষরে ডামফ্রিসায়ারের রুথওয়েল গীর্জায় ক্রুশকাঠামোর গায়ে ক্ষোদিত আছে। এই উক্তিগুলিকে ঘিরে হয়ত পরিবর্তীকালে কাব্যটি লেখা হয়েছিল। খৃষ্টানদের কাছে ক্রুশকাঠ পরম পবিত্র, বিশেষ করে যে ক্রুশটিতে যীশুকে বিদ্ধ করা হয়েছিল। এই কাব্যটি সেই ক্রুশকাঠের আত্মকথা। শুরু কবা হয়েছে একেবারে সেইখান থেকে যেখানে বনের প্রান্তের গাছটি ছেদন করা হয়েছিল। ক্রুশকাঠ যেন যীশুকে তাঁর নশ্বর দেহত্যাগের সময়ে ধারণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

কবি স্বপ্নে এই ক্রুশকাঠটিকে তার নানা বিস্ময়কর রূপান্তরে এবং তার নানা উক্তির ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনেকে কবিতাটিকে বা স্বপ্নটিকে কবির খৃষ্টধর্মে পরম আস্থার অন্যতম কারণ হিসাবেও বর্ণনা করেন। মানুষের পাপস্খালন, নরকের দুর্দশা, স্বর্গে প্রবেশের সমস্ত রহস্য যেন ক্রুশকাঠের পাবত্র আত্মপরিচযের ভিতর দিযে ব্যক্ত হয়, এবং কাব্যটির সমাপ্তিও এইভাবে : যীশুর অবিনশ্বরতাব বাণীকে চিরকাল এই ক্রুশকাঠই বহন করে নিয়ে যায়।

এই কাব্যটিকে খৃষ্টীয় প্রভাবানুসারী প্রাচীন ইংরাজী কবিতাগুলির ভিতর শ্রেষ্ঠতম বলে বিচার করা হয়। নিঃসন্দেহে এটিই স্বপ্নবিষযক প্রথম কবিতা।

জুডিথ্ (Judith)

এরপরে আমরা আসি আর একটি কাব্যের কথায় যেটির বিষয নেওয়া হয়েছে 'পুরাতন বিশ্বাসের কাহিনী' (The Old Testament) থেকে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কেডমনীয় হলেও আলঙ্কারিক প্রসাধনের দিক থেকে একে কিনেউলফ বা তাঁর উত্তরসূরী কারও লেখা বলে মনে হয়।

এই কাহিনী মূল হিব্রু বাইবেলে ছিল না। ২৭০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক অনুবাদকদের দ্বারা সংযোজিত অংশে পাওয়া যায়।

"পুরাতন বিশ্বাসের কাহিনীর" (The Old Testament) সঙ্গে যুক্ত হলেও এটির ইংরাজী সংস্করণে এংলোস্যাক্সন ছাপ স্পষ্ট। কাহিনীতে জুডিথকে ইহুদী রমনী বলে দেখান হলেও সে যেন বীরত্বে এবং পরুষ কাঠিন্যে প্রাচীন এংলোস্যাক্সন বীর রমনী।

কাহিনীটি পাওয়া গেছে খণ্ডিত আকারে, মাত্র ৩৫০ লাইনের শেষের তিনটি সর্গে, এবং নবম সর্গের সামান্য অংশে।

ইজরায়েলীয় শহর বেথুলিয়ার নিকট আসিরিয় আক্রমণকারী হলোফারনেস-এর শিবিরে ইজরায়েলীয় রমনী জুডিথ প্রবেশ করে, এবং পানাসক্ত অজ্ঞান হলোফারনেসের মুণ্ডচ্ছেদ করে বেথুলিয়ায় ফিরে আসে, এবং নগরবাসীদের সব কিছু অবহিত করায়। অতর্কিত আক্রমণে আসিরিয়রা পরাজিত হয়, এবং যীশুর পিতৃপুরুষরা বিজয়ী হয়। জুড়িথের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের মহিমা প্রচার হয়।

'জুডিথ' সম্মবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা।

সন্তদেব জীবনী অবলম্বন কবে আবও কযেকটি সুন্দব ভক্তিমূলক কাব্য একাদশ শতাব্দীব আগেই বিভিন্ন সময়ে বচিত হযেছিল। যেমন, 'সেন্ট এ্যাণ্ড্রিযাস', 'সেন্ট হেলেন', 'সেন্ট জুলিযানা'। এগুলি প্রধানতঃ ল্যাটিন থেকে অনুবাদমূলক। এছাড়া, দেশেব মানুষ সেন্ট গুথলাক এবং সেন্ট কাথবার্টকে নিযেও কাব্য বচনা হযেছিল। তবে প্রথমোক্ত সেন্টদেব নিযে কাব্যগুলিতে প্রাচোব গন্ধবাহী যে আকর্ষণ ছিল তা ধর্মসম্পর্কহীন সাহিত্যকেও প্রভাবিত কবেছিল। যেমন, 'এ্যাপোল্লোনিযাস অব টাযাব' বা 'প্রাচীন টাযাব নগবীব এ্যাপোল্লোনিযাস'। প্রত্যেকটি কাব্যেই চিত্রময়তাব বিশিষ্ট এংলোস্যাক্সন রূপ বজায় ছিল। ল্যাটিন প্রভাবিত খৃষ্টান সাহিত্যে এংলোস্যাক্সন মৌলিক কল্পনা ও চিত্রময়তা কখনো পবাজয স্বীকাব কবেনি এতে কাব্য অতীতমুখী হযনি, ববং জাতিগত ঐতিহ্যেব প্রভাব দৃঢ়তাব সঙ্গে বেঁচে ছিল

এংলোস্যাক্সন গদ্য সাহিত্য

এংলোস্যাক্সন গদ্য সাহিত্যেব অধিকাংশ তাৎকালীন কালানযাযী দেশীয সমসাময়িক ভাষাতেই ব্যক্ত হযেছিল।

ল্যাটিন পণ্ডিত শ্রদ্ধেয বীড (Bede) বা 'বাডা'ব নাম দিযেই এংলোস্যাক্সন গদ্যেব কথা শুরু কবতে হয। তাব জীবনকাল ৬৭৩ থেকে ৭৩৫। তিনি জ্যাবো মঠে থাকতেন। তিন ধর্মকর্ম ছাড়াও অধ্যযনেব সঙ্গে লেখাপড়া চালিযে গিযেছিলেন। সাবা পশ্চিম ইউবোপে এত খ্যাতনামা শিক্ষক আব কেউ ছিলেন না। বাইবেলেব উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ছিল তাঁব যশেব অন্যতম কাবণ। ক্যান্টাববেবী তথা চার্চ অব ইংল্যাণ্ডেব প্রথম আর্চবিশপ, গ্রীস থেকে আগত, থিযোডোব এব ক্যান্টাববেবীব স্কুল থেকেও উত্তবেব জ্যাবো মঠে ছাত্রবা যেতেন। পববর্তীকালে এডমণ্ড বার্ক বীডকে বলেছেন, 'ইংবাজী পাণ্ডিত্যেব জনক।' তিনি প্লেটো, এ্যাবিষ্টটল, সেনেকা, সিসেবো, লক্রেসিযাস, ওভিড পড়েছিলেন এবং আযত্ত কবেছিলেন। ভার্জিল এব 'ইনিড' কেও তিনি তাব লেখায অনুসবণ কবেছিলেন। বীড ৪৫ খানি বই লিখে গিযেছিলেন। হযত তাবও বেশী। ওই কযখানি নষ্ট হযনি। ধর্মতত্ত্বেব বাইবেও ইতিহাস, জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতিষ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, সঙ্গীত, দর্শন, ব্যাকবণ, অলঙ্কাব, পাটিগণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র,— এ সবেব ওপব বই লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁব ভিতব বিদেশী ভাবধাবা একেবাবেই ছিল না। তিনি ছিলেন একজন খাটি ইংবাজ। তিনি ইংবাজী ভাষা ভালবাসতেন, ইংবাজী সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন। 'সেন্টজন এব সুসমাচাব' (Gospel according to St John) এব ইংবাজী অনুবাদ তাঁব শেষগ্রন্থ। এবং শেষ যে কথাগুলি তাঁব মুখ দিযে বেবিযেছিল সেগুলি ছিল 'মৃত্যু' সম্বন্ধে পযাব ছন্দে কিছু ইংবাজী ছোট কবিতা। তাঁব লিখিত গ্রন্থাদিব ভিতবে সর্বপ্রধান হচ্ছে 'ইংবাজ জাতিব ধর্মীয ইতিহাস' (Ecclesiastical History of the Anglicans)।

৭৩৫ সালে ইষ্টাবেব (Easter) এব দুই সপ্তাহ আগে থেকে তিনি দুর্বলবোধ কবতে থাকেন এবং শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকেন। একটানা অনিদ্রাবোগে ভোগেন। কিন্তু তাঁব সদাহাস্যময ব্যবহাবে কোন পবিবর্তন আসেনি। ছাত্রদেব শিক্ষাদানে কোনরূপ শৈথিল্য

তিনি দেখান নি। মাতৃভাষা ইংরাজীতে দু এক ছত্র কবিতা তখন মাঝে মাঝে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হত। মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্ররা বলেছেন, গুরুর শেষ বিদায় আসন্ন জেনে আমরা চোখের জল ফেলতে ফেলতেই তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেছি। তিনি থামতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে যে কোন ভাবেই হোক সেন্ট জনের গসপেলের ইংরাজী অনুবাদ করে যাবেন, যাঁরা তাঁকে থামতে বলেছিলেন তাদের তিনি জানিয়েছিলেন, ছাত্ররা মিথ্যা শিখুক আমি তা চাই না। আমার মৃত্যুর পর কার হাতে তাদের তুলে দিয়ে যাব? মৃত্যুর দিন এবং মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত দ্রুত হাতে তিনি তাদের লিখে যেতে বললেন। শেষ বাক্যটি যখন শেষ হ'ল, তিনি তাঁর উপাসনার বেদীর দিকে তাকিয়ে শেষবারের মত ঈশ্বরের মহিমা উচ্চারণ করলেন এবং শান্তভাবে চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন।

ইংরাজ পণ্ডিতদের ভিতর সর্বাগ্রগণ্য, ইংরাজ ধর্মশাস্ত্রবিদদের ভিতর সর্বাগ্রগণ্য, ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ভিতর সর্বাগ্রগণ্য জ্যারোর এই মঠবাসী সন্ন্যাসীর ভিতরেই ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের মূল প্রোথিত রয়েছে। ছয়শত ছাত্র পরিবেষ্টিত এই মানুষটি ইংরাজদের জাতীয় শিক্ষার জনক।

বীডের মৃত্যুর পব ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে নর্থামব্রিয়ায় অরাজকতা চলে। তাই শিক্ষা ও সাহিত্যের পীঠস্থান দক্ষিণে ওয়েসেক্সে সরে যায়। মাঝখানে আসে মার্সিয়ার প্রাধান্য। কিন্তু সে সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মের কথা জানা নেই। ৮২৫ সাল থেকে ওয়েসেক্সের প্রাধান্য সুরু হয, এবং রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্যেরও অগ্রগতি হতে থাকে।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডও প্রচণ্ড বিপদ আপদের সঙ্গে লড়াই করে চলছিল। বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল নরওয়েজীয় ও ডেনদের আক্রমণ। অষ্টম শতাব্দীর শেষ থেকেই তারা ক্রমাগত ইংল্যাণ্ডে লুন্ঠতরাজ চালাচ্ছিল। তিনশ বছর আগের এংলোস্যাক্সনদের বৃটেন আক্রমণের পুনরাবৃত্তি হতে থাকল। অখৃষ্টানদের দ্বারা আবার খৃষ্টানরা অত্যাচারিত হতে থাকল। ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য ও শিল্পকলার উপর অত্যাচার সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচারেব তালে তাল মিলিযে চলল। তবে ধীরে ধীরে এই অত্যাচার স্তিমিত হতে শুরু করল।

আসলে উত্তরের ওই সব দেশের মানুষরা ইংরাজদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। তবে ইংল্যাণ্ডের পুরোহিত শ্রেণী অবশ্য দেশরক্ষায় মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন। বিদেশী আক্রমণের কথা বলতে গেলে, নরওয়েজীয়দের থেকে ডেনদের আক্রমণ ছিল আরও ভয়াবহ ও ব্যাপক। তারা এসেছিল রাজ্য জয় করতে ও বসতিস্থাপন করতে। ৮৬৬ সালে ডেনরা ইষ্ট এ্যাংগলিয়ার তটভূমিতে অবতরণ করে। যুদ্ধ একাদিক্রমে চলতে থাকে। প্রথমে ইষ্ট এংগলিয়া, পরে ওয়েসেক্সের বেশ কিছুটা অংশ ডেনদের অধিকারে চলে যায়। ইতিহাসের ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণে ৮৭১ সালে ওয়েসেক্সের রাজা হন আলফ্রেড। ৮৭৮ সালে ওয়েডমোরের সন্ধির ফলে বৃটেনে অন্ততঃ দক্ষিণ পশ্চিম অংশে কিছুটা আশার আলো দেখা যায়। রাজা হলেও দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থেই আলফ্রেড তঁর সর্বাত্মক কর্মপ্রচেষ্টা বজায় রেখেছিলেন। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

যুদ্ধ বা আইনপ্রণয়নেই তাঁর স্মৃতি অদ্যাবধি রক্ষিত হয় নি। তা' হয়েছিল সর্বাধিকভাবে তাঁর সাহিত্য প্রীতিতে এবং সাহিত্য-কর্মে। তিনি নানাস্থান থেকে পণ্ডিতদের আনিয়েছিলেন ওয়েসেক্সকে শিক্ষা ও সাহিত্যে উন্নত করতে। তাঁর জীবনের সাধনা ছিল, জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার যেন সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয়। ল্যাটিনে দক্ষ পুরোহিত শ্রেণীর বাইরেও যে সাধারণ মানুষরা রয়েছেন, আলফ্রেড তাঁদের কথাই সবচেয়ে বেশী করে চিন্তা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের দেশীয় ভাষাতেই আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হোন, এই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। এক হিসাবে, আলফ্রেডই ইংরাজী সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁর আগে কবিতা ছিল। কিন্তু কবিতা তো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ভাষা নয়। ইংরাজী গদ্যের জনক আলফ্রেড তাই সাধারণ ইংরাজের কাছে ইংরাজী সাহিত্যেরও জনক।

বীডের 'ইতিহাস' যখন তিনি ইংরাজী গদ্যে অনুবাদ করেন বা করান তখন তা হল সাধারণ মানুষের অভিগম্য। সম্ভবতঃ এই প্রচেষ্টাই বিখ্যাত এংলোস্যাক্সন ক্রনিকল বা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ইতিহাসের প্রেরণা ও পটভূমি। সমগ্র টিউটনিক জাতির ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষায় এইটিই প্রাচীনতম ইতিহাস এবং টিউনিক গদ্যের স্মরণীয় স্তম্ভ।

বীডের 'ধর্মীয় ইতিহাস' ছাড়াও অরোসিয়াস-এর ইউনিভার্সাল হিষ্টরী বা বিশ্ব ইতিহাস, গ্রেগরী দি গ্রেট এর 'প্যাষ্টোর্যাল রুল' (ধর্মরক্ষকদের জন্য নিয়মাবলী) এবং বোয়েথিয়াস-এর (Boethius) 'সান্ত্বনা' (Consolation) আলফ্রেডের অমর কীর্তি। শেষোক্ত গ্রন্থটি ছিল জীবনদর্শনের উপর একটি আশ্চর্য সাহিত্য গ্রন্থ। ৮৯৯ সালে আলফ্রেডের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর ধরে সাহিত্যের স্রোত ক্ষীন হয়ে যায়। পুরোহিত শ্রেণী আবার অজ্ঞানতায় ডুবে যায়। তাদের পণ্ডিতন্মন্যতা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। তাদের দ্বারা লিখিত কোন গদ্যখণ্ডেই যুক্তি, নীতি বা সারবত্ত্বা ছিল না। এই অবস্থা থেকে ইংরাজী গদ্যকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে যে দুজন চেষ্টা শুরু করলেন তাঁরা হলেন এলফ্রিক (Aelfric) এবং উলফস্টান (Wulfstun)।

এলফ্রিকের লেখা ছিল মূলতঃ কথ্য ভাষায় ধর্মালোচনা এবং উপদেশ। এগুলি ছিল সন্তদের গুণগান, এবং লেখার ধরণ ছিল গদ্য এবং পদ্যের মাঝামাঝি। শক্ত ল্যাটিন শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে অত্যধিক সহজ করার দরুণ তা জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং তার দ্বারা ভাষার উন্নতি ঘটেছিল। ল্যাটিনের আওতা থেকে ইংরাজী গদ্যকে এইভাবে বার করে আনা প্রশংসার্হ।

এলফ্রিকের লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান ৮০টি ছিল 'হোমিলি' (Homily) অর্থাৎ 'শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধায়ক ধর্মীয় নীতি উপদেশ' এবং সন্তদের জীবনী।

অপরদিকে, ইয়র্কের আর্চবিশপ উলফষ্টান-এর দ্বারা ১০১৪ সালে লিখিত নীতি উপদেশ আলঙ্কারিক ভাষা এবং ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। এই সময়ে ডেনদের ভয়ে ভীত ইংরাজদের উদ্দীপ্ত করায় তাঁর লেখা একাধারে সাহিত্য সম্পদে ও দেশপ্রেমে দীপ্যমান।

এরপর ইংরাজদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ায় ডেনরা ইংল্যাণ্ডের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। প্রায় ছাব্বিশ বছর ধরে ডেনদের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকে। তারপর আবার স্যাক্সন রাজশক্তি ক্ষমতায় ফিরে আসে। সেই অবস্থাও চলে প্রায় পঁচিশ বছর। এরপর প্রাচীনযুগের অবসান ও মধ্যযুগের আরম্ভ।

উপসংহার

একাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে ইংল্যাণ্ডে ডেনরাজারা রাজত্ব করেছেন। এঁদের ভিতরে ক্যানিউট ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। তিনি বন্য, দরিদ্র, হতবুদ্ধি, সরল ইংরাজদের জন্য যা করেছিলেন পৃথিবীর খুব কম দেশেই কোন বিদেশী রাজা তাঁর প্রজাদের জন্য তা করেছেন। যুদ্ধবিদ্ধস্ত, ক্ষতবিক্ষত ইংল্যাণ্ড, দেশের অর্ধাংশ যেখানে মানুষের বসবাসের অযোগ্য, জলাভূমি, বন্যপশুদের আবাসস্থল—সেই ইংল্যাণ্ডে ক্যানিউট শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিলেন। সাহিত্য ও শিল্পকলার উপযুক্ত পরিবেশ হয়ত ক্রমে তৈরী হতে পারত, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে তাদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা দিয়ে পিতার ন্যায়বিচার, বিচক্ষণতা ও শান্তিকামিতার আদর্শকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিল। এই অস্থিতাবস্থা থেকে ইংল্যাণ্ডকে উদ্ধার করা কোন সাধু এডওয়ার্ড- এর (ওয়েসেক্সের তদানীন্তন স্যাক্সন রাজা) পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইংল্যাণ্ডের চার্চেরও তখন কোন নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল না। এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর মন্ত্রী গডউইন-এর যোগ্য পুত্র হ্যারল্ড-এর হাতে রাজ্যভার স্বভাবতঃই চলে গেল। কেননা ইংল্যাণ্ডের প্রযোজন ছিল একজন স্যাক্সন নেতার। হ্যারল্ড শুধু ওয়েসেক্স-এর রাজা নন, তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় নেতা। তিনি তাঁর মহান কর্তব্য যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছেন।

১০৬৬ সাল যেমন তাঁর নিজের জীবনের তেমনি ইংল্যাণ্ডের জাতীয ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের দুঃখময় পরিসমাপ্তি। সেপ্টেম্বর মাসে ইয়র্কের কাছে ষ্ট্যামফোর্ডব্রিজের যুদ্ধজয়ের পর ঝড়ের বেগে তিনি দক্ষিণে লণ্ডনে চলে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই নরম্যাণ্ডির উইলিয়ম ইংল্যাণ্ডের উপকূলে নেমে পড়েছেন। সময়াভাবে অপ্রস্তুত সৈন্য নিয়ে তাঁর মোকাবেলা করবার জন্য হ্যারল্ড দ্রুত হেষ্টিংসের দিকে চলে যান। সেখানে সেনলাক পাহাড়ে ১৪ই অক্টোবর ভোর থেকে সারাটা দিন যুদ্ধ চলে। উইলিয়ম ছিলেন অসম্ভব জেদী। আর হ্যারল্ডের ছিল অল্প শিক্ষিত সৈন্য আর প্রচণ্ড স্বাধীনতাস্পৃহা। সূর্যাস্তের ঠিক পরেই অদম্যসাহসী এই বীর রণক্ষেত্রে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সাসেক্সের সমুদ্রে স্যাক্সন-সূর্য চিরকালের জন্য ডুবে গেল। পরাজিত, অপমানিত ইংল্যাণ্ড বিজয়ীকে সম্বর্ধনা করে নিল। পুরাতন সংস্কৃতি অতীত ইতিহাস হয়ে গেল।

বিজয়ী নরম্যানরা ইংল্যাণ্ডে এক নতুন যুগের সূচনা করল। —তা হ'ল মধ্যযুগ, নরম্যান সংস্কৃতির যুগ, বিদেশী আধিপত্যের যুগ।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে গদ্যের যেমন কোন উন্নতি হয়নি, তেমনি কোন ক্ষতিও হয়নি। ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য তখনও ছিল গদ্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি; কিন্তু কবিতা—এংলোস্যাক্সন বিশালতায় বা ল্যাটিন অলঙ্করণে—কোন কিছুতেই আর নতুন কোন পথ দেখাতে পারেনি। কবিতা সাধারণ মানুষ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ড তখন যেন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল নতুন বিষয়ের, নতুন অলঙ্করণের, নতুন ধারার। প্রাচীন রুক্ষ-সুন্দর কাব্য সৃষ্টির আর কোন স্থান ছিল না। উদাত্ত মুখরতা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। এক অজানা, নতুন, মার্জিত রুচি বেগে এগিয়ে

আসছিল। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংল্যাণ্ড রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে যতটা না পালটেছিল তার থেকে অনেক বেশী বদলে গিয়েছিল সম্পূর্ণ এক নতুন সংস্কৃতির শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা। তাই মধ্যযুগের আবির্ভাব রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের দ্বারা নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবর্তনের দ্বারা পশ্চাতের বহুযুগকে দ্রুত অতিক্রম করে গেল। এংলোস্যাক্সন সাহিত্য পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে গেল। চলমান জীবনের সঙ্গে তার আর কোন যোগ রইল না।

পরিশিষ্ট

নবম শতাব্দী থেকে সুরু করে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এবং ডেনরা ইংল্যাণ্ডে যাতায়াত করে এবং বেশ কিছু সময় ধরে রাজত্বও করে। কাজেই ওই সব দেশের ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রভাব ইংরাজী ভাষার উপর স্বাভাবিকভাবেই পড়ে।

এই সব প্রভাবের বিস্তৃতি, স্থায়ীত্ব, এবং সন্নিবেশের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণভাবে এবং তর্কাতীতভাবে উপলব্ধি করা আজ সম্ভব নয়। শব্দ, ভাব এবং সঞ্চারিত বোধ বর্তমান ইংরাজী ভাষার আধুনিকতা এবং বিশ্বজাগতিকতার ভিতর লিপ্ত হয়ে রয়েছে। ডেনরা দস্যুবৃত্তি ছেড়ে রাজদণ্ড গ্রহণ করেছিল, আবার কালের পরিবর্তনে তারা চলেও গিয়েছিল। রেখে গিয়েছিল প্রাচীন রহস্যময় কিংবদন্তী জড়িত সংস্কৃতির কিছুটা, এবং তা-ও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল না। ইংরাজী সংস্কৃতির ভিতরেই তা মিশে গিয়েছিল। 'নরওয়েজীয়'রা গ্রেটবৃটেনের নানা যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিল যেমন, স্ট্যামফোর্ডব্রিজের যুদ্ধে হ্যারল্ডের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই টস্টিগের সঙ্গে নরওয়ের রাজাও যোগ দিয়েছিল। ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন, এবং স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও মনের গতি যুক্তি আর হিসাব ধরে পুরাপুরি বোঝা যায় না। শত্রুপক্ষের সঙ্গে সামরিক সংঘাতের ভিতর দিয়েও সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদান চলে, আমাদের দেশেও কি প্রাচীনকালে আর্য-অনার্যের মধ্যে, বা মধ্যযুগে দেশীয় মানুষ এবং সাময়িক আক্রমণকারীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হয়নি? আর স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলির (নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক) মানুষেরা তো ইংরাজদের পূর্ব পুরুষদের জ্ঞাতি। তাই পরিবর্তন অবশ্যই এসেছিল, প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল ; তবে তার কিছু জানা যায়, কিছু জানা যায় না।

প্রথমতঃ ইংরাজী বাক্যগঠনের রীতিতে যে পরিবর্তন আসে তা বোঝা যায় বাক্যগঠনের নতুন ধরনে, বিশেষ করে বিষয়ানুগত এবং প্রয়োজনানুরূপ বৈচিত্রে। ল্যাটিনের সুনির্দিষ্ট ছকের বাইরে নতুন নতুন শব্দ সমন্বয়ের দ্বারা এংলোস্যাক্সনদের প্রাচীন ভাষার প্রাণবন্তভাব নতুন করে আর একভাবে ফিরে আসে। বচন ও পুরুষভেদে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। শব্দের উচ্চারণে প্রয়োজনীয় কাঠিন্য দেখা দেয়। আঞ্চলিক উপভাষাগুলিতে কোন কোন স্থানে এই কাঠিন্যই একমাত্র রূপ বলে প্রচলিত হয়। কিন্তু লিখিত ভাষাতে পূর্বের দুর্বল এবং পরবর্তীকালের কঠিন রূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে বজায় থাকে। আইনকানুন সংক্রান্ত শব্দ, প্রাত্যহিক ব্যবহারের কিছু শব্দ, কিছু কিছু বিশেষ্যের শেষাংশ, এবং উত্তরের কোন কোন আঞ্চলিক উপভাষায় কিছু কিছু শব্দ

সংযোজনা স্ক্যাণ্ডিনেভীয এবং ডেন আধিপত্যের ফল হিসাবে স্থায়ী হযে রইল। বানানে অনেক নতুনত্ব এল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নতুন সমার্থক দুটি শব্দই থেকে গেল, অর্থের সামান্য ইতর-বিশেষ বোঝানোর জন্য। কোন কোন স্থলে পুরানো ইংরাজী শব্দ নতুন ড্যানিশ অর্থ পরিগ্রহ করল। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরানো ইংরাজী শব্দের বিশিষ্ট কোন ব্যবহার নতুন ড্যানিশ শব্দ দিয়ে বোঝান হতে থাকল। অর্থাৎ এক কথায়, প্রচলিত আধুনিক ইংরাজীর রূপ স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এবং ডেনদের সঙ্গে একত্রে থাকার ফলে, ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু তবুও বৃহত্তর ইউরোপের আদর্শের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের তখনও সরাসরি যোগাযোগ ঘটে ওঠেনি। ড্যানিশ এবং স্ক্যাণ্ডিনেভীয় প্রভাব সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য তখনও উত্তর ইউরোপের একাংশের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। তদানীন্তন জাতীয় সংস্কৃতির আত্মিক প্রযোজন ছিল প্রসারণের, এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের বিচিত্র সমারোহময় সংস্কৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের। নরম্যাণ্ডির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার রাজপথ ধরে ইংল্যাণ্ড ইউরোপের সেই সার্বিক সংহতিতে সামিল হতে চলল।

এই অংশের জন্য যে সমস্ত বইযের সাহায্য নেওয়া হযেছেঃ

A. Stopford Brooke : English Literature from the beginning to the Norman Conquest

W. P. Ker : Epic and Romance

W. J. A. Courthope : A History of English Poetry

Borris Ford : A Guide to English Literature

A. C. Baugh (Ed.) : A Literary History of England

Legouis and Cazamian : History of English Literature

P. Harvey : The Oxford Companion to English Literature

R. M. Wilson : Early Middle English Literature

মধ্যযুগ

(একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ)

মধ্যযুগ

(১০৫০—১৩৫০)

ভূমিকা

মধ্যযুগ। বর্ণাঢ্য সমারোহের যুগ, নাইট ব্রতধারী পরার্থপ্রাণ বীরেদের যুগ।

রূপকথা—কিংবদন্তীর যুগ, অন্ধবিশ্বাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের যুগ—পরমার্থের বিশ্বাসে ঐহিক যন্ত্রণাকে হাসিমুখে সহ্য কবার যুগ— উৎসব মুখরতার যুগ—রোম্যান্সের যুগ।

মধ্যযুগের সাহিত্যকে আধুনিকতায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে চলবে না। আধুনিক সাহিত্যের পরিণত গঠন, সীমাহীন বুদ্ধি কৌশল, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অতিরিক্ততা সেখানে নেই; কিন্তু তার বদলে আছে সরলতার সৌন্দর্য, কৃত্রিম সৌষ্ঠবের বদলে সাদামাঠা উপস্থাপন, বুদ্ধিব বিশ্লেষণের বদলে মুগ্ধ মনের আত্মনিবেদন। বুদ্ধিজীবি আধুনিক মানুষ একে সাহিত্য পদবাচ্য হবার মত যথেষ্ট গুণান্বিত নয় বলে মনে কবতে পারেন; কিন্তু যদি শিশুর সরল হাসি পরিণত মানুষের তৃপ্ত মুখমণ্ডলের চেয়ে অধিকতব সুন্দব হয়, তবে মধ্যযুগের সাহিত্যেও সেই সৌন্দর্যের বিকাশ। অথবা,

সাঁওতাল মেয়েটির কানে কালো গালের উপব আলো করেছে, সেই ক্যামেলিয়া।

সে বললে,—'ডেকেছিস কেনে?'

আমি বললেম,—'এই জন্যই।'

মধ্যযুগ মানে মধ্যবর্তী বন্ধ্যা যুগ নয়, শুধু পরবর্তী সৃজনশীল যুগের প্রস্তুতিমাত্র নয়। তার নিজস্ব বিশিষ্ট পৃথক এক সৌন্দর্যকে উপলব্ধি কববাব মন আমরা হয়ত হাবিয়ে ফেলেছি।

ইংল্যাণ্ডে দিনেমার রাজত্বকালে বাজা আলফ্রেডের অন্যতম বংশধর (সাধু) এডওয়ার্ড মামার বাড়ী নরম্যাণ্ডিতে থাকতেন। নরম্যাণ্ডির যে উইলিযম ১০৬৬ সালে ইংল্যাণ্ড দখল করেন তিনি এডওয়ার্ডের মামাব নাতি। নবম্যাণ্ডি অঞ্চলটি পশ্চিম ফ্রান্সের উত্তর অংশে। নরম্যাণ্ডিতে থাকাব দরুণ সেখানকার প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল, এবং তিনি রাজা হবার পরে অনেক নর্ম্যান ইংলণ্ডে এসে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে সুরু করল। সেনলাকের যুদ্ধের পর এই সব নর্ম্যান রাজার জাত হিসাবে বিশেষ সম্ভ্রম দাবী করতে লাগল। তবে তার বিশ বছর বা কিছু বেশী আগে থেকেই নর্ম্যান সংস্কৃতির হাওয়া বেশ জোরেই বইতে সুরু করেছিল। ভ্রাম্যমান গীতিকার এবং গায়কদল এডওয়ার্ডের গুণগান করে বেড়াত। তিনি ভাল লোক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শক্ত শাসক ছিলেন না; অন্ততঃ স্পষ্টবক্তা ছিলেন না। ফলে ইংরাজ প্রজারা নামে ইংরাজ রাজার অধীন, কিন্তু কাজে নর্ম্যান অভিজাতদের সামনে যেন ছোট হয়ে যেতেন। তাঁদের কেউ কেউ পুরানো ইংরাজ সংস্কৃতি, ধর্ম ও কৃষ্টিকে আঁকড়ে রইলেন; আবার কেউবা অধিকতর আধুনিক নর্ম্যান সংস্কৃতিকে মোটামুটি আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করলেন। ফলে অধিকাংশ কথ্য সাহিত্য পুরাণো ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলল; কিন্তু লিখিত সাহিত্যে বড় রকম ওলট পালট হয়ে যেতে থাকল। স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা এবং মার্জিত শহুরেয়ানা পাশাপাশি চলতে থাকল। এই গঙ্গা যমুনার স্রোত চলল ততদিন যতদিন না নর্ম্যান সংস্কৃতি দেশীয়

মূলস্রোতের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। ধীরে ধীরে নর্ম্যান বা ফরাসী ভাবধাবা ইংবাজ জাতকে গুণগতভাবে পরিবর্তন করল। অর্থাৎ পুরানো এংলোস্যাক্সন জাত নব্য ইংরাজ জাতে রূপান্তরিত হ'ল। এরপর কয়েকশ বছব ধরে ইংরাজ এবং ফরাসীদের অনুকূল-প্রতিকূল ভাবের লড়াই চলেছে; কিন্তু একই সঙ্গে উভয় সাহিত্যই উভয় সাহিত্য থেকে রসগ্রহণ করেছে। ফরাসী দেশ, বিশেষ করে দক্ষিণ ফ্রান্স বেশ ভাল রকমই ল্যাটিন প্রভাবাধীন ছিল। আর ইংবাজরা উত্তর ইউরোপের টিউটনিক মহাজাতির বংশধর। কিন্তু জাতিগত এই বিভিন্নতা সংস্কৃতিগত এই মিলনের পথে বেশী দিন অন্তরায় হয়ে থাকে নি।

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা খুব বড় রকমের পরিবর্তন ধীরে ধীরে দানা বাঁধ ছিল। এতাবৎকাল সাহিত্যের প্রধান উৎস ছিল দেশের ধর্মসংস্থা অর্থাৎ খৃষ্টান মঠগুলি। নান বিপদ আপদের ভিতর দিয়েও সাহিত্যের যথাসাধ্য সংরক্ষণ ইংবাজী চার্চের দ্বারাই হয়ে আসছিল। সাহিত্যিকরা নিজেরা ছিলেন মঠের সাধু। তখনকার দিনের লেখাপড়ায় অর্থাৎ ল্যাটিনে তারা ছিলেন পারদর্শী। সুতরাং উল্লেখযোগ্য ভিত্তিমূলক সাহিত্য ছিল ল্যাটিন প্রভাবিত এবং ধর্মের আশ্রিত। কিন্তু সাধাবণ মানুষদের জন্য এবং সাধারণ মানুষদের দ্বারা কিছু স্বাধীন ইংবাজী সাহিত্যও তৈবী হচ্ছিল। তাদের মধ্যে যেগুলি ভাল সেগুলি ধর্মেব স্বীকৃত পাচ্ছিল। কিন্তু ভালমন্দের বিচারক ছিলেন ল্যাটিনে পণ্ডিত মঠেব যাজকবা। তবে সাধারণ মানুষদের বোধগম্য গ্রাম্য সাহিত্যেব উদ্ভব ও জনপ্রিয়তার খতিয়ান না থাকলেও সেগুলিব অভাব দেশে ছিল না। ধর্মের উত্তাপে এই গণসাহিত্যও আগুন পোহাত।

নর্ম্যান অধিকারেব আমলেব সুরু থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য কিছু কিছু তৈবী হতে থাকলো। এবং আশ্চর্যের বিষয় মঠেব পাঠগৃহেই ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সুরু হ'ল। এবং এই ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য প্রাচীন ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে অবলম্বন করল। এই ইতিহাসাশ্রিত ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের শুরু সম্ভবতঃ 'টারগট' (Turgot) এবং 'সিমিয়ন' এর (Simeon) হাতে। অবশ্য সাহিত্যের বাহন সেই ল্যাটিন বা ল্যাটিন প্রভাবিত ভাষা। এটা ইংরাজী সাহিত্যের অংশ এই কারণে যে তা ইংবাজদের দ্বারা ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের আখ্যান। এটা ইংরাজী সাহিত্যের অংশ আরও এই কারণে যে ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষা প্রকাশের ধরনধারণ দ্রুত দেশীয় ইংরাজী ভাষার অবয়বে মিশে যেতে থাকল। বহুজাতির সংমিশ্রণে যেমন ইংরাজ জাতির উদ্ভব, বহুভাষার সংমিশ্রণে তেমনই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পরিপূর্ণতা।

ইতিহাসের অন্তরালে যে ইংরাজী স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তা-ই অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদা ও স্বাধীন অস্তিত্বের দিকে চালিত করল। ইংরাজী ভাষা এইভাবে অনাড়ম্বর স্বতোৎসারিত গ্রাম্য ভাষা থেকে এক আন্তর্জাতিক আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় স্থান পরিবর্তন করেছিল। স্পষ্টভাবে ইংল্যাণ্ড এবং ইংরাজী ভাষাকে লিখিত সাহিত্যে উপযুক্ত স্থান দেওয়ার সূত্রপাত করলেন হান্টিংডনের আর্চডীকন হেনরী এবং মামসবেরীর গ্রন্থাগারিক উইলিয়ম। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সাগ্রহে সংগ্রহ করলেন বৃটনদের বিরুদ্ধে স্যাক্সন বিজেতাদের রণসঙ্গীতগুলি, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সংগ্রহ

করলেন ইংরাজ রাজাদের বিষয় অবলম্বন করে এতাবৎকাল রচিত গাথাকাব্যগুলি। হেনরীর মত উইলিয়মও ছিলেন মঠবাসী সন্ন্যাসী। ধর্মীয় ধারাকে কেন্দ্রীয় সূত্র হিসাবে অবলম্বন না করে উইলিয়ম ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে উইলিয়মের এই দৃষ্টিভঙ্গী নতুন এবং সাহিত্যের স্বতন্ত্র সত্তার স্থায়ী ভূমিকা। এই ধারা অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে নিরপেক্ষভাবে ধর্মসংগঠন ও রাষ্ট্রের সংঘাত বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছিল। ধর্মসংগঠনকে অস্বীকার না করে বিষয়ানুগভাবে তার থেকে সরে যাওয়া সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য শুরু করার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। ইংরাজী সাহিত্যকে এইভাবে নিজের স্বতন্ত্রখাতে বইয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন পর পর আরও কয়েকজন পথপ্রদর্শক। এঁদের সাহিত্য-কৃতিত্ব অসামান্য নয়, কিন্তু এঁদের শুরু-করা পদ্ধতির অসামান্য গুরুত্ব ছিল। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিকে ধর্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতিষ্ঠাও সাহিত্যিক প্রসারতার নতুন রূপ।

এর পরে, স্বাবলম্বী সাহিত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করলেন জিরাল্ড ডি ব্যারি (Gerald de Barri)। জনসাধারণের কাছে সহজে গ্রহনীয় সাহিত্য এবং প্রচার পুস্তিকা প্রণয়নের প্রবর্তক বলা চলে জিরাল্ডকে। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহিত্যিক, এবং স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সমীকরণের প্রথম পথিকৃৎ। ল্যাটিনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে দেশীয় জনপ্রিয় সাহিত্যে তাকে সন্নিবেশিত করার কৃতিত্বও জিরাল্ডের। সাধারণ্যে প্রচলিত বোধগম্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বোধহয় প্রাচীন এংলোস্যাক্সনদের অসংস্কৃত জনপ্রিয় আভিজাত্যকে নতুনভাবে এবং বিস্তৃততর করে তাঁর যুগের উপযোগী জনপ্রিয় সাহিত্যের রূপে পরিবেশন করলেন। তিনি নতুন নতুন অঞ্চল সম্বন্ধে সরকারী তথ্য সংগ্রহকারীর মত তখনকার কালের সাংবাদিকতার কাজও করেছেন। তিনি যেমন ধর্মকে সাহিত্যের অঙ্গীভূত করেন নি, তেমনি সাহিত্যকে রাজানুগ্রহের উপর নির্ভরশীলও রাখেন নি।

এই মধ্যযুগে সাহিত্যের যে পরিচয় সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল তা ছিল রোম্যান্স (Romance)। রোম্যান্স ছিল ধর্মসংগঠনের শাসনের আওতার বাইরে। এই রোম্যান্সে ধর্মের অমর্যাদা করা তো হয়ই নি, বরঞ্চ তাকে এক সুশোভন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মসংগঠন এই রোম্যান্সের বিরোধিতা করেছিল। সেই বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রান্সের অন্তর্গত বৃটানীর কেল্টদের পরম যত্নের স্মৃতি রাজা আর্থার সম্পর্কিত রোম্যান্স ওয়েলসের এবং ইংল্যাণ্ডের নানা অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের নিজস্ব সম্পদের পুণ্যময় গৌরবের ভাণ্ডারে সুরক্ষিত হ'ল। ওয়েলস-এর বৃটনরা স্যাক্সনদের থেকে প্রাচীনতর নিজেদের স্বাধীনতার অতীত সমৃদ্ধিকে রাজা আর্থারের পুণ্যকথার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলল। মনমাউথের জিওফ্রে (Geoffry of Monmouth) তাঁর লেখা 'বৃটনদের ইতিহাস' বইতে ক্রুশেডের নতুন আলোয় রাজা আর্থারের কাহিনীর ভিতর দিয়ে বৃটনদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখালেন। এর পর ধীরে ধীরে আর্থারের 'গোল টেবল' (Round Table)-এর কথা উঠলো, এবং এটাও আগেকার কিংবদন্তীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিরাট সামগ্রিক পৌরাণিক উপকথার অঙ্গীভূত হল। এরপর মার্লিন, ল্যান্সলট এঁদের কাহিনী যুক্ত হল। স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক অসাধারণ আদর্শ আর্থার এবং তাঁর বীর যোদ্ধাদের

কাহিনীগুলিকে সমৃদ্ধ করল। ধর্মসংগঠন এই উপকথার অন্য তাৎপর্য গ্রহণ করল ; কারণ এগুলির সরাসরি খৃষ্টান ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, যীশুর সঙ্গে তো নয়ই। তাই তারা 'পবিত্র রেকাবি' (San Grail) এর কাহিনী উদ্ভাবন করল ; এবং প্রাকখৃষ্টান আর্থারকে সেই পবিত্র পাত্রের খোঁজে দেশে দেশে পাঠিয়ে দিলে। খৃষ্টধর্মের ধারায় সংস্কৃত এই নতুন আর্থার কাহিনী লিখলেন ওয়ালটার ডি ম্যাপ (Walter de Map)। ম্যাপ এবং অন্যান্যরা সম্পূর্ণ খৃষ্টান গুণান্বিত নুতন এক বীরযোদ্ধার সৃষ্টি করলেন—স্যার গালাহাড। এইভাবে আর্থারের কাহিনী রূপান্তরিত হ'ল পৃথক এক ক্রমবর্ধমান সাহিত্যে। মূল জনপ্রিয়তা এতে হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু সৌন্দর্যকে প্রচলিত নীতিনিয়মের বাঁধনে বাঁধা হল। মুক্ত এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, তা সে কিংবদন্তীই হোক, উপকথাই হোক—তাকে ধর্মের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত করা অবশ্যই সাহিত্যের অগ্রগতিতে বাধা। কিন্তু ওয়ালটার শুধু বাধা ছিলেন না। তাঁর কাজ যেমন রোম্যান্সের মুক্ত সাহিত্যের খৃষ্টীয়করণ, তেমনই আবার তদানীন্তন চার্চের সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গসাহিত্য সৃষ্টি। মধ্যযুগীয় চার্চের কুসংস্কার থেকে তাকে উদ্ধার কবার মাধ্যমে সাহিত্যেরও স্বাধীনতার পথ খুলে দেওযা হয়। চার্চের সমস্ত পদাধিকারীর চারিত্রিক দুর্নীতির এত সার্থক সমালোচনা খুব কমই হয়েছে। যদিও ওয়ালটারের মূল লক্ষ্য চার্চকে নৈতিক উন্নতির পথ দেখান, তবু তাঁরই কাজের দ্বারা সাহিত্য পরোক্ষে বিশেষ উপকৃত হয়েছিল।

উপরিউক্ত বইগুলি ল্যাটিন থেকে অনুবাদ নয়, ইংরাজদের দ্বাবা লিখিত ল্যাটিন বই। সাধারণ মানুষের ভাষা— দেশীয় ইংরাজী—কিন্তু কথ্য ভাষায় প্রাধান্য বজায় রেখে চলল। অর্থাৎ যদি কোনদিন কেবলমাত্র স্বাভাবিক ইংরাজী ভাষায় লেখা সাহিত্যের যুগ আসে, তো সেখানে ভাষার অভাব হবে না। এই মূলধনটুকু কিন্তু সামান্য পুঁজি নয়, কেননা এর পিছনে রাজকীয় স্বীকৃতি ছিল ; তবে তা রাজসভার ভাষা ছিল না।

ইংরাজী ভাষায় লেখা কিন্তু বন্ধ হয়নি। স্তোত্র ইত্যাদিতে, ধর্মীয় কিছু পুস্তিকাতে এবং সর্বোপরি এংলোস্যাক্সন ক্রনিকল-এর মতো ধাবাবাহিক ঘটনাপঞ্জী সংরক্ষণে ইংরাজী ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছিল। দেশীয় ভাষার সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তিস্তম্ভ লেয়ামনের লেখা 'ব্রুট'। নরম্যান আধিপত্যের যুগেও খাঁটি ইংরাজী সাহিত্যের ধারা প্রবহমান ছিল। আলফ্রেডের অমর অবদান দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের রাজশক্তিকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল।

যুগের সূচনা

নর্ম্যানদের দ্বারা ইংল্যাণ্ড জয়ের কিছুকাল আগে থেকেই পুরানো এংলোস্যাক্সন সাহিত্যের অগ্রগতি ধীর প্রবাহী হ'য়ে গিয়েছিল। নর্ম্যান সান্নিধ্যে এবং নর্ম্যানভাবে অনুপ্রাণিত লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হবার মত পরিবেশ তখন সৃষ্টি হয়। আমি একে নর্ম্যান প্রভাবিত ইংরাজী সাহিত্য বলব না, কিন্তু এ সাহিত্যে অবশ্যই নর্ম্যান আদর্শের স্বীকৃতি ছিল।

একাদশ শতাব্দীতেই ইউরোপীয় সাহিত্য পূর্ণ বিকাশের মুখে। কারণ এ সাহিত্য

কেবলমাত্র প্রাচীন ক্লাসিক ল্যাটিনের প্রত্যঙ্গমাত্র ছিল না। যারা ল্যাটিন ভাষাসম্পদ বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছিল, তারাও একাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিনের অবনতির মুখে যার যার দেশীয় ভাষার উপর বেশী নির্ভর করতে শুরু করল। এছাডা, একাদশ শতাব্দীর শেষে ১০৯৫ সালে প্রথম ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যে পাশ্চাত্য জগৎ অনেক শতাব্দী ধরে কূপমণ্ডুক হয়েছিল, প্রাচ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কের দরুণ—তা সে শত্রুতার সম্পর্ক হলেও—সেই ইউরোপ এক বৃহত্তর, প্রাচীনতর এবং বিচিত্র জগতের পরিচয় পেল। দেশে দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপে, সাহিত্যের রং বদলে যেতে শুরু করল। প্রাচীন গ্রীকসাহিত্য ও সংস্কৃতির পুণর্জাগরণের আগেই বিভিন্ন দেশে এক নতুন এবং বেশ কিছুটা ভিন্নমুখী সাহিত্যের সঞ্চার হ'তে থাকল। রেনেসাঁসের মত এ স্রোত ইংল্যাণ্ডের তটভূমিতে অপেক্ষাকৃত দেরীতে পৌঁছয় নি। তার কারণ প্রথমে নর্ম্যান বিজয়, তারপর ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, এবং সব শেষে ক্রুশেডের ডাক। একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই এ সব কাণ্ড ঘটে গেল, এবং তখন থেকে চলতে লাগল। ভ্রাম্যমান গীতিকাররা খৃষ্টান তীর্থযাত্রী এবং উৎসাহী খৃষ্টান যোদ্ধাদের নামে যে সব গান বাঁধতে লাগলেন, তাতে ক্রুশেডে হারজিত যা-ই হোক না কেন, দেশীয় ভাষার স্বতোচ্ছাসরূপ প্রকাশ পেল। আলাদাভাবে দেখতে পেলে ক্রুশেডে ইংল্যাণ্ডের কিছু লাভ হয়নি, বরঞ্চ ক্ষতিই হয়েছিল। কিন্তু গরীব-বডলোক সব মানুষের যশের আকাঙ্ক্ষা লৌকিক সাহিত্যে বেশ ছাপ ফেলেছিল।

উপরোক্ত সূত্রে সাহিত্যে পুণঃপ্রবেশ করল টিউটনদের প্রাচীন বীরত্বগাথা, এবং কেল্টদের রোম্যাণ্টিক উপকথা। নরনারীর ভালবাসার এক পবিত্র আধ্যাত্মিক ধরনের উপর নির্ভরশীল সাহিত্য-সৃষ্টিও এই সঙ্গে শুরু হল। রোম্যাণ্টিক সূক্ষ্ম-প্রেম ক্লাসিক স্থূল প্রেমকে একপাশে সরিয়ে ফেলল। সাহস এবং বাহুবলের সঙ্গে সৌজন্য ও নারীজাতির কাছে আত্মনিবেদন ও বশ্যতার এক নতুন পবিবেশ তৈরী হল। মধ্যযুগের সাহিত্যের এটি একটি বিশেষ দিক। ঈশ্বরের সন্মান বজায় রাখার পাশাপাশি চলল নারীজাতির প্রতি সম্ভ্রমবোধ, অশ্বারোহী বীরের আদর্শ এবং গৃহী জীবনের বাইরের বিশাল জগতের আকর্ষণ। একই সাহিত্যে এ সব কিছুর স্থান হ'ল। এ ধর্মীয় সাহিত্য নয়, আধ্যাত্মিকতার অভাবও নয়,—এ হল স্বনিয়ন্ত্রিত মানবিক প্রকৃতির মোহমুগ্ধ আতিশয্যের বিকাশ। মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই বিকাশের মধ্যে।

সাহিত্য-পরিস্থিতি

নর্ম্যান বিজয়ের আগের অবস্থাটা একটু এক নজরে বুঝে নেওয়া দরকার। এটা সত্য কথা যে আলফ্রেডের আমল পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের যে প্রাণবন্ত প্রাচুর্য এবং স্বাধীন সৃজনশীল শক্তি ছিল পরবর্তীকালে আর তা তেমন থাকে নি। একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিষয়ের অভাব ঘটেছিল। কাব্যকল্পনাকে বিষয়ের আধারে স্থাপন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা যাচ্ছিল। তাই ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দিকে তাকাতে হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সাহিত্যিক রীতি ও সাহিত্যের বিষয়ের যেমন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল, তেমনি

তা দৃষ্টিশক্তির প্রসাবতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতাও বাড়িযে দিয়েছিল। একান্ত নিজস্ব রীতি ও উপাদান ভাল কি মন্দ, অথবা কোন স্তরের তা জানবার জন্য বিদেশমুখী প্রবণতার দরকার হয়েছিল। এই প্রযোজন খানিকটা মিটেছিল ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়েব সাহায্যে। এর ভিতরে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষযের স্মরণ ও চর্চা উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই ইউরোপে সৃষ্ট ল্যাটিন সাহিত্যের চর্চা ছাড়াও, ইংরাজদের দ্বারা লিখিত প্রাচীন বিষয ও ল্যাটিন ভাষার পাণ্ডুতী সাহিত্য কখনও বাধা পাযনি। কিন্তু আমি সরাসরি ইংরাজী সাহিত্যের কথা বলছি। সাহিত্যবোধসম্পন্ন এবং ইংরাজী ভাষাকে ব্যবহার করবার মানসিকতা বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন। তাঁরা হযত মহারথী নন কিন্তু তাঁদেব নিষ্ঠা ও আন্তবিকতা প্রশংসার দাবী রাখে।

নর্ম্যানবিজয় একটা ঐতিহাসিক প্রশ্নচিহ্নের সামনে সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তিকে দাঁড করিয়ে দিলে। ইংরাজী সাহিত্য এবং তার ঐতিহ্যের প্রতি দুর্বলতা থাকা যে কোন ইংরাজেব পক্ষেই স্বাভাবিক। প্রশ্নটা দাঁড়াল এই, পুরাতন ইংবাজী ধাবা অনুসরণ করা হবে, না নর্ম্যান-মিশ্রিত ইংবাজীকে আশ্রয করা হবে। সাহিত্যিক মন স্বাধীন বটে, কিন্তু সাহিত্যিক ব্যক্তি হিসাবে উপযুক্ত পুরস্কাব ও স্বীকৃতি আশা করেন। এটা বাজসভাব পুরস্কার-প্রত্যাশা নয়,—প্রগতিশীল পাঠকের চাহিদা পূবণের কথা। মনে বাখতে হবে নর্ম্যানবা দেশী সাহিত্যের বিরোধিতা করেনি। অথবা হযত দেশী সাহিত্যেব খোঁজ নেবাব দরকাব মনে করেনি। কারণ যা-ই হোক প্রতিকূলতা বিদেশীদেব দ্বারা হযনি। বিষযের বৈচিত্র্য, প্রেবণার প্রকৃতি ইংরাজের সাহিত্যমানসকে ইউরোপেব মুখোমুখি দাঁড করিযে দিচ্ছিল। যে অনাবিল সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং কাব্যকৃতি দেশী সাহিত্যেব অনুশীলনে অনাযাসে হতে পারত সেই সৃষ্টিকর্ম বৃহত্তর এবং বিচিত্রতব সাহিত্যিক আবহাওযার আদর্শ অনুসবণ কবতে থাকল। কাজেকাজেই নর্ম্যানবিজয সাহিত্যকে নবাযিত কবল তা নয ; নর্ম্যানবিজয একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যাতে ইংরাজ মানসিকতার বৃহত্তর সন্তোষবিধান সম্ভব হল।

আবার, নর্ম্যান বিজযেব পর, মঠের ইংরাজ যাজকদের বদলে ইউবোপ থেকে আনীত যাজকরা ধর্মশাস্ত্রের চর্চাও পুরাতন ভক্তি-সাহিত্যের সীমানায বদ্ধ রাখলেন না ; তাঁরা ধর্ম সাহিত্যের ভিতব আধুনিকতাব দৃষ্টিভঙ্গী নিযে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের এক সূক্ষ্ম সূচনা করে দিলেন। স্বাধীন সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বরঞ্চ উৎসাহিত হল ; সাহিত্য নিষ্ঠাবান কুপমণ্ডুক থাকল না। পুরাতন ইতিহাস সঙ্কলন, পুরাতন পাণ্ডুলিপির অনুকরণ, গাথাকাব্যগুলি, প্রচলিত লোকসাহিত্য,—সবই বাঁচিয়ে রাখা হ'ল,—কিন্তু অন্ধসংস্কার বর্জিত উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। ইংরাজী সাহিত্য, নর্মান সাহিত্য, প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্য,—কোনটির প্রতিই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে মুক্ত সাহিত্যিক মনের আবির্ভাব ঘটল। পরোক্ষ হলেও নর্ম্যান বিজয়ের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল।

আবার 'নর্ম্যান-বিজয়'কে কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসাবে দেখাটা ঠিক নয়। মহাদেশীয় রুচি, এবং এই সব রুচি প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনের পেছনে যে সব শক্তি কাজ করেছে তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনের একটা প্রয়োজন ছিল। ধরা যাক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের কথা। দক্ষিণ ফ্রান্সের পয়টিয়ার্স

(Poitiers), মার্কাব্রু (Marcabru), ভেনটাডুব (Ventadour), মেয়ারউইল (Marcuil), বর্ণ (Born), বর্নিল (Borneil), এবং উত্তর ফ্রান্সেব বেথুন (Bethune), মুসেট (Muset), থিব (Thibaut)— এঁদের নবনারীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেম, লোকগীতি, রাখালী কবিতা, সুতাকাটা-তাঁতবোনার গান, অথবা রুটেবুফেব (Rutabeauf) লেখা কবিতায় ফেবল-জাতীয় গল্প ইত্যাদির সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবে ঘটত না, নর্ম্যান বিজয়ের পশ্চাদপট তৈরী না থাকলে। অথবা ফরাসীদের সঙ্গে রাজনৈতিক রেষারেষির সম্পর্ক থাকলে এবং তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হলে বা ছড়িয়ে পড়লে, ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য বদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত হত। আমবা এমনকি চশারের আবির্ভাব সম্পর্কেও হযত পূর্ণ আশা পোষণ করতে পারতাম না। নর্ম্যান বিজয়েব পর ইংল্যাণ্ডের রাজসভায পুরস্কার প্রত্যাশী ফরাসী গীতিকার এবং গাযকদের আমদানী হয়েছিল। কবিযশঃলাভেচ্ছু খাঁটি ইংরাজ গীতিকারেরা হযত ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন, বা পুরস্কারের ভাগ আশা করেছিলেন, এবং নতুন রীতি ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। এবং এর দ্বারাই পরে এংলো-নর্ম্যান সাহিত্যের উদ্ভব। কবি-সাহিত্যিক, এমনকি সাধারণ মানুষও অনেক ফরাসী শব্দ শিখেছিলেন। ভাষার শব্দভাণ্ডার তাতে বেড়েছিল এবং অনেক সাহিত্যকর্মেরও সুবিধা হয়েছিল। কাব্যের গঠনে সিলেবল-ভিত্তিক (syllable) লাইনের প্রবর্তন আধুনিকতা ও অগ্রগতির পরিচয়:

এইসব পরিবর্তনের দ্বারা সাহিত্য নিজেই সাহিত্যিককে পথ দেখাতে শুরু করেছিল; বা অন্য কথায, সাহিত্যিকের কাজ হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। কারুকুশলতা এবং সাহিত্যে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক দক্ষতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যেব এই নবতর রূপ পরবর্তী বড় সাহিত্যিকদের হাতে খুব কার্যকরী হয়েছিল, কারণ এর দ্বারা তাঁরা ব্যক্তিগত প্রতিভাকে ব্যাপকক্ষেত্রে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইংরাজী সাহিত্য কালক্রমে ফরাসী সাহিত্যের থেকে অধিকতর উন্নতির সুযোগ পেযে গেল। ফবাসী সাহিত্য যেখানে মুখ্যতঃ দক্ষিণ ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে গেল, ইংরাজী সাহিত্য সেখানে টিউটনিক এবং ফরাসী উভয সাহিত্যেরই সুবিধা গ্রহণ করতে পারল।

এংলো-নর্ম্যান সাহিত্য

এবং এইভাবেই শুরু হ'ল এংলো-নর্ম্যান সাহিত্য। ফরাসী অভিজাতরা ফরাসী স্তুতিবাদক কবিদের ইংল্যাণ্ডে নিয়ে এলেন। ফরাসী সভাকবিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, ফরাসী-অনুরাগী ইংরাজ কবিদের অনুসন্ধিৎসা,—দেশীয় লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি এক অভিজাত নব্য ইংরাজী স্থাপনা করল। ফরাসী কবিরা আবেগ, মরমীভাব বা গীতিকাব্যে অনুভবের গভীরতার দিকে ততটা মনোযোগ দেন নি, নীতি-দুর্নীতিও সেখানে খুব আমল পায়নি। ইংরাজী মানসিকতার সান্নিধ্যে তাতে নীতি আধ্যাত্মিকতা ও রোমান্টিকতার মিশ্রণ ঘটল। এইভাবে গড়ে উঠল ফরাসী গঠনের ইংরাজীভাবের সাহিত্য। এরই নাম এংলো-নর্ম্যান সাহিত্য।

এই এংলো-নর্ম্যান সাহিত্যেই কিছু উৎকৃষ্ট-মানের জীবনীগ্রন্থ এবং ইতিহাস লেখা

হয়েছিল। তাছাড়া ধর্মীয় ব্যাপার এবং তথ্য সরবরাহ এই সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। আনন্দ দান যে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য তা পুরাপুরি রক্ষিত হয়েছিল, এবং তা নর্ম্যান আদর্শে। রোম্যান্স জাতীয় সাহিত্যের সমাদর এই সাহিত্যের এবং এই যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই এংলো-নর্ম্যান সাহিত্য দেশীয় ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। পরবর্তী বহু শতাব্দীর পাঠকের কাছে থেকে গেল ৮০০ বছর আগেকার এক অর্ধপরিচিত সৌন্দর্যের জগৎ।

এংলো-নর্ম্যান সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারাবাহিকতা

একাদশ শতাব্দীতে সমগ্র দক্ষিণ ও উত্তর ফ্রান্সে ভ্রাম্যমান গীতিকারেরা বীরত্বের ও আত্মদানের মহিমা কীর্তন করছিলেন। তাঁদের ধারা শুরু হয়েছিল নবম শতাব্দী থেকেই। উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের বৃটানির এবং নরম্যাণ্ডির সেইসব অজ্ঞাতনামা গায়করা কিন্তু সাধারণভাবে রাজসভার প্রসাদপুষ্ট ছিলেন না। নবম শতাব্দী থেকেই তাঁদের কেউ কেউ ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন; অথবা এই চারণবৃত্তি ইংরাজ জনসাধারণের মনে ধরে। এগুলি লোকসাহিত্য। ইংরাজ চারণবৃত্তিতে বিদেশী ছাপ ছিল না। কিংবা, প্রাচীন এংলোস্যাক্সনদের যুদ্ধ ও অভিযানের গানের মত সর্বসাধারণের জীবনের বিশিষ্ট ভঙ্গী হিসাবেও এগুলি প্রচলিত হয়নি। কিন্তু এগুলির জনপ্রিয়তা ছিল। আবার, আর একদিকে এ যুগের বিশাল গথিক ক্যাথিড্রালগুলির স্থাপত্য খৃষ্টধর্মের প্রকাণ্ড ও সুউচ্চ মহিমা কীর্তনের উপযুক্ত হয়েছিল। ধর্মীয় স্তোত্রই হোক আর লোকসঙ্গীতই হোক সবই ছিল হয় ঈশ্বরের বিশাল মহিমার অথবা মানুষের সাহসী কার্যকলাপের মুগ্ধ গুণগান।

নর্ম্যানরা ফ্রান্সের তথা আধুনিক ইউরোপের রীতিনীতি, মনোভাব, প্রকাশভঙ্গী, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের নতুন সংগঠন এবং উন্মেষের প্রবণতা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসছিল। ইউরোপে নরম্যাণ্ডির ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে দক্ষিণ ফ্রান্সের নানা শিল্পে ও বিদ্যায় উৎকর্ষপ্রাপ্ত প্রভাব তারা ভোগ করেছিল; অথচ অধিবাসীরা সুদূর উত্তর ইউরোপের কঠিন-রুক্ষ-পরুষ প্রকৃতি তাদের রক্তে অনুভব করত। কাজে কাজেই নর্ম্যানরা যেন ছিল আধুনিকতায় সমৃদ্ধ সুসংস্কৃত টিউটন। ইংরাজদের সঙ্গে প্রকৃতিগতভাবে তাদের অমিল ছিল না। শুধু উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হিসাবে একধরনের অহঙ্কার কিছুদিন তাদের ইংরাজদের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। যত দিন যেতে লাগল ততই তারা ইংরাজদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ বেশী বেশী করে অনুভব করতে লাগল, এবং বৃটন-স্যাক্সন-ড্যানিসদের মিশ্র জাতিতে তারাও অবশেষে আত্মদান করলে। ধীরে ধীরে এই নর্ম্যানরা লিখিত সাহিত্যে ইংরাজীকে অবলম্বন করলে, যদিও কথাবার্তায় নিজেদের ভিতরে তারা ফরাসী (বা নর্ম্যান) রয়ে গেল। ইংরাজরাও অনেক ফরাসী শব্দ কথ্য ভাষায় গ্রহণ করলে, এবং লিখিত সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করার জন্য অনেক ফরাসী উপায় এবং উপাদান আত্মসাৎ করলে। ফরাসীরা (নর্ম্যানরা) এংলোস্যাক্সন সাহিত্য অপ্রচলিত করেনি; ইংরাজরা নিজেরাই তাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃতি অনুসরণ করতে অক্ষম হল। তারা যেন স্বেচ্ছায় ফরাসী ভাষাকে তুলনামূলক শ্রেষ্টত্ব দিলে। বিচ্ছিন্নভাবে ফরাসী অনেক

শব্দও তারা সামান্য উচ্চারণের তফাৎ করে নিয়ে প্রয়োজনমত গ্রহণ করলে। শব্দরূপের নতুন 'রীতিস্থাপনা' এবং অন্ত্যস্বরবর্ণের লালিত্য সংযোগের দ্বারা পরপর শব্দগুলির অর্থবহ যোগাযোগ ঘটান ইত্যাদির ব্যবহারিক প্রয়োগ ফরাসী শব্দগুলির সঙ্গে অধিকতর পরিচয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হ'ল। কাব্যে অনুপ্রাসের কঠোরতা শিথিল হ'ল। পয়ার ছন্দের আবির্ভাব প্রায়শঃ লক্ষণীয় হয়ে উঠল। সাহিত্যিক শব্দ ব্যবহারিক শব্দের পার্থক্য ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকল।

কবিদের মধ্যে যাঁরা পৃষ্ঠপোষকের মনোরঞ্জনের জন্য গান বাঁধতে লাগলেন তাঁদের স্থান সকলের সঙ্গে একাসনে আর থাকল না। তাঁরা হলেন 'অনুগ্রহভাজন'।

চার্চের গুরুত্ব কোন সময়েই হ্রাস পায়নি। 'পরলোকে উর্দ্ধগতি'র মানসিকতা ভাল রকমই বজায় ছিল। পাপীর নরকবাস, পুণ্যাত্মা ও অনুতপ্তের মুক্তি,—এসব ব্যাপারও ছিল। ধর্মীয় সাহিত্য সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল ; কিন্তু বিশ্বাসের সৌন্দর্য ছিল অমলিন।

নীতিবোধ যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছিল। এই নীতিবোধ চার্চের যাজকদেরও দুর্নীতির সমালোচনা থেকে রেহাই দেয়নি। উৎফুল্ল আনন্দসজ্ঞা জ্ঞান মানুষের সহজ পাপপুণ্যের বোধকে জীবন ও শিল্প থেকে বাদ দেয়নি। গিনিভিয়ের ও ল্যান্সলটের পাপ কবির দুঃখবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত হলেও তা' গান্ধারীর দৃঢ়তায় সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের বস্তু হয়েছিল।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। মধ্যযুগের সাহিত্য—প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত—ততটা পড়ার বস্তু ছিল না, যতটা ছিল শোনার বস্তু। বই পড়ার মত শিক্ষা যাজকদের ছিল ; অ-যাজক অভিজাত বা সাধারণ কারোরই তেমন ছিল না। গান 'গাওয়া' হত, কবিতা 'পড়া' হত। সাহিত্য ছিল কালক্ষেপের উপায়। মানুষের মনঃসংযোগের সবটা তার দখলে ছিল না। গদ্যসাহিত্য শিক্ষার ব্যাপকতার উপর নির্ভর করে। তাই সাহিত্য ছিল শ্রুতি ; এবং পদ্যই তার উপযুক্ত বাহন। গদ্যসাহিত্য এ যুগে সমৃদ্ধ হয়নি। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে সাহিত্যের প্রয়োজন ছিল সাময়িক ; এবং অভিজাতরা সাহিত্যকে গুরুত্ব দেননি। তবু সাহিত্যের স্রোত অনাবিল ছিল। এর কারণ সাহিত্য সেই সব জনপ্রিয় বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল যেগুলিকে স্মরণ করে বা অনুভব ক'রে মানুষ সুখে হাসতে চাইত, দুঃখে কাঁদতে চাইত। মানুষের সেই বস্তু-অতিক্রমী জীবনবোধ সাহিত্যকে ধরে রেখেছিল।

কিন্তু ইংরাজী ভাষার প্রাণপ্রাচুর্য ও বলিষ্ঠতা সুললিত ফরাসীভাষার থেকে বেশী ছিল। কাজেই ফরাসী সংস্কৃতি গ্রহণ করা না করা ইংরাজদের ওপরই নির্ভর করেছিল।

সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎস থেকে আগত ফরাসী এবং ইংরাজ—দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চস্তরের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই কিছু কিছু শুরু হয়েছিল। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে সামগ্রিকভাবে ফরাসী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলল, এবং ইংরাজী সাহিত্যের বিদেশী সাহিত্যকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করবার অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা ফরাসী উপাদানপুষ্ট নতুন এক ইংরাজী সাহিত্য সৃষ্টি হল।

এ সব উপাদানের ভিতরে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ক্লাসিক স্থূল বস্তুতান্ত্রিক ভালবাসার

বদলে সূক্ষ্ম মনোবিকলন। বীরত্ব এক পেলব মহত্ত্বের দ্বারা এবং আদর্শের অনুসরণে প্রভাবিত হল। পোপের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি এল স্বদেশ সম্পর্কিত নতুন এক বোধ। এমনকি প্রকৃতিও এই নতুন বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হল ; এবং মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক একই উপাদানের গঠন থেকে পৃথক বিচিত্র ও স্বতন্ত্রসত্বার ভিন্ন ভিন্ন মানুষ দেখা যেতে লাগল।

গণসাহিত্য সাহিত্যিকের সাহিত্যে পরিণত হতে চলল। সাহিত্যিক একটা শ্রেণী তৈরী হবার সময় এসে গেলে। এঁরা খৃষ্টান যাজক নন, যোদ্ধা বা অভিযানকারী নন, ভ্রাম্যমান স্বভাবকবি বা স্তুতিবাদক গীতিকার নন। রাজানুগ্রহ এঁদের প্রয়োজন থাকলেও তা বাতিলের অযোগ্য হল না। গণতান্ত্রিকতা আদর্শের ভিতর বেঁচে রইল, কিন্তু তা গণবোধে আর সঞ্চারিত হল না। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ অবদান আত্মত্যাগের এক আশ্চর্য জীবনবোধ যা দৈনন্দিন সাধারণ্যের উর্ধে এক অতীন্দ্রিয় রহস্যে সম্পৃক্ত।

মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রভাবসঞ্চারী বিভিন্ন শক্তি

খৃষ্টীয় প্রভাব ঃ ইউরোপে মধ্যযুগের প্রায় শেষ পর্যায়ের সমসাময়িক ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যযুগ। ১০৯৫ সালে ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ সুরু হয়। ইউরোপের খৃষ্টান রাজাপ্রজা অনেকেই এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এই ক্রুশেডই মধ্যযুগের সমাপ্তির শেষ বড় ধাপ। এই ক্রুশেডের মধ্য দিয়েই প্রাচ্য জগতের সঙ্গে ইউরোপের বিস্ময়জনক পরিচয়। ক্রুশেড মানুষের মনে যে আবেগ এনে দিয়েছিল তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চার্চের হাতে থাকাই স্বাভাবিক। যদিও অভিযান ও উন্মাদনায় চার্চের ভূমিকা তেমন কিছু ছিল না, তবুও ল্যাটিন প্রভাবিত যাজকদের হাতে তৈরী সাহিত্য খৃষ্টান উপাদানের উপরই নির্ভরশীল ছিল। এই খৃষ্টান চরিত্রের সাহিত্যে আবেগপ্রবণ অতীন্দ্রিয়তা এবং মার্জিত অলংকরণের প্রাধান্য ছিল। এ্যানক্রেন রিয়ল (Ancren Riwle) এবং 'অরিসন'-র (The Orison of our Lady) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া খৃষ্টান নির্দেশিকা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল 'পেচক ও নাইটিঙ্গেল' (The Owl and the Nightingale)। এগুলি অন্ধসংস্কার সমন্বিত প্রচলিত খৃষ্টধর্মের সাহিত্যিক ফল।

এ্যারিষ্টটলীয় জ্ঞানচর্চা ঃ মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ্যারিষ্টটলীয় ধারণা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে যে বিদ্যাচর্চা করে আসছিল তা যে সম্ভ্রমের উদ্রেক করত, তাকে কেউ কখনও উপযুক্ত মর্যাদা দানে বঞ্চিত করেনি।

প্লেটোনিক মানসিকতার অস্তিত্ব ঃ 'নাইট' সুলভ নৈতিক ও সামাজিক আচার পদ্ধতি এই প্লেটোনিক মানসিকতার ফল। কৃতিত্বের মুগ্ধ স্বীকৃতি এবং অভিজাত সমাজের আনুষ্ঠানিক ভালবাসাতেও এই মানসিকতার প্রকাশ। নারীসত্ত্বায় আপাত-অতিক্রমী (Transcendental) সৌন্দর্য অন্বেষণ এই মানসিকতার সৃজনশীল দিক।

রোম্যান-ক্যাথলিক আন্তর্জাতিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদের অস্বীকৃতি ঃ পরবর্তীকালে রেনেসাঁসের প্রভাব এই ধর্মীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রেনেসাঁসের ফল হয়েছিল মুক্তি, চিন্তা ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতার বোধ, আর ক্যাথলিক আন্তর্জাতিকতা ছিল স্থানু বিশ্বাস ও বুদ্ধিবর্জিত ত্যাগের বোধ।

সামন্ততন্ত্র ঃ সামন্ততন্ত্রকে ধরা হয়েছিল খৃষ্টান সমাজের আদর্শ রূপ বলে। যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা থাকে, তবে সামন্ত-প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা থাকবে।

আরবীয় অতীন্দ্রিয়তা ঃ ক্রুশেডে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে, এবং স্পেনে মূর আধিপত্যের কারণে এই অতীন্দ্রিয়তা। এই চরিত্র নানা হাত ঘুরে ইংরাজী সাহিত্যের উপরও কিছু প্রভাব ফেলেছিল।

কেল্টপ্রভাব ঃ উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সের বৃটানি এবং বৃটেনের ওয়েলস-এর অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসগুলি মধ্যযুগে খুব কার্যকরী ছিল।

পুরাতন দেশীয় ঐতিহ্য ঃ নরম্যান সংস্কৃতির যুগে ওরমুলাম (Ormulum) উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। যাজক ওরম(Orm) লিখিত এই কাব্যটি মধ্যযুগীয় ফরাসী প্রভাব বর্জিত।

উপরোক্ত প্রভাবগুলির অনুবর্তী হ'য়ে মধ্যযুগের সাহিত্যের কতকগুলি লক্ষণ স্পষ্ট হয়। প্রাচীনকাল থেকে দেশে দেশে যে গণসাহিত্য সৃষ্টি হযে আসছিল তাতে নামযশের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে কাব্যসৃষ্টির আনন্দই বড ছিল। আবার পাণ্ডুলিপির ক্রমাগত বিভিন্ন অনুকরণের ফলে মূল রচনা কিছু কিছু পালটে যাচ্ছিল। এটা এমন বড ব্যাপার নয়। কারণ আমরা ব্যক্তির চেযে কাব্যের সঙ্গে বেশী যুক্ত। কিন্তু এই ক্রমাগত হাত ফেরার দরুণ বিভিন্ন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের মনোমত বিভিন্ন প্রভাববিস্তারকারী উপাদান কোন কোন ক্ষেত্রে মূলগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছিল। নামী লেখাগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাচীনতা এবং অজানা মূলস্রষ্টার গুরুত্ব নষ্ট হয়নি। কিন্তু বহু সাধারণ স্তরের জনপ্রিয় লেখার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন প্রাযই হত। অনুকরণকারী লিপিকারের উপরে তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন বড বড প্রভাবসঞ্চারী শক্তি কাজ করেছিল। উপাদানের মৌলিকতার তত প্রয়োজন ছিল না ; কাব্যকে জনসাধারণের কাছে মনোগ্রাহী করে তোলাটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। এই মনোগ্রাহীকরণের পদ্ধতিতে লেখক এবং অনুলিপিকার নিজস্ব ধরণের ব্যাপক ও শক্তিশালী প্রভাবের অধীনে কাজ করতেন। এমন কি, লেখকের বা কবির জনপ্রিযতা নির্ভর করত কোন শক্তিশালী প্রভাবের অধীনে তিনি কাজ করেছেন, এবং কোন প্রাচীন বহুস্বীকৃত বিষয়বস্তুকে তিনি ব্যবহার করেছেন, তার উপরে। এর ফলে, ভাষান্তরিত সাহিত্য মূল সৃষ্টির মতই মর্যাদা পেত। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে মধ্যযুগের শেষ দিকের বিভিন্ন কাব্য-নিদর্শন অনুবাদকের ছোট ভূমিকায নিজেকে বদ্ধ রাখেনি, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রেই অনুবাদ হযে উঠেছিল মূল সৃষ্টির মত গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেই কারণে ভাষান্তরিত কোন সাহিত্যবস্তু সেই ভাষার পটভূমিকাতেই বিচার্য হওয়া উচিত ; অন্য ভাষায় তার উৎস আবিষ্কারের দ্বারা তার গুরুত্ব খাটো করা উচিত নয়।

একই বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের নানা সাহিত্যকর্মের যুক্তিসঙ্গত স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী ছিল, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'।

আবার কথ্য সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান স্ত্রীলোক শ্রোতা কবিকে বীরযোদ্ধার মানসিকতার দিকে এগিয়ে দিত, যার ফলস্বরূপ 'নাইটদের' সৃষ্টি করা হয়েছিল বা তাদের বীরত্বের কাজের প্রচার করা হয়েছিল। নাইটদের সম্পর্কিত গাথা কাহিনী এবং গল্প যেন কবিদের অপূর্ণ আশার রঙ্গীন রোম্যান্টিক বিহ্বলতা।

[গ্রন্থের এই খণ্ডে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে বিশিষ্ট অল্প কয়েকটির সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে কিছু জানা দরকার। আমি সেগুলিকে মধ্যযুগের প্রথমাংশের সাহিত্য বলছি। শেষাংশের অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পরবর্তী খণ্ড "প্রাক আধুনিক" যুগের মধ্যে রাখছি। অর্থাৎ পরবর্তী খণ্ডটি হবে মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের সূচনা—এই উভয়ের সম্মিলিত প্রকাশ]

মধ্যযুগের (প্রথমাংশের) সাহিত্যের ডালি

অল্প কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম ঃ

(ক) ইংরাজদের দ্বারা ল্যাটিন ভাষায় লেখা গ্রন্থ ঃ

★ বৃটেনের রাজাদের ইতিহাস (Historia Regnum Britanae। লেখক মনমাউথের জিওফ্রে (Geoffry of Monmouth)।

★ ব্রুট (Brut)। লেখক ওয়েস (Wace)। এটি নর্ম্যান-ফরাসী ভাষায় লেখা।

(খ) ধর্মীয় কাব্য ঃ

★ নীতি উপদেশ (Poema Morale)।

★ ওরমুলাম (Ormulum); লেখক ওরম (Orm)।

★ পাপসম্পর্কিত গ্রন্থ (Handlying Synne); লেখক ব্রুন্নের রবার্ট মন্নিঙ্গ (Robert Monnyng of Brurae)।

★ কার্সার মাণ্ডি (Cursor Mundi)

★ বিবেকের দংশন (Pricks of Conscience)।

(গ) ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য ঃ

★ ব্রুট (Brut) ঃ লেখক লেয়ামন (Layamon)

★ পেচক ও নাইটিঙ্গেল (The Owl and the Nightingale)

(ঘ) রোম্যান্স (Romance) ঃ

★ রাজা হর্ন (King Horn)

★ ফ্লরিস এবং ব্ল্যাচিফ্লুর (Floris and Blanchi-Fleur)

★ হ্যাভলক দি ডেন (Havlok the Dane)

★ স্যার বেভিস অব হ্যাম্পটন (Sir Bevis of Hampton)

★ গাই অব ওয়ারউইক (Guy of Warwick)

★ জোশেফ অব এ্যারিম্যাথি (Joseph of Arithmathie)

★ উইলিয়ম এবং ওয়েরউলফ (William of Palarne or William and the Werwolf)

★ গয়েন এ্যাণ্ড দি গ্রীণ নাইট (Gawaine and the Green Knight)

★ ইয়েন এবং গয়েন (Ywain and Gawaine) এবং অবশ্যই রাজা আর্থার সম্পর্কিত আরও কতকগুলি সংশ্লিষ্ট রোম্যান্স।

(ঙ) ব্যালাড (Ballad) ঃ

- ★ জুডাস (Judas)
- ★ স্যার অরফিও (Sir Orfeo)

(চ) গদ্যগ্রন্থ ঃ

- ★ এ্যানক্রেন রিয়লে (Ancren Riwle)
- ★ আজেনবিট অব ইনউইট (Azenbyt of Inwyt)

(ছ) বিবিধ ঃ

- ★ বেষ্টিয়ারি (Bestiaries)
- ★ শিয়াল এবং নেকড়ে (Vox and the Wolf)

এছাড়া, মধ্যযুগেই নাটকের সূত্রপাত। ১৩১১ সাল থেকেই Corpus Christi (কর্পাস ক্রিষ্টি) নামক রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে অভিনয় শিল্পের অঙ্কুরও আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই অক্সফোর্ড এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কেম্ব্রিজ ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বাইবেলের আনুষ্ঠানিক অনুবাদ চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে হয়নি। তবে নানা ধর্মীয় গ্রন্থে বাইবেলের উৎস (ল্যাটিন) থেকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে বা অংশবিশেষ অনুবাদও করা হয়েছে।

উপরে যে সব বই-এর নাম করা হল সেগুলিই সব নয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নামী কয়েকটি বই-এর উল্লেখ করলাম মাত্র। এই বইগুলি ও বিষয়গুলির অল্পবিস্তর আলোচনার দরকার।

মধ্যযুগের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পৃথক পৃথক আলোচনা

ইংরাজদের দ্বারা লিখিত ইতিহাস-আশ্রিত ল্যাটিন সাহিত্য অথবা নর্ম্যান-ফরাসী সাহিত্য কর্ম

বৃটেনের রাজাদের ইতিহাস (Historia Regnum Britanae) ঃ একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যখন নর্ম্যান আধিপত্য ও নর্ম্যান রাজকীয় ক্ষমতা তুঙ্গে তখন ইংরাজরাও নিজেদের প্রাচীনতা ও ঐতিহ্যের সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়েছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু মানসিকতার সন্তোষের জন্য সত্য এবং কল্পনার একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্য লেখার বিষয় হিসাবে দরকার হয়েছিল। কিন্তু ল্যাটিনে লেখা না হলে এ জাতীয় লেখার ভার এবং গুরুত্ব তখনকার কালে স্বীকৃত হত না। এ জাতীয় লেখার জন্য দেশের জন্য গর্ববোধের একটা ভূমিকা ছিল। হয়ত তদানীন্তন নর্ম্যান রাজশক্তি ও আকর্ষণীয় সংস্কৃতির জবাবে বৃটিশ ঐতিহ্যও কিছু কম গৌরবের নয়, এরকম একটা কিছু দেখানোর আগ্রহ শিক্ষিত বৃটন এবং ইংরাজের মনে ছিল। কিন্তু মঠের যাজকদের বাইরে বিদ্বান-পণ্ডিত তো তেমন কেউ ছিলেন না। তাই ওয়েলস-এর

অর্ন্তবর্তী মনমাউথেব মঠের যাজক জিওফ্রে (Geoffrey) ল্যাটিন ভাষাতে একটি ইতিহাস সঙ্কলন করলেন। এরই নাম 'বৃটেনের ইতিহাস' বা Historia Regnum Britanae। ১১৩৬ সালে বা তার কিছু পরে এটি লেখা হয়। ওযেলস এর বৃটনদের আহত অভিমানের এক অতি গুরুত্বপুর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। এর ঐতিহাসিক মূল্য প্রায কিছুই নেই। সাহিত্যিক সৌষ্ঠবও উল্লেখযোগ্য নয। কিন্তু বহু সুন্দর গ্রন্থের উৎস ও প্রেরণা হিসাবে এটির গুরুত্ব অসামান্য। বিশেষ করে, ইংরাজী বোম্যান্সের মূলসূত্র এখানেই পাওয়া যায়।

এই ল্যাটিন সঙ্কলনখানির গল্পসমগ্র কর্ণওয়াল, ওযেলস, আর্য়াল্যাণ্ডের বিশেষ করে বিভিন্ন কেল্টিক কাহিনীর সুগ্রথিত সমাবেশ। ল্যাটিনে লেখা হলেও অনেকে একে বৃটিশ জাতীয় মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে চান।

কাব্যের আধারে এই আধা কল্পনা, আধা ইতিহাসেব গ্রন্থে ইলিযাড মহাকাব্যের ইনিযাস (Aeneas) এব প্রপৌত্র ব্রুটাস-কে (Brutus) বৃটনদের আদিপুরুষ বলে দেখান হযেছে। সেই ব্রুটাস নাকি লণ্ডন শহর পত্তন কবেছিলেন, যাব নাম তখন দেওযা হযেছিল নব-ট্রয (Troy novant)। সত্যমিথ্যা যা ই হোক, একটা পরাজিত, অবহেলিত জাতিকে (বৃটন) সুপ্রাচীন গৌরবের ভিত্তিতে স্থাপন করাব এক আন্তরিক এবং উদগ্রীব বাসনা এই কাহিনী সৃষ্টি এবং প্রচাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রযেছে। সাহিত্যেব ইতিহাস শুধু পুঁথিপত্রেব ইতিহাস নয, মানবমনেব আশা-আকাঙ্ক্ষাব ইতিহাস।

জিওফ্রের এই ইতিহাসে 'ব্রুটাস' থেকে সুরু করে ক্যাডওযালাডিযা (Cadwalladea) পর্যন্ত রাজাদের ইতিহাস দেখান হযেছে। উক্ত ক্যাডওযালাডিযাকে বলা হযেছে ইংল্যাণ্ডের শেষ বৃটিশ রাজা। জিওফ্রের সত্য অথবা কল্পিত ইতিহাস ৬৩৫ সালেব কাথায শেষ হযেছে।

জিওফ্রের কাব্য-ইতিহাস শুধু বৃটনদেব জাতীয আকাঙ্ক্ষাপূরণেব উপায নয, বিজেতা এংলোস্যাক্সন এবং বিজেতাব বিজেতা নর্ম্যানদের কাছেও কৌতূহলের বিষয হয়েছিল। এবং কৌতূহল ও স্বীকৃতি বৃটন-স্যাক্সন নর্ম্যানদের সম্মিলিত মহাজাতিগঠনের স্থায়ী অভিলাষের প্রমাণ।

এই গ্রন্থখানির বিভিন্ন অংশ ১১০০ সাল থেকে ১১৫৪ সালেব ভিতর সংগ্রহ করা হয়েছিল। অনেকের মতে লেখা সম্পূর্ণ হযেছিল ১১৩৬ সালে।

রোম্যান ডি ব্রুট—এটি নর্ম্যান-ফরাসী ভাষায লেখা। আনুমানিক ১১০০ সাল থেকে ১১৭৪ সালের মধ্যে লেখা। লেখকের নাম ওয়েস (Wace)।

জিওফ্রে মনমাউথের 'বৃটনের রাজাদের ইতিহাস'কে কেবলমাত্র রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন বিভার্লির আলফ্রেড (Alfred of Beverley); আর দুজন নর্ম্যান অন্বেষী (truveres)—গাইমার (Gaimar) এবং ওয়েস (Wace) তাকে ফরাসী কবিতায় অনুবাদ করলেন। তাঁদের কবিতার আখ্যান এত সার্থকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল যে রাজা দ্বিতীয় হেনরী গ্ল্যাষ্টনবেরীতে (Glastonbury) আর্থারের সমাধিক্ষেত্র—সত্য অথবা কাল্পনিক—পরিদর্শন করে আসেন। দ্বিতীয় হেনরী নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন জিওফ্রে (Geoffry) এবং নাতির নাম রেখেছিলেন আর্থার।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি 'মিউনিক পাণ্ডুলিপি' বলে পরিচিত। নর্ম্যান-ফরাসী কাব্য-ইতিহাস 'ব্রুট' বৃটনদের গৌরবগাথা।

ধর্মীয় কাব্য

এরপরে আমরা আসতে পারি ধর্মীয় কাব্যের আলোচনায়।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দরিদ্র, অশিক্ষিত ও গ্রাম্য ইংরাজেরা যেমন রাজশক্তির পালাবদলে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল তেমনি খাঁটি ইংরাজী ভাষাও ক্ষমতাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজে করুণার বিষয় ছিল। তখনও দখলকারী নর্ম্যানদের সমাজে এই ধারণা প্রচলিত হয়নি যে তাদের ভবিষ্যত এই দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা হয়ে গেছে। রাজসভার ভাষা এবং দেশীয় মানুষের পুরুষানুক্রমিক ভাষার দূরত্ব ছিল স্পষ্ট, যেমন ছিল দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক দূরত্ব। ইংরাজদের ভিতর কিছু কিছু জমিদার আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন বটে তবে সাধারণ স্যাক্সনরা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীতদাসের মত গণিত হত। এ অবস্থায় সাধারণভাবে যা হয়ে থাকে-

"দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে।... ..."

তবে স্যাক্সনরা মরেনি। অনন্ত দুঃখের অন্ধকারে দূরাগত ক্ষীণ বংশী ধ্বনির মত দু চার জন দেশীয় কবি গভীর ধর্ম বিশ্বাসের পলকা সুতোটাকে ধরে রেখেছিলেন। তাতে শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি হয়নি। তবে এই অবস্থায় সাহিত্যের যে মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখা সম্ভব- -মানুষের চিত্তবৃত্তিকে কিছু একটা অবলম্বন দান তা করা গিয়েছিল। এই ধর্মীয় কাব্যের কাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত। প্রথম দিকে এই কাব্যে আন্তরিকতা ছাড়া অন্য কোন উৎকর্ষ ছিল না, তবে তখন তা খাঁটি ইংরাজী ছিল।

নীতি উপদেশ (Poema Morale বা Moral Ode)

এই রকম একটি কাব্যগ্রন্থ। এতে এংলোস্যাক্সন কাব্যের একটানা উদাত্ত আকর্ষণ নেই, তবে গাথা সঙ্গীতের উপযোগী ছন্দচাতুর্য আছে [আইঅ্যামবিক হেপ্টামিটার]। ৪০০ লাইনের মত কবিতা। এই কবিতাটি সম্ভবতঃ ইংরাজী সপ্তমাত্রিক (septenary) ছন্দের অদ্যাপি বিদ্যমান প্রাচীনতম উদাহরণ।

কাব্যে কোন মৌলিকতা নেই, তবে বক্তব্যের দৃঢ়তা আছে। আমার মতে এর গুরুত্ব খাটি ইংরাজী কবিতায় পূর্বাপর যোগসূত্র হিসাবে। এ কবিতাটির পাঠের উপযুক্ততা থেকে শোনার উপযুক্ততা বেশী।

ভাষা ল্যাটিনের অনুকরণ নয়, তবে সুরধ্বনি সৃষ্টিতে ল্যাটিনের ছাপ আছে।

এই কবিতায় কবি তাঁর দীর্ঘজীবন পর্যালোচনা করেছেন, অনুশোচনার সঙ্গে নিজের ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করেছেন, এবং ধর্মপ্রাণ, পবিত্র জীবনযাপনের সুপারিশ করেছেন। মরজীবনের পবিত্র সুযোগগুলি নষ্ট করার জন্য দুঃখ করেছেন, 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' এর ছবি এঁকেছেন, এবং স্বর্গের চির-আনন্দ বর্ণনা করেছেন। পাপের ভাগ কেউ নেবে না, এ সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন।

শব্দচয়ণ ও কাব্য চাতুর্যে কোন বিশেষত্ব নেই। তা সত্ত্বেও এর প্রাঞ্জলতা লক্ষ্যনীয়, এবং সাধারণ যে সব মানুষদের উদ্দেশ্যে এটি লেখা তাদের কাছে এটি পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

অন্ত্যমিলে সন্ধ্যস্বর ব্যবহারের অন্যতম প্রাচীন উদহারণ এই কবিতাটি। এটি দক্ষিণী আঞ্চলিক (পশ্চিম স্যাক্সনীয় এবং কেন্টিয়) ভাষায় লেখা। ১১৫০ সাল থেকে ১১৭০ সালের মধ্যে কবিতাটি লেখা হয়েছিল বলে ধরা হয়।

এর পরে উল্লেখযোগ্য আনুমানিক ১২০০ সালে ওরম (Orm) অথবা ওরমিন (Ormin) এর রচিত

ওরমুলাম (Ormulum)

ওরম ছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকের সন্ত অগাষ্টাইনের অনুবর্তী উত্তর লিঙ্কনস-এর এলসাম প্রায়রি (Elsham Priory) মঠের ধর্মসংগঠনের বিধিবদ্ধ নিযমকানুনের অনুগামী সদস্য বা ক্যানন রেগুলার (Canon Regular)।

কাব্যটি পূর্ব এ্যাঙ্গলিযার অথবা প্রাচীন মার্শিয়ার পূর্বাংশের আঞ্চলিক ভাষায রচিত। এতে নর্ম্যান-ফরাসী শব্দসংখ্যা খুবই কম। এটি একটি অসম্পূর্ণ কবিতা। ১৯৯৯২ এর মত লাইন আছে এবং ৬৭টি ভগ্ন লাইন আছে। ব্যাখ্যা সমন্বিত ধর্মোপদেশ (Homily) আছে ৩২টি; ১০২ লাইনের ভূমিকা আছে; ২৪২টি Homily-র তালিকা আছে; ৩৩২ লাইনের উৎসর্গপত্র আছে। রোম্যান ক্যাথলিক রীতি অনুযায়ী প্রস্তুত প্রতিটি ধর্মোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ আছে; এবং তার উপস্থাপনের ও প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলা আছে। এই প্রকাণ্ড পুস্তকখানি লেখকের পরিশ্রম ও প্রবল উৎসাহের প্রকৃষ্ট প্রমান। এর বৃহদায়তনের আরও কাবণ, লেখকের উদ্দেশ্য এই যে কোন কিছুই যেন পাঠকেব কাছে অজানা না থাকে এবং উপযুক্ত পটভূমির অস্তিত্ব ছাড়াই কোন কিছু যেন উপস্থাপিত না হয়। আর, পুনরাবৃত্তি না করেই সবটাই যেন বলা হয়। ধর্মপ্রতিষ্ঠান সমর্থিত নীতির বা "ধর্মসংগঠনের দ্বারা কথিত সত্যের" যথাযথ অনুসরণ বা কবির পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বলার কিছু নেই; তবে সেই নীতির সঠিকতা বজায় রাখবার ব্যাপারে অনমনীয়তা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থটির সাহিত্য হিসাবে সার্থকতার অন্তরায়।

প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের এই লেখাটিতে শুধু পদ্যের কাঠামোর ধরণ ছাড়া আর তেমন কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না।

এই লেখাটি অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরীর 'জুনিয়াস ওয়ান' (Junius 1) পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে।

এই কাব্যগ্রন্থটিও বরাবর সপ্তমাত্রিক ছন্দে লেখা, তবে অন্ত্যমিলবর্জিত। অন্ত্যমিল নেই; ছন্দের একঘেয়েমি আছে; বানানে জটিলতা আছে। স্বরসঙ্ঘাতের কোথাও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। তবে রচনাশৈলীর নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। পাঠকের মনের উপর প্রভাব পড়া-না পড়া নিয়ে কবির কোন প্রত্যাশা বোঝা যায় না।

এই কবিতায় কবি যেন তাঁর অধীত কোন বিষয় বা অংশকেই বাদ দিতে চান না,—এই

রকম মনোভাব বোঝা যায় ; অথচ রক্ষণশীল মনোভাব থেকে কখনই বিচ্যুত নন। রোমক ভাষাসমূহের থেকে আহৃত শব্দের সংখ্যা অনেক। অতীতের আস্বাদনই যেন কবির কাম্য। যেখানে সাহিত্য তাঁর সমসাময়িক কালে নতুন অবয়ব ও নতুন ভাবের সন্ধানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

এই পাণ্ডুলিপিটির মূল গুরুত্ব অবশ্য তৎকালে প্রচলিত শব্দেব সঠিক বানানের ব্যাপারে। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি কবির নিজের হাতেই লেখা। হ্রস্বস্বরের পরবর্তী প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বকরণের যে প্রক্রিয়া তিনি অনুসরণ করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে বইটি সহজে পডার সুবিধা করে দেওয়া। ভাষার বিবর্তনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগে স্বরবর্ণের উচ্চারণের দৈর্ঘ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সঠিকতা যাচাই করার পক্ষে তাঁর বর্ণসজ্জা আমাদের পক্ষে খুবই সহায়ক।

সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে বা সমকালীন মানুষের মানসিক অবস্থা ও প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করার ব্যাপারে 'ওরমুলাম' যতটা না সার্থক, ভাষার বিবর্তনের একটা পর্যায়ের পরিচায়ক হিসাবে তার থেকে বেশী সার্থক।

এর পরে যে গ্রন্থটির সম্বন্ধে দু'চার কথা বলার আছে সেটি হল, **''পাপসম্পর্কিত গ্রন্থ''** (Handlyng Synne)

এর লেখক হচ্ছেন 'ব্রুন্নে'র রবার্ট মন্নিং (Robert Monnyng of Brunne)। তিনি লিঙ্কনসায়ারের লোক। সেমপ্রিংহ্যাম (Sempringham) এবং সিক্সহিল (Sixhill) মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লেখাটি সুরু হয় ১৩০৩ সালে। এটি উইলিয়ম অব অডিংটন বা অডিংটনের উইলিয়ম-এর লিখিত ম্যানুয়েল ডি পোকিয়েজ (Manual de Pechiez)-এব উপর ভিত্তি করে রচিত। চার-স্বরাঘাত বিশিষ্ট লাইনে শ্লোকের আকারে ১২৬৩০ লাইনের কবিতা। মানুষকে পাপ সম্পর্কে অবহিত করান এবং পাপ থেকে মুক্তির পথ দেখান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনের সম্বন্ধে ধারণা করার ক্ষেত্রে বইটি খুবই সহায়ক। প্রয়োজনীয় বহু ঘটনা ইত্যাদির তারিখ এই বইয়ে নানা উল্লেখ থেকে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে পাপ কাজ এবং পাপীর অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল ; কিন্তু পাপ সম্পর্কে চিন্তা এবং অনুশোচনাও কম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্রুন্নের চেষ্টা ছিল যেন পাপী ব্যক্তিরা (laewede men) মদের দোকানের আকর্ষণ কাটিয়ে পাপ স্বীকারের এবং অনুতাপের আবহাওয়ায় উঠে আসে। তিনি কৌতুকের মোড়কে সৎপরামর্শদানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচনাশৈলী শিথিল ; কথোপকথনের উপযোগী। তা' যাজক-সুলভ গম্ভীর নির্দেশমাত্র ছিল না। সরল বিশ্বাস, উদার সহানুভূতি এবং মানুষের দুর্বলতার ব্যাপারে আন্তরিকতা ও আগ্রহ তাঁর কাব্যকে এক বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছে।

বক্তব্য বিশেষ ধরণের নীতিমূলক হ'লেও গল্প বলার কৌশল মন্নিং সার্থকভাবে আয়ত্ব করেছিলেন।

গ্রন্থটিকে আবার একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সেটি হচ্ছে মারাত্মক পাপসম্পর্কিত মধ্যযুগীয় বা ঠিক তার পরের যুগের এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য। চশারের 'পার্সন-এর

গল্প' (Parson's Tale), গাওয়ার (Gower)-এর কনফেসিও আমানটিস (Confessio Amantis), 'মর‍্যালিটি' নাটক (Morality Plays),—ইত্যাদিও এই শ্রেণীভুক্ত সাহিত্যের নিদর্শন। প্রসঙ্গতঃ মন্নিং স্ত্রীজাতিকে পুরুষের পাপের জন্য দায়ী করেছেন।

বইটির সামাজিক মূল্য অনস্বীকার্য। 'ল্যাংল্যাণ্ড'-এর মত সমাজসংস্কারের প্রচণ্ড তীব্রতা এতে নেই, কিন্তু পাপের পথ পরিত্যাগ করানোর জন্য উপদেশ দানের আগ্রহ এতে বিন্দুমাত্রও কম নেই। ধনীব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা, তাদের বদান্যতার অভাব, ইত্যাদির বর্ণনার ভিতর দিয়ে আমরা যেন ১৩৮১ সালের কৃষকবিদ্রোহের পদধ্বনি শুনতে পাই।

এর পরে মধ্যযুগের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ **'কার্সার মাণ্ডি'** (Cursor Mundi)-র কথায় আসা যাক। এটি রচিত হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৩০০ সাল থেকে ১৩২৫ সালের মধ্যে। ৩০০০০ লাইনের অন্ত্যমিলযুক্ত শ্লোকে লেখা।

'কার্সার মাণ্ডি' কথাটির অর্থ জগৎকে দ্রুতগতিতে অতিক্রম বা অতিক্রমকারী (Runner across the World) বা বিশ্ব ইতিহাস (History of the Universe)। এটি যেন কাব্য ছন্দে বাইবেলের কাহিনীগুলির বিশ্বকোষ। ভাষা উত্তরাঞ্চলের। কবির পরিচয় জানা যায় না। বহুসংখ্যক মঠে যে এর বিভিন্ন অনুকৃতিগুলি সুরক্ষিত ছিল তাতে এর জনপ্রিয়তা প্রমাণ হয়।

মঠের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত নয়, ল্যাটিন-না-জানা এমন সব সাধারণ মানুষজনের উদ্দেশ্যে এটি রচিত হয়েছিল। পুরো গ্রন্থটির কোন জায়গাতেই লেখক একথা ভুলে যাননি। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নীতি ও উপদেশের কথা জানতে চাইত। তাদের তা জানানই যেন ছিল লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক ক্ষেত্রে আনন্দদানের মধ্য দিয়েই নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সহজ উদাহরণ দিয়েও বিভিন্ন বিষয় বোঝান হয়েছে। ছবির মত স্পষ্টভাবে অনেক জিনিষ উপস্থাপিত করা হয়েছে। জনপ্রিয় রোম্যান্সগুলির সঙ্গে স্বেচ্ছাকৃত প্রতিযোগিতার ভাবও তাঁর কবিতায় রয়েছে। মধ্যযুগীয় উপকথার প্রচুর সমাবেশ আছে।

খৃষ্টীয় ধারণার তিন আদি বিভূতি (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা) এবং জগত সৃষ্টি থেকে কবিতা সুরু হয়েছে। বাইবেলের সমগ্র কাহিনী, স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা, বিভিন্ন কাহিনীর পরিবর্ধন ও সংযোজনের ভিতর দিয়ে কাব্য এগিয়ে গেছে। 'পবিত্রগৃহের' (Holy Room) অধিষ্ঠাত্রী দেবী-বিষয়ক কথা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গ্রন্থটি যেন নানা উপকথার সংগ্রহশালা। বহুসংখ্যক উৎস থেকে আহৃত বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে। কবি বাস্তবিকই সুপণ্ডিত, অনুসন্ধানী ও পরিশ্রমী।

গ্রন্থটিতে একটি কাব্য পরিচয় এবং আর সাতটি খণ্ড আছে। তাছাড়া আছে চারটি পরিশিষ্ট অংশ ও চারটি সংযোজনা। এর উপরেও আছে ছড়ানছিটান নানা ধর্মালোচনা ও সন্তদের জীবনী। নানা উপাদানের বৈচিত্র ও প্রকাণ্ড সমাবেশ। 'পুরাতন বিশ্বাসের কাহিনী'র প্রধান প্রধান চরিত্রের নানা কথা, এমন কি এ্যাডামের মৃত্যুর কথাও এতে আছে। মাতা মেরীর পরিচয় ও জীবনসংক্রান্ত তথ্য আছে। এ্যান্টি-ক্রাইষ্ট (Anti-Christ) এর কথা, প্রলয় ও নবসৃষ্টির কথা আছে। পবিত্র ক্রুশের সান্নিধ্যে মাতা মেরীর করুণ বিলাপ দিয়ে কাব্যটি শেষ হয়েছে।

সাহিত্যের ধারাবাহিকতার কথা বলতে গেলে চতুর্দশ শতাব্দীর 'মিরাকল' (Miracle) জাতীয় নাটকের (সন্তদের জীবনী সংক্রান্ত নাটক) ক্ষীণ আভাস যেন এই কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়।

এর পর আর একটি গ্রন্থের কথা বলে ধর্মীয় কাব্যের আলোচনা শেষ করবো

Pricke of Conscience (বিবেকের দংশন) বলে যে লেখাটি সাহিত্য সমাজে পরিচিত তার লেখক হিসাবে লিডগেট-এর (Lydgate) মতানুসারে প্রথমে রিচার্ড রোল-এর কথা ভাবা হয়েছিল। রিচার্ড রোল অব হ্যামপোল (Richard Rolle of Hampole) চতুর্দশ শতকের আত্মভোলা সাধক, জ্ঞানী পণ্ডিত এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন। সুতরাং সমসাময়িক কালের Pricke of Conscience বইটির গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর নাম মনে আসা স্বাভাবিক। তবে এখন জানা যাচ্ছে যে লেখাটি তাঁর নয়। লেখক যিনিই হোন বইটির জনপ্রিয়তা ছিল। এটি ১৩৪০ সালের বই। এতে দশ হাজার লাইন আছে।

লেখাটি কোন আনন্দদায়ক সাহিত্যসৃষ্টি নয়। বাইবেলে বর্ণিত ঐশ্বরিক নির্দেশগুলির মন্তব্যসহ উপস্থাপন, সংক্ষেপে খৃষ্টীয় মূলনীতিগুলির মন্তব্যসহ বর্ণনা, সন্তজনের অতিপ্রাকৃত দিব্যদর্শন, প্রার্থনাগুলির ব্যাখ্যামলক বিবৃতি, সাতটি মারাত্মক পাপ, 'পবিত্র আত্মার' উপহার—ইত্যাদি বিষয় আছে।

এ বইটিকে ধর্মাচরণের এবং ধর্মবিশ্বাসের শেষ বিশ্বস্ত নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য

এই পর্যায়ে প্রথমেই যে গ্রন্থটির নাম করতে হয় সেটি লেয়ামনে এর (Layamon) লেখা 'ব্রুট'।

ব্রুট (Bru)ঃ ১১৭৩ সাল থেকে ১২০৭ সালের মধ্যে রচিত।

বীড-এর ধর্মীয় ইতিহাস-এর ইংরাজী অনুবাদ এবং ওয়েস এর 'রোম্যান ডি ব্রুট'-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। লেয়ামনের লেখার সাল-তারিখের সম্ভাব্যতা অল্প সময়সীমার মধ্যে আনলে ১২০৫ সালটিই উপযুক্ত বলে মনে হয়।

বৃটিশ মিউজিয়মের দুটি পাণ্ডুলিপিতে লেয়ামনের 'ব্রুট' সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপি দুটির একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, এবং অপরটি তৃতীয় পাদে লেখা।

লেয়ামন ছিলেন ওয়ারসেস্টারসায়ারের এ্যার্লি কিংস (Arley kings) মঠের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ওয়ারসেস্টারের ভাষাতেই কবিতাটি লেখা। ওয়েস-এর ফরাসী গ্রন্থের দ্বিগুণ আয়তন লেয়ামনের-এর (Brut) ১৬০০০ লাইন। দীর্ঘ অনুপ্রাসের লাইন-ই বেশী। তবে লেয়ামন-এর এই লেখাতেই সিলেবল-এ বিভক্ত লাইনের অন্ত্যমিলবিশিষ্ট শ্লোকের সুরু। লেখার ধরণ খানিকটা ঢিলেঢালা গোছের। ইংরাজী লিখিত কাব্যে সন্নিবিষ্ট আর্থারের কাহিনীতে এই প্রথম 'গোলটেবিল' -এর (Round Table) অনুপ্রবেশ। ফরাসী থেকে অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও লেয়ামন ছিলেন পুরাপুরি ইংরাজ কবি। তিনি

জার্মান অর্থাৎ স্যাক্সন বংশজাত। আবার, রাজা আর্থার যদি 'বৃটিশ' হন তবে লেয়ামন জাতিগতভাবে তাঁর প্রতিপক্ষের গৌরবের ছবিই যত্ন করে এঁকেছেন।

লেয়ামনের লেখাকে আমরা প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় নর্মান-প্রভাবিত সাহিত্যের মাঝখানে রাখতে পারি। আবার, আমরা একে কাব্যের রূপে স্বীকৃতি দিলেও লেয়ামন যেন ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। অথচ ইতিহাস লেখার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছিল না। তাই এতে দীর্ঘ তালিকার সন্নিবেশ ঘটেছে যার একঘেয়েমি কেউ অস্বীকার করেন না।

নর্মান রাজসভা ও নর্মান সম্প্রদায়ের আকর্ষণ তাঁর কাছে ততটা ছিল না, যতটা ছিল বৃটেনের প্রাচীন গৌরব গাথার। প্রাচীন ধরনের যুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির বর্ণনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এমন কি ভাগ্য বা নিয়তির ধারণাও তাঁর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আর্থারের রাজ্যশাসনের বর্ণনা সামগ্রিক ইতিহাসের ভিতর আনুপাতিক হারে অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়েছে। এই পর্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি অনেক নতুন কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। লেয়ামনের এই বর্ণনা থেকেই পরবর্তীকালের ম্যালোরি থেকে টেনিসন পর্যন্ত সকলেই আর্থার সম্পর্কিত বিষয় এবং তথ্য আহরণ করেছেন।

ওয়েসের কাব্যে যে আর্থার ছিলেন রোম্যাণ্টিক নায়ক এবং শিভ্যালরি-র প্রতিমূর্তি, লেয়ামন তাঁকে এঁকেছেন আত্মবিশ্বাসী শান্তি-স্থাপয়িতা হিসাবে। লেয়ামন আর্থারকে রোম্যাণ্টিকতার বেদী থেকে তুলে এনে বসালেন প্রজারঞ্জক রাজার সিংহাসনে। তবে সেই সঙ্গে আর্থারকে ঘিরে যে রহস্যময়তার আবরণ ছিল লেয়ামন তাকে ছিঁড়ে ফেলেন নি। জন্মকালীন রহস্যময়তা থেকে পরলোক যাত্রা পর্যন্ত সবটাই ছিল প্রাকৃত ও অতি প্রাকৃতের এক সুষম সমাহার।

স্যাকসন আলফ্রেডের জায়গায় অতি প্রাচীন ব্রুটাস বা কিংবদন্তীর নায়ক আর্থার লেয়ামনের অধিকতর ঘনিষ্ঠ। মানসিকতার দিক থেকে লেয়ামন ইংরাজ ছিলেন না, ছিলেন বৃটিশ। ইংরাজ ঐতিহ্য অতীতের দিকে সম্প্রসারণের বোধে অনুপ্রাণিত লেয়ামন জিওফ্রে এবং ওযেসের থেকে আলাদা।

লেয়ামনের কাব্যিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ঐকান্তিকতা, শক্তি ও উন্মাদনা,—এই কাব্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

জিওফ্রের ইতিহাসের বিষয়বস্তুর মতই ব্রুটাসের (গ্রীক) পূর্বপুরুষদের সময় থেকে ৬৮৯ সালে বৃটনদের ওয়েলস অঞ্চলের ভিতরে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখার সময় পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস লেয়ামনের কাব্যে স্থান পেয়েছে। কাহিনীটি তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে ট্রয়ের পতন থেকে সুরু করে আর্থারের জন্ম পর্যন্ত, দ্বিতীয়টিতে আর্থারের কাহিনী এবং তৃতীয়টিতে এথেলষ্টানের হাতে বৃটনদের পরাজয় পর্যন্ত কাহিনী আছে।

কল্পনা-ভিত্তিক কাব্যসৃষ্টির ঐতিহ্য লেয়ামনের হাতে সুরু।

সরাসরি ধর্মসম্পর্কহীন, অথচ, কৃচ্ছ্রসাধনের বক্তব্য আছে এমন কাব্য **'পেচক ও নাইটিঙ্গেল' (The Owl and the Nightingale)**

এতে স্পষ্ট বা কল্পিত কোন ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসরণের ব্যাপার নেই; আছে জীবনের দুই আদর্শের তুলনামূলক দোষগুণ বিচার। আদর্শের দোষগুণ ছাড়াও লক্ষ্য করবার ব্যাপার হচ্ছে কাব্যের ভাষা ও পরিচয়। আর আছে কাব্যের মান ও ধরন সম্পর্কিত কিছু ভাষা ও আধার যা ইংরাজমনের স্থায়ী রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। কিন্তু চলমান সাহিত্য সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও আনন্দের সন্ধান করে। এবং যে কোন সাহিত্যের মত ইংরাজী সাহিত্যও আনন্দ আহরণের পথ দেখায়। 'পেচক ও নাইটিঙ্গেল' সেইসব বিতর্ক ও পথনির্দেশের একটি খাঁটি ইংরাজী দেশীয় কাব্য।

এটি চারস্বরাঘাত যুক্ত ৮৯৭ লাইনের কবিতা।

ঠিক এই যুগের পরিবেশে কাব্যটিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা এমন কি ব্যতিক্রমও বলা চলে। কাব্যে নিরপেক্ষ কৌতুকময়তা কোন যুগেই সুলভ নয়; বিশেষ করে মধ্যযুগে তো নয়ই। আলোচনা এবং বাদানুবাদ হয়ত মৌলিক নয়; কিন্তু দুটি পাখীকে সামনে রেখে এক প্রাণবন্ত আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে নতুনত্ব অবশ্যই আছে। বিষয়ের গুরুত্ব সত্ত্বেও কাব্যটির উপস্থাপনের পরিকল্পনা কমেডির আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

আলোচনা-সমালোচনায় দুইপক্ষ তাদের অহঙ্কারকে আড়াল করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার মত যুক্তি দেখায়, অথচ যেন পারস্পরিক সৌজন্য দেখানোর মত একটু আধটু পরস্পবেব সঙ্গে একমত হয়। পেচক যেন তার সুগভীর চিন্তাকে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে, আর নাইটিঙ্গেল কাঁপা কাঁপা একটানা গানের সুরে তার যুক্তিপ্রয়োগ করতে থাকে।

এটি সম্ভবতঃ ১১৯৯ সাল থেকে ১২১৬ সালের মধ্যে বা অব্যবহিত পরে রচনা। তবে এ' নিয়ে মতভেদের অবকাশ প্রচুর। কারোর মতে ১২৫০ সাল; এমন কি কোন কোন মতে ১২৭২ সালের পর।

লেখক সম্ভবতঃ নিকোলাস অব গিল্ডফোর্ড (Nicholas of Guildford)। এটি সম্ভবতঃ তখনকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভাষায় লেখা হয়েছিল।

সমসাময়িক কালে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে লেখাটি জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর পাঠকের মনের কাছে আবেদন রাখার মত প্রয়োজনীয় সব উপাদানই এর মধ্যে ছিল। তখনকার কালের 'ফেবল'-জাতীয় গল্প এবং দ্রুত চাপান-উতোর তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া সমসাময়িক ফরাসী গীতিকবিতার রেশ, জনপ্রিয় প্রবাদ এবং উদাহরণ হিসাবে পরিপূরক অন্যান্য কাহিনীর চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে এই কাব্যে। আইনসংক্রান্ত পশ্চাদপট, বিভিন্ন বিষয়ের পরোক্ষ উল্লেখ, নানা অভিধা ইত্যাদির জনপ্রিয়তা আরও এই কারণে ছিল যে সাধারণ মানুষের ওইগুলি জানারও দরকার ছিল। তাছাড়া শিক্ষিত মানুষদের কিছু কিছু রহস্যের খোরাক এই গ্রন্থে রয়েছে। এই সব রহস্যের একাধিক ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব। এমনকি সব মিলিয়ে লেখাটিকে ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত বস্তুর সংঘাত হিসাবেও দেখা যায়। এ সংঘাত কি একদিকে আমোদপ্রমোদ এবং অন্যদিকে স্বেচ্ছাবৃত আত্মসংযমের, অথবা চিন্তাহীন কর্ম ও কর্মহীন চিন্তার সংঘাত, অথবা শিল্প ও দর্শনের সংঘাত তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। প্রাচীনপন্থী নির্দেশমূলক ধর্মাচরণ এবং নব্যপন্থী ধর্মসম্পর্কহীন কাব্যের দ্বন্দ্বও হয়ত এতে থাকতে পারে,—এরকম মতকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এবারে আমরা আসি মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এক সাহিত্যিক প্রবণতার কথায়। আমি রোম্যান্সের (Romance) পরিবেশ, প্রকাশ এবং গুণগত মানের কথা আলোচনা করবো। লেখনীর মাধ্যমে লোকপ্রিয় সৌন্দর্যসৃষ্টির এরকম সার্থক উদাহরণ জগতে খুব কমই আছে।

রোম্যান্স (Romance)

রোম্যান্স-এর মূল মানে হচ্ছে 'রোমান-ধরনে'। কথ্য ল্যাটিনের যে বিশেষ ধরন রোমের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল, তা ই ধীরে ধীরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে যেমন প্রচলিত ভাষায় তেমনি লোকসাহিত্যে প্রসার লাভ করেছিল। অন্যান্য ভাষায় প্রসারিত হয়ে যাবার পর কিন্তু এই ভাষা কেবলমাত্র নিকৃষ্ট জনের কথ্যভাষায় সীমাবদ্ধ থাকল না। কিছু কিছু রদবদলের ভিতর দিয়ে তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাষাও হয়ে দাঁড়াল। মনে রাখতে হবে যে আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে প্রধানতঃ গণ সাহিত্যই ছিল ব্যাপক এবং স্বীকৃত সাহিত্য। পণ্ডিত মানুষেরা দেশে দেশে ব্যাকরণ সম্মত সাধু ল্যাটিন নিয়ে কাজ করেছেন। তাতে স্তান বিস্তান এবং ধর্মপুস্তক তৈরী হয়েছে। কিন্তু তখনকার দিনের ব্যাপক গণসাহিত্য রোম্যান্স ভাষাতেই বিভিন্ন দেশে একাধারে সুসংস্কৃত এবং সাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। ফ্রান্স, বিশেষ করে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেঁস অঞ্চল, এই রোম্যান্সের আদি পীঠস্থান। তবে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের তৎকালীন প্রচলিত বিভিন্ন শাখাতেই রোম্যান্স ভাষা ব্যবহার হয়েছে। ইংরাজী রোম্যান্সগুলির অধিকাংশই তৈরী হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে। পরবর্তীকালে সাহিত্যের একটা বিশেষ শাখাকেই 'রোম্যান্স' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, অর্থ কেন্দ্রীবদ্ধ হয়েছে ও স্থান পরিবর্তন করেছে।

সৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহৎব্রতধারী বীরযোদ্ধাদের অভিযান ও কার্যকলাপ রোম্যান্সের ব্যাপক উপাদান। সত্য ঘটনায় অথবা লোককাহিনীতে রং চড়িয়ে, এমনকি অতিপ্রাকৃত উপাদানের মেশাল দিয়ে, পদ্যে অথবা গদ্যে রোম্যান্সগুলি তৈরী হয়েছিল। বহু রোম্যান্স-কাহিনী প্রচলিত গাথা বা ব্যালাড-এর ধরনে সাজিয়ে নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে শোনান হত। আবার কোন কোন রোম্যান্স এককভাবে পাঠকের নিঃশব্দ পাঠেরও সামগ্রী হ'ত। তবে সাদামাঠা কোন বিষয়কে রোম্যান্স তৈরীর জন্য বাছাই করা হত না। রোম্যান্স মধ্যযুগের এক আশ্চর্য সম্পদ। যে বর্ণাঢ্যতার কথা আগেই বলা হয়েছে, তা ছাড়া কোন রোম্যান্স তৈরী হতে পারত না। যে অনাবিল, কাল্পনিক, অতীত আনন্দের ভিতরে মানুষ নিজের প্রয়োজন-ভিত্তিক সঙ্কীর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে পারত তা রোম্যান্সের ভিতরই পাওয়া যেত। এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে একথাও বলা যেতে পারত, মানুষ তার প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনের থেকে রোম্যান্সের ভিতরেই এক নিখুঁত আনন্দের জীবন খুঁজে পেত,—যা হত তার উচ্চাভিলাষী কাম্যজীবনের প্রতিরূপ।

মহাকাব্যগুলির মতই রোম্যান্সের কবি বা লেখক অন্তরালে থাকাই পছন্দ করতেন। তবে রোম্যান্স প্রকাণ্ড পতন বা প্রচণ্ড একাগ্র লক্ষ্য সামনে রেখে এগুত না। আমার

মনে হয়, আবেগ নিষ্ক্রমণের ব্যাপক গণমাধ্যম ছিল রোম্যান্স। এক কথায়, বীরপূজা ও অজানা জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল,—এর ভিতর দিয়েই মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিল যে যুগে, সে যুগে রোম্যান্সের থেকে উপযুক্ততর উপায়ের কথা আর ভাবা যায় নি।

তবে ভিন্ন ভিন্ন রোম্যান্সের নায়ক নায়িকাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন নাম বা ঘটনার পটভূমিকায় থাকলেও বিভিন্ন রোম্যান্সের প্রধান চরিত্রগুলি একই রূপ ফুটিয়ে তুলত। তদানীন্তন মানুষ নিজেদের যে আকাঙ্ক্ষিত-আদর্শরূপ দেখতে চাইত তা-ই বারবার ফুটে উঠত বিভিন্ন রোম্যান্সের কাহিনীতে। বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপেব প্রত্যক্ষ অংশীদার হওয়ার যুগ শেষ হয়ে আসছিল, অথচ প্রতিটি মানুষের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রকাশের যুগ তখনও এসে পৌঁছয়নি। তাই মধ্যযুগ ছেয়ে আছে মানুষের কল্পনার রাজপুত্রের কাহিনী দিয়ে,— কেননা জীবনের অন্যান্য নানাদিকে ব্যাপ্তি ও মহত্ত্বের স্ফুরণ, বিশেষ করে ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্যের বোধ তখনও মানুষের আয়ত্ত্বের ভিতর আসেনি। তা আসতে সুরু করেছিল চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এবং পরে চশারের নেতৃত্বে।

মধ ও পশ্চিম ইউরোপে বৃহৎ গথিক ক্যাথিড্রালগুলিরও অবদান ছিল এইসব রোম্যান্স তৈরী করার পিছনে। এদের আকার-আয়তনের সঙ্গে যে মানসিক বিশালতার সমধর্মিতা ছিল, রোমান্সের লাগামছেঁড়া আতিশয্যের কল্পনাতেও সেই মানসিকতার প্রকাশ। ওই সময়ের ভিতরেই সারা ইউবোপে ক্রুশেডের বিশাল আবেগ পুরোপুরি সমাদরের আসনে বসে গেছে। ক্রুশেডে হার হলেও মধ্যযুগের কাল্পনিক অভিযানে যে শৈশবের সুরু, ষোড়শ শতাব্দীর 'অজানার আহ্বান' তারই পরিণতি।

মধ্যযুগের ইংরাজী ভাষায় দেশী-বিদেশী বহুকাহিনী বা জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে 'রোম্যান্স' লেখা হয়েছিল। প্রাচীন বৃটেনের নানা কল্পিত কাহিনী বা লোককাহিনী অবলম্বনে, ইংল্যাণ্ডের প্রথম দিককার ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা বা কাহিনী অবলম্বনে, ফ্রান্সের বা মধ্য-ইউরোপের কোন কোন কাহিনী অবলম্বনে, প্রাচীন গ্রীস এবং প্রাচীন রোমের কোন কোন বিষয় অবলম্বনে, এবং এমনকি সমসাময়িক কালের ইংল্যাণ্ডের বা ইউরোপের অন্য কোন দেশের কিছু কিছু সুন্দর এবং চমকপ্রদ কাহিনী অবলম্বনে রোম্যান্সগুলি তৈরী হয়েছিল।

এবার, বহুল পরিচিত কয়েকটি রোম্যান্সের কথা আলাদা আলাদা করে দেখতে হয়। এগুলি ছিল ঃ

রাজা আর্থার-এর কাহিনী। এই রোম্যান্স এবং এই সম্পর্কিত সাহিত্য ১১৩২ সালে বা তার কিছু পরে জিওফ্রের 'ইতিহাস' দিয়ে সুরু হয়েছিল, এবং ১৮৪২ সালে টেনিসনের 'মর্টে ডি আর্থার'-এর প্রকাশন পর্যন্ত চলেছিল। ১৩৬০ সালে মর্টে ডি আর্থার (Morte De Arthure) এই নামেও একটি রোম্যান্স প্রকাশিত হয়। বৃটিশ বা কেল্টিক বিষয়সমূহের মধ্যে আর্থারের নামের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বিষয়গুলি ছাড়াও 'ট্রিসট্রেম' (Tristrem), [আনুমানিক ১৩০০ সাল], 'ইয়েন এবং গায়েন' (Ywain and Gwain) [আনুমানিক ১৩৫০ সাল], 'গায়েন এবং সবুজ নাইট' (Gwain and the Green Knight)

[আনুমানিক ১৩৭৪ সাল], ইত্যাদি কয়েকটি রোম্যান্সের সঙ্গেও আর্থারের কম বেশী সম্পর্ক আছে। প্রসঙ্গতঃ, আর্থার বা অন্য কয়েকটি রোম্যান্সকে 'বৃটিশ উৎসের রোম্যান্স' বলা হয়।

রাজা হর্ন (King Horn) [আনুমানিক ১২২৫ সাল] একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রোম্যান্স। রাজা হর্ন ইংরাজদের ইতিহাসের বিষয় অবলম্বনে রোম্যান্স।

হ্যাভলক দি ডেন [আনুমানিক ১৩০০-১৩২০]। Havelock the Dane-ও ইংরাজদের ইতিহাস বিষয়ক।

ফ্রান্সের বিষয় ও মধ্য ইউরোপের শার্লোম্যান (Charlemagne) সম্পর্কিত কযেকটি রোম্যান্সও চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন জগতের আলিসণ্ডার (Alisaunder বা Alexander) এবং ট্রয় (Troy) সম্পর্কিত রোম্যান্সও লেখা হয়েছিল।

থিবস (Thebes)-এর কাহিনী অবলম্বনে রোম্যান্স ছিল।

সমসাময়িক কালের বিষয়ও রোম্যান্স-এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। সিংহহৃদয রিচার্ড (Richard caeur de Lion) সম্পর্কিত রোম্যান্স, এবং আরও অনেক রোম্যান্স প্রচলিত ছিল এবং জনপ্রিয় ছিল।

এইস . রোম্যান্সের অল্প কয়েকটির কথা আমরা এবার আলোচনা কর:বো।

স্বভাবতঃই রাজা আর্থার সম্পর্কিত রোম্যান্সের কথাই প্রথমে বলতে হয়। রাজা আর্থারের কাহিনী কযেক শতাব্দী জুড়ে প্রকাণ্ড সাহিত্য ও সাহিত্যের প্রেরণা হয়েছিল।

রাজা আর্থার (King Arthur) সম্পর্কিত রোম্যান্স

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রবণতা খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষদিক থেকে ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টির যে তাগিদ অনুভব করা হোত তা হয় ল্যাটিনে লিখিত, না হলে ল্যাটিন-প্রভাবিত। ল্যাটিন প্রভাবিত হলেও ইংরাজীর নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি, যা ছিল গণতন্ত্র-ঘেঁষা, তার কোথাও ছেদ পড়েনি। বীড এবং আলফ্রেডের অবদানের কথা আগেই বলা হযেছে।

কিন্তু আর একটি প্রবণতা নর্ম্যান বিজয়ের পর থেকেই খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকল। তা হল গল্প শোনানোর সাহিত্য। এ সাহিত্যের প্রধান ভিত্তি ছিল ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক কিংবদন্তী নর্ম্যানরাই সেই সাহিত্যের ঝোঁক ইংরাজী সাহিত্যে চালু হওয়ার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

রাজা আর্থার সম্পর্কিত কাহিনীর কথাই ধরা যাক। সপ্তম শতাব্দী থেকেই আর্থারের কাহিনীর কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদান দক্ষিণপশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে ছিল। কোথা থেকে এবং কিভাবে এ কাহিনীর সুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এমনকি এ কথাও বলা যায় যে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একাধিক ঐতিহাসিক বা আধা ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে আর্থারের কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে। আসলে কাহিনী বা কিংবদন্তী যতই

পুরানো হতে থাকে, ততই তাকে নিখুঁত আদর্শরূপে পরিবর্তিত করবার ঝোঁক এসে পড়ে। আবার, আমরা প্রত্যেকে যেমন আলাদা আলাদা করে মনে মনে কোন কোন সময়ে 'হ্যামলেট' হয়ে যাই, তেমনি দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ নিজেদের নিজেদের ধরনে এক এক অতীত রোম্যান্টিক আর্থার তৈরী করে নেয়।

তবে অনেক মিলও আছে। 'বৃটিশ' আর্থারকে নিয়েই আমাদের এখানকার কথা। ওয়েলস আর কর্ণওয়াল-এর কেল্টদের ভিতব অনেকদিন এই 'আর্থার' সীমাবদ্ধ হয়ে ছিলেন। ওয়েলস-এর যাজক জিওফ্রে, যিনি মনমাউথ এর জিওফ্রে বলেই বেশী প্রসিদ্ধ, ১১৩২ থেকে ১১৩৫ সালের মধ্যে ল্যাটিনে বারটি ছোট ছোট বই লেখেন। তিনি এগুলিকে ইতিহাস বলেছিলেন। এদের নাম দিয়েছিলেন 'বৃটেনের রাজাদের ইতিহাস'। কিন্তু আসলে এগুলি প্রামাণ্য ইতিহাস ছিল না। কতকগুলি ছিল প্রচলিত লোককাহিনী, এবং আর কতকগুলি জিওফ্রের কল্পনা। আবার পুরোপুরিভাবে ওগুলির কোনটিই জিওফ্রের নিজস্ব সৃষ্টি ছিল না। প্রাচীন ল্যাটিন পণ্ডিত নেন্নিযাস এর (Nennius) লেখায এর বেশ কিছু সূত্র পাওয়া যায়। জিওফ্রের হাত দিয়েই কিন্তু আর্থার বহুলভাবে পরিচিত হ'য়ে পড়লেন। প্রসঙ্গতঃ, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ফরাসী রোম্যান্স লেখকদের অবদানও এই ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থারের রোম্যান নাম 'আরটেরিয়াস' (Arterius)। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে নেন্নিযাস এই নামটিকেই পরিচিত করান। আর্থারের পূর্বপুরুষ বোম্যান ছিলেন এই ধারণাও ওই সঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয। যদিও আর্থারকে নিয়ে ইতিহাস তৈরী করা এক ধরনের ভ্রান্তিবিলাস, তবুও, যেমন ঝাপসা অতীতের অস্পষ্ট চরিত্র 'লিযার' বা 'সিম্বেলিন' সাহিত্যের ঐতিহাসিক চরিত্রদের থেকেও স্পষ্ট, গল্পের আর্থাব 'ইতিহাস' না হয়েও সত্যতর ইতিহাস। তবে কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপাদান, এমনকি সমসাময়িক কালের ইতিহাসের অংশও জিওফ্রে তাঁর কাহিনীতে মিশিয়ে নিযেছেন।

জিওফ্রের পরে ১১৫৫ সালে লেখা ফরাসী কাব্য ওয়েস-এর (Wace) 'রোমান ডি ব্রুট'-এ আর্থারের কথা আছে। আর্থারের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত 'রাউণ্ড টেবল' বা গোলটেবিলের উল্লেখ এখানেই প্রথম পাওয়া যায। তারপর ১২০৫ সালে প্রকাশিত লেয়ামন-এর (Layamon) ব্রুট (Brut) কাব্যেই প্রথম ইংরাজী ভাষায় আর্থারের কথা লেখা হয়। এরপরে আর্থার সম্পর্কে সুগ্রথিত ও সুবিন্যস্ত ধারণার সাহায্য নিয়ে ফরাসী এবং জার্মান কবি-সাহিত্যকগণ ওই দুটি ভাষায় এই রোম্যান্সচক্রের বহুল ব্যবহার করতে থাকেন। প্রায় একশবছর এইভাবে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে থেকে যাওয়ায় আর্থার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একটি পরিচিত ও ব্যবহারযোগ্য রোম্যান্সের উপকরণ হিসাবে গৃহীত হলেন। তবে ইংল্যাণ্ডে, বিশেষ করে ওয়েলেস-এ থাকাকালীন যে দেশপ্রেমের উপাদান তাতে ছিল বা যেভাবে একটা সামগ্রিক জীবনের ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল, তা' কিন্তু আর বজায় রাখার আবশ্যকতা রইল না। আবার, ইউরোপে রোম্যান্স হিসাবে আর্থার এবং তাঁর নাইটদের কার্যকলাপের বিবরণে যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল, চতুর্দশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডে আর্থার কাহিনীর চর্চায় তা-ও রইল না। কাব্যের গণ্ডীর বাইরে বিশ্বাসের জগতের

আর্থারের আয়ুষ্কাল বৃটেনে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুরুতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর আর্থার-কাব্য জাতীয় মানসিকতার প্রতিবিম্ব নয়, সাহিত্যিক অনুশীলনের এক উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ মাত্র।

১৩৬০ সাল নাগাদ স্কচ কবি হুকোন (Huchown) আর্থারকে নিয়ে অনুপ্রাসসজ্জিত এক কাব্য লিখলেন। ইনিই সম্ভবতঃ স্যার গযেন এবং সবুজ নাইট (Sir Gawayn and the Green Knight)-এর রোম্যান্সও লিখেছিলেন। এর আগেই লেখা হয়েছিল 'ইয়েন এবং গায়েন' (Ywain and Gwain)। এরকম একটি দুটি নয়, আর্থারের নাইটদের পরাক্রম এবং সৎকর্ম, আর না হয় আর্থারের নিজের বীরত্ব,—এই নিয়ে অনেকগুলি কাব্য চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে লেখা হয়েছিল। আর্থারের কাহিনী একটা উৎস যা অনেক কবিকে কাব্য সৃষ্টির পক্ষে গ্রহণযোগ্য উপাদান যুগিয়েছিল।

তবে ফরাসী রোম্যান্স লেখক ক্রেটিয়েন (Chretien)-এর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের আর্থার সম্পর্কিত রোম্যান্স পরবর্তীকালে আর্থার চক্রের অন্য সব সাহিত্য কৃতির আদর্শ হয়েছিল।

প্রায় একশবছর পরে ১৪৮৫ সালে স্যার টমাস ম্যালোরি-র (Sir Thomas Malory) গদ্যে লেখা আর্থার কাহিনী ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। এতে আগেকার আর্থার-সম্পর্কিত সব কবিতারই সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ম্যালোরির কাহিনীতে নর্ম্যান আমলের প্রথমদিকের ফরাসী রাজসভার আড়ম্বর ছিল না। আসলে তাঁর সময়ে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে সেই মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তবে মধ্যযুগীয় আদর্শগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বলে বোঝা যায়। হয়ত বিষয়বস্তুর সৌজন্যে, ম্যালোরির লেখা পরবর্তী কবিদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল। গদ্যে লেখাতেও ছন্দের এক সুনিয়ন্ত্রিত উত্থানপতন ছিল। বক্তব্য খুব সোজাসুজি বলা হয়েছিল। এমন কথা বলা হয় যে এমন কিছু আকর্ষণ ম্যালোরির লেখায় ছিল যা মানুষকে আর্থারের কাহিনী ভুলতে দেয়নি। অথবা, অন্যভাবে বলা যায় যে ম্যালোরির কাহিনীর অস্তিত্ব যদি না থাকত তো আর্থারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি আর ঘটত না।

আর্থার-কাহিনী

ম্যালোরির সংগৃহীত আর্থার কাহিনীগুলির সুবিন্যস্ত রূপে আমরা পাই একটি সৎ, সংগ্রামী জীবন, এবং কয়েকটি বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ পশ্চিম বৃটেনে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল উথার পেনড্রাগণ (Uther Pendragon)। আর ছিলেন এক বৃদ্ধ, জ্ঞানী মন্ত্রী মার্লিন (Merlin)। মার্লিন যাদুবিদ্যা জানতেন। রাজা উথার রাজা গরলইসকে (Gorlois) যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন, এবং নিহত করেছিলেন। গরলইস-এর স্ত্রী ইগরেইন-কে (Igraine) উথার বিবাহ করেছিলেন। উথার অসুস্থ হন। ইগরেইন সন্তানের প্রতীক্ষা করছিলেন। আর্থারের জন্ম। বিপদের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গোপনে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বস্ত বন্ধু স্যার একটরের (Sir Ector) আশ্রয়ে তাঁকে রাখা হয়। রাজা উথার মারা যান।

অন্য এক কাহিনী অনুসারে উথার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। মার্লিন অলৌকিকভাবে সমুদ্রতীরে এক শিশুকে কুড়িয়ে পান। তাকেই মার্লিন উথারের উত্তরাধিকারী করতে চান। আবির্ভাবের সময়ে স্বর্গীয় এক আলোয় উদ্ভাসিত এই শিশুই পরে রাজা আর্থার নামে পরিচিত হন।

উথারের মৃত্যুর পব চূড়ান্ত অরাজকতা চলে। তখন মার্লিন ক্যান্টারবেরীর প্রধান ধর্মযাজকের কাছে যান। দুজনেই অনুভব করেন একজন যোগ্য রাজার প্রয়োজন। এই বাজা হবেন প্রকৃত রাজবংশজাত। তিনি হবেন বীর ও মহান। নতুবা অন্য রাজারা তাঁকে মানবেন না। প্রধান ধর্মযাজক সকলকে বড়দিনের দিন লণ্ডনের গীর্জায় সমবেত হতে বললেন। তাঁরা যেন একজন যোগ্য নেতার জন্য প্রার্থনা করেন।

বাজারা লণ্ডনেব গীর্জায় সমবেত হলে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ তাঁদের প্রার্থনা করতে বললেন। নেতার প্রয়োজন, এবং শীর্ষস্থানীয় রাজার উপযুক্ত পরিচায়ক চিহ্ন থাকা চাই। প্রার্থনার পর বৃটেনের সেই অভিজাত নেতারা যখন লণ্ডনের গীর্জা থেকে বেরিযে আসছেন তখন তাঁরা সামনে এক প্রকাণ্ড মার্বেল পাথর দেখেন। ওটি আগে ওখানে ছিল না। ঝলমলে একটি তরোয়াল তাতে গাঁথা ছিল। পাথবে একথা খোদাই করা ছিল যে যিনি এই তরোযালকে টেনে তুলতে পারবেন তিনিই বৃটেনের যথার্থ রাজা হবেন। অনেকে চেষ্টা করলেন ; কেউ পারলেন না। উদ্দিষ্ট সেই রাজার খোঁজ পাওযা গেল না।

মার্লিনের পরামর্শে আর্চবিশপ আবার সেই একই জাযগায নতুন বছরের প্রথম দিনে সবাইকে জড়ো করলেন। রাজকীয় আডম্বরপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা টুর্নামেন্ট (Tournament) হবে। স্যার একটর এবং তাঁর ছেলে স্যার কে (Kay) এলেন। স্যাব একটর আর্থাবেব পালক পিতা। আর্থারও এলেন। স্যার কে নিজের তরোযাল আনতে ভুলে গিযেছিলেন। আর্থার বাড়ী থেকে তা' নিযে যেতে এলেন। কিন্তু বাড়ীর দরজা বন্ধ। সবাই টুর্নামেন্ট দেখতে গেছেন। আর্থার তখন ভাবলেন, পাথরে গাঁথা তরোযালটা তো তুলে নিলেই হয। তিনি অনায়াসে তা' করলেন। স্যাব কে এবং তাঁর বাবা আর্থারের কথা শুনলেন। শুনে তাঁরা সব বুঝতে পারলেন। তাঁরা বুঝলেন, ইনিই হবেন সেই রাজা, যাঁর জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে। একটর এবং কে নতজানু হয়ে আর্থারকে যথোচিত সম্মান দেখালেন। আর্থারকে তাঁর প্রকৃত পরিচয়ও দেওয়া হল। এই হল আর্থারের আত্মপবিচয প্রাপ্তি। এ সবের ভিতরে মার্লিনের কার্যকলাপ কেউ লক্ষ্য করল না। তিনিই হলেন আর্থারের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙক্ষী ও পরামর্শদাতা।

এখন, আর্থার তরোযালটি যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিলেন। আর্চবিশপ বিভিন্ন বীরযোদ্ধাদের বললেন সেটি টেনে তুলতে। আগের মত আর্থার অনাযাসেই তা করলেন। মার্লিন সবাইকে আর্থারের পরিচয় দিলেন। কিন্তু অন্যেরা তাঁকে নেতা বলে মানলেন না। এমন কি তাঁর বংশ পরিচয়ও বিশ্বাস করলেন না। পরে, আর একদিন, একই ধরনের পরীক্ষা করা হল। কিন্তু অনেকেই আর্থারকে মেনে নিতে চাইলেন না। ইষ্টারের দিন এসে গেল। এটি খৃষ্টের পুনরুত্থানের স্মরণে পালিত দিন। এবারেও সেই একইভাবে আর্থারের শক্তিপরীক্ষা হল। একই ফল হল। সাধারণ লোক আর্থারের শ্রেষ্ঠত্বে সম্পূর্ণ

বিশ্বাসী হল। আর্চবিশপ সকলকেই আর্থারকে মেনে নিতে আদেশ করলেন। আর্থার পবিত্র তরোয়ালটি আর্চবিশপের হাতে দিলেন। আর্চবিশপ সেটি গীর্জার বেদীর উপর রেখে দিলেন।

কিন্তু যুদ্ধের জন্য আর্থারের একটি তরোয়াল দরকার। তা' তিনি পেয়েও গেলেন। অলৌকিক তরোয়াল। এক হ্রদের অধিষ্ঠাত্রীর দান (Lady of the Lake)। তরোয়ালের হাতলে একদিকে উৎকীর্ণ 'আমাকে গ্রহণ কর' ; আর একদিকে উৎকীর্ণ 'আমাকে পরিত্যাগ কর'। মার্লিন পরামর্শ দিলেন গ্রহণ করতে। প্রয়োজন হলে পরে পরিত্যাগ করা যাবে। তরোয়ালটির নাম হয় এক্সক্যালিবার (Excalibur)। এরপর আর্থার কেমলট (Camelot) গেলেন, এবং রাজা হলেন। বিশ্বস্ত এবং শ্রদ্ধাশীল যোদ্ধারা তাঁর চারিপাশে রইল। এই সব বীরযোদ্ধারা শপথ নিলেন। তাঁরা স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করবেন। দুর্বলকে সাহায্য করবেন। রাজার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন। অভিষেক অনুষ্ঠান ছিল অতিপ্রাকৃত ভাবে সমৃদ্ধ। 'হ্রদের অধিষ্ঠাত্রী' উপস্থিত ছিলেন। তিনজন অলৌকিক রূপবতী অপরিচিতা রাজকুমারী ছিলেন। বীর যোদ্ধারা তো ছিলেনই।

আর্থার তাঁর কাজ সুরু করলেন। জঙ্গল পরিষ্কার হল ; রাস্তা তৈরী হল ; তীর্থযাত্রীরা নিরাপদ হলেন ; চাষী ও মেষপালকেরা নিশ্চিন্ত হল।

আর্থারের সহযোগী বীরদের ভিতর ছিলেন স্যার ল্যান্সলট (Sir Lancelot), গয়েন (Gawain), গারেথ (Gareth), বেডিভিয়ার (Bedevere) এবং অন্যান্যেরা।

আর্থার দুর্বল রাজাদের সাহায্য করতে লাগলেন। এমনি এক অসহায় রাজার মেয়ে গিনেভিয়ার (Guinevere)। আর্থার সেই রাজাকে সাহায্য করলেন এবং বিপদমুক্ত করলেন। এরপর গিনেভিয়ার-এর সঙ্গে আর্থারের বিবাহ হয়। এই বিবাহে খুব জাঁকজমক হয়। গিনেভিয়ার-এর বাবা যৌতুক পাঠালেন এক প্রকাণ্ড গোলটেবিল। এইটিই আর্থার-কাহিনীর সেই বিখ্যাত গোলটেবিল (Round Table)। এই টেবিলকে ঘিরে দেড়শ জন বসতে পারতেন। যোগ্য বীরেদেরই অধিকার ছিল 'গোলটেবিলের' পাশে বসার। পবিত্র-হৃদয় এই সব বীর জীবন তুচ্ছ করে অনেক সৎকাজ করেছিলেন।

সাধারণ নিরীহ মানুষের শত্রুরা আর্থার এবং তাঁর বীর সহযোগীদের পরাক্রমে দক্ষিণ বৃটেন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। নিরাপদে গমনাগমণের ব্যবস্থা যথাসাধ্য করা হয়েছিল। বন্যজন্তুদের ভয় কমান গিয়েছিল। এক শান্তির রাজ্য স্থাপনা করা হয়েছিল।

এমনও হতে পারে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর দুর্বলতা ও অসহায়তা মানুষের মনকে যত বেশী কাবু করে ফেলছিল, ততই বাস্তবিক হোক বা কাল্পনিক হোক, কোন এক আর্থারকে কেন্দ্র করে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত ভয়শূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছিল ;—বাস্তবে যা হয়ত সম্ভব ছিল না, কবির কল্পনায় তাকেই রূপ দেবার জন্য মানুষের এক আকুল প্রচেষ্টা ছিল। মধ্যযুগীয় চূড়ান্ত সৌজন্যবোধ এবং উন্নততম নীতিবোধ যাকে বলা হয়েছিল সিভালরি (Chivalry),—তার সঙ্গে 'আর্থারিয়' পরিবেশকে এক করে দেখার ইচ্ছাই যেন রূপ পেয়েছিল আর্থারচক্রের রোম্যান্সগুলিতে।

কিন্তু পাকা ফলের ভিতরেই পচনক্রিয়া সুরু হয়। অথবা, চূড়ান্ত উন্নতির ভিতরেই

লুকিয়ে থাকে দুঃখময় পরিসমাপ্তির অঙ্কুর। আর্থারের অন্যতম ভাগিনেয় মরড্রেড (Mordred), যাকে তিনি বিশ্বাসভাজন নাইট-এর মর্যাদা দিলেন, সে-ই বিপরীত কথা বলতে সুরু করল। কুৎসা ও অপবাদের তথ্য বেরিয়ে এল রাজপরিবারের ভিতর থেকে। আর্থারের শ্রেষ্ঠতম নাইট ল্যান্সলটের প্রতি রানী গিনিভেযারের অনুরক্তি মরড্রেড ও অন্যান্যদের বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাল। ধৈর্যশীল ও মহানুভব আর্থার অনেক প্রতিরোধের পর শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেন। ল্যান্সলটকে দেশত্যাগ করতে হল।

অনেক চেষ্টায়, ধৈর্যে, পরিশ্রমে, সততায়, আন্তরিকতায়, বীরত্বে, মানবিকতায, পবিত্র গোলটেবিলের চারিদিকে যে আদর্শনিষ্ঠ, একতাবদ্ধ, নাইটদের সম্প্রদায় আর্থার গড়ে তুলেছিলেন তা অসম্বন্ধ ও বিশ্লিষ্ট হতে চলল। মহান মানুষটি তাঁর নিজের গড়া পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ, একক হ'য়ে গেলেন।

আর্থারের আর দুই ভাগিনেয় গয়েন এবং গারেথ কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। আর মর্ড্রেড এবং তার দলবল সামরিক দিক দিযে আর্থারকে যতটা না দুর্বল করতে পেরেছিল, তার চেয়ে বেশী সফল হয়েছিল আর্থারের মনের জোর ভেঙ্গে ফেলতে।

মরড্রেডের আহ্বানে এ্যাঙ্গলসরা বৃটেন আক্রমণ করল। আর্থারের বিশ্বস্ত নাইটরা তাদের হারিয়ে দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তখনও আর্থাব রাজধানীতে ফিরে আসতে পারেন নি। ডিসেম্বরের রাত্রি। নিদ্রাহীন আর্থার। চারদিকে নজর রাখছেন আর্থারের সবচেয়ে প্রাচীন নাইট সাহসী স্যার বেডিভিয়ার। আর্থারের তাঁবুর বাইরে থেকে তিনি এক করুণ অনুচ্চ বিলাপ শুনলেন। আর্থারের মনোবেদনা কি অসীম মর্মান্তিকঃ আমি তো সব কিছুতেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছি। মাটি থেকে আকাশ, সামান্য থেকে অসামান্য কোন কিছুই ঈশ্বরের রাজত্বের বাইরে বলে জানিনি। কিন্তু এ কি হ'ল? আমি কি তাঁর সেবায় কোন ভুল করলাম? কেন ব্যর্থ হলাম! কোথায় গেল আমার নাইটরা? কোথায় গেল তাদের শপথ? কি পরিণতি হল আমার এই সারাজীবনের সাধনার?

রাজা বেডিভিয়ারকে বললেন, গযেন মারা গেল যুদ্ধে। তার আত্মা এসে বলে গেল, আগামীকাল আমাকেও চলে যেতে হবে। বেডিভিয়ার শেষবারের জন্য রাজাকে উৎসাহিত করে তুলতে চাইলেন। 'মরড্রেডকে ধ্বংস করতে হবে; বিশ্বাসঘাতকদের ধ্বংস করতে হবে। উঠুন, মরড্রেড যে এসে গেল। উঠুন, যুদ্ধ করুন, জয়ী হোন।' কিন্তু শোকসন্তপ্ত আর্থার ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন,—'পশ্চিম সমুদ্রতীরেব এ যুদ্ধ আর আগেকার যুদ্ধের মত নয়। এ যুদ্ধে রাজা চলেছেন তাঁর প্রজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। প্রজারঞ্জক রাজার একি চরম ব্যর্থতা!'

পশ্চিম বৃটেনের এই যুদ্ধে বিরুদ্ধপক্ষের কোন নাইট সরাসরি আর্থারের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করেনি। কেবল মরড্রেড এর ব্যতিক্রম। আর্থারের মাথায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হল। আহত সিংহের বিক্রমে রাজা এক্সক্যালিবারের আঘাতে মরড্রেডকে নিহত করলেন। কিন্তু তাতে জয়ের আনন্দ ছিল না। ছিল স্বজনবিয়োগের কান্না। হয়ত অন্য অবস্থায় আর্থার হ্যামলেটের মত বলতে পারতেনঃ Give me your Pardon, Sir; I have done you wrong অথবা 'I have shot mine arrow O'er the house and shot my brother.'

'তুমি আমাকে ক্ষমা করো মরড্রেড ; দোষ হয়ত আমারই।' কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। তাঁর নিজের মস্তিষ্কের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আর্থারের শ্বাসকষ্ট সুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বেডিভিয়ারের হাতে তুলে দিলেন সেই অলৌকিক তরোয়াল ঃ এক্সক্যালিবার। দূরে হ্রদের জলে তাকে নিক্ষেপ করতে বললেন। কি ঘটে দেখে এবং শুনে এসে তাঁকে বলতে বললেন।

বেডিভিয়ার চাইলেন না এই অসাধারণ, অলৌকিক অস্ত্রকে পরিত্যাগ করতে। তিনি দুবার রাজাকে এসে অসত্য ভাষণ দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে মনিদ্যুতিময় এই অসাধারণ সৌন্দর্য থেকে যাক পৃথিবীতে। ভবিষ্যত মানুষের কাছে প্রমাণ থেকে যাক যে রাজা আর্থার বলে কেউ একজন কোনদিন ছিলেন। রাজা সব বুঝলেন। কষ্ট পেলেন। তিনি বললেন,—'বেডিভিয়ার, তুমিই তো আমার শেষ বিশ্বস্ত সহযোগী। আমি তো এই জগত থেকে চলে যাচ্ছি। আমার এই অবস্থায় তুমিও কি শেষ পর্যন্ত আমাকে অমান্য করতে চাও ?'

বেডিভিয়ার আবার ছুটলেন। এক্সক্যালিবার জলে ছুঁড়ে দিলেন। জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে সাদা রেশমে ঢাকা একখানি হাত তরোয়ালটি ধ'রে ফেলল, এবং আস্তে আস্তে জলের তলায় ডুবে গেল। বেডিভিয়ার রাজাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেন জলের ধার পর্যন্ত। বহুদূর থেকে একটি বজরা ভেসে আসতে দেখা গেল। কালো রঙের সেই বজরায় কালো পোষাকে কয়েকজন আরোহিনী, তিনজন অলৌকিক সুন্দরী রাণী—মাথায় তাঁদের সোনার মুকুট,—সুললিত দীর্ঘ উচ্চস্বরে তাঁরা কেঁদে চললেন। বেডিডিয়ারের কাছ থেকে রাজাকে তাঁরা হাত বাড়িয়ে বজরায় তুলে নিলেন। বেডিভিয়ার কেঁদে উঠলেন : হে প্রভু, আমি কোথায় যাব ! গোলটেবিলের আমার সব সহযোগীরা তো চলে গেছেন। অজানা জগৎ, অজানা মানুষ, আজানা মুখ,—আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব ? আমি যে নিঃস্ব হয়ে গেলাম, নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। বজরার ওপর থেকে আহত আর্থার সান্ত্বনা দিলেন ঃ পুরাণ জগৎ নতুন জগতকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে ! ঈশ্বর কিভাবে যে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেন কে জানে। আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা কোরো। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যা সম্ভব তা অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। দিবারাত্র প্রার্থনা কোরো। তোমার প্রার্থনার প্রস্রবন আমার জন্য চিরকাল উদ্গত হতে থাকুক।

আর্থাব বেডিভিয়ারকে বিদায় জানালেন। এ্যাভিলিয়ন (Avilion) এর উপত্যকার দিকে তাঁর মহাযাত্রা সুরু হ'ল। সেখানে তিনি সুস্থ হ'য়ে উঠবেন। তিনি চলে যাচ্ছেন গভীর থেকে গভীরতর রহস্যে। বহুদূর থেকে কি এক অজানা সুর ভেসে আসতে লাগল। সে সুর কারোকে ফিরে পাবার সুর, সম্বর্ধনার সুর, আনন্দের সুর। এ জীবনে যে অপূর্ণতা তিনি রেখে গেলেন তা সার্থক হবে অনাগতকালে আলোকোজ্জ্বল দিব্য পূর্ণতায়। আর্থারের মহাপ্রয়াণের শূন্যতা আমাদের সকলের আত্মোপলব্ধির ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণতা পাক। তাঁর অন্তর্ধানের পরেও তাঁর সাধনার দীপশিখা চিরকাল আমাদের অন্তরকে উদ্ভাসিত করুক।

সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে আর্থার কাহিনীর সঙ্গে জড়িত অনেকগুলি রোম্যান্স সে

যুগে রচিত হয়েছিল। এ ছাড়া আলাদা কয়েকটি বৃটিশ এবং এ্যাংলিকান রোম্যান্সও আমরা হাতে পেয়েছি। এই সব রোম্যান্সের মাত্র কয়েকটির নাম আমরা এখানে বলছি—

★ রাজা হর্ন (King Horn)—আনুমানিক ১২২৫ সাল।
★ ফ্লরিস এবং ব্ল্যাঙ্কিফ্লুর (Floris and Blanche Fleur) আনুমানিক ১২৫০ সাল।
★ হ্যাভলক দি ডেন (Havlok the Dane)—আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১৩২০।
★ হ্যাম্পটনের স্যার বেভিস (Sir Bevis of Hampton)--আনুমানিক ১৩৩০।
★ গাই অব ওয়ারউইক (Guy of Wardwick)—আনুমানিক ১৩৩০
★ জোশেফ অব এ্যারিম্যাথি (Joseph of Arimathie)---আনুমানিক ১৩৫০।
★ উইলিয়ম অব পালার্ণে অথবা উইলিয়ম এবং ওয়েরউলফ(William of Palerne or William and the Werwolf)—আনুমানিক ১৩৫০ সাল
★ স্যার গয়েন এবং সবুজ নাইট (Sir Gawaine and the Green Knight)--আনুমানিক ১৩৭০।

আমরা এখানে মাত্র তিনটি রোম্যান্সের কথা আলোচনা করবো।

রাজা হর্ণ (King Horn)

উপরোক্ত রোম্যান্সগুলির মধ্যে রাজা হর্ণ প্রাচীনতম। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত। সম্ভবতঃ ১২২৫ সালে বা তার কিছু পরে। সাহিত্যের ইতিহাসে 'হর্ণ' এর গুরুত্ব এই যে কাব্যটি রোম্যান্স এবং পরবর্তী যুগের ব্যালাডের মাঝামাঝিতে রয়েছে। রঙ্গীন কল্পনা থেকে ঘটনাগত বাস্তবতার দিকে লোকসাহিত্যের সঞ্চরণের একটি পরিষ্কার ধারণা এই কাব্যটির থেকে পাওয়া যায়।

ইংরাজী কাব্যটি দুই স্বরাঘাত বিশিষ্ট ছোট ছোট ১৫০০ লাইনের কাব্য।

হ্যাভলক দি ডেন (Havlok the Dane)

এটি রচিত হওয়ার আনুমানিক সময় ১৩০০ থেকে ১৩২০ সাল। এটি চার স্বরাঘাতবিশিষ্ট ছোট ছোট শ্লোকে লেখা। এটি সংরক্ষিত আছে 'লড-বিবিধ-১০৮' (Laud Misc. 108) পাণ্ডুলিপিতে। লাইনের সংখ্যা ৩০০১। একই কাহিনীর আরও তিনটি পাণ্ডুলিপি অন্যান্য যুগে পাওয়া গেছে। এটি লিঙ্কন-সায়ারের উত্তর-মধ্যদেশীয় আঞ্চলিক ভাষায় লেখা। লিঙ্কনসায়ারের গ্রিমসবি অঞ্চলেই কাহিনীর পটভূমি।

'নির্বাসন-প্রত্যাবর্তন' শ্রেণীর কাহিনীগুলির প্রচলিত ধারার মধ্যে গল্পটির বিন্যাস ধরে রাখা হয়েছে।

কাহিনী ঃ হ্যাভলক ডেনমার্কের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। বঞ্চিত ও বিতাড়িত হ্যাভলক ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত। ধীবরদের দ্বারা লালিত পালিত। দুষ্ট রাজ-অভিভাবকের গৃহস্থালীতে খুব নীচু ধরনের কাজে নিযুক্ত। রান্নাঘরের বাসনকোসন ধোওয়ার কাজ। ওই রাজ-অভিভাবকের উদ্দেশ্য ছিল অপ্রাপ্তবয়স্কা রানী গোল্ডবারোকে (Goldborough) রাজকীয় বংশমর্যাদায় হীন প্রতিপন্ন করে নিজে রাজা হওয়া। ছদ্মপরিচয় সত্ত্বেও হ্যাভলক যে পরিশ্রমী এবং ক্রীড়াকুশলী তা' সকলের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বংশমর্যাদায়

সে নীচু। তাই রাজ-অভিভাবক তার সঙ্গে গোল্ডবারোর বিয়ে দিতে চাইলেন। এই বিয়ের ফলে গোল্ডবারোর কোন ক্ষতিই হল না, কারণ হ্যাভলক ডেনমার্কের রাজবংশের অন্তর্গত। পরে হ্যাভলক নিজের দেশে ডেনমার্কে রাজা হয়। আরও পরে সে ইংল্যাণ্ড জয় করে, এবং সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাকি জীবন কাটায়।

ধীবরদের জীবনের বাস্তব ও প্রাণবন্ত চিত্র এখানে পাওয়া যায়। শ্রোতাদের কাছে কাব্যটি যে জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায়।

মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় থাকলেও বর্তমানে সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নিদর্শন ব্যতীত এর নিজস্ব সাহিত্যিক উৎকর্ষ স্বীকৃত নয়। দু' একটি দিক ছাড়া সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে বাস্তবিকই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় ; কিন্তু মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরিই আছে।

স্যার গয়েন এবং সবুজ নাইট (Sir Gawayne and the Grene Knight)

রচনার আনুমানিক সময় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে, সম্ভবতঃ ১৩৭০ সাল।

[যদিও কালানুক্রমিকভাবে বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল, তথাপি রোম্যান্সের উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিবেচনা করে, এই কাব্যটিকে বর্তমান অংশেই বাখা হল।]

উৎস সম্ভবতঃ ফরাসী হলেও এটিকে ইংরাজী রোম্যান্সের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত কবা হয়। যে পাণ্ডুলিপিটি অদ্যাবধি রক্ষিত আছে, সেটি পশ্চিম-মধ্য দেশীয আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। পাণ্ডুলিপিটির নাম দেওয়া হয়েছে কটন নিরো এ এক্স ফোর (Ms. Cotton Nero Ax +4)। লাইনের সংখ্যা ২৩৫০।

ছন্দেব বৈশিষ্ট্য নিজস্ব ধরনের। দীর্ঘ অনুপ্রাসযুক্ত কয়েকটি করে লাইন। তারপর পাঁচটি অন্ত্যমিলযুক্ত ছোট ছোট লাইন। মিলের পরিকল্পনা ababa। প্রথম লাইনটিতে একটিমাত্র স্বরাঘাত। বাকিগুলিতে তিনটি ক'রে। এই পরিকল্পন' পরপর পুনরাবৃত্ত হযেছে। অনুপ্রাসযুক্ত অন্ত্যমিলের আধিক্য কাব্যটির ক্ষতি করেছে।

সমগ্র কবিতাটি চারটি অংশে বিভক্ত। গয়েন সম্পর্কিত এই রোম্যান্সটি প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিম ইংল্যাণ্ডে, পরে উত্তর ফ্রান্সে পৌরাণিক উপকথা হিসাবে সুরু হয়। আর্থার সম্পর্কিত মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও এটি প্রথম থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ রোম্যান্সের স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। গয়েন আর্থারের ভাগিনেয়। বিশ্বস্ত নাইটের সমস্ত গুণ গয়েনের ভিতর ছিল।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যদিও আর্থারের রোম্যান্সচক্রের স্থান প্রথম, কিন্তু গয়েনকে কেন্দ্র করেও একট আলাদা রোম্যান্সচক্র তৈরী হয়েছিল।

গয়েনের শ্রেষ্ঠত্ব আর্থারচক্রের সমস্ত রোম্যান্স-এ স্বীকৃত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে ম্যালোরির 'মর্টে ডি আর্থার'-এ তাঁর ছবি ততটা উজ্জ্বল নয়। দোষ কিছু দেখান হযনি, তবে মর্যাদায় খাটো করা হয়েছে।

আলোচ্য রোমান্সটিতে নর্স, ড্যানিশ, ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরাজী,—সব ধরনের ভাষাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কাহিনী ঃ সবুজ পোষাকে ঢাকা অচেনা নাইট আর্থারের রাজসভায় সকলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানায়। গয়েন তার মুণ্ডচ্ছেদ করলেও তা আবার যথাস্থানে জোড়া লেগে যায়, এবং তখনকার মত 'সবুজ নাইট' স্থানত্যাগ করে। যাবার সময় গয়েনকে জানিয়ে যায় যে তার যদি সাহস থাকে ত' পরবর্তী নববর্ষের দিন 'সবুজ উপাসনাগারে' যেন গয়েন তার সঙ্গে দেখা করে। নির্ধারিত দিনের কয়েকদিন আগে গয়েন প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং একটি দুর্গে উপস্থিত হয়। সেই দুর্গে উপযুক্তভাবে তাকে সম্বর্ধনা জানান হয়। দুর্গের মালিক প্রস্তাব করে যে সে শিকারে যেতে চায়, এবং গয়েন যেন সেই সময়ে তার স্ত্রীকে সাহচর্য দান করে। এ-ও ঠিক হয় যে ওই সময়ে দুর্গের মালিক এবং গয়েন,—যে যা পাবে তা পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করবে। যাই হোক, দুর্গস্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কিন্তু গয়েনের কাছে স্বাভাবিক সৌজন্যের চেয়ে বেশী কিছু দাবী করে ; কিন্তু গয়েন নাইট-সুলভ চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখে। তবে সৌজন্য বজায় রাখারা জন্য এই মহিলার ন্যূনতম আবেদন মঞ্জুর করে। দুর্গাধিপাত ফিরে এলে গয়েন সেইটুকুই তাকে ফেরৎ দেয়। তৃতীয় দিনে ওই অভিজাত মহিলা গয়েনকে একটি রেশমী কোমরবন্ধ দেয়, যেটি পরে থাকলে সে হবে অভেদ্য। এবপর নববর্ষ এসে গেল। গয়েনকে 'সবুজ উপাসনাগারে' নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তাকে লড়াই করতে হবে 'সবুজ নাইটের' সঙ্গে। দেখা গেল 'সবুজ নাইট' আর কেউ নয়,—ওই দুর্গাধিপতি নিজেই। লড়াইয়ে পরপর আঘাতেও গয়েনকে কাবু করা যায়নি। সে তখন তার কোমরবন্ধের গোপন তথ্যটি প্রকাশ করে।

কাহিনীটির সমাপ্তি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু কাহিনীটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কাল্পনিক কাহিনী হলেও মধ্যযুগীয় অভিজাত সমাজের যে জীবনাদর্শ ফুটে উঠেছে তা আমাদের অন্যান্য অনেক দিকে তদানীন্তন সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে জানতে সাহায্য করে। উচ্চকোটির মানুষের আদর্শ সম্পর্কিত কাহিনী হলেও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ চোখে পড়বার মত।

কাহিনীর গঠন ও বিষয়বস্তুর ব্যবহার মার্জিত ল্যাটিন অথবা ফরাসী কোন ভাবেরই অনুকরণ নয়। এই লক্ষণের দরুন কাহিনীটি নিজস্ব গ্রামীন রূপ পেয়েছে। অলঙ্কারের সমৃদ্ধি কোন বিশেষত্ব না আনতে পারায় এটি এক রুক্ষ স্বাধীন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

এরপরে আমরা আসব ব্যালাড-এর কথায়।

ব্যালাড (Ballad)

ব্যালাড (Ballad) এক ধরনের কাহিনীমূলক পদ্য। ব্যালাডগুলি সাহসিক অভিযান এবং নানা ব্যক্তিগত শক্তিশালী অনুভূতির ভিত্তিতে রচিত। ইউরোপেব বিভিন্ন দেশে দশম শতাব্দী বা তার কিছু পরে বিভিন্ন ব্যালাড রচনা করা হয়েছে। ইংরাজী ব্যালাড অপেক্ষা স্কচ ব্যালাড সম্ভবতঃ সংখ্যায় বেশী। ইংরাজী ব্যালাডের সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ইউরোপের সম্পর্ক নিকট। ব্যালাডের সঙ্গে নাচের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও

সুললিত আবৃত্তিই ব্যালাডের জনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ। সুসংবদ্ধভাবে ব্যালাড সংগ্রহ এবং লেখার কাজের জন্য আমরা চতুর্দশ শতাব্দীর ফরাসী গীতিকার 'মাচট' (Machaut) এবং ডেচ্যাম্পস (Deschamps)-এর নাম করতে পারি। তবে ব্যালাড এমন এক ধরনের পদ্যে লেখা কাহিনী যার উদ্ভব স্বতঃপ্রণোদিত এবং গ্রাম্য পরিবেশ থেকে। ব্যালাডকে আকর্ষণীয় করবার জন্য কখনো কখনো অতিপ্রাকৃত উল্লেখ ও আবেষ্টনীর দরকার হত।

ব্যালাডকে আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে 'গাথা' নাম দেওয়া হয়েছে। রাজস্থানের চারণ কবিরা বীরত্বের, আত্মত্যাগের, দেশপ্রেমের এবং একনিষ্ঠ ভালবাসার নানা ঐতিহাসিক কহিনীকে অবলম্বন করে জনপ্রিয় বহু গান বেঁধেছিলেন। সাধারণ মানুষের মুগ্ধ বিহ্বলতা, দুঃখ ও আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে গাথা বা ব্যালাডের মাধ্যমে। ব্যালাডের সার্থকতা কেবলমাত্র কাব্য রচনা বা গান গাওয়ার উপর নির্ভর করে না ; বহুসংখ্যায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আনন্দ ও দুঃখের সমষ্টিগত প্রকাশ ব্যালাডের একাধারে লক্ষ্য ও সার্থকতা। আবৃত্তি বা গানের উপযোগী করে ভাষাবিস্তারের ভিতরে কৃত্রিম কলাকৌশল অবশ্যই থাকে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আবেগ সমস্ত কলাকৌশলকে ভাসিযে নিয়ে যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সব ব্যালাড তৈরী করা হয়েছিল তা মানুষের মুখে মুখে বহুকাল ধরে বেঁচেছিল। কিন্তু মধ্যযুগ শেষ হওয়ার দিকে ব্যালাডের গ্রামীনভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ; এবং একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, চারণকবি বা ব্যালাড গাযকদের সংখ্যাও কমে আসছিল। সাহিত্যে গদ্যরীতির ক্রমশঃ প্রাদুর্ভাব, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ছাপার অক্ষরে লিখিত বিষয় পড়ে আনন্দ পাবার মত পাঠক শ্রেণীর উদ্ভব হতে থাকায় ব্যালাডের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। সাহিত্য যত দিন প্রধানতঃ কানে শোনবার জিনিষ ছিল ততদিন ব্যালাডের গুণগ্রাহীর অভাব হয়নি। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে তা' হতে শুরু করেছিল।

পঞ্চদশ শতকের পর ইংরাজী ব্যালাড আর তার মৌল উৎস খুঁজে পায়নি। এর পরে যা যা ব্যালাড লেখা হয়েছে তাতে কবির দক্ষতা, ছন্দের সঠিকতা এবং কাহিনীর ভাবপ্রধান বিন্যাস অবশ্যই আছে। কিন্তু সহযোগী স্রষ্টা শ্রোতাদের উৎসাহমুখর অংশগ্রহণ আর নেই। অর্থাৎ আধুনিক ব্যালাডে আবরণ ও আভরণের প্রাচুর্য থাকলেও সেই পুরাণো সুব আর বাজে না ; পুরাণো শ্রোতার উত্তরসূরীও নেই।

পুরাণো ব্যালাডের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া দুষ্কর। বস্তুতঃ সেরকম কিছুর খুব প্রয়োজনও কখনো হয়নি।

জুডাস (Judas) নামের ব্যালাডের ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

১৩১০ সালে রচিত 'স্যার অরফিও' (Sir Orfeo) প্রথম দিককার ব্যালাডের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় নিদর্শন।

নিঃসন্দেহে রবিনহুডের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যালাড গুচ্ছ জনপ্রিয়তায় অন্য সব ব্যালাডকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

রবিন হুডের-এর (Robin Hood) নাম দিয়ে অনেকগুলি ব্যালাডে একটি

ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছিল। প্রায় ১০০ বছর ধরে এই বিষয়ের ব্যালাডে পরপর সংযোজনা হয়েছিল। এর জনপ্রিয়তার ভিত্তি ছিল নর্ম্যান-এ্যাংলিকান পারস্পরিক বিরোধিতা। স্বভাবতঃই দেশীয় ইংরাজদের কাছে এই ব্যালাড-শৃঙ্খলা খুব জনপ্রিয় ছিল। গল্প অংশের আকর্ষণের দরুন প্রাথমিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সত্ত্বেও রবীনহুডের কাহিনী এখনও জনপ্রিয় ; —তবে তা ব্যালাড হিসাবে নয়, আধুনিক গল্প হিসাবে।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার উপর নির্ভর করে অনেক ব্যালাড রচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীনতার যে মোহ ব্যালাডের অন্যতম আকর্ষণ তা আর পরবর্তীকালের ব্যালাডে বজায় রাখা যায়নি।

বেস্টিয়ারি (Bestiary)

জীবজন্তুসংক্রান্ত নীতি উপদেশমূলক রচনা

কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত না হলেও মধ্যযুগে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন, খৃষ্টের মহিমা প্রচার, প্রতীকি ধরণে কোন কিছু বোঝান, ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে বা হয়ত গল্প শোনানোর তাগিদে,—কিছু কিছু জীবজন্তুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে জীবজন্তুকে যতখানি মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তার সামান্যমাত্রও পশুপক্ষী সংক্রান্ত এইসব গল্পে দেওয়া হয়নি। প্রধানতঃ উপদেশ ও নির্দেশমূলক সাহিত্যে পশুপক্ষীকে আনা হয়েছিল বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে। পশুপক্ষী যেগুলিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মধ্যযুগীয় সেইসব কাব্য উচ্চস্তরেরও নয়, বা সাহিত্যের কোন উৎকর্ষ-সাধনও তাতে হয়নি। তবে বলার ভঙ্গী এবং জীব-জগৎকে কিছুটা স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা ওই সব কাব্যে ছিল। এগুলিকে সাধারণতঃ জীবজন্তু সংক্রান্ত নির্দেশমূলক সাহিত্য বা জীবজন্তুসংক্রান্ত সাহিত্য বলা চলে। ইংরাজী নাম বেষ্টিয়ারি (Bestiary)। Fox and the Wolf (ফেকস এ্যাণ্ড দি উলফ)—'শিয়াল ও নেকড়ে' এই জাতীয় পদ্যে লেখা গল্পের একটি উদাহরণ। —এটিকে 'কৌতুক-কাব্য' অপেক্ষা 'বিদ্রুপাত্মক সাহিত্য' বলাই বেশী যুক্তিসঙ্গত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই জাতীয় কাব্য কয়েকটি লেখা হয়েছিল। এরা কোন ধারা সৃষ্টি করেনি। 'ফেবলস' জাতীয় গদ্য সাহিত্যের কথা এখানে অবান্তর।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়, **গদ্যগ্রন্থ**—অনুবাদ অথবা মৌলিক। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম মৌলিকতার থেকেও বেশী গৌরব ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই গদ্য গ্রন্থের আবির্ভাব ও বিকাশ সুরু হয়।

আমরা এখানে দুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিগদর্শনের কথা আলোচনা করবো।

এ্যানক্রেন রিয়লে (Ancrene Riwle)

অর্থাৎ 'সন্ন্যাসিনীদের পালনীয় নিয়মাবলী'।

১২২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বা কিছু পরে বইটি লেখা হয়েছিল। সমারসেটসায়ারের যে সব সন্ন্যাসিনীদের জন্য এটি লেখা হয়েছিল তাঁরা মঠে থাকতেন না ; কাছাকাছি

কোন নির্জন পরিবেশে থাকতেন। এটি ছিল মধ্যযুগের প্রথম দিকের গদ্যজাতীয় সমস্ত লেখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১২৫০ সালে এর পূর্ণ সংস্কার হয়। পরিমার্জিত এই নতুন সংস্করণটির নাম 'এ্যানক্রিন ওয়াইসে' (Ancrene Wisse) অর্থাৎ 'সন্ন্যাসিনীদের পথপ্রদর্শনকারী'। পুরাতন ও নূতন দুটি গ্রন্থেরই পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি বর্তমান আছে।

গ্রন্থটি সরল ও সুন্দর। ধর্মাচরণের সঙ্গে মানুষের মঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখান এর তদানীন্তন জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। এই গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব এই যে এটি ইংরাজী গদ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। গ্রন্থটিতে যে নৈতিক মান বজায় রাখা হয়েছিল তা প্রশংসার দাবী রাখে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এইটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইংরাজী গদ্যগ্রন্থ।

এর পরের যে গ্রন্থটির উল্লেখ করতে হয় তা হ'ল—**'এ্যাজেনবাইট অব ইনউইট' (Azenbite of Inwyt)**।

এটি আনুমানিক ১৩৪০ সালে লেখা। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা গ্রন্থটির সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্ব এই কারণে যে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে লেখকের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। লেখকের নাম ড্যান মাইকেল (Dan Michel)। তিনি ছিলেন নর্থগেটের (Northgate) অধিবাসী।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যা কিছু গদ্যলেখা ছিল তা' ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কিত। প্রায় ১০০ বছর বাদে ম্যাণ্ডেভিলের ভ্রমণ বৃত্তান্তের আগে গদ্যে আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ লেখা হয়নি।

নাটকের কথা

মধ্যযুগের যে সব ধরণের সাহিত্যকর্মের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা এখানে করা গেল তার ভিতর লিখিত বা অভিনীত নাটকের কোন সম্ভাবনা আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখি না। মধ্যযুগীয় পরিবেশ নাটকের পরিবেশ নয়। বিচিত্র-সুন্দর এই জগত সম্পর্কে মোহ এবং আশার দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগের বিশেষত্ব। তার সঙ্গে নাটকের কোন সম্পর্ক নেই। প্রচণ্ড মননশীলতা, উচ্চ চিন্তা, দিব্যদর্শন যেমন এ যুগে অতীত, তেমনই সুদূরের বিস্ময়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির গৌরব, বুদ্ধি ও স্থিতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য মধ্যযুগের ইংরাজের অধিগত ছিল না। যে সৌন্দর্যবোধ, অনাবিল আনন্দ, প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রনা এ যুগের মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার কৃত্রিম পুনঃসৃষ্টিতে পরিবর্তনের কথা ভাবা যায় নি। মানুষের জীবনই মানুষের কাছে চূড়ান্ত বোধ্য ব্যাপার; শিল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতিরূপ প্রদর্শন মানুষের কাছে খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। তাই ইংরাজী নাটক সচেতন কর্মধারার পথ বেয়ে আসে নি। ব্যবহারিক জীবনে ভাল লাগার বস্তুকে পুনরাবৃত্ত করতে করতে একটা নুতন অনুশীলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকল, এবং তা স্বাধীন অন্য-নিরপেক্ষ বিশেষ ধারার আনন্দ। মানসিক বিহ্বলতার একটা অভাবিত পর্যায় ক্রমে ক্রমে স্থায়ী হল। তার ভিতরে মানুষ নিজের প্রতিরূপ, নিজের প্রকৃতির প্রতিরূপ দেখতে পেল, এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকল। ইংরাজী নাটকের অঙ্কুরোদগম

সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার পরিবেশেই কখন যেন একটা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে ও চরিতার্থ করতে সুরু করল। ইংরাজী নাটক কোন একজন মানুষ বা কোন একশ্রেণীর মানুষ তৈরী করেন নি। এ হল মধ্যযুগের বর্ণাঢ্য বিহ্বলতায় অন্যমনস্ক এক অপ্রত্যাশিত নির্ঝর। মধ্যযুগে সুপরিণত নাটক নেই, কিন্তু মধ্যযুগেই নাটক সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যযুগে যে নাটকীয় শিল্পকর্মের অস্পষ্ট আরম্ভ, তার ভিতরে কোন ক্লাসিক অন্তর্লীন প্রভাব কাজ করেনি। এ ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের গ্রাম্য এবং স্বাধীন সংস্করণ।

খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীতে রোম্যানরা ইংল্যাণ্ডে প্রকাণ্ড কয়েকটি এ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরী করেছিল। এ্যাম্ফিথিযেটার মানে উভয় দিক বা চারিদিক পরিবেষ্টনকারী ক্রমোন্নত আসনের সারি। এগুলি নাটক দেখার জন্য তৈরী হয়নি, অন্য দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। তবে অভিনীত নাটক দেখার পক্ষে এগুলি খুবই উপযুক্ত হতে পারতো। পরবর্তী খৃষ্টান আমলে এগুলি অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত হয়েছিল। এগুলির কোন প্রযোজন ছিল না, বা প্রযোজন থাকলেও বৃটেনে নাট্যকলার চর্চার জন্য এগুলির কোন উপযোগিতা ছিল না। দেশে রোমক কৃষ্টিও প্রচলিত হয় নি; বা নাটকীয় ধরণের কোন কাজের জন্য ধর্মীয় সমর্থনও ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন মানুষ ব্যাপারটির তাৎপর্য না বুঝেই জীবিকার প্রয়োজনেই কিছু কিছু আচার-আচরণ অধিগত করেছিল। নাট্যক্রিযার অঙ্কুরোদগম হযনি, তবে নাটকীয় ধরনের জীবিকান্বেষী চালচলনের পৃষ্ঠপোষক ছিল। ভ্রাম্যমান কাহিনীকার, গীতিকার এবং গায়কদের জনপ্রিযতা ছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত এদের যে অংশকে 'মিনসট্রেল' (Minstrel) বলা হত, তারা এংলোস্যাক্সন আমলের 'স্কোপ'-দের (Scop) থেকে এগিযে ছিল। স্কোপরা (Scop) বীরমানুষদের জীবনী অবলম্বন করে কবিতা রচনা করতেন। মধ্যযুগের পশ্চিম ভারতের 'ভাট' কবিদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা যেত। কিন্তু 'মিনসট্রেলদের' কল্পনাশক্তি ছিল, কাব্যবোধও ছিল, যদিও তাঁদের সামাজিক সম্মান তেমন ছিল না। এঁদের গৌরব করে ভ্রাম্যমান ঐতিহাসিক বলা যেতে পারত যদি তাঁদের বিষয়বস্তুর ভিত্তি প্রামাণ্য হত। জনসাধাবণের এবং অভিজাতদের দাবী ছিল তাঁদের প্রধান সম্বল; তাই তাঁরা লোককাহিনীর উপরে উঠতে পারেন নি। ধর্মসংগঠন তাঁদের সমর্থন করেনি, আবার গুরুতর রকমের বিরোধিতাও কবেনি। তাঁরা ধর্মপ্রচার করেন নি; নেচে গেয়ে গল্প শুনিয়েছিলেন। এই মিনসট্রেলদের ভিতর সুপ্ত ছিল দেশী অভিনেতা ও নাট্যকার। কথাটা গুণগতভাবে এত অভাবিত প্রয়োগ যে তাকে অগ্রাহ্য করার ঝোঁক আধুনিক আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীতে খুবই স্বাভাবিক।

ক্যাথলিক চার্চের কৃত্যাদির ভিতের একধরনের নাটকীয়তা ছিল যা নির্ভেজাল বিশ্বাস ও হাস্যকর আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত। এইসব কৃত্যাদির দর্শনীয়তার উপরে জোর দেওয়া চার্চের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ভক্ত সাধারণ মানুষদের (Laity) তা' ভাল লাগত। ভক্ত সাধারণ মানুষদের নিজস্ব আকর্ষণের গণ্ডীর ভিতরে রাখা চার্চের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। তাই ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের দর্শনীয়তার গুণ বজায় রাখার জন্য চার্চের মাথাব্যথা ছিল। এই আকর্ষণ এবং অনিচ্ছাকৃত আস্কারার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এক নতুন

মজার সৃষ্টি হল। কোন নিয়মকানুন নয়,—কিছু কথা, কিছু অঙ্গভঙ্গী, কিছু ইশারা, এবং কিছু জীবন্ত ব্যাখ্যা,—এই নিয়ে একটা নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি হল, চার্চ যাকে ফেলতে পারল না, সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিতেও পারল না ; —আর তা-ই হ'ল নাটকের অঙ্কুর। কাজেই এর ভিতরে নতুন শিল্প-উদ্ভাবনের কোন সজ্ঞান প্রচেষ্টা ছিল না। গোড়ার দিকের ইংরাজী নাটক তাই ছিল স্বয়ম্ভূ। দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাবে আড়ালে আড়ালে নাটকের মত কিছু একটা বড় হয়ে উঠছিল। আসলে চার্চ বুঝতেই পারেনি যে তার ছত্রচ্ছায়ায় এমন একটা ধর্মনিরপেক্ষ আনন্দদায়ক শিল্প প্রচলিত হতে সুরু করেছে। এ শিল্প প্রথম দিকে চার্চ-অনুমোদিত গণ উপাসনার মধ্যেই শুধু মিশে ছিল। পরে ধীরে ধীরে চার্চের সমস্ত অংশই—বাইবেল পাঠ, ব্যাখ্যা এবং নিয়মমাফিক বা ব্যক্তিগত উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন দিক—জনপ্রিয়তার খাতিরে কলকাতার 'জেলেপাড়ার সং'-এর ধর্মীয় সংস্করণে পরিণত হ'ল। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং উৎসব অনুষ্ঠানের আনন্দ—দুই যেন মিশে গেল। সাধারণ মানুষ ধর্মের গুরু গম্ভীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দ উৎসবের মধ্যে ধর্মের সহজ ব্যাখ্যাকে রূপ দিল। অভিনয়, অভিনেতা, মঞ্চ, দর্শক, উৎসবমুখরতা,—সব কিছুর একটা অদ্ভুত সমন্বয় গড়ে উঠল। এই ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাসে ছিল 'ধর্মীয়', কিন্তু আনন্দের নেশায় নাট্যাভিনয়ের গুণপ্রাপ্ত। পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তার নাটকে পৌঁছতে পঞ্চদশ শতাব্দী কেটে গিয়েছিল।

(আমরা এই খণ্ডে মধ্যযুগের আলোচনা চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নিয়ে যাব ; তার বেশী নয়।)

স্বতন্ত্রধারায় ধর্ম বা ধর্মসংগঠন থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা অপ্রত্যাশিত, কিন্তু তা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। পৌরানিক নাটক অভিনীত হওয়া আর ধর্মচর্চা যেমন এক জিনিষ নয়, তেমনি ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে আনন্দ-উৎসব এবং চার্চের উপাসনা যে আলাদা,—এটা যখন বোঝা গেল তখন নাটক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এই ক্রমবিকাশের ধাপগুলি দেখে নেওয়া যেতে পারে, এবং এগুলির অনুসরণের দ্বারাই সাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের শুভাগমন প্রত্যক্ষ করা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নাটক ধর্মনিরপেক্ষ হতে সুরু করল। তবে তার আগের একশ বছরের ভূমিকা জানা দরকার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভাষা ল্যাটিন ছেড়ে ইংরাজী আশ্রয় করল। চার্চ যখন বুঝল, ধর্মের চেয়ে ধর্মের অবাঞ্ছিত সন্তান বেশী জনপ্রিয় হয়েছে তখন চার্চ তাকে ত্যাগ করল। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল। চার্চ থেকে বিতাড়িত নাটক তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ে যেতে সুরু করল। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা গিল্ডগুলির অনুমোদন এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেল 'নাটক' বা সঠিকভাবে বলতে গেলে 'অভিনয়'।

পৌর্বাপর্ব বোঝার জন্য আর একটু গোড়ার দিকে যাওয়া দরকার। নবম শতাব্দীর শেষদিকে খৃষ্টের পুনরুত্থান (Easter) উপলক্ষ্যে পবিত্র পানভোজনের সঙ্গে একটি নূতন বিষয় যুক্ত হল। "পবিত্র" ল্যাটিন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পুরোহিতদের দ্বারাই এক ধরনের বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা ও বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ প্রয়োগ সুরু হল। যীশুর সমাধিস্থল

বলে সাজানো জায়গায় দেবদূত, মাতা মেরী ও অন্যান্যদের প্রায় হেঁয়ালিতে এবং সামান্য কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে কথোপকথনের অভিনয় দর্শকদের ভিতর খুব আনন্দের সঞ্চার করতো। এই অভিনয়টির নাম ছিল কোয়েম কোয়ারিটিস (Quem Quaertis) অর্থাৎ "কাহাকে খুঁজিতেছ?" পরে এই প্রতীকি উপস্থাপন সরাসরি চরিত্রাভিনয়ে পরিবর্তিত হল। সঙ্গে সহযোগী ভক্তিমূলক গানের সুরও বজায় রাখা হল, অর্থাৎ বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাকে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলা হল।

কিছুকাল পরে বড়দিনের উৎসবের সঙ্গেও এই নতুন ব্যাপারটি যুক্ত করা হল। এর নাম দেওয়া হল অফিসিয়াম প্যাস্টোরাম (Officium Pastoram)। ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল পূজার্চনার কাজের ব্যবহারিক প্রয়োগ। কিন্তু এই ধরনের ব্যবহারিক প্রদর্শনীর পক্ষে বাইবেলের কোন সায় বা সমর্থন ছিল না। ভক্তিপ্রকাশে ভণ্ডামী ছিল না, কিন্তু পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন, এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ধর্মসংগঠনের কর্তৃপক্ষের প্রায় হাতের বাইরে। বড জোর তাঁরা তাকে নিষিদ্ধ করতে পারতেন, বা বিতাড়িত করতে পারতেন; এবং তাঁরা তা ক'রেও ছিলেন।

তারপর এল যীশুর জন্মের সময়ের বিখ্যাত সেই দৃশ্যের অনুকরণ। প্রাচ্যের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি 'ম্যাজাই' (Magi) এলেন,—তাঁদের পোষাকে প্রাচ্যের জাঁকজমক। তারপর এলেন রাজা হেরড,—যাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের যেতে হয়েছিল। আর এল হেরডের সেই বাইবেলে বর্ণিত নাটকীয় আস্ফালন। হেরডকে খুব চিৎকার করতে হত, এবং কৌতুকপ্রিয় দর্শক মহাআনন্দে তা' উপভোগ করত। নাটকের এবং অভিনয়ের আর বাকি রইল কতটুকু?

বড়দিনের উৎসবের ভিতরে আরও কিছু কিছু ঘটনা ও দৃশ্য অনুপ্রবেশ করল। ধর্মীয় কৃত্যাদির গাম্ভীর্য এতে ক্ষুন্ন হলেও সাধারণ মানুষ যে অর্বাচীন আনন্দ পেতে থাকল তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা চার্চের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জনসমাগম বাড়তে লাগল। মূল আকর্ষণ এইসব অভিনব দৃশ্য ও কার্যকলাপ। কাজেই চার্চের গণ্ডীর বাইরেও এগুলি ছড়িয়ে পডল, এবং সেখানে পুরোহিতদের কোন কর্তৃত্ব থাকল না। এ অবস্থায় এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে চার্চকে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে হ'ল। চার্চের ক্ষতিবৃদ্ধি তেমন কিছু হল কি না সে আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ মানুষ শিল্পসাহিত্যের নতুন একটা প্রসারণের ক্ষেত্র পেল, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। এর পরে বাকি থাকলেন শুধু নাট্যকার। নতুন এক রীতিতে, নতুন এক শিল্পের জন্য সাহিত্য-কুশলতার পরীক্ষা দিতে যাঁরা একে একে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

এই সব ধর্মীয় বিষয়ের নাট্যরূপকে বলা হচ্ছিল মিরাকল (Miracle) অর্থাৎ অলৌকিক। কয়েক শতাব্দী পরে বাইবেলে বর্ণিত ঘটনার নাট্যরূপকে বলা হতে লাগল 'রহস্য' বা মিস্ট্রি (Mystery)। বাকি সব কিছুরই মিরাকল (Miracle) অর্থাৎ 'অলৌকিক' নামই বজায় রইল। মনে রাখতে হবে, এগুলি আর ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভূক্ত বা প্রসারিত অংশ ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীতেই এগুলি রচনায়, ব্যবস্থাপনায় ও অভিনয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকের রূপ পেয়ে গেল।

এই চতুর্দশ শতাব্দীতেই গিল্ডগুলি হয়ে দাঁড়াল নাটকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবস্থাপক। প্রথমে ধর্মীয় ও সামাজিক গিল্ড এবং পরে বণিকদের গিল্ড স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই কাজে এগিয়ে এলেন। এই গিল্ডগুলির কর্ণধারগণ তখন কল্পনাও করেন নি যে তাঁরা মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কি বিরাট সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গতঃ, গিল্ড (Guild) কথাটির মানে বড় বড় শহরের ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত বণিকসংঘ। মধ্যযুগে এই সব বণিকসংঘের খুব মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল।

প্রাথমিক স্তরের নাটকগুলি পরে সুসংগঠিত ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল। তবে এই সব বিবর্তন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে সুস্পষ্ট ছিল না। আমাদের বর্তমান অধ্যায় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নাটকেরও ক্রমবিবর্তনের আরও কথা বলার রইল।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ

মধ্যযুগের প্রথম দিক থেকেই ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম দুই বিশ্ববিদ্যালয় রূপ পেতে সুরু করেছিল। অন্যান্য ধারায় জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশের সাহিত্যকর্ম পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিকে ল্যাটিনের প্রভুত্ব এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে ফরাসী দেশের, সাহিত্যের গুণানুসরণ তারা অগ্রাহ্য করতে পারেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয যে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে উঠেছিল এটা বেশ বোঝা যায়। তাই সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম স্মরণ করা আমি দরকার মনে করছি।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ইংল্যাণ্ডের প্রধান দুটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা জগতে ও সাহিত্য জগতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সেই থেকে বরাবর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী হিসাবে, এবং সাহিত্যের মান বজায় রাখার ব্যাপারে প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। দেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ ও প্রায়ই এদের উন্নতমান বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া, এদেরই সংগ্রহশালা ও পাঠাগারে দেশের সাহিত্যের অতীত অবস্থা ও ক্রমোন্নতির বহু নথিপত্র রাখা হয়েছে; এবং সেগুলির উপর চর্চা ও গবেষণার দ্বারা এবং জাতীয় চিন্তাধারার ও প্রধান প্রধান প্রবণতার বিশ্লেষণের দ্বারা জাতির মৌল চিন্তাজগতের পরিচয় নতুন নতুন ভাবে বরাবর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। শিক্ষার পীঠস্থান এবং সাহিত্যের পীঠস্থান অনেক ক্ষেত্রে একজায়গাতেই এসে মিলেছে,—এ বোধ আধুনিককালে অনেক দেশেই স্বীকৃত।

এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ সুরু হয়নি। বিশিষ্ট শিক্ষাগতপ্রাণ মনীষি এবং নানা উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই দুটি জায়গায় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে, এবং ক্রমে সেগুলির সম্মিলিত কেন্দ্রীবদ্ধরূপ বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত হতে থাকে। এ ব্যাপারে ক্রুশেডের

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ক্রুশেড উপলক্ষেই ইউরোপ প্রাচ্যের জ্ঞান ও শক্তির মুখোমুখি হয়েছিল। প্রাচীনতর ও উন্নততর প্রাচ্যের জ্ঞান পাশ্চাত্যের চিন্তাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। ক্রুশেড আরম্ভ হয় ১০৯৫ সালে। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দী পেরিয়ে ত্রয়োদশ শতকে ক্রুশেডের ব্যাপক ফলশ্রুতি ইংল্যাণ্ডের জ্ঞানের জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন আনে। বহু বিষয়ে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সত্যকার জ্ঞানী মানুষদের কেন্দ্র ক'রে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এগুলিই কেন্দ্রীবদ্ধ হয়ে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে। এডমণ্ড রিচ (Edmund Rich), এ্যাবেলার্ড (Abelard), রোজার বেকন (Roger Bacon) এবং অন্যান্য অসাধারণ শিক্ষকের পদধূলিতে ধন্য এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য বর্ণনা হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

লণ্ডন থেকে ৮০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান অক্সফোর্ডসায়ারে চেরওয়েল (Cherwell) এবং আপার টেমস (Upper Thames)-এর মাঝখানে অক্সফোর্ড অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষেরা ওখানে টেমস-এর নাম দিয়েছেন আইসিস (Isis)। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অক্সফোর্ডে কতকগুলি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১১৬৭ সাল থেকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজ ছাত্রদের প্রবেশের অধিকার সঙ্কুচিত হওয়ায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন বাড়ী ছিল না। ভাড়া করা কোন বাড়ীতে বা কোন গীর্জায় পাঠদান হত। ছাত্রদের জন্য দাতব্য বাসস্থানে কলেজগুলি একে একে সুরু হয়। কলেজগুলির ভিতর প্রাচীনতম ইউনিভার্সিটি কলেজ (University College) প্রতিষ্ঠা হয় ১২৪৯ সালে। বেলিয়ল কলেজ (Balliol) ১২৬৩ সালে, এবং মার্টন (Merton) কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় ১২৬৪ সালে। রোজার বেকন (Roger Bacon) ছাড়াও প্রথম দিকের খ্যাতনামা অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ডানস স্কোটাস (Duns Scotus), উইলিয়ম অব অকহাম (William of Ockham) এবং অন্যান্যরা। ওয়াইক্লিফ (Wycliffe) তাঁর জীবনের অধিকাংশ এখানেই কাটিয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটি কলেজ, বেলিয়ল কলেজ এবং মার্টন কলেজ ছাড়াও প্রথম দিকের কলেজগুলি ছিল এক্সেটার (Exeter)—১৩৩৪, ওরিয়েল (Oriel)—১৩২৬, কুইনস (Queen's)—১৩৪০। এ ছাডা সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান সেন্ট এডমাণ্ড হল (St. Edmund Hall)-(১২৭৮) এবং ওয়ারসেস্টার (Worcester) (১২৮৩)-এ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লণ্ডন থেকে ৮০ কি.মি. উত্তরে ক্যাম (Cam) নদীর ধারে কেম্ব্রিজ শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়। ১২০৯ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের সুরু। ওই সময়ে অক্সফোর্ড থেকে কিছু ছাত্র এখানে চলে আসেন। প্রথম কলেজ পিটার হাউস (Peter House) ১২৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১৮ সালে ষ্টাডিয়াম জেনারেল (Studium Generale) হিসাবে পোপের স্বীকৃতি পায়। প্রথম দিকের কলেজ ও সমকক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল ক্লেয়ার (Clare)-১৩২৬, কোরপাস ক্রিষ্টি (Corpus Christi)-১৩৫২, গনভিল এ্যাণ্ড কেয়াস (Gonville and Caius)-১৩৮৪, পেমব্রুক (Pembroke)-১৩৪৭ এবং ট্রিনিটি হল (Trinity Hall)-১৩৫০।

চার্চের বিশ্বাস এবং সংস্কারমুক্ত জ্ঞান—যা পরবর্তীকালে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের স্বাধীন মনস্বিতায় ব্যক্ত হয়েছে—সেই সংস্কার ও জ্ঞানের দ্বন্দ্ব এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। তবে বিমুক্ত জ্ঞানের চর্চা আরও ৬০০ বছর ধরে সংগ্রামের পুরস্কার।

ওয়েলস-এর সাহিত্য (Welsh Literature)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ওয়েলস-এর সাহিত্য সম্বন্ধে আলাদা করে দু'এক কথা বলা দরকার। নবম শতাব্দীতে স্যাক্সনদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের ভাবাবেগ একটা নাড়া খেয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ওয়েলস-এর গ্রাম্য মানসে জাতীয়বোধ-প্রণোদিত সঙ্গীতের একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মধ্যযুগীয় ওয়েলস সাহিত্য একটা সুসংগঠিত রূপ পেয়েছিল। জাঁকজমক চিত্রকল্পের প্রাচ্যদেশীয় ধরনের একটা প্রস্ফুরণ গ্রাম্য স্বভাব কবিদের ভিতর থেকেই উঠে এসেছিল। এতে আবেগ ও বিষাদের এক অতিপ্রাকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল, যা সমসাময়িক কালের ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যে ছিল না।

তাছাড়া, মধ্যযুগে ওয়েলস-এর দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন শব্দ, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রকাশের ধরন ইত্যাদি রোম্যান্টিক সাহিত্য প্রকাশের অত্যন্ত উপযুক্ত বাহন ছিল। অথচ তা বিশৃঙ্খল বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশেষ তারতম্য হবার মত ভাষা ছিল না; বহু শতাব্দী আগে থেকেই আকার ও গঠনের দিক থেকে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই সুপরিণত ও সুনির্দিষ্ট ভাষাব চৌহদ্দির ভিতরে কেল্টিক কল্পনা বাইরে লোকের কাছে চমকপ্রদ হতে পেরেছিল। কেল্টিক লোককাহিনী ও গল্পসম্ভারকে বলা হত 'মাবিনোজিয়ন' (Mabinogion)। গল্পকার 'ছোট গিয়ন' (Gwion the Little) নিজেকে নানা পশুপাখী ও শস্যে রূপান্তরিত করলেন। এধরনের গল্পের অভিনবত্ব আছে আমাদের কাছে; কিন্তু এগুলিকে স্বাভাবিক এবং প্রতীকি পরিচয় হিসাবে দেখার মন আমাদের নেই। এ সাহিত্যে অসম্ভব বা অবাস্তব বলে কিছু নেই। এগুলি বড কোন বিশিষ্ট কবির কল্পনা নয়। ওয়েলসের মানুষের জাতিগত বিশেষত্ব, তাদের বিশ্বাস, কুসংস্কার সব কিছু সমসাময়িক ইংরাজী সাহিত্যের থেকে আলাদা। তবে ইংরাজী সাহিত্যের ধারার অন্যতম উপনদী হিসাবে এগুলির উল্লেখ প্রয়োজন।

আগে যে মাবিনোজিয়ন (Mabinogion) এর উল্লেখ করলাম তার জগৎ ছিল এক অলীক জগৎ। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকে দেখতে হয়। অন্ধকার বন, তপস্বীর বাস, সূর্যালোকিত ফাঁকা জায়গা, বীরনায়কের শিরস্ত্রাণ ও বর্মের উপর আলোকের বিচ্ছুরণ, সর্বত্র উজ্জ্বল রং-এর বাহার। কুমারীদের পরিহিত রেশমীবস্ত্রের রং আগুনের শিখার মত, আরক্তিম স্বর্ণবর্ণের কণ্ঠাভরণ, তাতে মণিমুক্তা বসান; ব্রুম (Broom) জাতীয় গুল্মের ফুলের থেকেও উজ্জ্বলতর স্বর্ণবর্ণের মস্তকাভরণ, সমুদ্রের ঢেউ-এর ফেনার থেকেও অধিকতর শ্বেত তাদের গাত্রচর্ম, শ্যেনপাখীর থেকে, বাজপাখীর থেকে তীক্ষ্ণতর তাদের চোখ, লাল গোলাপের থেকে অধিকতর লাল তাদের কপোল। এই হচ্ছে সেই বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত চিত্রকল্প যা ওয়েলস-এর মানসিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এরই সঙ্গে মিশে আছে এক আবেগময় বিষণ্নতা। প্রকৃতির বর্ণনাতেও প্রকাণ্ড অতিরঞ্জন; কিন্তু তা মানুষকে অভিভূত করে, পরাঙ্মুখ করে না। আবার, কত সহজ কথা অদ্ভুত সুন্দরভাবে শোনাতে পারেন কাহিনীকার। একদিকে গাঙচিল যখন উড়ে যায়, আর একদিকে নাইটিঙ্গেল পাখী গান গেযে চলে তখন রাত্রিবেলায় মরানদীর সোঁতার ধারে 'মানুষের যার ওপরে কখনো পা পড়েনি' এমন ঘাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গোয়ালকমাই (Gualchmai) যখন ঘোষণা করেন, 'আমি পাখীর গান শুনতে ভালবাসি, সেই মিষ্টিগান যা আমাকে বনের মাঝখানে ঘুম পাড়িযে দেয়',—তখন যেন বুঝতে পারি এই জংলী পাহাড়ী জাতটা বাস্তবতার আবছা সীমার বাইরে কোন এক রহস্যময জগৎ নিয়ে বেঁচে আছে।

সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের উপত্যকায়, বনের প্রান্তে তাদের শহর, তাদের নিসর্গশোভা, তাদের গাঙচিল, তাদের সুন্দরী মেয়েরা,—তাদের আলাদা একজগৎ। এ জগৎ তারা কলুষিত হতে দেয় না; তাদের দেশপ্রেমের সাহিত্য এই ভাবকল্পনায় বিভোর। ইংল্যাণ্ডের অন্য অংশের প্রেমভালবাসার সাহিত্য আলাদা। প্রত্যুষের আর সায়াহ্নের আকাশের সেই গোলাপী আভা এদের সারা দেশে, সারা মনে ছড়িযে আছে। এদের ভালাবাসা আনন্দলোকের ভালাবাসা,—সে আর এক জগৎ। আবার, এদের সাহিত্যে আবও মিশে আছে রণোন্মাদনা, দেশপ্রেমের দুর্বার আকর্ষণ আর স্যাক্সনদের প্রতি ঘৃণা। ওযেলসেব এই কেল্টিক সাহিত্য পরবর্তীকালে সুসমন্বিত ইংবাজী সাহিত্যে বেশ কয়েকজন বড কবিকে উপহার দিয়েছিল।

বাইবেল (The Bible)

যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ সুরু হয়ে যায, তবুও এই সংক্রান্ত কথা আমি পরবর্তী খণ্ডে বলার চেষ্টা করবো।

ঃ নিবেদন ঃ

সংক্ষেপে, আমি এ পর্যন্ত মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছুটা বর্ণনা করলাম, এবং আপাততঃ এখানেই এই সামান্য আলোচনা বিনীতভাবে সংযত করলাম। সহৃদয পাঠকগণের সমালোচনা ও সহানুভূতি পেলে উৎসাহিত হব।

উপসংহার

মধ্যযুগের কাব্যের একটা বিশেষত্ব ছিল যে স্রষ্টা এমনভাবে নিজের পরিচয় রাখার চেষ্টা সাধারণতঃ করেন নি যে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মুখ্য আকর্ষণ হবে স্রষ্টার মানসিকতা বিশ্লেষণ। কাব্যের ভিতরে নিজের বোধ ও অনুভূতিকে কবি চিরকাল সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু মধ্যযুগের কবি নিজের অনুভূতির দীপ্তির আড়ালে কোথায় যে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন তা যেমন পাঠকেও জানেন না, তেমনি কবি নিজেও আত্মপরিচয় দিতে উদগ্রীব হননি। এই সুর মধ্যযুগের সাহিত্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। হয়ত এর ভিতরে অনেকাংশে আধ্যাত্মিক আত্মনিবেদনের একটা ভূমিকা আছে।

আমার এমনও মনে হয় মধ্যযুগের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় আগামী দিনের পথ মধ্যযুগের কবিরা যে কিভাবে আলোকিত করে দিয়ে গেলেন, তা তাঁরা নিজেরা হয়ত পুরোপুরি উপলব্ধি করেন নি। লৌকিক ও অতিলৌকিক উদাত্ত বিশালতায় আদিযুগের কবিরা জগৎকে প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চোখে দেখেছিলেন। তাঁরা ঠিক কবিও ছিলেন না। দুঃখ ও আনন্দের নির্বাধ স্ফুরণে তাঁরা ছিলেন প্রকাণ্ড মানুষ। মধ্যযুগে চেষ্টাকৃত আলঙ্কারিকতায় সে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়েছিল। অতিপ্রাকৃতভাব মধ্যযুগেও খুব স্পষ্টভাবেই বর্তমান ছিল। কিন্তু হাতের নাগালে যে জগৎ তাকে সূক্ষ্ম কারুকার্যতায় এবং দক্ষ কুশলতায় অভিনব রূপ দেবার সচেতন প্রতিজ্ঞা ছিল মধ্যযুগের কবিদের।

মধ্যযুগ হারিয়ে গেছে। কোন কীটস (Keats), কোন টেনিসন (Tennyson) আর তাকে জীবন্ত করতে পারবেন না। রেমব্র্যাণ্টের (Rembrandt) ছবির মত তা সোনালী ফ্রেমে বাঁধান অতীতের অদ্ভুত সৃষ্টি বলে চিরকাল আমাদের রোমাঞ্চ জাগাবে। জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা পরিক্রমা করে এসেছিল প্রাচীন গ্রীসের যে মহত্ব তা-ও যেমন আজ চিরকালের জন্য অতীত, ইউরোপীয এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যযুগ তেমনই অতীত। আতিশয্য নিযে ব্যঙ্গের ডন কুইকসট (Don Quixote) লেখা যায়, কিন্তু আমাদের কল্পনায় মধ্যযুগের সেই পরিবেশকে মলিন করা যায় না।

মধ্যযুগের সাহিত্যের অনাবিল দুঃখ এবং অনিয়ন্ত্রিত আনন্দের খুব কম জায়গাতেই বক্রোক্তি-ব্যঙ্গোক্তি-কটুক্তিতে বুদ্ধির আধুনিক ধরনের তীক্ষ্ণতা ও তিক্ততার প্রকাশ। প্রহসন-প্রধান কিছু কিছু অংশও সরল। বিদ্রুপাত্মক রচনা (Satire) আর বুদ্ধির শান দেওয়া কথাও কম। যা ছিল তার থেকে বেশী কিছু বা অন্য কিছু আশা করার দরকার নেই। পরিস্থিতির বিচারে মূল্যায়ণ শিল্পবোদ্ধার একটা মস্ত শক্তি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ম্যাথু প্যারিস (Matthew Paris) ছিলেন মঠবাসী ঐতিহাসিকদের শেষতম মানুষ। ব্যক্তি পরিচয়ের বাইরেও তাঁর পরিচয় ছিল দেশভক্ত মানুষ হিসাবে। চার্চের কর্তৃত্ব নানাভাবে অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাচ্ছিল। মধ্যযুগের যত শেষের দিকে যাওয়া যাবে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে হলেও সাহিত্যের স্বতন্ত্র সত্ত্বা সৃষ্টি হয়ে চলেছিল। আবার একথাও সত্য, চার্চ যে শিক্ষাই দিক, মধ্যযুগের সাহিত্যে চার্চের ভূমিকা ছিল শক্তিশালী। তার কিছুটা ছিল বাধ্যতা আদায় করবার চেষ্টা, আর কিছুটা ছিল মানুষের ভিতরের বিহ্বল ভগবদ বিশ্বাস। 'ধর্মবিশ্বাসই সকল জ্ঞানের আধার',—এই পশ্চাদপদতা সত্ত্বেও ওই ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করেই ভাল সাহিত্য যে রচিত হয়েছিল তাতে কোন ভুল নেই। এ ব্যাপারে আধুনিক বিচারবুদ্ধি, যুক্তিতর্কের গর্বকে আমার বলতে ইচ্ছা করেঃ

'Let not ambition mock their useful toil'

পিতামহ প্রাচীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ; কিন্তু তাঁকে বাদ দিলে আমার অস্তিত্বও তো থাকে না।

পরিশিষ্ট

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ফরাসী ভাষার মর্যাদা খুব বেশী ছিল। মাতৃভাষা ইংরাজী (এবং তার নানা আঞ্চলিক উপভাষা) জন্মগতভাবেই মানুষের আয়ত্বে ছিল। তাই তার কদর করা এবং তাকে মার্জিত, উন্নত ও আন্তর্জাতিক করে তোলার কথা শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণী ভাবেনি। মনে রাখতে হবে, ইংরাজী উত্তর ইউরোপেব টিউটনিক ভাষার উত্তর পুরুষ, এবং ফরাসী রোম্যান্স ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও ফরাসী দেশেব উত্তর পশ্চিমাংশ এবং ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ পূর্বাংশ এত কাছাকাছি যে একের উপর আরেক ভাষার প্রভাব পড়া ছিল স্বাভাবিক। তবে নর্ম্যান বিজয়ের মত ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে এই প্রভাব তাড়াতাড়ি কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু দু'শবছর এই প্রভাব কার্যকরী থাকবার পর তা ভাঙতে সুরু করেছিল। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর উপর এই প্রভাব প্রথম থেকেই কিছুটা কম ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাই ফরাসী প্রভাব কেবল অভিজাত সমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। প্রাচীন বৃটিশ এবং স্যাক্সন ভাষায় সূক্ষ্ম আধুনিক ভাবপ্রকাশেব উপযুক্ত শব্দ কম ছিল। তবে ধর্মীয় আচার-আচরণ, নীতি-নির্দেশ, করণ-কারণের ব্যাপারে প্রথম দিকে খাঁটি ল্যাটিন, এবং পরের দিকে দেশীয ভাষা বা ল্যাটিন প্রভাবিত ইংরাজীর জনপ্রিয়তা দেখা যায। আর এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা: ধর্মীয় ব্যাপাবে অভিজাতদের আড়ম্বর আছে, ভক্তি নেই; যেখানে গরীব-মধ্যবিত্তের ভক্তি আছে, আড়ম্বরের সামর্থ্য নেই। আর এই ভক্তির প্রাচীরে ফরাসী প্রভাব প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল। গরীব মানুষের কাছে অর্থ না বুঝলেও ল্যাটিন তবু গ্রাহ্য ছিল, কিন্তু ভক্তিলেশহীন ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি তেমন পাত্তা পাযনি। কিন্তু ফরাসী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির যে রাজকীয কদর ছিল, ইংরাজী ভাষায় তা' একেবারেই ছিল না; ল্যাটিনেও পুরস্কার মরণোত্তব স্বর্গবাসের আশ্বাসের থেকে বেশী কিছু ছিল না।

মধ্যযুগে ফরাসী ভাষার যে শাখার সঙ্গে ইংরাজী ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটেছিল তা নরম্যাণ্ডির ভাষা। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক অনেক পরের কথা। এই নর্ম্যান ফরাসী প্রভাব দ্বাদশ শতাব্দীতে খুব কার্যকরী হয়েছিল। পরে নর্ম্যানদের সঙ্গে সম্পর্ক আর তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ফ্রান্সের সঙ্গে বেশ রেষারেষি সুরু হয়ে গেল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর নর্ম্যান-ফরাসী প্রভাব ইংরাজী ভাষার উপর থেকেই গেল বা আজও আছে। প্রধানতঃ এই প্রভাবই ভাষাগত দিক থেকে আদি এংলোস্যাক্সন যুগ থেকে ইংরাজী ভাষাকে মধ্যযুগে এনেছিল। ওই যুগের ফরাসী উপাদান ও ফরাসী প্রভাবিত পরিবর্তন সম্বন্ধ দু'এক কথা জানা দরকার।

শব্দসম্ভারে যোজনা ও পরিবর্দ্ধন

বহু শব্দ ফরাসী ভাষা থেকে সরাসরি ইংরাজী ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রধানতঃ প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত এবং আর কতকগুলি অভিজাত সমাজের নানা পরিচয়সংক্রান্ত। সরকার ও শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত অতি প্রচলিত ও অতি প্রয়োজনীয় অনেক শব্দই ফরাসী

ভাষা থেকে নেওয়া। সামন্ততন্ত্র, যুদ্ধ, আইনকানুন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, নৈতিক ধারণা ইত্যাদির বহু শব্দই এই একই ভাবে এসেছে। খাদ্যবস্তু, রান্নাবান্না, প্রভু-ভৃত্য, অভিজাতসুলভ অবসরবিনোদন, শিল্পকলা, পোষাক, স্থাপত্য, বৃত্তিব্যবসা, কারিগর এবং অন্যান্য নানা শ্রেণীর বিভিন্ন শব্দ ফরাসী ভাযা থেকে ইংরাজী ভাষায় চলে এসেছিল।

এছাড়া দেশীয় ভাষার প্রতিশব্দ হিসাবে বহু ফরাসী শব্দ ইংরাজী শব্দভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়েছে। তবে এই জোড়া-জোড়া শব্দের ইংরাজী শব্দটি সূক্ষ্ম অর্থভেদ বজায় রেখেছে। ইংরাজী শব্দগুলি মৌখিক কথাবার্তার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এবং সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল। নবাগত ফরাসী শব্দগুলি তুলনামূলকভাবে আনুষ্ঠানিক বা পোশাকি—[Hearty-Cordial]। দেশীয় ইংরাজী শব্দগুলি তুলনামূলকভাবে আবেগ-তাৎপর্য সমন্বিত।

'সঙ্কর' (Hybrid) শব্দঃ ফরাসী মূলশব্দের সঙ্গে ইংরাজী প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরী হয়েছিল। [Duke + dom = Dukedom]। অভিজাত 'ডিউক' পরিচয়ের সঙ্গে ডাম এই প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। অর্থ, ডিউকের দ্বারা শাসিত অঞ্চল বা ডিউকের মর্যাদা। অথবা ইংরাজী মূলের সঙ্গে ফরাসী প্রত্যয়যুক্ত শব্দ। যেমন [Shepherd + ess = Shepherdess] = মেষচারণকারিণী।

উৎপাদিত নতুন শব্দঃ ফরাসী শব্দ Duc (বাকি) থেকে duty (কর্তব্য) ; dutiful (কর্তব্যপরায়ণ) ইত্যাদি।

তবে ফরাসী শব্দের তাডনায় কিছু সুন্দর ইংরাজী শব্দ বাতিল বা প্রায-বাতিল হ'য়ে গেছে। যেমন, ইংরাজী শব্দ anda, cempa, eam, earm, here, leod, lof, sibb, wuldor, wyrd ইত্যাদি প্রাচীন ইংরাজী শব্দের বদলে যথাক্রমে envy, warrior, uncle, poor, army, people, praise, peace, glory, fate ইত্যাদি ফরাসী শব্দ স্থায়ী হযে গেল।

ব্যাকরণগত দিক থেকে পরিবর্তনঃ

বানানে পরিবর্তন—queen (<cwen) ;

শব্দধ্বনিতে পরিবর্তন—আধুনিক ইংরাজী Much (অনেক), days (দিনগুলি) পুরাতন ইংরাজীতে ছিল Mycel (উচ্চারণ 'মিকেল') এবং Dagas (উচ্চারণ 'ডাগাস')। মধ্যযুগীয় ইংরাজীতে সেগুলি হয় Mochele এবং Dazes. লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণের কোমলতার অগ্রগতি।

বাক্যগঠনঃ 'এর' এর ইংরাজী es ('s) বা 'of' দুভাবে হয়। দ্বিতীয়টি ফরাসী প্রভাবের ফল।

বাক্যে বিভিন্ন ধরণে শব্দবিন্যাসের বদলে সর্বত্র একই নিয়মের শব্দবিন্যাস ফরাসী প্রভাবের ফল।

শব্দাদির ব্যাকরণগত রূপসম্বন্ধীয় ব্যাপারেও ফরাসী প্রভাব পড়েছিল। বিভক্তি-প্রত্যয় যোগে শব্দের বা ধাতুর রূপ পরিবর্তনের ব্যাপারে ফরাসী প্রভাব খুব কার্যকরী হয়েছিল।

যেমন, এখন যে অধিকাংশ বিশেষ্য কেবলমাত্র -es বা -s যুক্ত করে বহুবচন করা হয় তা ফরাসী প্রভাবেরই ফল।

পূর্বতন ব্যাকরণগত লিঙ্গ পরিচয়ের বদলে ফরাসী প্রভাবিত স্বাভাবিক লিঙ্গ পরিচয় এখন ইংরাজীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহার হচ্ছে। প্রাণীদের পুরুষ বা স্ত্রী, এবং অ-প্রাণীদের সব ক্ষেত্রেই ক্লীবলিঙ্গ বলে বলা হচ্ছে।

ইংরাজী ভাষার উপরে ফরাসী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর এইবকম ব্যাপক ও স্থাযী প্রভাব সত্ত্বেও চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইংরাজের সর্বাত্মক জাতীযতাবোধ দানা বেঁধেছিল। তাতে শুধু ফরাসী রাজশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটে উঠেছিল তা নয, স্বদেশেও রাজশক্তির অহঙ্কার ও পোপের অযৌক্তিক অনুপ্রবেশের বিরোধিতা স্পষ্ট ছিল। অভিজাত-শ্রেণী, সাধারণ মানুষ এবং চার্চেরও স্বচ্ছ, মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন একটি অংশ জাতীযতাবোধের দ্বাবা ঐক্যবদ্ধ হযেছিল। জাতির এই পরিবর্তিত রূপেব মধ্যেই প্রকাশ পেতে সুরু করল জনপ্রিয় এবং সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের নিদর্শনগুলি যাঁরা একাধারে সাহিত্যের স্বর্ণযুগেব ভূমিকা তৈরী করবেন, আবার দেশের সমস্ত মানুষকে গর্ব ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত কববেন।

ভাষার শব্দসম্ভারে, ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, আভিজাত্যে ও প্রকাশভঙ্গীতে যে সব পরিবর্তন এসেছিল তার সামান্য কিছুর পরিচয আমরা এখানে দিতে পারলাম। আর, সাহিত্যিক অগ্রগতির খতিযান নিতে গেলে অবশ্যই দেখা যাবে গদ্যের বলিষ্ঠতা ও সাবলীলতা প্রকাশ পাবার সময তখনো আসেনি। পদ্যের আত্মপ্রকাশক ভঙ্গী তখনও সুগঠিত হয়নি। বিষয়গত তন্ময়তার চারদিকে তখনও প্রকাশের আকাঙ্খা আবর্তিত হচ্ছিল। তবে সরলতা ও স্বতোৎসারিত ভঙ্গী বেশ বোঝা যাচ্ছিল। সেখানেও কতকগুলি শাখা স্থাযী স্পষ্টরূপের দিকে এগিযে যাচ্ছিল, কিন্তু পরিণত অবস্থায় পৌঁছয নি। হযত তখনও কবির প্রকাশ ক্ষমতা এবং প্রকাশের নির্দিষ্ট লক্ষ্য একই সমতলে এসে পৌঁছাযনি। প্রকাশেব ক্ষমতা বাডান এবং বিষযবস্তুকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার স্বাভাবিক চেষ্টা অবশ্যই চলছিল, কিন্তু নির্ভরযোগ্য স্থাযী অবস্থায পৌঁছাতে তখনও দেবী ছিল। সবচেযে বড কথা ছিল অনায়াসভঙ্গী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অভাব। গঠনমূলক দূরদৃষ্টি থেকে কবিরা তখনও পেছিয়ে ছিলেন। কাব্যেব ভিন্ন ভিন্ন শাখার বা ধরনের নির্ভরযোগ্যতার আশ্বাস তখনও এসে পৌঁছায়নি। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক মতবাদগুলিব সম্বন্ধে জ্ঞান ও বোধের সাহিত্যিক ভিত্তি তৈরী হবার যুগ তো তখন স্বপ্নের কথা।

লিখিত সাহিত্যের ভাষা হিসাবে এই সময়ে দেশের মধ্যপূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃতি পেতে সুরু করেছিল। রাজধানীর ভাষা হিসাবে লণ্ডনের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং শিক্ষাকেন্দ্রের ভাষা হিসাবে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ভাষার নেতৃত্ব অন্য আঞ্চলিক ভাষার থেকে ক্রমশঃ বেশী স্বীকৃতি পেতে থাকল।

মধ্যযুগের যে মানুষ রাজা, রাজপরিবার এবং অভিজাতদের জন্মগত অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে একথা ভাবেই নি; ধর্মীয় অনুশাসনের থেকে দেশাত্মবোধ বা অন্য কিছুর বেশী গুরুত্ব থাকতে পারে একথাও কখনো বোঝেনি; চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা নয়, অবৈজ্ঞানিক নানা সংস্কারকেই স্বাভাবিক মনে করেছে; মধ্যযুগের শেষে সেই মানুষই

প্রতিষ্ঠিত সামাজিক গতানুগতিকতার থেকে যুক্তি ও বিচারবিবেচনা প্রয়োগের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকেছে। সমাজ সংস্কারক বা ধর্মীয় আন্দোলনের নেতারা নন অগ্রগামী বুদ্ধিমান মানুষেরা সাহিত্যের শক্তি মানুষের মধ্যে বিকীরণ করেছেন। হঠাৎ কোন রহস্যময় শক্তির প্রভাবে যা হয়নি, সাহিত্যে নিঃশব্দ পরিব্যাপক শক্তিতে তা হতে সুরু করেছিল। চূড়ান্ত, উজ্জ্বল বিশ্লেষণী শক্তি অবশ্য তখনও দেখা দেয় নি, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অগ্রগতির সম্পর্ক কখনও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি।

তবে সাহিত্যিকের পক্ষে আনন্দ-বেদনা সৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যবস্তুতে নিজেকে হারিয়ে ফেলার যুগ শেষ হয়ে আসছিল। ব্যক্তিগতভাবে কবিযশঃলাভেচ্ছু সাহিত্যিকের জাত বিনম্র কিন্তু ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল। এই সব নতুন সাহিত্যিক সজ্ঞানে অন্যদের আনন্দ দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। শ্রোতা, পাঠক বা অন্যান্য মানুষের ভীড়ে নিজেদের মিশিয়ে দিতে চাইলেন না। সাহিত্য একটা প্রকৃত গণশিল্প থেকে জনগণের প্রশংসা-প্রত্যাশী একটি বিশেষ শ্রেণীর দক্ষতার পরিচায়ক হতে চলল। এ অবস্থা আজও চলেছে। অধিকাংশ মানুষ অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু তাদের মনে এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে না থাকার জন্য কোন দুঃখবোধ থাকে না। এরা কেবল শ্রোতা ও পাঠক; আজকের সাহিত্য-জগতের প্রকাণ্ড সম্পদ। এই শ্রোতাদের (বা পরবর্তীকালের পাঠকদের) ভিতরেই কল্পনায় বা অন্তর্লীন স্মৃতিতে মধ্যযুগের বা তারও পূর্বের সাহিত্য বেঁচে থাকবে।

এই অংশের জন্য যে সমস্ত বই এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।—

Legouis and Cazamian : History of English Literature

W. P. Ker : English Literature (Medieval)

A. C. Baugh (Ed.) : A Literary History of England

P. Harvey : The Oxford Companion to English Literature

: Encyclopaedia Britannica

: Cambridge History of English Literature

প্রাক্-আধুনিক যুগ

(চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং পঞ্চদশ শতাব্দী)

প্রাক্-আধুনিক যুগ

(১৪২০—১৫০০)

ভূমিকা

সাহিত্যের পরিচয় তার ধারাবাহিকতার মধ্যে। নদীর জল শুকিয়ে গেলে অথবা তার ধারা পূর্বগতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা শুধু প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালই নয়,—সেই পরিবর্তনে পূর্বতন ধারার বিস্তীর্ণ অববাহিকায় প্রাণসম্পদও মারা যায়। চলমান সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে।

কোন বড সাহিত্য একদিনে সৃষ্টি হয় না, বা হঠাৎ অল্প কিছুকাল হল সৃষ্টি হয়েছে তাও নয়। ইংরাজী সাহিত্য প্রথম দিকে কোন কোন অবস্থায় উপেক্ষিত হলেও শীতের শেষে নতুন বীজের অঙ্কুরোদগম হয়েছে; অর্থাৎ বিরুদ্ধ অবস্থাকে সে কাটিয়ে উঠেছে। তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বরাবর বজায় ছিল,—তা কখনও উচ্ছল, অবারিত; আবার কখনও বা ছিল ব্রীড়াবনতা কুমারীর নতনেত্রের উৎসুক প্রতীক্ষায়।

ইংরাজ জাতির সাহিত্যিক মানসিকতা কখনও শুকিয়ে যায়নি। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে রোম্যান্সের জোয়ার যখন পুনরাবৃত্তির তলানিতে এসে ঠেকল তখন ব্যালাড, নাটক আর গদ্য সাহিত্য মুখ খুলল। সব কিছু পূর্ণোদ্যমে নয়, কিন্তু নতুন দিগন্তের আভাষ পাওযা যেতে থাকল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ধর্মের রথচক্র তূর্য নিনাদে এগিয়ে চলেছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয়টা ধর্মীয় নয়; কিন্তু এটা চোখে পড়বেই যে ধর্মকে অবলম্বন করে ইংরাজদের প্রাণশক্তি, তখন এক গতিবেগ পেয়েছিল। আবার, দেশাত্মবোধের পূর্ণশক্তি চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তার সম্ভাবনাময় শৈশব কাটিয়েছিল। ঐতিহাসিক পরিস্থিতিগুলি সংগঠন ও সমন্বয়ে ব্যক্ত হর্যেছিল। এই সময় পূর্ণ জাতিগঠন হয়েছিল। জাতীয় সাহিত্য পূর্ণতায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল।

একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে। —চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কি এমন বিশেষত্ব আছে, যে আলাদা অধ্যায়ের সূত্রপাত বলে ওই সময়কে গণ্য করতে হবে?

প্রাচীন গ্রীক বা প্রাচীন ল্যাটিনের প্রভাব চিরকাল ছিল, আজও আছে। সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় ভাব-ভাবনার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি শুধু ছিল নয়, উত্তরোত্তর বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু স্বাধীন জাতীয় সাহিত্য, বিশেষ করে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ইংরাজী সাহিত্যের সৃষ্টির শুরু চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই। হয়ত একে বৃটিশ সাহিত্য বলা বেশী সঙ্গত। এডিনববা থেকে আইল অব ওয়াইট পর্যন্ত শুধু ভাষার ঐক্য নয়, মূল সাহিত্যিক প্রকৃতি এই সময় থেকেই এক হতে সুরু করেছিল। ওয়েলসের স্বাতন্ত্র্যবোধ অথবা আয়ার্ল্যাণ্ডের সামুদ্রিক ব্যবধান এর ব্যাপ্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এর সম্পূর্ণতা এসেছিল ষ্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। আমি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের কথা বলছি না; ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তারের কথা বলছি।

দ্বিতীয়তঃ কাল্পনিক অতিরঞ্জনের তখন পড়ন্ত বেলা। সমসাময়িক কালের ধর্মের পতাকাবাহী নিষ্ঠাবান বীরযোদ্ধাদের নেতৃত্ব, এবং গণনেতৃত্ব এ যুগে লক্ষ্যণীয় হয়ে দাঁড়াল। সামাজিক অবস্থাগুলির পরিচয় সমন্বিত বিশ্লেষণ, গঠনমূলক ব্যবহারিক নৈতিকতা, গভীর

ও প্রশান্ত ঐক্যবোধ, স্বদেশী বিশেষত্বের তাৎপর্য-গ্রহণ, আবেগ ও বুদ্ধির পূর্ণ সমন্বয়, —এই সময় থেকেই সুরু। আর, ওয়াইক্লিফ, ল্যাংল্যাণ্ড, চশারের মত যাঁদের হাতে এ যুগের ইংরাজ চরিত্রের মানসিক গুণোন্নয়নের ভার এসে পড়েছিল তাঁরা ছিলেন যুগন্ধর প্রতিভা।

সাহিত্যের পুরাভাগের এই সব নেতারা যেমন ছিলেন স্বমহিমায় অতিবিশিষ্ট, তেমনি ছিলেন তাঁরা জনসমষ্টির বিশ্বাসভাজন, এবং ভাবগত ঐক্যের সম্মুখভাগ। সাহিত্য যে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয, তা-যে রাজনীতি বা ধর্মের অধীন অংশমাত্র নয়, তা' এ যুগেই স্পষ্ট করে বোঝা গেল। রাজানুগৃহীত চশার বা ধর্মের গভীর তত্ত্বে অনুপ্রাণিত ওয়াইক্লিফের থেকে গল্পকথক চশার এবং বাইবেল প্রণেতা ওয়াইক্লিফ টিণ্ডেল আমাদের কাছে অধিকতর স্মরণীয় হয়ে আছেন।

একাদশ শতাব্দী থেকে সুরু করে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অতীত, অদৃশ্য বা অনাগত অনেক কিছু ছিল যা আবার ওই সময় থেকেই সুরু করে অস্তিত্বে পুনঃ প্রকাশিত বা প্রথম উদ্ভাবিত হতে সুরু করল। তাই, যেমন ধারাবাহিকতার খাতিরে আমরা কখনো কখনো চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগেব শেষার্ধ বলি, তেমনি এটাও বুঝি যে সঠিকভাবে বলতে গেলে, এটা একটা পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগ যাকে প্রাক্-আধুনিক বলাই বেশী সঙ্গত। রেনেসাঁসের নবজাগরণ জ্ঞানেব এবং চিন্তার মুক্তি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ওই সময় পর্যন্ত ধরে দেড় হাজার বছরের ইউরোপীয সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক নুতন ধরন, গঠন শৈলী এবং প্রকাশভঙ্গীর পুণরাবির্ভাব অথবা প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই।

চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যের কোন কোন নতুন ধারা পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। হিউমার-এর (Humour) কথাতেই আসা যাক। কৌতকরসবোধ বা হিউমার ছাড়া মানুষের আদর্শ আত্মপ্রকাশে ক্রুটি থেকে যায়। হিউমার-এর একটা বড় অংশ কমিক (Comic) বা চটুল হাস্য পরিহাস। পারিপার্শ্বিক সমস্ত বিষয় বা অবস্থাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হালকা হাসির বা মজার পরিবেশ বজায় রাখা ; অবাঞ্ছিত কোন গুরুভার পরিবেশকে সহজ ও স্বস্তিদায়ক করে তোলা ; ভক্তির অতিরিক্ত গাম্ভীর্য, ব্যক্তিবিষয়ের অনর্থক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিবিশেষের অনভিগম্যতাকে দূর করে বিমল আনন্দ সৃষ্টি করা ; সূক্ষ্ম বুদ্ধিকেও সাধারণের বোধের আওতায় নিয়ে আসা ; —ইত্যাদি হিউমারের বিশেষত্ব। সেক্সপীয়ারের কমেডিগুলিতে এবং ডিকেন্সের উপন্যাসে এই হিউমারের স্পর্শ পাওয়া যায়।

কিন্তু হিউমার ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত সমালোচনার দৃঢ়তাকে ঢেকে রাখে। হিউমার সর্বতোভাবে মানুষের আনন্দের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য। এবং তা মানুষকে তুচ্ছ করে নয়; অন্তরঙ্গতা দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই হিউমার ইংরাজী সাহিত্যে চিরপ্রবহমান ধারা হিসাবে আজও ব'য়ে চলেছে।

মধ্যযুগের শেষার্ধের আর একটি অবদান স্যাটায়ার (Satirc), যার অর্থ ব্যঙ্গ এবং বিদ্রুপ। তীব্র আঘাতের উপকরণ। জোনাথান সুইফট-এর হাতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অস্ত্র চূড়ান্ত তিক্ততায় পৌঁছেছিল তা এই যুগেই সুরু। 'স্যাটায়ার' নিষ্ঠা ও সততার এক

বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। এটি ইংরাজী সাহিত্যে অদ্যাবধি প্রচলিত অন্যতম শক্তিশালী ধারা। স্যাটায়ার এক ধরনের নির্দেশিকা সাহিত্য। প্রায়ই আপাতরম্য আবরণের আড়ালে স্যাটায়ারকে ধরে রাখা হয়।

এযুগে আরও যা প্রাধান্য পেল তা এ্যালিগোরি (Allegory) বা রূপক। এ্যালিগোরির পরিকল্পনা মূলতঃ কৃত্রিম হলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা বহু ক্ষেত্রে এ্যালিগোরির বিশেষ ধরনকে সুবিধাযুক্ত বলে মনে করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সহজবুদ্ধিগম্য গঠন প্রক্রিয়া হিসাবে এ্যালিগোরিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে দূরান্বিত কোন কোন চিন্তাকে মানুষের কাছে পরিচিত করানোর জন্যও অনেক ক্ষেত্রে এ্যালিগোরি কাজ দিয়েছে। সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে বরাবর এ্যালিগোরি সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

এ যুগের আর এক জনপ্রিয় বিষয় ও বিষয়ানুগ পরিকল্পনা 'কোর্টলি লাভ্' (Courtly Love)। অভিজাত সমাজে নরনারীর নৈকট্য সৃষ্টির এবং ওই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানের ব্যবহার এই 'শিষ্টাচারসম্মত প্রেম'-এর কাহিনীর বিষয়। প্রাচীন অথবা সমসাময়িক সমাজ-দর্শন এই শিষ্টাচারসম্মত প্রেম-এর ধারক। শিষ্টাচারসম্মত প্রেম দাঁড়িয়ে আছে প্রবল ইন্দ্রিয়াশক্তি ও দেহাতীত ভালবাসার মাঝামাঝি অবস্থায়। বর্জনীয় এবং অস্বাভাবিক উভয়কেই পাশ কাটিয়ে গিয়ে যে কল্পনাসঞ্জাত প্রেমের পরিবেশ এই সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তা রেনেসাঁসের প্রেম পরিকল্পনার থেকে মাত্র কয়েক ধাপ পিছিয়ে। রেনেসাঁসের উদ্ধত প্রাণশক্তি এতে নেই, কিন্তু এ আছে, অন্ততঃ ইংল্যাণ্ডে, প্রভেঁস ও উত্তর ফ্রান্সের ক্লাসিক ধাঁচের চেয়ে, ইংরাজের রক্ষণশীলতার অনেক কাছাকাছি। কর্তব্য ও প্রেমের সমন্বয় ইংরাজী সাহিত্যের শিষ্টাচারসম্মত প্রেমের স্পষ্ট লক্ষণ। দেহাতীত ভালবাসাও গ্রাহ্য নয় যদি সেখানে কর্তব্য ও সামন্ত প্রভুর প্রতি বশ্যতাকে অস্বীকার করা হয়। এই ভালাবাসা যদি বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয় তাহলেও তা অপরাধ। শিষ্টাচার সম্মত প্রেমের এই নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করা নিয়ে কাব্য হতে পারে, কিন্তু ধর্মপ্রতিষ্ঠান কিংবা সমাজ উভয়ের কাছেই তা নিন্দার্হ। কাজেই এই শিষ্টাচারসম্মত প্রেম না ক্লাসিক, না রোম্যান্টিক।

উঁচু স্তরের মানুষের ব্যবহারিক জীবন, রাজনৈতিক জয়পরাজয়, বিকৃতি, বিভ্রান্তি, কূটনীতি, লালসা, প্রতিযোগিতা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এ যুগে। রাজশক্তি, চার্চ, অভিজাতশ্রেণী,—কেউই সুস্থির মানসিকতার সন্ধান করেনি। এই দুর্বলতার চূড়ান্ত ফল ফলেছিল সাধারণ মানুষের আত্মসম্মান ও আত্মোপলব্ধির প্রতিষ্ঠায়। কৃষকবিদ্রোহ দমন করা গিয়েছিল, লোল্যার্ডদের নির্মম অত্যাচারে স্তব্ধ করা গিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার নৈতিক শক্তি ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল দেশের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি মানুষের মনে।

ইতিহাসের এই বিক্ষুব্ধ অধ্যায়ে মানুষের সমগ্র বিপ্লবী চেতনা যে মানুষটির কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সব চেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর নাম জন বল (John Ball)। তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছিল—কেণ্টের 'পাগলা পুরোহিত'। তাঁর বিখ্যাত ছড়া ঃ

"When Adam delved and Eve span,
Who was then the gentlemen ?"

[আদিপিতা আদম যখন মাটি খুঁড়ে করত চাষ,
আদি মাতা ইভ সে যখন বুনত কাপড় বারমাস,
সকল মানুষ যখন ছিল সমান এবং বিত্তহীন,
কেই বা ছিল কুলীন তখন, কেই বা ছিল অকুলীন ?]

ছড়াটি তখন মানুষের মুখে মুখে ফিরত। জন বল ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর বিদ্রোহী সমাজতান্ত্রিক। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই 'পাগল' কালাপাহাড় গণতন্ত্রের পক্ষে শক্ত বেদী রচনা করে দিয়েছিলেন। গণতন্ত্র—ইংরাজী জাতীয়তা; ইংরাজী সাহিত্যের প্রাণশক্তি এই গণতন্ত্রের ভিতরেই পূর্ণতা পেয়েছে। এই জন বলই তাঁর শস্যপেষাইকারী জ্যাক ও শকট চালক জ্যাকের পথনির্দেশের দ্বারা ১৩৮১ সালের কৃষকবিদ্রোহকে পথ দেখাতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদকে অবলম্বন করে গদ্যসাহিত্যের যে প্রচণ্ড শক্তিশালী অংশ পরবর্তীকালে অত্যন্ত প্রযোজনীয় বলে বোঝা গিয়েছিল তার সুরু হয়েছিল জন বল-এর জনপ্রিয় সৃষ্টি 'মিলার জ্যাক ও কার্টার জ্যাক'-এর দ্বারাই।

এদিকে, নর্মানরা আর রাজশক্তি ছিল না। তারা দ্রবীভূত হযে গিয়েছিল ইংরাজ জাতীয়তার মধ্যে। তাই তিক্ততায, সমালোচনায, জাতির পুনর্গঠনে, আন্তরিকতায, আনন্দে, আবেগে পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত ইংরাজ জাতির এবং ইংরাজী সাহিত্যের আবির্ভাবের উষাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৩৩৭-১৪৫৩) জয় পরাজয়ে সেই একই প্রাণের স্পন্দন ব্যক্ত হয়েছে। ১৩৪৮-৪৯ সালের কাল-মহামারী গরীব চাষীদের মুক্তির পথ দেখিযেছে। ১৩৮১ সালের কৃষকবিদ্রোহ শুধু আর্থিক-সামাজিক কলহ নয; তা হল মৃত্যুর মধ্য দিযে অমর গণশক্তির পূর্ণ অভ্যুদয়। আলোচ্য যুগের প্রাণবন্ত সাহিত্যের কখনো বিক্ষুব্ধ, কখনো সংহত এই পটভূমিকা।

আমাদের এই আলোচ্য যুগ একহাতে ধরে আছে বিলীযমান মধ্যযুগকে, আর একহাতে আবাহন জানাচ্ছে আধুনিক সাহিত্যের সূচনাকে। প্রত্যূষের শুকতারা এবং পূর্বদিগন্তের ক্ষীণ রক্তিমাভা এই ব্রাহ্মমুহূর্তে একাধারে ধরে রেখেছে স্মৃতির দীপ্তি ও সৃজনের উন্মেষ।

সাহিত্যের আধুনিকতা

১৩৪০ সালে স্লুইসের নৌযুদ্ধে ফরাসীরা ইংরাজদের কাছে হেরে গেল। সেই সুরু। ফরাসী বিদ্বেষের ফলে স্বদেশী ভাষার উপর মানুষের আস্থা ও নির্ভরশীলতা বেড়ে উঠল। শধু তাই নয়, ইংরাজীভাষাকে ঘিরে এক স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ তৈরী হল। ওয়াইক্লিফের ট্র্যাকট (Tract) গুলি (ধর্মবিষয়ক আলোচনা সমন্বিত এবং প্রচারমূলক পুস্তিকা) প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকতা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল। লাভবান হ'ল অক্সফোর্ড। পোপের চাপিয়ে দেওয়া যাজকরা আর সম্মানের পাত্র থাকলেন না। রাজশক্তির সঙ্গে সামন্তশক্তির বিরোধ লেগেই থাকল। এই পরিবেশে সাহিত্যিকরা নতুন বা প্রায়-নতুন কয়েকটি ধারার বিষয় ও উপাদানে স্বনির্ভরশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আসল কথা, মনের মুক্তি। সাহিত্যিকরা

এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের শক্তিকে বুঝতে পারলেন, এবং তার প্রয়োগে কেউ সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিলেন, কেউ বিদ্রোহ করলেন। সাহিত্যে আধুনিকতার ক্ষেত্র এইভাবে তৈরী হল।

এই আধুনিকতার বিস্তৃতি ও গভীরতা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, চিন্তা ও সৃজন ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কল্পলোকে সীমাবদ্ধ রেখে বর্তমান ও বর্তমানের মানুষকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় রাখার কোন যুক্তি আর থাকল না। দ্বিতীয়তঃ, "চরিত্র" বলে একটা নতুন বস্তুকে নিয়ে কাজ সুরু হল। এটা ব্যক্তিগত চরিত্রের ব্যাপ্তি ও বিশালতার কথা নয়; ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসাবে দেখার দৃষ্টি। তা একদিকে যেমন পাঠকের সামনে বৈচিত্র্য ও নতুন আগ্রহের দরজা খুলে দিল, তেমনি মানুষের চরিত্রের মূল প্রবণতাগুলি একত্রে এক বৃহত্তর সামগ্রিকতার রূপ পেল। মানুষের বৈচিত্র্যের ধরনধারণ ও ব্যাপ্তি আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। জগৎকে দেখার নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া গেল।

এ যুগের নানান সাহিত্যকর্মকে এই আধুনিকতার ভিতর সন্নিবিষ্ট করলে যুগটির বিশেষত্ব ধরা পড়ে। প্রতিভার একক বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা যায় না; কিন্তু তা যে যুগের পরিবেশ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তা-ও বোঝা দরকার।

তাছাড়া, ইংরাজ জনসাধারণের সন্তোষ ও আনন্দ,—যা কোন ঘটনায় বা উদাহরণে বোঝা যাবে না,—তাকেও জানতে হবে। ইংরাজী ভাষার পূর্ণমর্যাদার সঙ্গে সর্বত্র স্বীকৃতি একটা খুব বড় কথা। এই মানসিকতা যে আনন্দে প্রতিফলিত হয়, সাহিত্যের আধুনিকতা তাতেই ফুটে ওঠে।

তারপর, ক্যাক্সটনের মুদ্রাযন্ত্র শুধু প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির নিদর্শন নয়; তা হল লিখিত পুস্তকাদির গণসংযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তখন থেকে পাঠক লিখিত সাহিত্যে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকল। লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে বহুসংখ্যক মানুষের পরিচয়ের দ্বারা সাহিত্যকর্মের অপূর্ণতা বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে ঘুচে যেতে সুরু করল। আজকের দিনে লিখিত সাহিত্যই সব। মুদ্রিত সাহিত্যের ব্যাপকতা আধুনিকতার অন্যতম সর্ত।

এ যুগে সাহিত্যকর্মের শ্রেণীবিন্যাস

কবিতা ঃ সমসাময়িক বিষয়, ক্লাসিক বিষয়, রূপক, দিব্যদর্শন, স্বপ্নবিষয়ক, বিভিন্ন ধরণের গীতিকবিতা, ব্যালাড, স্যাটায়ার, অন্যান্য।

গদ্য ঃ কাহিনীমূলক, রোম্যান্স

বাইবেল ঃ অনুবাদের ধারা

নাটক ঃ ক্রমোন্নত ধারা

এগুলি তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের বিস্তৃত এবং বিচিত্র শাখাপ্রশাখা। এগুলির ব্যাপক তাৎপর্য—ছন্দ, অলঙ্কার, উপযুক্ত শব্দচয়ন, বিভিন্ন ষ্টাইল, বিভিন্ন লেখকের চরিত্রলক্ষণের বিশিষ্ট প্রভাব,—সব মিলিয়ে পূর্ণোদ্যমে কাজের আলোড়ন। যুগের উদ্যম ও সৃজনবৈপুণ্যের অনুশীলনে ব্যক্ত হয়েছে প্রাক্-আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। তা তুচ্ছ করবার মত নয়, তা শুধু দু'একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

কবিতা

কবিতার কথায় আমরা প্রথমেই ক্যান্টারবেরী টেলস (Canterbury Tales) এর কথা বলব। কাব্যের নামটির মানে 'ক্যান্টারবেরী' যাওয়া-আসার পথে বলা গল্পগুলি। এটিই এ যুগের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকর্ম। এর রচয়িতা জিওফ্রে চশার (Geoffrey Chaucer) [আঃ ১৩৪০-আঃ ১৪০০]

ক্যান্টারবেরি টেলস অর্থাৎ ক্যান্টারবেরি যাওয়ার পথে শোনান গল্পগুলি বর্ণনায় এবং চরিত্র-উপস্থাপনে সার্থক। এটি ঘটনা ও কাহিনীমূলক কাব্য। শোভাযাত্রার মত একের পর এক চলমান উপস্থাপন। এর গঠনের একটা পরিকল্পনা ছিল। ইংল্যাণ্ডের উচ্চতম ধর্মোপাসনাকেন্দ্র ক্যান্টারবেরি লণ্ডন থেকে ৫৬ মাইল দূরে, এবং ডোভার যাবার রাজপথের উপর পড়ে। এখানকারা প্রধান পুরোহিত (আর্চবিশপ) ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ পদাধিকারী যাজক। ১১৭০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর রাজা দ্বিতীয় হেনরীর সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁর চারজন নির্বোধ সৈনিক তদানীন্তন আর্চবিশপ টমাস বেকেটকে হত্যা করে। এই হত্যা ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে (বিংশ শতাব্দীতে) টি. এস. ইলিয়ট 'গীর্জায় হত্যা' (Murder in the Cathedral) নামক বিখ্যাত নাটক লেখেন। যাইহোক, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, পোপের নির্দেশে বেকেট হলেন শহীদ ও সন্ত (Saint)। তখন থেকে বেকেটের সমাধি তীর্থযাত্রীদের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে গেল।

ক্যান্টারবেরিতে সেন্ট টমাস-এর সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবার জন্য তীর্থযাত্রীরা লণ্ডন থেকে প্রাযই যেতেন। একবার সাদার্ক-এর (Southwark) 'ট্যাবার্ড ইন' (Tabard Inn) নামক সরাইখানায় এইরকম ঊনত্রিশজন তীর্থযাত্রী জড়ো হলেন। কবি নিজেও তাঁদের একজন। সরাইখানার মালিক (হোষ্ট = Host) তাঁদের পথ দেখিয়ে নিযে যেতে রাজী হলেন। তাঁকে নিয়ে মোট যাত্রী হলেন ত্রিশজন। তিনি একটি সর্ত করলেন। রাস্তার কষ্ট লাঘব করবার জন্য প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে যাবার পথে একটি এবং ফেরবার পথে একটি করে গল্প বলতে হবে। সবাই রাজী হলেন। পরের দিন সকালেই যাত্রা সুরু হল। যাত্রীদের মধ্যে তদানীন্তন ইংরাজ সমাজের সব ধরনের মানুষ ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকে যেমন নিজের নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র ব্যক্ত করেছেন, তেমনি আবার গল্পের বিষয়, বলার ভঙ্গী, উদ্দেশ্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপও (আলাদা আলাদা গল্পের ভিতর) ধরা পড়েছে। এই তীর্থযাত্রীরা ছিলেন নাইট (knight) [বীরযোদ্ধা], স্কোয়ার (Square) [নাইট পদপ্রার্থী অনুচর], ইয়োম্যান (Yeoman) [ভূমিজ সৈনিক], ফ্র্যাঙ্কলিন (Franklin) [লাখেরাজভোগী], প্রায়রেশ (Prioress) [উপাসিকাদের মঠের উপাধ্যক্ষা], প্রায়রেশ-এর চ্যাপলেন (Prioress's Chaplain) [উপাধ্যক্ষার সেবিকা], প্রিষ্ট (Priest) [পুরোহিত], ক্লার্ক (Clerk) [ধর্মশাস্ত্রের ছাত্র], পার্শন (Parson) [গ্রামের গরীব পাদ্রী], মঙ্ক (Monk) [মঠবাসী সন্যাসী], ফ্রায়ার (Friar) [ভিক্ষু], পার্ডনার (Pardoner) [প্রায়শ্চিত্ত বিধানকারী], সামনার (Summoner) [কোর্টের পেয়াদা], মার্চেণ্ট (Merchant) [বণিক], পাঁচজন গিলডসম্যান

(Gildsman) [কারিগরসংঘেব সদস্য], কুক (Cook) [রাঁধুনি], ম্যানসিপল (Manciple) [বাজার সরকার], সিপম্যান (Shipman) [জাহাজওয়ালা], ফিজিসিয়ান (Physician) [শরীরতত্ত্ববিদ], সার্জেন্ট (Sergeant at law) [আইনবিদ], মিলার (Miller [শস্যপেষাইকারী], রিভ (Reeve) [কৃষিমজুরদের সর্দার], প্লাউম্যান (Ploughman) [চাষী], ওয়াইফ অব বাথ (Wife of Bath) [বাথ সহরের বনিতা], এবং চশার নিজে। তবে সবগুলি গল্পলেখা হযনি। আমরা ২২টি সম্পূর্ণ, ২টি অসম্পূর্ণ, এবং আর ২টি গল্প পেয়েছি যেগুলি মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত। এছাড়া, রযেছে প্রোলগ (Prologue) [প্রারম্ভিক পরিচয]। গল্পগুলির আলাদা আলাদা মুখবন্ধ আছে। তাছাড়া আছে সরাইখানার মালিক হোষ্ট-এর (Host) বিভিন্ন কথা, এবং অন্যান্যদের কথোপকথন। মূল প্রোলগটি ৮৫৮ লাইনের।

'ক্যান্টারবেরি টেলস'-এর মাধ্যমে চশার চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়েছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডে যে 'কাল মহামারী' (Black Death) বা 'ব্ল্যাক ডেথ' হয়েছিল, তাতে দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা পড়ে। এই ক্যান্টারবেবি টেলস-এর মাধ্যমেই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তদানীন্তন চিকিৎসাবিজ্ঞানের দূরবস্থা ও অসহায়তা। চিকিৎসার অন্যতম ভিত্তি ছিল জ্যোতিষীবিদ্যা। জমিদারদের সমৃদ্ধি ছিল; নাবিকদের ব্যবসাবাণিজ্যও ভাল ছিল। ধনী বণিকশ্রেণী ক্রমেই সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এই সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকে সমাজে বেশ সম্মান পেতে থাকে। নাইটরা হীনপ্রভ হয়ে পড়ে, তবে তখনও তারা বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। সামন্তপ্রথা আর আগেকার মত সুনির্দিষ্টভাবে সাজান থাকেনি। রাজার বেতনভোগী সৈনিকরাই দেশরক্ষা ও আক্রমণের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁডায়। তবে তীরধনুক তখনও তাদের প্রধান অস্ত্র। পূর্বতন কালের অবদমিত শ্রেণীও এখন পরাক্রম দেখাতে সুরু করে। চশার এদের সম্বন্ধে কোন ভাল কথা বলেন নি; সরাসরি এদের নিন্দা করেছেন। তবে ধর্মভীরু, রাজভক্ত প্রজাও অনেক ছিল।

আবার, উচ্চতম স্তরে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের কথাও চশারের কাহিনীতে রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ১৩৬৩ সালের পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ ইংরাজীতেই দেওয়া হয়েছিল।

চশারের কাহিনী থেকে এ যুগে বেশবাসের বাহুল্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের পোষাকের কথা জানা যায়।

পুরোহিত ও যাজকশ্রেণীর আচার ব্যবহার আর শ্রদ্ধা পাবার মত ছিল না। এঁরা সকলেই প্রায় শ্রমস্বীকার ও কৃচ্ছ্রতা ভুলে গিয়েছিলেন। লোভ, বিলাসিতা, এবং অজ্ঞ মানুষদের বঞ্চনা করা এঁদের নিত্য কর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামের দরিদ্র পুরোহিত তখনও সরল ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও মানুষের বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

এই সব তথ্য আমরা চশারের ক্যান্টারবেরি টেলস-এ যত স্পষ্ট ও সুন্দর করে পাই কোন ইতিহাস বা দলিল থেকে তা পাই না।

মধ্যযুগের শেষ পর্যাযে তাবৎ সাহিত্য কর্মের মধ্যে এই ক্যান্টারবেরী টেলস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কাহিনীকে বর্ণনা দ্বারা রঞ্জিত করার এত সুন্দর উদাহরণ আধুনিক সাহিত্যেও কমই দেখা যায়। 'মাত্রা'র দক্ষ ব্যবহার, এবং নিপুণ শব্দচয়ণ কবির অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ক্যান্টারবেরী টেলস-এর সবচেয়ে বড় নৈপুণ্য চরিত্রচিত্রনে। এবং এ ব্যাপারে যে মানসিক সৌকর্যের ছবি কবি তাঁর 'হিউমার'-জ্ঞানের চূড়ান্ত সামঞ্জস্যবোধের দ্বারা প্রকাশ করেছেন তা একাধারে আনন্দ ও বিস্ময়ের অফুরন্ত আকর হয়ে আছে। ক্যান্টারবেরী টেলস-এর ভিতর দিয়েই চশারের সেই ছবি ফুটে ওঠে যাতে দেখা যায় কৌতুকের মৃদু হাসিতে উদ্ভাষিত একটি মুখ যা মানুষের বিচিত্র সব দুর্বলতার নিদর্শনকে প্রশান্ত স্নেহের চোখে দেখছে।

রূপক

এরপরে আমরা মধ্যযুগের শেষের দিকের সাহিত্যের একটি বড় শাখার কথায় আসতে পারি। এ্যালিগোরি (Allegory) বা রূপক। ব্যাপক সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা আলাদা রূপকের উদাহরণের সঙ্গেই আমরা বেশী পরিচিত ; কিন্তু স্পেনসারের (Edmund Spencer ১৫৫২-১৫৯৯) 'ফেয়ারি কুইন' (The Faerie Queene ১৫৮৯-১৫৯৬) প্রকাশিত হবার আগে রূপকের বৃহত্তম সম্ভাবনাকে আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি।

'রূপক' একটি অলঙ্কার যাতে দুই স্তরে একটি কাহিনী বা ঘটনাকে ধরে রাখা হয় এবং পরোক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ধর্মেব তত্ত্বব্যাখ্যা এবং নীতি প্রচারে রূপকের আশ্রয় অনেক আগে থেকে নেওয়া হচ্ছে। বাইবেলের প্যাবাবলগুলি (Parable) খুব প্রাচীন উদাহরণ। এগুলি যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্যদের দ্বারা যীশুর মুখে বসান উপদেশের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাহিনী। এগুলি হিব্রু বাইবেলে ছিল। উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষে নির্দেশাত্মক কাহিনী।

ধর্মশাস্ত্রকার এবং ধর্মীয় দর্শনের অনুশীলনকারীগণ এরপর সামগ্রিকভাবে পুরো বাইবেলকেই রূপক হিসাবে ব্যবহার করলেন। ধর্মজগতের বাইরের বড বড় অনেক কবি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত যীশুর জীবনী, কার্যকলাপ ও উপলব্ধিগুলিকে রহস্যময় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। এইভাবে "রূপক" আর সাহিত্যের বিশেষ ধারা হিসাবে আলাদা কিছু থাকল না। সাহিত্যের সর্বাংশে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

শ্রেষ্ঠ রূপকগুলিতে বস্তুবিরহিত শুদ্ধজ্ঞানকে আবৃত করে রাখে যে বস্তুসম্পর্কিত সহজবোধ্য আবরণ তাকে আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য এই যে বোদ্ধাপাঠক সেই আবরণ ভেদ করে শুদ্ধজ্ঞানে যেন পৌঁছায়। অথবা, সেই আবরণ উন্মোচনের বুদ্ধি যদি না-ও থাকে তবু অন্তর্নিহিত জ্ঞানের প্রভাব যেন সে অনুভব করে।

চশারের 'রূপক' অত্যন্ত বিশিষ্ট ধরনের। —বিচিত্র মানুষের সারি ; তাদের কথা, কাজ এবং অভিব্যক্তি একটি আবরণ। বিচিত্র মানবসত্তার ধ্রুবক অস্তিত্ব ওই আবরণের নিচে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। চশার জ্ঞান বিতরণ করতে চাননি। কারণ তিনি জানতেন, কৌতুক

ও আনন্দের ভিতর দিয়ে পাঠক যে অভিজ্ঞতা পাবে কেবলমাত্র তা-ই তাকে মানুষের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করবে। পণ্ডিতম্মন্যদের দিয়ে একাজ হয় না ; কারণ মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়, উপলব্ধির ব্যাপার। তাই তিনি কাহিনী ও বর্ণনার ভিতর দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তারপর যার যা বোঝার যে তা' বুঝে নিক। চশার কৌতুকের আশ্রয়ে রূপকের পরিকল্পনা করেছিলেন, কারণ আনন্দই পাঠককে সত্য দর্শনে পৌঁছে দিতে সমর্থ। কিন্তু চশারের এই আশ্চর্য কৌতুক-আশ্রিত রূপকের কোন যথার্থ উত্তরসূরী নেই।

পিয়ের্স প্লাউম্যান

আগেই বলা হয়েছে কাব্যের বিভিন্ন শাখাতেই নানাভাবে 'রূপক'-এর ব্যবহার হয়েছে। বিদ্রুপাত্মক রচনার (স্যাটায়ার) [Satire] শাখাতেই চতুর্দশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম রূপক কাহিনী 'দি ভিসন অব উইলিয়ম কনসার্নিং পিয়ের্স দি প্লাউম্যান' অর্থাৎ 'চাষী পিয়ের্স সম্পর্কে উইলিয়মের দিব্যদর্শন'। The Vision of William concerning Piers the Plowman প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬২ সালের অব্যবহিত পরে। উইলিয়ম হচ্ছেন কবি নিজে। কবির নাম উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ড (Willam Longland)। কবির জীবনকাল সম্ভবতঃ ১৩৩২ থেকে ১৪০০। তিনটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। পশ্চিম মধ্যদেশীয় আঞ্চলিক ভাষায় লেখা (West Midland dialect) চশার এই আঞ্চলিক ভাষা পছন্দ করতেন না। চশারের লেখা এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ইংরাজী সাহিত্য পূর্ব মধ্যদেশীয় (East Midland) ভাষায় লেখা। পিয়ের্স প্লাউম্যানের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যটি ২৫০০ লাইনের। অন্যগুলি আরও বড।

'ভিজন' (Vision) কথাটির মানে 'দিব্যদর্শন'। 'ভিজন' স্বপ্ন নয়। ভিজন বা দিব্যদর্শনে অনুভবের যে গভীরতা ও আন্তরিকতা ফুটে ওঠে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তা হওয়া সম্ভব নয়। এই কবিতায় খৃষ্টানের জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি যে অনুরক্তি দেখান হয়েছে তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ্ববরেণ্য কবি দান্তে-কে (Dante Aligheri ১২৬৫-১৩২১)।

কাহিনীঃ কোন এক মে মাসের সকালবেলায় কবি ম্যালভার্ন হিলস (Malvern Hills) নামক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ঘোরে তিনি দেখেন একটি বড মাঠে বহুলোক জমায়েত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনি দেখেন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পবিত্র সত্ত্বা দেবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি কবিকে বলেন, এই সব মানুষ পার্থিব বিষয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছে। এই সব মানুষের উচিত সত্যের সন্ধান করা, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়া এবং প্রেমের পবিত্র পথে স্বর্গে যাবার যোগ্যতা অর্জন করা।

এরপর, পাপীতাপীরা অনুতপ্ত হয়ে সত্যের পীঠস্থানে যেতে চায়, কিন্তু তারা পথ চেনে না। এটি লোকায়ত অর্থে তীর্থস্থান নয়,—মানসিক পথপরিক্রমা। তখন এলেন 'পিয়ের্স প্লাউম্যান'। —যাঁর নামে এই কবিতার নামকরণ। পঞ্চাশবছর ধরে কর্মযোগের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর সেবা করেছেন, এবং বিবেক ও সৎবুদ্ধির কাছ থেকে তিনি পথের

হদিস জেনে নিয়েছেন। তারপর তাঁর নেতৃত্বে কৃচ্ছ্রতাসাধনের পথে তীর্থযাত্রা। তীর্থযাত্রার আগে তিনি ভূমি কর্ষণ করলেন, অন্যদের তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বললেন, আর রমনীদের বললেন পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করতে। অর্থাৎ কর্মযোগের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করা যায়,—তা জানালেন।

এ ছাড়া আরও বহু ঘটনার সংযোজন এই কাব্যে ঘটান হয়েছে। নানা উপদেশ, নানা সমালোচনা, তিরস্কার ইত্যাদিতে ভরপূর এই কাহিনীগুচ্ছ। যুক্তিসঙ্গত দৃঢ়সম্বদ্ধ ভাব নেই, তবে বর্ণনার প্রাচুর্য সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল।

এই গ্রন্থটি রূপক, ধর্মোপদেশ, ইতিহাস এবং ব্যঙ্গাত্মক তিরস্কারের এক ব্যাপক মিশ্রণ। অন্ত্যমিলের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা লাইনগুলির মাত্রার সমতা রাখা এর বিশেষত্ব। এটি পুরাতন ইংরাজী কাব্যের লক্ষণ; সমসাময়িককালে প্রায় পরিত্যক্ত। পুরাতন রীতির ছন্দের শক্তি এখানে যথার্থভাবে ফোটান হয়েছে।

আদিযুগের ইংরাজীর সঙ্গে কাব্যের ধ্বনিগত মিল থাকলেও ফরাসী শব্দের বহু ব্যবহার এতে পাওয়া যায়।

সমসাময়িক কালের সামাজিক রীতিপ্রকৃতি এবং মানুষের বিবেক এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কাব্যে দরিদ্র, বিনয়ী এবং নিজের নিজের দোষ সম্পর্কে অবহিত মানুষদের দেখা যায়। রোগ, অভাব, দুর্ভিক্ষ এই কাব্যে যে সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে তা' অন্যত্র অদৃশ্য। যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অসন্তোষ চতুর্দশ শতকের সমাজে প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছিল 'পিয়ের্স প্লাউম্যান' তার সার্থক দর্পন। ১৩৮১ সালের কৃষক বিদ্রোহের পদধ্বনি তখন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অভিজাতরা তখন শুধু রাজাকে নিজেদের অধীনে রাখার চেষ্টা করছিল তা' নয়, সাধারণ মানুষের মর্যাদা আরও খাটো করছিল। ধর্মনেতারা আর শ্রদ্ধার আসনে ছিল না। তাদের বিলাসিতা অভিজাত সামন্তদের বিলাসিতার থেকে কিছু কম ছিল না। বিদেশী পোপের খবরদারী সাধারণ মানুষের অসন্তোষ সৃষ্টি করছিল। রাজা এবং অভিজাতরা এই অসন্তোষকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছিল। শতবর্ষের যুদ্ধের চাপ, কাল মহামারী, এবং সমস্ত দুঃখদারিদ্রকে ল্যাংল্যাণ্ড মানুষের পাপের ফল বলে বোঝালেন। এতে যেমন একদিকে আসল অপরাধীদের চিহ্নিত করা হোল না, তেমনি আর একদিকে, অভিজাত সমাজের কুৎসিত জীবনের প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন ল্যাংল্যাণ্ড। তবে হ্যাঁ,—ল্যাংল্যাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গীতে দুঃখ এবং আনন্দ মিলিয়ে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। সে যাই হোক, ল্যাংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বহুল পরিমাণে সত্যতর ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছিল।

কবি ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ করে 'সু' এবং 'কু' এর দ্বন্দ্বকে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি আন্তরিকভাবে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন প্রতিটি মানুষের জীবনকে পাপমুক্ত ও পবিত্রতর করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। তিনি উন্নত নৈতিক আদর্শে পুরোহিত সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি এক নতুন জগৎ গড়তে চেয়েছিলেন যার ভিত্তি হবে যীশুর আদর্শ ও বাণী। এবং এই আদর্শের বিরোধীদের তিনি তীব্র ব্যঙ্গোক্তির কশাঘাতে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। কবির আন্তরিকতা, সততা এবং সাহস মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না।

সাহিত্যকর্ম হিসাবে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও 'পিয়ের্স প্লাউম্যান' চতুর্দশ শতকের ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্যজীবনের সাধারণ মানুষের মানসিকতাকে বৃহত্তর ও মহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন, এবং সর্বকালের মানুষের কাছে আদর্শ জীবনের স্পষ্ট ছবি তুলে ধরতে পেরেছেন। তিনি বিদ্রোহ করেন নি, স্থায়ী প্রভাবও রেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্বালা এবং আদর্শের স্বপ্নের সামনে আমরা শ্রদ্ধাবনত না হয়ে পারি না।

পিয়ের্স প্লাউম্যানের সঙ্গে আমরা রূপক হিসাবে চশারের 'দি বুক অব দি ডাচেস' (The Boke of the Duchesse)-১৩৬৯-এর কথা বলতে পারি। বাংলায় একে বলব 'ডাচেস বা ডিউকের স্ত্রীর কাহিনী'। কবির পৃষ্ঠপোষক, এবং রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের কাকা 'জন অব গণ্ট'-এর (John of Gaunt) স্ত্রী ব্ল্যাঙ্কি-র (Blanche) মৃত্যুতে এটি লেখা হয়েছিল। পরোক্ষভাবে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের শোকের বর্ণনায় এটি একটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি।

চশারের প্রথম জীবনের আর একটি বিখ্যাত কবিত' 'গোলাপের রোম্যান্স' (The Romaunt of the Rose)।

ফরাসী কবি গুইলোঁ ডি লরিস (Guillaume de Lorris) এর 'লে রোম্যাণ্ট ডি লা রোজ' (Le Romaunt de la Rose)-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। প্রধানতঃ ভাবানুবাদ হলেও এই দীর্ঘ রূপক কবিতাটি একাধারে স্ত্রীজাতির প্রতি প্রণযের পূজা ও উপহাসের তাচ্ছিল্য বজায় রাখে।

এতে মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন দিককে একেকটি চরিত্র হিসাবে, এবং প্রেমের লক্ষ্য বস্তুকে একটি বিশেষ গোলাপ ফুল হিসাবে দেখান হয়েছে। বর্ণিত বিষয় এই যে একমাত্র অকৃত্রিম ভালবাসা ছাড়া, মানুষের চরিত্রে আর কোন দিকই বাঞ্ছিত প্রেমের দ্বারা অভিষিক্ত হয় না।

স্বপ্নদর্শনে রূপকের এই ভাবগত কাহিনী এক সময়ে সারা পশ্চিম ইউরোপে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

মুক্তা (The Pearl)

'রূপক' কবিতার আলোচনায় 'মুক্তা' (The Pearl) কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্যার গয়েন এণ্ড দি গ্রীন নাইট (Sir Gawayne and the Grene Knight) এবং আর দুটি কবিতার সঙ্গে এটি একই পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে। কবির নাম জানা যায়নি। পাণ্ডুলিপিটির নাম দেওয়া হয়েছে কটন নীরো এ এক্স ফোর (Cotton Nero Ax +4)। কবিতাটি লেখা হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৩৭০ সালে বা তার কিছু পরে। মধ্যযুগে রূপক ও প্রতীকে মিশ্রিত কবিতাগুলির মধ্যে এটিই প্রথম। এটি পশ্চিম-মধ্যদেশীয় (West Midland) আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। এই আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ভাল কবিতা পরে আর তেমন পাওয়া যায় নি। কতকগুলি বিশেষ উদ্ভাবনী দক্ষতার দরুন কবিতাটির শিল্পচাতুর্য লক্ষ্যণীয়। প্রতিটি লাইনে চার জায়গায় জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। বার লাইনের পাঁচটি করে স্তবকের গুচ্ছে কবিতাটি সাজান আছে। মিলের পরিকল্পনাঃ ababababbcbc। প্রতিটি লাইনে দুটি বা তিনটি অনুপ্রাস আছে। কবিতাটির বিভিন্ন অংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

কাহিনী ঃ কবির আড়াই বছর বয়সের কন্যা মার্গারেট মারা গেছে। প্রতীক হিসাবে বলা হয়েছে তাঁর মুক্তাটি হারিয়ে গেছে। এবং মাটির নীচে চলে গেছে। তার কবরের পাশে কবি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের ঘোরে একটি নদীর অপর পারে কবি তাঁর মেয়েকে দেখতে পান। অপর পারটি যেন স্বর্গ। মেয়েটি যেন বড় হয়ে গেছে। কবি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। স্বর্গ সম্পর্কে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কথাবার্তা। কথাবার্তাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেউ লৌকিক শোকগাথা, কেউ ধর্মীয় শোকগাথা—ইত্যাদি ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতাটিতে ইংরাজী শব্দ ও ব্যাকরণের সঙ্গে ফরাসী কবিতার ষ্টাইলের মিশ্রণ দেখা যায়।

'পার্ল'-এর কবিই এই ষ্টাইলের সবচেয়ে বড কবি। কাব্যকে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

রোম্যান্স এবং ব্যালাড (Romance and Ballad)

[পূর্ববর্তী খণ্ডের আলোচনার সঙ্গে একত্রে পড়লে সামগ্রিক ধারণা হবে।]

পঞ্চদশ শতকের রোম্যান্সের বিষয়বস্তুও যেমন আগেকার মত ছিল না, তেমনি তার প্রাণশক্তিও নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল। কেবলমাত্র রোম্যান্টিক ভাবকল্পনার মধ্যে চতুর্দশ শতকের এবং পূর্ববর্তী যুগের রোম্যান্সকে বসান যায়। অতিরিক্ত বর্ণবিন্যাস, গতি এবং আনন্দ-বেদনার তীব্র প্রকাশ যে রোম্যান্সের সুন্দর প্রকাশরীতি তার জগৎ পঞ্চাদশ শতক বা পরবর্তী কোন সময় নয়। মানুষ হঠাৎ যেন "আধুনিক" হয়ে গেল। রোম্যান্সের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সেখানে অচল। কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হলেও "স্যার গয়েন এবং সবুজ নাইট" (পূর্ববর্তী খণ্ডে আলোচিত) বীরত্ব ও রুচিসম্মত আচরণের শেষ সার্থক নিদর্শন।

আর, ব্যালাডের আকর্ষণ ছিল তার ছন্দ, আবৃত্তির ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। "এখনই এবং এখানে" নিয়ে ব্যালাড হয় না। তবু সপ্তমাত্রিক আয়াম্বিক ছন্দের একটানা দ্রুত আবৃত্তির আকর্ষণ চিরকাল আছে। পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন যুগে কোলরিজ বা কিপলিং ব্যালাড লিখেছেন। তবে সে সবের সমাদর বুদ্ধিদীপ্ত সীমিত সংখ্যক মানুষদের ভিতরে।

পঞ্চদশ শতকে সম্পূর্ণ ইংরাজীতে, অবশ্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়, অনেক ব্যালাড তৈরী হয়েছিল। এদের অনেকগুলিই তদানীন্তন রাজনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। একধরনের ব্যালাড গায়কদের গ্লীমেন (Gleemen) বলা হত। গ্লী (Glee) মানে আমোদ। এই গ্লীম্যানরা ছিলেন ভ্রাম্যমান গায়কদের তিনচারজনের এক একটি দল। এক এক জন গানের এক একটি অংশ বলতেন। কণ্ঠস্বরে এবং বলার ভঙ্গীতে কেউ গাম্ভীর্য, কেউ চটুলতা, এবং অন্যান্য ভাবসৃষ্টির চেষ্টা করতেন।

এ যুগে রাজায় রাজায়, রাজসিংহাসনের বিভিন্ন দাবীদারদের ভিতর, রাজা এবং অভিজাতদের ভিতর, বা রাজা এবং অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ প্রজার বিরোধ লেগেই ছিল। "গ্লীম্যান"রা কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষ নিতেন, অথবা দেশীয় ইংরাজদের পক্ষ নিতেন।

'চেভি চেজ' (Chevy Chase) এই রকম একটি খুব জনপ্রিয় ব্যালাড। এতে ইংরাজ নেতা পার্শি (Percy) এবং স্কচ নেতা ডগলাস-এর (Douglas) যুদ্ধের কথা আছে। এতে যুদ্ধের ভয়াবহতা, এবং 'নাইট'-এর বীরধর্ম (Chivalry) দুইই দেখান হয়েছে। 'চেভি চেজ'-এর ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে কেউ কেউ ট্রয়ের বিশাল প্রান্তরকে দেখেছিলেন।

১৭৬৫ সালে পুরানো অনেক ব্যালাডকে সংগ্রহ করে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন বিশপ পার্শি অব ড্রোমোর (Bishop Percy of Dromore)। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের এই দর্শনীয় স্মৃতিস্তম্ভের নাম দেওয়া হয়েছিল, 'পার্শি-দ্বারা সংগৃহীত প্রাচীন ইংরাজী কবিতাব পুরা নিদর্শন' (Percy's Reliques of Ancient English Poetry)।

শিষ্টাচারসম্মত প্রেম (Courtly Love)

আমরা এবার মধ্যযুগীয় আদর্শের 'শিষ্টাচারসম্মত প্রেমের' (Courtly love) কবিতার সম্বন্ধে আগে (এই খণ্ডের ভূমিকায়) যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আরও দ'চার কথা যোগ করবো।

খৃষ্টের সমসাময়িক কালের রোমক কবি ওভিড (Ovid) এই আচরণের ঐতিহ্য অবলম্বনে প্রথম কাব্য লেখেন 'আর্স আমাটোরিয়া' (Ars Amatoria)। বিধিবদ্ধ আচরণের মত, ওভিড-এর তৈরী আদর্শ প্রেমের কবিতা তৈরীর কাঠামো হিসাবে হাজার বছর ধরে কমবেশী অনুসরণ করা হয়েছে।

সৌন্দর্যের প্রভাবে নায়িকার নায়কের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব; নায়িকার প্রতি নায়কের বিশ্বস্ততা; ধর্মপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বীকৃত ও অনুমোদিত বিবাহ-সম্পর্কের গুরুত্বহীনতা; কৃত্রিম নিয়মকানুনের বশীভূত হলেও আন্তরিকতা বজায় রাখা; উন্নতমানের চরিত্র; গোপনীয়তা; সম্পূর্ণ আস্থাভাজন তৃতীয় কোন ব্যক্তি; —এগুলি এই জাতীয় কবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়। নায়কের মনোভাব পাঠককে জানানোর একটি সাধারণ কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন। তৃতীয় ব্যক্তি নাটকের চরিত্রের মত পত্রাদির আদান প্রদান করবে, এবং নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 'শিষ্টাচারসম্মত প্রেমের কাব্য' কাহিনীমূলক কাব্য।

এই রীতি অনুসারে কবি কাব্যে যা ফুটিয়ে তুলবেন, নিজের জীবনেও তা অনুসরণ করবেন। কাব্যের আদর্শ কবির জীবনবোধের থেকে আলাদা হবে না।

তবে চশার নিজে শেষ পর্যন্ত প্রচলিত এই গণ্ডীর ভিতরে আটকে থাকেন নি। এমনকি কখনও কখনও প্রেমিক-প্রেমিকার বহু ব্যবহৃত উক্তিকে নিয়ে পরিহাসও করেছেন। হয়ত তিনি এটা বুঝেছিলেন যে বাছাই করা কিছু শব্দ বা কথা বলার ধরণ মানুষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করবে না।

ট্রয়লাস এবং ক্রিসিড (Troilus and Criseyde) (১৩৮৫-৮৭)

উৎস ঃ হোমারের ইলিয়াড-এ (Iliad) ট্রয়লাসের উল্লেখ থাকলেও ক্রিসিডার উল্লেখ নেই। সেখানে ব্রিসিস (Briseis) নাম পাওয়া যায়। এর থেকে ব্রিসিডা বলে একটা

নাম আসে। হয়ত এই ব্রিসিডাকেই পরে ক্রিসিডা বলা হয়েছে। ট্রয়লাস-ক্রিসিডার কাহিনীরও তেমন উল্লেখ হোমারে পাওয়া যায় না। চশার সম্ভবতঃ ল্যাটিন কবি বোক্কাসিও (Giovani Boccaccio),—(১৩১৩-১৩৭৫)-এর 'ইল ফিলসট্রাটো' (Il Filostrato) নামক কাহিনীমূলক কাব্য অনুসরণ করেছেন। তবে বোক্কাসিও-র রীতি কাহিনীমূলক গীতিকাব্য, যেখানে চশার লিখেছেন কবিতার আকারে আধুনিক উপন্যাসধর্মী রচনা। সঠিক ব্যষ্টি লক্ষণযুক্ত চরিত্র ইংরাজী সাহিত্যে ট্রয়লাস-ক্রিসিডাতেই প্রথম পাওয়া যায়। এই উপাদান অবলম্বন করে সেক্সপীয়র কঠিন বিশ্লেষণাত্মক নাটক লিখেছেন। পৃথিবীর বহু সাহিত্যেই এই উপাদানের ব্যবহার করা হয়েছে। বাঙালী কবি বিষ্ণু দে-র "ক্রিসিডা" কবিতাটিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

কাহিনী ঃ ট্রয়ের নাগরিক কালকাস (Calkas) গ্রীকশিবিরে আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করে গোপনে ট্রয় পরিত্যাগ করে গেলেও তার মেয়ে ক্রিসিড (Criseyde) ট্রয় নগরীতেই থেকে গেল। ট্রয়ের অন্যতম রাজকুমার ট্রয়লাস (Troilus) তাকে দেখে মুগ্ধ হল। ট্রয়লাসের বন্ধু প্যাণ্ডারাস (Pandarus) তাকে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিল। ক্রিসিড প্যাণ্ডারাসের নিকট আত্মীয়া। প্যাণ্ডারাসের সাহায্যেই ট্রয়লাসের সঙ্গে ক্রিসিডের দেখা সাক্ষাৎ ঘটে। ক্রিসিড ট্রয়লাসকে শিষ্টাচারসম্মত ধরনে প্রণয়ী হিসাবে মেনে নিতে রাজী হয়। এই সময়ে গ্রীক ও ট্রোজানদের ভিতর সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘটে। বন্দী বিনিময় হয়। কালকাস তার মেয়ে ক্রিসিড-কে গ্রীক-শিবিরে নিয়ে যেতে যায়। ট্রোজানরা চায় এ্যান্টেনর-এর (Antenor) বদলে ক্রিসিডকে গ্রীকদের দিয়ে দিতে। হতাশ হয়ে প্যাণ্ডারাস আবার ট্রয়লাস এবং ক্রিসিডের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। ক্রিসিড ট্রয়লাসকে কথা দেয়, যে কোন ভাবেই হোক, সে আবার ট্রয়ে ফিরে আসবে। গ্রীক ডায়োমেড (Diomede) ক্রিসিডকে তার বাবার কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। যুদ্ধ করতে করতে একদিন ট্রয়লাস ডায়োমেডের হাতে ক্রিসিড-কে দেওয়া তার শেষ স্মারক চিহ্ন দেখতে পায়। ট্রয়লাস ক্রিসিডকে অবিশ্বাসিনী বলে বুঝতে পারে। ট্রয়লাস যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

কেউ কেউ ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম প্রাণবন্ত, অগতানুগতিক ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে প্যাণ্ডারাসের কথা বলেছেন। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিচরিত্র মহাকাব্যের যুগের গ্রীস বা ট্রয়ে থাকা সম্ভব কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু চশারের যুগে এটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এবং সে যুগেও ভাল বা মন্দ, সমস্ত ধরনের সামনের সারির কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অনুভব করার মত মনের জোর হয়ত পায়নি। ঠিক এখানেই মহৎ শিল্পীর কাজ,—সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা। প্যাণ্ডারাস কোন মহান চরিত্র নয়; কিন্তু তাকে গড়ে তোলা হয়েছে অন্যদের থেকে পূর্ণতর মানুষ হিসাবে। অবৈধ প্রণয়ের দালাল, কোটনা প্যাণ্ডারাস ট্রয়লাসের প্রতি সহানুভূতিতে মানুষের গুণ পেয়ে গেছে।

ক্রিসিডার বিচারে আমরা এই মূল্যবোধকে কাজে লাগাতে পারি। ক্রিসিডা শুধু সাধারণ নয়; সাধারণের থেকে হীনতর। কিন্তু সে কি মধ্যযুগের গতানুগতিক সুন্দরী এক নায়িকামাত্র? তাহলে অবিশ্বাসিনী নারী চরিত্রের অন্যান্য উদাহরণের ভিতর তাকে তো

খুঁজে পাওয়া যেত না। সে কি হিব্রু টেষ্টামেন্টের স্যামসন ডেলাইলা কাহিনীর পুনরুদ্ধৃতি? না। ডেলাইলার পরিকল্পনা ছিল ছকে বাঁধা, পূর্বনির্দিষ্ট। এখানে তা নয়। দ্বন্দ্ব এবং দোদুল্যমানতা পূর্ণতর আদর্শের প্রাথমিক পদক্ষেপ। ঘৃণ্য ক্রিসিডাকে কি কখনো অসহায়, পরমদুঃখিনী বলে মনে হয় না? চশার এখানে দৃঢ় সত্যতায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

আমি এই প্রসঙ্গে রেনেসাঁসের কথাও তুলতে পারি। কনষ্টান্টিনোপল খৃষ্টানদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, বা ক্লাসিক যুগের পুঁথিপুস্তকাদি পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া,—এতে অনেক পরের ঘটনা। রেনেসাঁসে নতুন জ্ঞানলাভের থেকে অধিকতর গুরুতর যা হয়েছিল তা মানুষের মনের মুক্তি। এই বোধ মানুষের মনে এসেছিল, যে যা জানি তার থেকে আলাদা, নতুন, অন্য কিছুও আছে,—এটাকে মানতে হবে। চশারের সম্পর্কেও ওই কথাই বলতে পারি। —নারী—সুন্দরী, নায়িকা, দেবী, —কিন্তু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং চেতনাবর্জিত বস্তুমাত্র। মধ্যযুগে শুধু সামন্ত প্রভুর বা গতানুগতিক ধর্মসংঘের শাসন ছাড়াও পুরুষের শাসন সবচেয়ে প্রকট ছিল। সেই অবস্থাতেও ক্রিসিডাতে রক্তমাংসের মানুষের মত দ্বন্দ্ব এবং অসহায়তার বোধ চশার আনলেন কি ভাবে? এখানেই চশার নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর সমসাময়িক কালের মানুষকে। চশার বা সেক্সপীয়র কেউই মিলটনের মত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তাঁরা গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাই তাঁরা নিজের নিজের যুগের মানুষের উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

নাটক

এবার নাটকের কথায় আসি। পূর্ববর্তী খণ্ডে (মধ্যযুগ—একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) আমরা ইংল্যাণ্ডে দেশীয় নিজস্ব ধরনে নাটকের সূচনার কথা বলেছি। আমরা 'গিল্ড'গুলির কথা বলেছি। কিন্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক গিল্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় নীতি, ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের শ্রেণীবিভাগ, পরিবর্তন ও গুণগত ক্রমোন্নতির কথা বলিনি।

আগেই বলা হয়েছে প্রার্থনানুষ্ঠান, বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদিতে জনসাধারণ যেমন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের আশ্রয় পেত তেমনি সেগুলি সরল সাধারণ মানুষকে নানাভাবে আনন্দও দিত। এটা ঠিক যে ধর্মসংগঠনগুলির পরিচালকমণ্ডলীর ভিতরে নানা অনাচার ঢুকেছিল; কিন্তু সেগুলি জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে এটাও দুঃখের কথা যে জনসাধারণের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের নানাভাবে শোষণ ও বঞ্চনা করার উপায় হিসাবে ওইসব উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-বিচারকে ব্যবহার করা হোত। আমাদের প্রতিবাদ সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, নাটকের বিরুদ্ধে নয়। জনসাধারণ তাদের বিশ্বাসের সরলতায় তাদের মনের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখেছিল।

উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাইবেলের কাহিনীগুলির জনপ্রিয় এইসব আনন্দদায়ক নাট্যরূপকে 'মিরাকল' (Miracle) বলা হত। এগুলি বিভিন্ন গিল্ড (Guild) দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। গিল্ডগুলি ছিল পুরোহিত সমাজ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বাইরের ধর্মীয় সংঘ, সামাজিক

সংঘ বা বণিক সংঘ। (পরবর্তীকালের ইংরাজী সমাজের বড় বড় ক্লাবগুলির সূত্রপাত এইসব গিল্ডগুলির ভিতর থেকে কি না তা সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধানকারীগণ ভেবে দেখতে পারেন।) চেষ্টার (Chester), ইয়র্ক (York), কভেন্ট্রি (Coventry) এবং ওয়েকফিল্ড (Wakefield),—এই চারটি জায়গায় এই ধরনের মিরাকল নাটকের খুব জনপ্রিয়তা ছিল। বাঁধা মঞ্চ কিছু ছিল না। বিশেষধরনে তৈরী টানাগাড়ীতে করে শহরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে এইসব অভিনয় দেখান হত। এই সব নাটকের পাণ্ডুলিপির অনেকগুলিই অদ্যাবধি রক্ষিত আছে।

এরপর আসে মর‍্যালিটি (Morality) শ্রেণীর নাটক। এগুলির বিষয়বস্তু বাইবেলে উল্লিখিত ঘটনা নয়। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির অনেক কিছুই 'মর‍্যালিটি' নাটকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলিতে 'পাপ', 'পুণ্য', 'লোভ', 'ন্যায়', 'সৌন্দর্য', 'শক্তি', 'শান্তি',—এরাই হ'ত নাটকীয় চরিত্র। পঞ্চাশের দশকে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রের পরিচালনায় 'আত্মদর্শন' ছিল এই জাতীয় নাটক। এইসব মর‍্যালিটি নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল সদাচরণ, পাপ থেকে মুক্তি, আত্মার পবিত্রতা, এবং স্বর্গে প্রবেশের অধিকার ইত্যাদি। মধ্যযুগীয় রীতিতে বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যার নাটকীয় ধরণের ভিতর থেকে, কিংবা পৌরাণিক অথবা ধর্মীয় ঘটনা ইত্যাদির রূপক উপস্থাপনের ভিতর থেকেই হয়ত এই মর‍্যালিটি নাটকের উদ্ভব। যে সব নাটকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যায়নি সেগুলির ভিতরে ১৪০০ সালের বা তার কিছু আগের লেখা নাটক "জীবনের গর্ব" (The Pride of Life) উল্লেখযোগ্য।

এইসব মর‍্যালিটি শ্রেণীর নাটকের ভিতর **'যে কোন মানুষ' (Everyman)** শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।

১৪৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে এটি লেখা হয়। 'ঈশ্বর' এই নাটকের একটি চরিত্র। সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের একীভূত রূপ 'মানুষ'ও এই নাটকের একটি চরিত্র। 'মৃত্যু', 'এভরিম্যান' নামক চরিত্রকে নিয়ে যেতে আসে। সঙ্গী সাথীরা কেউ 'এভরিম্যান' এর সঙ্গে যেতে চায় না। 'সৎকর্ম' নামক চরিত্র রাজী হয়। স্পষ্টভাবেই, মূল একটি নীতিশিক্ষা নাটকটির বক্তব্য। কিন্তু সেই বক্তব্যটুকুতে পৌঁছানোর জন্য নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় ধাপগুলি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয়নি। কাজেই নীতিশিক্ষা নাটকীয় শিল্পকর্মের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

তবে ঐতিহ্যবাহী নীতিশিক্ষা ঃ "সব ভাল তার, শেষ ভাল যার"-এর উপস্থিতি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। আবার. 'আপনার লোকেদের' আন্তরিকতার অভাব সত্যদর্শনের সঙ্গে মহৎ বেদনাও সৃষ্টি করে।

এই নাটকে প্রয়োজনীয় সঙ্গতি এবং আদিম, মৌলিক, নিরাভরণ, রূক্ষ মহিমা লক্ষ্য করা যায়।

'এভরিম্যান' মর‍্যালিটি নাটকের একটি পরিণত নিদর্শন। এই নাটকটির মারফৎ বোঝা যায় যে নাট্যকার সাহিত্যকর্মের গুরুত্ব বুঝতে শিখেছেন। অন্য বিবেচনার তুলনায় সেইটাই প্রধান, এ বোধ অবশ্য তখনও আসেনি। নাটকটির লেখায় এক ধরনের অসংস্কৃত মূলরূপ বজায় আছে। এটি একটি প্রাচীন ক্লাসিকগুণ। সূক্ষ্ম কৃত্রিম সৌন্দর্য ক্লাসিক ধর্মের বিরোধী।

অসংস্কৃত বিশালতার একটা নিজস্ব ইশারা আছে। সে সৌন্দর্য এই নাটকটির ক্ষেত্রে বহু পরেও স্বীকৃত হয়েছে। এটি পরে অনেকবার অভিনীত হয়েছে। 'এভরিম্যান' মর‍্যালিটি নাটকের ধারার একটি অক্ষত পরিচায়কচিহ্ন শুধু নয়, বা রূপক নাটকের একটি নিদর্শনমাত্র নয়। এটি একটি সার্থক, জনপ্রিয়, স্থায়ী এবং নিজস্ব আবেদন সমন্বিত সাহিত্যিক নিদর্শন। এটি ষোড়শ শতাব্দীর গৌরবময় নাট্য ঐতিহ্যের স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত বিষয়। 'এভরিমান' রচিত হয় ষোড়শ শতাব্দী শুরু হওয়ার অল্প কয়েক বৎসর মাত্র আগে।

এইসব মর‍্যালিটি নাটকের বিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক নাট্যকারদের প্রভাব ইংল্যাণ্ডের নাটকের উপর এসে পড়তে থাকে। এখানে একটা রহস্য থেকে যায় এই যে যদি বহিরাগত নাটকের প্রভাব নাটকের সুবর্ণযুগের একমাত্র উৎপত্তি স্থল বলে ধরা হয়, তবে কি এটা মেনে নিতে হবে যে সাংস্কৃতিক বিশ্বদর্শনের (ষোড়শ শতাব্দী) ফলে দেশীয় নাটক উৎখাত হয়ে গেল? —ব্যাপারটা তা নয়। আসলে, মর‍্যালিটি নাটকগুলির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার একটা শক্তি ছিল। যেমন,—রূপকগুণাক্রান্ত চরিত্রগুলি ধীরে ধীরে ধর্মীয় অবস্থান থেকে সরে যেতে সুরু করে। ধর্ম-অধর্ম, স্বর্গ-নরক নয়; মানবিক নীতি-দুর্নীতি এবং আরও পরে, জ্ঞান-অজ্ঞানতার দ্বন্দ্ব নাটককে রসদ যোগায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষের চিন্তাভাবনা, বোধ, যন্ত্রণার সেই সবদিক যা এতদিন বিশ্লেষণ করা হয় নি, তা দেখান হতে সুরু করে। সংস্কার-আন্দোলন, ধর্মীয় স্বাধীনতা যেমন মননশীলতার দিক, তেমনি ক্রমপরিবর্তনশীল মর‍্যালিটি নাটক জনবোধ্য ব্যবহারিক দিকে মানুষের চিন্তাজগতকে বদলে দিয়েছিল, এবং বিস্তৃত করেছিল। সুতরাং ছেদ পড়েনি। বড় জোর আমরা বলতে পারি,—যে নাটকীয় কর্মতৎপরতা এতদিন ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমানায় আটকে ছিল তা দরজা খুলে দিল ইজিয়ান (Aegean) থেকে টাইরেনিযান (Tyrrhenian) পর্যন্ত প্রাচীন নাট্যজগতের তরঙ্গের তাড়নাকে, এবং তা ইংরাজী ভাষায় এবং বহুক্ষেত্রে, ইংরাজী ইতিহাসকে অবলম্বন ক'রে।

প্রসঙ্গতঃ, গ্রন্থের পরবর্তী পর্বের কথা হলেও একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। ধারাবাহিকতা অনুসরণ করার জন্য জানতে হবে যে আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাইরেও কিছু নাটক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এগুলির সূত্রপাত হঠাৎ হয়নি। গণ নাটক, প্রহসন, গর্ভনাটিকা কেবলমাত্র গুরুতর নাটকের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য বা আবেগের চাপকে কমিয়ে দেবার জন্যই সৃষ্টি হয়নি,—এদের প্রাথমিক প্রয়োজনও ছিল। এইসব নাটকগুলির কোন কোনটিতে শুধু ধর্মীয় কাঠামো নয়, চিরাচরিত রূপকের আশ্রয়ও বর্জন করা হয়েছিল। যেমন, মেডওয়ালের (Henry Medwall) 'ফুলজেনস এবং লুক্রেস' (Fulgens and Lucres)। এ ধরনের নাটক ধর্মভিত্তিক নয়, রূপকও নয়। পরবর্তীযুগের গুরুত্বপূর্ণ ও নামী কমেডিগুলিতে এই সব ছোট ছোট নাটকের ধারা ভালরকমই থেকে গেছে। তবে পরবর্তী যুগের ট্র্যাজেডিগুলি ল্যাটিন এবং বিশেষ করে, গ্রীক আদর্শে প্রভাবিত হওয়ায় তাদের জাতই আলাদা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দুঃখের কাহিনী নিয়ে গীতিকাব্য হয়েছে, নাটক হয়নি। তবে কমেডির ধারা বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও তার দেশীয় লক্ষণ অনেকখানিই বজায় রাখতে পেরেছিল।

আবার, ট্র্যাজেডির বিশ্বজাগতিক আতঙ্ক (Terror) এবং নৈতিক ন্যায্যতার (Moral Justicc) উন্নত পর্যায়ের সঙ্গে সমলক্ষণের সূত্র দেশীয় নাটকের কোথাও পাওয়া যায় না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

ইংরাজী গদ্য

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে গদ্যে লেখার প্রচলন মোটামুটি ভালভাবেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে প্রথম দিকে পার্থিব বিষয়, এবং কেবলমাত্র আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে জাগতিক জ্ঞানবুদ্ধির বিষয়ের উপর লেখার আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা না থাকায় ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুবাদের উপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা ম্যাণ্ডেভিল, যাঁর আসল নাম জেহান ডি বুর্গোগ (Jchan dc Bourgogne)-এর নাম করতে পারি।

অনুবাদ বা প্রাথমিক লেখা যা-ই হোক না কেন, ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কিছু সময় লেগেছিল। অন্ততঃ, ল্যাটিন প্রভাবিত 'সাধু' ইংরাজী এবং দেশীয় চলতি ইংরাজী,—দুটি শ্রেণী অনেকদিন ধরেই পাশাপাশি চলেছিল। স্বভাবতঃ, জ্ঞানের কথা, গুরুগম্ভীর বিষয়,—বোঝানোর জন্য দেশীয় ইংরাজীভাষার ক্ষমতা যেন যথেষ্ট ছিল না। আস্তে আস্তে দুই-এ মিলে মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আসে। কিন্তু অতি-আধুনিক কাল ছাড়া সীমারেখা বরাবরই টানা হয়েছে। বেকন (Bacon), মিলটন (Milton), কার্লাইল (Carlylc) এবং আরও অনেকে—ল্যাটিন বা ল্যাটিন-প্রভাবিত ভাষার বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষার নিজস্ব সুর গাম্ভীর্য ধীরে ধীরে অনুভব করা গেছে; এবং বর্তমানে ভাল ইংরাজী ভাষা বহু ক্লাসিক নিদর্শনের থেকে পাঠকের কাছে কম সম্ভ্রমের বিষয় নয়।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই ইংবাজী গদ্যের সেই প্রাণবন্ত উত্থান পতনের সুর, যা পাঠককে অভিভূত করে, এবং পাঠকের মনকে এক শক্তিশালী আবেশে ভরিয়ে তোলে, তা প্রকাশ পেতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইংরাজী গদ্যের চরিত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আদর্শ খুঁজে পায়। আজ যে ইংরাজী গদ্য সারা পৃথিবীতে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় এবং সব চেয়ে জনপ্রিয় পাঠ্য-উপকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার শুরু চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকেই। এর জন্য আমরা কেবলমাত্র কয়েকজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কৃতিত্ব দিই না। রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় স্বাধিকার অর্জনের অন্যতম অনুষঙ্গী হিসাবেই ইংরাজী ভাষার গৌরব ও মর্যাদা ইংরাজমানসে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাষার গঠন সৌকর্যের এই কৃতিত্ব ইংরাজ জনসাধারণের। কাজের সুবিধার জন্য আমরা আগে ইংরাজী **বাইবেলের** প্রসঙ্গে অল্প দু'এক কথা বলব। জনসাধারণের মনের ধর্মবিদ্রোহের প্রবল প্রবণতা যে মানুষটির ভিতর কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তিনি **ওয়াইক্লিফ (John Wycliff)** ১৩২০-১৩৮৪।

বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ অষ্টম শতাব্দী থেকেই সুরু হয়েছিল। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মহামতি বীড এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের এলফ্রিক (Aelfrice)-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এরপর নর্ম্যান-প্রভাবিত পরিবেশে বাইবেলের কিছু কিছু অংশ নিয়ে কাজ

হলেও, সামগ্রিক পরিকল্পনা কিছু ছিল না। এই পরিকল্পনা এসেছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে জনসাধারণের ধর্মীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে।

এংলোস্যাক্সন যুগের রাজা আলফ্রেডকে ইংরাজী গদ্যের জনক বলা হয়েছে। আবার চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ওয়াইক্লিফকে ইংরাজী গদ্যের নতুন জনক বলা চলে। তাঁর ট্র্যাকটগুলি (ধর্মবিষয়েব উপর ছোট প্রচারপুস্তক বা আলোচনা) সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাতেই লেখা হয়েছিল। এগুলিতে সুকুমার লালিত্য ছিল না, কিন্তু সাধারণ ইংরাজের সম্পূর্ণ পরিচিত ও নিজস্ব ভাষা এতে ছিল। আবার, এতে বাইবেল থেকে চয়ন করা কিছু কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ছিল যা সাধারণ মানুষের চোখের সামনে সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে ধরতে পেরেছিল। যুক্তি ও ভাষার অপূর্ব সমন্বয়ে এগুলি নিরাসক্ত মানুষদেরও সঞ্জীবিত করে তুলতে পেরেছিল। আমরা জানি ওয়াইক্লিফ সাহিত্যিক হতে চান নি। তিনি ধর্মবিদ্রোহের নেতা; ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার ভগীরথ। কিন্তু ওয়াইক্লিফ যা লিখেছিলেন তাতে ইংরাজী সাহিত্যের অভিযানেরও অন্যতম নেতা বলে তিনি স্বীকৃত। তাঁর বিশেষ প্রযোজনে তাঁর লেখাগুলির সঙ্গে সাধারণ ইংরাজের বিচারবুদ্ধিকে তিনি যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই ওয়াইক্লিফের লেখা সংস্কারমুক্ত সাধারণ ইংরাজের সাহিত্য-চিন্তার পরিচয় বহন করে। ধর্মীয় সংস্কার মুক্তির চেষ্টা হয়ত ওয়াইক্লিফের অজ্ঞাতসারেই ইংরাজী গদ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ পেতে সাহায্য করে। ওয়াইক্লিফ ইংরাজের ধর্মকে যুক্তির পরিবহনে তুলে দেন; ইংরাজী গদ্যকে স্বাধীনতার পথ দেখান। শিষ্য হারফোর্ডের (নিকোলাস হারফোর্ড—Nicholas Herford) সহায়তায় তিনি শেষ পর্যন্ত বাইবেলের নতুন অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। বাইবেলের দুটি অনুবাদ ওযাইক্লিফের হাতে নিষ্পন্ন হয়। দুটিই প্রকাশিত হয় পরে। একটি তাঁর জীবনের শেষতম পর্যায়ে ১৩৮৪ সালে, এবং অপরটি ১৩৮৮ সালে। প্রথমটিতে হারফোর্ডের এবং দ্বিতীয়টিতে জন পার্ভের (John Purvey) সহযোগিতা ছিল। প্রচণ্ড নিষ্ঠা ও কঠোর বিশ্বাসের সঙ্গে এই মানুষটি ধর্মের ক্ষেত্রে ইংরাজের জন্য যা করেছিলেন, তা ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের গঠনকারী শক্তি হিসাবে এবং সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান উপাদান হিসাবে চিরকালের জন্য থেকে গেছে। পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত এই তেজস্বী মানুষটি ১৩৮৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর লাটারওয়ার্থের (Lutterworth) গ্রামীন গীর্জায় শেষ প্রার্থনা সভায় যোগ দেন। এবং পরের দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যাঁরা ওয়াইক্লিফের সাহিত্যিক কৃতিত্বকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে বলেন, তাঁরা সাহিত্যকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেখেন। সে দৃষ্টি ভ্রান্ত।

ওয়াইক্লিফের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ বছর পরে আবার বাইবেলের অনুবাদের কাজের উপযুক্ত উৎসাহী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এঁরা হলেন উইলিয়ম টিণ্ডেল, মাইলস কভারডেল, জন রোজার্স এবং অন্যান্যরা। এঁদের কথা গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বলা হবে।

এবার আমরা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ইংরাজী গদ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন দু'চারখানি বই এর উল্লেখ করবো।

Mandeville's Travels ঃ প্রথমেই ম্যানডেভিলের-এর (Sir John Mande-

ville) "ভ্রমণবৃত্তান্ত" (ট্রাভেলস-Travels)-এর উল্লেখ করতে পারি। কাল্পনিক কিংবদন্তী অথবা সকলের জানা কয়েকটি ভ্রমনবৃত্তান্ত এখানে লেখা হয়েছে। লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল এটি নয়। গদ্যসাহিত্য-প্রস্তুতির প্রথম দিকের লেখা হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে বইটির বিশেষ স্থান আছে। লেখক ফরাসী। ম্যাণ্ডেভিল নামটি আসল নাম নয়। লেখকের নাম সম্ভবতঃ জেহান ডি বুর্গোর্গ (Jehan de Bourgogne)। মূল বইখানি ফরাসী ভাষায় লেখা। এর ইংরাজী অনুবাদটিই ইংরাজী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মূল ফরাসী বইটি হয়ত ১৩৫৬-৫৭ সালে লেখা হয়েছিল। এবং ইংরাজীতে এর অনুবাদ হয়েছিল ১৩৭৭ সালে।

জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার ব্যাপারে যাত্রীদের সাহায্যকাবী পুস্তক হিসাবে এর পরিকল্পনা ছিল। এর বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হযেছিল। বইটি সমসাময়িককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ১৭২৫ সালেও বইটির জনপ্রিযতা ছিল। কারণ ওই বছরে বইটি ছাপান হয়েছিল।

বাইবেলের বাইরে ইংরাজী গদ্যে লিখিত বা অনূদিত বই হিসাবে প্রথম এই বইটির নামই করতে হয। লেখক যিনিই হোন বইটি যুগোপযোগী ছিল, এবং অনুবাদ হলেও, ইংরাজী গদ্যে লেখকের নিজস্ব বিশিষ্ট লক্ষণ এই গ্রন্থখানিতেই প্রথম পাওয়া যায।

এরপরে আমরা রেজিনাল্ড পীকক-এর (Reginald Pecock—১৩৯০-১৪৬১) নাম উল্লেখ করতে পারি। ১৪৪৫ সালে "যাজকদিগকে অতিমাত্রায় দোষারোপের সংযতকারী" (দি রিপ্রেসর অব ওভারমাচ ব্লেমিং অব দি ক্লার্জি—The Repressor of overmuch Blaming of the Clergy) নামে যে বই তিনি লেখেন তাতে ইংরাজী শব্দের যথাসম্ভব ব্যবহার লক্ষ্য করা যায ; তবে তা রূঢ ধরনের।

চশারের কথা এখানে আবার একটু বলা দরকার। গদ্য লেখায চশারের স্থান খুব উঁচুতে নয়। প্রধানতঃ অনুবাদ এবং তা-ও সাবলীল নয। 'ক্যান্টারবেরি টেলস'-এর অন্তর্ভুক্ত দুটি গল্প গদ্যে লেখা। এ দুটিতে সঠিক অর্থবোধক ইংরাজী শব্দ প্রচুর। একটি গল্প তাঁর নিজের জবানীতে, এবং অপরটি 'পার্সন'-এর (গ্রামের গীর্জার যাজক) মুখ দিয়ে বলান গল্প। প্রথমটির নাম 'মেলিবিয়াসের গল্প' (দি টেল অব মেলিবিয়াস—The Tale of Melibeus)।

আর যা গদ্য লেখা আছে তা অনুবাদ এবং কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষযে। চশারের বিশেষত্ব এগুলির উপর আদৌ নির্ভর করে না।

সাহিত্যের অগ্রগতি সামাজিক ও বাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে। অনেক ক্ষেত্রে এই সব ক্রিয়াকলাপের প্রভাব সাহিত্যের উপর পড়তে কমবেশী পঞ্চাশ বছরের মত সময় নেয়। আবার, জগতে এমন অনেক সাহিত্যকর্ম আছে যা সমাজ এবং প্রচলিত ধ্যানধারণাকে পালটে দেয়। মোটামুটি এই রকম পরস্পর সাপেক্ষ গতিশীলতা অথবা বিলম্বিত প্রভাব সাহিত্যের ইতিহাসের খুবই প্রত্যাশিত চরিত্র। কিন্তু ব্যতিক্রমও কিছু কিছু থাকে। এই ব্যতিক্রমের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বৈচিত্র ও অনন্যপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ রোম্যান্স লেখার উপযুক্ত যুগ নয়। অন্ততঃ মধ্যযুগীয় আদর্শের রোম্যান্স সেখানে হাস্যকর। কিন্তু আর্থারের কাহিনীর জনপ্রিয়তা সমাজের কোন কোন অংশে ভাল রকমই ছিল। অভিজাত-সমাজভুক্ত মানুষেরা এবং কিছু কিছু কবিও প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে কৃত্রিম আত্মাভিমানের বশবর্তী ছিলেন। বই-এর পাঠক এই শ্রেণী থেকেই অনেক ক্ষেত্রে উঠে আসে। কালপরিত্যক্ত শৌর্যবীর্যের কৃত্রিম আদর্শ অবলম্বন করে যারা বেঁচে থাকে, লিখিত বই-এর পাঠকের সংখ্যা এককালে তাদের ভিতরেই বেশী ছিল।

ম্যালোরির (স্যার টমাস ম্যালোরি Sir Thomas Malory) **'মর্টে ডি আর্থার'** (Morte d' Arthur) গদ্যে লেখা রোম্যান্স। ১৪৬৯ সালে এটি লেখা হয়।

কাব্যময় গদ্যে লেখার এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই অভিনবত্ব আছে। উপকথার ব্যাপক এবং দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহ্যের দরুন কোন কোন মহলে আর্থার কাহিনীর চাহিদা ছিল। বিশেষ করে, গদ্যে লেখার অভিনবত্বের আকর্ষণ কম নয়। আর্থারের পিছনে বিরাট ঐতিহ্য যদি না থাকত, তবে মানুষের মন প্রাক্-আধুনিক যুগে হয়ত সেদিকে ঝুঁকে পড়ত না। এই সর্বাত্মক আকর্ষণ বোধ হয়ত কোন বিশেষ অবস্থায় যুগধর্মকে তেমন পাত্তা দেয়নি। শক্তিশালী মানবিক অনুভূতির এক অনিঃশেষ গুণ থাকায় আর্থারের পুরানো কথা নতুন করে শোনবার মত মানসিকতা হয়ত অনেকের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। আর্থার-কাহিনীর মধ্যে ফেলে আসা দিনের যে আকুলতা থেকে গেছে তা-ই ম্যালোরির সাহিত্যকর্মকে নিষ্প্রভ একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ম্যালোরির সাহিত্যকর্মের মধ্যে দক্ষতা, চাতুর্য এবং স্বচ্ছতা আছে, কিন্তু মূল সৌন্দর্যবোধ কতটা আছে বলা শক্ত।

প্রসঙ্গতঃ ১৪৮৫ সালে ম্যালোরির 'আর্থার' ছাপা বই হয়ে বেরোয়।

যুগধর্মিতা থেকে বিচ্যুতির যে ত্রুটি ম্যালোরির ছিল পঞ্চাশ বছর পরে লর্ড বাবনার্সের (Lord Berners 'Chronicle'—১৪৬৭-১৫৩৩) হাতে তার ত্রুটি পূরণ হয়েছিল। জিন ফ্রয়সার্ট-এর (Jean Froissart—১৩৩৭-১৪০৫) যে ফরাসী গ্রন্থটি বারনার্স অনুবাদ করেছিলেন তা ছিল বাস্তবতা ও শিল্পবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

তা সত্ত্বেও ম্যালোরির সাহিত্যকর্মের কৃতিত্ব যা ছিল তা উল্লেখ না করাটা সাহিত্য বিচারে নিরপেক্ষতার অন্তরায় হবে। এটা অস্বীকার করা উচিৎ হবে না যে ম্যালোরির হাতেই ইংরাজী গদ্য প্রথম নিজ স্বরূপ পরিগ্রহ করেছিল। অতীতের বহুসংখ্যক উপকথার একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ক্যাক্সটন(Caxton)

[ইংল্যাণ্ডে প্রথম মুদ্রাকর]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ ঘটেছিল ক্যাক্সটনের (William Caxton—উইলয়ম ক্যাক্সটন—১৪২২-১৪৯১) হাতে। ক্যাক্সটন খুব বড় সাহিত্যিক ছিলেন না; কিন্তু তিনি প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম উপকরণ ব্যবহার করে সাহিত্যের প্রকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ সার্থকতা ঘটিয়েছিলেন।

ক্যাক্সটন কেন্ট প্রদেশের লোক। লণ্ডনের এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর অধীনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। বস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবেই ফ্রান্সে বৃটিশ বাণিজ্যের বিস্তারের ব্যাপারে উত্তর ফ্রান্সের ফ্লাণ্ডার্সের ব্রুগেশ শহরে তেত্রিশ বছর কাটান। তারপর, ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের বোন বার্গাণ্ডির ডাচেশ মার্গারেটের অধীনে নকলনবিস হিসাবেও কিছুদিন কাজ করেন। কিন্তু সে কাজ বড় একঘেয়ে লাগে। ইতিমধ্যে কোলার্ড ম্যানসন (Colard Mansion) ব্রুগেন শহরে ছাপাখানার পত্তন করেন।

মুদ্রাযন্ত্র প্রথম প্রবর্তন হয় জার্মানীতে। কিন্তু পাণ্ডুলিপির হুবহু অনুকরণের যে চেষ্টা প্রথম দিকের ছাপাখানায় ছিল তাতে ছাপার খরচ খুব বেশী পড়ত, ছোট ছোট বই ছাড়া অন্য কিছু ছাপা যেত না, এবং সেগুলিও হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির অনুকরণের থেকে কম জনপ্রিয় ছিল। ১৪৯৪ সালে আলডাস ম্যানুটিয়াস (Aldus Manutias) নতুন পদ্ধতি প্রচলন করার আগে মুদ্রাকররা এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পারছিলেন না। নতুন পদ্ধতিতে প্রথম ছাপার কাজ হয় দক্ষিণ ইউরোপে—ভেনিসে। এরপর এই কারিগরীবিদ্যা প্যারিসে এবং লিয়নস-এ (Lyons) কেন্দ্রীভূত হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্যাক্সটনের মারফৎ ইংল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। ১৪৭৭ সাল থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডে মুদ্রাকরের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন ক্যাক্সটনের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

কিন্তু ক্যাক্সটন শুধু মুদ্রাকর ছিলেন না, —অনুবাদ করার কাজে তিনি সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করেছিলেন। নিজের অনুবাদকরা বিষয়বস্তু তিনি চার হাজার পাতারও বেশী ছেপেছিলেন।

তাঁর জীবিতকালে তৎকালীন প্রায় সমস্ত ভাল বইই তিনি ছেপেছিলেন। ক্যাক্সটনের মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেশের নানা অঞ্চলের গ্রন্থকারদের লেখা তিনি নিজে সম্পাদনা করে এবং নিজের মত পরিমার্জনা করে ছেপেছেন। ফলে হাতে লেখা অবস্থায় যেগুলি ছিল নানা আঞ্চলিক ভাষার গ্রন্থ, ক্যাক্সটনের ছাপাখানার মারফৎ সেগুলি তখন থেকে 'ইষ্ট মিডল্যাণ্ড'-এর ভাষার আদর্শে কেন্দ্রীভূত হয়। অর্থাৎ, মৌখিক ভাষা যেখানে যা-ই প্রচলিত থাক না কেন, লিখিত ইংরাজী সাহিত্য তখন থেকে একটা বিশেষ আদর্শ বা ধরন অবলম্বন করে। লন্ডন-অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের এই আঞ্চলিক ভাষা ফরাসী ভাষার সহযোগিতায় ইংরাজী সাহিত্যের ভাষার প্রচলিত রূপ হিসাবে তখন থেকে স্বীকৃত হয়। এই ভাষাকে ইতিপূর্বেই উঁচু মর্যাদা দিয়ে গিয়েছিলেন জিওফ্রে চশার।

নানা কবিতা—নানা কবি

আবার কবিতার কথায় আসা যাক। এখানে চশারের আরও কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা দরকার।

'রণ্ডেল' (Rondel) একজাতীয় বিচিত্র গঠনের ছোট কবিতা। এগুলি দশ লাইনের বা তের লাইনের কবিতা। এতে দুটি অন্ত্যমিল বরাবর চলতে থাকে, এবং লাইনের

প্রথম শব্দগুলি ধুয়া হিসাবে দুবার ব্যবহার করা হয়। এ জাতীয় কবিতার এখন আর চলন নেই। চশার এতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি আবেগসমন্বিত কয়েক ধরণের ছোট কবিতাও (লিরিক—Lyric) লিখেছিলেন। সুনির্দিষ্ট গঠনের 'রণ্ডেল' দ্বাদশ শতকের প্রভেঁস-এর (Provence—দক্ষিণ ফ্রান্স) কবিদের সৃষ্টি।

স্বপ্নবিষযক আলোচনার সঙ্গে কাহিনী যুক্ত করে চশার লিখেছিলেন 'যশের আলয়' (দি হাউস অব ফেম—The House of Fame)। এতে যশস্কামদের আকুতি কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। ভাষার প্রাণবন্ত ভাব অবশ্যই প্রশংসার বিষয়। এই কবিতায় কবি তাঁর একান্ত ব্যক্তিসত্ত্বাকে সরলভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আবার 'পক্ষীদিগের মহাসভা' (দি পার্লিমেণ্ট অব ফাউলস—The Parlement of Foules) সহজ আদর্শের রোম্যাণ্টিক কবিতা। এখানে ভাবপ্রকাশের বাঁধা ছকের কৃত্রিমতা তিনি বর্জন করেছেন।

'গ্রিসেলিডিস-এব গাথা' (ব্যালাড অব গ্রিসেলিডিস—Ballade of Griselidis)-তেও তিনি হালকা সুরেই চূডান্ত কারুকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, চশার কখনও পুরাপুরি আধ্যাত্মিকতার বা মহিমান্বিত কাব্য সৃষ্টির কোন চেষ্টা করেননি। মানুষের মনের সাধারণ অনুভূতিগুলির কৌতুকময় প্রকাশ তাঁকে আমাদের কাছে অনেক 'কাছের মানুষ' করে রেখেছে।

চশার বই পডতে ভালবাসতেন। 'দি হাউস অব ফেম'-এ (The House of Fame) যে ইচ্ছার ইঙ্গিত, 'আদর্শ নারীদের কথা'-য় (লিজেণ্ড অব গুড উইমিন—Legende of Good Women) তারই ক্রটিশূণ্য প্রকাশ।

চশারের সমসাময়িক ছিলেন জন গাওয়ার (John Gower)। ১৩৯০ সালে তাঁর লিখিত 'প্রেমিকের স্বীকারোক্তি' (Confessio Amantis—কনফেসিও এ্যাম্যানটিস) ৩৩০০ লাইনের ব্যাপক কবিতা। কোন ব্যক্তিবিশেষ "শিষ্টাচারসম্মত প্রেমের" রীতি লঙ্ঘন করে পাপ করেছে। কবিতাটি তারই স্বীকারোক্তি। ক্লাসিক সাহিত্যে উল্লিখিত নানা কাহিনীর সঙ্গে সে তার পাপগুলির তুলনা করেছে। সাতটি মারাত্মক পাপের [বিলাস—Luxury; ক্রোধ—Anger; ধনলোভ—Avarice; অতিভোজন—Gluttony; আলস্য—Sloth; দম্ভ (মদ)—Pride; পরশ্রীকাতরতা (মাৎসর্য)—Envy] সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা এখানে করা হয়েছে। কাহিনীকার হিসাবে কবির দক্ষতা থাকলেও কবি হিসাবে তিনি আকর্ষনীয় ছিলেন না। গাওয়ার নীতিবাগীশ ও রক্ষণশীল ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিডগেট-এর (John Lydgate)-এর কবি ও অনুবাদক হিসাবে খুব খ্যাতি ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য যদিও অন্য কিছুতে ছিল না, কিন্তু অনেক বিদেশী কাহিনী এবং রোম্যান্স তিনি ইংরাজ পাঠককে উপহার দিয়ে গেছেন।

এখানে আমরা আর কয়েকজন কবির উল্লেখ করবো যাঁদের কাজ সাল তারিখের দিক দিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর ভিতরে পড়লেও নতুন যুগের নতুনত্ব যাঁদের ভিতর ছিল না। এঁদের না ছিল উল্লেখযোগ্য প্রতিভা, না ছিল নতুন লক্ষণ। এঁদের কথা পরবর্তী

খণ্ডে বলতে গেলে নতুন যুগের চরিত্রের সঠিক পরিচয় দেওয়া যাবে না। এমনই হয়। সাল তারিখের লাইন দিয়ে সাহিত্যের বিচিত্র গতিকে অঙ্কের হিসাবে মেলান যায় না।

নতুন যুগের হাওয়াকে ধরতে পারার ক্ষমতা না থাকলেও কয়েকজনের কথা উল্লেখ করতে হয় যাঁদের কাব্যপ্রয়াস ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের সাহিত্যের পড়তি দশা থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতা ছিল না।

জন স্কেলটন (John Skelton—১৪৬০-১৫২৯) ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। সাহিত্যের মান ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ভাল ধারণা ছিল; উপযুক্ত পদেও তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ভাল লেখার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ হয়ত ছিল না। হয়ত একটু খ্যাপাটে গোছের লোক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সবাই যা ভাল বলত তা তিনি ভাল বলতেন না; আর, অন্য সব ধরনের পদ্যের থেকে তিনি বিদ্রুপাত্মক রচনাতে আনন্দ পেতেন। —তবে তাতে কোন সৌকর্য বজায় রাখা দরকার মনে করতেন না। পুরোহিতদের অনাচারকে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন। আক্রমণাত্মক হলেও নতুন যুগের উপযোগী গতিশীলতা ও প্রাণবন্তভাব তাতে ছিল না।

তাঁর পদ্যগুলি সাত লাইনের আইএ্যাম্বিক (Iambic) ছন্দের স্তবকে লেখা। এটি সম্ভবতঃ চশারের প্রভাব। জন স্কেলটনের পাণ্ডিত্য ও নিজের পছন্দসই সাহিত্যকর্ম থাকলেও আমরা তাঁকে ধরে একালের সাহিত্যের সূত্রকে অনুসরণ করতে পারি না।

আবার, এই সময়, উপযুক্ত উৎসাহ, পরিবেশ ইত্যাদি না থাকায়, এবং সৃজনশক্তির অভাবে কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ফেরাতে দেখি অতীতের দিকে। কিন্তু সে অতীতকে শক্তিশালী কল্পনা দিয়ে বর্তমান যুগে খাপ খাইযে নেওয়ার ক্ষমতা এই সব কবিদের ছিল না।

তবু স্টিফেন হয়েস (Stephen Hawes—১৪৭৪-১৫৩০) দাবী করলেন, ইংরাজী সাহিত্যকে তিনি একক প্রচেষ্টায় ধরে রেখেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্যকে ধরে রেখে সাহিত্য তখনই ধোপে টেঁকে যদি তা ঐতিহাসিক বা উপকথার বা লোককাহিনীর ব্যক্তিদের অবলম্বন করে তৈরী করা হয়। তখনকার দিনের জানা জগতের পরিচয় যতই এক ঘেয়ে হয়ে আসছিল, উপাদানের জনপ্রিয়তা ততই কমে আসছিল। যদি অতীতের কোন আদর্শ আর মানুষের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তবে মানুষের আদর্শ সম্পূর্ণ কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু হয়েস-এর সে ক্ষমতা ছিল না। তাঁর বোধশক্তি ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল সীমিত। আক্ষরিক অর্থে, নীতিশিক্ষামূলক রূপক আর সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। এগুলিকে অবলম্বন করে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতাও হয়েসের ছিল না। তাই তাঁর কাব্য প্রচেষ্টার সাহিত্যিক মূল্য ছিল না, এবং তা স্থায়ীত্ব পায়নি।

এমনকি এর পরেও আলেকজাণ্ডার বার্কলে (Alexander Barclay ১৪৭৪-১৫৫২), নতুন যুগের মানুষ হলেও নতুন সাহিত্য কর্মের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন নি। বার্কলের এইটুকুই নতুনত্ব যে তিনি জার্মান উৎস এবং মানুষের নানা ধরনের বোকামি,—এ দুটিকে অবলম্বন করলেন। জনপ্রিয়তা কিছুটা এসেছিল।

বার্কলে আর একটা কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মেষপালকদের জীবন ও পরিবেশ অবলম্বনে একজাতীয় প্রকৃতি সম্পর্কিত ইংরাজী কাব্য খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বার্কলে সেইজাতীয় কবিতার সূত্রপাত করে যান; তবে তা প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতা হয় নি, নীতি আলোচনা হয়েছিল। প্যাস্টোর্যাল কবিতা (Pastoral—মেষপালক সম্পর্কিত) পরে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে বড় কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। কর্মব্যস্ততা ছিল; সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল; কাজও হয়েছিল, কিন্তু নিজস্ব স্থায়ীগুণসম্পন্ন সাহিত্যকর্ম তেমন পাওয়া যায় না। চশারের প্রভাব যতই না কেন মানুষের মনে থাকুক, তারজন্য অন্যরা এগিয়ে আসতে পারেননি, এ সিদ্ধান্ত নিছক আবেগপ্রসূত। আসলে অন্যান্য কারণ ছিল—সামাজিক এবং ঐতিহাসিক। আর তাছাড়া নদীর স্রোতের মত সাহিত্যের স্রোতেও জোয়ার-ভাঁটা থাকতে পারে। এটা স্বাভাবিক। ওয়াইক্লিফ-ল্যাংল্যাণ্ড-চশারের পরে শূন্যস্থান উপযুক্তভাবে পূরণ হযনি। তার জন্য তাঁদেব উজ্জ্বল স্মৃতিই দায়ী এটা ধরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

ঘটনাটা এই যে যাঁরা এই সময়ে সাহিত্যকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রশংসনীয় চেষ্টা ছিল, তবে ক্ষমতা তেমন ছিল না। এই সময়ের কবিরা—যে কোন কারণেই হোক—হয়ত সঠিক পথ অনুসরণ করেন নি। তাঁরা হয ক্লাসিক উৎসের আশ্রয নিযেছিলেন, আর না হলে সদ্য অতীত পূর্বসূরীদের অক্ষম অনুকরণ করেছিলেন।

এই অর্ধ শতাব্দী বা তার কিছু বেশী সময়ের রিক্তপ্রায় অবস্থার কারণ যা-ই হোক,—এতে একটা দরকারী কাজ হযেছিল। চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের সাহিত্যিক নেতৃত্ব উপযুক্তভাবে উপলব্ধ হওয়ার জন্য এবং ষোড়শ শতকের প্রাণবন্ত সাহিত্যের আবির্ভাবের জন্য মাঝখানে যে বিস্তৃত অবসর বা শূন্যতার প্রয়োজন ছিল তা পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে সৃজনশীলতার দুর্বলতার জন্যই পাওয়া গিয়েছিল। তবে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায় ধর্মীয বিষযে পীকক, ফিসার ও ল্যাটিমার; অন্যান্য বিষযে ক্যাক্সটন ও টমাস মূর শক্তি ও মৌলিকতা দেখিয়েছিলেন। নবযুগসৃষ্টির পেছনে ক্যাক্সটনের এবং মূরের অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা শেষ করলাম। স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্য সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলা হবে। কিন্তু যে ধারণাটি আমাদের পরিষ্কারভাবে পাওযা দরকার তা হল সামগ্রিকভাবে গ্রেট বৃটেনের মানুষের সঙ্গে তাদের সাহিত্যের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নির্ধারণ হয় দু'ভাবে। একটা হ'ল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সাহিত্য কর্মকে মানুষ কিভাবে গ্রহণ করেছে। এঁরা বা এগুলি দৈনন্দিন জীবনের বা বিচিত্র কর্মজগতের আবশ্যিক অঙ্গ না-ও হতে পারে। তবুও তাঁদের সমীহ করা বা তাঁদের সম্বন্ধে সম্ভ্রমের বোধ কতটা মানুষের সাধারণ বোধবুদ্ধির সীমানার ভিতরে ধরা পড়েছে সেটা দেখা দরকার। যেমন, আর্থার সম্পর্কিত রোম্যান্সগুলি সম্বন্ধে বা অনেক পুরানো "বীওউলফ" সম্বন্ধে আত্মীয়তাবোধ এবং গর্ববোধ; চশার, ল্যাংল্যাণ্ড, ওয়াইক্লিফের অবদানগুলির সম্পর্কে শ্রদ্ধা,—এগুলি মনে, অন্ততঃ চলনসই ভাবে, কিছু ছাপ ফেলেছে কিনা জানলে সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটা দিক দেখা হয়।

আবার এর কালানুক্রমিক বিচার আছে। সমসাময়িক কালে, বা দু'এক শতাব্দীর মধ্যে মানুষ এগুলির সম্বন্ধে কতটুকু মনে রেখেছে, এটা এক রকমের বিচার। আর একটি বিচার,—সাহিত্যের কালজয়িতা। জনপ্রিয়তা থাক বা না থাক,—কোন এক প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব বা বিরোধিতা কতটা রয়েছে, এবং কতটা মানুষ ভুলে গেছে। আমি সাহিত্যিক মহলের বিচারের কথা তুলছি না। পণ্ডিত-গবেষক অনেক প্রাচীন এবং সাধারণভাবে বিস্মৃত জিনিষকে টেনে তোলেন। ওটা অন্য এক জিনিষ। কালিদাস আজও ভারতের সাধারণ মানুষের ভিতর বেঁচে আছেন। রামায়ণ-মহাভারত জগতের শত পবিবর্তনেও পাহাড়ের মত অবিচল আছে ; এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে পরম সত্যের মত। এ বিচার একমাত্র শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষ—জনসাধারণ—এদের ভিতর বেঁচে থাকাব থেকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কিছুই হতে পারে না। তা সে মানুষ—-অজ্ঞ, মূর্খ, নিরক্ষর যা-ই হোক না কেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ইংরাজী সাহিত্যের এই ধরনের বিচারের দরকার আছে। জীবিতকালে চশারের পরিচিতি অল্পসংখ্যক ইংরাজের বা স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্যিক সমাজের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্কচরা যে উৎসাহের সঙ্গে চশারের চর্চা করেছেন, ইংরাজরা তা করতে পারেন নি। আবার ল্যাংল্যাণ্ডের ঝাঁঝালো সমালোচনা, ওয়াইক্লিফের গঠনমূলক কাজ ইংরাজ সমাজের ভিতর এমন ভাবে মিশে গেছে যে তা আজ আলাদা করে চেনা যায় না। ইংরাজী সাহিত্য জগতে আলফ্রেড বা বীড বা অন্যান্যরা—যাঁরা ইংরাজীকে রক্ষা করেছিলেন অথচ প্রাচীন ইউরোপের ক্লাসিক জগতের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়েছিলেন ; পরবর্তীকালে কারুকার্যময় ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের মেলবন্ধন যাঁরা ঘটিয়েছিলেন,—তাঁদের আলাদা পরিচযের দরকার নেই। তাঁরা ইংরাজী সাহিত্যের প্রাণের সঙ্গে, চেতনার সঙ্গে মিশে রয়েছেন।

সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আর এক দিকে। ব্যবহারিক জগতে ক্রমাগত আচার-বিচার-ব্যবহারের দিক থেকে সাহিত্যের কোন কোন নিদর্শন বরাবর একটা জাতিকে, একটা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িযে রেখেছে,—সেটা দেখাও এক বিশেষ সম্পর্কের স্বীকৃতি। জনপ্রিয় গানগুলিতে, নানা উদ্ধৃতিতে, উৎসবে-ব্যসনে, আনন্দে-দুঃখে রবীন্দ্রনাথ সেইভাবে বাঙ্গালীসমাজে মিশে আছেন। ওপার বাংলা, এপার বাংলা এক করে দিয়ে। সাহিত্যের উন্নততম গৌরবের এই হচ্ছে চূড়ান্ত নিদর্শন।

আজ থেকে পাঁচশ-সাতশ বছর আগেকার মানুষের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-উৎসবের কতটুকু আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এবং তা কোন কোন আন্দোলন, কোন কোন চিন্তা, কোন কোন উত্তরাধিকার মারফৎ,—তা সাহিত্যবিচারের বোধ হয় শেষ কথা। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' যে অর্থে আজও সমস্ত বাঙালীর মনকে ছেয়ে আছে, তেমনটা কেন ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে হয়নি,—সেটাও উপলব্ধি করার বিষয়। অন্যদিকে ব্যালাডগুলি, গ্রাম্যসংস্কার ও কাহিনীগুলির কিছু কিছু কি শক্তি নিয়ে এখনো রয়েছে তা-ও বুঝতে হবে। তেল-নুন-লকড়ি-র বাইরে একটা উপলব্ধি বিস্তারের জগৎ কি ইংরাজের মনের মধ্যে নেই ? ইংরাজের ভাষা জগদব্যাপী হয়ে গেছে। ইংরাজী সাহিত্যের

জ্ঞান এখন উচ্চকোটির মানুষের ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু বোধশক্তি সম্পন্ন ইংরাজ কি বলছে? গায়ের জোরে বা বাণিজ্যের কৌশলে ভাষা বিস্তার হয়; কিন্তু চিন্তার বিস্তারের রাস্তা আলাদা। রেণেসাঁসের যুগসন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে ইংরাজী সাহিত্যের সেই অন্তর্লীন প্রভাব আছে কি না সে বিচার কে করবে?

উপসংহার

স্কটল্যাণ্ড

দশম শতাব্দীর সুরু থেকে উত্তর বৃটেনের একাংশের স্কট অধিবাসীরা পিক্টল্যাণ্ড বা সমগ্র উত্তর বৃটেনের অধিকার পেয়ে গেল। ওই সময় থেকে পিক্টল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড নামে পরিচিত হল। পিক্টরা এবং স্কটরা একজাতিতে মিশে যেতে তিনশ বছর লেগেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে স্কটরা ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় সাহায্য পেত। কিন্তু তারা তাদের জাত্যাভিমান কখনও ক্ষুণ্ন হতে দেয়নি।

স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন সাহিত্য গেলিক (Gaelic) ভাষায় এবং নিম্নভূমির আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য প্রধানতঃ দেশীয় 'গেলিক' ভাষায়। নবম শতাব্দীতে ল্যাটিনে লিখিত 'বুক অব ডিয়ার' (Book of Deer) নামক খৃষ্টের উপদেশ-সম্বলিত গ্রন্থের পাতার অলিখিত প্রান্তিক অংশে (Margin) দ্বাদশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডের গেলিক ভাষায় কিছু কিছু লেখাই অদ্যাবধি রক্ষিত এই ভাষার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন।

প্রাচীনতম গেলিক সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি যা পাওয়া গেছে সেটি একটি কবিতা সঙ্কলন। ১৫১২ থেকে ১৫২৬ সালের মধ্যে সংগৃহীত। বইটির নাম 'লিসমোরের ডীনের (এক বিশেষ উচ্চপদাধিকারী যাজক) গ্রন্থ' (The Book of the Dean of Lismore)। সংগ্রহকারী দুই ভাই,—জেমস এবং ডানকান ম্যাকগ্রেগর (James and Dancan MacGregor)। স্যার জেমস ম্যাকগ্রেগর ছিলেন লিসমোরের ডীন। এই বই-এর কবিতাগুলি তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়। —স্কচ কবিদের কবিতা, আইরিশ কবিদের কবিতা, এবং পৌরানিক কবি ও যোদ্ধা 'ওসিয়ান' (Ossian) সম্পর্কিত কয়েকটি ব্যালাড।

১৩১০ থেকে ১৫২০ সালের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের গেলিক কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। গ্রেগর গোষ্ঠির (Gregor clan) নেতা জন-এর বেতনভোগী কবি ফিয়নলা রুয়াধ-এর (Fionnlagh Ruadh) কবিতা তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যায় পাওয়া গেছে।

প্রাচীন বংশানুক্রমিক কবি পরিবার ম্যাকমুইরিক (Macmhuirich) পরিবারের 'গিওলা কোলুইম ম্যাক আন ওলাইম' (Giolla coluim mac an Ollaimh)-এর লেখা তিনটি কবিতাও পাওয়া গেছে।

অন্যান্য কবিদের মধ্যে 'গিওলা ক্রিয়ষ্ট ব্রুইলিজিয়াক' (Giolla Criost Bruilingeach) এবং দুজন মহিলা কবি 'এথভ্রিয়াক ইংঘিয়ান কয়েরকিয়াডেল' (Aithbhreac Inghean Coirceadail) এবং আর্গিলের কাউন্টপত্নী 'ইসাবেলা' (Isabella, countess of Argyll) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সব কবিরা যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বার্নস-এর (Robert Burns—১৭৫৯-৯৬১) পূর্বসূরী।

নিম্নভূমির স্কচসাহিত্যের বা 'লাল্লান' (Lallans) এর অদ্যাবধি রক্ষিত কবিতার প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি জন বারবার।

জন বারবার (John Barbour) ১৩১৬-১৩৯৫—যেন চতুর্দশ শতাব্দীর স্কটল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি। সম্ভবতঃ ১৩৭৬ সালে লেখা বারবারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল 'ব্রুস' (Bruce)। বারবার অক্সফোর্ড ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তের হাজার লাইনের এই বিশাল কবিতাটির উপাদান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকের স্কটল্যাণ্ডের দেশপ্রেমের ইতিহাস। এই জাতীয় উপাদান অবলম্বন ফরাসী প্রভাবের ফল। জন্মগতভাবে নর্মান হলেও স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গে প্রথম রবার্ট ব্রুসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর নামাঙ্কিত কাব্য 'ব্রুস' স্কটল্যাণ্ডের মহত্তম জাতীয় কাব্য।

চশারের পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকজন স্কচ কবি বেশ নাম করেছিলেন। এঁদের অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো বা সেন্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকেই স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্যের একটা বড় রকমের উত্থান ঘটেছিল। তার আগে স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্য সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য স্তরে ছিল না। তবে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক পশ্চাদপদ পরিবেশেও কিছু কিছু গান তৈরী হয়েছিল ; এগুলি প্রায়ই ব্যালাড জাতীয়। কারণ কি তা মোটামুটি অনুমান করা যায়। কয়েক শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডে যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক-সামাজিক সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তার প্রায় কিছুই স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে ছিল না। দেশীয় এবং সংলগ্ন অঞ্চলের প্রাচীন পিক্ট, স্কট এবং বৃটন,—কেল্টদের এই তিনটি শাখার সমবায়ে স্কচজাতির উদ্ভব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্কচরা ছিল একটি অবিমিশ্র জাতি। ভাষার ক্ষেত্রেও ওই একই কথা খাটে। এংলোস্যাক্সনদের সঙ্গে পিক্ট এবং স্কটদের একটানা শত্রুতার সম্পর্কের দরুণ পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুযোগ ঘটেনি। তাছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে পার্বত্য-আঞ্চলিকতা, প্রচণ্ড শীত, দারিদ্র্য, কষ্টকর জীবনযাত্রা, স্বেচ্ছায় আত্মকেন্দ্রিক থাকার বোধ,—সেই রোমক আমল থেকে স্কটল্যাণ্ডে কোন বড় সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ নিয়ে আসেনি। কয়েকজন সাধুসন্তের প্রচার-উপদেশই জীবনের একমাত্র মেদুর পরিচয় ছিল। এইসব কারণে বড় বা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে স্কটল্যাণ্ডে তেমন তৈরী হয়নি। ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শ, বিশেষ করে চশারের গুণগত আদর্শের প্রভাব স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্যের সঠিক ও উল্লেখযোগ্য সূচনা।

পঞ্চদশ শতকের আগে বড় এবং একটানা সাহিত্য তেমন সৃষ্টি না হলেও স্কটল্যাণ্ডের নিজস্ব বৈশিষ্টপূর্ণ ভাষা ছিল।

স্কটল্যাণ্ডে চশারের অনুসরণকারীগণ

স্কটল্যাণ্ডে চশারের কয়েকজন অনুসবণকারী আলাদা আলাদা করে গুণগতভাবে কমবেশী সমৃদ্ধ সাহিত্য তৈরী করেছিলেন। চশারের অনুগামী হিসাবে ইংরাজদের থেকে স্কচ কবিদের সৌষ্ঠব বেশী ছিল। কিন্তু, আর এক দিকে, স্কটবা নিজেদের পুরানো ঐতিহ্যের তেমন আন্তরিক অনুসরণ করেন নি। এতে পুরানো সাহিত্য, এমনকি অকিঞ্চিৎকব হলেও, এবং নতুন সাহিত্যের মধ্যে যে ব্যবধান তৈরী হযেছিল, তা পরে কখনো কখনো ব্যক্তিগতবোধের একাত্মতা দিয়ে আংশিকভাবে পূরণ হলেও, ধারাবাহিকতা বজায রাখা যায়নি।

চতুর্দশ শতকের অনুপ্রাসের এবং ইতিহাসমূলক কবিতার ঐতিহ্য, মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকলেও, দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। অন্ধ গীতিকার হেনরী বা হ্যারির দেশাত্মবোধক "ওযালেস" (Wallace by Harry) (১৪৬১) বা উইনটন-এর (Wynton) ইতিহাস-এ তা লক্ষ্য করা যায়। "ওযালেস" ছিল স্যার উইলিয়ম ওয়ালেসকে কেন্দ্র করে বীরত্বব্যঞ্জক রোম্যান্স। এমনকি, পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকেব প্রথম দিকের স্কচ কবিদের ভিতরেও মধ্যযুগীয রোম্যান্সের উপাদান থেকে যায়। মনে হয স্কচ কবিরা মধ্যযুগীয প্রভাব এবং স্থানীয় প্রকৃতির প্রভাব কোনদিনই পুরাপুরি বর্জন করতে চাননি।

আমরা এখন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর কযেকজন স্কচ কবির কথা বলব।—

এঁদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্কটল্যাণ্ডের রাজা **প্রথম জেমস (১৩৯৪-১৪৩৭)**। ইংল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ হেনরীর আমলে তিনি বন্দী হন, এবং তাঁকে ইংল্যাণ্ডে রেখে দেওয়া হয়। রাজা ষষ্ঠ হেনরীর আমলে ১৪২৪ সালে তিনি চতুর্থ হেনরীর ভাইঝি জোযান বীফোর্টকে বিয়ে করেন, এবং ইংল্যাণ্ডে বন্দী দশা থেকে ছাড়া পান। তাঁব বিখ্যাত কাব্যটি সম্ভবতঃ ১৪১৩ সালে লেখা হয়। এইভাবে তাঁর ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটি স্কচ তথা ইংরাজী সাহিত্যে একটি সুন্দর কাব্য উপহার দিয়েছে। 'রাজার লেখা বই'—এই কাব্যটির নাম। —'কিংস কোয়্যার' (King's Quair)। এটি একটি স্বপ্নবিষয়ক কাব্য। রূপক কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এতে ১৯৭টি স্তবক আছে, এবং প্রতিটি স্তবকে ৭টি করে লাইন। এটি চশারের 'ট্রয়লাস', কাব্যের ছন্দে লেখা। এই ছন্দে রাজা জেমস কাব্য লেখায় এই ছন্দটির তখন থেকে নাম হয়েছে 'রাজকীয় ছন্দ' বা রাইম রয়্যাল (Rime Royal)। এটি পাঁচ মাত্রার আইএ্যামবিক ছন্দে লেখা। ছন্দের পরিকল্পনা ababbcc। চশারের 'কমপ্লেট আনটু পিটি' (Compleynt unto Pite) কাব্যে এই ছন্দ প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। 'কিংস কোয়্যার' পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য।

এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডে সাহিত্যের অন্য কোন উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।

তারপর আসছেন হেনরিসন (রবার্ট হেনরিসন—Robert Henryson—১৪২৯-১৫০৮)। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ক্রেপিডের শেষ ইচ্ছা (টেষ্টামেন্ট অব ক্রেশিড)। চশারের 'ট্রয়লাস এবং ক্রিশিড'-এর সঙ্গে সংযোজনা

হিসাবে যেন লেখা হয়েছে। এটিও 'রাইম রয়্যাল' ছন্দে লেখা হয়েছে। এবং এর বর্ণনার কারুণ্য বিশিষ্ট দক্ষতা ছাড়া অসম্ভব। স্কটল্যাণ্ডের মৌখিক ভাষার অনেক মিশেল এই কাব্যে আছে। এটি 'দামোদর গ্রন্থাবলী'-র মত অনুকরণ মাত্র নয়। তাছাড়া, চশারের কাব্যের কিছু রদবদল ও সংযোজনা কবির আত্মবিশ্বাস সূচিত করে। ইনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

তারপর আছেন ডানবার (উইলিয়ম ডানবার— William Dunbar— ১৪৬০-১৫৩০)। এঁকে চশারের স্কচ অনুগামীদের ভিতর শ্রেষ্ঠতম বলা হয়। ইনি চশারকে অনুকরণ করেন নি। এঁর কাব্যে আমরা যেন আবার দেখতে পাই রঙে ও আড়ম্বরে মধ্যযুগীয় অস্ত্রচালনার উৎসবের প্রদর্শনী। এঁর ছোট ছোট কবিতায় সঙ্গীতের সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য লক্ষ্য করা যায়। 'সোনালি ঢাল' (Goldyn Targe) এবং 'কবিদের জন্য শোক' (Lament for the Makaris).—এঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্য। শব্দের ঝঙ্কার ও চিত্রময়তা এঁর কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

এরপর ডগলাস-এর নাম করতে হয়। গোভিন ডগলাস Gawin Douglas—(১৪৭৪-১৫২২)। ইনি ইটালির প্রাচীন কবি ভার্জিল-এর মহাকাব্য 'ইনিড' (Aeneid)-এর ইংরাজী অনুবাদ করেন। ডগলাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেন্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন, এবং নির্যাতিত হয়েছিলেন। ডগলাস চশারের 'হিউমার' এবং ল্যাংল্যাণ্ডের 'স্যাটায়ার' উভয় বিষয়েই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ফলস্বরূপ তাঁর কাব্যের ভাষা শক্ত। তিনি প্রকৃতির যথার্থ পর্যবেক্ষক ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের হলেও লিণ্ডসে (Sir David Lyndsay—১৪৯০-১৫৫৫) সম্বন্ধেও দু'এক কথা না বললে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের স্কচ কবিদের সম্পর্কে কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লিণ্ডসে-র কবিতায় স্কটল্যাণ্ডের রূক্ষতার ছাপ পড়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'রাজকীয়তা' (Monarchy)। এতে প্রাচীনকাল থেকে সুরু করে নানা সাম্রাজ্যের উদ্ভবের বিবরণ আছে। রূঢ়তা সত্ত্বেও ভাঁড়ামোর ছদ্মবেশ তাঁকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। আক্রমণাত্মক রচনাই তাঁর কাব্যের প্রধান অবলম্বন।

মোটের ওপর, অন্ততঃ এটা দেখা যায় যে এই সব স্কচ কবিরা চশারের অন্ধ অনুকরণকারী ছিলেন না। চশারের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করবার শক্তি তাঁদের ছিল, এবং তাঁরা তার সমাদর করেছিলেন বুদ্ধি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, যা তদানীন্তন ইংরাজ কবিরা পারেন নি। এঁদের স্বাতন্ত্র্য ছিল। হেনরিসন ক্রিশিডার অন্তিম পরিণতি অন্যভাবে দেখিয়েছিলেন; ডগলাস চশারের 'ইনিড'-এর (Aeneid) অনুবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন; এবং এইভাবে স্কচ কবিদের নিজস্ব বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছিল।

স্কচ সাহিত্যে প্রথম দেশজ সাহিত্যিক গদ্য লিখেছিলেন জন আয়ারল্যাণ্ড। ১৪৮০ সালের কাছাকাছি। এই গদ্যখণ্ডগুলি ছিল ধর্মীয় বিষয়ের উপর। ব্যবহৃত শব্দগুলি শব্দান্তরের পক্ষে অনুপযোগী এবং সংখ্যায় সীমিত। পরবর্তী শতাব্দীতে গদ্য অধিকতর সহজ হয়েছিল এবং ল্যাটিনের চাপও কমে এসেছিল।

এরপর আমাদের চলে যেতে হবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। 'আড়াইশ' বছর বাদে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় স্কচ কাব্য মোটামুটিভাবে ইংরাজী সাহিত্যের মূলস্রোতেরই অংশ। মধ্যবর্তী সময়ে, ইংরাজী সাহিত্যে একটানা ছিল ; স্কচ সাহিত্যে তা হয়নি। কারণ স্পষ্ট। —দক্ষিণ বৃটেনের অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের আধুনিক যুগে পদক্ষেপ, গুরুতর সামাজিক রদবদল, বৈজ্ঞানিক বোধ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দ্রুত কার্যকরী ছিল। জগতের নুতন ধারনা চেভিয়টের (Cheviot) সীমানা পেরিয়ে উত্তরে ছড়িযে পড়তে সময় লেগেছিল।

পরিশিষ্ট

চতুর্দশ শতকের কাল মহামাবী এবং তারপরে কৃষক বিদ্রোহ ইংরাজের ভাষাকে গণতন্ত্রমুখী করেছিল। সাহিত্যিকরা কি সেই রাস্তা ধরে চলেছিলেন ; না প্রাচীন গ্রীসের এবং প্রাচীন রোমের চিন্তাজগতের বিস্ময়কর উন্নতির স্মৃতিতে তাঁরা উদ্ভাসিত এবং উল্লসিত হয়েছিলেন ; না কি তাঁরা ইংরাজ চাষী, ইংরাজ শ্রমিক, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক, ইংরাজ দার্শনিক — সবাইকে মুগ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন ? —-এ অবশ্য পববর্তী শতকের কথা। আমরা এখন পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ভাষার উন্নতির একটু খতিযান এখানে নিযে নিই।

কাল মহামাবী ইংরাজী ভাষার পক্ষে একদিকে শাপে বর হয়েছিল। অনেক সংঘারামে ল্যাটিন-জানা যাজকশ্রেণীব অভাব হয়ে পডল। অনেক সাধাবণ মানুষ প্রাণের দাযে সংঘারামগুলিতে আশ্রয নির্যেছিল। তাবা মৃত যাজকদের স্থলাভিষিক্ত হল। তারা ইংরাজী ছাডা অন্য কিছু জানত না ; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল ইংরাজীও জানত না। শহবগুলিতে ব্যবসায়ী সংঘের সভ্যরা পরস্পরের দেখাশোনা করার জন্য অনেকে বেঁচে গিযেছিল। এদের হাতে দু' পয়সা জমেও ছিল। এরা হল মধ্যবিত্তশ্রেণী। গ্রাম্য জমিদাবদের থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করার সুযোগ সুবিধা এদের বেশী ছিল। এদের ক্লাসিক ভাষা, এমনকি ফরাসী ভাষা ব্যবহার করবারও তত প্রয়োজন ছিল না। ১৩৬০ সালের ব্রেটিগনির (Bretigny) সন্ধিতে ফরাসীদেশের অনেকটাই বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল। পরপর নানা যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই জয়পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষার উপর নির্ভরশীল ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ ফরাসীদেশের পশ্চিমাংশ এবং অন্যান্য নানা কেন্দ্র থেকে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিল। এইভাবে দেশে এবং বিদেশে ইংরাজী ভাষার প্রচলন প্রয়োজনের তাগিদে বেড়ে গিয়েছিল। ইংরাজ লেখকদেরও যে পাঠকদের দরবারে হাজির হতে হয়েছিল তারা ইংরাজী ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না। তাই লেখকরাও বাধ্য হযে ইংরাজীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও কথা পাওয়া গেছে যে অনেক বনেদী পরিবারের লোকেরাও ভাল ফরাসী জানতেন না। কাজে কাজেই ইংরাজীর অবস্থা হ'ল পোয়াবার। জন অব গণ্ট বা ডিউক অব ক্লারেন্স-এর পরিমণ্ডলে, বা এমনকি দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজসভাতেও ইংরাজীর প্রাধান্য সুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৩৫৬ সাল থেকে লণ্ডন এবং মিডলসেক্সের শেরিফদের আদালতগুলিতে ইংরাজী ব্যবহার বিপিবদ্ধ করা হল। ১৩৬২ সাল থেকে পার্লামেন্টের আইনে সারা দেশে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হল। ১৩৪৯ সাল থেকে বিদ্যালয়ে

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে এবং শিক্ষার আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ইংরাজীর প্রচলন সুরু হয়ে গেল ; এবং ১৩৮৫ সাল থেকে এ ব্যবস্থা স্থায়ী মর্যাদা পেল। ১৪০০ সালে রাজার কাছে লেখা আবেদনপত্রও ইংরাজীতে লেখা হল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাশেষি ক্যাক্সটনের লেখা থেকে জানা যায় যে ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক ল্যাটিন বা ফরাসী জানেন না।

এই তো গেল জাতির কর্মজগতের সর্বত্র জাতীয় ভাষার প্রসারণের ছবি। আবার আর একদিকে দেখি স্থাবর প্রকৃতির পুরানো নিয়মকানুন, ব্যাকরণের জটিলতা ইত্যাদি থেকে ভাষার মুক্তি। সাবলীলতা, চলমানতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সকলের ব্যবহারের উপযোগী করে ভাষাকে সক্রিয় করার এক অবিরাম প্রবণতা। ইংরাজী ভাষার গণতন্ত্রমুখী চরিত্র, গ্রহণপটুতা, সামঞ্জস্য বিধান, সঙ্কীর্ণতামুক্ত বিশ্বজনীন চরিত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতেই ফুটে উঠতে সুরু করেছিল। এই শতাব্দীতেই ইংরাজী ভাষায় আধুনিকতার বেদীনির্মাণ হয়েছিল। এরই উপর প্রকাণ্ড এই বিশ্বভাষার সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল এই শতাব্দীতেই। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষার বিবর্তন ভাষার তথা সাহিত্যের ইতিহাসে সুনিশ্চিত এবং আশাবাদী পদক্ষেপ।

এখানে মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যাকরণের ক্রমাগত সরলীকরণের প্রবণতার দুটি একটি উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এ পর্যন্ত বহুবচন বোঝানোর জন্য বিশেষ্যের শেষে আগে ('-en') এবং ('-s') দুইই ব্যবহার করা হচ্ছিল। ধীরে ধীরে কেবলমাত্র ('-s) এর ব্যবহার বাডতে লাগল। চতুর্দশ শতাব্দীতে সব জায়গায় এই পরিবর্তন স্থায়ী হল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শব্দের শেষে ('e) [ই]র উচ্চারণ বন্ধ হয়ে গেল। এর কিছু পরে ক্রিয়ার প্রথম পুরুষ একবচনে ('th')-এর বদলে ('s') এর ব্যবহার চালু হয়ে গেল। আবার, প্রথম পুরুষে বিশেষ্যের ক্ষেত্রে বহুবচনে ('s') এবং ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একবচনে ('s') এর বহুল ব্যবহারের দ্বারা বর্তমানকালে অধিকাংশ বাক্যে ('s') এমনভাবে থেকে গেল যে বাক্যে কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে তা ('s') এর অবস্থানের দ্বারাই বোঝা সম্ভব হল।

বিভক্তি এবং প্রত্যয়যুক্ত করে শব্দকে নানা ধরনের আকার দেওয়ার যুগ পঞ্চদশ শতাব্দীতে শেষ হয়ে গেল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্রিয়ার শেষে ('-ing') প্রত্যয় যোগ করবার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। প্রথমে বিশেষ্য, তারপরে 'দুর্বল' (Weak) ক্রিয়ায়, এবং সবশেষে সাহায্যকারী ক্রিয়া ব্যতীত সব ক্রিয়াতেই প্রয়োজনমত ('-ing') ব্যবহার করা হতে থাকল।

'না' বলতে 'No' (=ne) খুব প্রাচীন। পরে আসে 'noht' (=not)। মধ্যযুগের প্রথমদিকে একই সঙ্গে 'no' (=ne) এবং 'not' ব্যবহার হয়েছে। যেমন, 'I ne saye not (= I no say not)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে একই কথা দুবার ব্যবহারের রীতি শেষ হয়ে গেল। ওই শতাব্দীতে 'আমি জানিনা'র ইংরাজী হ'ল 'I say not'। ষোড়শ শতাব্দীতেও ওই অবস্থান বজায় ছিল।

ধাতুমূলের রূপান্তরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্রিয়ায় স্বর পরিবর্তনের রূপ ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেগুলির অতীত কালের রূপ এবং কালবোধক কৃদন্ত রূপের জন্য নানা নিয়ম চলছিল। মধ্যযুগের শেষ পর্বে ধাতুর শব্দাংশযুক্ত রূপান্তর ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এতে বিশৃঙ্খলার বদলে একটা সঠিক নিয়ম ধরে কাজ হতে থাকল।

ভাষার এইসব এবং অন্যান্য পরিবর্তন যথাযথ অনুসরণ করে গেলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে যে ইংরাজী ভাষা ছিল যেন প্রাচীন ইংরাজীরই প্রসারিত অংশ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে সেই একই ভাষায় আধুনিকতার লক্ষণ প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে।

ওই সময় পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কাউণ্টিতে (জেলা) ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত ছিল। ক্রমে সেগুলি চারটি বড আঞ্চলিক ভাষায় একত্রিত হ'ল। এগুলি ছিল,—উত্তর, মধ্যপূর্ব, মধ্যপশ্চিম ও দক্ষিণা ভাষা। দক্ষিণ-পূর্বে কেণ্ট প্রদেশেও নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা চলছিল। বাজধানী লণ্ডন মধ্যপূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এই মধ্যপূর্ব অঞ্চল লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে থাকল।

ক্রমে ক্রমে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, লণ্ডনের আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত ইংরাজী ভাষা হিসাবে, অন্ততঃ লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে, গৃহীত হল। আগে যেমন লিখিত ভাষার আঞ্চলিক ধাঁচ থেকে বোঝা যেত লেখক কোন অঞ্চলের লোক, এখন থেকে আর তা' বোঝবার তেমন উপায় রইল না। ক্যাক্সটনের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা বইগুলিও 'লণ্ডনের' ইংরাজী সারাদেশে প্রচার করতে লাগল। তবে আবার একথাও ঠিক নয় যে ভাষার আঞ্চলিকতা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। কিছু কিছু ধরন, এমন কি কিছু কিছু শব্দও বিভিন্ন লিখিত বস্তুব বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিকতা আজও ধরিয়ে দেয়।

এইভাবে পঞ্চদশ শতকের শেষে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। এই আধুনিকতার নানা দিক এবং সেগুলির বস্তুভিত্তিক ও লক্ষণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও চরিত্র বিচার পরবর্তী খণ্ডে যথা সম্ভব করা হবে। তবে পঞ্চদশ শতকের শেষাশেষি ইংরাজী সাহিত্যের প্রায়-পরিণত অবস্থা প্রসঙ্গে দুটি একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানেই করতে হয়।

এই সময়ে রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে ধর্মীয় জীবনে একটা সুসংহত, সুপ্রতিষ্ঠ অবস্থা এসে গিয়েছিল। সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে এটি একটি আদর্শ অবস্থা। কিন্তু আশানুরূপ উন্নত পর্যায়ের সৃষ্টি হয়নি। এ ব্যাপারে চশারের স্মৃতি দায়ী কি না তা' নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আলোচনা হযেছে। তবে বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। সাহিত্য অতি উচ্চমানের অবস্থায় না থাকার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু কিছু লেখকের যে আবির্ভাব হয়েছিল তা আমরা আগেই বলেছি।

চশার মানুষকে নানা বৃত্তিতে এবং নানা পরিবেশে কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলেন। সে দৃষ্টিতে স্বচ্ছতা ছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা ছিল না। কবিতা লেখার এবং কবিতায় গল্প বলার নানা কৌশল অনেকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাদের উদ্দেশ্যে সেগুলি বলা বা লেখা সে সম্বন্ধে নুতন

কোন আদর্শ সামনে ছিল না। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের ভিতরে অপার বিস্ময়কে উপলব্ধি করার যুগ সেটা নয়। আবার ফেলে-আসা মধ্যযুগীয় ধরনে সাহিত্য রচনা সাহিত্যিকের পক্ষে পীড়াদায়ক হ'ত, শ্রোতা বা পাঠকের কাছেও গ্রহণযোগ্য হ'ত না। অসম্ভব উচ্চাকাঙ্খার যুগের দরজায় দাঁড়িয়ে স্থির নিশ্চিন্ত উপকরণ নিয়ে আর বড় সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। পরবর্তী র‍্যানেইসঁসের যুগ এই অবসাদের প্রকৃতিতে দ্রুত গতিসঞ্চার করল। তাই নতুন শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই সন্দেহ আর আক্ষেপের আর কিছু থাকল না।

গ্রন্থের বর্তমান পর্বের জন্য যে সমস্ত বই-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ—

A. C. Baugh (Ed.) : The Literacy History of England

Legouis & Cazamian : History of England Literature

W. P. Ker : English Literature, Mediaeval

W. J. Courthope : A History of English Poetry

Boris Ford : A Guide to Englisn Literature

R. K. Root : The Poetry of Chaucer

A. C. Baugh : A History of English Language

Frank N. Magill · Masterpieces of World Literature

Paul Harvey : The Oxford Companion to English Literature

: Encyclopedia Britanicca

: Cambridge History of English Literature

আধুনিক যুগ

প্রথম পর্ব

(ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ)

আধুনিক যুগ

[১৫০১—১৫৭৫]

(র‍্যানেইসঁস-এর পূর্বাহ্ণ)

ভূমিকা

১৪৩৮ সাল। তুর্কী আক্রমণের হাত থেকে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী বিজানটিয়ামকে আর বাঁচানো যাবে না। বিজানটাইন-সম্রাট ইটালীতে একদল গ্রীক যাজককে পাঠালেন। সত্বর সাহায্যের দরকার। ফ্লোরেন্সের শাসকের নেতৃত্বে স্থির হ'ল যে মূল রোমক চার্চ এবং গ্রীক চার্চের একজোট হওয়া দরকার। তাতে ক'রে প্রাচীন বস্তু-ভিত্তিক স্মৃতিচিহ্নগুলি যদি বাঁচান না-ও যায়, অন্ততঃ ধর্মীয় এবং তার চেয়েও প্রাচীন, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে হয়ত বাঁচান যাবে। এই লক্ষ্য অনুসরণ করে কিছু কাজও হ'ল। এর ফলে প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্বসমন্বিত গ্রন্থাদি এবং কিছু কিছু শিল্পনিদর্শন ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেল। এই সময়ে, বিস্মৃতি ও অবলুপ্তির হাত থেকে গ্রীসের সাহিত্য সম্পদের অবশিষ্ট যা রক্ষা পেয়েছিল তাকে জানার আগ্রহ ইটালীর পণ্ডিত সমাজে দেখা দিয়েছিল। ফ্লোরেন্সের শাসক কসিমো (Cosimo) এবং দার্শনিক ফিসিনো-র (Ficino) ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সেই অনুসন্ধিৎসার একটা প্রকৃত শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। কসিমো জগতের নানা ধর্মকে উদার ও অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। কসিমো ও ফিসিনোর মধ্যস্থতায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রাচীন পৃথিবীর তত্ত্বগত ও বস্তুগত অবশেষ পশ্চিম ইউরোপে বিকিরণের বাস্তব কর্মকাণ্ড সক্রিয় ছিল।

প্রসঙ্গতঃ, প্লেটো তত্ত্বগত শিক্ষা ও শিল্পগত অভিব্যক্তি,—এই দুই-এর পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

নবজ্ঞান সঞ্চারের এই প্রাথমিক অধ্যায়ের সমসাময়িক কালে ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ইটালীর বিভিন্ন অংশে বিস্তারলাভ করল। ফ্রান্সের পণ্ডিতরা এই সুযোগে ইটালীর নিজস্ব সাহিত্য-সম্পদ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিপত্রাদির অনেকগুলিই অধিকার করে বসলেন। অবশ্য জ্ঞানার্জন অপেক্ষা আভিজাত্যের পরিচায়ক হিসাবেই অধিকৃত বস্তুগুলির মূল্যায়ন হয়েছিল।

তবে খৃষ্টান জগতে গ্রীসের মুক্ত মানসিকতা আনবার জন্য ধর্মসংস্কার অথবা জ্ঞানের বিস্তৃতির দ্বারা অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচনের চেষ্টা,—কোনটাই তত কাজে লাগেনি। বস্তুজগতের সীমাবদ্ধ ধারণার কূপমণ্ডুকতা যতদিন না ঘুচেছিল ততদিন গ্রীসের ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের পুনঃপ্রচার স্বাভাবিক গতি পায়নি।

অন্য আর একদিকে, মধ্য ও মধ্য-উত্তর ইউরোপে, ফ্লোরেন্স থেকে পাওয়া দার্শনিক শিক্ষা হিব্রু এবং গ্রীক বাইবেল সম্বন্ধে প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসা ঘটিয়েছিল, এবং সত্যকে সরাসরি জানার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার গৌরব এবং দায়িত্ব পোপের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার কথা আসেনি। প্রাচীন জ্ঞানের নতুন প্রচার গতানুগতিকতাকে সরিয়ে দিতে চায়নি। তবু পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছিল। পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান কারণ কার্ডিন্যাল ও বিশপদের নীতিভ্রষ্টতা এবং ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগান। চেতনার পুনর্জাগরণ নয়,—পোপ এবং তাঁর পারিষদদের অনাচারই এই সময়ের ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ।

এইভাবে, নতুন জ্ঞান, গ্রীসের প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্য এবং শিল্পকলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, ধর্মসংস্কারের আগ্রহ ও ধর্মজ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণের আন্দোলন মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপকে পঞ্চদশ শতকের প্রায় সবটা জুড়েই আলোড়িত করেছিল।

চিন্তা ও কর্মজগতের এই আলোড়ন সরাসরি ইংল্যাণ্ডের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। ইংল্যাণ্ডে র‍্যানেইসঁস (Renaissance)-এর নব্যজ্ঞান ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেও কেবলমাত্র পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে তত্ত্বগত বিদ্রোহের তাড়না বাইরে থেকে আসেনি। ইংল্যাণ্ড তার নিজস্ব ধরনে, এবং নিজস্ব সমস্যার সমাধানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নতুন ধারণা বাইরে থেকে নিয়েছিল। তার বেশী নয়। এখানে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কার এবং নব্যজ্ঞান যখন জাতীয় প্রয়োজনে জনপ্রিয় হয়েছিল তখনই ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন গ্রহণ করেছিল। তাই ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ধারা ছিল অবিচ্ছিন্ন ও উদার। ধীরে ধীরে জগতের বিশালত্বের ধারণার সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞান এবং জ্ঞানলব্ধ বিষয়গুলি—বিশেষ করে তার ব্যবহারিক, দিক—ইংল্যাণ্ডের প্রবহমান জনপ্রিয় ধারায় দ্রবীভূত হয়ে গেল। র‍্যানেইসঁসকে ইংল্যাণ্ডের জাতিগত মর্যাদাবোধের সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের জাতীয় গর্বকে কোনভাবে ক্ষুণ্ন না করে। তাই ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের ব্যাপক সাহিত্যিক মান বহিরাগত শক্তির—ইউরোপের পূর্ব থেকে পশ্চিম—কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি। ইংরাজী সাহিত্য আত্মিক দিক থেকে এবং পরিবেষণায় পুরাপুরি ইংরাজী সাহিত্যই ছিল।

যুগসন্ধি

নৈতিকতা, ধর্মবোধের দেশীয় ঐতিহ্য, সৌন্দর্যের রহস্যময় অনুভূতি র‍্যানেইসঁসের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে ইংরাজী সাহিত্যকে সরিয়ে রেখেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মমতের বহিরাগত পরিবর্তনের প্রভাব দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি। ধর্মীয় সংস্কারের সাহিত্যিক প্রকাশ এবং সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতার বিকাশ বহুদিন দেশীয় ঐতিহ্যের জনপ্রিয়তাকে পেরিয়ে যেতে পারেনি। র‍্যানেইসঁস ইংরাজ মানসিকতাকে অভিভূত করেছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের শতমুখী স্বাধীন সৃজনশীলতার দ্বারা সমৃদ্ধ শিল্প ও সাহিত্য ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করতে সময় নিয়েছিল।

ধর্মসংস্কারকরা ধর্মবোধের স্বাধীন বিকাশের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন ; কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্যে তা প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান নি। পণ্ডিত মানুষেরা দেশীয় শিল্পের বিভিন্নধারায় গ্রীসিয় রীতিতে মানুষ ও তার ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্ররূপের উদ্ঘাটনে তৎপর হন নি। ফলে, ধর্ম-অন্দোলনের এবং র‍্যানেইসঁসের প্রাথমিক প্রভাব নীতি ও আদর্শের সাহসিক প্রতিষ্ঠার চৌহদ্দির বাইরে সাহিত্য বা অন্য কোন শিল্পে দেখা যায় নি।

পোপের একচ্ছত্র রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় কর্তৃত্বের বাইরে এসে ইংরাজরা কিন্তু মুক্তি পায়নি। নীতিনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি আর শুষ্ক নৈতিকতার চাপ নতুন ধরনের এক মানসিক দাসত্ব সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া, প্রাথমিক অবস্থায়, ইংল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার ইংরাজদের

বাধ্যতামূলক নীতিনিয়মের হাত থেকে মুক্ত করে বহিরাগত বহু আন্দোলনের প্রচারে 'বাঁশবনে ডোমকানা' হয়ে যাওয়ার অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। ধর্মসংস্কার শুরু হওয়ার আগে ছিল এক ধরণের ধর্মীয় দাসত্ব; আবার পরে, মধ্যযুগীয় মোহভঙ্গ হলেও নানা মতাদর্শের রেষারেষিতে প্রাণচঞ্চলতার স্বাভাবিক রূপ ফুটে উঠতে পারেনি। এই অবস্থা র‍্যানেইসঁসের প্রভাবের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ধর্মের প্রভাব থেকে মানুষ মুক্ত হতে চায় নি; কিন্তু জীবনকে বঞ্চিত করে কৃচ্ছ্রসাধনও মানুষের কাম্য ছিল না। গতানুগতিক দেশীয় সাহিত্য এই অবস্থার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাসের প্রচণ্ড চাপ মানুষ বহুক্ষেত্রেই অবশ্য স্বীকার্য বলে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের শেষে ও ষোড়শ শতকের আরম্ভে মানুষ বাধ্য হয়ে রাজশক্তির মনগড়া ধর্মের নিগড়ে বদ্ধ হল। একদিকে সমাজ সংস্কারকদের কঠোর নীতিবাগীশ আদর্শ, অন্যদিকে রাজশক্তির সঙ্কীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত ধর্মীয় নির্দেশ,—এই দুই-এর মাঝখানে সাধারণ মানুষ আগের চেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছিল। মধ্যযুগের অবস্থার সঙ্গে তফাৎ এইটুকুই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষীণ বাতাস মাঝে মাঝে দুর্বলভাবে মানুষকে স্বাধীনতার অস্পষ্ট ধারণায় সহজ হবার মত একটা ইচ্ছা জুগিয়ে যাচ্ছিল। মধ্যযুগের শিল্পকলা একমুখী হলেও সৌন্দর্যের চর্চা ছিল। সংস্কার আন্দোলনের শুরুতে সৌন্দর্যবোধ ভয়ে লুকাতে পথ পায়নি। হয়ত এটার প্রয়োজন ছিল। বড় কিছু পেতে গেলে আপাত কষ্টের রাস্তা অতিক্রম করতে হয। সংস্কার-আন্দোলন র‍্যানেইসঁসের অগ্নিপরীক্ষা।

চশার কিন্তু সংস্কার-আন্দোলনের এবং নব্যধর্মগুলির কঠোরতার যুগকে পেরিয়ে গিয়ে পরবর্তী যুগের পরিচয় আগেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় আকাশ-কুসুম এবং পরবর্তী 'পিউরিটান' (পবিত্রতাবাদী) কঠোরতার প্রতিবাদ অনেক আগে থেকেই তাঁর কাব্যের সুরে ধরা পড়েছিল।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ষোড়শ শতকের ইংরাজী সাহিত্যের অবস্থা। একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। প্রাচীন গ্রীক এবং প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্যের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে ধর্ম সংস্কারের প্রভাব ক্রমে ক্রমে ইংরাজী সাহিত্যের উপর যতই পড়ুক না কেন দেশীয় সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধর্মীয় একাধিপত্যের সঙ্গে খোলাখুলি বা গোপনে প্রতিযোগিতা করে চলেছিল। সেই জনপ্রিয় ও জনপরিচিত সাহিত্য এখন নির্ঝঞ্ঝাট হতে চলল। ব্যালাড এবং নাটক পুরোপুরি ধর্মীয় অনুমোদন কোনদিনই পায়নি; বরঞ্চ এদের উপর একটা শাসনের তর্জনী সর্বদা উঁচিয়ে ছিল। সেই চাপ থেকে মুক্ত হয়ে ইংরাজী সাহিত্য ক্রমে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের অবস্থায় পৌঁছাল। ইংল্যাণ্ডে র‍্যানেইসঁসের আগমন স্বতপ্রণোদিত গ্রহণ ক্ষমতাকে মোহগ্রস্ত করে নয়, বিস্ময় ও আনন্দের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন আবাহনে। র‍্যানেইসঁসের মূলপ্রেরণা শুধু চিন্তার মুক্তি নয়, প্রকাশেরও স্বাধীনতা; —তা ইংল্যাণ্ডে যতটা কাজ করেছিল মহাদেশের আর কোন অঞ্চলে ততটা করেনি। ফলে ইংরাজী সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যই রইল,—কিন্তু তা হ'ল স্বাধীন ও সাবলীল। র‍্যানেইসঁস ইংরাজী সাহিত্যকে যতখানি না পূর্বমুখী করেছিল, জীবনের মূল অনুভূতিগুলির স্বাভাবিক প্রকাশে তার থেকে বেশী শক্তি জুগিয়েছিল।

পুনরুজ্জীবন—ধর্মসংস্কার—নতুন জ্ঞানের আলো (Renaissance, Reformation and New Learning)

দ্বাদশ শতকে ইটালীর সাহিত্যের ভাষা দক্ষিণ ফ্রান্সের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পরে সিসিলিতে স্বাধীনভাবে ইটালীর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইটালীর সাহিত্যকেন্দ্র উত্তরে সরে যেতে থাকে। নানা পরিবর্তনের পর এই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল দর্শন ও বুদ্ধিভিত্তিক। উত্তর ইটালীর টাস্কানি (Tuscany) প্রদেশের ফ্লোরেন্স (Florence) ছিল এই সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্র।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইটালীর কবিরা ল্যাটিন সাহিত্য অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের অজানা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য ব্যগ্র হলেন। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই জ্ঞানান্বেষণ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

এই সময় ইউরোপের সর্বত্র এবং ইংল্যাণ্ডেও, প্রাচীন গ্রীসের আদর্শে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সুদূরপ্রসারী গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ঈশ্বর ও স্বর্গের ধারণাকে উপেক্ষা না করে মানুষের শক্তি, বুদ্ধি, কাজকর্ম ও মহত্ত্বকে মুক্ত ও বিস্ময়ের চোখে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী। প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা করে গৌরবদানের প্রয়োজন না-ও থাকতে পারে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবসত্ত্বা উপেক্ষা, অবহেলা বা অনুকম্পার বস্তু নয়,—এই দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তানায়কদের ভিতর এসে গেল। মানুষের চিন্তা ও কল্পনার জগতের কেন্দ্রে রইল মানুষ; —আধ্যাত্মিক থেকে আধিভৌতিকের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া,—ষোড়শ শতাব্দীর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মানবতাবাদ' (Humanism)। বহু দেবদেবীকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যিকেরা তাঁদের আগ্রহকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন মানুষের উপর। মানবদেহ কুৎসিত নয় মানুষের ভালাবাসা পাপ নয়, আর মানুষের জগতের সৃষ্টিকর্তা মানুষ-ই, —এই বোধ ও প্রত্যয় মানবতাবাদের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা। বাঙালীর কাছে এ কথা বহুকাল ধরে জানা হয়ে আছে চণ্ডীদাসের পরম আশ্চর্য সুন্দর ঘোষণায়; 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

ইংল্যাণ্ডে এই মানবতাবাদকে প্রথমে আবাহন করেছিলেন উইলিয়ম গ্রকিন (William Grocyn ১৪৪৬-১৫১৯), টমাস লিনাক্রে (Thomas Linacre ১৪৬০-১৫২৪), জন কোলেট (John Colet ১৪৬৭–১৫১৯) এবং উইলিয়ম লিলি (William Lily ১৪৬৮-১৫২২)। এঁদের একত্রে 'অক্সফোর্ড সংস্কারক' (Oxford Reformers) বলা হয়। এঁরা প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি ইটালীর বিভিন্ন শহরে নিজেরা গিয়ে দেখে এসেছিলেন। কনষ্টান্টিনোপল থেকে খৃষ্টান পণ্ডিতরা বিতাড়িত হয়ে উত্তর ও মধ্য ইটালীর বোলোগনা (Bologna), ফ্লোরেন্স (Florence), ভেনিস (Venice), পাডুয়া (Padua) এবং রোম (Rome) নগরীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উপরোক্ত জ্ঞানান্বেষী ইংরাজ যুবকগণ প্রাচীন গ্রীসের তত্ত্ব ও তথ্য এনে হাজির করলেন অক্সফোর্ডে। সমসাময়িক বিশিষ্ট পণ্ডিত ইর্‌্যাসমাস (Erasmus) এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করলেন। এরই নাম 'নতুন জ্ঞান' বা New Learning।

ইর‍্যাসমাস এবং সমকালীন পণ্ডিতরা শুধু যে প্রাচীন গ্রীক চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে ইংরাজ মানসিকতার পরিচয় ঘটালেন তা-ই নয়, প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শেখার জন্য কোলেট 'সেন্টপল'-এর নামে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, এবং ইর‍্যাসমাস ল্যাটিন ব্যাকরণের সংস্কার করলেন। প্রসঙ্গতঃ, ইর‍্যাসমাস (Deciderius Erasmus ১৪৬৯-১৫৩৬) ছিলেন হল্যাণ্ডের লোক। ইংল্যাণ্ডে নতুন জ্ঞান এবং পুনর্জাগরণ (Renaissance) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মসংস্কার (Reformation)

ধর্মসংস্কার (Reformation) সব সময়ে এবং সর্বতোভাবে নতুন জ্ঞান (New Learning) এবং বিস্মিত ও প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখেনি বা সহযোগিতা করেনি। মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ করে ইর‍্যাসমাস যে নতুন বাইবেল লিখলেন তা দিয়ে মানুষের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। আর এছাড়া, পোপ এবং তাঁর পারিষদদের অনাচার তো ছিলই। জার্মানীর উইটেনবার্গ (Wittenberg) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং যাজক মার্টিন লুথার (Martin Luther) এই পরিস্থিতিতে পোপের সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন। ইর‍্যাসমাস কিন্তু এতখানি এগোতে চাইলেন না। তাই 'নতুন দৃষ্টিভঙ্গী' এবং ধর্মসংস্কার তফাতে সরে গেল।

লুথার 'প্রতিবাদ' বা 'Protest' করেছিলেন বলে তার অনুগামীদের 'প্রতিবাদকারী' বা 'Protestant' বলা হতে লাগল।

পোপ এবং তাঁর পারিষদদের দুর্নীতিব বিরুদ্ধে একশ বছর আগেই ওয়াইক্লিফ তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায়, লুথারের প্রতিবাদী আন্দোলন ছাড়াও যে আন্তর্জাতিক প্রকাণ্ড শক্তি সমস্ত ইউরোপকে মথিত করছিল তা তখন ছিল না। 'পুনর্জাগরণ'-এর সৌন্দর্যবোধ প্রতিবাদী.আন্দোলনকে অবলম্বন করেনি। প্রোটেস্ট্যান্টরা ধর্মীয় সুনীতি চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের ধর্মসম্পর্কহীন শিল্পসৃষ্টিকে অনুমোদন করেন নি। ইংল্যাণ্ডে প্রোটেষ্ট্যান্ট মতবাদ বাঁচবার ফরমান পেলে তখনই যখন রাজশক্তি আপন স্বার্থরক্ষায় তাকে সমর্থন করল। নতুন যুগের সাধাবণ মানুষ প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ নিয়ে তত বেশী মাথা ঘামাননি, যতটা তাঁরা র‍্যানেইর্সসকে নিয়ে করেছিলেন। দুই আন্দোলনই পাশাপাশি চলেছিল ; এবং সাহিত্যের ভবিষ্যতেব উপর দুয়েরই প্রভাব পড়েছিল।

এই ভাবে ষোড়শ শতাব্দীর গোডার দিক থেকে ইংরাজী সাহিত্যেব যে রূপ আমরা দেখি তাতে বোঝা যায় প্রধান প্রধান কি কি প্রভাব তাকে ক্রমশঃ উন্নত ও আধুনিক করে তুলছিল।

যে কোন প্রাচীন জাতের বিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তি তার ধর্ম। তাতে কি যৌক্তিকতা আছে না আছে তা অন্যভাবে বিচার্য। পরবর্তীকালে এমন কি তা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হলেও, সাধারণ মানুষ তাকে এক ধরনের গুরুত্ব দেয়। সেটা তার স্বভাবগত। আর, মধ্যযুগে

বা তার অব্যবহিত পরে ধর্মবিশ্বাস মানুষেব জাগতিক কর্মজীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই ছিল। শাসক বা অভিজাতরা ধর্ম নিযে কি করেছেন না করেছেন সেটা বড় কথা নয়; সাধারণ মানুষ ধর্মকে কতখানি প্রিয বস্তু বলে মনে করেছিল, সেটা বুঝতে হবে। তাই ইংল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার কেবল ধর্মতত্ত্বের আলোচনা-সমালোচনা নয়—জাতীয় বোধের দ্বারা নিষিক্ত সহজ ও জাগতিক ধর্মাচরণের স্বীকৃতি।

ক্ষেত্রবিশেষে, ধর্মীয পরিবর্তনের বাডাবাডিতে যে কঠিন জীবনযাপন পদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছিল তা' ইংল্যাণ্ডে সাধারণভাবে জনপ্রিয় হযনি। আচরণ-পদ্ধতি নয়; ভক্তির সহজগ্রাহ্য ধরনে ও সুপ্রকাশে মানুষের সাহিত্যিক সৌন্দর্যসৃষ্টিব প্রয়াশ সহজ হতে পেরেছিল। নতুন সাহিত্যে ধর্মের ভূমিকা মোটামুটি এই রকমই।

দ্বিতীযতঃ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনষ্টাণ্টিনোপল থেকে তাডা-খাওয়া গ্রীক-পণ্ডিতদের পুঁথিপত্রাদি থেকে মানুষ অনেক নুতন জ্ঞানের সন্ধান পেল; অথবা পুরাতন ধারণাগুলির সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করল। তবে, এই জ্ঞানের প্রসাব অন্য আর একদিক থেকে চোখ-ধাঁধানো প্রকাণ্ড পবিপূরক পেযে গেল। নতুন নতুন আবিষ্কার ও অভিযানের দ্বারা পৃথিবীর বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা যত পাওযা যেতে থাকল, ততই বস্তুজগতকে দেখার দৃষ্টির ভিতরে বিস্মযের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস (Columbus) পশ্চিম ভারতীয দ্বীপপুঞ্জে (ত্রিনিদাদ) পৌঁছল, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে জন ক্যাবট (John Cabot) আমেরিকার উত্তব-পূর্বে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড আবিষ্কার করলে, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা (Vasco De Gama) ভাবতে আসার জলপথ আবিষ্কার করল। এগুলি শুধু অভিযান বা আবিষ্কার নয়, —মানুষের চিন্তাজগতের বিশাল পরিবর্তনের বাহক।

প্রাচীন গ্রীসের কথায় আবাব আসা যাক, কেননা র‍্যানেইসঁসের কেন্দ্রাবিন্দু সেখানেই। এথেন্সের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা সামগ্রিকতাকে, এবং স্বেচ্ছাচারের থেকে যুক্তিকে যে ভাবে প্রাধান্য দিযেছিল তা উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির পদ্ধতি অনুসরণের জন্য ইউরোপের সর্বত্র আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল। যা কিছু গ্রীক তা-ই যে ভাল তা নয়। গ্রীস যেমন গতানুগতিকতার মোহভঙ্গ করেছিল, তেমনি আবার প্রাচীন গ্রীসের সম্পর্কে এক শক্তিশালী মোহও সৃষ্টি হয়েছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন গ্রীস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের বিভাগ খোলা হযেছিল আলোচ্য শতাব্দী শুরু হওয়ার আগেই (১৪৯০)। তবুও বলা চলে গ্রীসের প্রতি আনুগত্য প্রাচীন গ্রীসেরই শিক্ষায় ইংরাজ মানসিকতায় এক স্বাধীন চিত্তবৃত্তি সৃষ্টি করেছিল যার জন্য র‍্যানেইসঁসের আত্মিক অনুসরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

নতুন জ্ঞানের আলো শুধু বিস্ময় ও ভৌত এবং অভাবিত আদর্শ সামনে এনে দিয়েছিল তা-ই নয়, এক চিরন্তন নৈতিকতার মাপকাঠি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ বা ধর্মীয় শাসন যা-ই বলুক না কেন মানুষের অন্তরেন্দ্রিয় হয়ত অন্য কিছু বলতে পারে। প্রচলিত আদর্শের বিরুদ্ধে যীশুর বিদ্রোহ এই নৈতিকতারই সাধনা। এমনকি এই আদর্শ মানুষের কর্মফলের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রাহ্য হওয়ার সুযোগ এসেছিল। যা কিছু অন্যায় প্রতিটি

মানুষ তা নিজেই বুঝতে পারল ; শুধু এইটুকু যোগ হল যে নিজের মনের কাছে অকপটে স্বীকারোক্তি মানসিক যন্ত্রণার লাঘব করতে পারে,—বাইরের শাস্তি বা পুরস্কার সেখানে তুচ্ছ।

আর তৃতীযতঃ, প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহারকে অবারিত করে দিল। সাহিত্যিক বা যে কোন অগ্রগমনে ধারাবাহিকতার উপযোগীতা আছে, তেমনি গতানুগতিকতাকে একের পর এক পার হয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে। র‍্যানেইসঁস মানুষের মনের এই গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছিল। র‍্যানেইসঁসের দ্বারা শুধু জ্ঞানসঞ্চয় হযনি ; নতুন নতুন জ্ঞানকে যাচাই করার ও গ্রহণ করার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল।

এতাবৎকাল মানুষের মনের গঠন কি হওয়া উচিত, বা কি মঙ্গলজনক , এ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা এসেছে, কিন্তু প্রতিটি মানুষকে আলাদা করে বিচার করার দরকার আছে—এ বোধ আসেনি। কথাটাকে আর এক ভাবে বলা যায়,—বিচিত্র মানুষের মন,—প্রতিটি মানুষ অন্য মানুষেব থেকে আলাদা, —মানুষের বিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন মানুষ বোঝেনি। র‍্যানেইসঁস এক বিস্মৃয়ের দৃষ্টি নিয়ে প্রতিটি মানুষের মনের সেই অনাবিষ্কৃত মহাদেশের খোঁজে মানুষকে আত্মহারা হওযাব সুযোগ করে দিলে, এবং তখন থেকেই বোঝা গেল কাব্যের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয়ে যাবে না ; এ বিস্ময় অন্তহীন।

র‍্যানেইসঁসের আর এক শ্রেষ্ঠ অবদান নতুন এক সৌন্দর্যের বোধ। এই বোধ শিল্পকলা থেকে প্রসারিত হয়েছিল মানুষের জীবনে। মানুষের মনই মানুষকে এই সৌন্দর্য দিতে পারে। প্রাচীন গ্রীক আদর্শ, সুষম, সুসম্পূর্ণ ধারণার ভিতর প্রতিটি অংশের সঙ্গে প্রতিটি অংশের সামঞ্জস্য এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে। আমরা যখন কোন মানুষকে বলি,—দেহে, মনে, চিন্তায়, কাজে সুন্দর হও—তখন যে সর্বাত্মক সৌন্দর্যের ধারণা আমাদের আসে তা-ই র‍্যানেইসঁসের সৌন্দর্যবোধ। গ্রীকরা এই সৌন্দর্য বুঝত। মধ্যযুগে এই সৌন্দর্য মানুষ ভুলে গিয়েছিল। এই সৌন্দর্যবোধ সবচেয়ে স্বাভাবিক। এ ভিক্টোরিয় যুগের ন্যাকামি নয় বা সাধুসন্ন্যাসীদের ভগবদদর্শন নয়। এ মানুষের সৌন্দর্য, যা মানুষেই সৃষ্টি করে।

ধর্মসংস্কার ও পুনর্জাগরণের এই তিনটি পথ পরিক্রমণ যে ভাবে এবং যাঁদের হাতে ঘটেছিল তাঁরা কি করলেন বা কিভাবে করলেন এ বারে তা দেখা যাক।

১৫৬৪ সালে ফরাসী ধর্মতত্ত্ববিদ জ্যঁ ক্যালভিনের (Jean Calvin) মৃত্যু হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই পশ্চিম ইউরোপে তিনি ধর্মসংস্কারের ব্যাপক পরিবেশ তৈরী করেছিলেন। এর ফলে 'পবিত্রতাবাদী' বা 'পিউরিটান' মতবাদের সৃষ্টি হয়। পিউরিটানরা চরম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। ঠিক উল্টোদিকে 'ক্যাথলিক সংস্কার' বা ক্যাথলিক ধর্ম বজায় রেখে তার সংস্কার-এর আন্দোলনের ফলে 'জেসুইট' মতবাদের উদ্ভব হয়। ক্যালভিনের অন্যতম শিষ্য স্কটল্যাণ্ডের জন নক্স-এর (John Knox ১৫০৫-১৫৭২) দ্বারা স্কটল্যাণ্ডে 'প্রেসবিটেরিয়ান' (Presbyterian) বা 'প্রবীনদের দ্বারা শাসিত প্রতিবাদী ধর্মসংঘের' উন্নতি হয়। এই উপলক্ষ্যে জন নক্স স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত ইংরাজী ভাষায় ধর্মপুস্তিকা ইত্যাদি লেখেন। তাঁর লিখিত প্রচার-পুস্তিকাগুলি ধর্মসংস্কার উপলক্ষ্যে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের

উৎকৃষ্ট নমুনা। যে যুক্তিবাদ র‍্যানেইসঁসের অন্যতম ফসল, তা এইসব ধর্মীয় আলোচনায় জোরালভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জন নক্সকে স্কটল্যাণ্ডের প্রথম গদ্য সাহিত্যকার বলে বলা হয়। এই সময়ে পিউরিটান এবং প্রেসবিটেরিয়ান সংস্কারকগণ তাঁদের কথা ইংরাজ ও স্কচ জনসাধারণের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেবার জন্য ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে, ধর্মসংস্কারকদের বক্তব্যের বাহক এবং পরোক্ষ-উৎপাদন হিসাবেই সাধারণ্যে প্রচলিত ইংরেজী গদ্যের সূত্রপাত। অন্য আর একদিকে রাজাদেশে এবং অন্যান্য কারণে সঙ্ঘারামগুলির ধ্বংস এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে অতি-উৎসাহী প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের প্ররোচনায় বহু প্রাচীন এবং অমূল্যগ্রন্থ নষ্ট হযে যায়। ধর্মীয় অস্থিরতা বহু পরে যখন থিতিয়ে এসেছিল, কেবলমাত্র তখনই সহনশীলতার পরিবেশে কিছু কিছু গ্রন্থ রক্ষা পেয়েছিল। 'গ্রন্থ' এবং 'জ্ঞান' কোন ধর্মের প্রভাবে বা বিরোধিতায় মলিন হয় না, এই পরিণতবোধ ষোড়শ শতাব্দীর শেষেও পুরোপুরি আসে নি। তাই ধর্মসংস্কার শুধু জ্ঞানের আবাহন ও প্রতিষ্ঠার নয়, বিরোধিতার ও ধ্বংসের জন্যেও দায়ী। আদি ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আন্দোলনের দ্বারা মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তির—ক্ষেত্রবিশেষে কুবুদ্ধি ও কুযুক্তির—স্বচ্ছন্দ ও সক্রিয় ব্যবহার হয়েছিল।

ইংরাজী গদ্য

ধর্মীয় তত্ত্ব, জাগতিক তথ্য ও নতুন ধ্যান ধারণা, এবং যুক্তি ও বুদ্ধির পূর্ণ ব্যবহার,—এই তিন দিকেই ইংরাজী গদ্য ষোড়শ শতাব্দীতে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিতা তেমন এগিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বয়সে নবীন হলেও গদ্য নিশ্চিত অগ্রগতি দেখিয়েছিল।

যতি চিহ্নের প্রয়োগ বা প্রয়োগ ছাড়াও,—উচ্চারণে অর্থভিত্তিক সময়ের বিভাগ এবং ধ্বনির উত্থানপতন এই সময় থেকেই ভালভাবে শোনা যেতে থাকল। গদ্যে অনুচ্ছেদ বিভাগের নীতি বেশ বোঝা গেল। গদ্যের তিন স্তরের লিখনভঙ্গী—আড়ম্বরপূর্ণ ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ, মাঝারি ও সাদাসিধা—আলাদা আলাদা লেখক ও বিষয়ের ভিত্তিতে অনুসরণ করা আরম্ভ হল।

ষোড়শ শতাব্দীতে যা যা গদ্য লেখা হয়েছিল তার মোটামুটি এইরকম শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

- ★ বাইবেলের অনুবাদ।
- ★ ধর্মবিষয়ক অন্যান্য রচনা।
- ★ প্রাচীন নানা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের অনুবাদ।
- ★ ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের নানাকথা।
- ★ আধুনিক কালের নানা অভিযান ও আবিষ্কার সম্পর্কিত কাহিনী।
- ★ অন্যান্য।

বাইবেলের অনুবাদের ব্যাপারে আমরা আগে যা বলেছি তার সঙ্গে আরও কিছু কথা এই অংশে যোগ করবো।

ধর্মবিষয়ক নানা রচনার ভিতর জন ফোক্স (John Foxe ১৫১৬-৮৭)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এই পরবর্তী ও বিপজ্জনক দিনগুলির স্মারক কার্যাবলী' (Acts and monuments of these latter and perilous days) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইটির অন্য আর এক পরিচয় 'শহীদদের বিষয়ে' (Book of Martyrs)। এটি লেখা হয় ১৫৬৩ সালে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির জন্য গ্রন্থটির প্রচুর খ্যাতি ছিল। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মীয় মতবাদের উপর এটি একটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

লর্ড বার্ণার্স-এর (Lord Berners) অনুবাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৫২৩-২৪ সালে বার্নার্স ফরাসী লেখক ফ্রয়সার্ট-এর (Jean Froissart ১৩৩৭ ১৪০৫) 'মধ্যযুগের ধারাবাহিক ইতিহাস' (Chronicles)-এর ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ছিল সরল, সাধারণের বোধগম্য কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক। এই অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী গদ্য সাধারণভাবে শুরু হ'ল বলে বলা যায়। এই গ্রন্থে ১৩২৫ সাল থেকে ১৪০০ সাল পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের নানা ঘটনা, কিংবদন্তী ও উপকথার সন্নিবেশ আছে।

এ ছাড়া যোড়শ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশের ভিতরেই অন্যতম অ-গতানুগতিক লেখক ছিলেন রোজার আসচাম (Roger Ascham ১৫১৫-৬৮)। তাঁর লেখার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল দুটি। একটি ছিল পরমুখাপেক্ষী না হয়ে ইংরাজী গদ্যকে ভাবপ্রকাশের সার্থক মাধ্যম করে তোলা ; অপরটি ছিল ইংল্যাণ্ডকে অন্যান্য দেশের কাছে দর্শনীয় করে তোলা। ১৫৪৫ সালে লেখা তাঁর একটি পুস্তকের নাম 'টক্সোফিলাস' (Toxophilus)। এতে ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধীয় কথোপকথন আছে। ১৫৭০ সালে তাঁর আর একখানি পুস্তক 'বিদ্যালয়ের শিক্ষক' (The Schole master) প্রকাশিত হয়। এতে শিক্ষকদের প্রতি উপদেশ আছে যে কি করে ল্যাটিন শেখান যায়।

উপরোক্ত সময়ের ভিতরে লিখেছেন এমন অন্যান্য লেখকদের ভিতর হলিনশেডের (Raphael Holinshed) নামও এই সঙ্গে করতে হয়। ১৫৭৭ সালে তাঁর লেখা "ইতিহাস" (Chronicles) প্রকাশ শুরু হয়। ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে বইটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এতে উল্লিখিত ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড বহু অংশ কৌতূহলের উদ্রেক করে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের আর একজন গদ্য লেখকের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে খুব উল্লেখযোগ্য। ইনি জন লিলি (John Lyly ১৫৫৪-১৬০৬)। এঁর দুখানি গদ্যে লেখা বই 'ইউফিউস দি এ্যানাটমি অব উইট' (Euphues the Anatomy of Wit-১৫৭৯) এবং ইউফিউস এ্যাণ্ড হিজ ইংল্যাণ্ড (Euphues and his England-১৫৮০)-এর বিশেষত্ব দুদিক থেকে। বর্তমানে যাকে আমরা ফিকসন' (Fiction) বলি তার সম্পর্কে ওই সময়ে লেখকদের একটা সঙ্কোচ ছিল, কেননা ফিকসন কথাটির মানে অসত্য। কিন্তু লিলি এই সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠার সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয়তঃ, ষ্টাইলের (রচনাশৈলী) দিক থেকে এর স্বেচ্ছাকৃত কৃত্রিমতা এবং আদব-কায়দার বাড়াবাড়ি ইংরাজী সাহিত্যে নতুন। এই বইয়েরই ভাষাকে মনে রেখে অস্বাভাবিক ও বড় বড শব্দপূর্ণ রচনাশৈলীকে 'ইউফিউইজম' (Euphuism) বলা হয়। কোন কোন গদ্য লেখক এই

রচনাশৈলী, বিশেষ করে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, কিছুদিন অনুসরণ করেছিলেন। লিলির এই গদ্যই ইংরাজী সাহিত্যে সচেতনভাবে উদ্ভাবিত ও অনুসৃত প্রথম ব্যক্তিগত রচনাশৈলী।

এইগুলি এবং এইসব বিভিন্ন ধরণের গদ্যগ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বা কিছু পরেও লেখা হয়েছে। (এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করবার ইচ্ছা রইল।)

ইংরাজী বাইবেল

আমরা এখন বাইবেলের অনুবাদের কথায় আবার ফিরে আসব। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বাইবেলের অনুবাদ সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ রেখেছিলাম। এই খণ্ডেও সে আলোচনা সম্পূর্ণ করা যাবে না।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে বাইবেলের অনুবাদ প্রসঙ্গে জন ওয়াইক্লিফ, নিকোলাস, হারফোর্ড এবং জন পার্ভের নাম করেছি। এখন আমরা চলে আসব ১৫২৫ সালে।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন উইলিয়ম টিনডেল (William Tyndale ১৪৮৪/৮৫/৯০-১৫৩৬)। তাঁর দ্বারা অনূদিত বাইবেল পশ্চিম জার্মানীর কোলনে (Cologne)প্রথম ছাপা হয়। টিনডেল সরাসরি হিব্রু এবং গ্রীক মূল বাইবেল থেকে অনুবাদ করেছিলেন। বিদেশেই বেলজিযামের ভিলভোর্ডে(Vilvorde) সহরে তাঁকে ফাঁসী দেওযা হয় বিরুদ্ধ ধর্মমত প্রচারের কারণে। টিনডেল শুধু যে ধর্ম পুস্তকের মৌলিকত্বের খাতিরে হিব্রু এবং গ্রীক বাইবেলের উপর নির্ভর করেছিলেন তা-ই নয, তিনি দেখিয়েছিলেন ল্যাটিন অপেক্ষা ওই দুই প্রাচীন ভাষাই ইংরাজীর অধিকতর নিকটবর্তী। আবার নৈতিকতার দিক থেকে. তিনি মধ্যযুগীয় রূপকথা-উপকথার বিরুদ্ধতা করেছিলেন, এবং বাইবেলকেই সুনীতির চরম আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি প্রাচীন মহাকবিদেরও বর্জন করেছিলেন। এর দ্বারা হয়ত ইংরাজী জাতীয়তার এক ধরনের সঙ্কীর্ণবোধ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মানবতাবোধের ঔদার্য সম্ভবতঃ ইংরাজ জনসাধারণকে সামনে রেখে তৈবী হয়েছিল। বহুভাষাবিদ, সুশিক্ষিত টিণ্ডেল যেমন বাইবেল ছাডা কোন কিছুরই গুরুত্ব দেন নি, তেমনি বাইবেলের ধারক হিসাবে ইংরাজী ভাষার তথাকথিত অক্ষমতার প্রাচীনপন্থী সমালোচনারও উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। এ যুগের ধর্মসংস্কারকগণের সঙ্গে এইখানেই তাঁর বৈসাদৃশ্য। ওয়াইক্লিফের উত্তরসূরী এইভাবে ইংরাজীভাষাকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অগ্রসরমান স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

টিনডেলের ইংরাজী বাইবেল রাজশক্তির অনুমোদন না পেলেও রাজা নিজে ইংরাজী ভাষায় বাইবেলের বিপক্ষে ছিল না। অবশ্য পোপের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ছেদ হয়েছিল ব্যক্তিগত কারণে। লুথারের আদর্শে টিনডেল যে বাইবেল লিখেছিলেন তা বাতিল হয়ে গেলেও তাঁরই লেখা নতুনভাবে সম্পাদনা করে ১৫৩৫ সালে বাইবেল প্রকাশ করলেন মাইলস কভারডেল (Miles Coverdale ১৪৮৮-১৫৬৮)। এই প্রথম সম্পূর্ণ বাইবেল ইংরাজীতে প্রকাশ পেল। এতে শব্দ চয়নে মূল বাইবেলের মাধুর্য বহুল পরিমাণে বজায় রাখা গেল।

এরপর কোন এক জন রোজার্স (John Rogers)-এর নামে ১৫৩৭ সালে একটি বাইবেল পাওয়া গেল। এই বাইবেলের উপর ভিত্তি করেই ১৫৩৯ সালে প্রকাশ পেল গ্রেট বাইবেল (Great Bible)। এটিই হল রাজানুমোদিত প্রথম বাইবেল।

১৫৬০ সালে আবার চরম প্রোটেস্ট্যান্ট আদর্শে জেনিভা বাইবেল বা ব্রীচেশ বাইবেল (Geneva Bible বা Breeches Bible) প্রকাশ পেল ; এবং তারই উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য 'বিশপদের বাইবেল' (Bishops' Bible) প্রকাশ পেল ১৫৬৮ সালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রসঙ্গতঃ, পিউরিটানদের 'জেনিভা বাইবেল' পরে ইংল্যাণ্ডের রাজানুমোদিত ধর্ম "চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের" প্রচণ্ড আক্রোশের মুখে পড়ে। এমন কি, অনেক পরে, ১৬২০ সালে, নানা আক্রমণ প্রতি আক্রমণের শেষ পর্যায়ে একদল পিউরিট্যান দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন।

যাই হোক বাইবেলের ধারাবাহিক অনুবাদের ভিতর দিয়ে ধর্ম আন্দোলনের কারণে অপ্রত্যক্ষভাবে, ইংরাজী ভাষাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিল।

বিস্ময়কর বিশাল জগৎ প্রত্যক্ষ এবং সম্ভাবনাময়

ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মীয় আন্দোলনের পাশাপাশি—কখনও সমর্থনে, কখনও বিরোধিতায়—আর যে যে শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল প্রাচীন গ্রীস এবং প্রাচীন রোমের ধ্যান ধারণা এবং শিল্পকৃতিত্বের সঙ্গে আধুনিক কালের পরিচয়, এবং অজানা জগতের বিশালতার ধারণা। এ ধারণা মানুষের কল্পনাকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করল, এবং সাহিত্যে নতুন এবং শক্তিশালী প্রেরণা যোগাল।

এই বিস্ময়-আপ্লুত নব্য জ্ঞানের প্রধান বাহক স্যার টমাস মুর (Sir Thomas More—১৪৭৮ ১৫৩৫)। মুরের সাহিত্যকর্ম ছিল ল্যাটিনে। ইংরাজী ভাষা সরাসরি উপকৃত হয়নি ঠিকই ; কিন্তু ইংরাজ তথা পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে মুর যে নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার করলেন, তা ইংরাজী সাহিত্যের বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ইংরাজ লেখক টমাস মুরের ল্যাটিন গ্রন্থ ইংরাজী সাহিত্যকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল, তা যে কোন ইংরাজী গ্রন্থের পক্ষে দুর্লভ ক্ষমতার পরিচায়ক হতে পারত।

এ যুগের নব্যজ্ঞানের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন টমাস মুর। ইতালিতে নব্যজ্ঞানের অন্যতম প্রযোজক পিকো ডেলা মিরানডোলা (Pico Della Mirandola ১৪৬৩-৯৪) ছিলেন টম্যাস মুরের আদর্শ। মিরানডোলা ধর্ম এবং দর্শনকে ঘনিষ্ঠ স্তরে নিয়ে এসেছিলেন। মুর নব্য শিক্ষার আলোয় ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আচার-আচরণে অথবা মানসিকতায় তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না। স্বদেশে ইর‍্যাসমাসকে তিনি অনুসরণ করতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। জ্ঞানের আলো শুধু তাঁর অধীত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি তাঁর নিজের জীবনকে অকৃত্রিম করে তুলেছিলেন শুদ্ধ জ্ঞানের আলোক ধারায়। রাজসভার আড়ম্বর তাঁকে আনন্দ দেয়নি ; কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রাজা তাঁকে বারবার উচ্চপদ ও সম্মান দিয়ে নিজের কাছে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। জ্ঞানতপস্বী

হয়েও তিনি সংসার বিরাগী ছিলেন না; ল্যাটিনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও যখন অল্প বয়সেই ইংরাজীতে পঞ্চম এডওয়ার্ডের জীবনী লিখলেন তখন তা হল উৎকৃষ্ট ইংরাজী গদ্য,—নির্ভুল, প্রাঞ্জল এবং আধুনিক।

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 'উটোপিয়া' (Utopia)। এটি প্রকাশিত হয় ১৫১৬ সালে। 'উটোপিয়া' ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয়েছিল। ইংরাজী সাহিত্যের পক্ষে এটা অবশ্যই কিছুটা আক্ষেপের বিষয়। 'উটোপিয়া' কথার অর্থ "যে দেশ কোথাও নেই' (Nowhere)। বেলজিয়ামের এ্যান্টওয়ার্প-এ (Antwerp) সাময়িক অবস্থানকালে মুর এমন এক দেশের কথা শুনেছিলেন যা তাঁর কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। আমেরিগো ভেসপুচি-র (Amerigo Vespucci) সঙ্গে 'নতুন জগতে' গিয়েছিল এমন একজন নাবিক সে দেশ সম্পর্কে নতুন কিছু কথা বলেছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা মুরকে এক আশ্চর্য প্রেরণা দিয়েছিল, যার জন্য শুধু নতুন দৃশ্য বা সমৃদ্ধি নয়,—নতুন সমাজ এবং নতুন ধরনের রাষ্ট্রের পরিকল্পনাও মুরের মাথায় এসেছিল। মুরের কল্পনার সেই আদর্শ দেশের ধারণা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বুদ্ধি ও যুক্তি অনুসারে মানুষের ভবিষ্যত যা হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন তা এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই গ্রন্থ তাঁর কল্পনার জগৎকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল। মানুষের শ্রমের যে উচ্চতম ধারণা তিনি এই গ্রন্থে রেখেছেন তা বোধহয় আজও অতিক্রম করা যায় নি। নব্যশিক্ষার আলোকে জ্ঞানী মানুষেরা মানুষের সমস্যার সমাধানের কোন বাস্তব উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শ্রম ও শ্রমিকের সমস্যা, অপরাধ প্রবণতার কারণ ও তার সমাধান,—ইত্যাদি হয়ে উঠেছিল গুরুতর চিন্তার বিষয়। রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা, সামাজিক অন্যায়, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা,—এগুলিই তখন মানুষের সমাজে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল। এসব থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? মুর তাঁর উটোপিয়া-তে যে আদর্শ জগতের ছবি এঁকেছিলেন, তাকেই সামনে রেখে এগিয়ে গেলে সমাজের পরিবর্তন, মানুষের পরিবর্তন সম্ভব। মুর কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। কল্পনাকে সুদূরপ্রসারী মঙ্গলের আকর্ষণ হিসাবে তাঁর কালের সমাজের সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন। তিনি আশ্চর্য ভবিষ্যদদ্রষ্টা ও মানবতাবাদী ছিলেন। ধনীর অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এত জোরাল প্রতিবাদ পৃথিবীতে খুব কম গ্রন্থেই হয়েছে। শাসনতান্ত্রিক নীতি-নিয়ম তৈরীর প্রতিষ্ঠানগুলি ধনীদের কুক্ষিগত। তারা সেগুলিকে তাদের নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করছে, এবং আইনপ্রনয়ণ হচ্ছে ধনীদেরই স্বার্থে। নির্ভীকভাবে তিনি একথা ঘোষণা করেছিলেন। যারা রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশী দিচ্ছে, প্রতিদানে তারাই পাচ্ছে সবচেয়ে কম, এই সত্যদর্শন 'উটোপিয়া'-রই শিক্ষা। 'পিয়ের্স প্লাউম্যান' এর পরে এর থেকে তীব্র এবং সত্যনিষ্ঠ প্রতিবাদ আর কখনও শোনা যায় নি। এই প্রতিবাদের রূপ ছিল সমসাময়িক সামাজিক দুর্নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র মানুষের বিবেকের সামনে তুলে ধরা। মানুষের মঙ্গল,—সামাজিক, শ্রমশিল্পগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সকলের জন্য, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য, আদর্শ ব্যবস্থা মুরের কল্পিত 'নেইকো দেশ'—এতেই আছে। সেখানে শ্রমসম্পর্কিত আইনের একটাই লক্ষ্য। তা হ'ল শ্রমিকের যথার্থ মঙ্গল। উৎপাদিত বস্তুর অধিকার সকলের; কিন্তু শ্রমদান

সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক। শ্রমিকের কাজের সময় সেখানে কমান আছে, যাতে করে বাকি সময়টা সে বুদ্ধিবৃত্তিক চিত্তবিনোদনে ব্যয় করতে পারে।

সমাজে অপরাধ প্রবণতারও সমাধান 'উটোপিয়া'তে আছে। দমন করে অপরাধ বন্ধ কবা যায না। অপরাধ করার প্রবৃত্তি যাতে না থাকে উটোপিয়াতে সেই ব্যবস্থার দিকেই বেশী নজর দেওয়া হয়েছে। যদি শিশুকে প্রথম থেকেই নৈতিক শিক্ষা না দেওযা যায়, তাহলে সে বড হয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হবে, এবং তখন দমনমূলক ব্যবস্থা দিয়ে তা বন্ধ করা যাবে না। মুরই প্রথম মানুষ যিনি অপরাধের সঙ্গে শাস্তির সামঞ্জস্যবিধানের পরামর্শ দেন। সাধাবণ চুরির জন্যও মত্যুদণ্ডের আইন মুরের সমসামযিক কালে এবং পরবর্তী প্রায় দুশ বছর ধরে ইংল্যাণ্ডের যে কি ক্ষতি করেছিল, তা আমরা সকলে জানি। মুর বলেছিলেন, পাপকে ধ্বংস করে মানুষকে বাঁচাতে। মানুষকে মেরে ফেলে সমাজকে কলুষমুক্ত করা যায় না। মানুষকে ভাল হবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

তখনকার অবস্থায়, ইংল্যাণ্ডের অর্ধেক মানুষ যেখানে ইংরাজী পডতে পাবত না, সেখানে, 'নেইকো দেশে' সরকারী ব্যবস্থাপনায শিক্ষাদান করা হচ্ছে। মুরের সমসাময়িক কালে ইংল্যাণ্ডের গরীব মানুষদের বাসগৃহ যেমন ছিল 'উটোপিযা'তেও তেমনই ছিল। কিন্তু উটোপিযার সমাজ অনুধাবন করলে যে আলো, বাতাস, স্বাচ্ছন্দ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে আসে শারীরিক স্বাস্থ্য, এবং তার থেকে আসে নৈতিক উন্নতি। উটোপিয়াতে রাস্তাগুলি কুড়ি ফিট চওডা, এবং বাডীগুলি উদ্যানশোভিত এবং সুন্দরভাবে পরিকল্পিত। বাডীগুলির গঠনে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থায়ীত্বের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

ঈশ্বর এবং ধর্ম সম্পর্কিত মতামতেব দিক থেকে মুরের মতামত একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। ঈশ্বর মানুষকে আনন্দ দিতে চেয়েছেন। সে আনন্দকে অবহেলা করা ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা। ধর্মাচরণে যাজকদের ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূণ নয়। প্রতিটি পরিবারই তার নিজস্ব ধর্মাচরণের মন্দির; বাইরে যাবার দরকার নেই। কোন গীর্জায গিয়ে পাপ স্বীকারের দরকার নেই; পরিবারের প্রধানের কাছে অকপটে নিজের অন্যায়কে স্বীকার করাই যথেষ্ট। আবার, সামাজিক ধর্মাচরণ ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরমত-সহিষ্ণুতার থেকে বড গুণ আর নেই। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। এমন কি নাস্তিকদেরও কোন শাস্তির দরকার নেই। নৈতিক পবিত্রতাই বড় কথা। এছাডা, ধর্মমতের প্রচার হবে যুক্তির ভিত্তিতে; শাস্তি ও নিগ্রহের ভিত্ততে নয়। কারুর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে যেমন হস্তক্ষেপ করা চলবে না, তেমনি আবার সর্বসাধারণের মিলিত অনুষ্ঠানে সকলে মিলে এমন স্তোত্র ও প্রার্থনা আবৃত্তি করবেন যা হবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। মূলনীতি হচ্ছে, সকলের আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিবেক একত্র মিলিত হয়ে এক সর্বধর্মসমন্বয়ে মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ গঠন করবে। তিনি আশা করেছিলেন, এইসব এবং অন্যান্য সমাঞ্জস্যমূলক এবং মঙ্গলজনক ব্যবস্থায় কোন মানুষের অসন্তোষ বা ক্ষোভ থাকবে না।

এমন একটি সমাজের আদর্শ যিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন তাঁকে শুধু সাহিত্যিক নয়, ঋষিকল্প ভবিষ্যদদ্রষ্টা হিসাবে আমরা শ্রদ্ধা করবো। সাহিত্যের মহত্তম সম্ভাবনা—মুর তাঁর জীবনে ও কর্মে দেখিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এই সঙ্গে, মুর যে তাঁর নিজের যুগের থেকে বহুদূর এগিয়ে ছিলেন একথাও আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো।

তিনি ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা যশস্বী হন নি। কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি ও নব্যজ্ঞানের সব চেয়ে উপযুক্ত অনুশীলনকারী হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যের নৈতিক মান তিনি অনেক উঁচুতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ, এই ধরনের স্বাধীন চিন্তার মানুষের সঙ্গে গতানুগতিক জগতের কারোরই আপোষ হয় না। অষ্টম হেনরী একদা ছিল তাঁর গুণগ্রাহী; কিন্তু সে-ই পরে তাঁর প্রাণদণ্ড দিয়েছিল।

আলোচ্য সময়ের ভিতর আর যা যা গদ্য লেখা হয়েছিল তা ধর্মীয় ব্যাপারে, এবং কিছু কিছু জাগতিক ব্যাপারে।

ক্র্যানমার (Cranmer) লিখেছিলেন প্রার্থনার বই। মুর (More) নিজে ইতিহাস অবলম্বনে বই লিখেছিলেন। ইলিয়ট (Elyot) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখেছিলেন। এসব বই-এর উল্লেখ সাহিত্যের ইতিহাসেই করা যায়। এদের নিজস্ব সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই।

নাটক

আবাব আমরা আগের খণ্ডে ফেলে আসা নাটকের কথায় ফিরে আসি। সরাসরি বাইবেলের ছোট ছোট ঘটনাকে অভিনয় করে দেখানোর বাইরেও আরও যে সব ধরনের উপাযের মাধ্যমে উৎসাহী মানুষেরা অভিনয দেখিয়ে ও দেখে আনন্দ পেতেন তাদের মধ্যে "মর‍্যালিটি" শ্রেণীর নাটক এবং কিছু কিছু গর্ভনাটিকার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এগুলির অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তা ছিল। গর্ভনাটিকাগুলির (Interlude ইনটারলুড) গুরুত্বের কথাও বলা হয়েছে। এই গর্ভনটিকাগুলির কোন কোনটিতে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র "চরিত্র"-এর আভাষ পাওয়া যায়। এছাড়া, উপস্থাপনের প্রয়োজনে নাটকের ছোট আয়তনের ভিতরেও "গানের" পরিকল্পনাও কোন কোনটিতে করা হয়েছিল। যেমন, ১৫৩৩ সালে মুদ্রিত এবং অভিনীত 'স্বামী জোহন, স্ত্রী টিব এবং পুরোহিত স্যার জন (Johan the husbande, Tyb his wife and Syr John the Preest)। এই ধরনের গর্ভনাটিকা এক হিসাবে দেশীয নাটকের উন্নততর পর্যায়।

পরবর্তী যে পর্যায় আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তা বোঝবার জন্য নাটকের মূল উদ্দেশ্যের কথা জানতে হবে। কাহিনীর ব্যক্তি বা ব্যক্তি চবিত্রকে অভিনেতা তার অভিনয়ের দ্বারা মূর্ত করবে। অপর কোন ব্যক্তিসত্ত্বাকে নিজের অভিনয়ের দ্বারা বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনার দ্বারা অভিনেতা দর্শকের মনে কুহক সৃষ্টি করবে। কোন মতে, দর্শক সেই কুহকের দ্বারা মোহগ্রস্ত হবে, বা অপর কোন মতে, দর্শক নিজের বিচারবুদ্ধি সচেতন রাখবে এবং অভিনয় যে অনুকরণ মাত্র তা বোঝবার শক্তি বজায় রাখবে। অভিনেতার কাজ সত্য ও মহৎ পরিস্থিতির সামনে দর্শককে দাঁড় করিয়ে দেওয়া; আর, দর্শকের কাজ, অনুসরণ ও উপলব্ধির দ্বারা সন্তোষ পাওয়া এবং অভিনয়ের অন্তঃস্থিত আদর্শ অস্তিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা।

তদানীন্তন ইংরাজী নাটকে ঘটনার ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থাপন এবং সেগুলির সজীবিকরণ, ভক্তি বা মুগ্ধতাকে পুনর্ব্যক্তকরণ, এবং চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি গঠন,—এই তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। পরবর্তীকালের নাটকের রীতি, ভঙ্গী, মহৎ উদ্দেশ্য—যা তার গঠনরীতি ও চরিত্র-সৃষ্টির দ্বারা, বা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অবস্থার বা পরিস্থিতির সারাংশ উপস্থাপনের দ্বারা বাঞ্ছিত শিল্পপর্যায়ে উন্নীত হয়—তা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরাজী নাটকে ছিল না। পরে প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেসো-ল্যাটিন আদর্শে নতুনভাবে নাটকের গঠন ও অন্তঃস্থ আবেদন তৈরী হল। কিছু সংখ্যাক ইতিহাস-নির্ভর নাটকে অবশ্য দেশীয় কথাকাহিনীর মিশেল ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের এই নতুন নাটকের আমদানী হল শিক্ষিত ইংরাজের দ্বারাই।

বিদেশ থেকে আমদানী নতুন উদ্দেশ্যের এবং নতুন গঠনের নাটক ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজী সংস্কৃতিকে যে উচ্চমানের আদর্শে প্রায় সম্পূর্ণ অধিকার করে ছিল তা জনপ্রিয়তার ঠিক কোন পর্যায়ে ছিল তা ভাবা দরকার। শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত নাটকগুলির চোখ ধাঁধানো আলোয় আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। সেগুলিতে যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু যথাযথ নয়, বিস্ময়কর। কিন্তু মর‍্যালিটি শ্রেণীর দেশীয় নাটকগুলি এবং অন্য কিছু কিছু নাটক, বিশেষ করে 'ইন্টারলুড'গুলির আকর্ষণ সাধারণ, অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছে খুব বেশী রকমই ছিল। বিদেশী আদর্শের নাটকগুলির বেশ কয়েকটির বড় আকর্ষণ ছিল দেশীয় ইতিহাস এবং দেশীয় কিংবদন্তীর ব্যবহার। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের কেউ কেউ একাধারে নব্যজ্ঞান বিকীরণ করতে এবং সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ করতে চেয়েছেন। কোন কোন কমেডিতে এবং ইতিহাসমূলক নাটকগুলিতে এই কাজ বহুল পরিমাণে সার্থক হয়েছে। ট্র্যাজেডিগুলির গ্রীক আদর্শ এবং নবাগত মানবিকতার আদর্শ এবং ল্যাটিন আলঙ্কারিকতা সাধারণ মানুষের কাছে সুবোধ্য ছিল না। বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী চমকপ্রদ কিছু কিছু নাট্যকীয় এ্যাকশন (Action) এবং সাজপোষাক, মঞ্চ প্রস্তুতের ব্যাপারে কিছু নতুনত্ব ইত্যাদি এই সব বিদেশী আদর্শের নাটকের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় ছিল। গ্রীস দেশে প্রাচীন নাটকগুলির জনপ্রিয়তার বিশেষ কারণ ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্ঞাত উৎসের আকর্ষণ। এছাড়া ছিল দেবতাদের প্রতি ভয় ও ভক্তি; এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে জাগতিক দিক থেকে শিক্ষাপ্রদ ও নীতিমূলক বিষয়। সব গ্রীক দার্শনিক ছিলেন না, কিন্তু বোধহয় সব গ্রীক-নাটক জনপ্রিয় ছিল দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নাটকগুলির সমীকরণের জন্য। গ্রীক ও ল্যাটিন আদর্শের ইংরাজী নাটক বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভা হতে পারে, কিন্তু জনপ্রিয় হবার জন্য, স্থায়ী হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। তবে ইংরাজী সাহিত্য জগতের অন্যতম সম্পদ 'কৌতুক ও রসিকতা' (Fun and Humour) বহুক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়েছিল।

'মর‍্যালিটি' (Morality) এবং 'ইন্টারলুড' (Interlude) শ্রেণীর নাটকগুলি বহু দিন ধরে সাধারণ ইংরাজের মনে আনন্দ দিয়ে এসেছিল; এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে

এই আনন্দ সম্পূর্ণ দেশজ লক্ষণে উৎকর্ষ পেয়েছিল। কিন্তু র‍্যানেইসঁস, এই সময়ে শিক্ষিত মানুষকে অন্য এক উৎসের সন্ধান দিল।

ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও শিল্পজগতে 'ক্লাসিক' (Classic) বলতে বোঝায় প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের আদর্শ। নাট্যশিল্পে এই আদর্শ এবং উদাহরণ প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মানুষের সামনে হাজির হ'ল এই ষোড়শ শতাব্দীতেই।

প্রাচীন গ্রীসের ট্র্যাজেডি ও কমেডির সংজ্ঞা এখানে দেওয়া দরকার।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে গুরুতর এবং সুসম্পূর্ণ অবিভক্ত ঘটনাপ্রবাহের অনুকরণ। এর গঠন হবে নাটকীয়। স্বাভাবিকভাবে ক্রমপরিণত কাহিনী দরদ এবং ভয় জাগিয়ে তুলবে। এই দরদ এবং ভয়ের ভিতর দিয়েই পুঞ্জীভূত আবেগ নিষ্ক্রান্ত হবে। বিশেষ কোন মানুষের উপর নিয়তির প্রভাব হবে প্রচণ্ড ও অমোঘ। এই মানুষটির কষ্টের জন্য আমাদের মনে সহানুভূতি আসবে; এবং আমরা সকলেই এইভাবে বিপন্ন হতে পারি এই বোধ দর্শকের মনে আতঙ্ক নিয়ে আসবে। যে মানুষটির ক্লেশ ও ধ্বংস দর্শকের মনে সহানুভূতি ও আতঙ্ক নিয়ে আসবে সেই মানুষটি "ভাল" বা "মন্দ" মানুষ নয়; সেই মানুষটি দর্শকেরই পরিবর্ধিত অস্তিত্ব।

আবার, কমেডিতে 'চরিত্র' এবং কাহিনী-ভিত্তি আমাদের জীবনের সচরাচর অভিজ্ঞতার থেকে কম গুরুতর হবে। কমেডিতে জীবনের হালকা হাসিখুসীর দিকটাই মঞ্চে উপস্থাপিত হবে।

প্রারম্ভিক এবং মধ্য স্তর পেরিয়ে এসে প্রাচীন এথেন্সে (Athens) নব্য কমেডির যুগে সামাজিক জীবন এবং আচার আচরণই কমেডির বিষয়বস্তু হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের প্রারম্ভিক স্তরের ও মধ্য স্তরের কমেডির কয়েকটি অদ্যাবধি রক্ষিত থাকলেও সরাসরি গ্রীক নব্যস্তরের কমেডি আমরা কিছুই হাতে পাইনি। গ্রীক নব্যস্তরের কমেডির আদল আমরা যা পেয়েছি তা ল্যাটিন অনুকরণের মধ্য দিয়ে। ল্যাটিন নাট্যকার প্লটাসের (Titus Maccius Plautus—টাইটাস ম্যাককিয়াস প্লটাস) ২২টি এবং টেরেন্সের (Publius Terentius Afar—পাবলিয়াস টেরেনসিয়াস এ্যাফার) ৬টি কমেডি আমরা পেয়েছি। এগুলির ভিতর দিয়েই নব্য স্তরের গ্রীক কমেডির (Greek New Comedy) সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করতে হয়।

এই 'প্লটাস' এবং 'টেরেন্স' ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে র‍্যানেইসঁস কমেডির আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। 'প্লটাস' এবং 'টেরেন্স'-এর গুরুত্ব দুদিকেই। তাঁদের মারফৎই নব্য স্তরের গ্রীক কমেডির ধারণা আমরা পাই; এবং ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজী কমেডির উপর তাঁদেরই প্রভাব বেশী। এঁরাই যেন মধ্যস্থতা করে প্রাচীন গ্রীসের নব্যস্তরের কমেডিকে র‍্যানেইসঁসের যুগের ইংল্যাণ্ডের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে (যেমন তার আগেও) দেশীয় জনপ্রিয় উপাদানে ও ধরনে তৈরী নাটক অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু নাটক গঠনের নীতি, এবং তা প্রয়োগ ও পরিবেষণার ধরন ইংল্যাণ্ডের নব্য নাট্যকাররা প্লটাস এবং টেরেন্স-এর কাছ থেকে পেলেন। প্রাক-খৃষ্টান এবং প্রাচীন কিন্তু নব-আবিষ্কৃত এই সব আদর্শ ষোড়শ

শতাব্দীর শিক্ষিত ইংরাজের কাছে প্রচণ্ড আকর্ষণীয় হিসাবে দেখা দিল। কিন্তু তাদের কেতাবী অনুকরণের দ্বারা দেশীয় নাটককে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। তাই ক্লাসিক আদর্শের প্রথম ইংরাজী কমেডি নিকোলাস উডাল-এর (Nicholas Udall ১৫০৬-৫৬) ১৫৫১ বা ১৫৫৩ সালের 'র‍্যালফ রয়স্টার ডয়স্টার' (Ralph Roister Doister) অন্য সব দিকে প্রাচীন ল্যাটিন কমেডির দ্বারা প্রভাবিত হলেও এর কয়েকটি চরিত্র এবং কৌতুক-পরিবেষণার ধরন সমসাময়িক ইংরাজ জীবন থেকেই নেওয়া হয়েছিল। কমেডির অন্তর্নিহিত নতুনত্ব বাইরের আপাতদৃষ্ট পরিচিত চেহারাকে বাদ দিতে পারেনি।

তবে অদ্যাবধি সংরক্ষিত পূর্ণাবয়ব ইংরাজী কমেডির সম্ভবতঃ প্রথম উদাহরণ 'গ্যামার গারটন-এর ছুঁচ' (Gammer Garton's Needle)। এতে 'অঙ্ক'-বিভাগ এবং নাটকীয় ছকের গঠন ছাড়া অন্য কিছুই প্রাচীন আদর্শ থেকে নেওয়া হয়নি। এর নাট্যকার কে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। সম্ভবতঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়ম ষ্টিভেনসন (William Stevenson) নামে কোন এক অধ্যাপক এটির নাট্যকার।

এই নাটকটিকেই সম্ভবতঃ পুরান ধারা এবং নতুনের প্রভাবের মাঝখানে রাখা যায়। এটি সম্ভবতঃ ১৫৫০ সালে লেখা হয়; তবে ছাপা হয় ১৫৭৫ সালে। এর চরিত্রগুলি ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্য মানুষের চরিত্র; বিদেশ থেকে কোন আদর্শ নেওয়া হয়নি। এটি নানা দিক থেকে একটি সার্থক প্রহসন। ১৫৫০ সালে বা তার অব্যবহিত পরেই এটি কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্টস কলেজে (Christ's) অভিনীত হয়। গল্প অংশটি এই রকম ঃ

কোন এক গ্যামার গার্টন তার ভৃত্য হজ (Hodge)-এর জন্য পাজামা (breeches) সেলাই করছিল। তার ছুঁচটা হঠাৎ হারিয়ে গেল। নানান বিভ্রান্তি, দোষারোপ, তর্কাতর্কি ইত্যাদির পরে সেটি আবার পাওয়া গেল। হালকা হাসির এবং মজার সুন্দর একটি নাটক। কথাবার্তা, ছড়া ইত্যাদি গতিশীল, প্রাণবন্ত, বাস্তব এবং খাঁটি ইংরাজী ধরনের। স্বভাবতঃই এই নাটিকাটির অন্তর্নিহিত শিল্পবস্তু আদৌ উঁচুস্তরের নয়, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এর একটা স্থান আছে।

নিকোলাস উডাল-এর র‍্যালফ রয়ষ্টার ডয়ষ্টার-এর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ল্যাটিন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত কমেডিগুলির মধ্যে এটিই প্রথম। ১৫৫১ বা ১৫৫৩ সালে এটি অভিনীত হলেও হয়ত লেখা হয়েছিল আগেই।

উডাল তাঁর ওযেষ্টমিনষ্টার স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে ল্যাটিন নাটক অভিনয় করানোর বদলে ল্যাটিন প্রভাবিত ইংরাজী নাটক অভিনয় করাতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই আলোচ্য কমেডিটি লিখেছিলেন। প্রধান চরিত্র র‍্যালফ তার আচার আচরণে দাম্ভিক, কিন্তু আসলে সে নির্বোধ এবং জড়বুদ্ধি। একদিকে হাস্যকর আবেগ এবং অন্যদিকে লোভ তার চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। সরাসরি ভাঁড় চরিত্রের মেরিগ্রিক (merrygreek) কিন্তু স্বাভাবিক। এগুলি ইটালির ক্লাসিক কমেডির বিভিন্ন চরিত্রের অনুকরণ। প্রধান মহিলা চরিত্র ডেম কনষ্ট্যান্স (Dame Constance) কিন্তু ব্যক্তিত্বপূর্ণ, বুদ্ধিমতী। দু'একটি পার্শ্বচরিত্র কিন্তু তদানীন্তন ইংরাজ সমাজ থেকে নেওয়া। নির্মল কৌতুক রসের এই নাটকটির নীতিশিক্ষা দর্শকদের মনে খুব একটা সাড়া জাগায় না। মোটের উপর নাটকটির ভাষা সুন্দর ও উপভোগ্য ইংরাজী।

এ'ছাড়া এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য কমেডি 'দ্য সাপোজেস' (The Supposes—১৫৬৬)। এটিই প্রথম গদ্যে লেখা কমেডি। এটি জর্জ গাসকয়েন-এর (George Gascoigne—১৫২৫-৭৭)।

নাটক অভিনয়ের তখনকার পরিস্থিতিটা একটু বিশেষ ধরনের। সখের আমুদে অভিনেতারা ছাড়াও তখন সবেমাত্র কিছু কিছু স্থায়ী অভিনেতার দল তৈরী হয়েছিল। এমন কি গতানুগতিক মর‍্যালিটি শ্রেণীর নাটকের ভিতরেও বিস্ময়কর বৃহৎ বিশ্বের ধারণা ঢুকে পড়েছিল। তবে তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার দক্ষতাসম্পন্ন নাট্যকার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে কেউ ছিলেন না।

আবার, প্রোটেস্ট্যান্টরা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'মির‍্যাকল' শ্রেণীর নাটকগুলির অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করায় সেগুলি আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকল। ফলে গোঁড়া ধর্ম সংস্কার-পন্থীদের জয় হল তা-ই নয়, ধর্ম সম্পর্কহীন নব্য নাটকের প্রসারেরও সুবিধা হল।

ইংরাজ দর্শক বরাবরই, নাটকের একেবারে শুরু থেকেই, নাটকের মাধ্যমে হাস্যকৌতুক আশা করে এসেছে। বিশেষ করে মর‍্যালিটি নাটকে হাস্যকৌতুকের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রায় সব সময়েই রাখা হত। এই হাস্যকৌতুকের জনপ্রিয়তাকে নাট্যকারকে অবশ্যই মনে রাখতে হত। জনসাধারণের চাহিদা থাকলেও কর্তৃপক্ষ এগুলিকে সুনজরে দেখতেন না, বা বলা চলে ঘৃণার চোখে দেখতেন। অনেক সময় বহুসংখ্যক দর্শকের ভিতরে প্লেগের আক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হত। তাই পেশাদার অভিনেতাদের ছোট ছোট দল ধনী এবং কৌতুকপ্রিয় পৃষ্ঠপোষক পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হত। শুধু অভিজাত সভাসদগণ নয়, রাণী এলিজাবেথ (রাজত্বকাল ১৫৫৮-১৬০৩) নিজেও এই সব অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। অভিনেতাদের কোন কোন দল নিজেদের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটা উপায় বার করলে। তারা বললে, —রানী তাদের অভিনয় দেখতে চান; সুতরাং অভিনয়ের বারবার অনুশীলনের দ্বারা তারা উন্নত ও মার্জিত হয়ে উঠতে চায়। তাই অভিনয় চালিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু এতেও তারা বাধা-বিপত্তি-নিষেধ সর্বতোভাবে এড়িয়ে যেতে পারল না। তখন বাধ্য হয়ে, ১৫৭৬ সালে, অভিনেতারা নিজেদের চেষ্টায়, লণ্ডনের ঠিক বাইরে শোরডিচের (Shoreditch) পোড়ো জমিতে প্রথম বাঁধা রঙ্গমঞ্চ তৈরী করলে। এই মঞ্চটি ১৫৯৮ সালে ধ্বংস হয়ে যায়।

এইভাবে নাটক, অভিনয়, দর্শক ও রঙ্গমঞ্চ,—এই চতুঃশক্তির সমাহারের দ্বারা নবযুগের নাটকের এবং অভিনয়ের সমস্ত রকমের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হল। প্রয়োজনীয় সর্ত পূরণ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রস্তুতির পূর্ণতা এসে যাওয়ায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার আবির্ভাবের আর কোন বাধা থাকল না।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরাজী ট্র্যাজেডিরও শুরু। ট্র্যাজেডির আদর্শ এসেছিল ইটালির ক্লাসিক নাটকের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের মধ্য দিয়ে।

প্রাচীন গ্রীসে ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল আমরা তা প্রকাশ করেছি। আমরা ট্র্যাজেডির তিন প্রধান নাট্যকার, —এসকাইলাস (Acschylus)-এর ৭টি, সফোক্লিসের (Sophocles) ৭টি, এবং ইউরিপাইডেস এর (Euripides) ১৭টি বা ১৮টি নাটক পেয়েছি। বাকি সব নষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রীক নাটকের রীতি ছিল একটি চরিত্রে একটি বিশেষ প্রকাশ-ধরণ আগাগোড়া বজায় রাখা, এবং আবেগজড়িত অথবা ভয়াল দৃশ্য দেখানোর বদলে গুরুগম্ভীর আলঙ্কারিক কিন্তু পরিমিত বাগ্মীতার ব্যবহার। এ বিষয়ে নির্দেশাত্মক সুবচন ছিল ঃ

'Let not Media Kill her sons on the stage.'। সেই অনুসারে গ্রীকমঞ্চে ভয়ানক ঘটনা বিবৃত করা হত, অভিনয় করে দেখান হত না।

কিন্তু দুহাজার বছর আগের ইটালির দর্শকদের সামনে ট্র্যাজেডিকে যে চেহারায় এনে ফেলা হল তাতে গ্রীক আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয়নি। গ্রীক নাটকের নিয়তিকে (Fate-ফেট) সেখানে প্রতিহিংসার (Revenge—রিভেঞ্জ) আকারে উপস্থাপন করা হল, এবং গ্রীক বিজ্ঞ ও পরিমিত উক্তির বদলে দীর্ঘ বক্তৃতা ও বাগাড়ম্বরকে প্রাধান্য দেওয়া হল। এই বক্তৃতায় নিয়তিবাদের দার্শনিকতার বদলে রক্তোন্মাদ প্রতিহিংসাপ্রিয়তাকে রাখা হল। নাটকের লক্ষণ এবং লক্ষ্য হল তুলনায় সঙ্কীর্ণ ধাতের; এবং যে ধরনের তেজী বিকাশ তাতে ফোটান হল তা সাধারণ মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার অধিগত। মোটের উপর ট্র্যাজেডির মান নিম্নগামী করা হলেও মানুষের হিংস্র প্রকৃতির জনপ্রিয় প্রতিফলন তাতে দেখা গেল। প্রাচীন ইটালির ট্র্যাজেডিব এই আদর্শ সবচেয়ে বেশী করে প্রকাশ পেযেছিল সেনেকার (লুসিযাস আন্নিউস সেনেকা-Lucius Annacus Seneca খৃঃ পূঃ ৩ ৬৫ খৃষ্টাব্দ) লেখাগুলিতে। তাঁর নাটকে প্রচণ্ড সন্ত্রাশ, চরিত্রচিত্রনে সামঞ্জস্যহীন অতিরিক্ততা, এবং বক্তব্যে অতিশযোক্তি প্রাধান্য পেল।

১৫৫৯ সাল থেকে সেনেকার ল্যাটিন নাটকগুলির ইংরাজী অনুবাদ হতে থাকে। তাঁর দশখানি নাটক আমার হাতে পেয়েছি। এগুলি ছিল পড়বার জন্য, অভিনয়ের জন্য নয। ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজী ট্র্যাজেডিগুলি সৃষ্টিব পেছনে সেনেকার প্রভাব খুব বেশী।

যেমন সেনেকার যুগের রোমে তেমনি ষোডশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে মানুষ নিষ্ঠুরতা, যন্ত্রণা, বর্বর পাশবিক কার্যকলাপ দেখতে ভালবাসত। একই সঙ্গে, রোম্যান ক্লাসিক আদর্শের সাহিত্যেরও আকর্ষণ ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড ছিল। তাই সেনেকার প্রচণ্ড জান্তব শক্তিসম্পন্ন জোরাল বর্ণনা মানুষের আত্মশ্লাঘাও যেমন মিটিয়েছিল, তেমনি ঘটনা ও বর্ণনা তাদের মনের সমধর্মী ছিল। প্রসঙ্গতঃ, ষোড়শ শতাব্দীর শিক্ষিত ইংরাজ সেনেকার কাব্যে প্রাচীন গ্রীসের অনুকরণ পেয়েছিল বলে মনে করেছিল। কিন্তু গ্রীক নাটকের সর্বকালীন আদর্শ এবং মূলনীতিগুলির প্রায় কিছুই সেনেকার নাটকে ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে সেনেকার নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার মত ছিল না। কিন্তু ষোড়শ শতকের উচ্চশিক্ষিত ইংরাজরা বর্বর মানসিক গঠন এবং বিশাল কল্পনার সঙ্গে একটা উদ্দাম সজীবতা তাঁদের নাটকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেনেকা একটা আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল। কিন্তু দেশজ পরিচিত পটভূমিকাকে প্রথমেই বাদ দেওয়া যায়নি।

১৫৬১ বা ১৫৬২ সালে টমাস স্যাকভিল (Thomas Sackville—১৫৩৬-১৬০৮) এবং টমার্স নর্টন (Thomas Norton) প্রথম ইংরাজী ট্র্যাজেডি 'গর্বোডাক' (Gorboduc) বা 'ফেরেক্স এবং পোরেক্স' (Ferex and Porrex) লেখেন। নাটকটিতে একের পর এক লোভ ও প্রতিহিংসাজনিত হত্যার রগরগে ঘটনা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি চরিত্রে একটানা উদ্ঘাটন এবং নাটকীয় গতি নেই। সেনেকার নাটকের মত এখানেও মানুষের লক্ষণ সমন্বিত চরিত্রের বদলে লক্ষণ বা পরিচয়কে মানুষের নাম দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার আর একদিকে মর‍্যালিটি নাটকের মত নির্দেশাত্মক (নীতিশিক্ষাদানের) ভঙ্গীও বিভিন্ন অংশে অনুসরণ করা হয়েছে।

এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি 'জোকাস্টা' (Jocasta—১৫৬৬)। এর লেখক জর্জ গ্যাসকয়েন (George Gascoigne-১৫২৫-৭৭)। কমেডি প্রসঙ্গে এঁর নাম আমরা আগেই করেছি।

নতুন দার্শনিক ও সাহিত্যিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় মানুষের জানা জগতের ভৌগোলিক প্রসারও হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। হাকলুইট (Hakluyt ১৫৫২-১৬১৬) নব-আবিষ্কৃত জগতের তথ্য সাধাবণের সামনে হাজির করে বিস্ময় ও আনন্দের জোয়ার এনে দিলেন ইংরাজী সাহিত্যে। তবে আরও আগে রিচার্ড ইডেন (Richard Eden) বিদেশী অভিযান-আবিষ্কার ইত্যাদির কাহিনীর অনুবাদ করে ইংরাজ মানসকে এক বিশাল বিস্ময়ের সামনে হাজির করিয়ে দিয়েছিলেন।

এইভাবে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে এক প্রকান্ড, সমৃদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যের শুরু হল,—পরবর্তীকালে যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বহুবিস্তৃত সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা ইংরাজী সাহিত্যের চূড়ান্ত ও উন্নত রূপের দেখা পাব যা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর, গভীর থেকে গভীরতর, বিচিত্র থেকে বিচিত্রতররূপে মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে বরেণ্য হয়েছে।

উপসংহার

(ক) আয়ার্ল্যাণ্ড

ইংল্যাণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমে আইরিশ সাগর। তার পশ্চিমে মোটামুটি বড়সড় দ্বীপ আয়ার্ল্যাণ্ড। ৫২° ও ৫৫° উঃ অক্ষাংশ এবং ৫° ও ১১° পঃ দ্রাঘিমা রেখার মাঝখানে আয়ার্ল্যাণ্ড দ্বীপ। এর উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর, আর পূর্বে আইরিশ সাগর। আয়ার্ল্যাণ্ডের বর্তমান লিখিত ভাষা ইংরাজী, এবং মৌখিক ভাষাও আঞ্চলিক বিশেষত্ব সত্ত্বেও ইংরাজী। ভৌগোলিক দিক থেকে এটি গ্রেট বৃটেন বা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এর উত্তরের কিছু অংশ বৃটিশ মূল ভূখণ্ডের যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দ্বীপের চার-পঞ্চমাংশ নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র 'আইরিশ ফ্রি ষ্টেট'।

বর্তমান ইংরাজী ভাষা জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রাচীন ইংল্যাণ্ড (ব্রিটন), স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, কর্নওয়াল ও আয়ার্ল্যাণ্ডে কেল্টিক ভাষার নানা শাখা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বৃটানিক ভাষা বর্তমান ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস, কর্নওয়াল ইত্যাদিতে প্রচলিত ছিল। স্কটল্যাণ্ড, ম্যানদ্বীপ এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে গেলিক (Gaelic) ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃটানিক ও গেলিক ভাষা একই কেলটিক ভাষাগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বর্তমানে এবং অতীতে ইংল্যাণ্ডের ভাষার সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাষার তেমন কোন দূরত্ব ছিল না।

প্রাচীন কেল্টিক সংস্কৃতির আধুনিক কালে পুনঃপ্রচারের কথা বাদ দিলে, গত কয়েকশ' বছর, বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, আইরিশ সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যেরই অংশ। যে ভাষায় গোল্ডস্মিথ (১৭২৮-৭৪) এবং ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩১) কবিতা লিখেছেন ; যে ভাষায় বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০), জে. এম. সিনজ (১৮৭১-১৯০৯), সিন ও কেসি (১৮৮৪- ১৯৬৪) নাটক লিখেছেন; যে ভাষায় জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর উপন্যাস লিখেছেন তা ইংরাজী ভাষা না হয়ে যায় কি করে! তাই ইংরাজী সাহিত্যের ধারা বিচারে ত্রুটি থেকে যাবে যদি আয়ার্ল্যাণ্ড-এর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোন পরিচয় না হয়। আমাদের বর্তমান চেষ্টা আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন সাহিত্যকে অনুসরণ করে ইংরাজী সাহিত্যের মূল স্রোতে তা মিশে যাওয়া পর্যন্ত তার গতি লক্ষ্য করা। এ অভিজ্ঞতা ইংরাজী সাহিত্যের ধারা উপলব্ধিতে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন গেলিক ভাষার গভীর ও রহস্যময় শিহরণের অভিজ্ঞতা প্রায় পুরাপুরিভাবে পরবর্তীকালের ইংরাজী ভাষায় লেখা আইরিশ সাহিত্যে থেকে গেছে। সুতরাং জনমানসের মূল চেতনার দিক থেকে গেলিক ভাষা ও সাহিত্য আয়ার্ল্যাণ্ডের ইংরাজী সাহিত্যের পূর্বপুরুষ। দৃঢ়সঙ্কল্পে, আসমুদ্র বেদনায়, স্বপ্নকুহেলীমাখা আইরিশ সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যেরই এক বিশিষ্ট রূপ।

আয়ার্ল্যাণ্ডে কেল্টিক কৃষ্টি কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা সঠিক করে বলা যায় না। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লা টেন' (La Tene) সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বহিরাগত মানুষেরাই আয়ার্ল্যাণ্ডে বসবাসকারী প্রথম কেল্টিক মানুষ। এরা মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের দ্বিতীয় লৌহযুগের মানুষ। এদের প্রাচীনতম ভাষার নাম দেওয়া হয়েছে 'গয়ডেলিক' (Goidelic)। কেল্টদের এই শাখার নাম 'গয়ডেল' (Goidel)। ইংরাজীতে শব্দটির বর্তমান উচ্চারণ 'গেলিক' (Gaelic)। ওগাম (Ogham) বর্ণমালায় এর সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন সমাধির গায়ে অধুনা অপ্রচলিত ওগাম বর্ণমালায় উৎকীর্ণ অল্পস্বল্প নিদর্শন। এগুলি খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর ব্যাপার। ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীরও অল্প কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তবে প্রাচীনতর পাণ্ডুলিপির পাতার মার্জিনে শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে কিছু কিছু কথা অষ্টম শতাব্দীতে রোম্যান হরফে লেখা হয়েছিল।

আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহিত্যকে চারটি যুগে ভাগ করা হয়—

প্রাচীন যুগ—দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত,

মধ্যযুগ—ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত,

তৃতীয় যুগ—উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর কেল্টিক বিষয়গুলির প্রতি আগ্রহের দরুণ ওইগুলির সঙ্গে নবপর্যায়ের পুনঃ পরিচয়।

আধুনিক আইরিশ সাহিত্যের সূত্রপাত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে।

কবিতা

প্রাচীন আয়ার্ল্যাণ্ডে একধরনের পুরোহিত শ্রেণীর মানুষের পেশা ছিল ব্যবহারযোগ্য মন্ত্র ইত্যাদি এবং কিছু সুবচন তৈরী করা। এইসব মানুষদের বলা হত 'ফিলি' (fili)। এঁরা ছিলেন প্রাচীন 'গল' এবং প্রাচীন বৃটেনের ড্রুইড-দের (Druid) মত। এইসব ড্রুইড, ভেট (Vatc) বা বার্ড-র (Bard) পদ্যে রাজা বা প্রধানদের কীর্তিকলাপ লিখতেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদিতে এঁদের খুব গুরুত্ব ছিল। তদানীন্তন তথ্যসমৃদ্ধ লোককাহিনী এঁরাই তৈরী করতেন। বাস্তবতা এবং হৃদয়বৃত্তি,—এই দু'এর চর্চাই এঁরা করতেন,—এবং তা-ই তৎকালীন সাহিত্য। খৃষ্টধর্মের প্রসারের দরুন ধীরে ধীরে এঁদের ধর্মীয় কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলেও দেশীয় শিক্ষা ও লোককাহিনী পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে সঞ্চার করার কাজে এঁদের থেকে গিয়েছিল, এবং তা খৃষ্টীয় চার্চের ধর্মীয় অনুশাসন এবং লিখিত পাণ্ডুলিপির থেকে একেবারে আলাদা ছিল। তবে আয়ার্ল্যাণ্ডের খৃষ্টান সাধুরা দেশীয় সংস্কৃতির এই মৌখিক সাহিত্য নষ্ট করে দিতে চান নি; বরঞ্চ সেগুলি লিখে রাখতে চেয়েছিলেন। এই খৃষ্টান সাধুদের দ্বারাই প্রথম দিককার আইরিশ সাহিত্য সংরক্ষিত হয়েছিল। তখনকার আয়ার্ল্যাণ্ডের নানা লোককাহিনী, উপকথা, আইনকানুন, বংশপত্রিকা এবং কিছু কিছু পদ্য এইভাবে স্থায়ীত্ব পেয়েছিল। তবে অধিকাংশ লেখা অবশ্য প্রধানতঃ গদ্যের আকারেই বজায় রাখা হয়েছিল।

কবি পুরোহিত ফিলিরা ভয়েরও বস্তু ছিলেন। তাঁদের দাবী পূরণ না করলে তাঁরা তীব্র গালিগালাজপূর্ণ ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক পদ্য লিখতেন। যাঁর উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করা হত তাঁর সম্ভ্রম নষ্ট হত। এই ধবনের ব্যাঙ্গাত্মক পদ্যকে 'ডের' (Der) বলা হত।

প্রথম দিকের লেখা পদ্যগুলি পরবর্তীকালের সাহিত্য এবং আইনকানুন সম্পর্কিত প্রামান্য লেখাগুলির মধ্যে মধ্যে ধরা আছে। নানা অবস্থান্তরের ফলে পদ্যগুলির মূলরূপ কিছু কিছু পালটে গেছে বা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর সেন্ট কোলাম্বা-র (St. Columba আঃ ৫২১-৫৯৭) বন্দনা প্রাচীনতম পদ্যগুলির একটি। অলঙ্কারযুক্ত ছোট ছোট বাক্য অনুপ্রাস দিয়ে যুক্ত। এটি সম্ভবতঃ প্রাচীন আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান কবি ডালান ফরগেলের (Dallan Forgaill) রচনা। আইসল্যাণ্ড এবং নরওয়ের ধাঁচের প্রাচীন কাহিনীমূলক পদ্যগুলিও (সাগা—Saga) ওই একই ধরনে রচিত হয়েছিল। মাত্রাবিশিষ্ট ছান্দোবদ্ধ কবিতার প্রথম দিকেব উদাহরণগুলি প্রাচীন জার্মানিক কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাতে দুটি করে অর্ধ-পঙক্তি অনুপ্রাস দিয়ে যুক্ত। সপ্তম শতাব্দী থেকে অন্ত্যমিল সুরু হয়।

তখন একই স্বরবর্ণ পর পর দুই পঙক্তির শেষে ব্যবহার করা হ'ল, সিলেবলগুলির দৈর্ঘ্য সমান রাখা হল, এবং উচ্চারণভিত্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সমশ্রেণীভুক্ত করা হ'ল।

এরপরে এল সাত বা আট সিলেবল-এর চার চার লাইনের স্তবক। এতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে মিল থাকল। এটি আসলে ল্যাটিন স্তোত্রের ছন্দ। চতুষ্পদী স্তবক পরে দুই দুই পঙক্তিতে ভাঙ্গা হ'ল। এখানে শ্লোকের প্রতিটি পঙক্তিতে মিল থাকল। এভাবে চতুষ্পদী স্তবককে দুভাগে ভাঙ্গার নাম হ'ল 'ডিবাইড' (debide)।

ফিলিরা (fili) কোন কোন সময়ে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট চালে কবিতা লিখেছিলেন। তবু তা খৃষ্টান ধর্মীয় কবিতার থেকে কম জীবন্ত ছিল না। দশম শতাব্দীতে দেড়শ'টি কবিতায় বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাস লেখা হয়। এর নাম 'সালটার' (Psalter)। কিন্তু আইরিশ কাব্য সাহিত্যের বাস্তব গৌরব নিহিত রয়েছে বহু অনামী কবির রচনায়। যেমন, একটি সাদা বিড়ালকে (পাঙ্গুর—Pangur) উদ্দেশ্য করে লেখা একটি কবিতা। এসব কবিতায় ছন্দের জটিলতা ছিল না। বহু শতাব্দী ধরে আয়ার্ল্যাণ্ডে যে সরল স্বচ্ছন্দ ভাষার ব্যবহার চলে আসছিল, তাতেই এই সব কবিতা লেখা হয়েছিল। এতে অর্ন্তদৃষ্টির যে সজীবতা ছিল ফিলিদের কবিতায় তা, ছিল না।

তবে ফিলিরা নানা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারতেন। যেমন, একাদশ শতকের একটি 'সমুদ্র' সম্পর্কিত কবিতা। এটির ভূমিকা, বিষয়-নির্বাচন এবং রূপকালঙ্কার স্ক্যাণ্ডিনেভীয় প্রভাব নির্দেশ করে। প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতার এই বিশেষ ধরনের মধ্য দিয়ে গীতি-কবিতা, প্রাচীন কাহিনীমূলক কবিতা এবং ঋতুবৈচিত্র্যের গান দেশীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করতো। এগুলি ছিল সূক্ষ্ম-সংবেদ্য।

আবার মঠবাসী বা নির্জনবাসী আইরিশ খৃষ্টান সন্ন্যাসীরাও প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতা লেখায় প্রেরণা জুগিয়েছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সন্ত ফ্রান্সিস-এর (St. Francis) অনুগামী ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা যে ধরনের গান বাঁধতেন এই কবিতাগুলি প্রায় সেই ধরনের। মঠবাসী কাব্য-ইতিহাস সংগ্রহকারীদের কাছে এগুলির আবেদন ছিল, এবং তাঁরা সেগুলির সংরক্ষণও করেছিলেন।

ফিলিদের (fili) আর একটি কাজ ছিল,—অতীত ইতিহাস লিখে রাখা। প্রথম দিকের অনেক কবিতাই ছিল ছন্দোবদ্ধ বংশতালিকা। তারপর, বিভিন্ন তথ্যের সারসংক্ষেপ লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা যখন অনুভব করা গেল, তখন সেগুলিও কবিতার আকারে লেখা হতে থাকল। একটি দীর্ঘ কবিতায়,—'ইমেন'-এর যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব যোদ্ধা জড়ো হয়েছিলেন (The Warriors who were in Emain—'Fianna bater in Emain—কিয়ান্না বাতার ইন ইমেন)—কবি কিনেড উয়া আটাকেন (Cinaed Ua Artacain) উক্ত প্রাচীন কাহিনীর সারসংক্ষেপ করেছিলেন।

আর একজন কবি ফ্ল্যাণ্ড মেনিস্ট্রেচ (Fland Mainistretch) সেই সব ফিলিদের বংশ তালিকা লিখে রেখেছেন, যাঁরা আয়ার্ল্যাণ্ডের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে বর্হিজগতের সমকালীন ইতিহাসকে পাশাপাশি দেখিয়ে গিয়েছিলেন।

পদ্য এবং গদ্যের আর একটি সংগ্রহ 'ডিনডসেনক্যাস' (Dind Shenchas)। এতে নবম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যুক্ত উপকথাগুলি সংগ্রহ করা রয়েছে। এতে কবিতা আগে উল্লিখিত 'ডিবাইড' (debide) আকারে লেখা। অন্ত্যমিলযুক্ত এই সব কবিতা বহু বিষয় সহজে মনে রাখতে সাহায্য করে।

এর পরে, আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের কথায় আমরা আসতে পারি। দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই এর শুরু বলা যায়। মঠের সন্ন্যাসীরা গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপির নকল আগের মতই করে চলেছিলেন। প্রাচীনতর সাহিত্যের যতখানি ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বেঁচেছিল তা এঁদেরই নিষ্ঠার ফলে সংরক্ষিত হতে পেরেছিল। কিন্তু সংরক্ষণের কাজ ছাড়াও নতুন সাহিত্যসৃষ্টির কাজও চলছিল; এবং তা দেশীয ভাষায়। কাব্যের গঠনের বৈচিত্র এই নতুন কবিরা আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পর বংশগতভাবে কবিপরিবার সৃষ্টি হ'ল। এঁদের বলা হল বার্ড (Bard)। এঁদের বলা যেতে পারত 'কবি সম্মেলনের সদস্য'।

প্রাচীন গেলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যতদিন ছিল ততদিন এই 'বার্ড'-দের হাতেই দেশের সাহিত্য বজায ছিল। প্রথম থেকেই এই 'বার্ড'-রা খৃষ্টীয় প্রভাবমুক্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে এই 'বার্ড'-দের বংশের ছেলেরা সেণ্ট-ফ্রান্সিস- এর অনুবর্তী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে থাকল। এর কারণ বোধহয় এই যে ফ্রান্সিসকান সাধুরা দেশের ঐতিহ্য রক্ষার কাজ নিজেরাই গ্রহণ করেছিলেন।

ক্রমে বার্ডরা কাব্যের বিভিন্ন দিকের সংস্কার শুরু করলেন। ভাষা ক্রমে আধুনিক হ'ল। নানা ধরনের ছন্দ যা ফিলিরা ব্যবহার করতেন, তার সংখ্যা কমিয়ে আনা হ'ল। তাল বা মাত্রার উপর আরও বেশী নিয়ন্ত্রণ এল এবং বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হতে থাকল। কবিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হ'ল। কবির পৃষ্ঠপোষক বা ঈশ্বরের স্তুতিবাদই প্রধানতঃ কাব্যের বিষয় হ'ল। যিনি পরবর্তী জীবনে এই বার্ডেব পেশা গ্রহণ করবেন তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা নিতে হত। তারপর তিনি পৃষ্ঠপোষকের খোঁজ করতেন। মঠ মন্দিরের দানের উপর তাঁরা আর ভরসা করতেন না।

প্রথম দিকের এরকম একজন বার্ডের নাম পাওয়া যাচ্ছে, 'মুইরিধাক আলবানাক' (Muircadhuch Albanach)। ইনি 'ও ডালে' (O Dalaigh) বংশের একজন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইনি একটি সুন্দর শোকগাথা লিখেছিলেন।

একজন করসংগ্রহকারীকে হত্যার স্বপক্ষেও তিনি উত্তেজক কবিতা লিখেছিলেন।

নর্মানরা আইরিশ সাহিত্যে 'শিষ্টাচারসম্মত প্রেম'-এর কবিতার আদর্শ নিয়ে আসে। তবে ওই ধরনের কবিতাতে বার্ড-রা দেশীয় সৌষ্ঠব দান করেন, এবং তাতে এক আত্মহারা বিহ্বলতা ফুটে ওঠে। এই ধরনের কবিতাকে 'ডাণ্টা গ্রাধা' (Dunta Gradha) বলা হত। আর এক ধরনের কবিতাকে বলা হত 'ক্রোসানাক্ট' (Crosanacht)। এগুলির মধ্যে মধ্যে গদ্যে কৌতুক ও ব্যঙ্গ ছড়ান থাকত।

গদ্য

প্রাচীন আইরিশ মহাকাব্যধর্মী সাহিত্য ছিল গদ্যে লেখা কাহিনী। কাহিনী-সম্পর্কিত নয় এরকম কিছু কিছু পদ্যও কথোপকথনের ধাঁচায় এর মধ্যে মধ্যে ছড়ান থাকত। প্রাচীন সংস্কৃতের মহাকাব্যধর্মী রচনার সঙ্গে এই রচনার ধরনের মিল আছে। তাই এই প্রাচীন আইরিশ সাহিত্যের আদি উৎস মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেই পাওয়া যেতে পারে

এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। পুরান ঐতিহ্য সম্ভবতঃ প্রাচীন গেলিক সাহিত্যে বহুদিন অনুসরণ করে আসা হয়েছিল। প্রাচীনতম গদ্য কাহিনীগুলি বাচনিক ঐতিহ্য থেকে প্রথম লিখিতরূপ পেয়েছিল সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে। নবম ও দশম শতাব্দীতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় আক্রমণগুলির জন্য লিখিত কাহিনীগুলি ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়নি। বিভিন্ন খৃষ্টান মঠে এগুলিকে সংগ্রহ করে রাখা একাদশ শতকের আগে সম্ভব হয়নি। জনজীবনের অস্থিরতার দরুণ এই সব সংগ্রহের ব্যাপারে উপযুক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ হয়নি।

গদ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকের "মেটে রঙের গরুর গল্প" (লেবর না হুইড্রে—Labor Na Huidre—The Book of the Dun Cow)। পরে 'দি বুক অব লিনষ্টার—The Book of Leinster)—এতেও একই কাহিনী অন্যভাবে দেওয়া আছে। এতে আদিম সমাজের ছবি ধরে রাখা আছে। রথে চড়ে যুদ্ধ, যুদ্ধজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে শত্রুর ছিন্নমুণ্ড, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরোহিতদের সম্ভ্রম, পবিত্র বা অপবিত্রবোধে নিষিদ্ধ স্বতন্ত্র বিষয় বা বস্তুর ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা,—এই সব কিছু ওই জাতীয় গ্রন্থে আছে। তথ্য প্রমাণভিত্তিক উৎসগুলিতে এ'সবের উল্লেখ নেই।

বিভিন্ন গদ্য লেখার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'আলএড'-দের সম্পর্কে নানা কাহিনী (Ulaid Cycle)। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে আলষ্টার (Ulster) প্রদেশের নাম এদেরই নাম থেকে এসেছে। আলএড বা আলষ্টার সম্পর্কিত কয়েকটি নাম যেমন, 'রাজা কনচোবার' (Conchobar), বালক যোদ্ধা 'কু চুলেন' (Cu Chulainn), 'কনট-এর রাণী মেব' (Medb, queen of Connaught), ভাগ্যহত প্রেমিক 'নয়সি ও ডিরড্রে' (Noisi and Deirdre)—প্রাচীন আইরিশ সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই 'আলএড' কাহিনীগুচ্ছের থেকেই নানা উপাদান নিয়ে আইরিশ গদ্য মহাকাব্য 'কুলি-র গবাদি পশু আক্রমণ' (Tain Bo Cuailngo—The Cattle Raid of Cooley)। আলএড-এর কাহিনীগুলিব সমবায়ে 'Tain' (টেইন) মহাকাব্য প্রথম সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় বীর কু চুলেন-এব বীরত্বের বর্ণনা আকর্ষণীয়। আবার এই উৎস-গ্রন্থ 'টেন' (Tain) থেকে নেওয়া বিভিন্ন উপাদানের অন্যান্য গ্রন্থে কালানুক্রমিক নানা ব্যবহারের পারস্পরিক তুলনা করলে সাহিত্যে প্রাচীন আইরিশ-ষ্টাইলের ক্রমাবনতি বোঝা যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে ট্রয় (Troy) এবং আলোকজাণ্ডার-কে (Alexander) নিয়েও কাহিনী বচিত হয়েছে। 'ফিন' (Finn)-এর কাহিনী খুব প্রাচীন। কিন্তু তা' নিয়ে গ্রন্থ রচনা হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীর পরে। 'সুইবনে গিলট'-এর (Suibne Geilt) নামের সঙ্গে যুক্ত 'বনবাসী দুরন্ত মানুষ'-এর (Wild-man-of-the-Woods) নানা কাহিনী ষ্ট্র্যাথক্লাইড (Strathclyde) নামক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এইখানেই আইরিশ সাহিত্য এবং দক্ষিণ বৃটেনের সাহিত্য পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল।

নির্দেশমূলক, জীবনীমূলক এবং খৃষ্টান ধর্মোপদেশ সম্বলিত সাহিত্য কিন্তু প্রথম থেকেই ল্যাটিন-প্রভাবিত। এই ধরনের সাহিত্য এবং কাহিনী উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু ছিল

না। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসাবে এগুলির দাম আছে। দিব্যদৃষ্টি (Vision)-সংক্রান্ত সাহিত্যও ছিল। যেমন, 'ফিস এ্যাডামনেন (Fis Adamnain) অর্থাৎ 'এ্যাডামনেন-এর দিব্যদৃষ্টি'। তবে এই ধরনের সাহিত্যে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

আইরিশ সাংস্কৃতিক জীবনে তত্ত্বের স্থান খুব উঁচুতে। প্রেরণার প্রকৃতি, ভাষার উৎস, ছন্দ, ষ্টাইল, ব্যাকরণ, কবির মর্যাদা,—ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা প্রাচীন কাল থেকেই আইরিশ সাহিত্যে চলে আসছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং তারপরে আয়ার্ল্যাণ্ডের বীরনাযক 'ফিন' (Finn), 'ওইসিন' (Oisin), 'কেওইলট' (Caoilt) এবং অন্যান্যদের নিয়ে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। কেওইলট 'গাভ্রা' (Gabhra) যুদ্ধের বীর, এবং পরে সন্ত প্যাট্রিক-এর সঙ্গী। ফিন-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি আলষ্টার (Ulster) কাহিনীগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। এইসব কাহিনী 'ফিলি'-দের হাত থেকে 'বার্ড'-দের হাতে যখন পড়ল তখন তা গুরু পুরোহিত সম্প্রদাযের আওতার বাইরে চলে এল এবং জনসাধারণের ভিতর বহুল প্রচারিত সাহিত্যের রূপ নিল।

এছাড়া, চতুর্দশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় লোককাহিনী অনেক সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর এল নানা অনুবাদের যুগ। মার্কো পোলো, ম্যানডেভিল, প্রেসটার জন (Prester John), গাই অব ওয়ারউইক (Guy of Warwick), এবং আর্থার সম্পর্কিত কাহিনীগুলির আইবিশ ভাষায অনুবাদ হল। খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা নানা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক এবং ভক্তিমূলক লেখার আইবিশ অনুবাদ করলেন। ছন্দ এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত লেখাও কিছু প্রকাশ পেল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে মূল দেশীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য যেন কিছুকালের জন্য স্থগিত রইল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ছাপাখানার কল্যাণে মহাদেশের নানা সাহিত্য এবং নানা প্রবণতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। তবে লিখিত ভাষায় গণশিক্ষা সীমিত থাকায দামী ভেল্লাম-এর (Vellum—চর্মপত্র) উপর হাতে লেখা সাহিত্য ধনী সংখ্যালঘুদের মধ্যেই কিছুদিন সীমাবদ্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি আইরিশ সাহিত্য আর তত আত্মসর্বস্ব হয়ে থাকল না,—বৃহৎ ইংরাজী সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত হযে গেল।

উপসংহার

(খ) ম্যাঙ্কস এবং কর্ণিশ সাহিত্য (Manx and Cornish Literature)

ম্যাঙ্কস সাহিত্য

মেভানিয়া বা ম্যান (Mevania or Man) দ্বীপ ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে প্রায় সমদূরবর্তী। এটি আইরিশ সাগরের একটি নাতি বৃহৎ দ্বীপ। এই দ্বীপের ভাষা ও সাহিত্যকে বলে ম্যাঙ্কস (Manx)। নবম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে গেলিক ভাষার (Gaelic) স্বাধীন বিকাশ সম্ভব ছিল। তারপর থেকে ১২৬৬ সাল পর্যন্ত এখানে নরওয়েজীয় ভাষার আধিপত্য ছিল। আবার ১৩৩৩ সাল থেকে এ্যাঙ্গলসদের আধিপত্য সুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে যখন এখানকার মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের সুযোগ আসে তখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে যেমন অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে

একটা কবি-সম্প্রদায় (Bards) গড়ে উঠতে পেরেছিল এখানে তা হয়নি, কেননা শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানকার মানুষের স্বাধীনভাবে ভাষা বিকাশের মত পরিস্থিতি ছিল না। আর, সাহিত্য বলতে যা আমরা পাই তা কিছুটা অনুবাদ সাহিত্য, আর কিছুটা লোকাচার (folklore)।

এই সব 'লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি' গাথা, পল্লীগীতি (Ballad) এবং আনন্দভজনগীত (Card—ক্যারল)-এর আকারে বর্তমান ছিল। 'ক্যারল'কে এখানে 'কারভেল' (Carvel) বলা হত। আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় বীর ফিন-এর (Finn) শত্রু 'ওরি'র (Orree) দুর্ভাগ্য অবলম্বনে একটি অতি জনপ্রিয় গান (Ballad) প্রচলিত ছিল। এটি সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ পল্লীকবি ওসিয়ান-এর (Ossian) দ্বারা রচিত।

১৫০৭ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপের ইতিহাস ম্যাঙ্কস ব্যালাডের আকারে তৈরী হয়েছিল। ম্যাঙ্কস ভাষায় অনুবাদগুলির কদর এখানে এখনও আছে। ইংরাজী ভাষা ও ম্যাঙ্কস ভাষার পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে এখানে একটি মিশ্র ভাষা তৈরী হয়েছে।

১৬১০ সালে ওয়েলসম্যান বিশপ জন ফিলিপস এর (John Phillips) দ্বারা, এবং ১৭৬৫ সালে এই দ্বীপেরই পুরোহিতদের দ্বারা 'চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের' ১৫৪৯ সালের 'দি বুক অব কমন প্রেয়ার' (প্রোটেস্ট্যান্ট মত প্রচারের উপযোগী ইংরাজী প্রার্থনা পুস্তক)—The Book of Common Prayer—ম্যাঙ্কস্ ভাষায় অনূদিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ম্যাঙ্কস্ ভাষায় 'পুরাতন ও নূতন বিশ্বাসের কাহিনী-র (Old and New Testaments) এবং এমনকি, বাইবেলের অপ্রামাণিক অংশসমূহেরও (Apocrypha) অনুবাদের কাজ চলেছিল। তাছাড়া 'এই দ্বীপের ইতিহাস', মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট'-এর অনুবাদ, 'ঈশপস ফেবলস'-এর গল্পের অনুবাদ—ইত্যাদিও আধুনিক কাল পর্যন্ত লেখা হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য এই দ্বীপের লিখিত ভাষা প্রধানতঃ ইংরাজী।

কর্ণিশ সাহিত্য (Cornish Literature)

ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কর্ণওয়াল উপদ্বীপ। দুটি কাউন্টি (জেলা),—ডেভন (Devon) এবং কর্ণওয়াল (Cornwall) নিয়ে কর্ণওয়াল উপদ্বীপ। হাজার বছর আগে ঐ অঞ্চলকে 'পশ্চিম ওয়েলস' (West Welsh) বলা হত। মৌখিক ভাষায় বেশ কিছু লোক এখনও এখানকার আদি কেলটিক ভাষা ব্যবহার করে। লিখিত ভাষার প্রবণতা ইংরাজীর দিকে।

বৃটানিক ভাষার বর্তমান উত্তরাধিকারী ওয়েলস এবং কর্ণওয়ালের ভাষা।

প্রাচীন কর্ণিশ ভাষার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দশম শতাব্দীতে বডমিন নামাঙ্কিত 'খৃষ্টীয় সুসমাচারের' মার্জিনে এবং ১০৮৬ সালের জরিপ সংক্রান্ত নথির মার্জিনে, অথবা ওই সময়ে প্রচলিত ল্যাটিন গ্রন্থগুলির বা দ্বাদশ

শতাব্দীর ল্যাটিন-এ্যাংলোস্যাকসন গ্রন্থগুলির সঙ্গে যুক্ত শব্দকোষে, কিছু ব্যক্তি বা স্থানের নাম।

তারপর, মধ্যযুগে, ১৪০০ সালের কাছাকাছি সময়ে লেখা একটি নাটকের মাত্র ৪১ লাইনের একটি ছিন্ন অংশ পাওয়া গেছে। একটি মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময়ে তার গুণাবলী এবং আচার ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু কথা। মধ্যযুগের 'মির্যাকল' (সাধুসন্ন্যাসীদের অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ) এবং 'মর‍্যালিটি' নাটকের (নীতি উপদেশ সংক্রান্ত) অক্ষত বা আংশিক পাণ্ডুলিপিও কিছু পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকের লেখা 'অরডিনালিয়া' (Ordinalia)। এটি পরস্পরযুক্ত তিন নাটকের একটি সমাহার। এটি ফরাসী 'প্যাশন' (Passion) জাতীয় নাটকের মত। এই ধরনের নাটকে যীশুর অন্তিমকালীন কষ্টের কথা থাকে। নাটক-ত্রয়ীর নাম ঃ 'অরিগো মাণ্ডি' (Origo Mundi-জগতের উদ্ভব), 'প্যাশিও ডমিনি নষ্ট্রি জেশু ক্রিষ্টি' (Passio Domini Nostri Jhesu Christi) এবং 'রেজারেক্সো ডমিনি নষ্ট্রি জেশু ক্রিষ্টি' (Resurrexio Domini Nostri Jhesu Christri)। নাটক তিনটি পরপর তিন দিন কোন ক্রীড়া উদ্যানে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

আর একটি সমজাতীয় নাটকের ২৫৯টি স্তবক পাওয়া গেছে।

এছাড়া গ্ল্যাসনে-র (Glasney) ধর্মশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গীর্জার পুরোহিত সম্প্রদায়ের এক সদস্য ডমিনাস হাডটন (Dominus Hadton)-এর লেখা বলে অনুমান করা হয় এমন একটি জীবনীগ্রন্থ 'সন্ত মেরিয়াসেক-এর জীবনী' (বিউন্যানস মেরিয়াসেক—Beunans Meriasek) ১৫০৪ সালের একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে।

প্রোটেষ্ট্যান্টদের ধর্মসংস্কার এই সব নাটকের প্রেরণাকে নষ্ট করে দিয়েছিল ; কিন্তু তার বদলে কর্ণওয়ালের সাহিত্যে নতুন কিছু যোগ দিতে পারেনি।

বাইবেল বা 'সাধারণ প্রার্থনা-পুস্তক' কর্নিশ ভাষায় অনুবাদের চেষ্টাও খুব জোরদার হয়নি। ফলে, যারা কর্নিশ ভাষা আঁকড়ে থাকবার, থেকে গেল, কিন্তু অনেকেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের দিকে ঝুঁকল।

বর্তমানে কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মৌখিকভাবে ও লিখিত আকারে পুরানো কর্ণিশ ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করেছেন।

পরিশিষ্ট

মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে ক্রমশঃ বেশী বেশী করে মানুষ যে বই পড়ায় আগ্রহী হচ্ছিল ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ইংরাজী ভাষার প্রসারের ক্ষেত্রে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগের ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি এবং সামাজিক সচেতনতা ষোড়শ শতাব্দীতে ভাষার পরিবর্ধনের পক্ষে সহায়ক পরিস্থিতি তৈরী করেছিল।

র‍্যানেইসঁস যে কেবল প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির দিকে মানুষের

দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল তা-ই নয়, অনেক রোম্যান্স শব্দের (ফরাসী, স্প্যানিশ এবং ইটালিয়ান) সঙ্গে নৈকট্য এনেছিল। আবার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইসব রোম্যান্স শব্দের বানান পুরানো সমার্থক ল্যাটিন শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে পালটে গিয়েছিল। যেমন, 'দেনা' অর্থে Dette পালটে গিয়ে Debt ; অথবা 'সন্দেহ' অর্থে 'Dout' পালটে গিয়ে 'Doubt' হয়েছিল। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ল্যাটিন, এবং বিশেষ করে 'গ্রীক' শব্দের বহুল আগম হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার নানা ধরনের কাজ ব্যাকরণের অনুশাসনে ইংরাজী ভাষায় স্থায়ী হয়ে গেল। যেমন 'Do' ক্রিয়া।

অনুরোধের ব্যাপারে জোর দেওয়ার জন্য—Do Come।

● নেতিবাচক বাক্যে জোর দেওয়ার জন্যে—I did not say it।

এখানে ক্রিয়ার মূল অংশের ঠিক আগেই 'Do'-এর স্থান।

● প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে—Does he think so? ইত্যাদি।

এই সময়ে ক্রিয়ার প্রথম পুরুষ একবচনের ক্ষেত্রে সংযুক্ত অংশ হিসাবে '-eth'-এর বদলে '-s' এর ব্যবহার শুরু হল।

বিশেষ্যের ক্ষেত্রে শব্দগুচ্ছের করণকারক একটি নতুন প্রক্রিয়া। আগেকার, 'Duke's niece of Gloucestier'-এর বদলে এখন প্রচলিত হল 'Duke of Gloucester's niece'।

বিশেষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ, বচন ও কারকের পার্থক্য ভিতরে থাকলেও বাইরে ধীরে ধীরে তার প্রকাশ কমে এল। তবে '-তর', '-তম' বোঝনোর জন্য প্রধানতঃ '-er', '-est' প্রত্যয় যোগ অথবা 'more', 'most'—ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহার পাকাপাকি হয়ে গেল।

সর্বনামের ক্ষেত্রে এই সময়ের কিছু পরে কয়েকটি পরিবর্তন আসে। তখন থেকে 'Thou', 'Thy', 'Thee'-এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃকারকে 'ye'-র বদলে 'you'-এর ব্যবহার হতে থাকে। It'-এর করণকারকে 'Its'-এর ব্যবহার শুরু হয়।

এগুলির দ্বারা যেমন সর্বনামের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি সম্বোধনের ব্যাপারে বৈষম্য পরিত্যাগ করা হয়েছিল। মধ্যম পুরুষে, সকলের ক্ষেত্রেই মর্যাদাসূচক বহুবচন 'you' (কর্তৃকারক ও কর্মকারক) এবং 'your' (করণকারক) ব্যবহারের দ্বারা ভাষায় ভদ্রতা প্রকাশের ক্ষেত্র বেড়ে যায়। এটি আধুনিক ইংরাজী ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

ইংল্যাণ্ডে ইংরাজী ভাষার পূর্ণ স্বীকৃতি হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। ল্যাটিনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও দেশীয় ভাষার উপযোগিতা ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই বুঝতে পারেন। তবে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত অমূল্য গ্রন্থগুলিরও পরিচয় পাওয়া দরকার ছিল। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে অনুবাদের একটা হিড়িক পড়ে গেল।

ইংরাজী ভাষাতেও ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা সমন্বিত গ্রন্থাদি লেখা হতে শুরু করল।

বানানের ক্ষেত্রে, উচ্চারণ এবং ব্যবহৃত অক্ষরের মধ্যে সামঞ্জস্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখা হতে লাগল। ১৫৮২ সালের রিচার্ড মুলকাষ্টার (Richard Mulcaster)-এর 'এলিমেণ্টারি' (Elimentaric) নামক গ্রন্থে সমস্ত বানানকে কতকগুলি মূল নীতির মধ্যে আনার চেষ্টা মোটামুটি সফল হয়েছিল।

তবে ব্যাকরণের নির্দিষ্ট অনুশাসন বা সংরক্ষণের থেকে এ যুগে নানা উৎস থেকে বহুসংখ্যক শব্দসংগ্রহ বিশেষ করে চোখে পডবার মত।

ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের সম্মানসূচক সমতার ভিত্তিতে যোগাযোগের ফলে ইংরাজী ভাষায় নানান অভিজ্ঞতা ও বর্ণনা প্রকাশের প্রয়োজন আগের চেয়ে বেশী করে দেখা গেল।

তা-ছাড়া বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সহজে প্রকাশ করার জন্য ভাষাকে ক্রমাগত শব্দ সংগ্রহের কাজ করে যেতে হল ; এবং তাকে বিচিত্র অর্থপ্রকাশের উপযোগী করে তোলার দায়িত্বও ইংরাজ-সমাজের উপর এসে পডল।

আবার, জাতীয় গৌরববোধের জন্য এবং স্বনির্ভরতার জন্য ল্যাটিন শব্দের পাশাপাশি ইংরাজী শব্দকে পরিবর্তরূপে রাখা হতে থাকল,—কোথাও একই অর্থে এবং কোথাও সামান্য ভিন্নতর অর্থে। সেই সঙ্গে ইংরাজী ভাষার ভবিষ্যৎ বিশালতার যেন প্রস্তুতি হিসাবে প্রয়োজনীয় শব্দসম্ভার অন্য ভাষা থেকে ইংরাজী ভাষায় একই উচ্চারণে নিয়ে আসার কাজ পুরোদমে শুরু হযে গেল। এই শেষোক্ত কাজটি আজও সমানভাবে বজায় থাকত যদি না পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষ নিজেদেব ভাষার সঙ্গে ইংবাজী ভাষা মিশিয়ে মিশ্রভাষা ব্যবহারের দিকে শখ করে ঝুঁকে পডত। অর্থাৎ, বর্তমানে ইংরাজকে অন্য ভাষা তত বুঝতে হয় না ; অন্য ভাষাভাষীরা ইংরাজী ভাষা বুঝে নেয। এতে ইংরাজী ভাষা ক্রমপ্রসারণের থেকে, আধুনিককালে, অন্য ভাষাভাষীদের আগ্রহে, আন্তর্জাতিক রূপ নেওয়ার দিকে বেশী এগিযে চলেছে।

র‍্যানেইসঁস যে জ্ঞান এবং যে প্রেরণা মানুষের ভিতর ছড়িযে দিল তা অনুসরণ করবার জন্য ইংরাজী ভাষাকে সমৃদ্ধিতর করারও প্রয়োজন দেখা দিল। প্রয়োজনীয় ল্যাটিন শব্দগুলির সঙ্গে যুক্ত নানা অনুষঙ্গী ও গূঢ়ার্থ ইংরাজী শব্দগুলিতে ছিল না। সুতরাং অন্য ভাষার নানা শব্দের আমদানির দরকার হ'ল। এতে ঋণ করার দীনতা প্রকাশ পায়নি ; বরঞ্চ মাতৃভাষার সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল।

আবার, একই ভাষা থেকে একই শব্দের বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত রূপগুলিকে আমদানি করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝান হতে থাকল। এতে মূল ভাষায় যেখানে কোন বিশেষ অর্থে কোন শব্দের সর্বশেষ পরিবর্তিত রূপটিই শুধু থেকে গেল, সেখানে ইংরাজী ভাষায় সামান্য পরিবর্তিত অর্থে একাধিক শব্দযুক্ত হল, এবং ভাষার শব্দ সংখ্যা বাড়ল।

ক্রমোন্নতিশীল বৃহৎ জগতের নতুন নতুন ধারণা, অভিজ্ঞতা ও উপকরণ বোঝানোর

জন্য বহু নতুন শব্দ ইংরাজী ভাষায় ক্রমাগত যুক্ত হয়ে চলল। এই গ্রহণ ও আত্মস্থ-করণের ধারাবাহিকতা ইংরাজী ভাষার প্রাণবন্ত ও ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরাজী ভাষা তার আধুনিক ও স্থায়ীরূপ পেয়েছিল। তবে ব্যাকরণের নিয়ম, নতুন শব্দের আগম ও ব্যবহার, বানান, উচ্চারণ, —ইত্যাদি ব্যাপারে এখনও সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদি চলেছে।

গ্রন্থের সামগ্রিক পর্যালোচনা ও পরবর্তী পর্যায়ের ইঙ্গিত

ইংরাজী জাতির সাহিত্য মানসের একটি সুন্দর ছবি পাঠকপাঠিকাদের মনশ্চক্ষের সামনে যথাসাধ্য তুলে ধরা গেল। এত অল্প পরিসরে (গ্রন্থটিতে আলোচিত) নয়শ বছরেরও বেশী সময়ের ইতিহাসে প্রতিফলিত একটি জাতির নন্দন সত্ত্বার পরিচয় দেবার চেষ্টা বাতুলতা। তবু বাঙালী পাঠকের হাতে গ্রেট বৃটেনের মানুষের শতশত বছরের মর্মবাণীর ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও যে উপহার দিতে পারা গেল তার জন্য গ্রন্থকার হিসাবে আমি আনন্দিত। ঘটনা, শিল্পী ও শিল্প নিদর্শনের তলে তলে মানবমনের যে চিরন্তন আত্মবিকাশের উদ্যম অতীত থেকে বর্তমানে, এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে মন্দাকিনী ধারায় বয়ে চলেছে তাকে বোঝানোর জন্যই আমার এই দুর্বল প্রচেষ্টা। সুরতরঙ্গ কখনও উচ্চ নিনাদে বেজেছে, কখনও বা তা মৃদু কলস্বনা, কিন্তু সর্বাংশেই তা পবিত্র। মানুষের প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখে মানুষের সুন্দর সৃষ্টি এই সাহিত্য বহু অসৌন্দর্য, ধ্বংস ও ঘৃণাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে, এবং এগিয়ে যাচ্ছে। একে উপলব্ধি করা আমাদের প্রত্যেকের মূল চেতনাকে উপলব্ধি করা এবং বিশ্বব্যাপী মানবসত্ত্বাকে স্বীকৃতি দেওয়া।

সাহিত্যে এই মূলচেতনা অগ্রসরমান প্রতিটি পদক্ষেপকে তার আগের ও পরের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে, প্রতিটি লেখককে তার পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর সঙ্গে একই বিবর্তনের সূত্রে বেঁধে রাখে, এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি যুগের সাহিত্য নিদর্শনকে তার উদ্ভব ও উত্তরণের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই সাহিত্যিক চেতনা নানা দেশের নানা জাতির নিজস্ব প্রকৃতি এবং বিশ্বব্যাপী মানবসত্ত্বা উভয়কেই অবলম্বন করে। সাহিত্যিক চেতনা এমনই জিনিষ যে অন্য দেশগুলির ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না রেখেও সাহিত্যিক সেই অজানা ভাষা ও সংস্কৃতির ধারকদের সবাই-এর কাছে নিজের কথা বলতে পারেন, কেননা মূল মানবিক চেতনা এবং সাহিত্যচেতনা সর্বত্রই এক। এই চেতনার স্রোত কোথাও আধুনিক স্তরে পৌঁছে গেছে, কোথাও এখনো পুরানো ভাবনা ও মূল্যায়নের সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে আসতে পারে নি। কিন্তু ভিত্তিস্তবের চেতনার প্রকৃতি সর্বত্র এক।

মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাহিত্যিক চেতনার ভিন্ন ভিন্ন গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু কতকগুলি বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যে পশ্চিমী জ্ঞান ও

পশ্চিমী ধরনের সাহিত্যিক আদর্শ আমরা আমাদের দেশে ধীরে ধীরে আমাদের সাহিত্যিক কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রসারণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি তা এদেশে পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম ফল। এবং এই পরবর্তী ব্যাপারটিও বহুলাংশে ইউরোপীয় রাজনৈতিক আধিপত্যের ফল। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন মনীষির দূরদৃষ্টি, উদারতা এবং বিজ্ঞতা। এর জন্য আমাদের সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্য হয়ে যায়নি। প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা ছেড়ে দিলেও গত ৫০০ বছরের এদেশেরই রাজসভার সাহিত্য ও লোকসাহিত্য আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলিব পশ্চাদপট। আর তাদের সামনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যে উত্তরণের আকর্ষণ।

ঠিক তেমনি আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য প্রাচীন কেল্টিক ঐতিহ্য, উত্তর জার্মানিক ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয় প্রকৃতি, নর্ম্যাণ্ডির বাবুয়ানা, ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব এবং বিশ্বের নানা সাহিত্যের আদর্শের এক বিচিত্র সমন্বয়। এর দ্বাবা কেউ ছোটবড় হয়ে যায় নি। সুবৃহৎ ইংরাজী সাহিত্যের ভিতর সবগুলিরই যথাযোগ্য স্থান আছে।

আমি আর একদিকে ভেবেছি। প্রকাণ্ড ক্ষমতাবান জাতির সাহিত্য, দুর্বল জাতির সাহিত্য, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায দক্ষ জাতির সাহিত্য, পরাধীন জাতির সাহিত্য, দাম্ভিক মানসিকতার সাহিত্য, —ইত্যাদি। এখানে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যকে একই মাপকাঠিতে মাপা বা তার প্রকৃতি নিরূপণে একই সূত্র বজায রাখা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব নয়। স্পেনেব ফ্যাসিবাদের পক্ষেও সাহিত্যিকরা ছিলেন; বার্সিলোনাব সরকাবের পক্ষেও সাহিত্যিকরা ছিলেন। সাধারণ সূত্র কি পাওয়া যাবে! সাহিত্য বহির্ভূত নানা আদর্শ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করবে। কিন্তু একটা বিশ্বাস স্থিব রাখতে হবে। মহাকালের বিচার অমোঘ, বাধ্যতামূলক। আশা করতে হবে; অপেক্ষা করতে হবে। উদ্বিগ্ন হলে চলবে না। নির্মল সাহিত্যের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভাবী আরও এই কারণে যে দেশে দেশে, দিশে দিশে সাহিত্য শুধু পরস্পরের প্রতিবেশী নয়, একই মানবিক চেতনায় অভিষিক্ত।

এবার ব্যক্তিত্বের কথা বলি। কোন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তাঁর নিজের যুগের দ্বারা সৃষ্ট এবং পূর্ববর্তী যুগগুলির সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের পরিণত ফল। আবার, তাঁকেই অনুসরণ করে পরবর্তী যুগ হয় সক্রিয ও ফলপ্রসূ। কিন্তু কোন সৎসাহিত্যিকই ফেলনা নয়। নিরবধিকাল, বিপুলা পৃথ্বী সব সৎ সাহিত্যিকেরই নির্বস্তুক সত্ত্বাকে ধরে রাখে। আরও একটি কথা। কোন সাহিত্যিকই স্বয়ম্ভূ নন। বহুকাল সঞ্চিত মানবিক প্রজ্ঞা ও বোধ কারো ক্ষেত্রে মাটিব প্রদীপের আলোয় স্নিগ্ধ দ্যুতি ছড়ায়, কারো ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বিদ্যুতে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব যাই হোক, বহুযুগের চেতনার প্রকাশ সকলের ভিতর দিয়েই। অংশ বড়ই হোক, ছোটই হোক,—তা সামগ্রিকতার অন্তর্ভুক্ত।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং তার পরের যুগের শক্তিশালী সাহিত্যকে আমরা পরবর্তী খণ্ডে লিপিবদ্ধ করবো।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংরাজ রাণী এলিজাবেথ এবং সপ্তদশ শতাব্দী'র গোড়ার থেকেই স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত রাজা জেমস শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। দুজনের

মধ্যে নানা পার্থক্য। কিন্তু সাহিত্যস্রোত অব্যাহত। সেক্সপীয়র নিজেই দুজনের রাজত্বকালেই কাজ করে গেছেন। এই সময়ের সাহিত্যিকদের কেউ কেউ বাজ বা রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন, কেউ বা রাজসিংহাসনের কাছে ঘেঁসতে পারেন নি। কিন্তু দুদলের সাহিত্যিকই পরস্পরের ভাবগত আত্মাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই সঙ্গে সব সাহিত্যিকেরই সাহিত্যিক অভিমান ছিল পুরোদমে, এবং জাতীযতার গর্ব ছিল ষোল আনা। ধর্ম সম্বন্ধে অবশ্য বেশী নিষ্ঠা অনেকেরই ছিল না। সাহিত্যিক অভিমান এবং জাতীযতাব গর্ব কিন্তু এসেছিল সাহিত্যের পথে তাডাতাডি এগিযে যাওযার বাসনা থেকে ; ইউরোপের অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেবাব জন্য। এটি সাহিত্যিক চেতনার উপলব্ধির এবং নিজেদের অবস্থানের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের প্রমান। যুদ্ধ, অভিযান, আবিষ্কার ইত্যাদি নানা ঘটনা শক্তিশালী প্রেরণা দান করেছিল। প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্য সম্পর্কে বিস্ময ও আগ্রহ দেখা দিযেছিল। সেই সঙ্গে সমসামযিক অন্যান্য ইউরোপীয সাহিত্যেব উৎকর্ষও আত্মসাৎ করবাব প্রলোভন ছিল। আমার তো মনে হয এতে সর্বাত্মক সাহিত্য চেতনা যা ফুটে উঠেছিল তা পরে প্রতিযোগীর থেকে বেশী করে সহযোগীর চরিত্র পেযেছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে আধুনিক সাহিত্যের বিশ্বজাগতিক প্রসারে শুধু ইংরাজী সাহিত্যের নয, সব সাহিত্যেরই মর্যাদাপূর্ণ স্থান সুরক্ষিত হযেছিল।

আমাদের গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে একটি বিশেষ দেশে সেই বিশ্বসাহিত্যেব অঙ্কুর কিভাবে উদ্ভিন্ন হযে উঠছিল তা আমরা প্রত্যক্ষ করবো।

তা ছাডাও, এই ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের সাহিত্যে ব্যক্তিমানুষকে যথাযোগ্য প্রাধান্য দেওয়া হযেছিল। এই মানবিক চিন্তার পুরোভাগে ছিলেন সেক্সপীয়র। ভাল অথবা মন্দ, নাযক অথবা খলনাযক সকলেই যে আলাদা আলাদা ভাবে বিশিষ্ট সত্ত্বার প্রকাশ—এটি এই যুগ থেকেই অতি স্পষ্ট করে বোঝা যেতে থাকল। পরে এই পথ ধরেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রাধান্যের অনুপাত নির্দিষ্ট হযেছিল। এই যুগেই পূর্বতন বহুযুগের অনেক একঘরে বিষয়কে নিষেধের আড়াল থেকে মুক্ত করা হয়েছিল।

আর, সর্বোপরি, পরবর্তী খণ্ডে আলোচ্য যুগেই র‍্যানেইসঁস বা 'পুনর্জাগরণ' উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আবার, ওই একই যুগের শেষ দিকে আপাত অদৃশ্যভাবে তার পতনও সুরু হয়েছিল। র‍্যানেইসঁসের প্রত্যক্ষ 'আন্দোলন' চিরকাল থাকতে পারে না। কিন্তু তা মানুষের মনে একটা গতির সঞ্চার করেছিল যা আধুনিক ও রক্ষণশীল সমস্ত বৃটিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বহুকাল ধরে পরিচালিত করেছিল। র‍্যানেইসঁসের আন্দোলন বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় ভরপুর। সারা ইউরোপের এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক আন্দোলন ইংরাজী সাহিত্যে যেভাবে প্রকাশ পেযেছিল, তা যে কোন সাহিত্য-পথিকের জানার বিষয়। আমরা তা যথাসম্ভব সহজ বর্ণনায় উপস্থিত করবো।

পাঠকপাঠিকাদের কাছে আমাদের অনুরোধ বর্তমান গ্রন্থটির পরিকল্পনা যদি আপনাদের ভাল লাগে তবে আমরা পরবর্তী খণ্ডে নতুন উৎসাহে তাঁদের মনের খোরাক যোগানোর জন্য সচেষ্ট হব। তার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করতে পারাটাই হবে আমাদের বাঞ্ছিত পুরস্কার।

গ্রন্থের এই খণ্ডের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

A. C. Baugh : Literary History of England
V. De. S. Pinto : The English Renaissance
A. Nicoll : British Drama
A Compton-Ricket : A History of English Literature
Legouis and Cazmian : History of English Literature
A. C. Baugh : A History of the English Language
W. H. Hudson : An Introduction to the study of Literature
Otto Jespersen : Growth and Structure of the English Language
: Encyclopaedia Britanicca
: The Cambridge History of English Literature

চার পর্বে (খণ্ডে) বিন্যস্ত গ্রন্থের প্রথমভাগ এখানে শেষ হল।

BRITAIN
IN THE MIDST
of
THE ENGLISH CONQUEST
NORTHFOLK
EAST
ANGLIA
Southfolk
ESSEX
Surrey
Dorsæta
London, Macmillan & Co. Ltd.

ENGLAND
in the
NINTH CENTURY
EAST
ANGLIA
Essex
Surrey

ইংরাজী সাহিত্যের আলোকধারা

দ্বিতীয় ভাগ

আধুনিক যুগ

[দ্বিতীয় পর্ব]

মধ্য গগনে র‍্যানেইসঁস

[১৫৭৬—১৬৫০]

সূচীপত্র

আধুনিক যুগ [দ্বিতীয় পর্ব]

মধ্য গগনে র‍্যানেইসঁস [১৫৭৬—১৬৫০]

।। মধ্য গগনে র‍্যানেইসঁস ।।

১৫৭৬—১৬৫০

যুগের পরিচয়

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক,—এই মিলিয়ে যে পঞ্চাশ ষাট বছর সময় তা বেনজীর হঠাৎ-সমৃদ্ধির এক যুগ। নতুন জ্ঞান এবং বিস্ময় এই যুগকে এক অসামান্য তীব্রতা এবং উন্মাদনা এনে দিযেছিল। অজানাকে জানার অপ্রশম্য ও দুনির্বার আকর্ষণ, ভৌত পৃথিবীর দ্রুত গতিতে অভূতপূর্ব বিস্তাব এবং রহস্যময সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা মানুষকে পুবান জ্ঞানেব সীমানা ভেঙ্গে ফেলতে উৎসাহ দিযেছিল। অপসৃযমান দিগন্তের রহস্য মানুষের মনে যুদ্ধজযেব উৎসাহ এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এনে দিযেছিল। যে ইংবাজ জাতি এতকাল ইউরোপে প্রায় অবহেলিত ছিল সে আজ জাতীয গৌরববৃদ্ধিব শক্তিশালী প্রেরণা পেযে গেল। চোখ ধাঁধানো নানা অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ল সমসাময়িক ইংরাজী সাহিত্যে। জাতীয সাহিত্য হঠাৎ যেন দুঃসাহসিক, দৃঢসঙ্কল্প, যৌবনমদমত্ত হযে উঠল। এই যুগ ইউবোপেব শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির সঙ্গে ইংবাজ জাতিব এবং ইংরাজী সাহিত্যের সমপর্যাযে উন্নযনের যুগ। এই যুগকেই ইংরাজী সাহিত্যেব ইতিহাসে প্রথম রোম্যান্টিক যুগ বলে বলা হয।

এখানে, 'বোম্যান্টিক' এবং 'রোম্যান্টিকতা' সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধাবণা পাওযা দবকার। দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ভাষাগুলি প্রধানতঃ ল্যাটিন ভাষা থেকেই এসেছিল। এবং যেহেতু ল্যাটিন ছিল প্রাচীন রোমের ভাষা, তাই দক্ষিণ ইউরোপের ওইসব ভাষাগুলিকে 'রোম্যানস' ভাষা (Romans) বলা হয। বড রোম্যানস (Romans) ভাষাগুলি হচ্ছে ইটালিয়ান, ফরাসী ও হিসপানিক। এই সব ভাষায লিখিত সাহিত্যকে বলা হযেছিল 'রোম্যান্টিক' (Romantic)। 'রোম্যান্টিক' কথাটি ইংরাজী ভাষায সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও প্রচলিত ছিল না। পরে, শুধু ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যই নয়, প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্যেরও বিশেষ বিশেষ অংশকে 'রোম্যান্টিক' বলা হয়েছে। আবার, সপ্তদশ শতাব্দীতে সমসাময়িক ইংরাজী সাহিত্যের বহু নির্দশনকে যে 'রোম্যান্টিক' বলা হয়েছে তা তাদের প্রশংসা করে নয়; বরঞ্চ নিন্দা করেই, বলা চলে। যাক, সে পরের কথা। তবে সাহিত্যের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই বিভিন্ন রচনায় প্রাধান্য পাচ্ছিল। সেগুলি ছিল অবিশ্বাস্য ধরন, অসংযম, মিথ্যাচরণ এবং অবাস্তবতা। সংযম, বাস্তবতা ও যুক্তিবাদের সঙ্গে তুলনা করে সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যের এই সব ত্রুটি দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে, মানবমনের চিরন্তন সত্ত্বায় কল্পনার যে আধিক্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হযে আছে তাকেই 'রোম্যান্টিকতা' বলে সাদরে বরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে কয়েক শতাব্দী ধরে মানব চরিত্রের একটা বিশেষ

লক্ষণ, যা কল্পনার আধিক্য এবং সম্মোহনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তাকেই 'রোম্যান্টিকতা' বলা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যের বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে হবে।

এই সময় নানা ধর্মীয় মতের (খৃষ্টধর্মের নানা শাখার) নেতাদের পারস্পরিক কলহ থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ যে ধর্মমতকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন তা পিউরিটান বা ক্যাথলিক কোনটাই নয়,—তা ছিল ইংল্যাণ্ডের স্বাধীন ধর্মীয় সত্ত্বার ঘোষণা। ইংল্যাণ্ডের গৌরব উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয়তাবোধ এক সূক্ষ্ম ও বহুবিস্তৃত রোম্যান্টিকতার ফল। এই রোম্যান্টিকতা এমনকি ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাণীর অন্ধ স্তাবকতাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের সারসত্ত্বাকে যেন দেখা হতে লাগল এক স্বচ্ছ রোম্যান্টিকতার আবরণের মধ্য দিয়ে। সমসাময়িক ফ্রান্স এবং ইটালি, এবং প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্যগুলিকে পিছনে ফেলে ইংল্যাণ্ড শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক জাতি হবার স্বপ্ন দেখল। সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখা,—রাখালি কবিতা (Pastoral), মহাকাব্যধর্মী কবিতা, কমেডি, ট্র্যাজেডি, নানা ধরনের গীতিকাব্য, নানা ধরনের গদ্য, রোম্যান্স, সমালোচনা-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন,—সবেতেই ইংল্যাণ্ড তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। এই উচ্চাকাঙ্খার দ্বারা মতিস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছিল কি না বা তা কতখানি সার্থক হয়েছিল সে সব অন্য কথা। আসল কথা ছিল প্রবল মানসিক তাড়না এবং তা সাহিত্যে সঠিকভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল।

আবার, ইংল্যাণ্ডের গর্বে গর্বিত হওয়ার এই মনোভাব সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সম্পর্কেও উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করল। বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, অভিযানকারী যুদ্ধজয়ী বীরের থেকে সাহিত্যিক যে কোন অংশে হীন নন, এই বোধ মানুষের মনে আসতে থাকল। সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে সমসাময়িককালে জোরালো কলম ধরেছিলেন স্পেনসার ও সিডনি। স্পেনসারের লেখায় অবশ্য আবেগের প্রাধান্য বেশী ছিল, কিন্তু সিডনি তাঁর 'কাব্যের পক্ষে' (এ্যাপলজি ফর পোয়েট্রি---Apology for Poetry) ১৫৮০-তে ইতিহাস-নির্ভর নজীরকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করেছিলেন। সিডনির লেখা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সমাদরভিত্তিক সাহিত্য সমালোচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সিডনির বিচার এই হিসাবে আরও উল্লেখযোগ্য যে তিনি ছিলেন আধুনিককালে মধ্যযুগীয় 'ক্ষাত্রধর্মের' (সিভ্যালরি—Chivalry) নিষ্কলুষ দৃষ্টান্ত, এবং একজন মহানুভব সৈনিক।

কাব্যকে বস্তুবিবর্জিত সত্ত্বায় কেবলমাত্র বুদ্ধি ও কল্পনার অধিগম্য স্তরে স্থাপন করা হয় এই যুগেই প্রথম। এবং এই লক্ষ্যের দিকে মানুষের চেতনাকে চালিত করার চেষ্টায় সাধারণ মানুষও নিজের অজান্তে তার প্রাথমিক জৈব প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিল। দৃশ্যতঃ, এটা একটা উদ্দীপনা ও উন্মাদনার অবস্থা। সিডনি নাটককে তত গুরুত্ব দেননি। কিন্তু নাটকের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পিছনেও এই উন্মাদনা কাজ করেছিল। এই যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাহিত্যের জোয়ারে আনন্দে সন্তরণশীল সাধারণ মানুষের সৌন্দর্যবিলাসের যুগ।

এই যুগের চরিত্র বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা যে পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা ক্রমশঃই কেন্দ্রীভূত হতে থাকল মানুষের মনোজগতের দিকে। বিশাল পৃথিবীর নব নব ধারণা যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল তা ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হল। আর, র‍্যানেইসঁসের দ্বারা প্রভাবিত মানুষই প্রথম তার ভিতরের প্রকাণ্ড সম্ভাবনাকে অনুভব করল।

সৌন্দর্যবোধ, শক্তি ও জ্ঞান,—এই তিন মৌলিক উপাদানেব সাহায্যে মানুষ নিজের উপর প্রভুত্ব করতে শুরু করল, এবং জগতের উপরও। এই জ্ঞান হয অধীত গ্রন্থ থেকে পাওয়া অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। গ্রন্থ থেকে পাওযা জ্ঞান শুধু নিজেব ভিতর নিজে সীমাবদ্ধ থাকল না,—তা মানুষকে চিন্তা করাল এবং প্রেরণা যোগাল। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পিছনে রইল দুর্জয় সাহস, আব সামনে থাকল অপার বিস্ময।

এখন থেকে সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের মান নির্ধারিত হতে শুরু করল মানুষকে অবলম্বন করে এবং সমস্ত কল্পনার কেন্দ্রে মানুষকে রেখে।

মানুষের জীবন ক্রমবর্ধমান আগ্রহের বিষয় হল। শুধু মানবাত্মা নয, মানুষের অবয়ব এবং দেহগত সৌন্দর্যও আলোচনার বিষয় হল। সাহিত্যে শুধু যে বিশাল, রোম্যান্টিক ভূযোদর্শন থাকল তা নয ; গ্রীস ও রোমের ক্লাসিক সাহিত্যও প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করল, এবং প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তা পডা হতে থাকল।

আর একদিকে বলা যায,—এই প্রথম মানুষ তার চারপাশের জগৎকে দেখার মত করে দেখল। মানুষের মনের জোর বেডে গেল। এতাবৎকাল জানা ধাবণাগুলির অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটল। র‍্যানেইসঁসের প্রভাব শুধু যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করল আর জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করল তা-ই নয,—পরীক্ষা করার ও যাচাই করাব উপর নির্ভরশীল এমন বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব, ধর্মীয বিশ্বাসের অন্তরে নিহিত সত্য,—এ সবের অনুসন্ধান ও চর্চাও হ'ল র‍্যানেইসঁসের প্রত্যক্ষ অথবা পবোক্ষ ফল। গ্রীস ও রোমের উজ্জ্বল আদর্শের সামনে দেশীয সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকবতা বোঝা গেল বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গঠন সৌকর্য এবং মানবিকতার মানসিকতা দেশীয সাহিত্যে সংযোজিত হতে বাধা থাকল না।

ধর্মীয় বোধের অভিনবত্বের বিশিষ্ট সমাদরকারীদের মধ্যে ছিলেন উইনচেষ্টারের বিশপ ল্যাংটন (Langton) এবং এমনকি, ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ ওযারহাম (Warham)। অন্যান্য যাজকদের তুলনায় ওয়ারহাম ছিলেন আদর্শ মানুষ। তিনি যেন ছিলেন বৃটিশ র‍্যানেইসঁসের অন্যতম জীবন্ত প্রতিভূ এবং বুদ্ধি ও নীতিভিত্তিক সাম্য ও সৌভ্রাত্রের এক অনাবিল উৎস।

―মিকা

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক যেমন ইংল্যাণ্ডের পার্থিব সম্পদবৃদ্ধির এবং ঔদ্ধত্য ও পরাক্রমের গৌরবময় স্তরে পৌঁছানর যুগ, তেমনই তা ছিল ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে যুক্তিসিদ্ধ ও রহস্যময় বিভিন্ন কারণে মানবসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের হঠাৎ হঠাৎ অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা যায়। র‍্যানেইসঁসের প্রত্যক্ষ ফল এবং প্রণোদিত ও স্বতোৎসারিত কার্যক্রম ইউরোপের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তা ইংল্যাণ্ডের বাইরে আর কোন দেশে সমগ্র জাতিকে এতখানি আশ্চর্য উন্মাদনায় ভরে দিতে পারেনি। জাতির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়েই এই উন্মাদনা ব্যক্ত হয়েছিল। ক্রমপ্রসরমান দিগন্তের অপার বিস্ময়, নিত্য নতুন জ্ঞানের আহরণ ও প্রতিষ্ঠা ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের এবং পরবর্তী কয়েক দশকের অতিবিশিষ্ট কর্মব্যস্ততা।

ইতিহাসনির্ভর সাহিত্য বলতে মধ্যযুগে যা বোঝাত তা অতিরঞ্জিত, অস্পষ্ট ও কাল্পনিক। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ক্রমে ক্রমে তা হয়ে উঠল যুক্তিধারা অনুসারে তথ্যের অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা।

একচ্ছত্র ক্যাথলিক মঠ গীর্জা ও ধর্মসংঘের নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হল। নতুন ধর্মমতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আগের যুগের প্রায় প্রতিটি সাহিত্যকর্মের পুনরুদ্ধার হল। এ কাজের পিছনে উৎসাহ পরোক্ষভাবে র‍্যানেইসঁসের অবদান। কিন্তু এই কাজের দ্বারাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারাকে বর্তমানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হল। এ বিষয়ে প্রধান অগ্রণী ছিলেন আর্চবিশপ পার্কার (Parker)। তাঁর দৃষ্টান্ত অনসরণ করে সাহিত্যিক পৌর্বাপর্য আরও বেশী করে প্রতিষ্ঠা করলেন ক্যামডেন (Camden), টুইসডেন (Twysden) এবং গেল (Gale)। উইলিয়াম ক্যামডেনের (William Camden) ১৫৮৬ সালে ল্যাটিনে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য বই 'বৃটানিয়া' (Britannia)। পি. হল্যাণ্ড (P. Holland) ১৬১০ সালে 'বৃটেন' (Britain)—এই নাম দিয়ে বইটির ইংরাজী অনুবাদ করেন। কিন্তু ইতিহাসকে পুরোপুরি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্ব কবি ড্যানিয়েলের (স্যামুয়েল ড্যানিয়েল Samuel Daniel—১৫৬২-১৬১৯)। তাঁর ইতিহাসভিত্তিক কাব্য 'গৃহযুদ্ধ' (The Civil Wars) ১৫৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ইটালির আচার-আচরণ, রুচি, পোষাক, কথাবার্তার ধরন ইংরাজরা প্রবল আসক্তির সঙ্গে অনুকরণ করল। পোপের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল; বাইবেলের কাহিনীগুলিও আর তত আনন্দ দিতে পারল না। সে জায়গায় বোক্কাসিও-র (গিওভানি বোক্কাসিও-Giovani Boccaccio ১৩১৩—১৩৭৫) সাহিত্য সম্বর্ধনার সঙ্গে গ্রহণ করা হল। তবে ইটালির গদ্যসাহিত্যের তখন পতন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কবি ও নাট্যকার লিলি (জন লিলি John Lyly

১৫৫৪—১৬০৬) নতুনত্বের আকর্ষণে সেই আদর্শই এনে ফেললেন ইংরাজী সাহিত্যে। পরবর্তী কবি ও নাট্যকারদের এই অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তবে ইংরাজী জীবনযাত্রার গর্ব ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অল্পকালের মধ্যেই গৌরবের সঙ্গে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে আধুনিক সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম জীবন্ত নিদর্শন ছিলেন স্যার ফিলিপ সিডনি (Sir Philip Sidney ১৫৫৪—১৫৮৬)। ইংরাজী সাহিত্যে সিডনির শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর আর্কাডিয়া (Arcadia)। আর ছিলেন গ্রীন (রবার্ট গ্রীন Robert Greene ১৫৫৮—১৫৯২) এবং ন্যাস (টমাস ন্যাস Thomas Nash ১৫৬৭—১৬০১)। তাঁরা তাঁদের অদ্ভুত, কাল্পনিক গল্পগুলির মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালের উপন্যাস সাহিত্যের আগমনের সূচনা করে যান। গ্রীন এবং ন্যাসের গল্পগুলি জনপ্রিয় ছিল। এই সব গল্পের আদর্শও পাওয়া গিয়েছিল সমসাময়িক কালের ইটালি থেকে। গ্রীন এবং ন্যাস বিতর্কমূলক কিছু পুস্তিকাও লিখেছিলেন। এগুলি জনপ্রিয় ছিল। তবে পরে গ্রীন-এর লেখাকে হেনস্থা করার একটা ঝোঁক এসেছিল। তাঁকে ছোট করবার আগে তাঁর 'প্রবর্তনকারীর' ভূমিকা স্মরণ করা কর্তব্য। কৃত্রিম, নিষ্ফল ছ্যাবলামির বদলে সহজ, স্বাভাবিক সাহিত্যের ভাষা ন্যাস-এর অমূল্য অবদান।

সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য যে সৎভাবে বহুসংখ্যক সাধারণ পাঠককে সন্তুষ্ট করা তা এঁদের লেখাতেই প্রথম সার্থক হয়েছিল। এই সব সৎ সাধারণ মানুষ সহজবোধ্য স্বাভাবিক সাহিত্য চেয়েছিলেন। লিলির (Lyly) অনুকরণকারীদের তৈরী করা ভাঁড়ামো চাননি। মানুষের মনের এই পবিণত রূপ র‍্যানেইস্‌সের দূরবিন্যস্ত ফল।

শুধু পার্থিব সম্পদ আহরণ করা ও ভোগ করার আদর্শ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে মানুষ গ্রহণ করেনি। শক্তিশালী বৃটিশ রক্ষণশীলতার পাশাপাশি সৃজনশীল স্বাধীনতা সাহিত্যের মাধ্যমে খুব জোরালভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই যুদ্ধজয়, বীরত্বের ব্যঞ্জনা, সচেতন আত্মশক্তি, জাতীয় গৌরব, ভৌতবিশ্বের অসীম রহস্য মানুষের মনে উৎসাহের জোয়ার টেনে আনছিল। বীর, নির্ভীক ইংরাজ জাতি শুধু যে পশ্চাদ্‌পদতা ও কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত হল তা-ই নয়, ইউরোপের অগ্রনীশক্তি হিসাবে স্বীকৃত হল। জাতিকে এই গৌরবের রথে যাঁরা চড়িয়ে দিলেন তাঁদের জনপ্রিয়তা অনেক উঁচুতে উঠে গেল। কিন্তু এগুলি দিয়ে মানুষের ইতিহাসে স্থায়ী আসন সংগ্রহ করা যায় না। তার জন্য চাই স্পেন্সারকে এবং বেকনকে, হুকারকে এবং শেক্সপীয়রকে। এঁরাই জগতের ইতিহাসে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে যান।

১৫৭৯ সালে স্পেনসারের SHEPHERD'S CALENDER, ১৫৮৫ সালে কিড এর (টমাস কিড ১৫৫৮—৯৪) THE SPANISH TRAGEDY, ১৫৮৭ সালে মার্লোর TAMBURLAINE, ১৫৯২ সালে DOCTOR FAUSTUS, ১৫৮৯ সালে স্পেনসারের FAERIE QUEENE, ১৫৯৪ সালে শেক্সপীয়ারের ROMEO AND JULIET, ১৫৯৬ সালে THE MERCHANT OF VENICE, ১৫৯৯ সালে JULIUS CAESAR, ১৬০০ সালে AS YOU LIKE IT, ১৫৯৮ সালে বেন জনসনের EVERYMAN IN HIS HUMOUR, ১৫৯৭ সালে বেকনের ESSAYS

এবং অন্যান্য শতাধিক কালজয়ী গ্রন্থ—গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, প্রবন্ধে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা ও উৎসাহের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করল। ইংরাজী সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যগুলির অন্যতম বলে চিরকালের জন্য স্বীকৃতি পেয়ে গেল।

ষোড়শ শতাব্দীর এই শেষ দিকে মানুষের মনের এক আশ্চর্য পরিবর্তনের কথাও এখানে বলে নেওয়া দরকার। জড়তা ও অনাগ্রহের বদলে সমসাময়িক কালের নানা জাগতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মানুষের মন হয়ে উঠল অত্যন্ত আগ্রহী এবং কৌতূহলী। মানুষের প্রকৃতির এবং মানুষের ইতিহাসের নব্যতর এবং সত্যতর দর্শন সৃষ্টি হল। শেক্সপীয়রের নাটক এবং বেকনের (Francis Bacon, ১৫৬১--১৬২৬) রচনাবলী ('Essays') এই দর্শনের সারবস্তুকে মানুষের সামনে উপস্থিত করল। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিস্ময়ের বস্তুগত বিধায়ক নানা ঘটনা ও অবস্থা বৃটিশ মানসের উপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানসিক বিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা প্রথম দিকে তত বোঝা যায়নি। কিন্তু 'আর্মাডা' ধ্বংসের (১৫৮৮) পর অভাবিতভাবে পটপরিবর্তন হয়ে গেল। ড্রেক, হকিন্স, ফ্রবিশারের জায়গায় নায়কের ভূমিকায় এলেন স্পেনসার, বেকন, সিডনি ও হুকার (Richard Hooker ১৫৫৪-১৬০০)। র‍্যানেইর্সসের ফেনপুঞ্জ কল্লোলের মাঝখানে ইংরাজী কাব্য নিয়ে এল অচঞ্চল প্রশান্তি। এই প্রশান্তির প্রাণশক্তি প্রথমদিকে নৈতিক সৌন্দর্যে, এবং ঠিক তার পরেই মানুষের অন্তর-বাহিরের বিচিত্ররূপে বেপমান।

কিন্তু র‍্যানেইর্সস শুধু গৌরব নয়, কলঙ্কও বয়ে আনল। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক জগতের মুখেচোখে ক্লান্তির ছাপ পড়তে লাগল। সাহিত্যে এই জের-টানা ক্লান্তি অবশ্য অনেকদিন স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি। ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করল। রাণীর অনুগ্রহ এবং আস্কারা থেকে এসেক্সের আর্ল বঞ্চিত হল। এই পতন স্বর্গ থেকে লুসিফারের পতনের মত প্রকাণ্ড পরিবর্তন সৃষ্টি করল। যুগের স্বরূপ সাধারণ, অসাধারণ সকলের ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ এবং ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেল। সারা দেশে একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া। দেশের ক্রমবর্ধমান সম্পদের এবং সাহিত্যের কল্লোল হতাশার পাথরে ধাক্কা খেল। চেতনা যেন হতবাক হয়ে গেল। নতুন শতাব্দীর প্রায় শুরুতেই ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ধত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বেচ্ছাচারী, দেশাহঙ্কারী, তরলমতি, দৃঢ়চরিত্র, সুবিধাবাদী, মর্যাদাবোধসম্পন্ন, নিষ্ঠুর, উচ্চাকাঙ্খী, খোসামোদপ্রিয়, গুণীজনের গুণগ্রাহী, সুচতুর, স্বাধীনতাপ্রিয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, 'গ্লোরিয়ানা' 'ফেয়ারীকুইন' এলিজাবেথ মারা গেলেন। পেছনে রেখে গেলেন একদিকে অতুল ঐশ্বর্য, দেশের মর্যাদা, দুর্বার উচ্চাকাঙ্খা, আত্মবিশ্বাসী নৌশক্তি, কাব্য ও নাটকে উন্নতির পরাকাষ্ঠা ; আর অন্য দিকে হতাশা, উত্তরাধিকারিত্বের অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা, নেতৃত্বহীনতা, ধর্মীয় রেষারেষি, আর বিহ্বল এক প্রকাণ্ড জাতিকে।

নিরাপত্তার অভাববোধ তীব্র হল। দেশের ঐক্যবদ্ধ মহিমার অসংলগ্নতা এবং পতন শুরু হয়ে গেল। ভাষার ক্রমোন্নতি আপাততঃ স্থগিত রইল। কবিতার সাবলীলতার বদলে এক বদ্ধ অধিবিদ্যার শুরু হল। পার্থিব সমৃদ্ধির চূড়ান্ত মূল্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে

হল। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতেই এক যুগ আর এক যুগে উত্তীর্ণ হতে চলল। আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের জায়গায় এল জড়তা; আর নৈরাশ্য মানুষের মনকে ছেয়ে ফেলল।

র‍্যানেইসঁসের প্রধান ঢেউ তখন সামনে থেকে সরে গেছে বা যাচ্ছে; সূর্য মধ্যগগনে, এবার পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হয়ে এল। কিন্তু তখনও অনুসরণকারী তরঙ্গাভিঘাত সমস্ত বৃটেনকে উচ্ছ্বাসে, কলরোলে প্লাবিত করছে। তখনও শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অনেকগুলিই বাকি; তখনও আছেন হুকাব, বেকন, বেন জনসন এবং বার্টন। আর রইলেন কবি জন ডন (John Donne—১৫৭৩-১৬৩১)—সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ দার্শনিক, ভক্ত, এবং কাব্যে যুগাতিক্রমী স্বাধীন মনস্বীতার আদর্শ দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ওঠে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের এই প্রকাণ্ড উন্নতিকে কেন ধবে রাখা গেল না। অনুকরণ যেখানে আত্মীকরণে লীন হয় সেখানে মুক্ত সাবলীলতা অক্ষুন্ন থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও সেই সাবলীলতার অনেকটাই বজায় ছিল। কিন্তু অল্প কয়েক বছরেই বহিরাগত আদর্শের প্রবল তাডনায় এক তীব্র এবং অস্বাভাবিক জোর সাহিত্যের বাইবের রূপের ভয়াবহ প্রচণ্ডতা বাড়িয়ে দিল। অন্তরস্থিত মহিমা যেন সেই সঙ্গে ফোঁপরা হতে শুরু করল। এর উপযুক্ত আত্মসমালোচনা তৎক্ষণাৎ হয় না, কেননা মানুষের চেতনা স্বচ্ছ হতে সময় লাগে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের বৃটিশ নাটকে সেনেকার (লুসিয়াস আন্নিউস সেনেকা Lucius Annaeus Seneca খৃঃ পূঃ ৩-৬৫ খৃঃ) প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। সেনেকা ছিলেন নাট্যকার। আমাদের আলোচ্য যুগের দেডহাজার বছব আগের মানুষ তিনি। তিনি তাঁর নিজের যুগের সাহিত্যিক শক্তির আদর্শ।

এখানে আমরা আর একজন ল্যাটিন দার্শনিকের কথা বলব। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই তাঁর চিন্তা সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি নিকোলো ম্যাকিযাভেলি (Niccolo Machiavelli ১৪৬৯-১৫২৭)।

সেনেকা গ্রীক প্যাটার্ণ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। আর ম্যাকিয়াভেলি তার কালের বাস্তব রাজনীতিব এক অভিনব পরিকল্পনা করেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে ইংরাজী সাহিত্যের প্রবলতম উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল ইংরাজী নাটকে। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাডা আতঙ্ক, নিষ্ঠুরতা, ইন্দ্রিয়াধিক্য এবং লোলুপ বাসনার উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্র ছিল ইংবাজী নাটক। এই বিশেষ ধরনের নির্দেশ এসেছিল অতি সাধারণ স্তরের ইংরাজ দর্শকের স্থূল এবং রূঢ় জীবনচর্চা থেকে। এরই মধ্যে নাট্যকারদের এবং অভিনেতাদের যুগপৎ করুণা ও তারস্বরে চিৎকার, মহিমা ও ভাঁড়ামি, চোয়াড়ে বর্বরত্ব ও বুদ্ধির খেলা দেখাতে হয়েছিল। অমার্জিত এবং সুসংস্কৃতকে একসঙ্গেই তোষণ করতে হয়েছিল।

১৫৭৬ সালে জেমস বারবেজের (James Barbage) প্রতিষ্ঠিত সোরডিচ-এর (Shoreditch) প্রথম বাঁধা রঙ্গমঞ্চ 'দি থিয়েটার' (The Theatre)-এর ধ্বংসের আগেই লণ্ডনে একের পর এক নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। লর্ড লিসেষ্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে অভিনেতারা কাজ করতেন জেমস বারবেজ ছিলেন তাঁদের প্রধান। 'দি থিয়েটারের' পরে সোরডিচেই যে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় তার নাম ছিল 'কার্টেন' (Curtain)। এর

পরে পরপর আসে 'দি রোজ' (The Rose), 'দি সোয়ান' (The Swan), 'দি ফরচুন' (The Fortune), 'দি গ্লোব' (The Globe)। গ্লোব থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জেমস বারবেজের ছেলেরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন রিচার্ড বারবেজ। এই রিচার্ড বারবেজ-ই শেক্সপীযরের অনেক নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এমন কি, শেক্সপীয়রের নাটকের কোন কোন জায়গা রিচার্ড বারবেজের সুবিধা-অসুবিধার কথা মনে রেখে লেখা হয়েছিল।

বহুসংখ্যক যোগ্য নাট্যকারের সমকালীন অস্তিত্ব ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র। এই অবস্থা নাটকের গণমুখীনতার সঙ্কেত দেয়। নাট্যকাররা অনেকেই রাজানুগ্রহ চাননি বা পাননি। এঁদের অনেকেই জীবনের নতুন আদর্শ ও মূল্যমান গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা এক একজন ছিলেন মহাবিদ্রোহী। বৃটিশ রক্ষণশীলতাকে, সহনশীলতা, ধৈর্য ও স্থৈর্যকে, প্রাচীন, বিশেষ করে ধর্মীয়, আদর্শকে এরা প্রচণ্ড প্রাণশক্তি দিয়ে পদাঘাত করে গেছেন। এঁরা ঈশ্বর মানতেন না। নৈতিক চরিত্র হাসি-তামাসাব ব্যাপার ছিল। এঁরা ছিলেন দরিদ্র, বেপরোয়া, উন্মত্ত ঝঞ্ঝা। শুঁড়িখানা ও পতিতালয় ছিল এঁদেব স্বাভাবিক আশ্রয়স্থান। এঁরা অনেকে মারাও গেছেন না খেতে পেয়ে, মাতলামি ও হানাহানিতে।

কিন্তু এঁদেরই হাতে শুরু হয়েছিল ইংরাজী সাহিত্যের সুবর্ণযুগের প্রচণ্ড শক্তিশালী নাটকের ধারা। এঁদের আগের যুগ পর্যন্ত নাটক ছিল মিনমিনে অনুকরণ অথবা তামাসা সৃষ্টির ক্লান্তিকব চেষ্টা। ষোড়শ শতাব্দীব শেষ দিকের দুর্দান্ত নাট্যকারদের কেন্দ্রে ছিলেন গ্রীণ (রবার্ট গ্রীন Robert Greene ১৫৫৮-১৫৯২) এবং মার্লো (ক্রিষ্টোফার মার্লো Christopher Marlowe ১৫৬৪-১৫৯৩)। গ্রীণ সমকালীন ইটালির লাম্পট্য ও স্পেনের অবিশ্বাসী নাস্তিকতাকে ইংরাজী নাটকের অঙ্গনে এনে ফেললেন। একজন প্রতিভাবান মানুষ কি করে নিজের জীবনকে তছনছ করে ধ্বংসসাৎ করে ফেলতে পারেন গ্রীণের জীবনের থেকে তার কোন অধিকতর স্পষ্ট উদাহরণ নেই। ক্যাথলিক ধর্মের পরলোক এবং নরক তাঁর কাছে ছিল উপাদেয় উপহাসের বস্তু। কোন নৈতিক সদাচবণকে জীবনে তিনি গ্রহণীয় বলে মনে করেননি। তাঁর জীবনের গ্লানিকে তিনি প্রচণ্ডভাবে উপলব্ধি করতেন, কিন্তু তার থেকে মুক্তিও তিনি বোধহয় চাননি। কিন্তু লেখনী তাঁর ছিল পবিত্র। নিজের জীবনের বিরুদ্ধ আদর্শকে ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন।

আর মার্লো ছিলেন আরও দুঃসাহসী, আরও উচ্চনিনাদী। নিরীশ্বরবাদিতার জন্য তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হতেন ; শুধু নৃশংস মৃত্যু তাঁকে তাঁর জীবনের প্রচণ্ড প্রদাহ থেকে মুক্তি দিযে গেল। তিনি মোজেসকে (Moses) 'ভাঁড়' বলেছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে তিনি যদি নতুন এক ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন তবে তা হবে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম থেকে অনেক উন্নত। তিনি ট্র্যাজেডিতে তাঁর সমকালীন সাহিত্যের থেকে অবিশ্বাস্য দূরত্বে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর্মাডা বিজয়ের পরের বছর তিনি বৃটিশ নাট্যজগতে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব এনে দিয়েছিলেন। মিষ্টিমিষ্টি কথার নাটকের বদলে বিজয়োদ্ধত তৈমুরলঙ-এর (Tamburlaine) কর্ণপটহ-বিদীর্ণকারী বজ্র নির্ঘোষ বৃটিশ নাটককে সচকিত, উৎকর্ণ করে তুলল। তিনি সেক্সপীয়রের শক্তিশালী নাট্য-উৎকর্ষের পথপ্রদর্শক। মহাশক্তিশালী

অতিপ্রাকৃত জগতের রহস্যময় শক্তিকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন তাঁর 'ফস্টাস' নাটকে। চাষাড়ে ও হাস্যকর ভাষা দিয়েও মার্লো তাঁর সমকালীনদের সন্ধান দিলেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের। সমগ্র বৃটিশ নাট্যজগতে ট্র্যাজেডির মহিমা ও প্রকাণ্ডতায় শেক্সপীয়র ব্যতীত তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

শেক্সপীয়রের জীবন কিন্তু সেই তুলনায়, যতটুকু বোঝা যায়, শান্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, এমনকি প্রথম দিকে আত্মধিক্কারে করুণ। তাঁর ভদ্রতা, সাদাসিধা আচার-আচরণ এবং সততার দ্বারা তিনি অধিকাংশ মানুষের ভালবাসা পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মী বারবেজ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন,—'যোগ্য বন্ধু ও সঙ্গী'। সমসাময়িক কবি বেন জনসন তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন,—'সৎ, দিলখোলা, মুক্ত প্রকৃতির মানুষ।' প্রথম দিকের অভিনেতার জীবন যেন হয়েছিল পরবর্তী জীবনের শিক্ষানবিশীর ধাপ। নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি তিনি প্রথম জীবনেই হাতে-কলমে শিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে গ্রীণের কটু সমালোচনা: 'ময়রপুচ্ছশোভিত কাক'—থেকে মনে হয় যে পূর্বসূরীদের নাট্য-উৎকর্ষগুলির ব্যাপাবে তিনি আগ্রহী শিক্ষার্থী ছিলেন। অভিনেতা, নাট্যকার এবং থিয়েটার কোম্পানীর অংশীদার হওয়ার পর তাঁকে 'সবজান্তা' বলেও ব্যঙ্গ করা হযেছে।

১৫৯৩ সালে নাটক-বহির্ভূত তাঁর প্রথম কাব্য 'ভেনাস ও এ্যাডোনিস' (Venus and Adonis) প্রকাশিত হয়। সনেটগুলি ১৫৯৮ সালের মধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যেই নাটকগুলি প্রায পর পর লিখিত হয়ে চলেছিল। সেগুলির কাব্যগুণ সুষমামণ্ডিত এবং নাট্যগুণ সুনিপুন। শেক্সপীয়রের নাটকের বিশাল বিস্তৃতি ও বৈচিত্র অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে বা অব্যবহিত পরে কোন নাট্যকার ভিন্ন ভিন্ন নাটকে এত পার্থক্য ও বৈচিত্র আনতে পরেননি। অথচ সেগুলি যে একই হাতের লেখা তা শেক্সপীয়রের বিস্ময়কর প্রতিভার অনুধাবনের দ্বারা বোঝা সম্ভব। এই শেষোক্ত কাজটিও যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন বা করছেন তাঁরাও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পাবার অধিকারী। ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলিও আশ্চর্য সব ভাব ও উদ্দেশ্যের সমন্বয়। ইংল্যাণ্ডের বিচিত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের যথার্থ সত্ত্বাকে এই সব ঐতিহাসিক নাটকে ধরে রাখা হয়েছে। ধারাবাহিক এই সব নাটকের প্রধান চরিত্র যেন ইংল্যাণ্ড নিজেই। মানবচরিত্রের রহস্যময় দিকগুলি বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে উদ্ঘাটিত হয়েছে; এবং চরিত্রগুলির একটির সঙ্গে আরেকটির কোন মিল নেই। এই সব চরিত্রগুলি শত শত বছর ধরে তাদের অস্তিত্ব সগৌরবে বজায় রেখেছে। তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ভুলে যেতে চাই যে তারা জীবন্ত মানুষ নয়, নাটকের চরিত্র মাত্র। সেক্সপীয়রের নাটকগুলি দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বিষাদের মহার্ঘ খনি। কোন কোনটির উন্নতি আকাশচুম্বী; আবার কোন কোনটি মাটির পৃথিবীর সহজ জীবনবোধের সার্থক নিদর্শন। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র শেক্সপীয়রের নাটকেই একাধারে একটি জাতির একটি বিশেষ যুগের সামগ্রিক চেতনা এবং সর্বকালের সকল মানুষের গূঢ়তম সত্ত্বা একই সমতলে স্থাপিত হয়েছে।

এই সব রথীমহারথীরা লেখার ক্ষেত্রে—তা সে নাটকই হোক, কবিতাই হোক বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক—নিজস্ব সব বিশেষত্ব এনে ফেললেন। সাহিত্যের

রীতিনীতিতে শুধু নয়, ভাষায় কোন কিছু প্রকাশের প্রয়োজনে, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার ব্যাপারে, এবং বিষয়বস্তুতে তাঁরা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে প্রধান স্থান দিলেন। অবশ্য এমন নয় যে যা কিছু পুরান তা-ই বাতিল করা হল। আসলে নতুন ধারা এবং ধারণার এক যুগ এসে গেল। স্থান-কাল-পাত্র অবলম্বন করার ব্যাপারে লেখকরা ঐতিহ্যবিহীন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেন ; এবং ভাষা ব্যবহারের নতুন নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন। অনুবাদের কাজে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল ; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নতুন অনুশীলনের বৈচিত্র হয়ে দাঁড়াল বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। একটা খুব বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এখানে দেওয়া অসঙ্গত হবে না। গ্রীক নাট্যকারদের অনেকের কার্যকরী নির্দেশ এবং অনুশীলনের ঐতিহ্য—তিন ঐক্যের সমাবেশ (Three Unities)—'স্থান', 'কাল' এবং 'নির্ভেজাল অখণ্ড নাট্যক্রিয়া'—রোম্যান্টিক নাট্যকাররা, বিশেষ করে শেক্সপীয়র, অনুসরণ করলেন না।

কালের ঐক্যের নির্দেশ এসেছিল এ্যারিষ্টটলের 'পোয়েটিকস (Poetics) থেকে। 'সূর্যের একবার পরিক্রমণের মধ্যে নাটকের সময় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।' (পুরান বিশ্বাস—সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে)। আবার, 'কোরাস' যেহেতু এক জায়গায় এক অবস্থায় সব সময়ে থেকে যাচ্ছে, সুতরাং নাটক চলাকালীন সময়ে স্থানের পরিবর্তন করা যায় না। এছাড়া, নাটকের গঠনের অন্তর্নিহিত এবং অতিপ্রয়োজনীয় নীতি হিসাবে কার্যক্রম এবং তার পরিকল্পনা বা প্লটকে (Plot) গ্রীক নাট্যকাররা বিশৃঙ্খল করতে চান নি। কাজেই প্লটের অবিমিশ্র অনন্যতা অবশ্যই ধরে রাখতে হয়েছিল।

রোম্যান্টিক আদর্শ সেই ক্লাসিক আদর্শকে সরিয়ে দিল। নাট্যক্রিয়ার অনন্যতা বা একাগ্রতাই হয়ে দাঁড়াল একমাত্র অনুসরণের বিষয়। এমনকি, সাব-প্লট (Sub Plot) বা উপকাহিনী মূল প্লটের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল। নীতি হিসাবে দেখতে গেলে এটা শুধু ব্যতিক্রম নয়,—বিচ্যুতি। কিন্তু হয়ত মূল বিষয়টিকে আরও আকর্ষণীয় করবার জন্য এই 'সাব-প্লট' বা উপকাহিনীগুলির উপযোগিতা বোঝা গিয়েছিল। কাজেই রোম্যান্টিক নাটকে নাট্যক্রিয়াব অবিমিশ্র অখণ্ডতা বজায় রাখাই একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

পরবর্তীকালে ডঃ জনসন তাঁর অনবদ্য যুক্তিতে এই অধরাকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন।

এইভাবে নানা ক্লাসিক কৌশলের বর্জন ও পরিবর্তনের দ্বারা রোম্যান্টিক নাটকের নতুন আদর্শ স্থাপিত হল। রোমান্টিকতার আবহাওয়া মুক্তির আবহাওয়া—বলিষ্ঠ, স্বাধীন প্রাণের প্রকাশ। এখন থেকে, যা মুক্ত এবং সাবলীল—বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে যা তাঁদের ক্ষমতা, চরিত্র ও মানসিকতার উপযুক্ত—তাকে অনুসরণ করাতে কোন সাহিত্যিক ত্রুটি ঘটল বলে কেউ মনে করলেন না। অবশ্য প্রতিটি বিশিষ্ট লেখক তাঁর নিজস্ব নিয়ম-কানুন তৈরী করে নিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। কেননা তিনি জানতেন সেই বিশিষ্ট স্টাইল এবং নিয়মকানুনেই তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব।

বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অনুসৃত কিছু কিছু নিয়মকানুন বা তার ব্যতিক্রম—যিনি যা-ই অনুসরণ করুন না কেন—সহজেই গ্রহণযোগ্য হল ; এবং এই ধারায় এক ধরনের মানসিক স্ফূর্তি এবং স্বাধীনতা সব লেখকই চাইলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

একটা বড় কথা হয়ে দাঁড়াল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবহাওয়াতেই সমস্ত সাহিত্যিক পরিবেশ একটা নতুন চেহারা নিল। ভাষায় বাক্যগঠনের রীতি, শব্দের পদসম্পর্কিত নির্দিষ্টতা,—এগুলির কোন প্রয়োজন স্বীকার করা হল না। যে কোন শব্দ যে কোন পদে ব্যবহৃত হবার যোগ্য বলে ধরে নেওয়া হল। কোন নাটকে ব্যবহৃত স্বরের পর্দা (Scale), এবং সকল অংশের গাম্ভীর্য বা তারল্য বৈচিত্র্যহীনভাবে আর একটানা একই রকম থাকল না। নাটকীয় ভাবের সুর হল প্রাণবন্ত এবং প্রয়োজনানুরূপ। আড়ষ্টভাবে চিরাচরিত অনুশাসন মেনে চলার প্রশ্ন আর উঠল না। একই শব্দগুচ্ছকে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভঙ্গীতে বহুমুখী বর্ণোজ্জ্বল করা হতে লাগল। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকল। গুণীজনের হাতে কাব্যের ছন্দ অনন্যপূর্বভাবে বিকশিত হতে থাকল। বিভিন্ন শব্দের ধ্বনিবৈচিত্র্যকে কবিরা স্বাধীনভাবে কাজে লাগালেন। ছন্দের মাত্রার সঙ্গে 'যেখানে যে রকম, সেখানে সে রকম' বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণের জন্য সময় কমান-বাড়ান হতে থাকল; বা নতুন নতুন ছন্দকৌশল সৃষ্টি হল। ছন্দকে পুরোপুরিভাবে বক্তব্যের বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অধীনে বাখা হল। মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর কোন কবিতাই বিভিন্ন বড় বড় কবির ক্ষেত্রে একই রকম থাকল না। অন্ত্যমিলযুক্ত পরপর দুই পঙ্ক্তির শেষ অংশে শ্বাসাঘাত ভেদে নানা বৈচিত্র্য সমকালীন ফ্রান্সের কাব্যরীতি থেকে আমদানী করা হল। এক কথায় কাব্যে ও নাটকে, ভাবে ও বৈচিত্র্যে, অর্থে ও উচ্চারণে এ হল এক বহুমুখী বিস্তারের যুগ।

এ যুগের বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠতা সমকালীন ও প্রাচীন আদর্শ ও নিদর্শন কোন কিছুকেই বাদ দেয়নি। ক্লাসিক গ্রীসের আকর্ষণ কমেনি। অনুবাদের নানা প্রচেষ্টায় তার প্রমাণ। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী যা কিছু সুন্দর ও বিস্ময়কর তাকেই সাহিত্যে স্থান দিয়েছে। কাব্যমোদীরা তাঁদের রোম্যান্টিক প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাচীন ক্লাসিক নির্দশনগুলির ইংরাজী অনুবাদ করে সাহিত্যের দিগন্ত চতুর্দিকে বাড়িযে দিলেন। অনুবাদের কাজ প্রাচীন পন্থায বা রক্ষণশীলতায বদ্ধ থাকা নয; বিস্মিত আনন্দের রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীরই সাক্ষ্য।

অনূদিত অনেক বইই ছিল অনুবাদের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদকদের সাহিত্যিক দক্ষতার দরুণ সেগুলির গুণগত উচ্চমান বজায় ছিল। এমন কি কোন কোনটি ল্যাটিন বা ফরাসীগ্রন্থের অনুবাদ হলেও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছিল। এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ স্যার টমাস নর্থ-এর (Sir Thomas North) দ্বারা ১৫৭৯ সালে অনূদিত প্লুতার্কের (Plutarch) কয়েকজন অভিজাত গ্রীক ও রোম্যানের জীবনী (Lives of the Noble Grecians and Romans)। কাব্যে জর্জ চ্যাপম্যানের (George Chapman ১৫৫৯-১৬৩৪) দ্বারা হোমারের ইলিয়াডের (Iliad) অনুবাদ (১৬০৯) সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

অনুবাদকরা যেমন বহু ক্লাসিক গ্রন্থ এই সময়ে ইংরাজীতে অনুবাদ করলেন, তেমনি আবার অনেক ইংরাজ সাহিত্যিক প্রাচীন গ্রন্থকারদের রচনার কিছু কিছু অংশ নিজের বলে চালানোর চেষ্টাও করেছিলেন।

ইংরাজী গদ্য

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অংশে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে সাহিত্যের প্রায় সব শাখাই নতুন নতুন ধরনে প্রকাশ পেল। প্রথমে গদ্যের কথাই ধরা যাক। গদ্যসাহিত্যের বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। বিভিন্ন সৃজনশীল, কল্পনাশ্রয়ী, যুক্তিবিদ্ এবং বুদ্ধিমান লেখকরা লেখার বিষয় এবং লেখার ধরন দুয়েতেই নতুনত্ব আনলেন। আবার, বাইবেলের মত অসাধারণ গদ্যে একাধাবে ঐতিহ্য, ভাবগম্ভীরতা, বক্তব্যের সঙ্গীতধর্মীতা ও জনপ্রিয়তা পুঞ্জীভূত হল সাহিত্যশিল্পীদের যৌথ প্রচেষ্টায।

বাইবেল

আমরা বই-এর প্রথম ভাগে ১৫৬০ সালের ব্রীচেশ বাইবেল এবং ১৫৬৮ সালের বিশপস বাইবেলের কথা বলেছি। ৪৩ বছর বাদে ১৬১১ সালে বাইবেলেব অনুবাদের শেষ পর্ব। আট বছর আগে এলিজাবেথ মারা গেছেন। এই শেষ অনুবাদ হয রাজা প্রথম জেমসের আমলে এবং তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে।

১৬০৭ সাল থেকে এই কাজ আরম্ভ হয। বাইবেল রচনা শুধু গদ্যে কিছু লেখা বা পূর্বসূরীদের লেখার নব্য সঙ্কলন নয;—এ ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর গোডায সাধারণ-অসাধারণ সব স্তরের ইংরাজের মনোজগতের বিশাল প্রতিচ্ছবি। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যোগসূত্র, প্রেরণার দিক থেকে ছিল জাতীয মানসিক ভিত্তি গঠনের শুদ্ধ নৈতিক প্রয়াস, সভ্যতার দিক থেকে এ ছিল সেমিটিক, গ্রীক, রোমক এবং এ্যাংলিকান ঐতিহ্যের সার্থক সমন্বয়। ১৬১১ সালের এই ইংরাজী বাইবেল ছিল ভাষায় ইংরাজী, সুরে পশ্চিম এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মানবসভ্যতার আত্মানুসন্ধান, এবং সাহিত্য হিসাবে একাধারে রোমাঞ্চকর অনুভূতি ও সহজ আকর্ষণের স্থায়ী সম্পদ। বহু শতাব্দীর মানবমনের অবিশ্বাস্য পরিবর্তনেও উজ্জ্বল, অমলিন। বেদ (The Vedas) বা জেন্দ-আবেস্তার (Zend-Avesta) প্রাচীনতা এতে নেই; তবে বহু শতাব্দীর মানুষের মনের শক্তিশালী বিশ্বাসের অমর আত্মা এতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে খৃষ্টধর্ম নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্মসংঘ অন্যান্য আচার-আচরণের অনুবর্তীদের চেয়ে বেশী সুবিধা পাচ্ছিল। কিন্তু এটা স্বীকার করতে কোন বাধা ছিল না যে বাইবেল সকলের জন্য; অর্থাৎ অন্যান্য ধরনে বিশ্বাসী খৃষ্টানরাও একটি সমন্বয়ী বাইবেল চাইছিলেন।

এই ধরনের আদর্শ বাইবেলে শুধু ঐতিহ্য নয়, সমসাময়িক এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বিশ্বাসকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কাজে কাজেই এই বাইবেল একদিক থেকে গোঁড়ামির পরিপন্থী হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। শুধু ধার্মিক পণ্ডিত নন—অনুবাদের ধারা

এবং বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা, সাহিত্যিক বোধ, কল্পনাশক্তি, উৎস ও রূপান্তর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং সেগুলিকে সংরক্ষণের বুদ্ধি,—এগুলি যাঁদের আছে তাঁদের সকলকেই উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ১৬১১ সালের বাইবেলে এই সব কিছুরই উপর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। এই বাইবেল লেখা হয়েছিল ১৬০৭ থেকে ১৬১১ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর ধরে। ৪৭ জন পণ্ডিত ৬টি পরস্পর সহযোগী দলে বিভক্ত হযে এই কাজ করেছিলেন।

এই বাইবেলে সর্বাধুনিক গদ্যকে বা সমসাময়িক কালের ধর্মীয় বাচনভঙ্গীকে অনুসরণ করা হয়নি। বরঞ্চ বলা চলে, এই বাইবেলের মাধ্যমে ইংরাজী গদ্যের একটি পৃথক ও শক্তিশালী রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। পুরাতন সমস্ত বাইবেল,—শুধু ইংরাজী নয়—হিব্রু, গ্রীক এবং ল্যাটিন বাইবেলকে—তাদের বলার ধরন এবং সুরের মাধুর্যকে—গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ও গঠনকারী উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হযেছিল। পুরাতন বিশ্বাস ও ব্যাখ্যাগুলি নিয়ে পণ্ডিতরা বারবার আলোচনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের ও বিদেশের, সমসাময়িক এবং প্রাচীন, সমস্ত বাইবেলের সারবস্তু যেন এখানে বজায রাখা হয়। অনুবাদের ব্যাপারে নিছক ভাষান্তরকে গুরুত্ব না দিয়ে কল্পনা ও ঐতিহাসিক বোধকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ইংরাজী বাইবেল 'ইংরাজী' বটে কিন্তু একে এক আশ্চর্য সমন্বয বলা চলে। নানা ভাষার, নানা সভ্যতার, নানা যুগের অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ এতে বজায রাখা হয়েছে। তাই এর আন্তর্জাতিকতা ও কালাতিক্রমতা লক্ষ্যণীয়। অপর দিকে, এর অবযব ইংরাজী ভাষায তৈরী হলেও, আদর্শ এক পৃথক শক্তির মত। বহু শতাব্দী ধবে এই বাইবেল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরাজের বাচনভঙ্গীকে প্রভাবিত করে আসছে। এর ঐতিহ্যবান পুরাতনী রূপ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যকে শক্তি ও মাধুর্য দিযে আসছে। আধুনিক ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের গঠনভঙ্গী ও উপাদানে কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে এর প্রভাব থেকে গেছে।

এই বাইবেলের বৈশিষ্ট্যগুলির ভিতরে রযেছে এর সংযত সারবত্তা, বেগ, রহস্যময় অপরিচিতি ও পূর্ণ পরিচিতির এক অদ্ভুত সমন্বয। বাহুল্যবর্জিত ভাব ও অ-সচরাচর প্রকাশভঙ্গী। আগ্রহের সঙ্গে বাইবেল পাঠ ইংরাজী ভাষায় সঠিকভাবে ভাবপ্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে। বাইবেলের ভাষা যেমন সম্ভ্রমের উদ্রেক করে তেমনি এর ছন্দ একটা সম্মোহনের সৃষ্টি করে। এই শেষতম লক্ষণ পৌরুষ গুণবিশিষ্ট ইংরাজী ভাষায় বাইবেলের অপূর্ব অবদান।

ইংরাজী বাইবেলের বিশিষ্ট ভাষার উৎস ভৌগোলিক ও ঐতিহ্যগত। পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ উষর প্রান্তর ও বিশাল সুনীল আকাশ—যা মানুষকে স্বপ্ন, তন্ময়তা ও গভীর চিন্তায় মগ্ন করে দিত এবং চিত্রময়, সরল ও স্বতোৎসারিত ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধের প্রকাশে আগ্রহী করত তার সারসত্তা আছে এই ইংরাজী বাইবেলে। আবার, সমুদ্রমেখলাবেষ্টিত, শিলাপ্রাচীররক্ষিত ইংল্যাণ্ডের উপকূল ও তটভূমি, ইংরাজী নৌবহরের সমুদ্রযাত্রা এবং সমসাময়িককালের ইংল্যাণ্ডের নাট্যামোদী মানসিকতা এই বাইবেল রচনাকে ঘনিষ্ঠভাবে

প্রভাবিত করেছে। গ্রীস ও রোমের ক্লাসিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ইংরাজের জীবন ও ভাষার পৌরুষ-কাঠিন্যও এর গঠনের লক্ষণীয় উপাদান। এর গূঢ়ার্থের আকর্ষণ ও ধ্বনিব্যঞ্জনা অননুকরণীয়।

ওলড টেষ্টামেন্টের (Old Testament—পুরাতন নিয়মের কাহিনী) ভাষা ছিল হিব্রু। এই ভাষা ছিল ভৌত, বস্তুনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাবতীয় ধারণা প্রকাশের সহজ ও প্রত্যক্ষ উপায়। সারিবদ্ধ চিত্রকল্পতার দ্বারা বক্তব্যবিষয়কে বোঝান হত। আবার এই ভাষার সাহিত্য ছিল নিষ্কম্প দৃঢ় বিশ্বাসের কঠোর রূপের অভিব্যক্তি। এই চিত্রময়তা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আলোচ্য বাইবেলের প্রাথমিক অংশে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই হিব্রুগুণান্বিত প্রাথমিক অংশের একটি সুন্দর বিশেষত্ব সম্পূর্ণ পৃথক উৎসের স্যাকসন প্রকাশভঙ্গীর প্রত্যক্ষ, বাস্তব অথচ সাবলীল চরিত্র। হয়ত মরুভূমি ও আকাশের উদার বিশালতা এবং বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের অপার বিস্ময়,—এই দুয়ের একটা সাধারণ ধর্ম আছে যা বর্তমান বাইবেলের 'ওলড টেষ্টামেন্ট' অংশে বাঁধা পড়ে গেছে।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ১৬১১ সালের এই বাইবেলের অনুবাদকগণ ভাষার অজানা শক্তিকে উদ্‌ঘাটন করবার একটা যেন প্রেরণা পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ল্যাটিন সাহিত্যের নিয়মানুগ ঝঙ্কারেরও সন্ধান করেছিলেন ইংরাজী ভাষায়। তাই ইংরাজী বাইবেল ইংরাজের কাছেও বিস্ময় ও আকর্ষণের বস্তু।

১৬১১ সালের বাইবেলকে বলা হয়েছে ইংরাজী গদ্যের উৎকর্ষের চূড়ান্ত নিদর্শন। বাইবেলের প্রভাব আধুনিকতম ইংরাজী সাহিত্যের সর্বাঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জন বিনিয়ন (John Bunyan ১৬২৮-৮৮) থেকে শুরু করে টি. এস. ইলিয়ট (T. S. Eliot ১৮৮৮-১৯৬৫) পর্যন্ত অনেক ভাবুক, চিন্তাশীল মনীষি, দার্শনিক, কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার বাইবেলের যুগাতিক্রমী অন্তরঙ্গতা সাগ্রহে অনুভব করেছেন। বহু ছোটবড় সাহিত্যিক জ্ঞাতসারে বা এমনকি অজ্ঞাতসারে, বাইবেল থেকে আহৃত শব্দগুচ্ছ, বাইবেলের সঙ্গীতময় অনুরণন, এবং তার বিচিত্র ব্যবহারিক দিক নিজেদের লেখায় ব্যবহার করেছেন। এগুলি অনুকরণ নয়, বরঞ্চ পৌর্বাপর্যের স্বীকৃতি ও একাত্মতাবোধ।

অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যায়ে এই ১৬১১ সালের বাইবেল। পুরাতনের প্রতি রহস্যময় আকর্ষণ, ঐকান্তিক ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধাশীল, আদর্শবান মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী এই বাইবেলের অম্লান বিশেষত্ব।

অন্যান্য গদ্য

এ যুগের গদ্যের বিশেষত্ব এই যে তা একদিকে গভীর, যুক্তিবাদী, বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার বাহক; আর একদিকে তা ব্যবহারিক সুবিধাযুক্ত ও কার্যকরী। সুচিন্তিত রচনার ভাষা গম্ভীর ও সংযত। আবার অনেকের ক্ষেত্রে ভাষা সুদৃঢ় কেন্দ্রাভিগ নয়। এই দুই বিচ্ছিন্ন লক্ষণের কারণও রয়েছে।

শুধু আনন্দ দান নয়, নানা প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অতীত ও বর্তমান সামাজিক অবস্থা সাদামাটাভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরাও সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যে শুধু জীবনের

সারবস্তুর সযত্ন সঞ্চয় নয়,—তা সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন,—এ সবেরও নিত্যসঙ্গী, তা এই সময়ের লেখাগুলি থেকে বোঝা যেতে শুরু করল। গদ্যসাহিত্যের পরিধি, প্রয়োজনীয়তা এবং জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। আজকের যুগে যখন আমরা সাহিত্যকে বিশিষ্ট কিছু বাছাইকরা লেখার সমন্বয় বুঝি, তখন আমরা ভুলে যাই সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ। আমাদের অন্য অনেক প্রাথমিক প্রয়োজনের বিষয়ের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লিখিত ভাষারও স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে; এবং তা উৎকর্ষ-সমন্বিত সাহিত্যের থেকে বরঞ্চ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইংরাজী সাহিত্যের এই আলোচ্য যুগেই সেই 'প্রয়োজনের' সাহিত্যে মানুষ অভ্যস্ত হতে শুরু করল। বড় বড় কিছু লেখক সম্বন্ধে দু'চার কথা অবশ্যই বলতে হয়। কিন্তু গদ্যসাহিত্যের এই ব্যাপক ব্যবহার এবং প্রসারণ সামাজিক দিক থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ছাপাখানার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, শিক্ষার প্রসার, দেশেবিদেশে গমনাগমনের আরও বেশী প্রবণতা এবং জীবনের ব্যবহারিক দিকগুলিকে স্বাভাবিক গুরুত্ব দান,—এসবের থেকেই এক অকুলীন গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হল, এবং তা' বেড়েই চলল। হুকারের (Richard Hooker ১৫৫৪-১৬০০) বিশেষত্ব এইখানেই যে তিনি ব্যবহারিক আদান-প্রদানের প্রয়োজন মেটাতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত শিল্পগুণ পেয়েছিল। হুকার তদানীন্তন চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের নির্দেশিত তত্ত্ব ও কর্তব্যগুলিকে ব্যাপক ভিত্তিতে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রাস্কিন (John Ruskin ১৮১৯-১৯০০) তাঁর শিল্পসংক্রান্ত এবং সমাজসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেও ভাষার এই বিশেষ ধারাকে অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য, এই সময়ের বহু অনামা লেখক তাঁদের নিজেদের সাহিত্যকর্মের গণতান্ত্রিক মূল্যমান উপলব্ধি করেননি। তাঁরা যে ধরনের শিল্পসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষমতায় তা সম্ভব ছিল না। তাই স্বতঃস্ফূর্ততা ও অলঙ্কারবর্জনের যে বিশেষত্ব পরবর্তীকালের গতিশীল ইংরাজী ভাষায় দেখা গিয়েছিল, তা তখনও পূর্ণ কার্যকরী হয়নি। তবু সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সেই ইংরাজী ভাষাতেই আধুনিক প্রাণবন্ত, গতিশীল ইংরাজী ভাষার অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল। প্রসঙ্গতঃ, আধুনিক ইংরাজী গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী ড্রাইডেনের (John Dryden ১৬৩১-১৭০০) আর্বিভাব অর্ধশতাব্দী পরেই। তবু বলতে হয়, ভবিষ্যতের ইংরাজী ভাষা যা হতে চলেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেই চরিত্রের যথার্থ স্বীকৃতি হয়নি। এলিজাবেথীয় মোহ মানুষকে এক কৃত্রিম অলঙ্করণের আদর্শে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। সেই আকর্ষণের কেন্দ্রীয় দৃষ্টান্ত ছিল লিলির (John Lyly-১৫৫৪-১৬০৬) 'ইউফিউস' (Euphues, the Anatomy of Wit —১৫৭৯, এবং Euphues and his England —১৫৮০)। 'ইউফিউস' সম্বন্ধে আগে কিছু বলা হয়েছে (প্রথম ভাগে)। এই ভাগে আরও কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

এ যুগের মেদুর কল্পনার ও অতিরঞ্জনের সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত সিডনির (Sir Philip Sidney—১৫৫৪-৮৬) 'দি কাউন্টেস অব পেমব্রোকস আর্কাডিয়া' (The Countess of Pembrokes Arcadia—লেখা ১৫৮০ সালে, প্রকাশ ১৫৯০ সালে)। রাখালিয়া

জীবন বোধের প্রথম ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় স্বপ্নাবেশ মাখানো সাহিত্যের ধারায় এটির সৃষ্টি। এ ধারা হ'ল জীবনের অতিমাত্রিকতা থেকে ছুটির পরিবেশে পুষ্ট। যাঁরা জীবনকে সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে দেখেছেন তাঁরাই এই ধারার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন। সিডনি কল্পনার বরপুত্র, বাস্তবের বীরনায়ক। প্রকৃতিতে মানুষের আবেগের প্রতিফলন (Pathetic Fallacy)-ও এই ধরনের রমন্যাসের মাধুর্যকে পরিবেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

সাহিত্যে ধর্মীয় স্বয়ম্ভরতার ধারণা পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হল ১৫৫৯ সালের 'সঙ্গতির আইন' ('Act of Uniformity') নামক বিলটি পার্লামেন্টে গৃহীত হবার পর থেকে। নানা মত ও পথের ক্রমাগত বিভেদ যেমন বিভিন্ন গদ্য রচনায় লক্ষ্য করা গেছে, তেমনি মধ্যপন্থার 'চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের' সমর্থনেও বেশ কিছু সুন্দর গদ্য সৃষ্টি হয়েছে। এই মধ্যপন্থার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন হুকার। হুকারের গদ্য পবিত্রতা ও গাম্ভীর্যের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

কিন্তু গুরুগম্ভীর ধর্মীয় আলোচনা, কিংবা হালকা হাওয়ার 'রাখালিয়া' রমন্যাস ছাড়াও সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অথচ ঘনসন্নিবদ্ধ সারাংশযুক্ত শক্ত বনিয়াদের গদ্যও এ যুগে লেখা হয়েছে। এ দিকে বেকনের (ফ্রান্সিস বেকন Francis Bacon ১৫৬১-১৬২৬) কথাই সকলের আগে আসে। জাগতিক বহু বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন। বক্তব্যের মূল্য অপেক্ষা ব্যাখ্যাই এখানে বেশী আকর্ষণের। জমজমাট ধরনে জ্ঞানের আলোচনাও অবাক করে দেওয়ার মত।

গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার

এই বই-এর বর্তমান খণ্ডের আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে গদ্য লেখা লিখেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রিচার্ড হাকলুইট (Richard Hakluyt ১৫৫৩ ১৬১৬), স্যার ফিলিপ সিডনি (Sir Philip Sydney ১৫৫৪-৮৬), রিচার্ড হুকার (Richard Hooker ১৫৫৪-১৬০০), জন লিলি (John Lyly ১৫৫৫-১৬০৬), ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon ১৫৬১-১৬২৬), রবার্ট বার্টন (Robert Burton ১৫৭৭-১৬৪০) এবং স্যার টমাস ওভারবেরি (Sir Thomas Overbury ১৫৮১-১৬১৩)। প্রায় সমসাময়িক রোজার আসচাম (Roger Ascham ১৫১৫-৬৮) গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তবে উপযুক্ত কারণে আসচাম-এর কথা গ্রন্থের প্রথম ভাগে বলা হয়েছে। হাকলুইট-এর উল্লেখও করা হয়েছে। জন লিলি সম্পর্কে সংক্ষেপে মোটামুটি ধারণাও দেওয়া হয়েছে।

হাকলুইট-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Principall Navigations, Voiages and Discoveries of the English Nation made by sea or over land...... at any time within the Compass of these 1500 years'. ('এই দেড় হাজার বছরের যে কোন সময়ে স্থলে ও জলে ইংরাজ জাতির প্রধান প্রধান নৌযাত্রা, দীর্ঘভ্রমণ এবং আবিষ্কারসমূহ') ১৫৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বৃটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে বৃটিশ উপনিবেশ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেই হয়ত হাকলুইট এই সব আবিষ্কার এবং অভিযানের

কাহিনী একত্রে সঙ্কলন করেছিলেন। সত্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সব কাহিনীগুলিতে সাহিত্যিক গুণ আরোপ করা শক্ত; কিন্তু হাকলুইট তা করেছিলেন। হাকলুইটের গ্রন্থটিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষের নমুনা হিসাবে দেখানো চলে না, কিন্তু এ যুগের উচ্চাকাঙ্খী ইংরাজ মানসিকতার শক্তি ও আশা এই গ্রন্থটির ভিতর দিয়ে অনুসরণ করা সম্ভব।

স্যার ফিলিপ সিডনি (১৫৫৪-৮৬)

সিডনির ব্যক্তিগত পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। জাটফেনের (Battle of Zutphen ১৫৮৬) যুদ্ধের মহান আত্মত্যাগী সৈনিক, রাণী এলিজাবেথের এককালীন প্রিয় সভাসদ গদ্যগ্রন্থ লিখেছিলেন দুটি। 'কাব্যের স্বপক্ষে' (এ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি—Apologie for Poetrie) এবং 'নিষ্পাপ স্বপ্নজগত' (আর্কাডিয়া—Arcadia)। দুটিই, বস্তুতঃ তাঁর কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। 'এ্যাপলজি' লেখা হয়েছিল ১৫৮০ সালে, কিন্তু তা প্রকাশিত হয় ১৫৯৫ সালে। 'আর্কাডিয়া'ও প্রকাশিত হয় ১৫৯৮ সালে, যদিও ১৫৯০ সালে সেটি অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং লেখা হয়েছিল অবশ্যই ১৫৮৬ সালের আগে।

'আর্কাডিয়া' সিডনির বোন লেডি পেমব্রোকের (Lady Pembroke) মনোরঞ্জনের জন্য লেখা। উইলটন (Wilton) নামক স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য এই লেখাটির প্রেরণা ও পটভূমিকা। এই লেখাটিতে চরিত্র অনেক এবং অধিকাংশই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত নয়। কর্মবীর সিডনির অন্য আর এক রূপ—কল্পনাবিলাসিতা—এতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্প হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ,—কিন্তু কাহিনী ও বর্ণনার একটা কোমল আকর্ষণ আছে। অতীত কোন যুগের স্বপ্নমধুর রোম্যান্টিকতাই এর প্রধান আশ্রয়। নানা অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্ন বিষয় শেষ পর্যন্ত 'মুসিডোরাস' ও 'পামেলা' (Musidorus and Pamela), এবং 'পাইরোক্লেশ' ও 'ফিলোক্লিয়া'-র (Pyrocles and Philoclea) বিবাহে একটা পরিণতিতে পৌঁছায়।

'এ্যাপলজি ফর পোয়েট্রিতে' সিডনি কবিকে মানবসমাজের নিয়ামক নীতিপ্রণেতা এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা (ভ্যাটিস-Vates) বলেছেন। 'এ্যাপলজি' পৌরুষব্যঞ্জক লেখা। প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখাই ছিল সিডনির আদর্শ, এ্যাপলজিতে তিনি তা' সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যের সারিতে 'এ্যাপলজি'র স্থান গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে যুক্তিকে দৃঢ়ভাবে অথচ সুন্দর করে প্রতিষ্ঠা করার একটা নির্ভরযোগ্য আদর্শ এতে পাওয়া যায়।

সিডনির 'আর্কাডিয়া' এবং লিলির ইউফিউস (প্রথম ভাগের ১৩৩ নং পাতায়) এলিজাবেথীয় রোম্যান্সের (বা রমন্যাসের) সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। রোম্যান্সের মূল অর্থ এবং তার ব্যাখ্যা প্রথম ভাগের ৬০নং পাতায় আছে।

এ যুগের সাহিত্য ও শিক্ষার উত্তরোত্তর উন্নতির পাশাপাশি গণচেতনার ধর্মীয় ভিত্তি খুব গুরুত্ব পেয়েছিল। এর প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। রোমের আদি ক্যাথলিক ধর্মের অনুশীলন ও অনুশাসনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিরোধ পাকাপাকি হয়ে গেল। অথচ প্রতিক্রিয়া হিসাবে চরম পবিত্রতাবাদ (Puritanism)-এর সঙ্গেও সাধারণ-অসাধারণ কোন মানুষ নিজেদের মানিয়ে নিতে পারল না। একটা মধ্যপন্থার দরকার হ'ল যার দার্শনিক ও ঐতিহাসিক

ভিত্তি সুদৃঢ় হবে, এবং যা হবে ব্যবহারিক দিক থেকে সহজে অনুসরণযোগ্য। ক্যাথলিক ধর্মের গভীর বিশ্বাস ও নিষ্ঠার রহস্যময় সৌন্দর্য এতে হয়ত থাকবে না; কিন্তু সাধারণ মানুষ খানিকটা 'সহজিয়া' পন্থা চাইতে থাকল। এখানেই এ্যাংলিকান চার্চের মূল শক্তি। আমাদের বিষয় ধর্ম-আলোচনা নয়,—সাহিত্যের ইতিহাস। তবে এই সময়ে ধর্ম-আলোচনা-মূলক সাহিত্য মানুষের মনের খোরাক যোগাতে তৎপর হয়েছিল। কিন্তু এই সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী কোন্ আদর্শ অবলম্বন করবে?

লিলি এবং তাঁর আলঙ্কারিক ইউফিউসিয় ভাষা তখন বাজার ছেয়ে রেখেছে। অল্প কিছুকাল পরেই তার অন্তঃসারশূণ্যতাকে কটাক্ষ করে পরোক্ষভাবে সুন্দর ব্যঙ্গরচনা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেখানে গুরুগম্ভীর বিষয়ের জন্য গুরুগম্ভীর ভাষার দরকার সেখানে লিলিকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। এই পটভূমিকায় চার্চ অব ইংল্যাণ্ড বা এ্যাংলিকান চার্চের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি সুনির্দিষ্ট করবাব ভার নিলেন রিচার্ড হুকার।

রিচার্ড হুকার

রিচার্ড হুকার (Richard Hooker) ১৫৫৪-১৬০০

হুকারকে তাঁর ভক্তি ও যুক্তি, সামাজিক চাহিদাপূরণ ও স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ,—এগুলিকে বজায় রেখে গদ্যসাহিত্য রচনা করতে হয়েছিল। তিনি অক্সফোর্ডে হিব্রুর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ধর্মসংক্রান্ত নীতি ও নিয়ম, বিশ্বাস ও পরিপালনকে সাধারণ মানুষের মনের মত করে উপস্থাপিত করলেন। পাঁচভাগে বিভক্ত তাঁর গ্রন্থ 'ধর্মসংঘের নীতি ও কৃত্যকে বজায় রাখার আদর্শ নিযামক' (The Laws of Ecclesiastical Polity) ১৫৯৪ এবং ১৫৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গুরুত্ব ছাডাও এই বই-এর দূরবিন্যস্ত প্রভাব রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামবিক স্বয়ম্ভরতার মত ধর্মীয় স্বয়ম্ভরতা বরাবরের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। ভাষার দিক থেকে এতে ছিল বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-মাধ্যমের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য। এটি উচ্চমানের সাহিত্যের অন্যতম বিশেষ সর্ত। সাংস্কৃতিক দিক থেকে হুকার যেন একই সঙ্গে দার্শনিক ও পুরোহিত দুইই ছিলেন। ধর্মসংঘের সংস্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ। যুক্তি ও উদাত্ত আহ্বান তাঁর ধর্মসংক্রান্ত লেখাকে সাহিত্যের স্তরে তুলে দিয়েছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় আনুগত্যের সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে তিনি উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। সাহিত্যের পরিবেশ সৃষ্টিতেও তাঁর প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী ছিল।

জন লিলি (John Lyly)-র গদ্যসাহিত্যের কথা গ্রন্থের প্রথম ভাগে আলোচনা করেছি।

এবার আসি বেকনের কথায়।

ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) ১৫৬১-১৬২৬

মেকলের (Thomas Babington Macaulay ১৮০০-১৮৫৯) মন্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক। 'প্লেটোর মতে, মানুষের উদ্ভব ও অস্তিত্ব দর্শন বা জ্ঞানকে উপলক্ষ্য করে; বেকনের মতে দর্শন বা জ্ঞানের আলোচনা মানুষকে উপলক্ষ্য করেই।' যে যুগে

যুক্তিহীন বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বেকন সে যুগে উন্নত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

ইংরাজীতে লেখা বেকনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দুটির নাম 'শিক্ষার অগ্রগতি' (Advancement of Learning) এবং 'প্রবন্ধাবলী' (Essays)। প্রথমটি ১৬০৫ সালে, এবং দ্বিতীয়টি ১৫৯৭, ১৬১২ এবং ১৬২৫ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ল্যাটিন গ্রন্থই তিনি গুরুত্ব দিয়ে লিখেছিলেন। ১৬২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম ল্যাটিন গ্রন্থ 'De Augmentis Scientiarum'-এ তিনি শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়বস্তুকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। 'জ্ঞানই প্রগতির ভিত্তি' এই মতকে 'শিক্ষার অগ্রগতি'-র জন্য ব্যবহার করেছিলেন। 'প্রবন্ধাবলীতে' (Essays) জনজীবনে ও সামাজিক জীবনে সাফল্য ও নিরাপত্তার জন্য বিজ্ঞতা, সতর্কতা, কৌশল এবং ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ দুটিতে ('শিক্ষার অগ্রগতি' এবং 'প্রবন্ধাবলী') বেকন মুখ্যতঃ যে জিনিষটিকে লক্ষ্য হিসাবে ধরেছিলেন তা হ'ল জ্ঞানের ব্যবহারিক দিক। জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ও ফলাফলই ছিল যেন বেকনের জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য। সত্য এবং সত্যবস্তুর উপযোগিতা ছিল বেকনের কাছে একই বিষয়। মানুষকে তার ব্যবহারিক জগতে কত বেশী সফল করা যায় এবং তার অস্বাচ্ছন্দ্য কতটা কমিয়ে দেওয়া যায়,—এটাই ছিল বেকনিয় দর্শনের উদ্দেশ্য। বেকন ছিলেন 'আরোহী যুক্তিবিদ্যার' (Inductive Logic) শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। নানা তথ্যসংগ্রহ, সেগুলির বিশ্লেষণ, এবং তার দ্বারা মূল নিয়ম আহরণ,—যুক্তি পরিচালনার এইটাই ছিল বেকনিয় পদ্ধতি। তবে সমসাময়িক নতুনত্ব থিতিয়ে যা থেকে গেল তা তাঁর যুক্তিবিস্তারের পদ্ধতি নয়;—তা হল বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নতুন নতুন ধারণা এবং সেগুলির প্রকাশের চমৎকারিত্ব।

বেকনের নিজের এবং অন্যান্য অনেকের ধারণামত তিনি দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগের নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন,—পরে যার ব্যাপক প্রয়োগ হবার সম্ভাবনা। 'আমি শুধু তূর্য নিনাদ করেছি, যুদ্ধ করবেন উত্তরসূরীরা ('I only sound the clarion; but I enter not into the battle')।

ফ্রান্সিস বেকনের বাবার নাম Sir Nicholas Bacon—অতি উচ্চ পর্যায়ের রাজকর্মচারী—Lord Keeper of the Great Seal। এঁদের বংশ ছিল খুব প্রতিপত্তিশালী। কাজেই আইন-ব্যবসায়ে বা রাজনীতিতে উন্নতি করতে তাঁর খুব অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রকৃত সাফল্য এসেছিল রাজা প্রথম জেমসকে খোসামোদের জন্য। তবে আসলে তিনি ছিলেন দার্শনিক ও সাহিত্যিক। ভাগ্যের উত্থানপতনে শেষজীবনে যেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন সেখানে সাহিত্যকেই তিনি সম্পূর্ণ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। জীবনের প্রথম থেকেই যে যশ এবং কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তিনি যা কিছু প্রয়োজন তা-ই করতে যে আগ্রহী ছিলেন, সেই যশ এবং কৃতিত্বের স্বীকৃতি জীবনের শেষ অংশে সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলেন। বেকনের উচ্চ পদমর্যাদা—পার্লামেন্টের সদস্যপদ, নাইট উপাধি, এ্যাটর্নি জেনারেলের পদ, লর্ড চ্যান্সেলরের পদ, ব্যারণ খেতাব, ভাইকাউন্ট খেতাব—আজ আমাদের কাছে তুচ্ছ; সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসাবেই তাঁর স্থায়ী স্বীকৃতি।

বিলাসিতার ভিতরেও প্রকৃত সত্যান্বেষণ, ইংরাজীকে তুচ্ছ করেও তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ ইংরাজী লেখক হওয়া, খৃষ্টধর্মে পরম বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন,—এই সব পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশে বেকনের চরিত্র আকর্ষণীয়।

'Essay' ('এসে'—রচনা) কথাটি মনটেন-এর (Michel De Montaigne —১৫৩৩-৯২) ১৫৮০ সালে ফ্রান্সে প্রকাশিত এবং ১৬০৩ সালে ফ্লোরিও (John Florio) দ্বারা ইংরাজীতে অনূদিত 'Essaies' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছিল। মনটেন এই জাতীয় লেখাকে খুব কেতাদুরস্ত আলোচনার ধরনে নিয়ে যেতে চাননি। বেকনও তাঁর রচনাগুলিতে বদ্ধমূল ধারণার প্রচার করতে চাননি। শুধু অল্প কথায় গুছিয়ে তাঁর বক্তব্য বলেছেন। তবে মনটেন যেখানে বিষয়কে উপলক্ষ্য করে আত্মকথা বলেছেন, বেকন সেখানে বিষয়কে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বেকন নীতিশিক্ষা দিয়েছেন, তবে সেখানে আত্মপ্রচারের কোন চেষ্টা নেই ; আর, তিনি লিখেছেন অভিজাত শ্রেণীর অনভিজ্ঞ পাঠককে সংসার এবং সমাজ সম্পর্কে কিছু শেখানোর জন্য। যুক্তি, সহজবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধ তাঁর ধারণা দিয়ে তিনি তাঁর পাঠককে দক্ষ ও বুদ্ধিমান করতে চেয়েছেন। বেকনের লেখা তাঁর অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও স্বাভাবিক সহজবুদ্ধির ফল।

বেকন কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ নৈতিকতাকে স্থান দেননি। পোপ (Alexander Pope ১৬৮৮-১৭৪৪)-এর মতে বেকন ছিলেন 'বিজ্ঞতম, উজ্জ্বলতম, নীচতম মানুষ'। তিনি অসামান্য বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সংবেদনশীলতা যেমন ছিল বহুমুখী, তেমনি আর একদিকে বুদ্ধি ও নৈতিকতাকে তিনি নিজের জীবনে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। এ ছাড়াও, আরও বলা হয়,—হৃদয়বৃত্তির উপরে তিনি মস্তিষ্ককে স্থান দিয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে 'প্রবন্ধাবলী' ('Essays') ১৫৯৭, ১৬১২ এবং ১৬২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে, এবং উত্তরোত্তর রচনাগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। এই পঁচিশ তিরিশ বছরে কিন্তু রচনাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষযে তাঁর মতামতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। শুধু উদাহরণ, বাগবিস্তার ও উদ্ধৃতির পরিমাণ বেড়েছে। প্রকাশভঙ্গী আরও ঝকঝকে হয়েছে এবং বাস্তবমুখী হয়েছে। এই লক্ষণগুলি খুব স্পষ্ট হয়েছে যেসব রচনায় সেগুলির ভিতর আছে—'সম্পদ' (Riches), 'ব্যয়' (Expense) এবং 'তেজারতি' (Usury) নামক তিনটি রচনা।

তারপর বেকন যখন খ্যাতিব সোপান বেয়ে উপরে উঠতে থাকলেন তখন তিনি সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রচনাগুলি লিখতে থাকলেন।

বেকনের রচনাগুলিকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নৈতিক রচনা, ধর্মীয় রচনা, এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক রচনা।

'নৈতিক' রচনাগুলিতে বেকনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল,—তিনি ছিলেন জীবন-শিল্পী। এই শ্রেণীর রচনায় তিনি কোন দার্শনিকতা প্রচার করেননি, বা কোন সমস্যা নিয়ে বাঁধাধরা পদ্ধতিতে অলোচনা করেননি। এখানে তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। তিনি বলেছেন নৈতিক ব্যর্থতা ন্যায় সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে যতটা না

আসে, ন্যায়ের পথ অবলম্বনের ইচ্ছার অভাব থেকে তার থেকে বেশী আসে। ভাল নৈতিক শিক্ষার উপরে তিনি খুব জোর দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আচরণ সম্পর্কিত ধারণা পরিস্ফুট হয়। শারীরিক রোগের মত নৈতিক দোষদুষ্টতাকে ভাল করে বুঝতে হবে, এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। সামাজিক জীবনের নৈতিকতাকে তিনি অনাসক্ত, বস্তুভূত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছেন। তাঁর বক্তব্য তিনি খুব চাঁছাছোলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই 'নৈতিক' রচনাগুলির ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'প্রতিকূলতা' (Adversity), 'ঈর্ষা' (Envy), 'আপাত জ্ঞানী' (Seeming Wise) 'সন্দেহ' (Suspicion), 'উচ্চাকাঙ্খা' (Ambition), 'ভাগ্য' (Fortune), 'সম্মান ও খ্যাতি' (Honour and Reputation), 'নানা উত্থান-পতন' (Vicissitudes of Things), এবং 'সত্য' (Truth)।

বেকনের 'ধর্মীয়' রচানাগুলির পিছনে একটা বিশেষ আদর্শ কাজ করেছিল।—ঈশ্বরের করুণা সর্বত্র বিরাজমান। মানুষ যেন সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রেম ও করুণাকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে। বেকন প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ধর্মব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সহিষ্ণু ও উদার। রাষ্ট্র ও ধর্মসঙ্ঘের সম্পর্কে সে যুগের একটা উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হয়েও তিনি ধর্মসঙ্ঘের স্বাধীন অস্তিত্বের পক্ষে কথা বলেছেন। তবে এও বলেছেন যে ধর্মসঙ্ঘেরও রাষ্ট্রের মত জাগতিক ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানিয়ে চলা উচিৎ। তিনি জানতেন যে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বেশী কূটকচালি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। পণ্ডিতী ধর্মতত্ত্ব এবং ঈশ্বরের প্রতি সহজসরল নির্ভরশীলতা ও ভক্তি—এই দুই-এর ভিতরে দ্বিতীয়টিকেই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করতেন। তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্বজগতের যেটুকু রহস্য ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশ করেন তাতেই তিনি মহান। সুতরাং ধর্মীয় বাদানুবাদে লিপ্ত থাকা সাধারণ মানুষের পক্ষে ভাল নয়। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা বা নাকচ করার কোন দরকার আছে বলে তিনি মনে করেননি। বেকনের ধর্মীয় মতামত আন্তরিক কিংবা সমস্যাকে এড়িয়ে যাওযার ফন্দী তা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর আপোষ-মীমাংসার সূত্র যে অনর্থক কলহ বন্ধ করার পক্ষে খুব উপযোগী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় রচনাগুলি হচ্ছে : 'ধর্মীয় ঐক্য' (Unity in Religion), 'নিরীশ্বরবাদিতা' (Atheism) এবং 'মোহাচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাস' (Superstition)।

'রাজনৈতিক' ও 'সামাজিক' রচনাগুলিতে দেখা যায় যে, তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক ধারণা গ্রন্থপাঠ থেকে আসেনি,—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। তিনি অন্যদেরও ওই সব বিষয়ের জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে বলেছেন। অভিজ্ঞ মানুষের জ্ঞান থেকেও শিক্ষা নেওয়া যায। তাঁর দেওয়া রাজনৈতিক পরামর্শ এবং তাঁর মতাদর্শের জন্য তাঁকে তাঁর যুগের ম্যাকিয়াভেলি (Nicolo Machiavelli—১৪৬৯-১৫২৭) বলে বলা যায়। তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা উভয়ের লেখারই বৈশিষ্ট্য। ম্যাকিযাভেলির সমস্ত রচনার একটা সামগ্রিক তত্ত্বগত একমুখীনতা ছিল। অন্যদিকে, বেকন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও অবস্থার উপর তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ম্যাকিয়াভেলির রচনার বিষয়বস্তু তাঁর পরিকল্পিত রাজশক্তির চরিত্র ; আর, বেকনের রচনার উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করানো এবং নানা বিষয়ে পরামর্শদান। তাই ম্যাকিযাভেলির লেখা কৌতূহল উদ্রেক করে, আর, বেকনের রচনা প্রয়োজন মেটায় এবং পরামর্শ দেয। এটাই বেকনের রচনার একটি বিশিষ্ট স্থায়ী শক্তি। অভিজাত সমাজের রীতি ও নীতি সম্পর্কে তাঁর দু'একটি রচনার নাম এখানে উল্লেখ করা যায়।—'যা নেই তার ভান করা এবং যা আছে তা নেই এমন ভান করা' (Simulation and dissimulation), 'আভিজাত্য' (Nobility), 'রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও অশান্তি' (Seditions and Troubles), 'সাম্রাজ্য' (Empire), 'ধূর্ততা' (Cunning) etc.

বেকন তাঁর রচনাগুলিতে তাঁর মতামত সোজাসুজি এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই প্রকাশভঙ্গী তাঁর মতামতের চেযে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আজ কয়েক শত বছর বাদে তাঁর দার্শনিকতা নিয়ে আমরা তত মাথা ঘামাই না ; কিন্তু তাঁর আলঙ্কারিক, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ষ্টাইল ইংরাজী গদ্যকে কতখানি আধুনিক ও গতিশীল করেছে তা বুঝতে চাই।

বেকন তাঁর রচনার কাঠামোর আদল মনটেনের কাছ থেকে পেযেছেন ; কিন্তু মনটেন যেখানে তাঁর রচনার বিষযবস্তুকে আত্মোপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়ে দিযেছেন, বেকন সেখানে তাঁর রচনার বিষয়কে নিজের সঙ্গে মিশিযে দেননি।

তাঁর রচনার প্রকাশভঙ্গীগত বিশেষত্ব এই যে ধানাই-পানাই না করে তিনি সরাসরি বক্তব্য বিষয়ের ভিতর ঢুকে পড়েন, এবং অপ্রযোজনীয় একটি শব্দকেও আমল দেন না। একটির পর একটি কথা স্বতোৎসারিত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং স্থির লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্যের ধরনটা যেন এমনই : 'আমি কোন আলোচনা করতে চাই না; যা বলছি তা শুনে যাও।' তাঁর বক্তব্য গাণিতিক স্পষ্টতায় ব্যক্ত। আপ্তবাক্যের মত তা পাঠককে শুনতে এবং নির্দ্বিধায মেনে নিতে বাধ্য করে। একটি একটি করে বাক্য পরপর পাঠকের মনে ঘা দিতে দিতে চলে। বেকনের রচনার বক্তব্যে নিহিত জ্ঞান পাঠকেব যতটা না উপকারে আসে, তার চেয়ে বেশী সে অভিভূত হয় বক্তব্যের তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা। তাঁর বক্তব্য অনুচ্ছ্বাস, দৃঢ, স্পষ্ট বোধগম্য, হৃদয-সম্পর্ক-রহিত মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান ও যুক্তির শক্তিশালী অভিব্যক্তি।

বেকনের ছোট ছোট প্রবন্ধগুলি ইংরাজী প্রবন্ধের উৎস-মুখ খুলে দিয়েছিল। ফরাসী বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ আবার বেকনকে বিশ্বজনীন এবং আলঙ্কারিক দার্শনিকদের ভিতর শ্রেষ্ঠ বলে বলেছেন। স্বদেশে বেন জনসন (Ben Jonson—১৫৭৩-১৬৩৭) তাঁর ভাষা ও বক্তব্য বিষয়কে রুদ্ধশ্বাস আকর্ষণীয় বলে বলেছেন; এবং শেলী (Percy Bysshe Shelley—১৭৯২-১৮২২) তাঁর অতিমানবিক বিস্তৃতায় বিস্মিত হয়েছেন।

এরপরে আর দুজন মানুষের কথা বলে আমরা আলোচ্য যুগে ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের

কথা শেষ করবো। এঁরা হলেন **রবার্ট বার্টন** (Robert Burton ১৫৭৭-১৬৪০) এবং **টমাস ওভারবেরি** (Thomas Overbury ১৫৮১-১৬১৩)।

বার্টনের বিখ্যাত বই 'বিষাদের ব্যবচ্ছেদ' (Anatomy of Melancholy) ১৬২১ সালে প্রকাশিত হয়। আমরা বর্তমানে যাকে 'স্নায়ুরোগ' (Neurosis) বলি, এবং হ্যামলেটের প্রকৃতির যে পরিচয় আমরা ওই নামের নাটকে পাই তাকেই এখানে 'বিষাদ' (Melancholy) বলা হয়েছে। প্রাচীন চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে যে চারটি 'রস' (হিউমার—Humour)-এর—'রক্ত' (ব্লাড—Blood), 'কফ' (ফ্লেম—Phlegm), 'পিত্ত' (কোলের—Choler) এবং 'বাতশূল' বা 'বাতশূলঘটিত বিষাদ' (মেলানকলি—Melancholy)—উল্লেখ করা হয়েছে, এই 'বিষাদ' (বাতশূলঘটিত) তারই একটি।

এ যুগের ভৌগোলিক জ্ঞানের বিস্তারের সমান্তরালে মানুষের মনোজগতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এই বইটি প্রায় পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতাসম্পন্ন পণ্ডিতদের কাছে বইটি বরাবরই আকর্ষনীয় হয়েছে।

ওভারবেরি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিষপ্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে সব নানা ধরনের সাধারণ মানুষ দেখা যায় তাদেরই 'ব্যক্তিতে গোষ্ঠীরূপ' প্রকাশ করে অর্থাৎ 'টাইপ' (Type) চরিত্র হাজির করে 'চরিত্রচিত্রণ' ('Characters') নামক গ্রন্থ তিনি ১৬১৪ সালে প্রকাশ করেন।

পরবর্তী বহু লেখকের নানা প্রবন্ধ ও নাটকে বিভিন্ন 'টাইপ' (Type) চরিত্রের উপস্থাপনে এই বইটি খুবই সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে টমাস ডেকারের (Thomas Dekker ১৫৭২-১৬৩২) লেখা লণ্ডনের নাগরিক জীবনের বিভিন্ন চিত্রের সঙ্গে ওভারবেরির টাইপ-চরিত্রগুলির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

এর পর, আলোচ্য যুগেরই শেষ দিকে ১৬৪৪ সালে মিলটনের (John Milton ১৬০৮-৭৪) এ্যারিওপ্যাগিটিকা (Areopagitica) প্রকাশিত হয়। কথাটির অর্থ 'সর্বোচ্চ স্তরের আদালতের বিচার'। মুদ্রিত আকারে কোন লেখা প্রকাশ করার ব্যাপারে লেখক ও মুদ্রাকরের অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও শেষ পর্যন্ত এতে বিবেকের স্বাধীনতা, এবং চিন্তা ও ধারণা স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে মিলটনের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিজে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট হয়েও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট পার্লামেন্টের চেতনাকে এই প্রচার পুস্তিকার সাহায্যে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন।

ইংরাজী কবিতা

আলোচ্য যুগের ইংরাজী কবিতার অবস্থা জানতে গেলে আমাদের বেশ কয়েক দশক আগে থেকে তার খেই ধরতে হবে।

এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে চশারের কীর্তিচ্ছটা পঞ্চদশ শতাব্দীকে ম্লান করে দিয়ে গেছে। ইংরাজী কবিরা প্রগতির স্রোত বহমান রাখতে পারেননি ; স্কচ কবিরা চশারের

প্রতি আনুগত্যের যে আধিক্য দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁরাও এগিয়ে যেতে পারেন নি। এ অবস্থায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের কাব্যের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এর পর, কবিরা যখন প্রেরণা পাবার জন্য বিদেশের দিকে তাকালেন তখন তাঁরা ফ্রান্সের চেয়ে ইটালির উপর বেশী নির্ভর করলেন। চশার প্রাথমিকভাবে ফরাসী ধারা অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু সে অনুসরণে কাহিনীর বিন্যাস থাকলেও তা সাবলীল ছিল না। মানবচরিত্রের ব্যাপক ও বিচিত্ররূপ, যা পরবর্তীকালে চশারের গৌরবের শ্রেষ্ঠ ধারক হয়েছিল, এবং তাঁর কৌতুকবোধ অবশ্যই তাঁর নিজস্ব। কিন্তু কাব্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ক্লাসিক প্রভাব তিনি আমব্রিয়া (Umbria—মধ্য ইটালি) ও উত্তর ইটালির পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং রাজনীতি-প্রভাবিত বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পরিবেশ থেকেই পেয়েছিলেন। এই প্রভাবের অনুসরণ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মেও চলেছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাব্যের শক্তি ও শৃঙ্খলার আদর্শ দক্ষিণ ইউরোপে একমাত্র ইটালির কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারত। তবে উত্তর ইটালি কোনদিনই ফরাসী প্রভাবমুক্ত ছিল না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যে যে আদর্শ অনুসরণ কবার চেষ্টা হয়েছিল সেই মূল আদর্শ দৃঢ়ভিত্তিক, এবং তার শুরু ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইটালিতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেনটিনি (Jacopo Da Lentini ১১৯৫-১২৪০) 'সনেট'-এর সূত্রপাত করেন। এটি ফরাসী আদর্শের বিবৃতি ও কাহিনীমূলক কাব্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাভলক্যান্টি (Guido Cavalcanti ১২৬০-১৩০০) এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর দান্তের (Dante Alighieri ১২৬৫-১৩২১) পরে ইটালির শ্রেষ্ঠ কবি পেত্রার্কা (Francesco Petrarca ১৩০৪—৭৪)। কাব্যে পেত্রার্কের বড় অবদান এই যে তিনি বহুচর্চিত প্রেমের কবিতাতে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ও অনুভূতিকে একটা সুনির্দিষ্ট গঠনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন। আমরা সকলেই জানি দেশ-কাল-ব্যক্তিভেদে কিছু কিছু তফাৎ থাকলেও সনেট ধীরে ধীরে এক বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। সর্বত্র এবং সব সময়ে গীতিকবিতার (Lyric) সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ হিসাবে এর ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ছিল। বর্তমান যুগের কাব্যের কোন বিশেষ গঠন-ভঙ্গীমা নেই; সুতরাং সনেট-এর ব্যবহারও খুব সীমিত। এই সনেটের ব্যাপক প্রচলন পেত্রার্কের হাতেই শুরু।

এখানে Subjective বা 'মন্ময়' কবিতার সম্বন্ধে আরও দুচার কথা বলার দরকার এই জন্য যে ষোড়শ শতকে ইংরাজী সাহিত্যে নাটকের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও এটা দেখা যায় যে আদি পর্বের (এ্যাংলোস্যাকসন, পরে ইংরাজী) কবিতার পরে, এই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সেই মন্ময় কবিতার গৌরবময় পুনঃপ্রকাশ হয়েছে। সে গৌরব আজ পর্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অন্যদিকে 'তন্ময়' (Objective) কবিতা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়সীমার ভিতরে 'ক্লাসিক' ও অন্যান্য ধরনের প্রকাশের

মধ্যে বহুকাল ধরে বদ্ধ রয়েছে। কাব্যে ক্লাসিক প্রভাব এখনও যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু খাঁটি 'তন্ময়' (Objective) কবিতা এখন দুর্লভ।

মন্ময় (Subjective) কবিতায় কবি নিজের ভিতর নিজে ডুবে যান, এবং তাঁর নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও অনুভবই তাঁর কাব্যের প্রেরণা ও বিষয়বস্তু। মন্ময় কবিতার আবেগ যত বেশী করে কবির নিজস্ব হবে, অর্থাৎ যত কম গতানুগতিক হবে, কবিতা তত বেশী সার্থক। অবশ্য কবির প্রকাশ ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খাঁটি আবেগ অনুভব করেও কবি হওয়া যায় না। তখন ডি. এল. রায়ের ভাষায় বলতে হয় : 'নীরব কবি হয়ে রইলাম চটে মটেই তো'। আর তা ছাড়া, প্রকাশের ধরন দেখেই বোঝা যায় যে আবেগ খাঁটি না দায়সারা। খাঁটি আবেগকে কাব্যগুণযুক্ত করতে গেলে তার ঘনীভবন বা স্বল্প আয়তনে প্রকাশের দরকার। আর একদিকে, কবিতাকে জনপ্রিয় করতে গেলে কবির সঙ্গে সমমানসিকতাসম্পন্ন অন্যান্য মানুষের অনুভূতির সঙ্গে তাকে মেলান দরকার। এই ভাবগত ধারণাকে বস্তুগত ধারণায় প্রকাশ করাকে এক কথায় resonance বা ভাবের অনুরণন বলতে হয। পরিবহন এবং পরিচলনের মিলিত প্রতিক্রিয়াও বলা চলে একে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, মন্ময কবিতায় প্রকাশের দক্ষতা ও সক্রিযতা কবির নিজস্ব হলেও তাঁর অনুভব এবং আবেগ সমমনোভাবসম্পন্ন মানবগোষ্ঠির অনুভব এবং আবেগের প্রতিনিধিত্ব করে। আবেগ এবং অনুভব ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের যারই হোক না কেন, যেহেতু অনেক মানুষ একই সঙ্গে একই কবিতা রচনা করছেন না, সুতরাং মন্ময় কবিতায় ব্যক্তিবিশেষের, অর্থাৎ কবির, স্বকীয়তার সমাদর অবশ্যই হয। একই আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে নানা কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ হওযা খুবই স্বাভাবিক। তাই সেখানে এককভাবে, ব্যক্তিবিশেষের কোন এক বিশেষ কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে, সেই কবিতার কবি নামক বিশেষ একটি ব্যক্তিকে গুরুত্ব না দিলে চলে না।

আগেই বলেছি ঘনীভবন বা স্বল্প আযতনে প্রকাশ মন্ময কবিতার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রযোজন। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, গ্রে'র (Thomas Gray ১৭১৬-১৭৭১) Elegy Written in a Country Churchyard নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ মন্ময কবিতা, এবং তা আয়তনে খুব বড।

যাই হোক, 'সনেট' এই রকম একটি মন্ময় কবিতার ধরন। এতে চোদ্দটি লাইন। স্তবক বিভাগের রীতি প্রধানতঃ দুরকম। নিযমিত বা মিলটনিক বা ইটালিয়ান এবং অনিয়মিত বা শেক্সপীয়েরীয়। এখানে 'নিয়মিত' বা 'অনিয়মিত' বলতে প্রকাশভঙ্গীর দুটি সুনির্দিষ্ট ধরন বোঝায়। সনেটে ছন্দেরও বিশেষ ধরন আছে। এটি দশমাত্রার চরণবিশিষ্ট মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর কবিতা। প্রতি দুটি মাত্রার দ্বিতীয়টির উপর জোর পড়ে, প্রথমটির উপর পডে না।

সনেটের সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে এটি একটিমাত্র চিন্তা এবং অনুভবের প্রকাশ। সনেটে একাধিক বিভিন্ন অনুভূতির স্থান নেই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মন্ময় কবিতার অনুশীলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। আর এই ব্যাপকতা সনেটের উপরেই বেশী নির্ভর করেছিল। সনেট এমনই এক ধরনের

কবিতা যাতে অস্পষ্ট বা ভাবগতভাবে অনিয়মিত হওয়া যায় না বা বড় বড় কথার আড়ালে বক্তব্যকে দুর্বোধ্য রাখা যায় না। এতে নির্ধারিত সীমার ভিতরে এবং নির্দিষ্ট নিয়মে কবিকে তাঁর কারুকুশলতা দেখাতে হয়। যে কোন সনেটের সারবত্তা বা হীনতা এক নজরেই ধরা পড়ে।

ষোড়শ শতকের ইংরাজী সনেট

ষোড়শ শতকের সনেটে, বিশেষ করে প্রথম দিকে, যুগের মেজাজ প্রায়ই ব্যক্ত হত। ফারাসী এবং ইটালিয়ান—ভাব ও ভাষা—ব্যক্ত করাতে, অবশ্যই অনুবাদে, কবির বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হোত না।

স্যার টমাস ইয়াট এবং হেনরী হাওয়ার্ডের পরে ফিলিপ সিডনি, এডমণ্ড স্পেনসার এবং সেক্সপীয়র সনেটকে ইংরাজী সাহিত্যে স্থায়ীত্ব দিলেন। এঁরা সনেটকে এক বিশিষ্ট সৌন্দর্য দান করলেন। পরে এতে ড্যানিয়েল, ড্রেটন এবং কনষ্টেবল কান্তিবাদী স্থায়ী আগ্রহ যুক্ত করেন। এইসব কবিদের সনেট সম্পর্কে আলাদা আলাদা আলোচনা উপযুক্ত স্থানে দেওয়া হবে।

এ যুগের সনেটের যথার্থ পথপ্রদর্শক বলতে আমরা স্পেনসারকে হাজির করতে পারি। স্পেনসার প্রধানতঃ সমসাময়িক ফারাসীধারা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর প্রাথমিক সনেটগুলির কয়েকটি ফরাসী কবি জোয়াকিম ডু বিল্লে'র (Joachim Du Bellay) অনুকরণ। আবার কয়েকটি ক্লিমেণ্ট ম্যারটের(Clement Marot) অনুকরণ। তবে ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজী সনেটের উপর বিল্লে বা ম্যারটের থেকে রণসার্ড (Ronsard) এবং ডেসপোর্টেস (Desportes)-এর প্রভাব বেশী। শেষোক্ত দুই কবিও ফারাসী। তবে ধীরে ধীরে ইয়াটের অনুসৃত পেত্রার্কান মডেল ইংরাজদের উপর আবার একক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

সনেটের প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলির এবং স্পেনসারের সনেটগুলির কথা মনে রেখেও বিশেষ কারণে আর একজনের নাম করা খুব দরকার। ইনি হচ্ছেন টমাস ওয়াটসন (Thomas Watson)। সনেটের কবি হিসাবে ইনিই প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। ইনি ফারাসী আবেগ ও ইটালিয়ান গতানুগতিকতাকে পুরাপুরি অনুসরণ করেছিলেন। এঁর কবিতাগুলি ছিল আঠারো লাইনের। ১৫৮২ সালে প্রকাশিত এঁর কবিতাসমগ্রের নাম ছিল 'Hecatompathia: or Passionate Centurie of Love'। সিডনির উপর ওয়াটসনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়

লিরিকের আবেগ এবং যথাযথ শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে সিডনির কোন জুড়ি ছিল না। ইটালিয়ান এবং ফারাসী শব্দমাধুর্যের প্রতিধ্বনি সিডনির সনেটে খুব স্পষ্ট। শুধু প্রেম নয়, ধর্মীয় এবং সখ্যতার বিষয়ের উপর লেখা পরবর্তীকালের অনেক কবির সনেটে সিডনির প্রভাব দেখা যায়।

আবার, স্পেনসারের সনেটে একটি প্রাচীন বিশ্বাসের পুণঃপ্রচলন লক্ষ্য করা হয়। এটি হচ্ছে 'কবির আত্মাভিমান' (Poetic Conceit-পোয়েটিক কনসিট)। এটির অর্থ,

কবিতা কবিকে অমরত্ব দান করে। এর সঙ্গে এই ধারণাও যোগ করা হয়: কবিতায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কবি অমরত্ব দান করেন। স্পেনসার এই আত্মাভিমানকে যুগোপযোগী করে ব্যবহার করেছিলেন। এই চিরকালীনতার ধোঁকা এ যুগের সনেটগুলির অন্যতম বিশেষত্ব। এটি স্পেনসার, ড্রেটন এবং ড্যানিয়েলে খুব স্পষ্ট।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু সনেটের কৃত্রিমতা, নীরসতা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হয়েছিল। প্রেম-বিষয়ক বহু সনেটকে নিযে বিদ্রুপ করা হয়েছিল। অনেকে পযসা দিয়ে সনেট কিনে নিজের বলে চালাত। তা ছাডা ভাবপ্রবণতার কৃত্রিমতাও সনেটের অনুশীলনকে গ্রাস করতে চাইছিল। সনেটের কৃত্রিম নিযমকানুনকে শেক্সপীয়র এবং বিশেষ করে, বেন জনসন প্রচুর ধিক্কার দিযেছিলেন।

কবি ও কাব্য

ষোড়শ শতকে আশির দশকে দুজন কবির সম্বন্ধে মানুষ খুব আগ্রহী হল। এঁরা হলেন—স্যাব টমাস ইযাট (Sir Thomas Wyatt ১৫০৩-১৫৪২) এবং আর্ল অব সারে, হেনরী হাওযার্ড (Henry Howard, Earl of Surrey ১৫১৬-১৫৪৭)। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদেব দুজনকে একসঙ্গে ইয়াট এবং সারে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে দুজনের ভিতর তফাৎও আছে। এঁদের কাব্যসংগ্রহের প্রকাশ হয় ১৫৫৭ সালে। এই ধরনের কাব্যসংগ্রহকে 'বিবিধ সংগ্রহ' বা 'মিসেলানি' (Miscellany) বলা হত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ পেযেছিল। এগুলির ভিতরে নানা দিক দিযে বিচার করে ১৬০০ সালে প্রকাশিত 'ইংল্যাণ্ডের কাব্য প্রেরণার উৎস' (England's Helicon) নামক সংগ্রহটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে।

১৫৫৭ সালে মুদ্রক ও পুস্তক-বিক্রেতা রিচার্ড টটেল (Richard Tottel) যে কাব্যসংগ্রহটি প্রকাশ করেন তা 'টটেলেব কাব্যসংগ্রহ' (Tottel's Miscellany) নামে সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে অন্যান্যদের কিছু কবিতার সঙ্গে ইয়াট এবং সারের কবিতাও প্রথম ছাপা হয়।

ইয়াট এবং সারের পরিচিতি, জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এঁদের লেখার প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে। তার কারণ এঁদের বিশিষ্ট কাব্যপ্রয়াশের জমি তৈরী হবার অনেক আগেই এঁরা বীজ বপন করেছিলেন।

ইংরাজী কাব্যে 'সনেট' এর প্রথম প্রচলনের জন্য যে গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধি এঁদের প্রাপ্য বলে পরে বোঝা গিয়েছিল তা তাঁদের কবিতা লেখার বা এমনকি মরণোত্তর প্রকাশনার সময়েও বোঝা যায়নি। 'সনেট' কথাটি লোকের কাছে পরিচিত হয়েছিল, কিন্তু ইটালিয়ান মডেলের ধরন-ধারণ লোকে ভুলে গিয়েছিল। নানা আকারের যে কোন ধরনের ছোট কবিতা বা গানকেই অনেকদিন ধরে সনেট বলা হচ্ছিল। কিন্তু 'সনেটের' গঠন এবং নিযমকানুন যা ইটালিয়ান আদর্শ থেকে নেওয়া হয়েছিল তা ইংরাজ পাঠকের কাছে পরিচিত করানোর ব্যাপারে প্রথম চেষ্টা ছিল ইযাট এবং সারের। তবে এঁরাও কোন জনপ্রিয় কেতা বা ঐতিহ্য রেখে যেতে পারেননি।

প্রসঙ্গতঃ, সনেটকে গীতিকবিতা বা লিরিকের (Lyric) অন্তর্ভুক্ত করা হলেও লিরিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী সনেটকে লিরিক বলা চলে না। 'সনেট' লিয়ার (Lyre) বা বীণাসহযোগে গাওয়া হতেই পারে না।

পুণরুল্লেখের দোষ হয়ে গেলেও আর একবার বলে নিই। সনেট সাধারণতঃ দুধরনের—নিয়মিত, ইটালিয়ান বা মিলটনিক একটি ধরন। অপরটি অনিযমিত, ইংরাজী বা এলিজাবেথীয় ধরন। প্রথম ধরনে আট লাইন এবং ছ'লাইনের ভাগ। প্রথম আট লাইনকে আবার চার চার লাইনে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তাদের মিলের কৌশল abba, abba। শেষ ছ'লাইনের মিল চার রকমে করা হত। —cd, cd, cd ; cde, cde ; cde, dce ; এবং cdd, cdc।

কিন্তু ইংরাজী ধরনের সনেটে মিলের কৌশল অন্য রকমের। চার চার লাইনের তিনটি স্তবকের মত ; এবং শেষ দু'লাইনে অন্ত্যমিল। অর্থাৎ মিলের পরিকল্পনা ab, ab,cd,cd, cd, ef, ef, gg।

ইটালিযান মডেলের ইংরাজী সনেটে 'প্রেম' বিষযকে কতকটা এড়িযে যাওযা হযেছিল। কিন্তু ইংরাজী মডেলের সনেটে বিষয়বস্তু সাধারণতঃ 'প্রেম' সম্পকির্ত। তবে ধর্মানুরাগ এবং সৌজন্যসূচক সম্বর্ধনার সনেটও অনেক লেখা হযেছিল। এই জাতীয সনেটগুলি জনপ্রিয় ছিল. এবং এদের কোন কোনটির সাহিত্যিক ক্রটি যদি কিছু থাকতও তা' তেমন লক্ষ্য করা হত না।

ইটালিযান সনেটে চিন্তা, আবেগ ও ভাষা প্রচণ্ড ব্যক্তিগত বোধে সম্পৃক্ত। কিন্তু ইংরাজী মডেলের সনেট সাধারণতঃ কৃত্রিম কাব্যানুশীলন এবং গতানুগতিক শব্দের ব্যবহার।

সাধারণতঃ সনেট পডা হয়ে যাওযার পরে একটা সম্পূর্ণতার ধারণা আসে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগের ধারাকে 'সম' পর্যন্ত টানা হয় না ; পাঠককে হতবাক করে দিযে বোধের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কবিতার ভাবধারাকে যেন হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া হয়।

সনেটের সম্বন্ধে এই দুটি একটি ধারণা দেওয়ার পর আমরা কবিদের কথায আবার ফিরে যেতে পারি।

ইযাট প্রধানতঃ ইটালিয় মডেল অনুসরণ করতে চেযেছিলেন ; এবং সারে নতুন এলিজাবেথীয় মডেল প্রবর্তন করেছিলেন। ইয়াটকে ইংরাজী সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তনকারী, এবং সারেকে ইংরাজী মডেলের সনেটের প্রবর্তনকারী বলে বলা যায়। প্রথম ধরনটির কাজ প্রভাবিত করা (Impression), দ্বিতীয়টির কাজ উদ্ঘাটিত করা (Expression)। ইটালিয়ান সনেটের গঠন ও উদ্দেশ্যের সংস্কার করে ইংরাজী মডেলের সূচনা সারের বিশিষ্ট কীর্তি।

আবার আর একদিকে ইয়াটের গুরুত্ব বেশী ; কেননা মূল জিনিষটি তাঁর হাত ধরেই ইংরাজী সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল। ইয়াট সনেটের শেষ দুই চরণে অন্ত্যমিল রেখেছেন, এবং অন্তিম অংশে বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করেছেন। পেত্রার্কের সনেটে শেষ ছয় চরণে ক্রমাবনত উৎরাই বজায় থাকে। শেষ দুই চরণে কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না।

টটেলের (Tottel) 'মিসেলনি' (Miscellany)-তে ইয়াটের ৩১টি সনেট আছে। মন্ময় কবিতার বিশেষত্ব যে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব কথা (সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হতে

পারে এমন সাধারণ কথা নয়)—তা ইয়াট প্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন। তবু, নতুন ধরনের কবিতা নিয়ে, বিশেষ করে সনেটের অভিনব গঠন নিয়ে, তাঁকে খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল।

টটেলের কাব্যসংগ্রহে (Tottel's Miscellany) সারের যে কটি সনেট আছে সেগুলিই ইংরাজী সাহিত্যের ইংরাজী মডেলের প্রথম সনেট। সারের সনেটগুলিতে ইয়াটের সনেটের থেকে বেশী ছন্দচাতুর্য ও সাবলীলতা দেখা যায়। ইংরাজী কাব্যে সারেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank Verse) সূত্রপাত করেন। মধ্যযুগীয় রাজকীয় স্বেচ্ছাচারিতায় এই প্রাণবন্ত যুবককে অল্পবয়সেই প্রাণদণ্ডের শিকার হতে হয়।

বিদেশী মডেলের সনেটের প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াট এবং সারে সত্যিকারের ইংরাজ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ইয়াট চশারের একজন ভক্ত ছিলেন।

এবারে আমরা দুজন কবির কথা বলব যাঁদের কবিতার তেমন কোন স্বকীয় গুরুত্ব বা স্থায়ী প্রভাব না থাকলেও তা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা অনুসরণে বেশ সাহায্য করে। এঁরা হলেন জর্জ গ্যাসকয়েন (George Gascoigne ১৫২৫-১৫৭৭) এবং টমাস স্যাকভিল (Thomas Sackville ১৫৩৬-১৬০৮)।

নাটক প্রসঙ্গে আমরা গ্রন্থের প্রথম ভাগে (আধুনিক যুগ-প্রথম পর্ব) গ্যাসকয়েনের কথা বলেছি। তাঁর কবিতার উদাহরণ হিসাবে ১৫৭৬ সালে প্রকাশিত ষ্টিল গ্লাস (Steele glass) এর উল্লেখ করতে পারি। এটি মুক্তছন্দে লেখা একটি বিদ্রুপাত্মক কবিতা। কবিতাটির কয়েকটি বিশেষত্বের ভিতর উল্লেখযোগ্য বিষয় কবির স্বাদেশিকতা। সঠিক ইংরাজী শব্দের ব্যবহারের এবং স্বদেশী সামাজিক আদবকায়দার পক্ষে লেখকের মতামত স্পষ্ট। র‍্যানেইসঁস আশ্চর্য নানা বিদেশী বিষয়কে যেমন আবাহন করেছিল, তেমনি তা স্বাদেশিকতাকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। গ্যাসকয়েনের পারিপাট্যহীন কবিতাতেও র‍্যানেইসঁসের ছাপ রয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রাণবন্ত এবং বহুমুখী কাব্যপ্রচেষ্টায় গ্যাসকয়েনের সঙ্গে স্যাকভিলের নামও করতে হয়। ল্যাটিন প্রভাবিত ইংরাজী নাটকের প্রথম নাট্যকার হিসাবে স্যাকভিলের নাম গ্রন্থের প্রথম ভাগে (আধুনিক যুগ-প্রথম পর্ব) করা হয়েছে।

১৫৬৩ সালে একটি কাব্যসংগ্রহে (Myrroure of Magistrate) এঁর 'The Induction' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাষায় আধুনিকতার অভাব। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা চোখে পড়ে। র‍্যানেইসঁসের অন্যতম অবদান স্বাদেশিকতার এক নতুন প্রতিজ্ঞা। 'আমরাও পেছিয়ে নেই'—এই মনোভাবের জোরাল প্রকাশ স্যাকভিল এবং আরও কয়েকজন কবির কবিতায় এত স্পষ্ট যে যেন মনে হয় যে কাব্যিক মুন্সীয়ানার থেকে সেটাই বেশী গুরুতর। ইংল্যাণ্ডের বাস্তব ইতিহাসের অনেক বড় বড় মানুষের জীবনের দুঃখময় শেষ পরিণতি এই সব কবিতার বিষয়বস্তু। সাম্প্রতিক কালের এবং বিশেষ করে, অতীত ইতিহাসের, বিষাদকরুণ আকর্ষণ এই সব কবিতার মূল আবেগ। ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিকে প্রয়োজনমত তীব্রতা দিয়ে উচ্চারণ করে অর্থ ও সুরকে সঠিকভাবে পরিষ্ফুট করার কাব্যিক কৌশল স্যাকভিলের পাণ্ডিত্য ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। কবিতার অর্থবৈচিত্র্য ও সুরসৃষ্টির জন্য ছান্দিক প্রকাশভঙ্গীর সঠিক ধারণা ও ব্যবহার বহুদিন ইংরাজী কবিতায় অকেজো

হয়ে পড়েছিল। স্যাকভিল এবং অন্য কয়েকজনের হাতে সেই প্রসাধন কৌশলের ব্যবহার আবার শুরু হল।

কাব্যের দার্শনিকতা, কল্পনা ও ভাবসৃষ্টির কথা আলাদা। কিন্তু ধ্বনিমাধুর্য, বিশেষ করে অর্থকে গ্রহণীয় করবার জন্য ধ্বনিমাধুর্যের ব্যবহার কিন্তু অন্য জিনিষ। ইংরাজী র‍্যানেইসঁসের এই প্রথম দিকের কবিরা সেই ডুবো অতীতকে টেনে তুললেন। প্রথমে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে উচ্ছল নবীনকে সংযত নিয়ম শেখান হতে লাগল। কবিতার গঠন যে নিযমের প্রস্তরভিত্তির উপরে দাঁড়ান শাখাপল্লবের হিল্লোল তা কবিদের ধীরে ধীরে বুঝতে হল। এবং যা ছিল আলগা উন্মাদনা তা কিছুদিনের মধ্যে স্থায়ীত্বে প্রসাদ লাভ করল।

স্বল্পায়তন কবিতার ধারায় গ্যাসকয়েন এবং পূর্ণাবয়ব কাব্যে স্যাকভিল তাঁদের নিজস্ব স্বল্প অবদানের মাধ্যমে ইংবাজী কাব্যে পূর্বাপর যোগসূত্র রচনা করেছিলেন।

এডমণ্ড স্পেন্সার (১৫৫২-১৫৯৯)

এ যুগের নাট্যকারদের হাতে, বিশেষ করে সেক্সপীযর এবং মার্লোর নাটকে, যে অসামান্য বলিষ্ঠ সুন্দর কাব্যসৃষ্টি হয়েছে তার তুলনা জগতে দুর্লভ। কিন্তু এঁদের পরিচিতি প্রধানতঃ নাট্যকার হিসাবে। প্রসঙ্গতঃ, এ যুগেও নাটকে গদ্যের ব্যবহার শুরু হয়নি। কেবলমাত্র কবি পরিচিতি নিয়ে যাঁরা এ যুগে সাথক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এডমণ্ড স্পেন্সার তাঁদের অগ্রগণ্য।

স্পেন্সারের মানসিক গঠন এবং তাঁর কাব্যের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। সিভ্যালরির (Chivalry—ক্ষাত্রধর্ম) ব্যাপক স্বীকৃতির দিন তখন শেষ হয়ে গেছে। স্যার ফিলিপ সিডনি যে আদর্শ দৃষ্টান্ত বজায রেখেছিলেন তা উজ্জ্বল কিন্তু যুগের পটভূমিকায় ইতিমধ্যেই ব্যতিক্রম। ম্যাকিয়াভেলির আদরা, বিশেষ করে ধূর্ততার রাজনীতি, তখন খুব বেশী রকম অনুসরণ করা হচ্ছিল। পুরানো রীতিনীতি, এমনকি 'সবকালেই ভাল' এমন কিছু কিছু গুণ, যেমন অকপটতা, আস্থা ইত্যাদির উঁচু রাজনীতির আসরে আর স্থান ছিল না। সুতরাং কি বিশ্বাস এবং দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে কবিরা আর কবিতা লিখবেন! একমাত্র করণীয় ছিল এলিজাবেথের স্তুতিবাদ। বা তার পরে রাজা জেমস-এর স্তুতিবাদ। আবার, এমনই অবস্থা ছিল যে এটা না করে উপায় ছিল না। সেক্সপীয়রকেও রাজা জেমস-এর সুনজরে থাকবার চেষ্টা করতে হয়েছিল।

অপসৃয়মান জগত ও সমাজের ধাঁচা আর কিছু না হোক,—কালের হাপরে পোড়েন খেয়েছিল। সুতরাং তা কাব্যের ভিত্তি হতে পারত। কিন্তু নতুন নিয়মে উচ্চাকাঙ্খা এবং ঈর্ষা পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এ সব ছিল রাজসভার ব্যাপার। সাধারণ মানুষ দূর থেকে অবাক হয়ে এগুলি দেখত। যেমন রাজনীতিতে তেমনি ধর্মসংস্কারে তাদের উচ্ছাসে কোন বাড়াবাড়ি ছিল না। কিন্তু সাময়িক খ্যাতি ও পুরস্কার রাজশক্তির দান। তা পেতে গেলে অনেক কিছু—নীতি এবং আদর্শ—ছাড়তে হয়। স্পেন্সার সব ছাড়েননি। তিনি যেন সে যুগের ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold ১৮২২-১৮৮৮)—জ্ঞানে

না হোক, সাহিত্য-কর্মে। পুরান ধর্মবিশ্বাসেব আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা স্পেন্সার কোনদিন পরিত্যাগ করেনি নি। কিন্তু ধর্মসংস্কারকেও তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এদিক থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ছিল না। এ যুগের সাধারণ মানুষ প্রকৃতিতে বর্বর থেকেও গরীবের প্রতি দযাদাক্ষিণ্য দেখাতেন। কিন্তু সাধাবণ মানুষ সাহিত্যের আদর্শকে দেশের গণ্ডীর বাইরে থেকে—বিদেশ থেকে—নিযে আসাব দরকার বোধ করেননি। স্পেন্সারের কিন্তু সে বোধ ছিল। শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল। নতুন নতুন গ্রামার স্কুল খোলা হচ্ছিল। এগুলি কোন বৈপ্লবিক বুদ্ধির আমদানি করেনি। কিন্তু নামকরা সাহিত্যিকরা নতুনত্ব আনার চেষ্টা না করলে দেশীয রসদ ফুরিযে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এডমণ্ড স্পেন্সারকে 'কবিদেরও কবি' (Poet of Poets) বলা হয। পরবর্তী বহুযুগের কবিদের উপব তাঁব বিশেষ প্রভাব পডেছিল। প্রযোজনানুরূপ শব্দচযনে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর বর্ণনাশক্তি ছিল অসীম। চিত্রশিল্পে অথবা বিশেষ করে ভাস্কর্যে, র‍্যানেইসঁসের প্রভাব ইংলণ্ডে এসেছিল অনেক পরে। এইসব শিল্পচর্চা না করেও স্পেন্সার ছিলেন শব্দে চিত্রময়তার অনবদ্য উদাহরণ। তাঁর দ্বারা অনুসৃত কবিতার স্তবকবন্ধন প্রণালীর নাম দেওয়া হযেছে 'স্পেন্সেরিয স্তবক' (Spenserian Stanza)। স্তবকগুলি হয নয় লাইনের। প্রথম আট লাইন পাঁচ মাত্রার ছন্দে ; প্রতিটি মাত্রায দ্বিতীয় অংশের (Syllable) উপর জোর পডে ; প্রথমটিব উপর পডে না। নবম লাইনটি ছয় মাত্রার। অন্ত্যমিল থাকে প্রথম ও তৃতীয় লাইনে ; দ্বিতীয, চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম লাইনে ; ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম লাইনে। অর্থাৎ ছন্দের পবিকল্পনা ছিলেন ababbcbcc। এই ছন্দ দুশো বছব ধরে বহু কবি অনুসরণ করেছিলেন।

জনসাধাবণেব কাছে স্পেন্সারের তাৎক্ষণিক প্রচার তেমন ছিল না। তবে বিশেষ করে রাজপ্রসাদপুষ্ট কবিদের কাছে তিনি বরণীয় ছিলেন। তিনি ছিলেন পবিত্রতাবাদ, নিযমতান্ত্রিকতা এবং মানবতাবাদী রম্যতার সার্থক সমবায়।

নানাভাবের ক্লাসিক প্রভাবের যুগেও স্পেন্সার সকলেব কাছে পরিচিত গ্রামীন ভাষাকে নিজের দখলে রেখেছিলেন এবং পরোক্ষভাবে তা প্রচারও করেছিলেন। এর দ্বারা কাব্যের কৃত্রিমতা কতটা খণ্ডান গিয়েছিল বলা যাবে না, কিন্তু ভাষা যে স্বাভাবিক ইংরাজী ভাষা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আবার আর একদিকে, প্রাচীন ক্লাসিক কবিরা ছাড়াও তাঁর সমকালীন ইটালিয়ান কবি টরকুয়াটো টাসো (Torquato Tasso ১৫৪৪-১৫৯৫) বা কিছু আগের লুডোভিকো এ্যারিঅস্টোর (Ludovico Ariosto ১৪৭৪-১৫৩৩) রাজসভার অভিজাত সাহিত্যের—রমন্যাস এবং উপকথা—প্রভাবও স্পেন্সারের উপর পড়েছিল। ক্ষাত্রধর্মের (সিভ্যালরি—Chivalry) উদাহরণমূলক গল্প বলার ও কাব্যে ছবি আঁকার যে আদর্শ এ্যারিঅসটো তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা আশি বছরের ব্যবধানেও ইংরাজ কবি স্পেন্সারকে উৎসাহ দিয়েছিল। এই মনোভাব, অন্ততঃ স্পেন্সারের ক্ষেত্রে, ক্লাসিক আদর্শের অনুকরণ নয়,—দেশীয় রূপক কাহিনীর আদর্শকে ধরে রাখার চেষ্টা।

আবার, ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত কবিতা লেখার চেষ্টায়

টাসো-ও ছিলেন স্পেন্সারের একটি অনুকরণীয় মডেল। যুদ্ধবিগ্রহের মত বড় বড পরিস্থিতির পটভূমিকায় টাসো যেমন শান্তিপূর্ণ ও গ্রাম্য পরিবেশকে মনে রেখেছিলেন, স্পেন্সারও সেইরকম ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরময় টিউডর অভিজাত সমাজের সঙ্গে মাখামাখি সত্ত্বেও কল্পনাসুন্দর গ্রামীণ চিত্রকে ভোলেন নি।

স্পেন্সার প্রাচীন ও সমকালীন, দেশীয় ও বিদেশী—সমস্ত কাব্যসৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন।

স্পেন্সার নিজেকে অভিজাত বংশের বলে পরিচয় দিলেও, তিনি সাধারণ স্তরের পিতামাতার সন্তান। এলিজাবেথের রাজসভার শক্তিশালী সভাসদ লিসেস্টার এবং তাঁর ভাগনে সিডনির পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অভিজাত সমাজে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, এবং রাণীর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছিলেন।

এলিজাবেথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন সংসার-সন্তান-আকাঙ্খী, নিঃসঙ্গ, দুঃখী, প্রচণ্ড তেজস্বী সেই ব্যক্তিত্বকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা সব কবিই করেছেন। স্পেন্সারের প্রধান কাব্য শুধু স্তুতিবাদ নয়, একটি কালোত্তীর্ণ সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি। তবে তাঁর নিজের আন্তরিকতা থাকলেও তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছায়নি,—কারণ রাজসভার সাফল্য এবং তার ফলস্বরূপ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আজও স্পেন্সারের কাব্য বিখ্যাত কিন্তু বহুজনপঠিত নয়।

স্পেন্সারের 'রাখালিয়া বারমাস্যা' (Shepheards Calendar) প্রকাশিত হয় ১৫৭৯ সালে। তাঁর বিদ্রুপাত্মক রচনা (Satire) 'হুবার্ডের গল্প' (মাদার হুবার্ডস টেল—Mother Hubberd's Tale) এবং 'অভিযোগ' (কমপ্লেনটস কনটেনিং সানড্রি স্মল পোয়েমস অব দি ওয়ান্ডর্স ভ্যানিটিজ—Complaints containing sundrie small poems of the World's Vanities) ১৫৯১ সালে প্রকাশিত হয়। ১৫৯৫ সালে সনেটের সঙ্কলন 'প্রেমের কবিতা' (আমোরেট্টি—Amoretti) প্রকাশিত হয়। এগুলি ইটালিয়ান মডেলের। ওই সময়েই তাঁর বিবাহ উপলক্ষ্যে লেখা আনন্দোচ্ছল কবিতা 'বিবাহসঙ্গীত' (এপিথ্যালামিয়ন—Epithalamion) লেখা হয়। 'চারটি স্তোত্র' (ফোর হিমস Four Hymns) প্রকাশিত হয় ১৫৯৬ সালে। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাব্যকৃতি 'পরীরাণী'র (The Faerie Queene—ফেয়ারি কুইন) প্রথম তিন খণ্ড ১৫৯০ সালে এবং শেষ ছয় খণ্ড ১৫৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, আরও অনেক কবিতা দিয়ে স্পেন্সার ইংরাজী কবিতাকে পরমুখাপেক্ষিতার দীনতা থেকে মুক্ত করেন।

এবার স্পেন্সারের কবিতাগুলি আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব।

রাখালিয়া বারমাস্যা (The Shepheards Calender)—১৫৭৯

এতে ঐতিহ্যসমন্বিত রাখালিয়া কথোপকথনের একলগ (Eclogue) ঠাট ধরে রাখা হয়েছে। বছরের এক এক মাসে এক একটি 'কথোপকথন'। কথোপকথনের ব্যক্তি ও বিষয় ওই বিশেষ মাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবি নিজেকে রাখালদের একজন হিসাবে

উপস্থিত করেছেন। নাম নিয়েছেন কলিন ক্লাউট (Colin Clout)। এই কাব্যে কবি সৌন্দর্যসৃষ্টিকে প্রাধান্য দিলেও সমসাময়িক জনমতকে উপেক্ষা করেননি। র‍্যানেইসঁসের সৌন্দর্যবোধ ও ধর্মসংস্কারের নিষ্ঠা দুইই বজায় রেখেছেন।

দশ বারো বছর পরে লেখা 'ফেয়ারিকুইন'-এর স্তবকে প্রথম আট লাইনে যেমন পাঁচ মাত্রার (দশ সিলেবল) ব্যবহার হয়েছে, এই 'বারমাস্যাতে'ও তা-ই করা হয়েছে। তবে 'ফেয়ারি কুইনের' একটানা বর্ণনার মাদকতা এতে নেই।

দক্ষিণ ইউরোপে সেই সময়ে খুব জনপ্রিয় রাখালিয়া কবিতার ঐতিহ্যে স্পেন্সারের এই কাব্য শুধু সংযোজন নয়—এই শ্রেণীর কাব্যের চরম উন্নতির উদাহরণ।

এই 'রাখালিয়া বারমাস্যাতে' পরিকল্পিত শিল্পচাতুর্যের উপর সম্পূর্ণ দখল রেখেই অনায়াসভঙ্গীতে কাব্যের মঞ্জীর বেজেছিল। স্বভাবকবি শিল্পের খুঁটিনাটি বিন্যাসের দিকে তত নজর রাখতে পারেন না। এ কাব্যের কবি কিন্তু তা হতে দেননি। আবার আর একদিকে, কাব্যের নিষ্প্রাণ কাঠামো নিয়ে কসরৎ দেখান যায়, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হয় না। স্পেন্সারের কাব্য তা-ও নয়। এ যেন আমাদের দেশের কাঠ-খড়ের শক্ত কাঠামোর উপরে মাটি ও রং এর অদ্ভুত শিল্পকর্ম।

স্পেন্সারের কাব্য যেন শব্দ ও কথা দিয়ে ছবি আঁকা। জানিনা আমি ভুল করছি কিনা। আমার তো ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক-র‍্যাফেলিয় কবিদের কথা মনে হয়। তবে সেগুলি স্বল্পায়তন, অধিকতর সন্নিবদ্ধ এবং রহস্যময়।

স্পেন্সারের বিদ্রুপাত্মক রচনা (Satires)

বিদ্রুপাত্মক উপাদান স্পেন্সারের নানা সময়ের নানা কবিতায ছড়িয়ে আছে। এগুলি সাময়িক ঘটনাবলীর উপর কটাক্ষপাত হলেও বিদ্রুপাত্মক রচনার মধ্যযুগীয় ধারা এগুলিতে অনুসরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া, এগুলির ভিতর দিয়ে স্পেন্সারের ক্লাসিক অনুশীলনেরও যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তবে এই জাতীয় অধিকাংশ কবিতায় বিদ্রুপাত্মক প্রচার কেবল প্রসঙ্গক্রমেই এসেছে। একমাত্র 'হুবার্ডের গল্পেতেই' (Mother Hubbard's Tale) বিদ্রুপাত্মক উদ্দেশ্যই প্রধান। এই কবিতাটি 'অভিযোগ' গ্রন্থের মধ্যে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে রাখা আছে। বেশ কিছু কবিতায় পুরোহিত-শ্রেণী, রাজসভাসদ ইত্যাদির প্রতি আক্রমণের চেষ্টা ছিল। হুবার্ডের গল্পে 'বানর' এবং 'শিয়াল' এই দুটি চরিত্রের কথোপকথন রয়েছে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় হেনরীর ভাই এবং রানী এলিজাবেথের পাণিপ্রার্থী আঁজুর ডিউক (Duke of Anjou) বানর; এবং রাণীর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, লর্ড ট্রেজারার, লর্ড বার্লে (Lord Burleigh, Lord Treasurer) শিয়াল। এইভাবে জন্তুজানোয়ারদের বাস্তব মানুষের চরিত্রের বদলে উপস্থিত করা মধ্যযুগীয় একটি রীতি।

বিদ্রুপাত্মক রচনাতেও স্পেন্সারের গল্প বলার ধরন সম্পূর্ণ দেশীয় এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ।

আমোরেট্টি (Amoretti)

১৫৯৫ সালে প্রকাশিত 'প্রেমের কবিতা' (Amoretti) কয়েকটি সনেটের সঙ্কলন। কোন রকম আড়াল না রেখে সরাসরি নিজের মনোভাবকে সনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করে স্পেন্সার তাঁর জীবনের একটা বিশেষ পর্বে যেন আত্মপরিচয় দিয়েছেন এই সনেটগুলিতে। শেক্সপীয়র এবং সিডনি ছাড়া সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যে সনেটের মাধ্যমে প্রেমনিবেদনের এর থেকে উচ্চমানের কোন উদাহরণ নেই। এই সনেটগুলির মিলের পরিকল্পনা ছিল abab, bcbc, cdcd, ee। সঠিকভাবে পেত্রার্কান না হলেও,—অষ্টক এবং ষষ্ঠকে ভাগ পেত্রার্কের আদর্শ অনুযায়ী। কাব্যের আত্মিক দিকের বিচারে এই সনেটগুলি বেদনা এবং আত্মধিক্কারবর্জিত পবিত্র।

বিবাহসঙ্গীত (Epithalamion)

'বিবাহসঙ্গীত' একটি বড় গীতিকবিতা। পুরাপ্রভাববর্জিত সহজ ও স্বাভাবিক এই দীর্ঘ কবিতাটি বিচ্যুতিহীন, অবিমিশ্র আনন্দ ও আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এটি ১৫৯৫ সালে প্রকাশিত।

চারটি স্তোত্র (Four Hymns)

এতে স্পেন্সারের প্রেম ও সৌন্দর্যের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। চরমসৌন্দর্যের বোধই পরম মঙ্গলের উদ্গাতা। সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি কলুষকালিমা নয়; বরঞ্চ তা-ই জগতের মঙ্গল নিয়ে আসে। এমন কি পার্থিব সৌন্দর্যের ধারণা, রমণীর দেহসৌষ্ঠবও শ্রেষ্ঠতম মানবিক বোধকে বিকশিত করতে পারে। এটি ১৫৯৫ সালে প্রকাশিত।

পরীরাণী (Faerie Queene)

পরীরাণী স্পেন্সারের শ্রেষ্ঠতম রচনা। প্রথম তিন খণ্ড ১৫৯০ সালে প্রকাশিত হয় এবং শেষ কয়েক খণ্ড ১৫৯৬ সালে প্রকাশের চেষ্টা হয়। তবে শেষ দিকের খণ্ডগুলির বেশ কিছু নষ্ট হয়ে যায়। কবির পরিকল্পনামাফিক কাব্যটি পুরোপুরি শেষ করার আগেই তিনি মারা যান।

কবির পরিকল্পনা অনুযায়ী মধ্যযুগীয় বার জন নাইট (Knight) অভিযানে বেরোবেন। তাঁদের কার্যাবলী, মহত্ত্ব, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় এবং সবশেষে মহত্তম নাইট আর্থারের সঙ্গে পরীরাণীর বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হবে।

শেষ করা না গেলেও, যা পাওয়া গেছে তা-ই ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যবহির্ভূত কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

স্পেন্সার তাঁর সমসাময়িক কালে এবং খুব কাছ থেকে দেখা পারিপার্শ্বিকের ভিতরে অমলিন পবিত্রতা এমন কিছু দেখেননি। রাণী তাঁর কাছে ছিলেন আদর্শ কল্পনার বাস্তবমূর্তি। সিডনি, র‍্যালে, লিসেস্টার, হার্ভে,—বা এমন আরও কয়েকজন অবশ্যই ছিলেন যাঁরা মানুষ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তার বাইরে অধিকাংশ বড় বড় মানুষের কাজ বা ধরনধারণ

প্রতিবাদযোগ্য। কিন্তু সরাসরি প্রতিবাদ করার বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, এবং সেই কোলাহলের ভিতরে নিজেকে মিশিয়ে দিতে তিনি চাননি। রাণী তো এঁদের মেনে নিয়েছিলেন এবং এঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু যে সুন্দর জীবন ও সমাজের ছবি তিনি তাঁর অন্তরে ধরে রেখেছিলেন তা তৎকালীন শক্তিশালী অভিজাত সমাজের চেহারাব সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং কার্যগতিকে স্পেন্সারকে যখন আদর্শ মানুষের ছবি তুলে ধরতে হল তখন তা আসলে সমালোচনামূলক হলেও প্রত্যক্ষ রূঢ়তা তাতে ছিল না। তাঁকে রূপকের আশ্রয় নিতে হয়েছিল এই পরিস্থিতিতে। ইংরাজী সাহিত্যের ঐতিহ্যে এবং জনসাধারণের মনের মাধুর্যে মধ্যযুগের নাইটদের (Knight) যে রূপ তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি ছবি হয়ে যাযনি, তাকেই অবলম্বন করলেন স্পেন্সার। চতুর্দশ শতাব্দীর শক্তিশালী রূপকসাহিত্য তখনও পর্যন্ত মানুষেব কাছে শুধু পরিচিত ও গ্রহণযোগ্যই নয়,—নিকট-অতীতের প্রায়-জীবন্ত বাস্তবতা। রূপকের কৌশল যেমন তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহাযক হল, তেমনি তাতে ইংরাজের কাছে আকর্ষণীয়—পিতৃপুরুষদের আদর ও ভালবাসাব চিহ্ন—মধ্যযুগীয় 'অভিযান' ও পবিত্রতাও অনুসরণ করা হল।

রূপকের কথা বলবার আগে, এই কাব্যকে ঘিরে নানা চরিত্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সাহিত্যের পাঠকদেব কৌতূহল মেটাতে পারে এমন কিছু তথ্য স্পেন্সার আমাদের দিযেছেন, যা যেহেতু এখন অতীত, সুতরাং ইতিহাস পর্যায়ভুক্ত। স্পেন্সার কিছু আদর্শ আমাদের সামনে বেখেছেন সেগুলি আমরা যেন অনুসরণ কবি—কবির এই রকম একটা ইচ্ছা ছিল। প্লেটোর চিন্তার দ্বারা চালিত হযে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের অভিন্ন সত্ত্বাকে তিনি উদার ক্ষাত্রধর্মের সঙ্গে মিলিযে দিতে চেয়েছিলেন। তাই 'পরীরাণী' কাব্যের চরিত্রগুলি একাধাবে বাস্তব ও কল্পনা। অধিকাংশ রাজসভাসদের ব্যক্তিগত জীবন ও কাজের সমালোচনা তিনি কবেছেন তাদেরই কাল্পনিক কিন্তু নিখুঁত আদর্শরূপে উপস্থিত করে।

চরিত্রগুলি আদর্শরূপে উপস্থিত করার জন্য তিনি ক্লাসিক আদরা সামনে রেখেছেন। স্পেন্সার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৌন্দর্য কামনা উদ্রেক করে ;—আবার সেই একই সৌন্দর্য মানুষের অন্তরেন্দ্রিয়কে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যায। কবি ক্যাম্পবেলের (Thomas Campbell ১৭৭৭-১৮৪৪) ভাষায় স্পেন্সার ছিলেন কাব্যে রুবেনস (ফ্লাণ্ডার্সের অতিমানব চিত্রকর Peter Paul Rubens ১৫৭৭-১৬৪০)। আর ডাউডেনের (Edward Dowden ১৮৪৩-১৯১৩) ভাষায় তিনি কবিদের মধ্যে অমর্ত্য চিত্রকর র‍্যাফেল (Raphael Sanzio ১৪৮৩-১৫২০)। আশ্চর্যের বিষয, উভয় ক্ষেত্রেই দুই মহান চিত্রকরের কথাই আসে।

স্পেন্সারের নারীচরিত্রগুলি পুরোপুরি ক্লাসিক মডেলে তৈরী করা নয়। স্পেন্সার নারীচরিত্রগুলিকে ক্লাসিক যুগের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে চাননি। তবে তিনি দেহ ও মনের সৌন্দর্যের যে পরাকাষ্ঠা নারীচরিত্রগুলিতে আরোপ করেছেন, তার চরম সদ্গুণান্বিত ভাব ক্লাসিক আদর্শের বলিষ্ঠতা ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া সম্ভব নয়। গ্রীক পৌরাণিক উপকথার সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ তাঁর এই নারীচরিত্রগুলি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল।

পরম বিশ্বাস এবং বিস্ময় যা ক্লাসিক শিল্পের অন্যতম মূল উপাদান—তা যে তিনি অনুসরণ করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি যথেষ্ট লেখাপড়া করেছিলেন, জেনেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন।

এ ছাড়া আদর্শ সৌন্দর্যের ধারণা তিনি পেয়েছিলেন প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্বে এবং অধিগম্য চূড়ান্ত সৌন্দর্যের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এ্যারিষ্টটলের (Aristotle) অভিজ্ঞতা থেকে। এ্যারিঅষ্টোর (Ludovico Ariosto ১৪৭৪-১৫৩৩) মধ্যযুগীয় চরিত্র এবং ব্যবহারবিধি তিনি অনুসরণ করেননি, যদিও মধ্যযুগের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল ষোল আনা। স্পেন্সারের কাব্যের বৈশিষ্টপূর্ণ আধ্যাত্মিকতায় না ছিল নিয়তির ত্রাস, না ছিল কঠোর আত্মপীড়ন। আনন্দ ও সৌন্দর্যের মধ্যযুগীয় গাম্ভীর্য স্পেন্সার তাঁর কাব্যে বজায় রেখেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে ক্লাসিক নিয়মতান্ত্রিকতার থেকে রোমাণ্টিক স্বাধীনতাকে বেশী করে অবলম্বন করেছেন। ধর্মের আধুনিক বিচারকে তিনি মেনে নিলেও মধ্যযুগীয় সৌন্দর্যকে অবহেলা করেন নি। আধুনিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধ্যানধারণা সত্ত্বেও কাব্যসৃষ্টিতে তিনি সৌন্দর্যকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ধর্ম সামাজিকতার ধারক ; কাব্যের ধর্ম মুক্ত মানসিকতার অনুশীলন।

প্রেম ও বীরত্বের অতিরঞ্জিত কল্পনাধর্মিতা পরীরাণী কাব্যের প্রধান গুণভিত্তিক উপাদান। সংগ্রাম ধর্মের জন্য, শান্তির জন্য, উন্নত আচারের জন্য এবং বীরধর্মের সৌন্দর্য বিকশিত করবার জন্য। প্রেমের উপাদানেও কোন স্থূলতার স্থান নেই,—তা শান্ত, গোপন ও পবিত্র। একটি আদর্শকে ধরে রাখা হয়েছে যা মানুষের আয়ত্ত্বের বাইরে নয়। স্পেন্সার কোন জটিলতার আশ্রয় নেননি ;—কিন্তু সূক্ষ্ম, ব্যাপক এবং উজ্জ্বল আদর্শকে বর্ণনা করে গেছেন। গ্লোরিয়ানা পবিত্র কামনার মূর্ত রূপ। এ যুগে কবিকল্পনার সৌন্দর্যাভিলাষ মধ্যযুগীয় আদর্শে একটা স্থিতি পেয়েছে,—যা কিন্তু মধ্যযুগের বহিরাবরণ নয়। বীর ও পবিত্র মানুষের ধর্মই এখানের 'ধর্ম'। নৃপতি ও সামন্তেব সম্পর্ক এখানে সৎ ও আন্তরিক, কেননা উভয়েরই লক্ষ্য এক,—ন্যায়ের যথার্থ প্রতিষ্ঠা। এইভাবে র‍্যানেইসঁস মধ্যযুগের অন্তর্নিহিত মূল সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, এবং স্পেন্সারের 'পরীরাণী' এই আদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

'পরীরাণী'র প্রধান পরিচয় এটি একটি রূপক কাব্য। সমসাময়িক রাজনীতি, ক্যাথলিক আইরিশদের দ্বারা এ্যাংলিকান ধর্মসংঘের বিরোধিতা, এবং দার্শনিক ও নৈতিক ভাব-ভাবনা,—এই সব কিছুই রূপক কাব্যে পরস্পরের সহযোগিতা করে একত্রিত হয়েছে।

এই রূপক কাব্যটির একটি রাজনৈতিক চরিত্র আছে। এই রাজনৈতিক চরিত্র সমসাময়িক ঘটনাবলীকে ভিত্তি করে আছে। তখনকার কালের যে কোন অভিজাত ইংরাজ প্রায়ই যে আদর্শ অনুসরণ করতো রেড-ক্রশ নাইট (The Red Cross Knight) তারই কল্পিত রূপ। রাণী এলিজাবেথ, স্কটদের রাণী মেরী (Mary, Queen of Scots), দ্বিতীয় ফিলিপ (স্পেনের রাজা), লর্ড লিসেস্টার, পোপ, স্যার জন পেরট (Sir John Perrot) কে এই কাব্যে যথাক্রমে পরীরাণী (Faerie Queene), ডুএসা (Duessa), আরকিমাগো (Archimago), রাজা আর্থার (Prince Arthur), অরগগলিও (Orgoglio) এবং স্যার স্যাটিরেন (Sir Satyrane) নাম দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় রূপক যা এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় ধর্মসংস্কারের ফলে এ্যাংলিকান ধর্মসংঘের যে রূপ অধিকাংশ ইংরাজের কাছে তখন পরিচিত ছিল স্পেন্সারও সেই ধর্মকৃত্যে নিষ্ঠাবান ছিলেন। 'রেডক্রশ নাইট' যেমন একদিকে সাধারণ ধার্মিক ইংরাজের আদর্শের অনুরূপ, তেমনি ওই চরিত্রটি ধর্মরক্ষার জন্য সংগ্রামে তৎপর। উনা (Una) চরিত্রটি সংস্কার-পরবর্তী খৃষ্টান ধর্মের, আর ডুএসা (Duessa) পরিত্যক্ত রোমান ধর্মসংঘেরই প্রতীক। আরকিমাগো চরিত্রটি যেমন সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ফিলিপকে সামনে রেখেই তৈরী হয়েছিল তেমনি তা গুণগতভাবে প্রোটেষ্ট্যান্ট এ্যাংলিকান ধর্মসংঘের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক প্রতিক্রিযার ব্যক্তিরূপ। অরগগলিও খৃষ্টবৈরিতা এবং রাজা আর্থার আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। এই সব চরিত্রের পারস্পরিক সংঘাতের শেষে যথার্থ খৃষ্টান খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই কাব্যে নীতি উপদেশ দেওযা হয়েছে, কিন্তু তা মানুষকে অযথা জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে নয়। নৈতিক রূপকগুলি সরস কৌতূহল সৃষ্টি করে না ঠিকই, তবে সেগুলি যে ভাবমূলক বিভিন্ন ধারণা এনে দেয় তার দ্বারা সমসাময়িক রাজ্য রাজনীতির মূলসত্তা এবং সাময়িকতা-বহির্ভূত নিত্যসত্তা দুইই প্রকাশ পায়। এই কাব্যে বিভিন্ন ভাবকল্পনার রূপকমূর্তির তালিকা দেওয়া যায়। যেমন, লালক্রসের বীরযোদ্ধা (পবিত্র প্রেম), উনা (সত্যে বিধৃত সৌন্দর্য), বিকট প্রাণী (ভ্রান্তি), আরকিমাগো (ভণ্ডামি), স্যানসফয (খৃষ্টধর্মে অবিশ্বাস), ডুএসা (কুৎসিত মিথ্যাচরণ), ফিডেসা (আস্থা), সিংহ (বুদ্ধিমত্তা), কর্সেকা (অনুরক্তি), এ্যালুসা (কুসংস্কার), কিরক্রাপাইন (ধর্মসংঘ লুণ্ঠন), স্যানসলয় (আইন শৃঙ্খলার অভাব), লুসিফেরা (অহঙ্কার), স্যার গায়ন—Guyon (মিতাচার), স্যানসজয় (নিরানন্দ), বামন (বিজ্ঞতা), আক্রাশিয়া—Acrasia (কাম), শিং ও লেজবিশিষ্ট ল্যাটিন দেবতাগণ এবং অর্ধমানব অর্ধছাগ গ্রীক বনদেবতাগণ (অসংস্কৃত মনের প্রবণতাগুলি), স্যার স্যাটিরেন (স্বাভাবিক বীরত্ব), অরগগলিও (মদোন্মত্ততা), রাজা আর্থার (ঐশ্বর্যময় ও ত্রুটিশূণ্য মহত্ত্ব), অভিশপ্ত মানুষ (নৈরাশ্য), সম্ভ্রান্তবংশীয়া সিলিয়া (মর্তে স্বর্গীয় জীবন), ফাইডেলিয়া (খৃষ্টধর্মে গভীর বিশ্বাস), স্পেরাউজ (আশা), চ্যারিশা (বদান্যতা), পবিত্র মানুষ (ধর্ম চিন্তা), প্রাচীন ড্রাগন (শয়তান), জীবন বৃক্ষ (খৃষ্ট), জীবন নির্ঝর (বাইবেল), ইডেনের রাজা ও রাণী (মানবজাতি)।

এই সব রূপকসমতা বরাবর টেনে যাওয়ায় এক ধরনের ক্লান্তিকর নিরর্থকতা আসে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে রাজনীতির দর্পনে যুগের প্রতিফলন কিংবা তত্ত্বগত শিক্ষা যা-ই এই কাব্যে থাকুক না কেন, চলমান বিচিত্র ছবি এই কাব্যের প্রধান ঐশ্বর্য, এবং স্পেন্সার তা নিপুণভাবে এঁকেছেন

স্পেন্সার সমকালীন রাজনীতির ব্যাখ্যা মূল নৈতিকতা থেকে আলাদা করে দেখতে চাননি। যেখানে অন্যেরা অন্যায়কে পুরাপুরি ধবংস করতে পারেন না রাজা আর্থার সেখানে আবির্ভূত হন (Magnificence)। কিন্তু তবু স্বর্গে যাওয়ার জন্য খৃষ্টধর্মের তিন প্রধান আধ্যাত্মিক গুণ—বিশ্বাস, আশা ও প্রীতির দরকার। এই গুণগুলিই অন্য সমস্ত মানবিক গুণকে ত্রুটিশূণ্য করে। ন্যায়-অন্যায়, শুভাশুভের এই দ্বন্দ্ব, এবং খৃষ্টের চূড়ান্ত বিজয় সামগ্রিকভাবে এই কাব্যের নৈতিক ধারক।

যে রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক রূপক-সমতা স্পেন্সার বরাবর টেনে গেছেন তার যান্ত্রিকতা এবং অগভীরতা স্পেন্সারের সমসাময়িক কালে বা নিকট ভবিষ্যতে তেমন বোঝা যায়নি। রূপকের বাড়াবাড়িটাই অপরিণত মনের কাছে আবেদন রাখে এবং গভীর ও সুষম সৌন্দর্যবোধ সেখানে চাপা পড়ে যায়। পরবর্তীকালে এই দিকটায় সমালোচকদের দৃষ্টি পড়ে। তখন সুপরিণত মূল সৌন্দর্যের সন্ধান করা হয়। স্পেন্সার এ ব্যাপারটি বুঝেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি সার্থক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিলেন ; এবং তা আধুনিককালের বিমূর্ত সৌন্দর্যের বিচারেও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে দেখা গেছে। কাব্যে স্পেন্সারের এই সৌন্দর্যসৃষ্টি যে চিত্রকলার পরিপূরক তা আগেই বলা হয়েছে।

এই সৌন্দর্যবোধ স্পেন্সারের চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল। এবং তা জোরাল পরিপূরক পেয়ে গিয়েছিল গ্রীক ক্লাসিক আদর্শে অর্থাৎ প্লেটোর (খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৮) কল্পনাশ্রিত আদর্শ এবং এ্যারিষ্টটলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২৫) ব্যবহারিক কিন্তু যুক্তিদর্শনগত চমৎকারিত্বে। সামঞ্জস্য, সৌষাম্য এবং মানবিক নীতিবোধের থেকে সেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি। তাঁর মহত্ত্ব এবং কল্পনার চূড়ান্ত সীমা একটা যুক্তিবোধের বাঁধনে বাঁধা ছিল। তাই কোথাও কাব্যের ঔজ্জ্বল্য ছেলেমানুষি তুচ্ছতায় ব্যর্থ হয়ে যায়নি। একটা সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্ট সীমা বরাবর বজায় ছিল। তাই তাঁর সৃষ্ট রূপক সার্থক কাব্য হয়েছিল ; নিম্নপর্যায়ের তুলনা-সমন্বিত তালিকায় পর্যবসিত হয়নি।

এই কাব্যে সৌন্দর্য, মঙ্গল এবং প্রেমকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। এর বিপরীতে রয়েছে অমঙ্গল, অসুন্দর এবং অবিশ্বাস। এই উপস্থাপন কিন্তু ছকে বাঁধা মাপজোক করে দেওয়া নেই। যে আছে তা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। স্পেন্সার ক্লাসিক উন্নতমানকে মধ্যযুগীয় জৌলুষের সঙ্গে সঠিক অনুপাতে স্বাভাবিকভাবে মেলাতে পেরেছিলেন। এই অনুপাত ও সংযমের বোধই রূপককে সাধারণ তুলনার স্তর থেকে অনেক উঁচুতে তুলে দেয়।

বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যবোধকে বজায় রেখে তাকে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যে বিকশিত করার দ্বারা শ্রেষ্ঠ কবির নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। যে শুভদ্রা অর্জুনের দয়িতা তিনিই অভিমন্যুর জননী।

'পরীরাণীতে' রোমান্স

'ফেয়ারী কুইনকে'(পরীরাণী) একটি নতুন বিন্যাসের রোম্যান্স হিসাবেও দেখা হয়। মধ্যযুগীয় নাইটসুলভ ক্ষাত্রধর্মের প্রদর্শন,—ন্যায়ের পক্ষ, দুর্বলের পক্ষ এবং সুনীতির পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের বিপক্ষে সংগ্রামের কথা এই কাব্যে রয়েছে। কিন্তু যারা অন্ধকারের জীব তাদের লড়াই পাপ ও অত্যাচারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। রোম্যান্সের বীরোচিত সৌন্দর্যের স্ফূরণ এই কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। আর, আগেই বলা হয়েছে, এই কাব্যে প্রেম সৌন্দর্যলোলুপতার ঘৃণ্যতা থেকে পুণ্য ও শুচিতায় স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রেমের এই উন্নত অবস্থান পুরাপুরি মধ্যযুগীয় ছাঁচে ঢালা। কিন্তু এখানেও অতিরিক্ততাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে

সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যবোধ কাজ করেছে। এটি কেবলমাত্র কাব্যের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের দ্বারাই সম্ভব। স্পেন্সার আদর্শ প্রেমের মহিমাকে এতটুকু খর্ব করেন নি।

আবাব, আর একদিকে তিনি মধ্যযুগের ধর্মীয় বশ্যতা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন র‍্যানেইসঁসের প্রভাবে। তিনি তাঁর যুগের প্রতিবাদী-ধর্মবোধকে এক নৈতিক অভিযানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। পুরাতন পদ্ধতিকে নতুন আদর্শের বাহক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। আবার, শবণাগতকে আশ্রয়দান ও বিপন্মুক্ত করার মত সামন্তবাদী মর্যাদাবোধকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর নিজেরও দরকার ছিল।

স্পেন্সার তাঁর কাব্যে স্যার ফিলিপ সিডনির যথার্থ সহযোগী ছিলেন। র‍্যানেইসঁসের বরেণ্য সন্তান মধ্যযুগের শেষ বিশ্বস্ত প্রহরী।

স্যার ফিলিপ সিডনি (১৫৫৪-১৫৮৬)

সিডনির কথা কিছুটা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর ১০৮টি সনেট ১৫৯১ সালে এবং ১৫৯৬ সালে প্রকাশিত হয। লেখা হয়েছিল ১৫৮০ থেকে ১৫৮৪ সালের মধ্যে। বইটির নাম 'এ্যাসট্রোফেল এবং ষ্টেলা' (Astrophel and Stella)। এই বইটিতে কয়েকটি গানও রয়েছে। সিডনির কাব্যের অনুরাগীদের অনেকেরই উৎকর্ষ বিচারের ক্ষমতা ছিল না। সম্ভবতঃ সিডনির অন্যান্য গুণের জন্যই অনেকে তাঁর কাব্যের প্রতি আসক্ত ছিলেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে তাঁর কবিতা নিচু স্তরের। পরবর্তীকালে যথার্থ কাব্যামোদী এবং বিদগ্ধ মানুষেরা তাঁর কবিতার সুখ্যাতি করেছেন। সমস্ত মানুষের 'সাধারণ' ভাব এবং অনুভূতি এতদিন কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। সিডনির কবিতাতেই প্রথম ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট এবং নিজস্ব অনুভূতিকে প্রকাশ করা হল। এখানে ব্যক্তিটি সিডনি নিজেই। আর্ল অব এসেক্সের বোন পেনিলোপির প্রতি সিডনির ভালবাসা তাঁর সনেটগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু তাকে কোন ধারকে সন্নিবিষ্ট করতে হয। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ভাব-ভাবনাকে কাব্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা অবশ্যই নতুন আদর্শ সৃষ্টি। সিডনি তা-ই করেছিলেন। এটা শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টতার কথা নয়; পথপ্রদর্শকের গুরুত্বের কথা। ব্যক্তিজীবনের আবেগ এবং কাব্যের উৎকর্ষবিধান,—দুদিকেই সিডনির আন্তরিকতা ছিল। আবেগের আন্তরিকতা কখনও তাঁর কাব্যকে বিশৃঙ্খল করেছে; কখনও তিনি সংযত হয়েছেন। সব জায়গাতেই তিনি তাঁর কাব্যের শুদ্ধতাকে বজায় রেখেছেন। সনেটের ঘনিষ্ঠ গঠন কখনও তাঁকে সাহায্য করেছে; কখনও বা তিনি প্রয়োজনীয় পরিসরের সাহায্য না পাওয়ায় অসুবিধায় পড়েছেন। একজন নাইটের (knight) মর্যাদাবোধ ও ত্যাগ এবং নিসঃঙ্গ প্রেমিকের হতাশা,—দুইই তাঁর সনেটে বর্তমান।

এরপর আমরা সনেটের আর তিনজন নামী লেখকের কথা বলব।—এঁরা স্যামুয়েল ড্যানিয়েল (Samual Daniel ১৫৬২-১৬১৯), মাইকেল ড্রেটন (Michael Drayton ১৫৬৩-১৬৩১) এবং হেনরী কনস্টেবল (Henry Constable)

ড্যানিয়েলের মৌলিক কাব্যরচনার ক্ষমতা থাকলেও তিনি বিদেশী চিত্রকল্প (Image) ও বিদেশী ভাষার অনুকরণ বেশী রকমই করেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে অনুকরণ ধীরে ধীরে কমে এল। তবে উপযোগী সাহায্যকারী হিসাবে বিদেশী উৎসের ব্যবহার চলতে থাকল।

কনস্টেবল-এর সনেট সমষ্টির নাম 'ডায়ানা' (Diana)। ইটালিয়ান এবং ফরাসী শব্দগুচ্ছের অত্যধিক ব্যবহাবের দ্বারা কৃত্রিম আবেগ প্রকাশের পূর্বাপর সমতা তিনি বজায় রেখেছিলেন। মৌলিকতা আদৌ দেখাতে পারেননি।

এ যুগের সনেট লেখার সামগ্রিক প্রচেষ্টার ক্ষুদ্রায়তন প্রতিনিধি ড্রেটনের সনেট। তিনি স্বদেশী-বিদেশী সব রকমের উৎসই ব্যবহার করেছিলেন। লেখা তেমন উঁচু স্তরের কিছু নয়। তবে সিডনি, স্পেন্সার ও শেক্সপীয়রকে বাদ দিলে মাইকেল ড্রেটনই এ যুগের অন্যান্য সনেট লেখকের ভিতর মোটামুটি সুখপাঠ্য। ১৫৯৪ সালে তাঁর সনেটের বই 'আইডিয়াস মিরর' (Ideas Mirrour) প্রকাশিত হয়। ড্রেটনের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত তথ্য হিসাবে বলা যায় যে তাঁর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া 'অ্যাঙ্কর' (Ankor) নদীটি ছিল যেন তাঁর অবেগের সহমর্মী, আর 'ইডিয়া' বা 'আইডিয়া' ছিল তাঁর নর্মসহচরী। তবে ওই নামের কেউ বাস্তবে ছিল কি না তা সঠিক জানা যায় না।

তাঁর কবিতায় যেমন নীতি উপদেশ ইত্যাদি ছিল না, তেমনি আবার মৌল আবেগও তিনি সঞ্চার করতে পারেননি। তাঁর কল্পনা ও রুচি ছিল বিচিত্র।

তাঁর সনেটগুলির কোন কোনটিতে নাটকীয়তা স্পষ্ট ও আকর্ষনীয়। 'Lover's Farell' (Since there's no help, come let us kiss and part,—) এরকম একটি প্রাণবন্ত সনেট। প্রেমিকার সঙ্গে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদের প্রস্তুতি হিসাবে বিদায়পর্ব যখন শেষ হয়ে গেল ঠিক তখনই ভালবাসাকে পুনর্জীবন দান করার আবেদন তীব্র আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হল। 'From death to life then might'st him yet recover!' শেষ লাইন দুটির হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত কারুকুশলতা শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ সনেটগুলির সমপর্য্যায়ের।

এঁদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মার্লোর আবির্ভাব।

ক্রিস্টোফার মার্লো (Christopher Marlow) ১৫৬৪-১৫৯৩

প্রচণ্ড শক্তিশালী নাট্যকার মার্লোর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই পর্বের ভূমিকা অংশে দেবার চেষ্টা করেছি। নাটকবহির্ভূত কবিতা হিসাবে তাঁর কাহিনীমূলক কবিতা 'হিরো এবং লিণ্ডার' (Hero and Leander) ১৫৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রাণবন্ত অনুভূতি সৃষ্টিকারী 'হিরো এবং লিণ্ডার' সমসাময়িক এবং বোদ্ধা পাঠক এবং শ্রোতার মনে এবং চোখের সামনে যে চৌম্বক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তা একমাত্র মার্লোর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

হিরো এবং লিণ্ডারের কাহিনী খুব প্রাচীন। এটি একটি গ্রীক পুরাকাহিনী। গ্রীক কবি

মুসেউস (Musaeus) পঞ্চম শতাব্দীতে একে কাব্যের আকারে লিখে ফেলেন। একে ফরাসী কাব্যে স্থানান্তরিত করেন ম্যারট (Marot)।

কাহিনীটি এই রকম। ইউরোপের দক্ষিণপূর্ব উপকূলের প্রায় শেষ সীমানায় অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীসের পূর্বদিকে হেলেসপন্ট উপসাগর। তার পূর্ব উপকূলে মাইসিয়ার অনতিদূরে ট্রয় রাজ্যের অন্তর্গত এ্যাবাইডস। আর পশ্চিম উপকূলে থ্রেসিয়া রাজ্য। থ্রেসিয়ার সমুদ্রের ধারে সেস্টর নামক জায়গায় প্রেমের দেবী আফ্রোদিতের (Aphrodite) মন্দির। মন্দিরের পূজারিণী হিরো। লিণ্ডার থাকত সঙ্কীর্ণ উপসাগরের অপর পারে এ্যাবাইডস-এ। আফ্রোদিতের মন্দিরে সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিরো প্রতিদিন পাহাড়ের উপর থেকে মশাল জ্বেলে আলোর সঙ্কেত দিত। আর সেই আলো দেখে লিণ্ডার সমুদ্রের খাড়ি সাঁতরে পেরিয়ে যাবার জন্য জলে নামত। সারারাত হিরোর সঙ্গে থেকে ভোরবেলা আবার সমুদ্র সাঁতরে লিণ্ডার ফিরে আসত। কিন্তু একদিন ঝড়ের হাওয়ায় হিরোর মশাল নিভে গেল। লিণ্ডার অন্ধকারে দিক ঠিক করতে পারল না। ভেসে গেল এবং জলের বা পাথরের ধাক্কায় মারাও গেল। পরের দিন সকালেই হিরো সমুদ্রের তীরে লিণ্ডারের মৃতদেহ খুঁজে পেল। শোকে দুঃখে হিরোও সেখানেই মারা গেল।

এই তো গেল গল্পকথা। কিন্তু মার্লো এই কাহিনীকে নিয়ে কি করলেন? কাহিনীর কারুণ্য মার্লোর কাছে বড় কথা ছিল না। তিনি পুরো প্রবণতাকে বিদ্রুপের পরিবেশে উপস্থাপিত করলেন। গ্রীককাব্যে অভিশপ্ত প্রেমের পরিণতির ব্যাপারে সহানুভূতির পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল। এই সহানুভূতি প্রাচীনকালের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং নিয়তিকে সামনে রেখে নিষিদ্ধ প্রেমকেও সহানুভূতি এবং সমাদরের আসন থেকে নামায়নি। হিরো এবং লিণ্ডার নিয়তির হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত আদর্শ প্রেমের দৃষ্টান্ত হয়ে ছিল।

কিন্তু মার্লো তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী কাহিনীটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে পালটে দিলেন; এবং এটিকে একটি বিদ্রুপের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেন। প্রেমের মহিমা থেকে হিরো এবং লিণ্ডার উভয়কেই বঞ্চিত করলেন। সেই সঙ্গে বহু শতাব্দীর (প্রাচীন ও মধ্যযুগের) নীতির আদর্শ নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন। নিষিদ্ধ প্রেম যদি আদর্শ বলে গৃহীত না হয়, তবে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার কি কারণ থাকতে পারে। অথবা, যদি তাকে গ্রহণ করা হয়, মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করতে আপত্তি কি? To call a spade a spade, এটাই তো সততা।

মার্লো পূর্বসূরীদের কাহিনী এবং এই মূল কাব্যকে আদৌ গুরুত্ব দেননি। তিনি এটাকে শুচিবাতিকগ্রস্থ সমাজকে সমালোচনা করবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

তবে এ সব মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। কাব্যের উৎকর্ষ কাব্যবহির্ভূত মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে না। তাকে দায়ী হতে হয় আমাদের সৌন্দর্যসত্ত্বার উপলব্ধির কাছে। হিরো-লিণ্ডারের উপাখ্যান নিয়ে মার্লোর মতামত কি—এটা বড় কথা নয়। বরঞ্চ, তিনি কাব্যসৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা কতখানি দেখিয়েছেন এবং কিভাবে দেখিয়েছেন সেটাই বড় কথা। বহু যুগের পুরানো কাহিনীতে তাঁর আগে পর্যন্ত যা কেউ আনতে পারেনি

সেই শক্তি ও দৃঢ়তা তিনি এনে দিয়েছিলেন শব্দ ও চিত্রকল্পের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে। এর আগে কেউ কখনও অমিত্রাক্ষর ছন্দের এত শক্তি দেখাতে পারেননি।

তাঁর বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি কৌতুকের আড়ালে রূঢ়তাকে চাপা দিয়েছেন। কিন্তু কৌতুক কাকে নিয়ে? হিরো-লিণ্ডারকে নিয়ে ততটা নয়, যতটা সমাজের ভণ্ডামীকে নিয়ে। আবার, হিরো-লিণ্ডার কাহিনী যে যুগে সৃষ্টি হয়েছিল সে যুগের বিরুদ্ধে তাঁর তত আক্রোশ নেই। তাঁর বক্তব্য, মধ্যযুগের ধর্মধ্বজীরা কি করে এই আদর্শকে মেনে নিলেন! আর সেই মনোবৃত্তি যদি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকেও বজায় থাকে তবে তা' সমালোচনার যোগ্য হতেই পারে। মার্লোর কথাটা বোধ হয় এরকম ছিল যে কাব্যকে কাব্য হিসাবেই দেখা হোক ; কাব্যে বর্ণিত বিষয়কে অর্থাৎ আখ্যানভাগকে বেশী গুরুত্ব দেবার দরকার কি আছে। আর, তা যদি দিতে হয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণিত আখ্যানকে নিন্দাও করতে হবে। মুখ্য জিনিষকে ছেড়ে দিয়ে গৌণ জিনিষ নিয়ে কাব্যনিদর্শনকে গৌরব দেবার কি প্রয়োজন। আর, যদি ঘোষিত চারিত্রিক নীতির কথা বলতে হয়, তবে এই কাহিনীর বিষয়বস্তুকে নিন্দা করতে হবে। তা না করাটাই ভণ্ডামী। মার্লোর আক্রোশ এই ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে।

মার্লো হিরো এবং লিণ্ডারের বিরোধিতা করেননি। তিনি সোজাসুজি এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের গ্রহণ করেছিলেন ; সুন্দর করে তিনি তাদের সজিয়েছিলেন। এমনকি তাদের পক্ষে তাঁর সমর্থন ছিল। বিদ্রোহী মার্লো বেপরোয়া হিরো এবং লিণ্ডারের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জর্জ চ্যাপম্যান (George Chapman) ১৫৫৯-১৬৩৪

চ্যাপম্যান বয়সে শেক্সপীয়রের থেকে বড়। তাঁর কিছু নাটক ছাড়াও একটি নামী বই আছে। হোমারের অনুবাদ করে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন।

বেন জনসন (Ben Jonson) ১৫৭৩-১৬৩৭

এ যুগের বিশেষ প্রতিভাধর সাহিত্যিক বেন জনসন। তবে যে গীতিকবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন তার দুটি একটি ছাড়া বাকিগুলিতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বাক্ষর নেই। [এঁর কথা নাটক প্রসঙ্গে বিশদভাবে বলা হবে]

এর পরে আমরা শেক্সপীয়রের নাট্যবহির্ভূত কবিতার কথা বলব।

উইলিয়ম শেক্সপীয়র (William Shakespeare) ১৫৬৪-১৬১৬

শেক্সপীয়রের জীবন, তার সমসাময়িক কাল এবং অন্যান্য কথা নাট্যকার হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতে করা হবে। এখানে আলাদাভাবে তাঁর কবিতাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আমরা তাঁর ৫টি কাব্য, ১৫৪টি সনেট এবং নাটকের অন্তর্ভূক্ত ৪৭টি গান,—এগুলি এখানকার আলোচনায় রাখছি।

'ভেনাস এবং এ্যাডোনিস' (Venus and Adonis) ১৫৯৩ সালে, 'দি রেপ অব লুক্রেশি' (The Rape of Lucrece) ১৫৯৪ সালে, 'দি প্যাশনেট পিলগ্রিম' (The Passionate Pilgrim) ১৫৯৯ সালে, 'ফিনিক্স এবং টার্টল' (Phoenix and Turtle) ১৬০১ সালে, এবং 'প্রেমিকার অভিযোগ' (A Lover's Complaint) ১৬০৯ সালে প্রকাশিত হয়।

তাঁর সনেটগুলি ১৬০৯ সালে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ সনেট লেখা শুরু হয়েছিল ১৫৯৮ সালের আগে থেকে। ১৫৪টি সনেট। তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১২৬+২৬+২। ১২৬তম সনেটটি ১৪ লাইনের বদলে ১২ লাইনের। প্রথম ১২৬টি সনেট কোন এক শ্রীযুক্ত ডব্লু এইচ-কে (Mr. W. H.) উদ্দেশ্য করে লেখা; পরের ২৬টি কোনও একজন কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্টা মহিলাকে (Dark Lady) উদ্দেশ্য করে, এবং শেষের দুটি শিশু কামদেব (Cupid) সম্পর্কে লেখা।

নাটকের অন্তর্ভুক্ত গান মোটামুটি ৪৭টি। Love's Labour's Lost-এ তিনটি, The Two Gentlemen of Verona-তে ১টি, A Midsummer Night's Dream-এ ৩টি, The Merchant of Venice-এ ১টি, King Henry IV, Part2 এ ১টি, Much Ado About Nothing-এ ২টি, As you like It-এ ৪টি, The Merry Wives of Windsor-এ ১টি, Twelfth Night-এ ৪টি, Hamlet-এ ৪টি, All's Well that Ends well-এ ১টি, Measure for Measure-এ ১টি, Othello-তে ৩টি, King Lear-এ ৩টি, Timon of Athens-এ ১টি, Cymbeline-এ ২টি, The Winter's Tale-এ ৪টি, The Tempest-এ ৭টি, এবং King Henry VIII-এ ১টি, এই মোট ৪৭ টি গান।

কাব্যগ্রন্থ

ভেনাস এবং এ্যাডোনিস (Venus and Adonis) কাব্যটি ১৫৯৩ সালে প্রকাশিত হয়।

ভেনাস প্রাচীন রোমের পৌরাণিক দেবী তথা প্রেমের দেবী। এ্যাডোনিস মর্তের মানুষ—সুপুরুষ। এদের নিয়ে কাহিনী। পুরুরবা-উর্বশীর কাহিনী।

ছয় লাইনের ১৯৯টি স্তবকের কবিতা অর্থাৎ মোট ১১৯৪ লাইনের কবিতা। মিলের পরিকল্পনা ababcc। এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল সাদাম্পটনের সম্ভ্রান্ত জমিদার (Earl of Southampton) রিওথেসলিকে (H. Wriothesley)। বিনয় সহকারে পরবর্তী কাব্যটিও এঁকেই উৎসর্গ করবার ইচ্ছা জানান হয়েছিল।

সমসাময়িককালের মানুষের কাছে কাব্যটি তাঁর নাটকগুলির থেকেও জনপ্রিয় হয়েছিল। কাব্যটি প্রাচীন কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন রোম্যান কবি ওভিডও (Ovid) এই কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখেছিলেন।

কাহিনী অংশ মোটামুটি এইরকম ঃ প্রেমের দেবী ভেনাস মর্তের মানুষ এ্যাডোনিসের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করে। এ্যাডোনিস এই অস্বাভাবিক প্রণয়ে বাধ্য হয়েই

আত্মসমর্পণ করে। কোনভাবে ভেনাসের হাত থেকে পরিত্রান পেলেও স্বাভাবিক এক দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। কেউ কেউ এ্যাডোনিসের ভিতর তদানীন্তন কালের শিকার-প্রিয় ইংরাজ যুবককে খুঁজে পেয়েছেন।

কাহিনীটির প্রাচীন কাব্যরূপগুলিতে এ্যাডোনিসের মৃত্যুর কথা নেই; কিন্তু পূর্বতন কবিরা ভেনাসের শোকের বর্ণনা দিয়ে কাব্যটি শেষ করতে চেয়েছিলেন। আর এখানে ভেনাসের রূপমাধুর্যের সঙ্গে তার অ-সম ভালবাসার বর্ণনা দিয়ে, তাকে করুণ পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ায় ভেনাস আরও সুন্দর হয়ে উঠুক, এইটাই বোধ হয় কবির ইচ্ছা ছিল।

কাব্যটি কাহিনীমূলক; মূল কাহিনী খুবই প্রাচীন। পরিচিত উপাদান অবলম্বনে এই কাব্যের একটি প্রধান আকর্ষণ এ্যাডোনিসের রূপ বর্ণনা।

এর পরে আছে 'The Rape of Lucrece'—'লুক্রেশির উপর বলপ্রয়োগ'

বইটি ১৫৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটিও একটি প্রাচীন-কাহিনী ভিত্তিক কাব্য। 'ভেনাস এবং এ্যাডেনিস'-এ ভেনাস আগ্রাসী। কিন্তু এখানে আগ্রাসী চরিত্রহীন পুরুষ টরকুইন। পূর্বতন কাব্যে বন্যশূকরের আক্রমণে এ্যাডোনিস নিহত; আর 'লুক্রেসি'তে লুক্রেসির আত্মহত্যা। পূর্বতন কাব্যে ভেনাসের করুণ বিলাপ অনেকটা জায়গা নিয়ে; আর এখানে, টরকুইনের বিবেকের বিরুদ্ধে তার নিজেরই কুযুক্তি প্রয়োগ এবং শেষে অনুতাপ।

'লুক্রেসি'—সাত লাইনের ২৬৫টি স্তবকে মোট ১৮৫৫ লাইনের কবিতা। মিলের পরিকল্পনা ababbcc। এটি কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী নয়। প্রাচীন রোমক কাহিনী—আধা-ঐতিহাসিক।

গল্পকাহিনী (Small)

আর্ডিয়া (Ardea) নগরী রোম্যান সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ। রোমের রাজার ছেলে শেক্সটাস টরকুইনিয়াস (Sextus Torquinius) এই সৈন্যদলের সঙ্গে আছে। অন্য এক সৈনিক কোলাটিনাস (Collatinus) তার স্ত্রী লুক্রেসিয়াস বা লুক্রেসি (Lucretius or Lucrece) সম্বন্ধে অহঙ্কার করে বলে যে সে সুন্দরী এবং পতিপরায়ণা। টরকুইন প্রলুব্ধ হয়। টরকুইন লুক্রেসির স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে লুক্রেসির উপর অত্যাচার করে। পরিণামে লুক্রেসি আত্মহত্যা করে। শেক্সপীয়র অবশ্য প্রথম দিকের কিছু অংশ বাদ দিয়ে শুরু করেছেন। শেক্সপীয়র গল্প-অংশের উপর বেশী জোর দিতে চাননি। তিনি অলঙ্কারসমৃদ্ধভাবে শেষ দিকের ঘটনাকে উপস্থাপিত করেছেন।

শেক্সপীয়রের উৎস ছিল রোম্যান কবি ওভিড (Ovid)-এর 'ফ্যাস্টি' (Fasti), রোম্যান ঐতিহাসিক লিভির (Livy) বর্ণনা এবং চশারের 'সৎ মহিলাদের কাহিনী' (The Legend of Good Women)।

কাব্যটির সমাদর বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে হয়েছে। কবির নিজের যুগে অলঙ্কার-সমৃদ্ধির জন্য এর সমাদর হয়েছে। ঊনবিংশ শতকে কাহিনীটিকে ভদ্র ও সংযত কাব্যরূপ দেবার জন্য কবির প্রশংসা করা হয়েছে। আধুনিক যুগে কাব্যটির স্থানে স্থানে যে নাটকীয় সুর

আনা হয়েছে, তার প্রশংসা করা হয়েছে। কাব্যের বিভিন্ন অংশে মূল প্রসঙ্গ থেকে অন্য কথায় সরে যাওয়াটা কাব্যের পক্ষে কিছু ক্ষতিকারক হয়েছে বলে অনেকের অনুমান।

কাব্যসমালোচকরা 'Lucrece'-কে নিয়ে বেশী আলোচনা করেছেন, কিন্তু পাঠকদের কাছে 'Venus' বেশী সমাদর পেয়েছে।

তৃতীয় কাব্যটি **'আবেগের অভিসারে' (The Passionate Pilgrim)—**

এটি একটি অদ্ভুত গ্রন্থ। এটির সাল-তারিখ তিন-চার রকমে উল্লেখ করতে হয়। ১৫৯৯, ১৬১২, এবং এমনকি ১৬৪০ সালের সংস্করণেও কিছু নতুনত্ব আছে।

রচয়িতা যে কেবলমাত্র শেক্সপীয়র নন তা প্রায় সবাই মানেন। বিশেষ করে টমাস হেউড (Thomas Heywood ১৫৭৫-১৬৫০) এবং রিচার্ড বার্ণফিল্ডের (Richard Barnfield ১৫৬৪-১৬২৭) কয়েকটি কবিতার কথা অবশ্যই আসে। এমনকি মার্লোর একটি কবিতাও এতে আছে।

বইটি একটি কবিতাগুচ্ছ। নানা আকার-আয়তনের ছোট বড় ২১টি কবিতা। শেক্সপীয়রের পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি বেশী, তাই সবগুলিই শেক্সপীয়রের নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল। কবিতাগুলির কোন কোনটি বেশ উঁচু মানের। আবার এর কোন কোন কবিতা শেক্সপীয়রেরই নাটক (Love's Labour's Lost) বা কাব্যগ্রন্থে (Venus and Adonis) আছে। Love's Labour's Lost যে তিনটি গান আছে এগুলি সেগুলি নয়। আবার শেক্সপীয়রের সনেটগুচ্ছ থেকেও দুটি এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বইটির ভিন্ন ভিন্ন কবিতার সংগ্রহের ব্যাপারে, এবং সম্পাদনার ব্যাপারে জগাখিচুড়ী করা হযেছে।

এই জন্যই বইটির একটি অখ্যাতি আছে। এই অখ্যাতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী ১৫৯৯ সালের প্রকাশক উইলিয়ম জ্যাগার্ড (William Jaggard)। পুস্তক প্রকাশনের ওই সময়ের স্বেচ্ছাকৃত দুর্নীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই বইটি। তবে তার জন্য শেক্সপীয়র দায়ী নন, এবং কবিতাগুলির কোনটিই একবারে নীচু মানের নয়।

আর একটি কথাও জানতে হবে তখনকার পাঠক অনেক ক্ষেত্রেই কবিতা পড়তেন, কিন্তু কবিকে পড়তেন না। অর্থাৎ বিভিন্ন কবির নানা কবিতা পড়তেন, কিন্তু একজন কবির নানা কবিতা পড়ার রেওয়াজ ছিল না। বেচারা কবিরা তাই নিজেদের কবিতা খ্যাতি অর্জন করলেই যথেষ্ট মনে করতেন; নিজেদের খ্যাতি তাতে পাওয়া গেল কি না তা দেখবার সুযোগ পেতেন না। বড় কবিদের অবশ্য ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছিল। নানা আলাদা আলাদা মানের পাঁচমিশালি কবিতার ভিতর ভাল মন্দ বাছার কাজটা ছিল সমালোচকের,—পাঠকের নয়।

এই রকম পাঁচমিশালি কাব্যসংগ্রহ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে অনেকগুলিই প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণ স্তরের কবিরা এই সুযোগটি পেয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী বেশ কিছু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেই গুণ এবং স্থায়ীত্বের বিচার করা সম্ভব হোত।

চতুর্থ কবিতাটি **ফিনিক্সপাখী এবং টার্টল পাখী (এক জাতীয় ঘু ঘু) (The Phoenix and Turtle)—**

১৬০১ সালে রবার্ট চেষ্টার (Robert Chester) এটি প্রকাশ করেন। এই কবিতাটির

নামের পাতায় শেক্সপীয়রকে সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান লেখক বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

এটি চার লাইনের ১৩টি স্তবকের অর্থাৎ ৫২ লাইনের কবিতা। স্তবকগুলির মিলের পরিকল্পনা abba। এ ছাড়া শেষে আছে ৫টি সমান স্তবকে বিভক্ত ১৫ লাইনের একটি শোকসঙ্গীত। এই গানটিতে স্পষ্ট করেই কবিতাটির সারবস্তু বলা আছে। সৌন্দর্য এবং সত্য (অমরতা বা চিরকালীনতা) এই দুটি পাখীর ভিতর ছিল; তাদের মৃত্যুর পরেও তা তাদের সঙ্গেই রয়ে গেছে। এদের বংশধর নেই, কেননা এরাই আদর্শ প্রেমের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

ফিনিক্স হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর পাখী, আর টার্টল পাখী বিশ্বস্ততা ও নিষ্কলুষতার প্রতীক।

কবিতাটি কোন এক স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে লিখিত। কিন্তু এদের সঠিক পরিচয় জানা যায় না।

এর পরে আছে 'প্রেমিকের অভিযোগ' (A Lover's Complaint)

১৬০৯ সালে প্রকাশিত সাত লাইনের ৪৭টি স্তবকের অর্থাৎ ৩২৯ লাইনের কবিতা। সম্ভবতঃ ছাপা হবার দীর্ঘকাল আগে লেখা হয়েছিল। কবিতাটি এত নীচু মানের যে অনেকে এটিকে শেক্সপীয়রের লেখা বলে মনে করেন না। তবে কেউ কেউ কিছু নিশ্চিত সঙ্কেত পেয়েছেন যে এটি শেক্সপীয়রেরই লেখা; অবশ্য তাঁর লেখালেখির একেবারে গোড়ার দিকে। আবার কেউ কেউ বলেন, অন্য কারুর লেখা, শেক্সপীয়রের জনপ্রিয়তার দরুণ তাঁর নামে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ সবই শেক্সপীয়রের প্রতি সমালোচকদের শ্রদ্ধার পরিচয়। তবে এটা শোনা যায়,—শেক্সপীয়র চাননি যে এ বই ছাপা হোক।

গল্পকাহিনী সমান্য। কোন একটি মেয়ে তার প্রেমিকের দ্বারা প্রবঞ্চিত। উক্ত পুরুষটি নানা কৌশলে ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েটির মন জয় করেছিল। কিন্তু মেয়েটির তরুণ বয়স পার হয়ে যাওয়ার পরে পুরুষটি তাকে পরিত্যাগ করে। সুতরাং মেয়েটি নির্জন পাহাড়ের ধারে একলা এসে নানাভাবে দুঃখ করে, আত্মধিক্কার দেয় এবং ভাগ্যের কাছে অনুযোগ করে। তার কাহিনী সে সহানুভূতিশীল একজন বয়স্ক রাখালকে বলে। কবিও আড়ালে থেকে ঘটনা ও বর্ণনা সব দেখেন এবং শোনেন। প্যাস্টোর্যাল কবিতার নমুনা হলেও এটি উঁচুদরের কবিতা নয়।

এই জাতীয় কবিতাকে প্যাস্টোর্যাল (Pastoral) কবিতা বা 'রাখালী' কবিতা বলে। এগুলি হয় মেষপালকদের জীবন সংক্রান্ত কবিতা, বা কোন মেষপালককে মাঝখানে রেখে সরল ও সুন্দর কবিতা। প্রাচীন গ্রীকরা এই জাতীয় কবিতা শুরু করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডেও এই বিশেষ শ্রেণীর কবিতা বহু শতাব্দী ধরে জনপ্রিয় ছিল।

শেক্সপীয়রের সনেট (Shakespearean Sonnet)

গ্রন্থের বর্তমান পর্বেই ইংরাজী সনেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। শেক্সপীয়রের সনেট তাঁর যুগের শুধু নয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম বলে

গণ্য। প্রকাশভঙ্গী ও রসসৃষ্টি,—এই দুয়েরই বিচারে সেগুলির উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। অনেকগুলি সনেটেই শেষ দুলাইনে এমন অপ্রত্যাশিত উত্তুঙ্গ চমক সৃষ্টি করা হয়েছে যে তা আমাদের বিস্ময়ে নির্বাক করে দেয়।

এগুলির সংবেদন ও অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর আগের সনেট লেখকদের থেকে আলাদা।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জাতীয় শক্তি ও প্রাচুর্যের ভিৎ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছিল। সহজভাবে তখনই তা অনুধাবন করা যায়নি। শেক্সপীয়র ঘটনাগত দিক থেকে তার প্রকৃতি ও কারণ দেখাতে যাননি। কিন্তু তিনি তা অনুভব করেছিলেন। এই অনুভব নানা ভাবে তাঁর সৃষ্টিতে মিশে গিয়েছিল। সনেটেও তাই ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি নিয়ে অনেক মাথা ঘামান হযেছে। কিন্তু তার থেকে বড কথা ছিল এই যে সূক্ষ্মভাবে জাতীয় চেতনায় স্বয়ম্ভরতা ও আস্থা যে ফোঁপরা হয়ে আসছিল তার প্রাথমিক অবস্থাকে শেক্সপীয়র তাঁর মননশীলতা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; এবং অসীম শক্তি দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। শেক্সপীয়রের সনেটগুলি তাই কারুকুশলতা, মননশীলতা, সংবেদনশীলতা, দৃঢ়তা এবং সৌন্দর্যের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

সনেটগুলির কথা 'পাল্লাডিস ট্যামিয়া' (Palladıs Tamia) বা 'উইটস ট্রেজার' (Wit's Treasure) অর্থাৎ 'বুদ্ধিমানের সম্পদ' নামক বইতে লেখা আছে।

'পাল্লাডিস ট্যামিয়ার' পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার।

১৫৯৮-সালে কেম্ব্রিজে শিক্ষিত 'মাষ্টার অব আর্টস' (Master of Arts) এবং লণ্ডনের অধিবাসী ফ্রান্সিস মেরেস (Francis Meres) 'পাল্লাডিস ট্যামিয়া' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে শেক্সপীয়রকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মেরেস-এর নিজের কথাই এখানে উল্লেখ করলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—'প্রাচীন রোম্যান কবি ওভিডের মধুর ও বুদ্ধিদীপ্ত আত্মা মধুভাষী শেক্সপীয়রের ভিতর রয়ে গেছে। ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধবদের ভিতর প্রচারিত তাঁর সুমিষ্ট সনেটগুলিই তাব সাক্ষী।' (.......thc sweet witty soul of Ovid lies in mellifluous and honcy-tongued Shakespeare, witness his sugured sonnets among private friends....)

'Palladis Tamia' তে উল্লেখ থাকায় এটা বোঝা যায় যে, ১৫৯৫, ৯৬ ও ৯৭ সালে এই সনেটগুলি শেক্সপীয়রের বন্ধুবান্ধবদের ভিতরে প্রচারিত ছিল। লেখা হয়েছিল আরও অনেক আগে থেকে।

১৬০৯ সালে টমাস থর্প (Thomas Thorpe) 'প্রেমিকার অভিযোগ' (A Lover's Complaint)-এর সঙ্গে এই সনেটগুলিকে বই আকারে প্রকাশ করেন।

১৬৪০ সালে সনেটগুলির আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করেন বেনসন (Benson)। এই সংস্করণটিতে থর্পের (Thorp's) সংস্করণ থেকে আলাদাভাবে সনেটগুলিকে সাজান হয়েছিল।

শেক্সপীয়রের সনেটগুলি ঠিক যে প্রবহমান ঐতিহ্যের তৎকালীন ধরনের সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তা নয়। কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করে লিখিত না হয়ে কোন পুরুষকে উদ্দেশ্য করে সনেট লেখা প্রচলিত রীতি ছিল না। প্রথম ১২৬টি সনেট পুরুষকে উদ্দেশ্য করে লেখা। এঁকে ডব্লু. এইচ (W. H.) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ২৬টি সনেটও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নয়। কোন মহিলার প্রতি প্রণয়জ্ঞাপন ছিল প্রচলিত রীতি। কিন্তু এই ২৬টির অধিকাংশ জায়গায় মহিলাটির প্রতি ঘৃণার ভাব রয়েছে। কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্ট (না কি কৃষ্ণকেশী ?) মহিলাটি আবার বিবাহিতা ছিলেন।

অল্পবয়স্ক কোন পুরুষবন্ধু বা পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে কবির আন্তরিকতা ছিল। ধরা যায় মোটামুটি ১৫৯০ সাল পর্যন্ত। তারপর বন্ধুবিচ্ছেদ হয়। ১৫৯৩-৯৪ সালে কবি আবার পরিস্থিতিকে মেনে নেন। শেষের ২৬টি সনেট লেখার সময়ে শেক্সপীয়র গুরুগম্ভীর নাটকগুলিও লিখছিলেন। কবির মনোভাব এবং কাব্যের ও সনেটের গঠন এবং ব্যক্ত মেজাজ সমতালেই চলেছিল। তবে পুরাপুরি সঠিক কথা কিছু বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত ডব্লু. এইচ এবং কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্টা মহিলাটির প্রকৃত পরিচয় ছাড়াও সনেটগুলিতে আরও কতকগুলি সমস্যা রয়েছে। যেমন, সনেটগুলি 'আত্মজীবনী'মূলক কিনা। এ সম্বন্ধে পরে কিছু বলছি। কেউ কেউ এই সনেটগুলিকে রূপক কবিতা বলেও বলেছেন। কিন্তু একটানা তুলনামূলক সঙ্কেত অনুসরণ করাও দুরূহ। লিটন ষ্ট্রাচি (Giles Lytton Strachey ১৮৮০-১৯৩২) এগুলিকে সনেট লেখার তৎকালীন ফ্যাসন ছাড়া আর কিছু নয় বলে ধরে নিয়েছেন। এই মত মেনে নিলে সনেটগুলির কাব্য উৎকর্ষের দিকেই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়। কারুর কারুর মতে বেশী গোয়েন্দাগিরি করার থেকে সনেটগুলিকে এই রকম মুক্ত দৃষ্টি নিয়েই দেখা উচিৎ। কিন্তু ভালবাসা, ঈর্ষা এবং অনুতাপের এত ছড়াছড়ি কি বাস্তব ঘটনা ছাড়া সম্ভব ? আর একটি সমস্যাঃ 'প্রতিযোগী কবি'—যিনি কবির পৃষ্ঠপোষকের দাক্ষিণ্য পেয়েছিলেন—তিনিই বা কে ? কবি চ্যাপম্যান কি ?

তাছাড়া, তখনকার কালের নট বা নাট্যকাররা ছিলেন অনুকম্পার পাত্র। শেক্সপীয়র কি ভাবে কোন অভিজাত পুরুষ বা অভিজাত মহিলার ঘনিষ্ঠতা পেয়েছিলেন ? প্রথম সনেটগুলি কোন অভিজাত পুরুষের এবং শেষেরগুলি সম্ভবতঃ কোন অভিজাত মহিলার সঙ্গে সান্নিধ্যের সাক্ষ্য।

অধিকাংশের মতে পুরুষ ব্যক্তিটি সাদাম্পটনের আর্ল হেনরী রিওথেসলি (Henry Wriothesley, Earl of Southampton) এবং অভিজাত মহিলাটি রাণী এলিজাবেথের অন্যতম সহচরী এবং সাদাম্পটনের সঙ্গিনী মেরী ফিটন (Mary Fitton)।

তারপর, শ্রীযুক্ত W. H. কে সনেটগুলির 'Begetter' বলে বলা হয়েছে। 'Begetter' বলতে জন্মদাতা বোঝায়। কিন্তু এখানে হয় 'সনেটগুলির সংগ্রহকারী' অথবা 'সনেটগুলি লেখায় উৎসাহদাতা'—এ দুটির যে কোন একটি বুঝিয়েছে। কিন্তু কোনটি ?

সংখ্যাগত পারম্পর্য ধরে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রথম সতেরটি সনেটে কবি তাঁর উদ্দিষ্ট অল্পবয়স্ক পুরুষটিকে বিয়ে করতে এবং বংশরক্ষা করতে বলেছেন,—যাতে করে তাঁর গুণাবলীর ধারা বজায় থাকে। তারপরের কবিতাগুলিতে তিনি ওই অভিজাত ব্যক্তিটিকে ভর্ৎসনা করেছেন। এই সময়ে হয়ত সেই কৃষ্ণকেশী মহিলাটিকে (Dark

Woman) কবির বন্ধু প্রলুব্ধ করেছেন। অথবা হয়ত অন্য কোন কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের দাক্ষিণ্য পাওয়ার দরুণ কবি অভিমান করেছেন। তারপর কবি ক্রমে বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়েছেন। কৃষ্ণকায়া মহিলাটিকেও নানা অবস্থায়, নানা সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা ছাব্বিশটি সনেটে ব্যক্ত হয়েছে।

কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষককে যেমন সম্মান দেখিয়েছেন তেমনি নিজের সৃজনীশক্তিতেও সঠিক আস্থা ঘোষণা করেছেন। তাঁর কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর বন্ধুকে অমরতা দান করেছেন। এই সুদৃঢ় আস্থা সত্যদ্রষ্টার দ্বারাই সম্ভব।

সনেটগুলির বহিরাবরণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সে সব আলোচনায় সনেটগুলির অন্তর্নিহিত স্থায়ী কাব্যগুণের সমাদর তত নেই। Kyd-এর রূঢ় ও দগদগে হিংস্র কাব্যলক্ষণ এবং Donne-এর দার্শনিকতা ও ভগবদ্ চিন্তার মাঝখানে শেক্সপীয়রের সনেটগুলিকে রাখা যায়। এটি প্রবহমানতার বোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কিন্তু এই সনেটগুলিকে শুধু ধারা এবং পর্যায়ের ফ্রেমে আটকানো যায় না। এগুলির নিত্যসত্যতাকেও অবশ্যই বুঝতে হবে। এগুলিতে দেহবিমুক্ত আত্মার সঙ্গে ভৌত অস্তিত্বের যে সম্পর্ক রয়ে গেছে তা-ও তো বুঝতে হবে। আবার এগুলিতে ক্ষণিকতা ও চিরস্থায়ীত্বের যে সন্ধি সেটাও কবির ভাব-গভীরতার পরিচয় বহন করে।

এখানে আমরা তিনটি সনেট সম্পর্কে আলাদা করে আলোচনা করবো।

১৮নং সনেটের আরম্ভঃ 'আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মের সুন্দর দিনের সঙ্গে তুলনা করবো?' (shall I compare thee to a summer's day?)। এই সনেটটির শেষে আছেঃ 'আমার এই অবিনশ্বর পংক্তিগুলির মধ্য দিয়ে তুমি চিরজীবি হয়ে থাকবে। যতদিন মানুষ থাকবে, মানুষের দৃষ্টিশক্তি থাকবে ততদিন আমার কবিতা থাকবে। আমার কবিতা তোমাকে অমরতা দেবে। মৃত্যুর দম্ভ তোমার সামনে হতমান হবে।

(Nor shall Death brag thou wand' rest in his shade,
When in eternal lines to time thou growest.
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.)

অথবা ৭৩নং সনেটের কথা ধরা যাক। এর আরম্ভঃ 'বছরের সেই সময়ে তুমি আমাতে দেখে থাকবে..(That time of year thou mayst in me behold.)।

এটি একটি আক্ষেপের কবিতা। শেষ অংশ অপ্রত্যাশিত সুন্দর।—'যে জীবন জ্বলে উঠেছিল তা ধীরে ধীরে নিভে যাবে। রাত্রি যেমন গোধূলির ম্লান আলোকে ঢেকে দেয়, মৃত্যুও তেমনি আমার জীবনকে অচিরে গ্রাস করে নেবে। তা' তুমি যখন দেখবে তখন আমার প্রতি তোমার ভালবাসা তীব্রতর হবে। অবিলম্বে যাকে পরিত্যাগ করতে হবে, অন্তিম মূহুর্তেই তার প্রতি ভালবাসা পূর্ণতা পাবে।'

কিংবা ১১৬নং সনেট।—'মনের মিল যেখানে আছে সেখানে কোন বাধাই বাধা নয়।'

(Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments.......)

প্রেমের চিরঞ্জীব ধ্রুবতার প্রত্যয়। দেহ তার সৌন্দর্য হারায়। প্রেম অপরিবর্তনীয়। এ যদি ভ্রান্তবিশ্বাস হয় এবং আমার জীবনে যদি সে ভ্রান্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহলে বলতে হয় আমি কখনো কিছু লিখিনি ; কোন মানুষ কখনো ভালবাসেনি।

(If this be error. and upon me prov'd,
I never write, nor no man ever lov'd.)

সনেটগুলিতে যেমন কবির ব্যক্তিগত জীবনেব সঙ্কট প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তদানীন্তনকালের জাতীয় সঙ্কটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সারবস্তু ব্যক্ত হয়েছে। যা আছে তাতে নিশ্চিত হবার কোন কারণ নেই। পরিবর্তন পীড়াদায়ক। তা মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। আপাত রম্যতার আড়ালে রূঢ়তা ও হৃদয়হীনতা থাকতে পারে। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় গৌরব ঔদ্ধত্য ও অমানুষিকতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনের সৌজন্য, বন্ধুত্ব ও প্রেম প্রতারণা, অহঙ্কার ও লালসার দ্বাবা মলিন হতে পারে। এগুলি উপলব্ধি করে মানুষ কষ্ট পেতে পারে ; কিন্তু এর ভিতরেই মানুষের চিরন্তন এবং ধ্রুব সত্ত্বাকে খুঁজে নিতে হবে। অভিমান আর অশ্রুজলকে সংযত করতে হবে কাব্যের পূর্ণতাসাধনের মধ্য দিয়ে। কৃচ্ছ্রতা আর সংসার পরিত্যাগ ভীরুতা। দুঃখে-সুখে সম্পদে-বিপদে জীবনের সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে হবে। নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতার কোন স্থান নেই,— না ব্যক্তিতে না জাতীয় সত্ত্বায়। গভীর উপলব্ধি হবে কাব্যের উৎস। সে উপলব্ধিকে ভাষায় প্রকাশের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা, যৌবন থেকে বার্ধ্যক্য, ক্ষমতা থেকে ক্ষমা, বিলাসিতা থেকে প্রেম সব কিছুকেই জীবনের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

"জীবন জানি হোমশিখায়,
হৃদয় জেনো তবু
প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক ক্যাথিড্রাল" —[বিষ্ণু দে]

জন ডন (John Donne) ১৫৭৩-১৬৩১

কবি ডন শেক্সপীয়ারের থেকে বয়সে অনেক ছোট। তিনি ধর্মসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কবি। তাঁর মৃত্যুর দু বছর পরে ১৬৩৩ সালে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে সেগুলি লেখা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং তার পরেও প্রায় দুই দশক ধরে।

ডন ছিলেন প্রচণ্ড বিশেষত্বমণ্ডিত কবি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই বিংশশতাব্দীতে আধুনিক কবিদের উপর ডনের শক্তিশালী প্রভাব বর্তমান। ডনের বিশেষত্ব নানা দিকে। 'ইমেজ' (Image), যাকে আমি 'চিত্রকল্প' বলেছি, বা 'ভাবমূর্তি' বলেও যার স্বরূপ বুঝতে হয়, তা ডনের কবিতায় ছিল অত্যন্ত অ-গতানুগতিক। এটা ঠিকই যে একটি বস্তু বা ভাবকে বরাবর একই তুলনা বা বিশেষণ দিয়ে বোঝাতে বোঝাতে এমন এক সময় আসে যখন বহু ব্যবহৃত উপায় বা শব্দ আর তেমন কাজ করে না। তখন সাহস করে নতুন সমানুপাতের সন্ধান করতে হয়। কিন্তু দৃঢ় মননশীলতা ও সাহস না থাকলে সেই প্রবর্তকের ভূমিকা নেওয়া যায় না। সকলে তা পারেন না ; ডন পেরেছিলেন।

এর দ্বারা শুধু যে পুরানো বিষয় ও ভাবনাকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় তা নয়, নতুন উপলব্ধির দরজাও খুলে যায়। আবার এমনও হয়, নতুনভাবে ব্যক্ত পুরানো জিনিষকে সঠিকভাবে বোঝান যায় না। কাজে কাজেই স্বীকৃতিও পাওয়া যায় না। ডন এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা এনে ফেললেন যাকে অবলম্বন করে অনেক আধুনিক কবি সঠিকভাবে নিজের কথা বোঝাতে পেরেছেন। এই ধরনের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী দুর্বল হাতে পড়লে উদ্ভট হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সেটা ব্যক্তিগত দক্ষতার ব্যাপার।

ডনের আর একটি বিশেষত্ব অখণ্ডতা, এবং দুই বিভিন্ন মনের পরস্পরের উপর প্রভাবের সামঞ্জস্য।

আবেগ, ইন্দিয়াতিশয্য ও শক্তিশালী বিশ্লেষণী চেতনা ডনের প্রধান মূলধন। আবেগ অনেক সময়েই ভগবদ্‌প্রেমে বিলীন হয়েছে। ইন্দ্রিয়াতিশয্য তাঁকে দুঃসাহসী করেছে, এবং মর্মভেদী চেতনা তাঁর কাব্যকে আত্মসমীক্ষার শক্তি জুগিয়েছে। তিনি বস্তুকে, শব্দকে এবং বস্তুর অভ্যন্তরের ইঙ্গিতকে এক সমতলে আনতে পেরেছিলেন। আবেগ তাঁর চিন্তাকে নিয়ন্ত্রন করেছে; কিন্তু সে আবেগের স্বরূপ ও তীব্রতাকে তিনি তাঁর উপলব্ধির আওতা থেকে হারিয়ে যেতে দেননি।

ডন বস্তু এবং আবেগ দিয়ে শুরু করে এগিয়ে গেছেন, বস্তু-বিমুক্ত চিন্তাকে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত সমন্বয়ের ভাষা খুঁজে পেয়েছেন। এই ভাষা পরিণত বুদ্ধির ভাষা এবং সঠিক ভাষা। কথা ভাল শোনাল কি না তাতে তাঁর কিছু যায় আসে নি। শুধু নতুনত্বের জন্যই যদি নতুন কথা আকর্ষণীয় হয়, তবে তা দুর্ভাগ্য।

আসল কথা, আমরা পরস্পরকে, প্রেমাষ্পদকে সঠিকভাবে বুঝতে চেয়েছি কিনা। ডন আত্মপ্রবঞ্চনা করেন নি। তাঁর উপলব্ধি সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছেছে। চিরাচরিত প্রকাশভঙ্গী সেখানে কত দুর্বল। ভাল ভাষা দিয়ে আপাত রম্যতা সৃষ্টি করতে তিনি চাননি। এই সততাতেই ডনের জয়,—ডন কালোত্তীর্ণ।

ডঃ জনসন (Johnson) ডন এবং ডনের উত্তরসূরীদের 'মেটাফিসিক্যাল' (Metaphysical) কবি বলেছেন। আমি সঠিক প্রতিশব্দ তৈরী করতে পারিনি। তাই তাঁদের আমি 'বস্তু-অতিক্রমী' ভাবনার কবি বলছি। তবে ডনের ক্ষেত্রে সেই ভাবনার প্রক্রিয়া ছিল একাধারে প্রেমের বিস্তৃতি ও সমাহরণ (Spreading and gathering)।

সূক্ষ্ম নতুনত্ব তাঁর প্রকাশভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কবিতার জন্য নির্ধারিত গঠনরীতিও মানেন নি। মূল অর্থ ব্যক্ত করতে তিনি যত দূর প্রয়োজন যেতে প্রস্তুত ছিলেন। কবিতা তাঁর কাছে শিল্পের চেয়েও বড় কিছু, অর্থাৎ সবচেয়ে সঠিক অভিব্যক্তি। বুদ্ধিকে পঙ্গু করে রেখে ভাষাকে গতানুগতিক করে রাখার তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন।

THE GOOD-MORROW

দূরান্বিত ভাব-সামঞ্জস্য ছিল তাঁর স্বাভাবিক প্রকাশের ধরন। এতে, আমি আগেই বলেছি, তিনি উদ্ভট আতিশয্যের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু হারিয়ে যাননি।

এই আতিশয্য 'দি গুড মরো' কবিতায় স্পষ্ট। কবিতাটির দৃঢ়তা খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ভালবাসা পরিণত মনেই সম্ভব; প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের কাছে একমাত্র বাস্তব। ভালবাসাই জাগরণ—আসন্ন সুপ্রভাত—Good Morrow। প্রমাস্পদের ভিতরেই গোষ্পদে বিশ্বদর্শন হয়। অধিকন্তু, ভালবাসা পরস্পরের পরিপূরক। এই সম্পূর্ণতাই অমরতা। এই সহজ সত্যটিকে ডন এখানে কয়েকটি অগতানুগতিক ভৌত পরিচয় দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

এর পর নাটকের কথায় আসছি।

নাটক

আমরা ইতিপূর্বে নাটকের সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা কিছু করেছি। ক্লাসিক নাট্যকার এসকাইলাস (Aeschylus), সফোক্লিস (Sophocles),ইউরিপাইডেস (Euripides)এবং এ্যারিস্টোফেনিস (Aristophanes) সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলেছি। প্রসঙ্গক্রমে এ্যারিস্টটল-এর (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২সাল) কথাও অবশ্যই আসে। সেই সঙ্গে ল্যাটিন নাট্যকার সেনেকার (লুসিয়াস আন্নিউস সেনেকা—Lucius Annaeus Seneca খৃঃ পূঃ ৩-৬৫ খৃষ্টাব্দ) এবং দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলির (নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি—Niccolo Machiavelli ১৪৬৯-১৫২৭) কথাও উল্লেখ করা হযেছে। দেশীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি এই সব দার্শনিক ও নাট্যকারদের প্রভাব যে আলোচ্য যুগের নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা জানিয়েছি।

সাধাবণভাবে 'নাটক' বলতে আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এবং অভিনয় করে দেখানোর জন্য নির্ধারিত নিয়মের সাহিত্যকর্ম বুঝি। দর্শকদের মনোরঞ্জন এবং একটা বক্তব্য বিষয় তাদের কাছে উপস্থাপন নাটকের কাজ: 'দর্শকমণ্ডলী' (Spectators and Audience) অভিনীত নাটকের ক্ষেত্রে খুবই বড় ব্যাপার। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নাট্যকারকে অনেক ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিষয়কে অবলম্বন করতে হয়। এ ছাড়া থাকে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং নানা কাল্পনিক বিষয় ও অবস্থাকে উপস্থাপনের কাজ। 'সাময়িক' জনপ্রিয়তা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়,—কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাটক বহুকাল পরেও তার আকর্ষণী শক্তি হারায় না।

ট্র্যাজেডি, কমেডি, গর্ভনাটিকা, প্রহসন ইত্যাদি এবং এদের নানা শাখা প্রশাখা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ সবের কিছু আলোচনা আমরা আগে করেছি। নতুন নতুন শাখার উদ্ভবও হচ্ছে। এই ধারার মধ্যে যথাস্থানে আমরা এই পর্বে আলোচ্য যুগের নাটককে বিন্যস্ত করবো।

আলোচ্য যুগে নাটক

আমাদের আলোচ্যযুগে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার থেকে নাটকের চাহিদা বেশী ছিল। ছাপান বই তখন সবে শুরু হচ্ছে। এককভাবে, ব্যক্তিগতভাবে বই পড়ার ক্ষেত্রে অনেক

বাধা ছিল। যথেষ্ট সংখ্যক বই ছিল না; বইপড়ার দক্ষতাও অনেকের ছিল না। আর তা ছাড়া চাক্ষুশ জ্বলজ্বলে কিছু সামনে দেখা এবং উপভোগ করার আনন্দের বিকল্পও খুব বেশী সেকালে আশা করা যায় না।

আমরা এখানে একেবারে গোড়ার দিকের দু'এক কথা সংক্ষেপে বলে নিই। ক্লাসিক নাটক ছিল অখণ্ড শিল্প। অঙ্ক-দৃশ্যের বিভাগ-উপবিভাগের সেখানে কোন দরকার ছিল না। কিন্তু ষোড়শ শতকের রোম্যাণ্টিক নাটকে এই ভাগগুলি অপরিহার্য ছিল। স্থানাভাবে আমরা এখানে এর বিস্তৃত কারণ আলোচনা করতে পারলাম না। এ ব্যাপারে সেনেকার প্রভাব ছিল একটা বড় ব্যাপার। তবে সেনেকার নিজের নাটকে কিন্তু এরকম বিভাগ ছিল না।

কোরাস (Chorus)

প্রাচীনতর গ্রীক নাটকে 'কোরাসে'-র একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। কোরাসের একটা ক্ষীণ ধারণা আমাদের দেশে যাত্রা থিয়েটারের 'জুড়ি' এবং 'দোযারকি' থেকে পেতে পারি। গ্রামাঞ্চলে যাত্রাতে তো বটেই, কলকাতার সাধা রঙ্গমঞ্চেও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও 'জুড়ি'-র দেখা মিলত। যাইহোক, 'কোরাস' নানাভাবে গ্রীক নাট্যকারকে এবং দর্শককে সাহায্য করতো।

রোম্যাণ্টিক নাটকে কোরাসকে বজায় রাখা যায়নি, বা বজায় রাখা হয়নি। তবে কোরাসের নানা বিকল্পের উদ্ভাবন করা হয়েছিল। রোম্যাণ্টিক নাটকে কোরাসকে আগের মত রাখতে গেলে নাটকের গতি কমে যেত এবং নাটকের যুক্তির ভিত্তি দুর্বল হয়ে যেত।

গ্রীক নাটকে 'কোরাস' অপরিহার্য ছিল। বস্তুতঃ কোরাস থেকেই গ্রীক ট্রাজেডির উদ্ভব। কোরাস ছিল অনেক মানুষের ব্যষ্টিকরণ। কোরাসের দল নেচে, গেয়ে, কৌতুক করে, স্মরণ করিয়ে, পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে প্রাচীন গ্রীক ট্যাজেডিতে বহু দিন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। কিন্তু এই মূল বীজ ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছিল। ক্রমে দর্শক ভুল করে একে প্রক্ষেপ বা অপ্রয়োজনীয় সংযোজন বলে মনে করতে শুরু করেছিল। বটগাছের মূল কাণ্ডের মত এই কোরাস নিজস্বরূপে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি।

ক্রমপরিণত গ্রীক নাটকে ধীরে ধীরে প্লট জটিল হতে থাকল। নাটকের এই পরিবর্তিত চেহারার সঙ্গে কোরাস আর সম্পর্ক রাখতে পারল না। আবার, প্লটের ক্রমশঃ জটিলতা গ্রীক নাটকের গঠনকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। গ্রীক নাটকের গঠনের এই অগ্রগতি ইউরিপাইডিসের (Euripides) অবদান।

অন্যদিকে প্লট ক্রমশঃ জটিল হওয়ার সমান্তরালে কোরাসের অস্তিত্ব ও অনুশীলন কমতে থাকায় গ্রীক ট্র্যাজেডির সরল প্রকাণ্ড প্রাণশক্তি আদিম সজীবতা হারিয়ে ফেলছিল। শুধু নাটক নয়, সমাজকে সুনীতিসম্মত চরিত্রে ধরে রাখার দায়িত্ব ছিল কোরাসের। বিভিন্ন ট্র্যাজেডিতে যখন জীবনের মূল নীতিগুলি থেকে সাময়িক বিচ্যুতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্ধারিত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হত, তখন তা ঘোষণার দায়িত্ব ছিল কোরাসের।

গ্রীক নাটকে অনেক ক্ষেত্রে মূল অংশে থাকত অজ্ঞানতা ও অবিবেচনার নিদর্শন,

সেগুলির যথাবিহিত শাস্তি ইত্যাদি এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মূলনীতির বিজয়। কোরাস এইগুলি লক্ষ্য করতো, বর্ণনা করতো ও ঘোষণা করতো।

বিভিন্ন পরিস্থিতির একটিকে আর একটির থেকে আলাদা করে দেখানোর কাজও ছিল কোরাসের কাজ। আমরা বাংলা নানা সামাজিক নাটকে, বিশেষ করে যাত্রায়, এই ধরনের উপায় অবলম্বন করতে দেখেছি নাচ, গান ('বিবেকের' গান, সমবেত গান ইত্যাদি) ইত্যাদির অবতারণার মাধ্যমে। গ্রীক নাটক ছিল সুসংলগ্ন ও অখণ্ড। অঙ্ক-দৃশ্যের ভাগ সেখানে ছিল না। পরিস্থিতিগুলি পরপর স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যেত। এই স্বাভাবিক একটানা ভাব বজায় রাখার জন্যও কোরাসের প্রয়োজন ছিল।

ল্যাটিন নাটকে সেনেকাকে অঙ্ক-দৃশ্যের বিভাগগুলির প্রবর্তক বলে অনেক ক্ষেত্রে ধরা হয়। সেনেকা ঠিক আমাদের পরিচিত অঙ্ক-দৃশ্যের ভাগ করেননি। কিন্তু সেনেকারই প্রভাবে অঙ্ক দৃশ্যের ভাগের পত্তন হয়েছিল। সেনেকা কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যার ফলেই পরবর্তীকালে নাটকের এই ভাগগুলি তৈরী হয়। সেনেকা কোরাসের সাহায্য নিয়েছিলেন, এবং অখণ্ড নাটককে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিলেন। অঙ্ক এবং দৃশ্যের বিভাজন কোরাসের এই কার্যকারিতা থেকে শুরু। পরবর্তীকালে অঙ্ক এবং দৃশ্যের বিভাজন থেকে গেল, কিন্তু কোরাস অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল এবং পরে বাতিল হয়ে গেল।

ক্লাসিক 'তিন ঐক্য' (Three Unities) বজায় রাখার একটা কৌশলগত দায়িত্ব ছিল কোরাসের। রোম্যান্টিক নাটকে তিন ঐক্যের পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় না থাকায় কোরাসের অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ততা আর থাকল না।

যাই হোক, আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। কৌতুহলী পাঠক যাঁরা এই বই-এর প্রথম ভাগ পড়েছেন তাঁরা আশা করি লক্ষ্য করেছেন যে সাহিত্যের যে কোন শাখার ক্রমোন্নতি এবং বিশেষ বিশেষ যুগে তার প্রকাশের ধরনকে আমি একটি প্রবহমান ধারার মধ্যে রাখতে চেয়েছি। চলমানতা এবং গুণগত ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করে যাওয়া সাহিত্যের ইতিহাসের কাজ। আমার বর্তমান আলোচনায় তাই প্রাচীন কথার কিছু উল্লেখ বা পুণরুল্লেখ দরকার মনে করলাম।

পাশ্চাত্য জগতে নাটকের শুরু প্রাচীন এথেন্সে সোমরসের দেবতা ডায়োনিসাসের পূজা উপলক্ষ্যে নাচগান উৎসব আমোদের থেকে। এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের গুরুতর দিক থেকে প্রাচীন ট্র্যাজেডির এবং লঘু হাস্যপরিহাসের দিক থেকে কমেডির উদ্ভব।

হাজার-বারশ বছর বাদে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালিতে প্রাচীন গ্রীসের নানা প্রভাবের সঙ্গে নাটকেরও যথার্থ আবির্ভাব হয়। প্রাচীন গ্রীসে নাটকের উপলক্ষ্য ছিল ডায়োনিসাসের পূজা ও সংশ্লিষ্ট উৎসব অনুষ্ঠান। কিন্তু দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে অবস্থা ছিল আলাদারকম। সে যুগের সাধারণ মানুষ গীর্জার আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সহজবোধ্য কিছু আনন্দের উপকরণ চেয়েছিল। এবং অবশ্যই সে প্রত্যাশা ছিল বাইবেলকে কেন্দ্র করে। তৎকালীন ভ্রাম্যমান গায়কেরা গান শোনাতেন অভিজাতদের, এবং তাদের ভাষাও ছিল সাধারণের বোঝার পক্ষে শক্ত। সাধারণ লোক বাইবেলের

গল্পই শুনতে চেয়েছিল এবং সহজ ভাষায়। এর সঙ্গে অভিনয়ের মত যদি কিছু যোগ হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। মধ্যযুগে এই তাগিদেই নাটকের সূত্রপাত।

পশ্চিম ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের এই গণ-সংস্কৃতি প্রায় একই সঙ্গে এবং একই কারণে ইংল্যাণ্ডেও জনপ্রিয় হয়। ইংল্যাণ্ডে এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ভাষাতেই নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ উপাদানও ধীরে ধীরে এই সব নাটকের সঙ্গে মিশে যেতে থাকল। বাইবেলে বিশ্বাস বজায় রেখেই মানুষ 'আনন্দের জন্যই আনন্দের' আয়োজন করতে শুরু করল। বিভিন্ন দেশে নানা রোম্যানস ভাষাতে যে সব জনপ্রিয় নাটক মধ্যযুগে তৈরী করা হয়েছিল এবং অভিনীত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'এ্যাডাম' (Adam)। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা হযেছিল।

ক্রমশঃ প্রাচীন গ্রীসের ট্র্যাজেডি ও কমেডির অনুকরণে ল্যাটিন ট্রাজেডি ও কমেডি লেখা ও অভিনয় হতে শুরু করল। ট্যাজেডি প্রসঙ্গে সেনেকার এবং কমেডি প্রসঙ্গে প্লটাস (Plautus) এবং টেরেন্সের (Terencc) এর কথা আমবা আগেই বলেছি। (প্রথম ভাগ, ১৪০ পাতা)

নাটকের গঠনভঙ্গীমায় ইটালি ও ফ্রান্সে সেনেকার প্রভাব নানাভাবে দেখা গেছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সেনেকার প্রভাব নাটকের গঠনভঙ্গীতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে যাঁদের হাতে নাট্যসাহিত্য গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁদের অনেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহাসিক উপাদান আকর্ষণীয ছিল। অনেকেই ইংল্যাণ্ডের নাট্যামোদী মানুষের কাছে কৌতুকবিহীন গুরুতর কিছু দেবার জন্য ট্রাজেডির চর্চা করলেন। বোধহয় একমাত্র লিলি বিদেশী আদলের প্রচণ্ডতাকে সরিয়ে রেখে সমসাময়িক জনজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কমেডি লিখেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে রোম্যাণ্টিক কমেডির প্রথম নেতা ছিলেন লিলি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংল্যাণ্ড এবং স্পেনের উদ্দাম স্বাধীনতা স্পৃহার মধ্যে ল্যাটিন নাটকের নিয়ম ও নির্দেশ হাবিয়ে গেল। এই পর্যাযেই ইংল্যাণ্ডে রোম্যাণ্টিক নাটকের সূত্রপাত হল।

মাঝখানে যে স্তর গেছে তার ব্যাখ্যা এইরকম। প্রাচীন গ্রীক নাটকের নব্য স্তরের কমেডির অনুসরণে ল্যাটিন কমেডি এবং পুরাপুরি অনুকরণের দ্বারা ল্যাটিন ট্র্যাজেডি শুরু হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে রোম্যাণ্টিক ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্রগুলি হোত অভিজাত, খ্যাতিমান মানুষেরা। ওই পর্যন্তই প্রাচীন ট্র্যাজেডির সঙ্গে মিল। নাটকের বক্তব্যের ও বাচনিক অভিব্যক্তির যে উন্নত স্তর প্রাচীন ট্র্যাজেডিতে একটানা বজায় রাখা হোত তা আর তেমন গুরুত্ব পেল না। সেনেকা কিন্তু প্রাচীন গ্রীক লক্ষণের সেই উন্নত স্তর অন্ততঃ আলঙ্কারিক বহিরাভরণের ভিতর বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান পর্বের আলোচ্য সময়ে ইংরাজী ট্র্যাজেডির পক্ষে সে স্তর বজায় রাখা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতার সমান বলে মনে করা হোল। রোম্যাণ্টিক ট্র্যাজেডির এটি একটি মস্ত বড় লক্ষণ।

ক্লাসিক ট্র্যাজেডির পুরাপুরি অনুকরণের চেষ্টায় অর্থাৎ নিও-ক্লাসিক ট্র্যাজেডিতে 'স্থান'

(Place), 'কাল' (Time) ও ঘটনার (Action) ঐক্য (তিন ঐক্য-Three Unities) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছিল। আবার ওই একই শতাব্দীরই শেষ দিকে গঠনমূলক স্বাধীনতার আকর্ষণে একমাত্র ঘটনার (Action) ঐক্য ছাড়া বাকি দুটিকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল। রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এইটিই। কিন্তু স্বাধীনতার অনুশীলনে মূল বিধিবদ্ধ আদর্শের মর্মকে যখন পরিত্যাগ করা হোল তখন অধোগমনের প্রবণতাকে যে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিরোধ করার দরকার তা কারুর চিন্তায় আসেনি। শেক্সপীয়রের পরে ইংরাজী ট্রাজেডি শুধু বাইরের ক্ষমতাই জাঁক করে দেখিয়েছে; মূল ভিৎ যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তার খবর কেউ রাখবার দরকার বলে মনে করেনি।

কঠিন নীতি নব্য ক্লাসিক ট্র্যাজেডিতেও যে আদিম সরলতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল, রোম্যান্টিক ট্রাজেডিতে তা আর বজায় থাকেনি। রোমান্টিক ট্র্যাজেডি বাস্তব জগতের বৈচিত্র ও জটিলতার প্রতিচ্ছবি। তবে রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডির প্রতেকটিতে এক একটি কেন্দ্রীয় মুখ্য আকর্ষণ বজায় রাখতে হয়েছিল। তা না থাকলে কোন নাটকই দানা বাঁধত না।

ক্লাসিক এবং নব্য ক্লাসিক ট্র্যাজেডিতে নিষ্ঠুর কাজের বার্তা পাওয়া যেত, কিন্তু ওই কাজের অনুষ্ঠান দেখান হত না। রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডিতে এ ব্যাপারে তেমন কোন বাঁধাধরা নিষেধ মানা হোল না।

কমেডিতে দেশীয় জনপ্রিয় উপাদান এবং তার সুব স্পষ্টভাবে বা অন্তর্লীন ভাবে বরাবরই বজায় ছিল। যে অবারিত আনন্দে সাধারণ মানুষের স্বস্তি ও সহজবোধ বরাবর প্রকাশ পেয়েছিল, রোম্যান্টিক কমেডিতে সেই বোধই ক্রমপরিণত নাটকীয় গঠনে ব্যক্ত হয়েছিল।

নাটকের অভিজাত দর্শক, সাধারণ মানুষ এবং তাদের মনোমত নাটক, উচ্চশিক্ষিত নাট্যকারদের শক্তিশালী কিন্তু অপরিচিত বিষয় ও ধরনের নাটক, সামগ্রিকভাবে নাটকের উদ্ভব ও ধারাবাহিকতার কথা এ পর্যন্ত কিছু আলোচনা করলাম। ওই প্রসঙ্গ ধরেই সেনেকা (Lucius Annaeus Seneca খ্রীঃ পূঃ ৩-৬৫ খৃষ্টাব্দ) এবং ম্যাকিয়াভেলির (Niccolo Machiavelli ১৪৬৯-১৫২৭) সম্বন্ধে এই পর্বের ভূমিকা অংশে দু'এক কথা বলেছি। এই দুজনের সম্বন্ধে আরও কিছু কথা অল্পপরিসরে বলার ইচ্ছা রয়েছে। এ ছাড়া আর যাঁদের কথা আলাদা করে বলতে হয তাঁরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত নাট্যকার। এঁদের বলা হয় University Wits—বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। তা ছাড়া, শেক্সপীয়র তো আছেনই, এবং সেই সঙ্গে তাঁর সমকালীন এবং ঠিক পরবর্তী যুগের নাট্যকারগণ।

এঁদের ভিতরে বোধ হয় শেক্সপীয়রই একমাত্র নাট্যকার যিনি বহিরাগত জ্ঞান ও তথ্য এবং দেশীয় চিরাচরিত উপাদান ও দেশীয় ইতিহাসকে এক জায়গায় এনেছিলেন।

আমরা এবারে সেনেকা ও ম্যাকিয়াভেলি সম্বন্ধে আরও কিছু কথা, আলোচ্য যুগে নাট্যমঞ্চ, ইউনিভারসিটি উইটস এবং শেক্সপীয়র এবং অন্যান্য নাট্যকার সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করবো।

লুসিয়াস আনিউস সেনেকা (Lucius Annaeus Seneca) খৃঃ পূঃ ৩-৬৫ খৃষ্টাব্দ

আলোচ্য যুগের নাট্যসাহিত্যের উপর সেনেকার প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে গ্রীক ট্র্যাজেডিকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, বা তার জায়গায় অনুরূপ কিছু আর তৈরী করা যাবে না। The days of Tragedy are gone with the Greeks. প্রাচীন গ্রীকদের মত প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির দিনও শেষ হয়ে গেছে। সেনেকা শেষ-হয়ে-যাওয়া সেই গ্রীক ট্র্যাজেডি অনুকরণ করেছিলেন। গ্রীক ট্র্যাজেডি তার অস্তিত্বের শেষ দিকে ধর্মীয় ভিত্তি থেকে মানবীয় ভিত্তির দিকে সরে আসতে শুরু করেছিল। সেনেকার নিজের আমলে রোমক সাম্রাজ্যের ভিতও দুর্বল হতে শুরু করেছিল। সেনেকা ছিলেন রোম সম্রাট নিরোর গৃহশিক্ষক। আবার নিরো-ই তাঁকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। সেনেকার সময়েই রোম সাম্রাজ্যের আড়ম্বর পতনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। সেনেকার নাটকগুলির বিষয়বস্তু ছিল গতানুগতিক; কিন্তু নাট্যরূপের মাধ্যমে সেগুলির ব্যাখ্যা ছিল সেনেকার নিজস্ব। তাঁর নাটকের ঘটনার ব্যাখ্যা তাঁর সমসাময়িক কালকে সামনে রেখে করা হয়েছিল। আমাদের কাছে যা প্রাচীন ইতিহাস তার আদর্শগত ব্যাখ্যা সেনেকার নাটকেই পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গীবনের (Edward Gibbon ১৭৩৭-১৭৯৪) [রোম সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস —The Decline and Fall of the Roman Empire] বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সতেরশ বছর আগে নাটকের আধারে ধরে রেখেছিলেন সেনেকা। তিনি নিরো-র শাসনকে ঘৃণা করে গেছেন। স্বৈরশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সতেরশ বছর আগে সেনেকার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজ নাট্যকাররা সেনেকার আদর্শকে তাদের নাটকে পুণরুচ্চারণ করেননি। তবু সেই আদর্শ—অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শ—আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। সমসাময়িককালে সেনেকার জনপ্রিয়তা অন্যভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালে সারা ইউরোপের বিদ্বান মনুষেরা তাদের কাছে প্রিয় ল্যাটিন ভাষায় যে সুন্দর ও সার্থক সাহিত্য চেয়েছিলেন তা সেনেকাই তাঁদের উপহার দিয়েছিলেন।

আমাদের আলোচ্য যুগের ইংরাজী নাটকের বহিরাবরণ সেনেকার নাটকের আদর্শেই তৈরি হয়েছিল। নাটকের গঠনগত এই বিশেষত্বের প্রত্যক্ষ আবেদন তদানীন্তন কালের ইংরাজ মানসিকতাকে সন্তুষ্ট করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাব কথা কারুর কারুর মনে পড়লেও অনেকেই শান্তি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বড় রকমের আশ্বাস পেয়েছিলেন। সেনেকার নাটকের গঠনশৈলীর অনুকরণে ইংরাজী নাটক ঠিক এই পরিস্থিতিতে সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিলেন। সেনেকার নাটকের অন্তর্নিহিত দার্শনিক শিক্ষা নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামাননি। কিন্তু তা ছিল এবং সেনেকার নাটকের স্থায়ী মানবিক মূল্য সেখানেই।

যাই হোক, যদিও আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নাটক, তবু আমরা বৃহত্তর সামাজিক আধারে নাট্যশিল্পের তদানীন্তন জনপ্রিয়তার আলোচনা করতে চাই। সামাজিক আধারের কথায় বলতে হয় যখন থেকে মানুষ বুঝতে পারল যে স্থায়ী শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কম তখন তারা উদ্বেগ ও হতাশার শিকার হল।

·সেনেকার সঙ্গে পরিচয়ের আগে যে ধর্মভিত্তিক নাটক চলছিল তার রেশ স্বাভাবিকভাবেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু সে যুগের ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা অন্য এক নাটক চাইছিল। দেশে অনুকরণীয় আদর্শের অভাব ছিল। ল্যাটিন ট্র্যাজিক নাট্যকার হিসাবে দেড় হাজার বছর আগের সেনেকা ইউরোপের পণ্ডিত সমাজের কাছে পরিচিত। সেনেকার নাটকের আপাতদৃষ্ট লক্ষণ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দর্শকের চাহিদার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। এই চাহিদা ছিল প্রধানতঃ অতি নাটকীয়তা, রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার চাহিদা। এই চাহিদার যোগান পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেনেকার মূল অভিজ্ঞতা মানুষকে ভাবিয়ে তুলল। প্রত্যক্ষ কারণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা।

কিন্তু ইতিমধ্যেই সেনেকার নাটকের রোমাঞ্চ ও আবেগের বাহুল্য ইংরাজী নাটকে অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট বছরের জন্য স্থায়ী এক বিশেষ গঠনশৈলী তৈরী করে দিয়েছিল। শেক্সপীয়রও এই বিশেষ গঠনশৈলী মোটামুটি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে অতিক্রম করে যে স্থায়ী দর্শনের পত্তন করে দিয়েছিলেন তা সেনেকার থেকে প্রসারিত এবং গুণগতভাবে বিচিত্র। সাধারণ ইংরাজ দর্শক তাদের তদানীন্তন বর্বর চরিত্রের দরুণ সেনেকার নাটকের খোলসটাকেই আসল জিনিষ বলে গ্রহণ করেছিল, এবং তা তাদের নাটকে মিশিয়ে নিয়ে এক ধরনের স্থূল আনন্দ পেয়েছিল।

সেনেকার নাটকের অন্তর্নিহিত অবদান ঃ

রোম সম্রাটের বর্বরতার প্রতিবিধান করবার ক্ষমতা সেনেকার ছিল না। সুতরাং তাঁকে তির্যক উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। ক্লাসিক উপকথার থেকে তিনি তাঁর বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সেগুলির মাধ্যমেই প্রচ্ছন্নভাবে তিনি রোমক শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। নিরো তা বুঝেছিল, কিন্তু ষোড়শ শতকের ইংরাজ দর্শকের তা বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। সেনেকার নাটকের আসল কথা ছিল অন্যায়কে ঘৃণা করতে শেখানো। রোমাঞ্চকর এবং আলঙ্কারিক বক্তৃতা তার বাইরের আবরণ। আমাদের আলোচ্য যুগের অধিকাংশ নাট্যকার এই বহিরাবরণকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ মাত্রাতিরিক্ত উল্লাসী ইংরাজ দর্শক তা-ই চেয়েছিলেন।

সেনেকা তাঁর প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরী করেছিলেন পাতালের অন্ধকার জগতের জীবেদের সাহায্য নিয়ে। সমকালীন রোমক রাজশক্তিকে এইরকম ভাবে পরোক্ষে উপস্থিত করে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু ষোড়শ শতকের ইংরাজ দর্শক সেই অতিপ্রাকৃত যান্ত্রিক উপকরণকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

অতিপ্রাকৃতের এই উপস্থাপনে সেনেকা রিভেঞ্জ (Revenge) বা প্রতিহিংসার সাহায্য নিয়েছিলেন। ইংরাজ নাট্যকাররা মূল বিষয় থেকে অনেক সরে গিয়ে এই প্রতিহিংসাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

প্রতিহিংসার এবং জঘন্য অপরাধের দৃশ্যগুলি উভয় যুগেরই (এখন থেকে দু হাজার বছর আগের রোমক যুগ এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড) মানুষকে আনন্দ দিত।

সেনেকা নাটকের একটা অবয়ব দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তব্যকে মানুষের মনে ধরাতে পারেন নি।

সেনেকা গ্রীক নাটকের নিয়তির জায়গায় ভাগ্যকে এনে হাজির করলেন।

আবার স্মরণ করিয়ে দিই যে আলোচ্য যুগে ইংরাজ দর্শকের মানসিকতা খুব নীচু স্তরের ছিল। প্রাচীন গ্রীকদের সংযম, সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য—কোন কিছুই তখনকার ইংরাজদের মনে ছিল না। সুতরাং সেনেকার নাটকের আপাতদৃষ্ট রূপ তাদের খুব ভাল লেগেছিল। গ্রীক নাটকে ছিল আদর্শ জীবন, সেনেকাব নাটকে শক্তিহীনের ব্যর্থ প্রতিবাদ;—হতাশা ও ব্যর্থতার চাপা কান্না। কিন্তু এ সবের যথার্থ উপলব্ধির ক্ষমতা আলোচ্য যুগের ইংরাজ দর্শকের ছিল না।

সেনেকার নাটক সম্ভবতঃ অভিনীত হয়নি। আবৃত্তি করা হয়েছিল। তাই আলঙ্কারিক ভাষা প্রযোগের প্রয়োজন ছিল, কেননা একমাত্র শ্রবণশক্তির দ্বারা এগুলিকে উপলব্ধি করতে হয়েছিল। এরই অনুকরণে আলোচ্য যুগের ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চে জোরাল শব্দের বহুল ব্যবহার হয়েছিল। আলোচ্য যুগের শেষের দিকে অবশ্য ইংরাজ দর্শক কান ও চোখ উভয়কেই কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। আর সেই সঙ্গে সেনেকার সেই মৌলিক উপাদান—"ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস"—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংরাজী নাটক, ইংরাজী উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।

সেনেকার প্রভাবেই আমাদের আলোচ্য যুগে রোমাঞ্চকর ভাবপ্রবণতাপূর্ণ মিলনান্তক নাটক বা 'মেলোড্রামা' (Melodrama) লেখা হতে লাগল এবং তা জনপ্রিয় হল। এই 'মেলোড্রামার' দুটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে,—(১) উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির ধারণা (Sensationalism —সেনসেসন্যালিজম) এবং (২) অত্যধিক ভাবপ্রবণতা (Sentimentalism—সেন্টিমেণ্ট্যালিজম)। ওই সময়ের বর্বর প্রকৃতির ইংরাজ দর্শকের কাছে এ দুটি স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্খিত ছিল।

এবারে দার্শনিক-রাজনীতিক ম্যাকিয়াভেলির কথায় আসতে হয়।

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli) ১৪৬৯-১৫২৭

ম্যাকিয়াভেলির সমসাময়িককালে উত্তর ইটালির ফ্লোরেন্স (Florence) ছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র। ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন ফ্লোরেন্সের নাগরিক। এই সময়ে ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালির বা বিশেষ করে ফ্লোরেন্সের সম্পর্ক ভাল ছিল না। সমগ্র ইটালিতে একটা নিরাপত্তার অভাববোধ তৈরী হয়েছিল। ম্যাকিয়াভেলি এই দুরবস্থার অবসান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার ভিত্তি ছিল 'রাজা' এবং 'রাজ্যশাসন' সংক্রান্ত তাঁর উদ্ভাবিত নীতি। ম্যাকিয়াভেলির দর্শনের প্রেরণা ছিল 'জাগ্রত ইটালি' বা 'ইটালিযা ওরিয়েণ্টা' (Italia Orienta)। তিনি ক্রমে 'একনায়কতন্ত্রে' (Dictatorship) বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। শেক্সপীয়র এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ নাট্যকারদের উপর ম্যাকিয়াভেলির প্রভাব পড়েছিল। তাঁর মতে রাজার চরিত্র হবে সিংহ ও শৃগালের প্রকৃতির সমন্বয় অর্থাৎ সাহস ও ধূর্ততার সমন্বয়। ইটালির গৌরবকে আবার উজ্জ্বল করে তুলতে গেলে এইরকম একজন সর্বময়

ক্ষমতাসম্পন্ন রাজার (Princc) দরকার। এই রাজা সর্বতোভাবে তাঁর রাজ্যের স্বার্থ দেখবেন (A man entirely devoted to the cause of the State)। এই ছিল ম্যাকিয়াভেলির সূত্র। ম্যাকিয়াভেলির 'Il Princcpe' ('রাজা'—The Prince) গ্রন্থে এই'বিষয়ের বিস্তৃত যুক্তি আছে।

ফরাসী লেখক জাঁতিলে (Gentillc)এই সূত্র ফরাসীতে অনুবাদ করলেন তার নিজস্ব ভাষ্যে। ম্যাকিয়াভেলি প্রদত্ত 'রাজা'-র সংজ্ঞায় সম্পূর্ণভাবে দেশের স্বার্থে (entirely devoted to the cause of the State) এই শব্দগুচ্ছকে জাঁতিলে পরিকল্পিতভাবে বাদ দিলেন। ম্যাকিয়াভেলির 'রাজা'কে দেখান হল স্বার্থপর, দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ নীচ মানুষ হিসাবে। এইভাবে মূল ইটালিয় চিন্তা ফরাসী ও ইংরাজ মনে সঞ্চারিত হল বিকৃতভাবে। বলাই বাহুল্য এই চিন্তা ম্যাকিয়াভেলির চিন্তা নয় ;—একে বলা চলে এই বিষয়ে নকল আদর্শ (Pseudo-Machiavellianism)। ম্যাকিয়াভেলির মতের এই বিকৃত ভাষ্যের প্রভাব পড়েছিল আমাদের আলোচ্য যুগের ইংরাজী নাটকে।

ইংরাজ নাট্যকাররা মঞ্চ-সফল হবার মত এই দুর্বৃত্ত চরিত্রের (Villain—ভিলেন) কাঠামো পাওয়ায় খুব খুশী হলেন। তাঁরা ম্যাকিয়াভেলির মূল মতবাদের কথা জানলেন না, এবং অজ্ঞানতাবশতঃ এই বিকৃত চরিত্রকে আসল মনে করে তাঁদের নাটকে হাজির করলেন।

এই আদর্শে প্রথম নাটক হল কিড-এর (Thomas Kyd—১৫৫৮-৯৪) 'দি স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি' (The Spanish Tragedy ১৫৮৫)।

ধারাবাহিকভাবে এই ঐতিহ্য অনুসবণ করা হতে থাকল। এমনকি সাহস ও ধূর্ততার যে কোন একটি লক্ষণকে নিযেও চরিত্র সৃষ্টি হল। শেক্সপীয়রের 'তৃতীয় রিচার্ড' (Richard III) এই আদর্শে তৈরী।

আসলে ম্যাকিয়াভেলির মতবাদ র‍্যানেইসঁসের বস্তুবাদেরই অংশ (Materialism)।

প্রশ্ন ওঠে 'সাহস এবং ধূর্ততার' এই চরিত্র কেন সৃষ্টি হল। এটি এসেছিল জীবন সম্পকির্ত ধারণার সেই ভিত্তি থেকে যেখানে জানান হয়েছে যে জীবন মুখ্যতঃ অসৎ। সুতরাং সাহস ও ধূর্ততার উপরই জীবনের পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে। এই ধারণায় এক নৈরাশ্যের ব্যঞ্জনা থেকে যায়।

এই নৈরাশ্যের ফলশ্রুতি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ইংরাজ মানসে নিরাপত্তার অভাবের ক্রমবর্ধমান অনুভূতি, বিশ্বাসের অভাব ও নানা মানসিক সমস্যা। র‍্যানেইসঁসের প্রাথমিক প্রভাব—যা ছিল উল্লাসের, গৌরবের, তেজোদৃপ্ত প্রকাশের, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের, জাতীয়তাবোধের, বিপদসঙ্কুল অভিযানের উন্মাদনার এবং নতুন নতুন কর্মপ্রচেষ্টার উজ্জ্বল সমন্বয়,—তা-ই পরে পালটে দাঁড়াল হতাশা ও আশঙ্কার পরিবেশে। ম্যাকিয়াভেলির মতবাদের বিকৃতি এই শেষোক্ত পরিস্থিতির পরিপূরক হিসাবে কাজ করলো।

সিউডো-ম্যাকিয়াভেলিবাদ (Pseudo-Machiavellism) প্রচণ্ড নাটকীয় সম্ভাবনা নিয়ে ইংরাজ নাট্যকার ও দর্শকের সামনে হাজির হল।

কিন্তু এ অবস্থারও শেষ আছে। জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক বোধের সম্মিলিত ফল

দেখা দিতে শুরু করলো। ম্যাকিয়াভেলির মতবাদের দার্শনিক মৌল শক্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করলো। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই ম্যাকিয়াভেলির মতবাদের পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা শুরু হল।

আরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা দরকার সেটি সে যুগের নাট্যমঞ্চ। নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা না থাকলে সে যুগের নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে না।

প্রাচীন গ্রীকদের অভিনয় হত পুরোপুরি মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চে। সেখানে একসঙ্গে নাকি ২০০০০ (বিশ হাজার) লোক অভিনয় দেখতে পারত। ডায়োনিসাসের পূজার বেদীকে সামনে রেখে, সেখানে পূজা সেরে, পূজা-অনুষ্ঠানের অংশহিসাবে অভিনয় হত। সেই অভিনয়ে রহস্যময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্বজগৎ এবং মানুষের জীবনকে জড়িত করে প্রাচীন গ্রীকরা নাটক অভিনয় করতেন। এছাড়া দর্শকমণ্ডলী ও মঞ্চের মধ্যে একটা দূরত্বের বোধ সৃষ্টি করা হত। অভিনয়ের একটা রহস্যময় আবেষ্টনী তৈরী করার জন্যই হয়ত এই দূরত্বের বোধের প্রয়োজন হত। অভিনেতারা সর্বদাই মুখোস ব্যবহার করতেন। ব্যক্তিগত অভিনয় নৈপুণ্য এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী দেখানোর সুযোগ ছিল না। এবং তার জন্য কোন অভাববোধ ছিল না। স্পষ্ট বাস্তব কিছুর সঙ্গে সে অভিনয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। দেবতাদের রহস্যময় আরাধনাটাই ছিল আসল কথা।

গ্রীক নাটক, গ্রীক অভিনয়, গ্রীক রঙ্গমঞ্চের কথা সঙ্গত কারণেই আসে। পাশ্চাত্ত্য জগতে অভিনয়সংক্রান্ত সব কিছুর মূল সেই প্রাচীন গ্রীসে, বা বিশেষ করে এথেন্সে। সেই পুরান কথার উল্লেখ না করে ইউরোপের কোন দেশেরই অভিনয় সংক্রান্ত (বা নাটক সংক্রান্ত) কোন কিছু বলা আদৌ যুক্তিসংগত নয়।

যাই হোক, আমরা এরপর বহু শতাব্দীর ব্যবধান বাধ্য হয়েই রাখছি। এখন আমরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের ইংল্যান্ডে। রঙ্গমঞ্চ ছিল ডিম্বাকৃতি। মঞ্চের মাঝখান দর্শকমণ্ডলীর দিকে এগিয়ে যেত। এই মঞ্চকে বলা হয়েছে "Undistanced stage" অর্থাৎ দূরত্ব-বর্জিত মঞ্চ। আমাদের আধুনিক কালের মঞ্চ কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখে এমন মঞ্চ। একে আমরা 'ছবির মত মঞ্চ' (Picture Stage) বা একদিক খোলা "বাক্সের মত মঞ্চ" (Box Stage) ইত্যাদিও বলি। তবে, এখন থেকে কয়েক দশক আগে থেকে আবার দূরত্ব-বর্জিত মঞ্চের প্রবর্তন হয়েছে। দর্শকমণ্ডলী ও মঞ্চের মধ্যে তফাৎ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

আমাদের আলোচ্য যুগের ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের ধারণা আমরা পাই কালিকলম দিয়ে আঁকা একটি বিশেষ ছবির মারফৎ। ছবিটি 'সোয়ান' (Swan) থিয়েটারের। ১৫৯৬ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে হল্যাণ্ডের অধিবাসী জোহানেস ডি উইট (Johannes de Witt) ছবিটি এঁকেছিলেন।

মঞ্চের তখন তিনটি অংশ ছিল। সামনের অংশ—রাস্তা, চত্বর বা অন্য কোন খোলা জায়গা দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হত। 'পিছনের অংশ'—কোন ঘর, মন্ত্রনাকক্ষ ইত্যাদি দেখানোর জন্য থাকত। আর, 'তৃতীয় অংশ' হত "উচ্চতর মঞ্চ"। এটি উপরতলার

জানালা, গ্যালারি, বা উপরতলার বারান্দা ইত্যাদির জন্য রাখা হত। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত কিন্তু বলেছেন,—মঞ্চে পাঁচটি অংশ থাকত। তাঁর মতে, একেবারে সামনে খানিকটা খোলা অংশ থাকত যার মাথার উপর ছাদ থাকত না। তারপর ছাদ-ঢাকা দ্বিতীয় অংশ। তারপর 'অভ্যন্তর মঞ্চ', 'উচ্চতর মঞ্চ', এবং একটি ছোট দরজা যার ভিতর দিয়ে উচ্চতর মঞ্চে যাতায়াত করা যেত।

মঞ্চ হত খোলা, খুঁটি দিয়ে উঁচু করা। তখনকার মঞ্চে সামনে কোন পর্দা থাকত না।

আলোচ্য যুগে মঞ্চে 'স্বগতোক্তি' (Soliloquy) এবং 'একান্তের' (Aside) বহুল ব্যবহার ছিল। এর দ্বারা এক ধরনের কৃত্রিমতা থেকে যেত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নরওযের ইবসেন (Henrik Ibsen ১৮২৮-১৯০৬) এটি বন্ধ করেছেন।

তখন মঞ্চে আসবাবপত্র কমই থাকত এবং দৃশ্যের পশ্চাদপট পরিবর্তন করা যেত না।

দর্শকের কথা বলতে গেলে সাধারণ দর্শক মঞ্চের তিন দিক ঘিরে মাটিতে বসত (groundling)। তিন দিকে গ্যালারি থাকত। বেশী দামের টিকিট কিনলে গ্যালারিতে বসা যেত। আরও দামী আসন হত মঞ্চের উপরেই টুল পেতে। আগেই বলা হয়েছে মঞ্চ হত দোতলা। দোতলাকে বলা হতো 'লর্ডস রুম' (Lord's room)। সবচেয়ে অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের কারোকে কারোকে সেখানেও বসতে দেওযা হত।

মঞ্চের সামনের অংশের মাথার উপর ছাদ থাকত। ছাদের পিছনে অবশ্য পর্দা ঝোলান থাকত, যেটাব পরে থাকত মঞ্চের পিছনের অংশ।

অভিনয় হত দিনের বেলায। 'অন্ধকার' দেখান যেত না।

খোলামঞ্চের দরুণ শেষ দৃশ্য শান্তিপূর্ণ রাখতে হত। কোন চূড়ান্ত রোমাঞ্চকর দৃশ্য সব শেষে দেখান যেত না।

এইবার এই যুগের বিশিষ্ট নাট্যকারদের কথা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়, বা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু আলোচনাও করতে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকদের কয়েকজন এই যুগের নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ তাদের সাহিত্যকর্মের ভিতর দিয়ে ফুটিযে তুললেন। তাঁরা পড়াশুনা করে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন নাটকের কথা জেনেছিলেন, এবং নিজেদের সাহিত্যে নাটকের নতুন মডেল গড়ে তুললেন। তাঁরা প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন, এবং নাটকে উদ্ধত, শক্তিশালী, নবচিন্তার প্রবর্তন করলেন। ইংরাজী ভাষার ভিতর সার্থক নাটক সৃষ্টির যে সুপ্ত সম্ভাবনা ছিল তাকে তাঁরা ফুটিয়ে তুললেন। নাটক প্রাণবন্ত হল এবং স্থায়ীত্বের গুণযুক্ত কয়েকটি নাটক ইংরাজী সাহিত্যে যুক্ত হল। এঁরা ছিলেন সাতজন। এঁদের একত্রে 'ইউনিভারসিটি উইটস' (University wits) বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত একদল বুদ্ধিমান নাট্যকার বলা হয়। এঁরা জীবনে কিছু পাননি, বা অন্য দিক থেকে বলতে গেলে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জীবনকে দেখেছিলেন।

এঁরা ছিলেন বেপরোয়া এবং বিপ্লবী। বয়সের ক্রমানুসারে এঁরা ছিলেন জন লিলি (John Lyly ১৫৫৪-১৬০৬), রবার্ট গ্রীণ (Robert Greene ১৫৫৮-৯২), টমাস কিড (Thomas Kyd ১৫৫৮-৯৪), জর্জ পীল (George Peele (১৫৫৮-৯৮), টমাস লজ (Thomas Lodge ১৫৫৮-১৬২৫), ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-১৫৯৩) এবং টমাস ন্যাস (Thomas Nash ১৫৬৭-১৬০১)।

নাট্যকার জন লিলি (John Lyly) ১৫৫৪-১৬০৬

গদ্যগ্রন্থ 'ইউফিউস' (Euphues) প্রসঙ্গে লিলির কথা আগেই বলেছি।

এখানে নাটকের কথায় বলি, ইংরাজী সাহিত্যে রোম্যান্টিক কমেডির প্রথম নিদর্শন আমরা লিলির মারফৎ-ই পাই।

'এনডিমিয়ন, বা চাঁদের দেশে মানুষ' (Endymion, the Man in the Moone) লিলির একটা নামকরা নাটক। এটি প্রকাশিত হয় ১৫৯১ বা ৯২ সালে। গদ্যে লেখা রূপক নাটক।

এনডিমিয়ন একজন মানুষ। চাঁদ অর্থাৎ সিনথিয়াকে (Cynthia) সে ভালবাসে। সিনথিয়ার আকর্ষণে সে টেলাস (Tellus) অর্থাৎ পৃথিবীকে ত্যাগ করে। টেলাস তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ডাকিনী ডিপসাস (Dipsas)তাকে সাহায্য করে। ডাকিনীর প্রভাবে চল্লিশ বছরের জন্য এনডিমিয়ন ঘুমিয়ে পড়ে। সিনথিয়া ডাকিনীর কুহক ব্যর্থ করে দিয়ে এনডিমিয়নকে জাগিয়ে তোলে।

এই কমেডিতে নাটকীয়তা খুব কম। রূপকের দিক থেকে অনেকে অনুমান করেন এনডিমিয়ন হচ্ছে লর্ড লিসেস্টার (Leicester), সিনথিয়া রাণী এলিজাবেথ এবং টেলাস স্কটদের রাণী মেরী (Mary, Queen of Scots)। এর ভিতরে আবার উপকাহিনী (sub-plot)আছে। ডিপসাসের সঙ্গে তার স্বামী জেরণের (Geron) ঝগড়া। রূপক হিসাবে জেরণ এবং ডিপসাস শ্রুসবেরির (Shrewsbury) আর্ল এবং তার স্ত্রী। অন্যান্য নাট্যকীয় চরিত্র হচ্ছে ইউমেনাইডস এবং সেমিলি (Eumenides and Semele)। হয়ত স্যার ফিলিপ সিডনি এবং লেডি রিচকে (Lady Rich) এই দুটি চরিত্রে দেখান হয়েছে।

এরপর আছেন গ্রীণ।

রবার্ট গ্রীন (Robert Greene) ১৫৫৮-১৫৯২

ইতিপূর্বেই গ্রন্থের এই বর্তমান পর্বের ভূমিকা অংশে আমরা গ্রীণের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। গ্রীণের চারটি নাটকের ভিতর আমরা এখানে কেবলমাত্র 'ভিক্ষু বেকন এবং ভিক্ষু বুঙ্গে' (The honourable history of Frier Bacon and Frier Bungay) নাটকটির কথা বলব।

এটি পদ্য ও গদ্যে লেখা একটি কমেডি। ১৫৯৪ সালে অভিনীত হয়।

গ্রীনের প্রকৃতি গল্পলেখকের প্রকৃতি। নাটকে বিভিন্ন উপাদান তিনি যে ভাবে একজোট করেছেন তা দিয়ে তখনকার কালের দর্শকদের আকৃষ্ট করে রাখা হয়ত গিয়েছিল ; কিন্তু

তাতে নাটকের মূল গঠনগত পারিপাট্য ছিল না। তবে কৌতুক ও স্নিগ্ধ পরিবেশ যা কমেডির মূল মেজাজ হওয়া উচিৎ তা কিন্তু তিনি বজায় রেখেছিলেন।

গদ্যে, বিভিন্ন পুস্তিকা ও রচনাতে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর নাটকে তা পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় গ্রীণের নাটক সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য একটা ধাপ হলেও তার নিজস্ব সারবত্তা খুব বেশী ছিল না।

অনেকে 'ভিক্ষু বেকন' নাটকটিতে মার্লোর ডঃ ফস্টাসের অনুকৃতি দেখেছেন। তবে সেটা এমন কিছু নয়। ডঃ ফস্টাসে যেমন এখানেও তেমনি বেকন অলৌকিক অন্ধকার জগতের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে চর্চা করেছে। এই পর্যন্তই মিল। আর এতে 'ফ্রায়ার বেকন' নাটকটি হয়ত তখনকার কালে কিছুটা দর্শনীয় হযেছিল, কিন্তু নাটকের ওজোগুণ বাড়েনি। 'History of Friar Bacon' বলে একটি গদ্যলেখা থেকে বোধহয় নাট্যকার এই নাটকটি লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এই নাটক পাঁচমিশালী উপাদানে তৈরী। প্রেমের গপ্পো, পরীটরির ব্যাপার, হালকা মেজাজের মুগ্ধতা, ল্যাটিন নাট্যকার প্লটাসের আদর্শে কিছু তামাসা, শয়তানের (Devil) পিঠে চড়ে পাপের (Vice) নরকযাত্রার মত মজার দৃশ্য, একটু আধটু ক্লাসিক ছাপ, ছিটেফোঁটা ইতিহাস,—এই সব মিলিয়ে গ্রীণ তাঁর নাটক লিখেছিলেন। সম্ভবতঃ তা মঞ্চসফল হয়েছিল। অভিজ্ঞ গল্পলেখকের পারদর্শিতা দিয়ে তিনি নাটকের দর্শককে ধরে রাখতে পেরেছিলেন, এবং চরিত্রগুলিকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। আর এইখানেই গ্রীণের বিশেষত্ব। লিলি তাঁর নাটককে সাহিত্যিক ভাবে উপস্থাপনের একটা উন্নত মান দেখাতে পেরেছিলেন। গ্রীণ তা পারেননি। গ্রীণ নাটক লিখেছিলেন আর্থিক অভাবের দরুণ বাধ্য হয়ে। তাঁর দক্ষতা প্রধানতঃ গল্পলেখকের দক্ষতা। তবে আলাদা আলাদাভাবে চরিত্রগুলি কিন্তু সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে গ্রীণের অন্তর্দৃষ্টি লিলির চেয়ে বেশী। আর নাটকের মাধ্যমেও তাঁর প্রেমের কাহিনী পরিবেশন যথার্থ দক্ষতা, বুদ্ধি ও অনুভূতির পরিচয় দেয়।

বেকনের কাহিনী এই নাটকে প্রধান কাহিনী নয়, সহযোগী কাহিনী (উপকাহিনী বা Sub-plot নয়)। আসল কাহিনীটি এই রকম।—কোন এক যুবরাজ এডওয়ার্ড—পরবর্তীকালের রাজা প্রথম এডওযার্ডও হতে পারে—ফ্রেসিংফিল্ডের (Freshingfield) কোন এক গয়লানী মেয়ে মার্গারেটকে (Margaret) ভালবাসে। এডওয়ার্ড লর্ড লেসিকে (Lacy) মধ্যস্থতা করতে বলে, এবং নানা ঘটনার পর এডওয়ার্ড লেসির হাতেই মার্গারেটকে ছেড়ে দেয়।

এই সঙ্গে বেকনের কাহিনী মেশান হয়েছে। এরকম দৃশ্যও এই নাটকে আছে যে বেকন এবং প্রতিযোগী ওইরকম একজন জার্মান তান্ত্রিক জার্মান সম্রাট এবং ইংল্যাণ্ডের ও ক্যাস্টিলের রাজার সামনে তাদের তন্ত্রবিদ্যা দেখাচ্ছে।

গ্রীণ এই সব কিছু মিশিয়ে বেশ একটা জমজমাট নাটক তৈরী করেছিলেন।

সহযোগী বেকন-বুঙ্গের কাহিনী এইরকম।—ভিক্ষু টমাস বুঙ্গের সাহায্যে ভিক্ষু রোজার বেকন একটি পিতলের মুণ্ড তৈরী করে। শয়তানের আরাধনা করে তাকে দিয়ে কথা

বলানোর চেষ্টা হয়। মাসখানেক পরে মুণ্ডটি কথা বলবে। তবে কথা আরম্ভের সময়ে তা শুনতে হবে, না হলে প্রথমাবধি সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিন সপ্তাহ্ ধরে বেকন মুণ্ডটিকে দেখে গেল। তারপর তার চাকর মাইলসের (Miles) উপর ভার দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মুণ্ড প্রথম কথা বললেঃ 'এখনই সময়' (Time is)। মাইলস কিন্তু এই সামান্য কথা শোনবার জন্য মনিবকে ডাকল না। একটু পরেই মুণ্ডটি বলল ঃ 'সময় অতীত' (Time was), এবং তারপর শেষ কথা বললঃ 'সময় অতিক্রান্ত' (Time is past)। এই বলে মুণ্ডটি পড়ে গেল এবং ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে বেকন মাইলসকে খুব গালিগালাজ করলে।

টমাস কিড (Thomas Kyd) ১৫৫৮-৯৪

কিডের 'স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি' (Spanish Tragedy) অতি বিখ্যাত, জনপ্রিয় এবং সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাটক। এটি একটি 'সেনেকান' (Senecan) বা সেনেকার আদর্শের নাটক। ১৫৮৫ সালে বা তার কিছু আগে এটি লেখা হয়।

এটিকে তদানীন্তনকালের নাটকের একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রেণীটির নাম 'প্রতিহিংসার ট্র্যাজেডি' (Revenge Tragedy)। 'সেনেকা' এই জাতীয় নাটকের ভিত্তি হলেও ওই সময়ে ইংরাজ দর্শক কিছুটা 'জটিল' অর্থাৎ নানা ঘটনাসম্বলিত নাটক চাইছিল। বর্বর মানসিকতা সম্পন্ন জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী কিড সাংঘাতিক কিছু দেখাতে চাইলেন। সংঘর্ষ, রক্তপাত, ষড়যন্ত্র, নানা লোমহর্ষক কৌশল এবং ঘটনা দিয়ে কিড নাটকের বাজারকে সরগরম করে তুললেন।

হিংসাত্মক 'গর্বোডাক' (Gorboduc) [প্রথম ভাগের ১১৪ পাতায় বিশেষ উল্লেখ আছে] থেকে শুরু করে শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটক পর্যন্ত যে গতিপথ স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির স্থান তার মাঝখানেই। এমন কি, শেক্সপীয়র 'হ্যামলেট' লেখবার আগে কিড-ও নাকি একটি 'হ্যামলেট' লিখেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। শেক্সপীয়রের সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তরসূরী ওয়েবস্টারের 'ডাচেশ অব ম্যালফি' নাটকও একই সূত্রে বাঁধা। এমনকি এ-ও বলা হয় যে উত্তরকালের গোয়েন্দা-উপন্যাসের বীজও এই 'স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির' ভিতর গুপ্ত রয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে জীবনকে চুটিয়ে ভোগ করার যে প্রচণ্ড বাসনা মানুষের মধ্যে এসেছিল, তা ম্যাকিয়াভেলির বস্তুবাদেরই প্রত্যক্ষ রূপ। এই ধরনের জীবনকে গ্রহণ করার অর্থ ছিল জাতীয় মানসিকতার আত্মিক পরাজয়। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উন্মাদনা কেটে আসছিল। কিন্তু তখন এক প্রকাণ্ড শূণ্যতা মানুষের মনকে গ্রাস করেছে।

শেষোক্ত অবস্থা কয়েক বছর পরের। আমি প্রথম পর্যায়টির কথা এখানে ধরছি। নীতি-দুর্নীতির বিবেচনাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে 'প্রচণ্ড' জীবনযাপন করার বাস্তব প্রতিফলন পড়েছে 'স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি' নাটকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের ইংরাজের জাতীয় জীবনের নির্ভরযোগ্য দলিল 'স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির' মত নাটক।

স্থানাভাবের দরুণ নাটকের প্লট এখানে বর্ণনা করা গেল না।

জর্জ পীল (George Peele) ১৫৫৮–৯৮

পীল প্রচলিত নাটকের ধারা বজায় রেখেছিলেন, এবং তা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল।

টমাস লজ (Thomas Lodge) ১৫৫৮–১৬২৫

লজ নাট্যকার হিসাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নন। তবে হয়ত গ্রীণ এবং শেক্সপীযরের কোন কোন নাটকে তিনি কিছু সহযোগিতা করেছিলেন বা প্রভাব ফেলেছিলেন।

এর পরে আমরা আসব মার্লোর কথায়।

ক্রিস্টোফার মার্লো (Christopher Marlow) ১৫৬৪–১৫৯৩

মার্লো শেক্সপীযরের থেকে দু'মাসের বড। তাঁর সম্বন্ধে এই ভাগের ভূমিকা অংশে আমরা কিছু বলেছি। শেক্সপীয়রের সাক্ষাৎ পূর্বসূরীদের মধ্যে, এবং 'ইউনিভার্সিটি উইটস'-দের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। মার্লো ইংল্যাণ্ডের নৌসেনাপতির আশ্রিত অভিনেতা ও নাট্যকারদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মার্লোর নাটকের সংখ্যা সীমিত। ১৫৮৭ সালে তৈমুরলঙ বা 'তাম্বুরলেন দি গ্রেট' (Tamburlaine the Great), ১৫৯০ সালে 'মাল্টার ইহুদী' (The Jew of Malta), ১৫৯১ সালে 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' (Edward II), ১৫৯২ সালে 'ডক্টর ফস্টাসের বিষাদময় ইতিহাস' (The Tragical History of Doctor Faustus), ১৫৯৩ সালে 'প্যারিসে হত্যাকাণ্ড' (The Massacre of Paris) এবং ১৫৯৪ সালে 'কার্থেজের রাণী ডিডো' (Dido, Queen of Carthage)। মার্লো হঠাৎ নৃশংসভাবে মারা যাওয়াতে শেষোক্তটি লেখা সম্পূর্ণ হয়নি। এ ছাড়াও শেক্সপীয়রের দু'একটি নাটকে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন বলে বলা হয়।

এগুলির ভিতর ডক্টর ফস্টাস তাঁর সবচেযে প্রসিদ্ধ সাহিত্যকীর্তি এবং তাঁর সব নাটকের ভিতর একমাত্র 'দ্বিতীয় এডওযার্ড' নাটকে নিয়মানুগ নাটকীয় গঠন বজায় রাখা হয়েছে। আমরা কেবল এই দুটির সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করবো।

'ডক্টর ফস্টাসের বিষাদময় ইতিহাস' (The Tragical History of Doctor Faustus) ১৫৯২ (আগে ধারণা ছিল এটি ১৫৮৮ সালে লেখা)

এই নাটকটিকে একদিকে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও অলৌকিক কল্পনা এবং অন্যদিকে অচিরাগত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা—এই দুয়ের মাঝখানে স্থান দিতে হয়।

নাটকটির উৎস 'ফাউস্ট' (Faust) নামে একটি সুবিদিত জার্মান উপকথা। ডক্টর ফস্টাস মধ্যযুগীয় ধরনের এক বৈজ্ঞানিক। তিনি যাদুবিদ্যা জানতেন। লুসিফার (Lucifer) বা স্যাটান (Satan) এবং প্রেতজগতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন।

তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবেন, এই বিশ্বাসে শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রী করে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে চব্বিশ বছর ধরে তিনি আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন। এই অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগ উপলক্ষ্যে ফস্টাস তথাকথিত বরেণ্য মানুষদের তাঁর উদ্ধত প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঙ্গ করেছিলেন। তবে ফস্টাস যেখানে অন্ধকার জগৎ থেকে বিভিন্ন আত্মাকে তাঁর সামনে আসতে বাধ্য করেছিলেন সেখানে মার্লো যে অসামান্য কাব্য সৃষ্টি করেছেন তা দ্বারা আমরা অপলক বিস্ময় ছাডা আর কিছু অনুভব করতে পারি না। গ্রীক মহাকাব্যের হেলেন যখন ফস্টাসের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল তখন তাঁর উল্লাস সেই বিখ্যাত লাইনে প্রকাশ পেল ঃ

Was this the face that launched a thousand ships
And burnt the topless towers of Ilium!

কবি এখানে পাঠক এবং দর্শককে বিস্ময়ের তুঙ্গে নিয়ে চলে যান।

যাই হোক, শয়তানের সঙ্গে চুক্তির সময়সীমা যখন শেষ হয়ে আসছে তখন ফস্টাসের আত্মধিক্কার মর্মন্তুদ। এই আত্মধিক্কার কি নিরীশ্বরবাদী মার্লোর আত্মোপলব্ধি?

ফস্টাসের শেষ দৃশ্যগুলিতে করুণ এবং মহিমান্বিত শব্দসম্ভারের উৎকৃষ্ট সমারোহ। এই সব দৃশ্যে মার্লোর কাব্যের গম্ভীর ও আডম্বরপূর্ণ বাক্যসমাবেশ সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যে দুর্লভ। মহাকবি গ্যেটে-ও এই উপকথা নিয়ে কাব্য লিখেছিলেন, কিন্তু তিনিও মার্লোর কাব্যের প্রকাণ্ড গম্ভীর মহিমাকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

এই নাটকে কোন অঙ্ক বিভাগ নেই ; কেবল চোদ্দটি দৃশ্য।

নাটকের প্রথমে, শেষে ও ভিতরে কোরাসের আবৃত্তি আছে।

এই নাটক অতুলনীয় কাব্যোৎকর্ষের উপর দাঁডিয়ে আছে। সাধারণ নাটকীয় নিয়মকানুন সেই সুরধুনীর প্রচণ্ডস্রোতের মুখে ঐরাবতের মত ভেসে গেছে।

মার্লোর যুগে বুদ্ধিমান ইংরাজের যে মানসিক দুঃসাহসিকতা এবং সবকিছুকে যুক্তির নিরিখে বিচার করে নেওয়ার যে ঝোঁক ছিল মার্লোর ফস্টাস যেন তারই ব্যক্তিরূপ। সে যুগের শহুরে ইংরাজের ছিল প্রচণ্ড লিপ্সা, অদম্য বাসনা। ফস্টাসে সেই চরিত্রই ব্যক্ত হয়েছে।

আবার প্রকৃতিকে বশীভূত করবার বাসনা নিয়ে সে যুগের মানুষেরা—শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, সারা ইউরোপের—অন্ধকারের জগতের শক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। এরই নাম ছিল ব্ল্যাক আর্ট (Black Art)—রহস্যময় যাদুবিদ্যা। সত্যকাবের যাঁরা জ্ঞানী মানুষ তাঁদের জ্ঞানচর্চা এবং অসংস্কৃত মানুষদের অতিমানুষিক ক্ষমতা আহরণের অপচেষ্টা,—এই দুয়ের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। এই দুটিই পরে ধীরে ধীরে নৈতিক শুদ্ধতা ও নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছিল।

রহস্যময় অতিপ্রাকৃতে বিস্মিত মার্লো কিন্তু নৈতিক শুদ্ধতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিলেন। অবশ্য তাঁর চারপাশের সমাজে এই নৈতিক শুদ্ধতাকে তিনি দেখতে পাননি। চরিত্রের দেউলিয়াপনার বিরুদ্ধেই মার্লোর বিদ্রোহ। যে কোন উপায়ে জ্ঞান ও শক্তিলাভই শেষ কথা নয় ;—নৈতিক শুদ্ধতাকেই শেষ পর্যন্ত আমাদের মানতে হবে। ফস্টাসের তথা মার্লোর এই মহৎ অভিজ্ঞতা নাটকটির মানবিক অবদান।

দ্বিতীয় এডওয়ার্ড (Edward II) ১৫৯১

উৎস: নানা নাটক ও ইতিহাসভিত্তিক কাহিনীর উৎস ছিল হলিনশেডের (Holinshed) 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' (Chronicles of England)। 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড'-এরও স্থূল উৎস হলিনশেড। দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকাল ১৩০৭-১৩২৭। তিনি ছিলেন প্লান্টাজেনেট বা আঞ্জেভিন বংশের রাজা। তাঁর বাবা প্রথম এডওয়ার্ড খুব পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ছিলেন দুর্বল রাজা। ১৩২৭ সালে রাণী ইসাবেলা চক্রান্ত করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত, বন্দী ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায়।

ঐতিহাসিকতা: মার্লো তাঁর নাটকে ঐতিহাসিক সত্যতা বজায় রাখতে চাননি। রাজকীয় আভিজাত্য না থাকুক এডওয়ার্ড ভীরু ছিলেন না। কিন্তু মার্লো তাঁর দুর্বলতা ও অসহায়তার কথাই বেশী করে তুলে ধরেছেন। দুর্বল মানুষের উপর নির্যাতন আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে 'ট্র্যাজিক' (Tragic) চরিত্র সৃষ্টি হয় না। আসলে নাটকের প্রকৃতি মার্লো ততটা বজায় রাখতে চাননি, যতটা তিনি কাব্যের উপর জোর দিয়েছেন। রাণী ইসাবেলা এবং 'ছোট' মার্টিমার এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যারণরাও যেন 'অপদার্থ' এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধতা করেছে। নাট্যকার এইভাবে তাঁর প্লট সাজিয়েছেন। কিন্তু আসলে ব্যারণরা বংশানুক্রমিকভাবে এবং যে কোন অবস্থাতেই যুদ্ধপ্রিয়। এডওয়ার্ডের দুর্বলতা তাদের বিদ্রোহের একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। এইভাবে নাটকের প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে অন্যভাবে দেখান হয়েছে।

রাজার অনুগৃহীত 'গ্যাভেস্টন' (Gaveston) আদৌ গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিল না। কিন্তু নাটকে তাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নাটকীয় কারণে নাটকে গ্যাভেস্টনের মৃত্যুর সময় পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং মৃত্যুর কারণও অন্যভাবে দেখান হয়েছে।

বড় মর্টিমার ও ছোট মার্টিমারকে নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই হাজির করা হয়েছে। কিন্তু আসলে রাজসভার চক্রান্ত এবং নানা ঘটনার মাঝখানে তারা এসেছিল অনেক পরে।

নাটকটিতে যে ইতিহাস আছে: ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করা হলেও নাটকটিতে নানা ব্যতিক্রম আছে। এটা নাটকটির সামগ্রিক সংগঠন, পরিসমাপ্তির বিশ্বাসযোগ্যতা, এবং পূর্বাপর দর্শনীয়তা বজায় রাখবার জন্যই করতে হয়েছে। নীরস ইতিহাসের প্রত্যাশা নিয়ে নাটকটিকে দেখতে গেলে হয়ত হতাশ হতে হবে।

কৌশলগত দিক থেকে (Technical aspect) নাটকটিকে অনবদ্যভাবে সাজান হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার কারণে মার্লোকে নাটক সাজানর জন্য যথেষ্ট কারুকুশলতা প্রয়োগ করতে হয়েছে।

নাটকটিকে ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি থেকে যে ভাবে বা যে দিকেই সরিয়ে বসান হোক না কেন, চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের ইংল্যাণ্ডের অমার্জিত রাজনৈতিক পরিবেশকে এখানে যথার্থভাবে রূপদান করা হয়েছে। শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মত ইংল্যাণ্ডের সম্মান বজায় রাখার আকুতি হয়ত এখানে নেই, কিন্তু এখানেও তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডকে যেন নাটকের 'নায়কের' (Protagonist) ভূমিকায় রাখা হয়েছে।

নাটকটির গঠন

এই নাটকটির সাফল্য তার কবিতা এবং ভাষার উপর কতটা নির্ভর করেছিল, আর কতটা সুসংগঠিত একক বিশিষ্ট শিল্পরূপের উপর নির্ভর করেছিল সেকথা বলতে গেলে দুটির উপর সমান জোরই দিতে হয়।

এটা স্পষ্ট যে কতকগুলি ঘটনাকে কোনরকমে জোড়া দিয়ে নাটকটি তৈরী হয়নি। চরিত্রগুলি—বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্রই হোক বা কবিকল্পিত চরিত্রই হোক—পরস্পরের সঙ্গে একটা নাটকীয় ঐক্যসূত্রে গাঁথা রয়েছে। নাটকীয় সংঘাত আছে, এবং তা বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাতের ভিতর দিয়ে রূপ পেয়েছে। যে আবেগ মার্লোর নাট্যসৃষ্টিকে সার্থক করেছে, চরিত্রগুলির ভিতরে সে আবেগ তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। তিনি নাটকের গতিশীলতার চেয়ে ঘনসন্নিবদ্ধ ভাবকে যেন বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। এর দ্বারা অবশ্য নাটকের কিছু ক্ষতি হযেছে বলে মনে করা যেতে পারে। তবে মার্লো হয়ত গ্রীক আদর্শের ঘনসন্নিবদ্ধ ভাব ফোটাতে পেরেছেন। তা ছাড়া, প্রধান চরিত্রের (এডওয়ার্ড) ট্র্যাজিক প্রকাণ্ডতা যদি না-ও থাকে, তবু তা দর্শকের করুণা উদ্রেক করতে অবশ্যই পেরেছে।

আমরা এখানে 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' নাটকের চারটি চরিত্রের কথা এবং দুটি দৃশ্যের কথা আলোচনা করবো।

চরিত্র চারটি হচ্ছে রাজা এডওয়ার্ড, রাণী ইসাবেলা, ছোট মর্টিমার এবং গ্যাভেস্টন। আর দৃশ্য দুটি হচ্ছে 'পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য,' যেটিকে সিংহাসনত্যাগের দৃশ্য (Abdication scene) বলা হয়, এবং রাজার মৃত্যুর দৃশ্য অর্থাৎ পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য।

এডওয়ার্ড

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এডওয়ার্ডের চরিত্রে নানা দোষ ত্রুটি ছিল। প্রধান ত্রুটি গাভেস্টনের মত নিম্নশ্রেণীর চাটুকারকে মাথায় তোলা। এডওয়ার্ড শুধু রাজা বলেই ক্ষমতার অধিকারী ; রাজকীয় গুণের দরুণ স্বাভাবিকভাবে শক্তির অধিকারী নন।

এডওয়ার্ড রাজকীয় আভিজাত্যের উপযুক্ত নন। কেন্ট তাঁকে উদ্ধত ব্যারণদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাইলেও তিনি নিরুত্তাপ। তবে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এডওয়ার্ড তাঁর বিক্রম দেখিয়েছেন। আবার, ধর্মসংগঠনের নেতাকেও তিনি সম্মান দেখান না। সেটা হয়ত মার্লোর নিজের চরিত্রেরই প্রতিফলন।

বাস্তব ক্ষমতা কিছুই এডওয়ার্ডের ছিল না। তিনি আদেশ করলেও কেউ তাঁর আদেশ শোনে না বা মানে না। তিনি চিৎকার করতে পারেন কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করে না। ব্যারণরা তাঁকে পরিত্যাগ করল, রাণী নিজে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তিনি রাজপোষাক-পরা, রাজসিংহাসনে-বসা সাধারণ মানুষ; রাজকীয়তা বলে তাঁর ভিতর কিছুই নেই। লোকে তাঁকে মানবেই বা কেন ? রাজার দোষ থাকতে পারে ; কিন্তু সবচেয়ে বড় দোষ

তাঁর দুর্বলতা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। এডওয়ার্ডের দোষ ত্রুটিকে বড় করে দেখানর পিছনে নাট্যকারের হয়ত ম্যাকিয়াভেলির আদর্শ রাজশক্তির সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় ;—এ রকম একটা ধারণা করা যেতে পারে।

আর একটা কথা। অনেক দোষের ভিতরেও এডওয়ার্ডের শিল্পরুচি ছিল। তিনি সঙ্গীত এবং কাব্য ভালবাসতেন।

আবার, শেষদিকে এডওয়ার্ডের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের জন্য মার্লো কি রাজার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছেন ?

রাণী ইসাবেলা

ইসাবেলা অসৎ চরিত্রের মহিলা। তার অসৎ-চরিত্রতার উপযুক্ত কারণ কিন্তু নাট্যকার দেখিয়েছেন। তবে এডওয়ার্ডের ব্যবহার যতই না কেন ইসাবেলাকে হিংস্রতা এবং অসৎ চরিত্রতার দিকে এগিয়ে দিক, এটা ঠিকই যে ওই বীভৎসতা তার নিজের ভিতরেই সুপ্ত ছিল।

ইসাবেলার মধ্যে হিংস্র পাশবিকতা এবং নারীসুলভ দুর্বলতা দুইই ছিল।

ইসাবেলার চরিত্রে ব্যক্তিগত বিষাদ খুব একটা বড় ব্যাপার। তবে এই বিষাদ উপযুক্ত কারণের জন্য যতটা তার চেয়ে বোধ হয় বেশী নিজের কাজের উপযুক্ত সাফাই গাওযার জন্য। তবে সবটাই অন্তর্নিহিত মনোবিকলন। ইসাবেলার চরিত্র নাটকীয় আগ্রহের সৃষ্টি করে।

মর্টিমার (ছোট)

সমালোচকরা অনেকে মর্টিমারকে মার্লোর চরিত্রের অনুরূপ বলেছেন। নিজের শক্তিমত্তায প্রচণ্ড আস্থাশীল মর্টিমার : 'The Prince I rule, the Queen I command ...... the Proudest lords salute me as I pass.....।

মর্টিমারের বাইরের আচার আচরণ কিন্তু প্রথমাবধি একরকম নয়। প্রথমদিকে সে আন্তরিক এবং দিলখোলা। শেষদিকে কূটকৌশলী, বিশ্বাসঘাতক এবং পরস্ত্রীতে আসক্ত।

তার চরিত্রের ক্রমবিবর্তন ম্যাকিয়াভেলির আদর্শের অনুরূপ। প্রথমদিকে মার্টিমার সাহসী, তেজস্বী এবং সৎ। কিন্তু পরে তার পরিবর্তন নাটকীয় স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে।

উচ্চাকাঙ্খা, অনায়াসে ক্ষমতাপরিচালন, এমনকি নিষ্ঠুরতা ও চরিত্রহীনতা যা-ই থাকুক না কেন যে শক্তি মর্টিমার দেখিয়েছে তা প্রশংসা না হোক বিস্ময় দাবী করতে পারে।

গ্যাভেস্টন

এই চরিত্রটির নিজস্ব গুরুত্ব সরাসরি দেখান হয়নি। রাজার সঙ্গে সামন্তদের বিরোধের কারণ হিসাবে তাকে নাট্যকারের প্রয়োজন ছিল।

ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে নাট্যকার এই চরিত্রটিকে সামাজিক দিক থেকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছেন। আসল গ্যাভেস্টন অভিজাত বংশের ছেলে। তা ছাড়া, ছোটবেলায় গ্যাভেস্টন রাজকুমার এডওয়ার্ডের (পরে রাজা দ্বিতীয এডওয়ার্ড) খেলার সঙ্গী ছিলেন। গ্যাভেস্টনকে কর্ণওয়ালের আর্ল হিসাবে সম্মানিত করা হয়েছিল। রাজপরিবাবের সঙ্গে বিবাহসূত্রে কুটুম্ব হিসাবে তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই নাটকে তাকে যেন সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ হিসাবে রাখা হয়েছে। স্বভাবেও যেন খানিকটা ভাঁড় বা বিদূষকের মত দেখান হয়েছে।

আমরা এখানে নাটকটির দুটি দৃশ্যের উপর সামান্য আলোচনা করবো।

প্রথমটি পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য অর্থাৎ রাজার সিংহাসনত্যাগের দৃশ্য।

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে এই দৃশ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক দিক থেকে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিক থেকে রাজা উৎপীড়িত এবং সর্বস্বান্ত। এই দৃশ্য রাজাকে যেন এক নতুন আলোকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। আমরা তাঁর সমস্ত ত্রুটি উপেক্ষা করতে চাই এবং তাঁকে ক্ষমা করতে চাই। রাজা একবার মুকুট খুলে ফেললেন; সময চেয়ে নিলেন; মুকুট আবার পরলেন; রাজকীয় মর্যাদাকে শেষবারের মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। জগতের খুব কম নাটকেই কোন দৃশ্যে এইরকম মর্মস্পর্শী মনস্তাত্ত্বিক আবেদন ফুটিয়ে তোলা গেছে। হযত শেক্সপীয়রের কয়েকটি নাটকীয় চরিত্রে মানুষের আবেগের স্ফূরণ এরই মত শক্তিশালী হতে পেরেছে। শেক্সপীযরের দ্বিতীয় রিচার্ড, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ এবং এ্যান্টনির চরিত্রে এই রকম গভীর আবেগের প্রকাশ আমরা দেখেছি। অনন্যসাধারণ কাব্যের সাক্ষাৎও এই দৃশ্যে আমরা পাই।

.. .. My nobles rule, I bear the name of king.
অথবা But if proud Mortiner do wear this crown,
Heavens turn it to a blaze of quenchless fire.

. . . .

কিংবা I'll not resign, but, whilst I live,
Traitors, be gone, and Join you with Mortiner,
বা এইরকম . . . .
Whither you will; all places are alike,
And every earth is fit for burial.

অপর দৃশ্যটি এডওয়ার্ডকে হত্যার দৃশ্য (৫ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্য)

দ্বিতীয় এডওয়ার্ড নাটকের এই দৃশ্যটি বীভৎসতা ও পাশবিকতাব চূড়ান্ত নিদর্শন। জগতের কোন নাটকে কখনও এর থেকে অধিকতর পৈশাচিক মৃত্যুর দৃশ্য দেখান হয়নি। প্রথমে এডওয়ার্ডকে এক হাঁটু ঠাণ্ডা নর্দমার জলে কয়েকদিন ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। সেই নারকীয় যন্ত্রণা সহ্য করেও রাজা বেঁচে রইলেন। এরপর রাজার মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা চললো। ঘাতক লাইটবর্ণ (Lightborn) রাজাকে নিয়ে তামাসা করলো। রাজা সবই বুঝতে পারছেন। অর্ধচেতন, ভয়ঙ্কর ত্রাসে পরিপূর্ণ রাজাকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হল।

এতখানি যন্ত্রণাময় অন্তিম পরিস্থিতির উপযুক্ত নায়ক দ্বিতীয় এডওয়ার্ড নন। তিনি তাঁর রাজকীয় বিক্রম দেখাতে পারেন নি। তাই আমরা এই মৃত্যুর দৃশ্যে প্রকাণ্ড কোন কিছুর ধ্বংসের জন্য আক্ষেপ করতে পারি না, এবং আমাদের সমগ্র চেতনা বিষাদে মগ্ন হয়ে যায় না, যদিও দৃশ্যটির বীভৎসতা আমাদের মর্মান্তিকভাবে আহত করে।

এর পর টমাস ন্যাস (Thomas Nash ১৫৬৭-১৬০১)। তিনি মুখোস পরে অভিনয় করবার জন্য একটি নাটক লিখেছিলেন, এবং মার্লোর অসমাপ্ত নাটক 'কার্থেজের রাণী ডিডো' সম্পূর্ণ করেছিলেন।

এই তো গেল ইউনিভার্সিটি উইটসদের কথা।

আর এক নাট্যকার জর্জ চ্যাপম্যান (George Chapman ১৫৫৯-১৬৩৪) কবি হিসাবেই বেশী প্রসিদ্ধ। তাঁর নাটকে কথা আর শব্দগুচ্ছের আড়ম্বরে দর্শকরা হয়ত বিভ্রান্ত হতেন।

উইলিয়াম শেক্সপীয়র বা শ্যাগসপীয়র (William Shakespeare or Shake-speare or Shagspere)

১৫৬৪ সালের ২৬শে এপ্রিল আভন (Avon) নদীর তীরে স্ট্রাটফোর্ড (Stratford) শহরে খৃষ্টীযকরণ ও নামকরণ হয়।

১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল সেন্ট জর্জ দিবসে (St. George's Day) মারা যান। স্ট্রাটফোর্ডের গীর্জার পূর্বাংশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কবির পিতার নাম জন শেক্সপীয়র এবং মায়ের নাম মেরী (Mary Arden)। দুই মেয়ের পর তৃতীয় সন্তান উইলিয়াম।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম এ্যান হ্যাথাওয়েকে (Ann Hathaway) বিয়ে করেন। এ্যান সম্ভবতঃ উইলিয়ামের চেয়ে আট বছরের বড ছিলেন।

শেক্সপীয়রের হরিণচুরি-টুরির যে সব গপ্পো শোনা যায় সেগুলির কোন প্রামাণ্য ভিত্তি নেই।

আসলে জীবনীকাররা হয়ত তথ্যের শূণ্যস্থান পূরণ করবার জন্য এগুলি উদ্ভাবন করেছিলেন।

তথ্যানুসন্ধানকারীরা কেউ কেউ বলেছেন তিনি কিছুদিন গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতাও করেছিলেন।

আবার, *শিক্ষাদীক্ষার কথা বলতে গেলে উইলিযম বীস্টন এবং তাঁর বাবা ক্রিস্টোফারের* (Christopher Beeston) কথা তুলতে হয়। শেক্সপীয়র যে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ক্রিস্টোফারও শেক্সপীয়রের আগে সেই দলের হয়ে অভিনয় করেছিলেন। উইলিয়ম বীস্টনের কথা অনুযায়ী শেক্সপীয়র ল্যাটিন মোটামুটি জানতেন, এবং কিছুদিন স্কুলমাষ্টারিও করেছিলেন।

শেক্সপীয়র দেশ ছেড়ে পালিয়ে লণ্ডনে যাননি। থিয়েটারের লাইনেই তাঁর ভবিষ্যৎ আছে এইরকম একটা ধারণা করে নিয়েই গিয়েছিলেন।

ম্যাথু আর্নল্ডের (Matthew Arnold ১৮২২-৮৮) শ্রদ্ধার্ঘ দিয়েই এই মনীষীর কথা শুরু করা যাক।

'........Thou smilest and art still,
Out-topping knowledge! For the loftiest hill
That to the stars uncrowns his majesty,
Planting his steadfast footsteps in the sea,

. . . .

Spares but the cloudy border of the base
To the foiled searching of mortality;

. . . .

. . . .

[মহাসমুদ্রের গভীরে দৃঢ়ভাবে পদযুগল সংস্থাপিত করে উর্ধ্বাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়ায় যে মহামহিম নগাধিরাজ তারই মত তুমি জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমাকে অতিক্রম করেও আমাদের দর্বল অনুসন্ধিৎসাকে বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত কর।]

তখনকার দিনে আইনগত নানা বাধানিষেধ থাকায় নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে কোন না কোন শক্তিশালী রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করতে হত। শেক্সপীয়র যে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেটির নাম ছিল লর্ড চেম্বারলেনের (রাজসংসারের কাজকর্মের তদারককারী বা ম্যানেজার) দল। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি এই সব উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের বাড়ী থেকে তাঁদের ব্যবহার-করা পোশাক-আশাক ইত্যাদিও পেয়ে থিয়েটারের দল অনুগৃহীত হত। এই দলে প্রধান প্রধান অভিনেতা ছিলেন— শেক্সপীয়র (Shakespeare), বারব্যাজ (Burbadge), হেমিঞ্জস (Hemings), ফিলিপস (Phillips), কেম্পট (Kempt), পুপ (Poope), ব্রায়ান (Bryan), কণ্ডেল (Condell), স্লাই (slye), কাউলি (Cowly),লোইন (Lowine), ক্রশ (Crosse), কুক (Cooke), গিলবার্ণ (Gilburne), আর্মিন (Armine),অসলার (Ostler), ফিল্ড (Field), আণ্ডারউড (Underwood), টুলি (Tooley), একলষ্টোন (Ecclestone), টেলর (Taylor), বেনফিল্ড (Benfield), গুঘ (Goughe), রবিনসন (Robinson), স্যাঙ্ক (Shancke) এবং রাইস (Rice)।

শেক্সপীয়র সম্পর্কে পড়াশুনা মোটামুটি তিনভাবে করা হয়।

[এক] গ্রন্থগুলির মূল পাঠনির্ণয় ও সেই সংক্রান্ত বিষয়াদি (Textual study or Textual Scholarship)।

[দুই] গ্রন্থগুলির আলোচনা ও সমাদরের বিভিন্ন দিক (Appreciation and Criticism)।

[তিন] শেক্সপীয়র সংক্রান্ত আলোচনা-সমালোচনার ইতিহাস (History of Shakespearean Criticism)।

প্রথমটির অর্থাৎ মূলপাঠসংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে যাঁরা আলোকপাত করেছেন তাঁদের ভিতর A. W. Pollard, J. Dover Wilson এবং A. Stopford Brooke-এর নাম সকলের আগে করতে হয।

তখনকার দিনে ছাপান বই-এর উপরে সরকার বেশ ভালরকম কর্তৃত্ব জাহির করতেন। এই সূত্রে লেখার জিনিষপত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির বিক্রেতাদের সংস্থা 'দি স্টেশনার্স কোম্পানীর' (The Stationers' Company) কথা আসে। পূর্বতন দুটি কোম্পানী সংঘবদ্ধ হয়ে ১৪৬৪ সালে লণ্ডনে এই সংস্থাটি তৈরী হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মুদ্রাকররা এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতেন। ১৫৫৭ সালের ৪ঠা মে এক রাজকীয় সনদের দ্বারা এই সংস্থাটি বিধিবদ্ধ হয় এবং এই সংস্থাটির মাধ্যমে বই-এর বাজারের উপর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব আসে। এই সংস্থাটির সদস্যরাই শুধু আইনসঙ্গত ভাবে বই ছাপতে পারতেন, এবং প্রতিটি বই-এর মালিককে এই সংস্থাটির খাতায় বই-এর নাম, বিবরণ ইত্যাদি লেখাতে হত। এই খাতাটিই ছিল বিখ্যাত স্টেশনার্স রেজিষ্টার (Stationers' Register)। সাহিত্যের ইতিহাসে এই স্টেশনার্স রেজিষ্টারের গুরুত্ব খুব বেশী। প্রতিটি বই ছাপানর জন্য অনুমতি (Licence) সংগ্রহ করতে হত। ১৫৮৬ সালে এই বিষয়ে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্যাণ্টারবেরির প্রধান ধর্মাধ্যক্ষকে। ১৫৮৮ সালের ৩০শে জুন প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ এই কাজের ভার দিলেন কয়েকজন প্রতিনিধির উপর। ১৫৯৯ সালের এক আদেশবলে নাটক ছাপানর উপর আরও কড়াকড়ি করা হল। ১৬০৭ সালে এই কর্তৃত্ব বর্তাল 'আনন্দ-অনুষ্ঠানের নিয়ামকের' (Master of Revels) উপর। এই সময়ে ওই পদে ছিলেন এডমণ্ড টিলনি (Edmund Tilney)।

নাটক ছাপান এবং অভিনয়ের ব্যাপাবে অনুমতিদানকারীর কাজ ছিল নাটকটি রাজনৈতিক দিক থেকে বিপজ্জনক কি না, দেশের সরকাবের বা বন্ধুভাবাপন্ন কোন দেশের রাজদূতের পক্ষে আপত্তিজনক কোন কিছু তাতে আছে কিনা তা দেখা।

এছাড়া, অপবিত্র কোন শপথ বা ভগবানের নাম ধরে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এমন কোন শব্দ নাটকে আছে কি না তা-ও দেখা হত। এই কারণেই ১৬২৩ সালের 'প্রথম ফোলিওতে' (এর কথা পরে বলা হবে) বহুক্ষেত্রে 'Heaven' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে ওই নাটকটিরই আগে ছাপান কোন সংস্করণে 'God' কথাটি রয়েছে।

এ সব কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে শেক্সপীয়রকে কোন্ অবস্থা মেনে নিয়ে লিখতে হয়েছিল বা তাঁর নাটকের প্রামাণ্য মুদ্রিত সংস্করণ বের করতে গিয়ে কি ধরনের সর্ত মানতে হয়েছিল সে সবের কিছু কিছু এর থেকে জানা যায়।

রাণী এলিজাবেথ মারা যাওয়ার পর স্টুয়ার্ট রাজা (১ম) জেমসের আমলেও শেক্সপীয়র আরও দশ বছর লেখালেখি করেছিলেন। জেমস স্কটল্যাণ্ডের লোক, এবং তাঁর অনেক কুসংস্কার ছিল। এ দুটো কথাও শেক্সপীয়রকে মাথায় রাখতে হয়েছিল।

এছাড়া, তাঁর নাট্য সংস্থার বিভিন্ন অভিনেতার নানা ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথাও

চিন্তা করতে হয়েছিল। যেমন, শেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বারব্যাজ। বারব্যাজের বয়স হয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি মোটা হয়ে পড়ছিলেন। ব্যারব্যাজের সেই শারীরিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই করে নাটকের কিছু কিছু উক্তি ও অবস্থাকে কাজ চালানোর উপযুক্ত করে দিতে হয়েছিল।

যাই হোক, আবার স্টেশনার্স কোম্পানীর কথায় আসি। সারা ইংল্যাণ্ডের সমস্ত বই ছাপানোর ব্যাপারে স্টেশনার্স কোম্পানীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। ছাড দেওয়া হয়েছিল ১৫৮৩ সাল থেকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা এবং ১৫৮৫ সাল থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানাকে।

লণ্ডনের এই কোম্পানীকে অন্য কারুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়নি। অবশ্য যাঁর নামে বইটি নথিভুক্ত করা হত কোম্পানী তাকে সম্মান দেখাত। এই কোম্পানীতে প্রতিটি বই নথিভুক্ত করবার ফিজ প্রথমে ছিল চার পেন্স, পরে হযেছিল ছয পেন্স। যাদের নাম কোম্পানীতে নথিভুক্ত থাকত না তাদের বই-এর ব্যাপারে কোন নিরাপত্তার দায়িত্বও কোম্পানীর ছিল না। অবশ্য, পৃষ্ঠপোষক রাজপুরুষ এই সব বই-এর স্বাভাবিক রক্ষক হতেন। তবে এরকম স্বার্থরক্ষাব দরকার কখনো হয়েছিল বলে জানা নেই।

তখনকার কালে ষোলপাতার ফর্মার আকারে বই ছাপা হত না। পাতা একবার ভাঁজ করে একরকমের ছাপা হত,—তাকে বলা হত ফোলিও (Folio)। Fold (ভাঁজ করা) শব্দ থেকে ফোলিও শব্দটি এসেছিল। দুবার ভাঁজ করলে তাকে বলা হত কোয়ার্টো (Quarto)। শেক্সপীযরের নাটক ফোলিও আকারে এবং কোয়ার্টো আকারে দুভাবেই ছাপা হযেছিল। মূল বই-এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে এগুলিও জানা দরকার ছিল।

শেক্সপীয়র ১৬১৬ সালে মারা যান। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে বা মারা যাওয়ার অব্যবহিত পবে কোয়ার্টো আকারে তাঁর বই ছাপা হয়েছিল। এই সব কোয়ার্টো সংস্করণের কোন কোনটি সৎভাবে ছাপা হয়েছিল। আবার কোন কোনটি গ্রন্থকারের বিনা অনুমতিতে চুরি করে ছাপা হয়েছিল। প্রথমগুলির নাম Good Quarto; দ্বিতীয়গুলির নাম Bad Quarto। এই Bad Quarto গুলি তৈরী হয়েছিল নানা ভাবে। সংশোধিত পাণ্ডুলিপি একটিই থাকত, এবং তা থাকত অভিনেতার সাহায্যকারীর (Prompter) হেপাজতে। কোন অভিনেতা দল ছেড়ে গেলে, কোন নাটকে তার নিজের অংশটুকু অন্য দলকে দিয়ে দিতে পারত। সেই অংশটুকুই প্রামাণ্য হত; বাকিটুকু হত না। তাছাড়া, প্রতিযোগীদল অনেক সময় দর্শক হিসাবে নিজের লোক পাঠাত। তারা এখনকার সর্টহ্যাণ্ডের মত কিছু কিছু লিখে নিয়ে আসত। সেটুকুকে কাজে লাগান হত। এই সব চুরিচামারি যারা করত তাদের বলা হত 'পাইরেট' (Pirate)। এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ শ্রীযুক্ত পোলার্ডের (A. W. Pollard) Shakespeare's fight with the Pirates।

এ ছাড়া, পরবর্তীকালে, ১৬৬৫ সালে প্লেগ এবং ১৬৬৬ সালে ভযাবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছিল বা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বই-এর পাণ্ডুলিপি বা মূল ছাপান কপি অনেক ক্ষেত্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সুতরাং শেক্সপীয়রের নানা লেখার প্রামাণিকতা নির্ধারণ পরে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৬১৬ সালে শেক্সপীয়র মারা যান। সাত বছর বাদে ১৬২৩ সালে তাঁর বন্ধু এবং

সহকর্মী হেমিঞ্জ এবং কণ্ডেল তাঁর নাটকগুলির ফোলিও সংস্করণ প্রকাশ করেন। এইটিই বিখ্যাত প্রথম ফেলিও (F_1)। এটিকেই প্রাথমিকভাবে প্রামাণ্য (Canon) ধরে নানা বাছবিচার করা হয়। যে সব সংস্করণের প্রামাণিকতা নির্ধারণ করা যায়নি সেগুলিকে একত্রে অপ্রামাণিক বা এ্যাপোক্রাইফা (Apocrypha) বলে। প্রথম ফেলিও প্রকাশের আগে অন্যদের দিয়ে ছাপান কোয়ার্টো সংস্করণগুলিকে হেমিঞ্জ এবং কণ্ডেল বলেছিলেন 'পঙ্গু, কাটাছেঁড়া এবং চোরাই' (Maimed, mangled and surreptitious)। তবে তাঁদের দাবী সর্বাংশে যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

১৬৮৭ সালে র‍্যাভেন স্ক্রফট (Raven Scroft) বলে একজন ভদ্রলোক 'টাইটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাসক্ষ' (Titus Andronicus) বলে একটি নাটক কোথা থেকে খুঁজে বার করলেন। ওই নামে শেক্সপীয়রেরও নাটক রয়েছে। তবে র‍্যাভেন স্ক্রফটের নাটকটি খুবই অপরিণত। তিনি দাবী করলেন যে অন্যের লেখা নাটক শেক্সপীয়ারের কাছে নিয়ে আসা হত। তিনি প্রয়োজনমত সংশোধন ও সংস্কার করে দিতেন।

এই হল প্রথম ফোলিওতে (F_1) প্রকাশিত নাটকগুলির সর্বাংশে প্রামাণিকতার ব্যাপারে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ। সন্দেহবাদীদের বলা হয়েছিল বিভাজনকারী বা Disintegrators। সেই থেকেই শেক্সপীয়রের প্রাপ্ত নাটকগুলির মৌলিকতা এবং বিশুদ্ধতা নিয়ে নানা খোঁজ খবর, বিচার-বিবেচনা শুরু হয়।

প্রমাণিকতা বিচারের জন্য সঠিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন ফ্লি (Fleay) বলে এক ভদ্রলোক ১৮৮৬ সালে। এই পরীক্ষার নানা খুঁটিনাটি দিক আছে। সেগুলি আর এখানে আলোচনা করা হল না।

হেমিঞ্জ এবং কনডেলের দ্বারা ১৬২৩ সালে প্রকাশিত প্রথম ফেলিও সংস্করণে, যাকে প্রামাণ্য সংস্করণ (Canon) বলে ধরা হয়েছিল তাতে ৩৬টি নাটক আছে। এই সংস্করণে 'ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডা' সবশেষে যুক্ত হয়। 'পেরিক্লেস' এই সংস্করণে রাখা হয়নি। ক্যাননভুক্ত ৩৬টি এবং 'পেরিক্লেস'-কে নিয়ে মোট ৩৭টি নাটক।

১৮টি নাটক প্রথম ফোলিওতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। বাকি নাটকগুলির ভিতর ৯টির প্রমাণিক (Good) কোয়ার্টো সংস্করণ, ২টির প্রামাণিক (Good) ও অপ্রামাণিক (Bad) কোয়ার্টো সংস্করণ, ৪টির অপ্রামাণিক (Bad) কোয়ার্টো সংস্করণ, ২টির পুরাপুরি সন্দেহভাজন (Doubtful) কোয়ার্টো সংস্করণ আগেই অন্যদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়াও প্রথম ফোলিওতে (Canon) যুক্ত হয়েছিল 'ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডা'। এই মোট ৩৬টি। এর সঙ্গে 'পেরিক্লেস'কে নিয়ে মোট ৩৭টি নাটক।

শ্রীযুক্ত এ. ডব্লু. পোলার্ড (A. W. Pollard) অবশ্য একটু অন্যভাবে এগুলিকে ভাগ করেছেন।

শেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা ও সমাদর করার সুযোগ সুবিধা নানা কারণে বর্তমান গ্রন্থে নেই। এজন্য আমি দুঃখিত।

সমালোচকরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও উপস্থাপনের ধরন এবং সেই সঙ্গে নাট্যকারের বয়স ও অভিজ্ঞতার ক্রমপরিণতি অনুযায়ী শেক্সপীয়রের নাটকগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।

প্রথমদিককার কমেডি—বুদ্ধি ও উপযুক্ত শব্দসংযোগ সত্ত্বেও পরিণত লক্ষণের অভাব। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রহসনধর্মী। এ নাটকগুলি হচ্ছে 'ভূলের মজা' (The Comedy of Errors), 'বদমেজাজী স্ত্রীলোককে বশে আনা' (The Taming of the Shrew),

'শুধু শুধুই নিঃস্বার্থ পরিশ্রম' (Love's Labour's Lost), এবং 'ভেরোনার দুজন ভদ্রলোক' (The Two Gentlemen of Verona)।

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে তারুণ্যের আবেগমিশ্রিত ট্র্যাজেডি 'রেমিও ও জুলিয়েট' (Romeo and Juliet) এবং হালকা আনন্দের পরিবেশে একটি রূপকথার মত নাটক 'একটি মধ্যগ্রীষ্মকালীন রাত্রির স্বপ্ন' (A Midsummer Night's dream)।

এগুলি তাঁর ৩০/৩১ বছর বয়সের রচনা।

'তার মুখে সূর্যের কাঁচা সোনা,
মনে তার নতুন অরণ্যের স্বাদ
তাই সবি ভাল লাগে।'
.... —[সমর সেন]

এই সঙ্গেই চলেছিল পুরাপুরি সেনেকান (Senecan) মডেলে রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডি 'টাইটাস এণ্ড্রোনিকাস' (Titus Andronicus) এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের ভিত্তিতে নাটক—'ষষ্ঠ হেনরী' (১ম, ২য় ও ৩য়) (Henry VI 1, 2, 3), 'তৃতীয় রিচার্ড' (Richard III) এবং 'রাজা জন' (King John)। এগুলিতে বিশিষ্ট এবং সাধারণ, উভয়স্তরের মানুষকেই রাখা হয়েছে। এর ঠিক পরে পরেই রয়েছে দ্বিতীয় রিচার্ড (Richard II)—ইতিহাসের সঙ্গে পরিণত মনস্তত্ত্বের সুন্দর সংমিশ্রণ। একই গুণান্বিত, সাবলীল ও উচ্চাকাঙ্খী নাটক 'চতুর্থ হেনরী' (১ম ও ২য়) (Henry IV 1 and 2) এবং ৫ম হেনরী (Henry V)। ইংল্যাণ্ডের বাস্তব ইতিহাসের নাটকীয় অভিব্যক্তি এইগুলি। ১৬১৩ সালে লেখা অষ্টম হেনরীও (Henry VIII) এই জাতীয় নাটক।

আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসভিত্তিক এই সব নাটকের প্রধান চরিত্র (Protagonist) যেন ইংল্যাণ্ড নিজেই। কালের রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি যেন এগুলিতে শোনা যায়। মহাকাল মহাকবির লেখনীতে স্বেচ্ছায় ধরা দেন।

এর পর আছে পরিণত কমেডিগুলিঃ কবি তখন বয়সে যুবক; ত্রিশের উপরে; চল্লিশের নিচে। প্রাণ সম্পদে ভরপুর, দক্ষতায় অনায়াস। জটিল, পরিণত বুদ্ধিযুক্ত কৌতুকবোধ, আমুদে মেজাজ এবং ভাঁড়ামো সবই এই শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে। নাটকগুলিঃ 'ভেনিসের বণিক' (The Merchant of Venice), 'অকারণ ব্যস্ততা' (Much Ado About Nothing), 'উইণ্ডসরের আমুদে বনিতাগণ' (The Merry Wives of Windsor), 'যে ভাবে চাও সে ভাবে' (As you like It), এবং 'দ্বাদশ রজনী' (Twelfth Night)।

'কুন্তলে তব শরৎ সাঁঝের ঋদ্ধি ;
পাকাদ্রাক্ষার মদির কান্তি অঙ্গে ;
উরসে তোমার মরসাধনার সিদ্ধি ;
ধরা রূপবতী, সে তোমারই অনুসঙ্গে।

—[সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

এর পরে গম্ভীর বিষন্ন শ্রেণীর নাটক।—এগুলিকে সমস্যামূলক (Problem) কমেডি বা অন্ধকার (Dark) কমেডিও বলে। এগুলিতে যেন রোম্যান্সের অন্তঃসারশূণ্যতা এবং মানুষের মনের অধোগামী প্রবৃত্তি দেখান হয়েছে। এই শ্রেণীতে আছে 'ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা' (Troilus and Cressida), 'সব ভাল তার শেষ ভাল যার' (All's Well that Ends Well) এবং 'সমুচিত প্রতিবিধান' (Measure of Measure)।

'গোধূলি প্রান্তরে লেখা কঠিন জিজ্ঞাসা :
শেষদিনে কোনখানে তোমাদের বাসা ?
তরল যৌবন ফিকে হযে আসে,
বিগত কৌতুক বিদূষক
কথার ঝলকে সভাভঙ্গ করে না গভীর রাত্রে।

—[সমর সেন]

তারপর শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডিগুলি। আবেগের ঘনত্ব, মনস্তাত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং ষ্টাইলের চরম উন্নতি এই ট্র্যাজেডিগুলির বিশেষত্ব। এই পর্যায়ে আছে 'হ্যামলেট' (Hamlet), 'ওথেলো' (Othello), 'ম্যাকবেথ' (Macbeth) এবং 'রাজা লিযার' (King Lear)।

'ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে
তেমনি করে তোমায় আমি জানি
দুরন্ত নদীর ধারা যেমন ক'রে দেখে
আকাশের তারা
—সেই আমার দেখা।

—[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

এর পরের পর্যায়ে রোম্যান নাটকগুলি। সাতবছ্ব আগের লেখা 'জুলিয়াস সিজারের (Julius Caesar) সঙ্গে এখানে আমরা একসঙ্গে দেখি ১৬০৬ সালে লেখা 'এ্যাণ্টনি ও ক্লিওপ্যাট্রা' (Antony and Cleopatra) এবং 'করিওলেনাস'কে (Coriolanus)।

একই ধারায় তারপর লিখলেন প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস অবলম্বনে নাটক 'এথেন্সের টাইমন' (Timon of Athens) এবং 'পেরিক্লেশ' (Pericles)।

১৬১০ সালে কবি লণ্ডন থেকে স্ট্রাটফোর্ডে ফিরে গেলেন। এই সময়ের কিছু আগে পরে লিখলেন 'সিম্বেলিন' (Cymbline), 'শীতের গল্প' (The Winter's Tale) এবং 'ঝড়' (The Tempest)। পরিণত বয়সের ক্ষমা ও পুণর্মিলনের কোমল সস্নিগ্ধ দৃষ্টি এ' নাটকগুলির সর্বাঙ্গে লিপ্ত রযেছে।

এর পর কবি হয়ত বিশ্রাম চাইলেন।

'কাননে প্রাসাদ চূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি'—

এরপর ১৬১৬ সালে রণক্লান্ত সৈনিকের মত কবি অনন্তধামে যাত্রা করলেন।

পাঠকপাঠিকাদের কাছে শেক্সপীয়রের কথা বলার আমার এই অক্ষম প্রচেষ্টার জন্য আমি লজ্জিত। তাঁরা যেন নিজগুণে আমায় ক্ষমা করেন।

এরপর আর যা বলব তা যুগে যুগে শেক্সপীয়র পাঠ ও সমালোচনার অতি সংক্ষিপ্ত এক ইতিহাস।

শেক্সপীয়র সংক্রান্ত আলোচনা-সমালোচনার ইতিহাস

শেক্সপীয়র বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁর লেখার পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সমালোচক সম্ভবতঃ গ্রীণ (রবার্ট গ্রীণ Robert Greene ১৫৫৮-৯২)। তিনি কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মানুষ। মারা যান ১৫৯২ সালে। শেক্সপীয়রের বয়স তখন আঠাশ। ইতিমধ্যেই তাঁর ক্ষমতা অনেকের কাছেই স্বীকৃত। মৃত্যুর ঠিক আগে গ্রীণ তাঁর 'কানাকড়ি বুদ্ধি' (Groatsworth of Wit) নামে একখানি পুস্তিকাতে শেক্সপীয়রের অতি রূঢ় সমালোচনা করলেন। শেক্সপীয়রকে বললেন 'ভুঁইফোঁড় কাক' (upstart crow)। সেই থেকে আজ চারশ' বছর ধরে শেক্সপীয়রকে কেন্দ্র করে যত লেখা হয়েছে, বোধ হয় একমাত্র বাইবেল ছাড়া আর কোন জিনিষ নিয়ে মানুষ তত লেখা লেখেনি। গ্রীণ তাঁর সতীর্থদের সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে নতুন এই লেখকটি তাঁদের লেখা আত্মসাৎ করছেন। কথাটা ঠিক বলে কেউ মনে করেন না। কিন্তু দুটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শেক্সপীয়র যে অদূর ভবিষ্যতে অতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক হবেন তা গ্রীণ বুঝতে পেরেছিলেন। আর সমসাময়িক কালের লেখাগুলি শেক্সপীয়র যত্ন করেই পড়েছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে চারশ' বছর ধরে অন্যেরা তাঁর সম্বন্ধে কি বলেছেন না বলেছেন তাই পড়ে আমরা শেক্সপীয়র সম্বন্ধে জানতে যাব কেন? এই প্রশ্ন এলিয়ট (টি. এস. এলিয়ট-T. S. Eliot ১৮৮৮-১৯৬৫) নিজেই তুলেছেন, নিজেই তার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শেক্সপীয়রের মত বড় কবির কথা যখন ওঠে, তখন আমরা অন্যান্য জ্ঞানীগুণী মানুষদের সাহায্য ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি না। এলিয়ট আরও বলেছেন,— দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে যে সব দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন তা গত তিনশ বছরের ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নতি ও পরিবর্তনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

শেক্সপীয়রের অন্যতম সমসাময়িক বেন জনসন (Ben Jonson ১৫৭৩-১৬৩৭) শেক্সপীয়রের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। এই অতি বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার (বেন জনসন)

শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন তাতে তাঁর গুণগ্রাহী মহত্ত্ব ও শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মিলটন তাঁর বিখ্যাত 'প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত' (L'Allegro) কবিতায় শেক্সপীয়রকে 'বনের পাখী' (native wood-notes wild) বলেছেন।

এই শতাব্দীরই শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ড্রাইডেন (John Dryden ১৬৩১-১৭০০) আন্তরিকভাবে শেক্সপীয়রের কবি প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। তবে ড্রাইডেন শেক্সপীয়রের নাটকের প্লট সম্পর্কে প্রশংসা করেননি। শেক্সপীয়র যেখানে রোম্যাণ্টিক, ড্রাইডেন সেখানে ক্লাসিক আদর্শের অনুরাগী। ড্রাইডেন কোন কোন ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের নিকৃষ্টতা এবং যথোপযুক্ত সমাপ্তির অভাব দেখেছেন। তিনি নাটকে কাব্যের ব্যবহারেরও ত্রুটি দেখিয়েছেন।

এরপর ধারাবাহিকভাবে রোয়ে (নিকোলাস রোয়ে Nicholas Rowe ১৬৭৪-১৭১৮), পোপ (আলেকজাণ্ডার পোপ Alexander Pope ১৬৮৮-১৭৪৪) ও জনসন (ডঃ স্যামুয়েল জনসন Dr. Samuel Johnson ১৭০৯-৮৪) শেক্সপীয়র সম্পর্কে অতি মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। ১৭৩৪ সালে লুই থিওবাল্ড (Lewis Theobald) শেক্সপীয়রের যে প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন তা যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেক্সপীয়র-সমালোচকদের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডঃ জনসন। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে শেক্সপীযরের রুচি ও নৈতিকবোধের সমালোচনা করেছেন। তিনি উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন এই সব দোষ একই যুগের মার্লো বা বেন জনসনের নেই। যুগ বর্বর হতে পারে ; সাহিত্যিক বা শিল্পী বর্বর হবেন কেন?

জনসনের সমালোচনা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব এবং সম্পূর্ণ নতুন কথা। ম্যাথু আর্ণল্ড (Matthew Arnold ১৮২২-৮৮) অষ্টাদশ শতাব্দীকে গদ্য এবং যুক্তির যুগ বলেছেন। ভাবালুতা সেখানে অচল। ওই লক্ষণাক্রান্ত যুগের মানুষ হওয়ায় ডঃ জনসনের সমালোচনা অনেক বেশী স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। বস্তুবাদের দ্রুত প্রসার অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পালটে দিচ্ছিল। ওই যুগের মানুষেরা শেক্সপীয়র সম্পর্কে যুক্তিহীন ভক্তিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তাঁরা মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদির বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে শেক্সপীয়রের বিচার করলেন। শেক্সপীয়র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না ; আরও কিছু ছিলেন। সুতরাং শেক্সপীয়রের বিচারের নতুন মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে। ক্লাসিক নিয়মাবলী সেখানে অচল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শেক্সপীয়রের সম্বন্ধে রোম্যাণ্টিক মতামতগুলি শেক্সপীয়র-সমালোচনার আর একটি জানালা খুলে দিয়েছিল। ওই সমালোচনার প্রধান লক্ষণগুলি ছিল আবেগ, কল্পনা এবং সৌন্দর্যবোধ। রোম্যাণ্টিক ছিলেন অন্তর্দর্শী।

তার ফলে চরিত্রই হল আলোচনার প্রধান বিষয় ; নাটকের ঘটনা (Action) নয়। রোম্যাণ্টিক যুগে হ্যামলেটের অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণ এইটাই—যদিও হ্যামলেটে প্রয়োজনীয় ঘটনা কিছু কম নয়। ল্যাম্ব তো (Charles Lamb ১৭৭৫-১৮৩৪) 'রাজা লিয়রের' অভিনয় হওয়া উচিৎ নয় বলেই বলেছিলেন।

রোম্যান্টিক সমালোচনায় চরিত্রগুলিকেই প্রাধান্য দিয়ে বিচার করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিচার ক্লাসিক যুক্তির বিপরীত। অংশ কখনও সমগ্রের থেকে বড় হতে পারে না। নাটকের চরিত্র যত বড়ই হোক তা নাটকেরই অংশ। সুতরাং নাটকের সামগ্রিক বিচারই যথার্থ বিচার। রোম্যান্টিক সমালোচকরা এ দিকটা দেখেননি।

রোম্যান্টিক সমালোচকরা প্রধানতঃ 'মন্ময়' বা সাবজেকটিভ (Subjective) চিন্তার মানুষ। তাঁরা ইমপ্রেসনিষ্ট (Impressionist) অর্থাৎ 'প্রভাববাদী'। তাঁরা বিষয়বস্তুকে যেভাবে দেখা যায় সেইভাবে গ্রহণ করার পক্ষে। তাঁরা বাস্তব শেক্সপীয়রকে বাদ দিয়ে যে যার নিজের নিজের মত শেক্সপীয়রকে বিচার করেছেন। সে যুগে এই আত্মগত বিচারের প্রধান উদ্গাতা ছিলেন কোলরিজ (স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ Samuel Taylor Coleridge ১৭৭২-১৮৩৪)। এই আত্মগত বিচার বিপজ্জনক। ডি কুইন্সি (টমাস ডি কুইন্সি-Thomas De Quincey ১৭৮৫-১৮৫৯) ম্যাকবেথের 'পোর্টার সিনের' (Porter Scene) এর আলোচনার ব্যাপারে কোলরিজের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। এঁরা সমালোচনার চেয়ে সৃজনশীলতার পরিচয় বেশী দিয়েছেন।

কোলরিজ আরও বলেছিলেন প্রতিটি শিল্পকর্মকে তার নিজস্ব 'জৈবিক' (Organic—অরগ্যানিক) নিয়মে বিচার করতে হবে।

ল্যাম্ব বলেছেন,—শেক্সপীয়রের নাটক বিভিন্ন চরিত্রের মানসিকতা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহী করে। চরিত্রগুলির কাজ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যার ফলে অভিনীত নাটক শেক্সপীয়রকে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করে না। কিন্তু নাটকগুলি পড়লে আমরা বিভিন্ন চরিত্রের মনের গঠন ও প্রবণতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাই। অভিনয় আমাদের সে আনন্দ দিতে পারে না।

হ্যাজলিটও (উইলিয়ম হ্যাজলিট—William Hazlitt ১৭৭৮-১৮৩০) ওই একই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন হ্যামলেটের বর্বরতা তার যুগের বর্বরতা; কিন্তু তার প্রতিভা তার নিজস্ব। কাজেই অভিনয় দেখা থেকে নাটক পড়া বেশী দরকার এইজন্য যে চরিত্রগুলির মানসিকতা অভিনয়ের দ্বারা পুরোপুরি ব্যক্ত হয় না।

পাঠগৃহ থেকে মঞ্চে আবার শেক্সপীয়রকে মুক্তি দেওয়ার প্রধান কৃতিত্ব বিংশ শতাব্দীর গ্রেণভিল-বার্কারের (হার্লি গ্রেণভিল-বার্কার Harley Granville Barker ১৮৭৭-১৯৪৬)।

শেক্সপীয়রের আধুনিক সমালোচনা—রোম্যান্টিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্লেষণীগুণ আধুনিক যুগে শেক্সপীয়র আলোচনার বিশেষ লক্ষণ।

শেক্সপীয়রের মনকে অনুধাবনের চেষ্টা আধুনিক যুগের অন্যতম বিশেষত্ব। এ বিষয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ ডাউডেনের (এডওয়ার্ড ডাইডেন-Edward Dowden ১৮৪৩-১৯১৩) ১৮৭৫ সালে লিখিত—'শেক্সপীয়র—তাঁহার মন ও শিল্প' (Shakespeare—His mind and Art)।

বার্ণাড শ (George Bernard Shaw ১৮৫৬-১৯৫০) যুক্তি-বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে শেক্সপীয়র-পূজার বিরোধী।

শিল্পী একটি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শুধু যে শিল্পকে প্রকাশ করেন তা-ই নয়, নিজেকেও

প্রকাশ করেন। সুতরাং মাধ্যম—যা এখানে অভিনীত নাটক—তার বিভিন্ন লক্ষণই শেক্সপীয়রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে পারে।

আবার ই. ই. স্টল—ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে শিল্পবিচার করেছেন। নাটকের ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে ও উৎপাদিত ফল হিসাবে শেক্সপীয়রের নাটককেও বিচার করতে হবে।

ইমেজারি (Imagery) বা চিত্রকল্পের ভূমিকা শেক্সপীয়রের নাটক বোঝার পক্ষে খুব বেশী দরকারী। অবশ্য, সাবধান হতে হবে নাটককে শুধু কাব্য হিসাবেই যেন দেখা না হয়।

প্রতীক বা সিম্বল (Symbol)-এর কথাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে নাটকের পূর্ণ প্রভাব পড়ে বিভিন্ন প্রতীকের অর্থভেদের ভিতর দিয়ে। উইলিসন নাইট (Wilson Knight) শেক্সপীয়রের নাটকের আলোচনা করেছেন এই দিক থেকে। ইনি শেক্সপীয়রের আধুনিক সমালোচকদের ভিতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জে. এম. রবার্টসন (J. M. Robertson) শেক্সপীয়রের নির্ভেজাল মূল লেখার গুরুত্বের কথা বলেছেন। নানা লোকের হাত দিয়ে যে সব পরিবর্তন এসেছিল সেগুলিকে সংশোধন করে (emendation) মূল লেখাতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

কোলরিজের নীতির অনুবর্তী এ. সি. ব্রাডলি (A. C. Bradley) ১৯০৪ সালে 'শেক্সপীয়ারীয় ট্র্যাজেডি' (Shakespearean Tragedy) লিখেছিলেন। তাতে নাটকের চরিত্রগু'লি আমাদের মনে জীবন্ত মানুষের রূপ নিয়েছিল।

শ্রীযুক্ত জি. বি. হ্যারিসন (G. B. Harrison) ১৯৩৯ সালে শেক্সপীয়র-পাঠের নানা দিক সংক্ষেপে কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বোঝার সুবিধা করে দিলেন তাঁর 'শেক্সপীয়রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে' (Introducing Shakespeare) বইখানির মাধ্যমে। সুখপাঠ্য এবং জ্ঞানগর্ভ এই ছোট বইটি আমাদের খুবই উপকার করেছে।

আমরা এখানে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে যাঁরা খুব সুন্দর লেখা লিখেছেন এবং লিখছেন তাঁদের প্রায় কারুর কথাই কিছু বলতে পারলাম না। এটা আমাদের খুব আক্ষেপের বিষয়। গুণী পাঠকমণ্ডলী আমার অসুবিধার কথা অবশ্যই বুঝতে পারবেন।

যাই হোক, এই ভাবে যত দিন যাচ্ছে তত বেশী বেশী করে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণী, রাশিয়া ও ভারতবর্ষে শেক্সপীয়রের আলোচনা হয়ে চলেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই কলকাতাতেই শেক্সপীয়র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন।

আর দুঃখের কথা একটাই এবং সেটা খুব বিপজ্জনক কথা। শোনা যাচ্ছে নাকি আমেরিকা মহাদেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেক্সপীয়র পাঠ তুলে দেওয়া হচ্ছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আশা করি ভারতবর্ষে তেমন দুর্দিন কখনো আসবে না।

এবারে, এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে শেক্সপীয়রের একটি কমেডি ('দ্বাদশ রজনী') এবং একটি ট্র্যাজেডি (ম্যাকবেথ) সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে চাই। 'কমেডি' ও 'ট্র্যাজেডি' সম্পর্কে কিছু সাধারণ আলোচনা আমরা গ্রন্থটির প্রথম ভাগের ১৪০-৪৪ পাতায় করেছি।

এই দ্বিতীয় ভাগেরও উপযুক্ত স্থানে ট্র্যাজেডি এবং কমেডির সম্পর্কে আলোচনা কিছুটা করা আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 'দ্বাদশ রজনী' ও 'ম্যাকবেথের' কথা বলছি।

'দ্বাদশ রজনী' অথবা অন্য যে কোন নাম
(Twelfth Night or What You Will)

'দ্বাদশ রজনী' শেক্সপীয়রের সুপরিণত কমেডিগুলির একটি। ১৬০১ সালে বা তার কিছু আগে এটি লেখা হয়। শেক্সপীয়র তখন যৌবন চাঞ্চল্যের সর্বোন্নত ধাপে। বিচক্ষণতা এবং কৌতুক দুয়েরই এখানে সমান অস্তিত্ব।

নাটকটির অন্য একটি নামও রয়েছে। —'What you Will'। এই নাম দিয়ে যেন বলা হচ্ছে, ইচ্ছামত যে কোন নাম দেওয়া চলতে পারে।

'দ্বাদশ রজনী' নামটিরও একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।—এটি দ্বাদশ রজনীতে অভিনীত হওয়ার জন্য। এই দ্বাদশ রজনী সম্ভবতঃ বডদিনের উৎসবের দিন থেকে গুণে ৫ই বা ৬ই জানুয়ারি, যেদিন এটি অভিনীত হওয়ার কথা।

'দ্বাদশ রজনী' বা 'যে কোন নাম'—কোনটি যে প্রাথমিক নাম কোনটি যে পরে যোগ করা হয়েছে তা নিয়েও মতভেদ আছে। এমনকি পরে এটির আর একটি নামও দেওয়া হয়েছিল : 'ম্যালভোলিও' (Malvolio)।

তখনকার দিনে পুরুষ অভিনেতারা মহিলা-চরিত্রে অভিনয় করত। অনেক ক্ষেত্রেই ওই মহিলা-চরিত্রকে নাটকের খাতিরে পুরুষের ছদ্মবেশ ধাবণ করতে হত। মহিলাকে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করানর মানে হচ্ছে সেই অভিনেতা তখন নিজের স্বরূপে স্বাভাবিক থাকছে। আর নাটকে যখন মহিলা হিসাবে তাকে স্বাভাবিক দেখান হত তখন সে বিশেষ সাজসজ্জার জন্য অবশ্যই কিছুটা আস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। এই বিশেষ সাজসজ্জা করা আর সাজসজ্জা না করার উপরই নাটকটিকে মঞ্চে উপস্থাপনের সূক্ষ্ম জটিলতা নির্ভর করছে।

কহিনী-সংক্ষেপ ঃ সিবাসটিয়ান (Sebastian) এবং ভাযোলা যমজ ভাইবোন। ঝড়ে জাহাজ ডুবি হওয়ায় দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়। দুজনেই বেঁচে থাকে। ইলিরিয়ার (Illyria) উপকূলে ভায়োলা ভেসে আসে। ইলিরিয়ার অবিবাহিত শাসনকর্তার (Duke) নাম অরসিনো (Orsino)। ভায়োলা পুরুষের ছদ্মবেশ ধারন করে তার কাছে যায়। সে এখন থেকে নতুন নাম নেয় সিজারিও (Cesario)। ধনী মহিলা অলিভিয়ার (Olivia) প্রতি প্রেমনিবেদনের ব্যাপারে সে অরসিনোর দূতের কাজ করে। অলিভিয়া সিজারিওকে ভালবেসে ফেলে।

এর পর ভায়োলার ভাই সিবাসটিয়ান এবং তার বন্ধু এ্যান্টোনিও (Antonio) হাজির হয়।

এদিকে অলিভিয়ার জ্ঞাতি মদ্যপ স্যার টবি বেলচ (Sir Toby Belch) ভাঁড়প্রকৃতির স্যার এ্যাণ্ডু এ্যাগুচিককে (Sir Andew Aguecheck) অলিভিয়ার প্রণয়প্রার্থী হতে উৎসাহিত করে। এ্যাগুচিক সিজারিওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। এ্যান্টোনিও মধ্যস্থতা করে ঝগড়াঝাঁটি থামিয়ে দেয়।

ডিউকের সঙ্গে পুরাণো এক ঝগড়ার সূত্রে এ্যান্টোনিও গ্রেপ্তার হয়। এ্যান্টোনিও সিজারিওকে সিবাসটিয়ান বলে মনে করে, এবং সেইভাবে তার সঙ্গে কথা বলে। সিজারিও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, কিন্তু এ্যান্টোনিও তাকে সাহায্য না করার জন্য সিজারিওকে দোষারোপ করে।

এইবারে আসল সিবাসটিয়ান অলিভিয়ার সামনে আসে। অলিভিয়া তাকে সিজারিও বলে ভুল করে, এবং গোপনে পুরোহিত ডেকে তাকে বিয়ে করে।

আবার এ্যাণ্ড্রু এ্যাগুচিক মনে করেছিলেন সিজারিও দুর্বল। সুতরাং তাকে জব্দ করতে চায়। কিন্তু সিজারিও-র বদলে সিবাস্টিয়ান উপস্থিত। এ্যান্টোনিও তাকেই সিজারিও বলে মনে করে তার সঙ্গে লড়াই করে এবং হেরে যায়।

এরপর অলিভিয়া সিজারিওর সন্ধানে অরসিনোর সভায় হাজির হয়। তখন এ্যান্টোনিওর বিচার চলছে। এ্যান্টোনিও সিজারিওকে এ্যাগুচিকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তাই এখন সিজারিও এ্যান্টোনিওর পক্ষে ওকালতি করে।

এই সময় অলিভিয়া হঠাৎ বলে বসে যে সে সিজারিওকে বিয়ে করেছে। সিজারিও (অর্থাৎ ছদ্মবেশী ভায়োলা) কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে কিছু জানে না। তার কারণ অলিভিয়া সিবাস্টিয়ানকে (অর্থাৎ ভায়োলায় যমজ ভাইকে) বিয়ে করেছিল। ডিউক রেগে যান এবং দোষীকে শাস্তি দিতে চান। এই অবস্থায় সিবাস্টিয়ান হাজির হয়, এবং অলিভিয়ার জ্ঞাতি টবি বেলচকে সে প্রহার করেছে বলে অলিভিয়ার কাছে ক্ষমা চায়। এখন অলিভিয়ার সামনে দুজন সিজারিও। গোলমাল মেটানোর জন্য ভায়োলা আত্মপ্রকাশ করে। অলিভিয়া এখন সিবাস্টিয়ানকে মেনে নেয়। ডিউকও ভায়োলাকে গ্রহণ করে। বিদূষক সবশেষে একটি মজার গান পরিবেশন করে। নাটক শেষ হয়।

এই নাটকের ভিতর ভায়োলার (Viola) চরিত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভায়োলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অন্তর্মুখী। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে ভায়োলার নিজের পরিচয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চারদিকে নাটকটি আবর্তিত হয়েছে। ভায়োলা উচ্ছ্বাসকে দমন করেছে। তাকে নিয়ে অলিভিয়ার চিন্তাতে সে মজা পেয়েছে; এবং অনায়াসে আত্মপরিচয় গোপন রেখেছে। ভালবাসা তার কাছে তুচ্ছ নয়; কিন্তু শালীনতা ও স্বাভাবিকতার সীমা সে কখনো লঙ্ঘন করেনি। সে সত্য পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়ে এক করুণ রস সৃষ্টি করেছে। স্বাভাবিক অনুভূতিকে যখন যেভাবে নমনীয় করা দরকার তখনই সে তা করেছে। ভায়োলাই বোধ হয় এই নাটকে একমাত্র 'অভিজাত' মনের অধিকারী। তার সে মন সমস্ত তুচ্ছতাকে একপাশে সরিয়ে রেখে সীমাবদ্ধ সুযোগে নিজেকে মহৎ রেখেছে। এই নাটকের নানা ঘটনার মধ্যে সে শুভ্র ফুল্লকুসুমের মত পবিত্রতা ও স্বাভাবিকতা দুইই বজায় রেখেছে।

পার্শ্ব চরিত্রগুলির মধ্যে ম্যালভোলিও (Malvolio) প্রধান। সে অলিভিয়ার গোমস্তা। সবাই মিলে তাকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে অলিভিয়া তাকে ভালবাসে। তার এই বোকামির জন্য তার খুব নিগ্রহ হয়েছিল।

একজন পুরুষের ছদ্মবেশে ভায়োলা, এবং আর একজন আসল সিবার্সটিয়ান যাকে অলিভিয়া সিজারিও বলে ভুল করেছিন।

ম্যালভোলিওকে এইভাবে বোকা বানানোর দৃশ্য হচ্ছে,—দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য। ম্যালভোলিও হালকা হাস্যকর চরিত্র নয়, কিন্তু তাকে ঠকানো হয়েছে, প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

একজন পুরুষের ছদ্মবেশে ভায়োলা, এবং আর একজন আসল সিবাসট্রিয়ান যাকে অলিভিয়া সিজারিও বলে ভুল করেছিল।

চার্লস ল্যাম্ব এই চরিত্রটির উপর খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন; এবং তাঁর সময়ে ঐ চরিত্রের অভিনেতা বেনসলির (Bensley) উপরেও। বিভিন্ন যুগে বড় বড় অভিনেতা চার্লস ম্যাকলিন (Charles Macklin) থেকে শুরু করে লরেন্স অলিভার (Laurence Oliver) এবং অন্যান্যেরা—এই চরিত্রটি অভিনয় করেছেন।

'বুড়ো বয়সেও জীবনের আনন্দ ফুরিয়ে যায় না'—এই আপ্তবাক্য ম্যালভোলিও-র চরিত্রে দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য নাটকের একটি বিশেষ বক্তব্যকে সকলের সামনে উপস্থাপিত করে।

নাটকটির প্রথম দিকের গম্ভীর পরিবেশ যাতে দর্শকদের একঘেয়ে না লাগে তার জন্য এইরকম একটি সুন্দর দৃশ্যের উপস্থাপনার একান্ত প্রয়োজন ছিল। হালকা ঘটনার আয়োজন করে ম্যালভোলিও-র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে আশা ও হতাশার ভিতর দিয়ে সার্থক করা হয়েছে এই দৃশ্যটিতে।

দ্বাদশ রজনীর কথা এখানে শেষ করা হল।

ম্যাকবেথ (Macbeth)

ম্যাকবেথ শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডিগুলির একটি। এটির রচনাকাল ১৬০৫ বা ১৬০৬ সাল।

উৎস: শেক্সপীয়র ম্যাকবেথ লেখার কিছু আগে থেকেই ম্যাকবেথ-কাহিনী প্রচারিত ছিল, এমনকি নাটকের আকারেও। 'স্টেশনার্স রেজিষ্টারে' ১৫৯৬ সালের একটি নাটকের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, যার নাম 'ম্যাকডোবেথ' (Ballad of Macdobeth)। ম্যাকবেথের কাহিনী স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের অংশ। হেনসলোর (ফিলিপ হেনসলো—Philip Henslowe) ডায়ারিতেও 'স্কচদের রাজা ম্যালকম' (Malcolm King of Scottes) বলে একটি নাটকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। হেনসলো এলিজাবেথের আমলের একজন বিত্তশালী লোক। সে নাটক কেনাবেচা করত। এই ব্যাপারে হিসাব রাখার জন্য তার একটি ডায়ারি ছিল। এই ডায়ারিটি তখনকার কয়েকটি নাটক লেখার সাল তারিখ নির্ধারণে সাহায্য করে।

শেক্সপীয়র সম্ভবতঃ হলিনশেডের 'ইতিহাস' (Holinshed's Chronicle) থেকে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু পেয়েছিলেন। [১৫৭৭ সালে লেখা এই বইটির উল্লেখ আমরা করেছি গ্রন্থের প্রথমভাগের ১৩৩ পাতায়।] তবে তাঁর নাটকের চরিত্রগুলির নাম পরস্পরের সঙ্গে পালটাপালটি করে দিয়েছিলেন। ইতিহাসের ডানকানকে তিনি ম্যাকবেথ বলে, এবং ম্যাকবেথকে ডানকান বলে দেখিয়েছেন। ব্যাঙ্কো ও লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রেও বিপরীত বা ভিন্ন প্রকৃতি দেখিয়েছেন।

কাহিনীসংক্ষেপ: স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকানের (Duncan) প্রভুভক্ত, বিজয়ী দুই সেনাপতি—ম্যাকবেথ (Macbeth) এবং ব্যাঙ্কো (Banquo)। যুদ্ধ জয় করে ফিরছেন। পথে তিন ডাকিনীর সঙ্গে দেখা। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ম্যাকবেথ রাজা হবে; ব্যাঙ্কোর সন্তানরা রাজা হবে। ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ম্যাকবেথ তার স্ত্রীকে জানায়। লেডি ম্যাকবেথের

কু-পরামর্শে ম্যাকবেথ অতিথি এবং রাজা ডানকানকে হত্যা করে। ব্যাঙ্কো এবং তার ছেলে ফ্লিয়ান্সকে (Fleance) হত্যা করবার জন্য ম্যাকবেথ লোক পাঠায়। ব্যাঙ্কো মারা পড়ে, কিন্তু ফ্লিয়ান্স পালিয়ে যায়। অন্যের কাছে অদৃশ্য ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্তিকে ম্যাকবেথ দেখতে পায়। ম্যাকবেথ আবার ডাকিনীদের কাছে যায়। তারা অশুভশক্তির আবির্ভাব ঘটায়। সে শক্তি ম্যাকবেথকে অভিজাত সামন্ত ম্যাকডাফ (Macduff) সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। দ্বিতীয় অশুভ শক্তি জানায় অযোনিজ কোন ব্যক্তি ছাড়া কেউ ম্যাকবেথের ক্ষতি করতে পারবে না। তৃতীয় শক্তি জানায় ম্যাকবেথের কোন ভয় নেই যতদিন না বার্ণামের অরণ্য ম্যাকবেথের দুর্গের দিকে চলে আসে। ম্যাকবেথ কিন্তু নিশ্চিন্ত হয় না। সে ম্যাকডাফের পরিবারের লোকেদের হত্যা করায। লেডি ম্যাকবেথ রাণী হয়েও মনে শান্তি নেই। সকলেই শত্রু। লেডি ম্যাকবেথ অর্ধোন্মাদ হয়ে যায় এবং মারা যায়। ম্যাকবেথ তার একমাত্র আপনার জনকে হারায়। ম্যাকবেথের অবস্থা করুণ। কিন্তু সে পিছু হঠতে জানে না। ম্যাকডাফ এবং ডানকানের ছেলে ম্যালকম ম্যাকবেথের দুর্গ ডানসিনেন আক্রমণ করে। অমিতবিক্রম ম্যাকবেথ যুদ্ধ করে যায। ম্যাকডাফ ম্যাকবেথকে হত্যা করে।

প্রকাণ্ড কিন্তু বিবেকহীন ম্যাকবেথের করুণ পরিণতি বেদনাদায়ক। ভাগ্যের হাতে বিশাল এক শক্তির পরাজয় ও ধ্বংস আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়।

অতিপ্রাকৃত উপাদান : সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ইংবাজ সমাজে অশুভ আত্মা ইত্যাদির অস্তিত্বের উপর খুব বিশ্বাস ছিল। এই সব আত্মা মানুষের দুর্ভাগ্য ইত্যাদির কথা আগে থেকে বলতে পারত ত'বটেই; দুর্ভাগ্য সৃষ্টিও করত। ডাকিনীর অস্তিত্বেও বিশ্বাস ছিল। তাদের পুড়িয়ে মাবা হত।

কাজেই মানুষের কাছে পরিচিত বিষয় হিসাবে ম্যাকবেথ নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদান রাখতে হয়েছে। নাটকের প্লট তৈরীর জন্য, কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নাটকের চরিত্রে অতিপ্রাকৃতের প্রভাব দেখানর জন্য এবং পরিবেশ তৈরীর জন্য অতিপ্রাকৃত বিষয়কে ব্যবহার করা হযেছে।

ম্যাকবেথ নাটকে ডাইনিরা সেই রহস্যময় অতি প্রাকৃত পরিবেশের দৃশ্যমান প্রতিনিধি।

নাটকীয় শ্লেষ (Dramatic Irony)

নাটকীয় শ্লেষ বা Dramatic Irony হচ্ছে একই জিনিসের দুটি দিকের পারস্পরিক বৈপরীত্য। ঘটনাক্রমে কোন কিছু যা করা বা বলা হচ্ছে তার ফল কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক অর্থের বিপরীত। যেমন, ম্যাকবেথ রাজা হবে। কথাটা শুনতে খুব ভাল। কিন্তু তাতে কি এটা বোঝা গিয়েছিল যে তাকে রাজা হতে হবে তার গুণগ্রাহী প্রভুকে হত্যা করে? কাজেই, ঘটনার ফল যখন দেখা যাচ্ছে তখন কি আমাদের বলতে ইচ্ছা করে না 'এ কেমন রাজা হওয়া? এমনভাবে রাজা না হলেই তো ভাল ছিল।'

ম্যাকবেথ নাটকের বেশ কয়েকটি দৃশ্য খুব বিখ্যাত। এমন একটি দৃশ্য 'দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।' এটিকে সংক্ষেপে 'দ্বাররক্ষী'—দৃশ্য বা Porter Scene বলা হয়। সমগ্র নাটকের স্বার্থে বিভিন্ন দৃশ্যের উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হয়।

আলোচ্য দৃশ্যটি প্রয়োজনীয়। এই দৃশ্য আরম্ভের ঠিক আগেই ডানকানকে হত্যা করা হয়েছে। এই নারকীয় অবস্থার পটভূমিতে এই দৃশ্যটিকে রাখা হয়েছে। ডি কুইন্সি (Thomas De Quincey ১৭৮৫-১৮৫৯) তাঁর একটি অনবদ্য রচনায় এই দৃশ্যটির যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

এই দৃশ্যটি নাটকীয় স্বস্তি বা Dramatic Relief-এর কাজ করেছে। হত্যাকারীর (ম্যাকবেথ) মানসিকতা কোথায় চলে গিয়েছিল, আবার কিভাবে তা স্বাভাবিক সচেতনতার দিকে ফিরে আসছে,—এই দৃশ্যেই সেটি আপাত-হালকা ঘটনা দিয়ে বোঝান হয়েছে। পূর্ববর্তী দুটি দৃশ্যের বীভৎসতা এবং অস্বাভাবিকতার ধারণা এই দৃশ্যটির সাহায্যেই তৈরী করা যায়। এই দৃশ্যটি মানুষের স্বাভাবিক সচেতনতা, এবং তার থেকে সাময়িক বিচ্যুতি—এই দুই-এর বৈপরীত্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তার থেকেও বড় কথা, দর্শক বা পাঠক যেন একটা হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পেল, এবং পূর্বাপর বিচার বিবেচনার বুদ্ধি ফিরে পেল।

এই দৃশ্যের প্রথমেই মঞ্চের ভিতরের দিকে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ দর্শকেরা শুনতে পাচ্ছে। এই ধাক্কাকে উপলক্ষ্য করে দুর্গের এক দ্বাররক্ষী তার কথা যা বলে যাচ্ছে তা নরক এবং স্বাভাবিক জগতের মাঝখানের সীমানা ও সম্পর্কের কথা। দ্বাররক্ষী অপদেবতার নামে শপথ নিচ্ছে। স্বাভাবিক মন নরকের জগতের খোঁজ নিতে চাইছে। মাতাল দ্বাররক্ষী দরজা খুলতে চাইছে না। কিন্তু স্বাভাবিক জগতের প্রতিনিধিদের অপ্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা পরমূহুর্তেই হতে চলেছে।

এইভাবে মাতাল দ্বাররক্ষী সমস্ত পরিস্থিতির মনস্তাত্ত্বিক বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত ফলপ্রদভাবে ঘটাতে পেরেছে।

ম্যাকবেথ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দুটি। ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ।

নাটকের নায়ক ম্যাকবেথ রাজার জ্ঞাতি ও সেনাপতি। রাজার প্রতি বিশ্বস্ততায় এবং সেনানায়কের ভূমিকায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খা তার জীবনে বিকৃত রূপ নিল। স্বার্থপরতা এবং পরস্বাপহরণ তাকে দুর্বৃত্তে পরিণত করল।

তার প্রথম দুষ্কর্ম—প্রভুকে হত্যা—তাকে আরও নতুন নতুন দুষ্কর্মের দিকে ঠেলে দিল। এখন সে ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল। তার শক্তি এখন বিকৃত শক্তি। সে শক্তি জীবনের দিকে এগিয়ে যায় না ; মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

ম্যাকবেথের মৃত্যু প্রকাণ্ড হিমানী-সম্প্রপাতের মত জগৎকে ধ্বংশ করে এবং নিজেও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

ম্যাকবেথের স্বগতোক্তিগুলি হ্যামলেটের স্বগতোক্তিগুলির থেকে কম শক্তিশালী নয়। হ্যামলেটের বিষাদ তাকে বিশ্ববীক্ষণের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে। ম্যাকবেথের স্বগতোক্তি তাকে আপন জীবনের গভীরতম স্তরে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে কোন সমাপ্তি নেই, ধারক নেই,—আছে পাতালের মহাগহ্বর। হ্যামলেট আমাদের চিন্তা করায় ; ম্যাকবেথ আমাদের অনুশোচনা ও প্রকাণ্ড অপচয়ের অনুভবে নিঃশেষ করে দেয়।

ম্যাকবেথের কল্পদৃষ্টি নিম্নস্তরে অলীকতা ও দৃষ্টিবিভ্রম, উচ্চতম স্তরে আত্মসমীক্ষার যন্ত্রণাময় প্রতিচ্ছবি।

লেডি ম্যাকবেথ প্রথমে সেনাপতির স্ত্রী, পরে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারিণী। তার সমস্ত চিন্তা ও কাজ তার স্বামীকে ঘিরে। তাকে সে আরও ক্ষমতাবান হিসাবে দেখতে চায়। এদিক থেকে সে নিঃস্বার্থ। কিন্তু ম্যাকবেথকে রাজা করবার জন্য কোন অসৎ কাজকেই সে অন্যায় বলে মানতে চায় না। তার চরিত্রে [কঠোর, উদ্ধত, নিষ্ঠুর] পরুষভাব অত্যন্ত প্রবল। সে তার স্বামীর উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তার কাজ এত গুরুভার যে শেষ পর্যন্ত সে মানসিক ভারসাম্য হারায়। চরম অসুস্থতা এবং মৃত্যুই তার নিয়তি। কিন্তু নিজের কথা না ভেবে স্বামীর স্বার্থচিন্তায় সে বিস্ময়কর দূরত্বে এগিয়ে যায়। চরিত্রের কাঠিণ্য ও নির্মমতা সে অন্যদিকে দেখাতে পারে, কিন্তু ম্যাকবেথের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সে কর্তব্যপরায়ণা সঙ্গিনী। সে বিবেক এবং নির্বিবেকের এক আশ্চর্য সমন্বয়। ডানকানের মুখের সঙ্গে সে তার বাবার মুখের মিল দেখেছিল। এটা বড কম কথা নয়। এস্কাইলাসের ক্লিটেমনেষ্ট্রা স্বামীকে হত্যা করেছিল। কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ ডানকানকে হত্যা করে আনন্দ পাবার জন্য নয়,—ম্যাকবেথ যাতে রাজার গৌরব পায় সেইজন্য। অসাধারণ মনের জোর ছিল এই মহিলার। ম্যাকবেথের কল্পনাপ্রবণতা এবং মানবিকতাকে লেডি ম্যাকবেথের মানসিক শক্তি এবং প্রভাব ছাড়া দুর্বল করে ফেলা যেত না।

অন্যান্য নাট্যকার

টমাস মিডলটন (Thomas Middleton) ১৫৭০-১৬২৭

মিডলটন নাট্যজগতের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। শেক্সপীয়রের অনুজ নাট্যকারদের প্রায় কেউই সুস্পষ্ট লক্ষণের ট্র্যাজেডি লিখতে পারেননি। মিডলটনের ক্ষেত্রেও সেই কথা খাটে। তবে প্রহসনমূলক নাটকে তাঁর মোটামুটি দক্ষতা ছিল। আসলে নিজের ক্ষমতার পরিমাপে নাটক লেখার চেষ্টা করায় মিডলটন বদনাম কেনেননি। শেক্সপীয়র এবং আরও কয়েকজন প্রতিভাধর নাট্যকারের সমসাময়িক হওয়ায় মিডলটন এবং অপর কয়েকজনকে নাটকের ক্ষেত্রে কিছু করার চেষ্টা খুব বুঝেশুনেই করতে হয়েছিল। অবশ্য মিডলটন লণ্ডনের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবেই চিনতেন। সুতরাং সহজেই তিনি তাদের জীবনের ত্রুটিগুলি দেখাতে পেরেছিলেন। ট্র্যাজেডিতে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাতে পেরেছিলেন একটি নাটকেই। সেটি হচ্ছে,—'মহিলারা মহিলাদের থেকে সাবধান হও' ('Women Beware Women—১৬২২)। তবে অন্যের সাহায্য নিয়ে লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি 'পরিবর্ত' (Changeling—১৬২১)। ক্রূরতা এই নাটকটির স্বাভাবিক ক্ষেত্র হলেও নাট্যকার একটা সংযত উপস্থাপনা বজায় রেখেছিলেন।

টমাস ডেকার (Thomas Dekker) ১৫৭২-১৬৩২

ডেকার সারাজীবনই লণ্ডনে কাটিয়েছিলেন। দেশীয় ও বিদেশী নানা আঞ্চলিক ভাষা এবং উপভাষা তাঁর জানা ছিল, এবং সেগুলি তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। ডেকার তাঁর নিজের যুগে চার্লস ডিকেন্সের (Charles Dickens ১৮১২-৭০) প্রতিরূপ

ছিলেন। লণ্ডনের নীচুতলার মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, এবং তাকে তিনি তাঁর নাটকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। লণ্ডনের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি একটি প্রবহমান স্রোতের মত করে দেখাতে পেরেছেন।

ডেকারের কমেডিগুলি বিদ্রুপাত্মক ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সহানুভূতিশীল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর নাটকে রোম্যান্স এবং বাস্তবতার সহাবস্থান দেখা যায়। ডেকার লণ্ডনবাসীদের নাট্যকার, এবং সেই বোধ তাঁকে তৃপ্তি দিত।

তাঁর বিখ্যাত নাটক 'জুতাপ্রস্তুতকারীর ছুটির দিন' (The Shoemaker's Holiday ১৫৯৯)। এই নাটকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি নিজেও যেন স্বাভাবিক আনন্দে মিশে গেছেন। তাঁর চরিত্রগুলি সর্বতোভাবে সৎ না হলেও,—ভাল লোক।

বেন জনসন (Ben Jonson) ১৫৭২-১৬৩৭

জন্ম ১৫৭২ সালে। প্রথম জীবনে রাজমিস্ত্রীর সাগরেদ। তারপর সৈনিক, তারপর অভিনেতা, তারপর নাট্যকার। 'কৌতুকময় কমেডি' বা কমেডি অব হিউমারের (Comedy of Humour) অন্যতম স্রষ্টা। খুনের দায়ে জেলে যেতে হয়েছিল। তখন রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমত নিয়েছিলেন। পরে আবার আগের বিশ্বাসে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের প্রধান ধর্মসংঘ চার্চ অব ইংল্যাণ্ডে (Church of England) ফিরে আসেন। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; অল্প বয়সেই প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। তেইশ বছর বয়সেই নাট্যকার হিসাবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

'যে যার খোশখেয়ালে' (Everyman in his Humour—১৫৯৮), 'খেপামির বাড়াবাড়ি' (Everyman out of his Humour—১৫৯৯), 'পাতিশিয়াল' (Volpone or the Fox—১৬০৬), 'অপরাসায়নিক' (The Alchemist—১৬১০) এবং আরো কয়েকটি তাঁর বিখ্যাত কমেডি। এগুলির প্রত্যেকটিতেই ব্যঙ্গাত্মক উপাদান মিশে আছে।

জনসনের আমল পর্যন্ত ইংরাজী কমেডি অসম্ভব, অতিরঞ্জিত, অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট এক ধরণের সাহিত্য ছিল। ক্লাসিক আদর্শ বজায় রাখার কোন চেষ্টা ছিল না। জনসন এই ধরনের রোম্যাণ্টিক কমেডির বদলে তাঁর কৌতুকময় কিন্তু বিদ্রুপাত্মক কমেডি (Comedy of Humour and Satire) হাজির করলেন। তিনি তাঁর নাটকে ক্লাসিক 'তিন ঐক্য' (Three Unities) ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে নাটকের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে যেন মিশিয়ে ফেলা না হয়, চরিত্রচিত্রণে যেন সঙ্গতি ও শোভনতা বজায় থাকে, চরিত্রগুলিতে যেন সামাজিক বিশ্লেষণ চোখে পড়ে, এবং সেগুলি যেন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে,—তা নাট্যকারের দেখা উচিৎ। এই সব আদর্শ অনুসরণের দ্বারাই নাট্যকার তাঁর সমসাময়িক কালের নাটকের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারেন।

জনসন তাঁর কমেডিকে বাস্তবধর্মী রাখতে চেয়েছিলেন এবং এটাও চেয়েছিলেন যে নাটকের কলাকৌশল যেন ক্লাসিক আদর্শের অনুরূপ হয়।

জনসনের নাটকে হাসির আড়ালে নাট্যকারের একটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ অবশ্যই থাকে।

আমার মতে ইংরাজী সাহিত্যের এক ধরণের শ্রেণীবিভাগে যদি কৌতুক এবং বিদ্রূপের দুটি ধারাকে চিহ্নিত করা যায় তবে তা যেমন প্রথম পাওয়া গিয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে চশার (১৩৪০-১৪০০) এবং ল্যাংল্যাণ্ডে (১৩৩২-১৪০০), তেমনি তা দেখা গিয়েছিল দুশো বছর বাদে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে শেক্সপীয়র এবং বেন জনসনে।

'অপরাসায়ণিক' (The Alchemist)

'অপরাসায়ণিক' বেন জনসনের বিশিষ্ট কীর্তি। এটিকে 'আচার-আচরণের কমেডি' (Comedy of Manners) শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। নাটকের ঘটনার সময় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। নাটকের স্থান লণ্ডনের একটি বাসগৃহের একটি ঘর এবং বাড়ীটির বাইরের দরজার সামনের দিক। এটিকে ১৬১০ সালে প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটি প্রথম ছাপা হয় ১৬১২ সালে।

কাহিনীসংক্ষেপ : মহামারীর ভয়ে লাভউইট (Lovewit) তার লণ্ডনের বাড়ী চাকর ফেস-এর (Face) জিম্মায় রেখে পালিয়ে যায়। 'ফেস' তখন অপরাসায়ণিক সাটল (Subtle) এবং তার সাগরেদ ডল কমনের (Doll Common) সঙ্গে সড় করে বাড়ীটাকে সহজেই ঠকে যায় এমন লোকেদের বোকা বানানোর কাজে ব্যবহার করে। তখনকার দিনে মানুষের পরশপাথরে খুব বিশ্বাস ছিল, এবং রাসায়ণিকরা পরশপাথর তৈরী করতে পারে এরকম একটা ধারণাও অধিকাংশ মানুষের ছিল। মানুষের সেই লোভ এবং বোকামিকে মূলধন করে এই ঠগবাজরা দুপয়সা কামাতে চেয়েছিল। লোভী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্যার এপিকিউর ম্যামন (Sir Epicure Mammon), পিউরিটান ট্রিবিউলেশন হোলসাম (Tribulation Wholesome) এবং এ্যানানিয়াস (Ananias)— দুজনেই অর্থগৃধ্নু, কেরানী ড্যাপার (Dapper), তামাকবিক্রেতা ড্রাগার (Drugger), বদমেজাজী ছোকরা ক্যাসট্রিল (Kastril), তার বিধবা বোন ডেম (Dame) ইত্যাদিরা দুষ্কর্মকারীদের শিকার হয়। জুয়াড়ী সার্লি (Surly) এদের বদমায়েসি ধরে ফেলে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লাভউইট ফিরে আসায় সাটল এবং ডল কমন পালিয়ে যায়। ফেস তখন ক্যাসট্রিলের বোন ডেম-এর সঙ্গে লাভউইটের বিয়ের ঘটকালি করে নিজের মনিবের সঙ্গে অশান্তি মিটিয়ে নেয়।

কারুর কারুর মতে 'দি এ্যালকেমিষ্ট' বেন জনসনের শ্রেষ্ঠ নাটক।

কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge ১৭৭২-১৮৩৪) এই নাটকের প্লটকে অত্যন্ত নিখুঁত বলেছেন। এই নাটকে আদর্শবাদী জনসনের চেয়ে শিল্পী জনসন বেশী করে প্রকাশ পেয়েছেন।

জন ওয়েবস্টার (John Webster)

শেক্সপীয়রের সঙ্গে প্রায় একই যুগের বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার ওয়েবস্টারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি লণ্ডনের

এক বণিকের ছেলে। কিছুদিন আইনের পড়াশুনাও করেছিলেন। জন্ম ১৫৭০ সালের পর; মৃত্যু ১৬২৪ সালের পর। প্রথম জীবনে অন্য কয়েকজন নাট্যকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছিলেন। প্রমোদ অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিশিষ্ট সংগঠক হেনসলোয়ের (Henslowe) অধীনেও কিছুদিন ছিলেন। পরে তাঁর একক প্রচেষ্টায় লেখা নাটক 'শ্বেত শয়তান' (The White Devil—১৬০৯) এবং 'মালফির জমিদারণী' (The Duchess of Malfi—১৬১৩) অতি বিশিষ্ট সাহিত্যকীর্তি হিসাবে স্বীকৃত। জীবনের শেষ বছরগুলিতে কোন শ্রেষ্ঠ নাটক তিনি লিখতে পারেন নি। অন্তত তেমন কোন লেখার খোঁজ পাওয়া যায় নি।

তাঁর নাটকগুলিকে প্রথম দিকে কেবল ভাবালুতা প্রবণ রোমাঞ্চকর নাটক হিসাবেই দেখা হয়েছিল। এর কারণ ওগুলিতে ক্রূরতা, আবেগ ও বিষণ্নতা সবই ছিল বেশী পরিমাণে। কিন্তু এটাও দেখা গেছে যে তিনি সেগুলিকে একটি নিয়ন্ত্রিত মাত্রার ভিতর ধরে রেখেছিলেন। পরে অবশ্য রোম্যান্টিকরা তাঁর নাটকের যথেষ্ট সমাদর করেছিলেন।

ওয়েবস্টার ছিলেন প্রতিভাবান নাট্যকার, শিল্পী, কবি। জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী তিনি নাটকের কোন কিছুই পালটাননি। তিনি প্রচলিত ট্র্যাজি-কমেডির বদলে যেন প্রতিজ্ঞা করে নির্ভেজাল ট্র্যাজেডি রচনা করতে চেয়েছিলেন।

ইলিয়ট (টি. এস. ইলিয়ট ১৮৮৮-১৯৬৫) ওয়েবস্টার সম্পর্কে বলেছেন, মৃত্যুচিন্তাই তাঁর মনকে আধিকার করেছিল; এবং চর্মের নিচে করোটিকে তিনি দেখেছিলেন। ওয়েবস্টারের প্রতিভা ছিল অনমণীয় ট্র্যাজেডির প্রতিভা। বিশেষতঃ সেই যুগে যখন ট্র্যাজিকমেডিই প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ট্র্যাজেডি তার পর থেকে আমাদের সহ্যশক্তির সীমার মধ্যেই যাতায়াত করেছে। এমনকি নাট্যকাবের স্বাধীন কল্পনার প্রসাদও আর কখনও তেমন পায়নি। এ প্রসঙ্গে আরও বলা চলে যে ওয়েবস্টারের পরে নাটকীয়তা এবং কাব্যগুণ আর কখনও পুরোপুরি পরস্পরের সঙ্গে মেশেনি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ট্র্যাজেডির তিনিই শেষ নায়ক।

মালফি-র জমিদারনী (The Duchess of Malfi) ১৬১৩

ওয়েবস্টারের এই নাটকটির প্লট সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি।

মালফির (Malfi) বিধবা জমিদারণী তার ভাই ক্যালাব্রিয়ার (Calabria) জমিদার ফার্ডিন্যাণ্ড (Ferdinand) এবং অপর ভাই কার্ডিন্যালের (Cardinal—অতি উচ্চপদস্থ রোম্যান ক্যাথলিক যাজক) মতের বিরুদ্ধে গোপনে পারিবারিক দেওয়ান (Steward) এন্টোনিও বোলোগনাকে (Antonio Bologna) বিয়ে করে। এই বিয়ের ব্যাপারটা ভাইদের কাছে ধরা পড়ে যায়। ভাইয়েরা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ডাচেসকে মানসিকভাবে যমযন্ত্রণা দিতে থাকে। নানা ধরনের যন্ত্রনা একের পর এক প্রয়োগ করা হতে থাকে। নির্যাতনে নির্যাতনে হয়রাণ হয়ে ডাচেস উন্মাদ হয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তাকে তার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়।

ডাচেসের স্বামী এন্টোনিও ছিল সৎলোক। ফার্ডিন্যাণ্ড এবং কার্ডিন্যালের অত্যাচার প্রধানতঃ যার মাধ্যমে ঘটেছিল সেই ড্যানিয়েল ডি. বসোলা (Daniel De Bosola) ডাচেশেরই এক কর্মচারী। নাটকটিকে এক কথায় বলতে হয় : ক্রূরতার বেদীতে সততার বলিদান। হার্ডির(Thomas Hardy ১৮৪০-১৯২৮) 'Tess of the D' Urbervilles (১৮৯১) নভেলে 'টেস'-এর সমস্যা বিস্তৃত পটভূমিকায় সেই একই।

প্রায় একই ধরনের পরিস্থিতিতে শেক্সপীয়র যেখানে বিষন্ন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ওয়েবস্টার সেখানে মর্মন্তুদ করুণা বিস্তার করে বিচার শক্তিকে মুহ্যমান করেছেন। এই করুণা 'প্রতিহিংসা-ভিত্তিক ট্র্যাজেডিরই' (Revenge Tragedy) একটি বিশেষ দিক।

নাটকটি ব্ল্যাকফ্রায়ার্স (Black Friers) এবং 'গ্লোব' (Globe) থিয়েটারে ১৬১২ বা ১৬১৪ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ; এবং ১৬২৩ সালে প্রথম ছাপা হয়।

সিরিল টুর্ণুর (Cyril Tourneur) ১৫৭৫-১৬২৬

ওয়েবস্টারের মত টুর্ণুরের জীবনেরও বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সৈনিকের কাজ করেছিলেন ; দেশবিদেশে যেতে হয়েছিল ; মারা যান আয়ার্ল্যাণ্ডে। তীব্র আবেগপূর্ণ কবিতালেখার ক্ষমতা ছিল। উল্লেখযোগ্য নাটক দুটি ;—'প্রতিহিংসালোলুপের ট্র্যাজেডি' (Revenger's Tragedy) ১৬০০ সাল থেকে, এবং 'নাস্তিকের ট্রাজেডি' (The Atheist's Tragedy) ১৬০৭ সাল থেকে অভিনীত হয়। এগুলির সহজভিত্তি ছিল প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনা। কাজেই দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। নাটকের পরিবেশ বিষন্ন, অস্বাভাবিক। ব্যক্তিমানুষের যে বিশিষ্ট পরিচয় ইতিমধ্যেই ইংরাজী নাটকে পরিপূর্ণভাবে এসে গিয়েছিল, টুর্ণুরের নাটকে তা পাওয়া যায় না। চরিত্রগুলিতে বিকৃতি দেখান হয়েছে, কিন্তু সবই যেন যান্ত্রিক। আগেকার 'মর‍্যালিটি' (Morality) নাটকের প্রতীকি চরিত্রের আভাষও হয়ত পাওয়া যায়। নাটকে সৃষ্ট ঘনীভূত আবেগ খুব দ্রুতই এসে পড়েছে ; কাজেই শ্লথভাবের কোন স্থান নেই। তদানীন্তন কালের দর্শকদের চাহিদার দিক থেকে এই উপস্থাপন খুবই সার্থক হয়েছিল।

জন মার্স্টন (John Marston) ১৫৭৫-১৬৩৪

মার্স্টনের জীবনের একটা স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য ছিল। মার্স্টন ছিলেন ছিদ্রান্বেষী। নিঃসন্দেহে তাঁর থেকে অনেক বেশী প্রতিভাবান মার্লো, জনসন ইত্যাদিদের নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। বিদ্রুপাত্মক কবিতা লেখায় তাঁর কলমের জোর ততটা ছিল না ; কিন্তু তা পুষিয়ে গিয়েছিল তীব্র কটূক্তিতে। তবে তিনি নাটকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'প্রতিহিংসা মূলক ট্র্যাজেডি' (Revenge Tragedy) দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল।

মার্স্টনের জন্ম কভেন্ট্রি সহরে (Coventry), অক্সফোর্ডে শিক্ষা পেয়েছিলেন, লণ্ডনে

সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। জীবনের শেষ দিকে যাজক হিসাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রূঢ় সমালোচক হিসাবে জোনাথান সুইফটের (Jonathan Swift ১৬৬৭-১৭৪৫) কথা হয়ত আমাদের মনে আসতে পারে।

তাঁর ট্র্যাজেডি 'এন্টোনিও ও মেলিডা' (Antonio and Mellida ১৫৯৯) এবং 'এন্টোনিও-র প্রতিহংসা' (Antonio's Revenge ১৬০২) প্রচণ্ড আবেগউত্তেজনাপূর্ণ অতি-নাটকীয় রচনা। এগুলিতে স্থূলভাবে আকর্ষণীয় রোম্যান্টিক উপাদানের যথেষ্ট মিশেল ছিল।

মার্স্টন কয়েকটি জনপ্রিয় কমেডিও লিখেছিলেন। 'পূবদিকে, পূবদিকে' (Eastward Ho)-(১৬০৫) নামক বিখ্যাত কমেডি চ্যাপম্যান (George Chapman ১৫৫৯-১৬৩৪) ও জনসনের (Ben Jonson ১৫৭৩-১৬৩৭) সহযোগিতায় লেখা হয়েছিল।

জন ফ্লেচার (John Fletcher) ১৫৭৯-১৬২৫ এবং ফ্রান্সিস বীমণ্ট (Francis Beaumont) ১৫৮৪-১৬১৬

সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুজনের কথা একসঙ্গেই বলা হয়। ১৬১৩ সাল পর্যন্ত এঁরা একসঙ্গেই থাকতেন, এবং লেখালেখিও প্রায়ই পরস্পরের সহযোগিতায় করা হত।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বা তার কিছু আগে থেকেই দুই বা তিনজন লেখকের পরস্পরের সহযোগিতায় লেখার একটা ফ্যাসন চালু ছিল। এমন কি শেক্সপীয়র, মার্লো বা বেন জনসন,—এঁদেরও অল্প কিছু এই ধরনের নাটক আছে।

বীমণ্ট ও ফ্লেচারের ট্র্যাজি-কমেডি 'ফিল্যাস্টার' (Philaster—১৬০৯), ট্র্যাজেডি 'কুমারী মেয়ের ট্র্যাজেডি' (The Maid's Tragedy—১৬১০) এবং 'রাজা থাকা, রাজা না-থাকা' (A King and No King—১৬১১) বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকের মতে শেক্সপীয়ারের সঙ্গে একটানা তুলনা করার দরুন, এঁদের কিছুটা যেন খাটো করে দেখান হয়েছে। ওই তুলনামূলক সমালোচনার ব্যাপারটা না থাকলে, এঁদের সঠিক বিচার হয়ত বা করা যেত।

লেগুই এবং কাজামিয়ঁর (Legouis and Cazamian) মতে 'কুমারী মেয়ের ট্র্যাজেডি' এঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ নাটক। ড্রাইডেন (John Dryden ১৬৩১-১৭০০) শ্রেষ্ঠ বলেছেন,—'রাজা থাকা, রাজা না থাকা' নাটকটিকে। তবে 'ফিল্যাস্টার'-এর আলোচনা তুলনামূলকভাবে বেশী হয় এই কারণে যে শেক্সপীয়রের দুটি বিখ্যাত চরিত্রের (হ্যামলেট এবং ওথেলো) সঙ্গে 'ফিল্যাস্টার' চরিত্রের কিছু মিল পাওয়া যায়।

এই 'ফিল্যাস্টার' নাটকের রচনা এবং অভিনয়ের সময় থেকেই মানুষের রুচি নাটকের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব, চিরকালীনতা এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য থেকে আপাত-আকর্ষণীয় অগভীর মানসিকতার দিকে চলে যেতে থাকে। মানুষ হয়ত সামাজিক জীবনে অসংলগ্নতা (Disintegration) এবং অ-নিরাপত্তার (Unsafety) দুশ্চিন্তা থেকে

সরে যেতে চাইছিল। বহিরাবরণের সাজসজ্জা এবং সুন্দর জাঁকাজমকেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইছিল। সেই রুচিকে বজায় রেখেই নাটককে উৎকর্ষতার দিকে নিয়ে যাবার সময় তখনো আসেনি।

নাট্যকাররা 'ফিল্যাস্টার' নাটকটির আর একটি নাম দিয়েছিলেন: 'রক্তাপ্লুত প্রেম' (Love lies a-bleeding)। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৬১১ সালে, এবং ছাপা হয় ১৬২০ সালে। নাটকটিতে সেনেকার প্রভাব রয়েছে।

গল্পটি এইরকম।—ক্যালাব্রিয়ার (Calabria) রাজা সিসিলি (Sicily) রাজত্বটিও আত্মসাৎ করে। সিসিলি রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী ফিল্যাস্টার। ক্যালাব্রিয়ার রাজার মেয়ে আরেথুসার (Arethusa) সঙ্গে তার ভালবাসার সম্পর্ক। কিন্তু আরেথুসার বাবা তার বিয়ে দিতে চায় স্পেনের রাজকুমার ফারামণ্ডের (Pharamond) সঙ্গে। ফিল্যাস্টার আরেথুসা সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য তার পরিচারক বেল্লারিওকে (Bellario) কাজে লাগায়। এদিকে আরেথুসা তার বাবাকে জানায় যে ফারামণ্ডের সঙ্গে রাজসভার একটি মহিলা নেগ্রার (Negra) সম্পর্ক আছে। নেগ্রা আবার প্রতিশোধ নেবার জন্য আরেথুসার সঙ্গে বেল্লারিও-র অসৎ সম্পর্কের কথা তোলে। ফিল্যাস্টার সেকথা বিশ্বাস করে, এবং আরেথুসাকে ছেড়ে চলে যায়। এর পরে প্রকাশ পায় যে বেল্লারিও আসলে একটি মেয়ে, ইউফ্রেসিয়া (Euphrasia), পুরুষের ছদ্মবেশে রয়েছে। সে সিসিলির একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে; এবং ফিল্যাস্টারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য পুরুষের ছদ্মবেশে তার পরিচারকের কাজ নিয়েছে। এই রকম আরও কিছু ঘটনার পর আনন্দ-বিষাদ দুয়ে মিলে নাটকটি দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়েছে।

তবে গভীর ও স্থায়ী কোন চেতনার ছাপ না পড়ায় র‍্যানেইসাঁসের উজ্জ্বল যুগের অবনতি এখান থেকেই অতি স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে।

বীমণ্ট এবং ফ্লেচার দুজনেই উচ্চশিক্ষিত। ফ্লেচার তাঁর পারিবারিক সাহিত্যিক রুচি স্বভাবতঃই অধিগত করেছিলেন; এবং স্বচ্ছল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বীমণ্টের সাহিত্যিক আগ্রহ আপনা থেকেই এসেছিল। কিন্তু যে অন্তর্নিহিত তেজ, উচ্ছ্বাস, দুঃসাহস এবং স্বপ্ন র‍্যানেইসাঁসের প্রাণসম্পদ তা তাঁদের লেখায় ছিল না। ভবিষ্যতেও ঠিক সেই জিনিসের আর কখনও আবির্ভাব ঘটেনি।

র‍্যানেইসাঁসের যুগের এবং ঠিক তার সন্নিহিত পরের যুগের নাটকের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করলাম। আলোচনার এই সীমিত পরিসরের জন্য সাহিত্যপিপাসু পাঠক পাঠিকাদের মনে যদি ক্ষোভ আর অতৃপ্তি থেকে যায়, তবে তাতেই আমার সামান্য চেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো। কারণ আগ্রহী পাঠক পাঠিকাদের মনের ক্ষোভ এবং অতৃপ্তি তাঁদের আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস রাখি।

উপসংহার

১৬০৩ সালে এলিজাবেথ মারা যান। সেই থেকে মোটামুটি ১৬৪০ সাল বা আরও কিছুদিন পর পর্যন্ত সময়কে সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যাকোবিয়ান ও ক্যারোলাইন যুগ বলা হয। ১৬১৬ সালে শেক্সপীয়রও মারা যান। তারপর থেকে অন্ততঃ ১৬৪০ সাল পর্যন্ত সময় শেক্সপীয়রের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীদের যুগ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরাজ জনসাধারণ যেন একই সঙ্গে দুধরনের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির ভিতর তাঁদের জীবন কাটিযেছিলেন। একটি বহির্জীবন, যা ছিল নানা ঘটনার ও কর্মব্যস্ততার জীবন; এবং অপরটি গভীর চিন্তা ও চেতনার জীবন।

এই প্রায় পঞ্চাশবছর সময়কে কযেকটি স্পষ্ট অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশটিতে উচ্ছৃল জীবনের ঘোর। ম্যাকিয়াভেলিয় বস্তুবাদের যুগ। আত্মিকতার বোধ এই সময় সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে আত্মিকতার এই শূণ্যতা উপলব্ধি করা যেতে থাকল, কারণ বস্তুগত জীবনের সর্বগ্রাসিতা তখন কমে এসেছে। শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এই সময়েই লেখা হয়েছিল।

এই সময় থেকেই সাহিত্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যুগ শুরু হয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া জাগতিক তত্ত্বই মানুষের চিন্তার বিষয় ও কাজের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। আচার-আচরণ, স্বভাব, জীবনযাপনের জন্য নৈতিক শিক্ষা,—এইগুলির পরিমার্জনাই মানুষকে ব্যাপৃত রাখে। সাহিত্যে এর প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী।

ক্রমশ নাটকে অবিমিশ্র ট্র্যাজেডি বা কমেডিরও গুরুত্ব আর তেমন বোঝা যায় না। জীবন যা তাই দেখো, তাই জানো,—এই যেন হয়ে এল জীবনের নির্দেশ।

তবে ক্ষেত্রবিশেষে দুষ্প্রবৃত্তিকে যেন ডেকে আনা হল। সেনেকার আপাত-ব্যাখ্যার প্রতিহিংসাচরিত্র আবার কোথাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতে থাকল।

আলোচ্য যুগের তৃতীয় অংশে বিশিষ্ট লেখকদের চিন্তাজগতে মুগ্ধ জীবনবোধ এবং বস্তুজগতের সম্পর্কে সচেতনতার মধ্যে একটা সাম্যভাব দেখা গেল। এই সময়ের সাহিত্যিক মেজাজ কোন ক্ষেত্রে শান্ত, নিস্তরঙ্গ কিন্তু সচল—নদীস্রোত; আবার কখনও বা বহির্জীবনের আঘাত সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াহীন নিস্পৃহ। কিন্তু আসন্ন ধর্মীয় বাদ-বিসম্বাদ বা রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কখনও সাহিত্য জগৎ হতাশা বা দুঃখে ডুবে যায়নি।

এর পর একটা স্থাযী লক্ষ্যের দিকে জীবন ও সাহিত্য এগুতে থাকল। এই লক্ষ্য কোন কাল্পনিক ভাবজগৎ নয়। এটা হল উৎসবের এবং দুঃখের, আড়ম্বরের এবং শান্তির, বন্ধনহীনতার এবং নৈষ্ঠিকতার, বাইবেলের এবং রাজসিকতার এক পাঁচমিশালী বাস্তব জগৎ। সপ্তদশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার কিছু পর থেকেই এই জীবনের শুরু। সাহিত্যও তাই আড়ষ্টতা এবং একমুখিনতা কাটিয়ে তখন একটা স্বাভাবিক রাস্তা খুঁজে পেয়েছিল।

তবে পঞ্চাশের দশকের অনেক আগেই জন ওয়েবস্টারের (John Webster ১৫৭৫-১৬২৪) নাটকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত দুষ্কর্মের দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও বিক্ষোভ বা অশান্তির কোন প্রকাশ নেই। বীমণ্ট (Francis Beaumont ১৫৮৪-১৬১৬) এবং ফ্লেচারের (John Fletcher ১৫৭৯-১৬২৫) নাটকে স্বচ্ছন্দ সুরপ্রবাহ গড়িয়ে গেল, এবং নিষ্করুণ মিডলটন (Thomas Middleton ১৫৭০-১৬২৭) সমালোচনার পরিবেশেও অস্পষ্ট স্তিমিতির মধ্যে মানুষের মনকে বিশ্রামের আহ্বান জানিয়ে দিলেন।

প্রসঙ্গতঃ, ১৬৪২ সালে পিউরিটানদের ধর্মীয় উন্মাদনার ফলে নাট্যশালাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

এর আগেই ফিলিপ ম্যাসিঞ্জারের (Philip Massinger ১৫৮৩-১৬৪০) ১৬৩৩ সালে প্রকাশিত 'পুরাণ দেনা শোধ করবার নতুন কায়দা' (A new way to pay old debts) নামক তিক্ত প্রহসনমূলক নাটকে একটি ব্যতিক্রমের মত রূঢ়তার হঠাৎ পুণরাবির্ভাব ঘটে গেল। তবে সবশেষে ফোর্ডের [John Ford জন ফোর্ড—১৫৮৬-১৬৩৯] ক্ষেত্রে আতঙ্ক ও বিকৃতি সত্ত্বেও এক বিষাদের সান্নিধ্যে আমাদেব মন আবার সাহিত্যিক স্থৈর্যে ফিরে এল।

এর পরে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন পা ফেললাম তখন ধর্মীয় উত্তেজনা চরমে। দশ বছর ধরে বিভিন্ন আদর্শের যে সংঘাত এবং শাসনব্যবস্থায় কঠোর গণতন্ত্র এবং ধর্মোন্মাদনার যে তাণ্ডব মানুষকে সহ্য করতে হয়েছিল তাকে 'পবিত্র বিকৃতি' ছাড়া অন্য কোন নাম দেওয়া যায় না। এ সময়ের একমাত্র রুপালি রেখা ছিল স্যার টমাস ব্রাউন (Sir Thomas Browne ১৬০৫-১৬৮২) এবং তাঁর 'প্রাচীন শবাধার' (Hydriotaphia : Urne Buriall-১৬৫৮)।

পরিশিষ্ট

১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলর (Oliver Cromwell) মৃত্যু হয়। দুর্ধর্ষ বীর, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী, অক্লান্ত কর্মী এই মহানায়ক নিজে সাহিত্য রচনা করেন নি। কিন্তু র‍্যানেইসঁসের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অবসান এবং নতুন আর এক আড়ম্বরপূর্ণ সাহিত্যের পালাবদলে তাঁর পরোক্ষ কিন্তু স্থায়ী ভূমিকা অনেক সময়ে লক্ষ্য করা হয় না।

গ্রন্থের বর্তমান প্রসঙ্গে ক্রমওয়েলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন স্টুয়ার্ট রাজারা তেমনই ক্রমওয়েল দুই বিপরীত দিকে ধর্মব্যবস্থাকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব্যক্তিনিরপেক্ষ নিয়মবদ্ধ ধর্মাচরণের থেকে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠল। ব্যক্তিমানুষের ধর্মবিশ্বাসের এই স্বাধীনতা আধুনিক মনোভাব সৃষ্টির স্পষ্ট এক সর্ত।

আধুনিক সাহিত্যে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা দেখতে আমরা এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি তার ভ্রূণ এইভাবে ধর্মবিশ্বাসে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার ভিতরেই সুপ্ত ছিল। ক্রমওয়েল বলেছিলেন রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যে মানুষ আত্মদান করছে, সে ঈশ্বরেরই

সেবা করছে ; সুতরাং তার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার দরকার নেই। এই ব্যক্তিস্বাধীনতার স্পৃহাই ধীরে ধীরে প্রায় একশ বছর পরে সাহিত্যিকের বিশ্বাসের ও প্রকাশের স্বাধীনতায় পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সংঘর্ষের ভিতর থেকেই প্রগতির উদ্ভব। পূর্ববর্তী কয়েক দশক ধরে চরম পবিত্রতাবাদীরা (Puritans) আক্রমণ ও উপহাসের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে পাশা উলটে গেল। পবিত্রতাবাদীরা হালকা আমোদ প্রমোদের সংস্কৃতিকে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ শুরু করল। এই আক্রমণের সূচনা হযেছিল অনেক আগে গসন (Stephen Gosson) এবং স্টাবসের (Philip Stubbs) মারফৎ। ১৫৭৯ সালে গসনের 'অপব্যবহারকারী গোষ্ঠী' (Schoole of Abuse) এবং ১৫৮৩ সালে স্টাবসের 'অপব্যবহারগুলির অঙ্গব্যবচ্ছেদ দ্বারা পরিজ্ঞান' (Anatomy of Abuses) দ্বারা ধর্মানুশীলনের শিথিলতার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়েছিল। এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি এসেছিল ব্যারিষ্টার প্রিণের (William Prynne) হাতে। ১৬৩২ সালে 'অভিনয় ও অভিনেতাদের ভর্ৎসনার নানা নিদর্শনের ভাণ্ডাব' (Histriomastix) গ্রন্থের জন্য তাঁকে আমানুষিকভাবে নির্যাতিত করা হয়েছিল। গসন, স্টাবস এবং প্রিণ যে শাস্তি পেয়েছিলেন তার কারণ উপযুক্ত সময়ের আগেই তাঁরা ধর্মের শিথিল প্রযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁরা তৎকালীন রাজানুমোদিত সাংস্কৃতিক পরিশীলনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই প্রচলিত সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরোধী এই সব প্রতিবাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সাহিত্যের, বিশেষ করে নাটকের পক্ষে রাজশক্তির সমর্থন। অর্থাৎ, জনপ্রিয় সংস্কৃতি যেন ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে গণতন্ত্রবিরোধী। এবং রাজানুগ্রহের বিরোধিতা ছিল পার্লামেন্টের সমর্থন পুষ্ট কিন্তু ধর্মীয় গোঁডামিতে আচ্ছন্ন। জনগণের পার্লামেন্টের হাতে জনপ্রিয় শিল্পের এই লাঞ্ছনার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ খুব কঠিন। পশ্চাদপদতা বলে একে নিন্দা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে গৃহযুদ্ধ, রক্তপাত, রাজদ্রোহ, প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা এবং সব শেষে, নানা অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করে, বাধ্যতামূলক নিষ্ঠার হাত থেকে নিষ্কৃতি এক ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং যথাসময়ে তার অবসান। এই শতাব্দীর সপ্তম দশক ছিল উপরোক্ত কার্যপরম্পরার শেষ অধ্যায়। তবে, সমাজের প্রধান প্রধান পরিচালক শক্তির অস্তিত্বপঞ্চকের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে প্রচলিত লক্ষণের সাহিত্যের পরিবেশ বজায় রাখা যায়নি। এই দশকে যা সৃষ্টি হয়েছিল তা জমকাল, মনোমুগ্ধকর এবং কিছুটা অগভীর। কিন্তু তার মধ্যেই নতুন এক ঐতিহ্য সৃষ্টি হতে চলেছিল।

আবার, আর একদিকে, নিজের অস্তিত্বকে অহেতুক জাহির না করে, সাহিত্যের একটা ক্ষীণ এবং প্রাচীন স্রোত পঞ্চাশের, এমনকি ষাটের, দশকেও প্রবাহিত ছিল। এই স্থায়ী ফল্গুধারাকে বহমান রাখার জন্য ধৈর্য, সময়, সুবিবেচনা এবং শান্তিকামিতার প্রয়োজন ছিল। ক্রমওয়েল বলেছিলেন,—'রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে বাধ্য না হয়ে যদি আমি

সুন্দর বনভূমিসংলগ্ন শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম, মেষপালকের নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতে পারতাম. তাহলে তার থেকে আনন্দ আমার আর কিছুতে থাকত না।' নিষ্ঠাবান, নীতিবাগীশ, অক্লান্ত যোদ্ধা, শান্তির অতন্দ্র প্রহরী এই মানুষটির মুখ দিয়েই ইংরাজী সাহিত্যের চিরাচরিত লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছিল। আইজাক ওয়ালটনের (Izaak Walton ১৫৯৩-১৬৮৩) 'নিখুঁত বঁড়শেল' (Compleat Angler ১৬৫৩) গ্রন্থেও ইংরাজের এই মনোবাসনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হয়ত ক্রমওয়েলের চরিত্রের অন্তলীন এই বিশেষ মাধুর্যের সঙ্গে সাহিত্যের সূক্ষ্ম যোগ ছিল। নানা ঘটনায়, নানা পরিস্থিতিতে শেক্সপীয়র-পরবর্তীযুগের সাহিত্যের ক্ষীয়মাণতা এবং ষাটের দশকের জোরাল পুণঃপ্রকাশে ক্রমওয়েল অপ্রত্যক্ষভাবে থেকে গেছেন। এণ্ড্রু মার্ভেল (Andrew Marvell ১৬২১-৭৮) একটি রাজনৈতিক উপলক্ষ্যেও তাঁর প্রশস্তি গেয়েছেন 'Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland' কবিতায়।

ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী ক্ষেত্রে সারা সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে মিলটন (১৬০৮-৭৮), ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০), সুইফট (১৬৬৭-১৭৪৫), স্টিল (১৬৭২-১৭১৯) এক বিচিত্র বিস্ময়কর সাহিত্যের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ; এবং পরবর্তী শত শত বছরের ইতিহাসে চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন উত্তরসূরীদের জন্য রেখে গেছেন। এঁরা সাহিত্যকে নানা দিকে নানা ভাবে যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তা রাষ্ট্রনৈতিক কালাপাহাড় ক্রমওয়েলের কার্যক্রম ছাড়া এ ভাবে সার্থক হতে পারত কি না কে জানে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে যে আসমান-জমিন ফারাক তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল গৃহযুদ্ধ (১৬৪২-১৬৪৯), প্লেগ (১৬৬৫), অগ্নিকাণ্ড (১৬৬৬) এবং প্রচণ্ড ও অত্যুগ্র ধর্মীয় নিষ্ঠা। এই ধরনের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়েই সাহিত্য এগিয়ে চলে। পরিবর্তনকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে তোলে ঃ 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী'-র সেই ছবি তখনই আমাদের উপলব্ধির আওতায় এসে যায়।

যদিও দেশের সাধারণ মানুষ গৃহযুদ্ধে (১৬৪২-১৬৪৯) প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু যুদ্ধের রেশ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে খুবই অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সেই অবস্থায় বড় কাব্যসৃষ্টি হয় না। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কবিতা লেখার প্রথা এই সময়ে চালু হয়ে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই এই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। 'অধিবিদ্যাবিৎ' (Metaphysical poets) কবিদের কথা আমরা বিশেষ কারণে আধুনিক যুগ দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম না। এঁরা ছিলেন হারবার্ট (George Herbert ১৫৯৩-১৬৩৩), ক্যারু (Thomas Carew ১৫৯৪-১৬৩৯), ক্রশ (Richard Crashaw ১৬১২-৪৯), কাউলে (Abraham Cowley ১৬১৮-৬৭), ভন (Henry Vaughan ১৬২২-৯৫), এবং এণ্ড্রু মার্ভেল (Andrew Marvell ১৬২১-৭৮)। এঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই কাজ করে গেছেন। এঁদের কথা বলা হবে আধুনিক যুগ তৃতীয় পর্বে।

এই যুগের ইংরাজী গীতিকাব্যের আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়। তা হল রাজনৈতিক

ব্যাপারে একশ্রেণীর কবির সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা। এ ছাড়া ছিলেন রাজার সমর্থক কবি বা 'অশ্বারোহী' (Cavalier) পক্ষের কবি। এঁদের ক্লাসিক ধাঁচের ছোট ছোট প্রেমের কবিতা এই গ্রন্থের বর্তমান পর্বে আলোচ্য যুগের (১৫৭৬-১৬৫০) শেষ দিকে লেখা হয়েছিল। এঁরা ছিলেন রাজভক্ত। একদিক থেকে ধরতে গেলে বিগত যুগের কাব্যিক প্রেরণার ধারা এঁদের ভিতরেই অব্যাহত ছিল। এই ধারারই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল ড্রাইডেনের ভিতর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিলটনের পরেই সবচেয়ে শক্তিশালী কবি ড্রাইডেন। 'ক্যাভেলিয়ার' কবিদের ভিতরে সাকলিং (Sir John Suckling ১৬০৯-৪২) এবং লাভলেস (Richard Lovelace ১৬১৮-৫৮) গৃহযুদ্ধের সঙ্গে কমবেশী জড়িত ছিলেন। এঁদেরও কিছু উল্লেখ আমরা গ্রন্থের পরবর্তী পর্বে করতে পারব বলে আশা করি। এই সময়ের অতি বিশিষ্ট লেখক টমাস ব্রাউন (Sir Thomas Browne ১৬০৫-৮২)। তিনি তাঁর যুগের মুখ্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে একেবারেই প্রাধান্য দেননি। তাঁর নিজের জগতে খৃষ্টিয় মানবিক বোধ এবং নব-আবিষ্কৃত সুদূর প্রসারী প্রভাবশালী, নানা তথ্যভিত্তিক জ্ঞানকে সাময়িক কোন শক্তিশালী উপসর্গ ভিন্নপথগামী করতে পারেনি।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বা তার কিছু আগের এবং পরের সময় পর্যন্ত সাহিত্যের ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, গতি ও বিকাশ একটা বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে নাতিদীর্ঘ পরিসরে [আধুনিক যুগ দ্বিতীয় পর্বে] দেখানোর চেষ্টা করা হল। কেন্দ্রীয় ঘটনা র‍্যানেইসঁস। বাইবের প্রভাব যা-ই থাকুক, ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজী প্রকৃতির ভূমিকাই প্রধান। র‍্যানেইসঁসের আবির্ভাব, গৌরব ও তনুভবন (rarefaction) একটা পরিচিত, প্রশস্ত দৃষ্টিকোন থেকে দেখাই সচরাচর রেওয়াজ। কিন্তু আর একদিক থেকে, বলতে গেলে বিপরীত দিক থেকে, দেখার পক্ষেও যুক্তি রয়েছে। তার কারণ কৌতূহলী পাঠকের নানা ধারণার ভিতরে একটা সমতা ও সামঞ্জস্য আনা দরকার। র‍্যানেইসঁস যে তাব নিজেব ধরনে গৌরবের সঙ্গে গ্লানিও বয়ে নিয়ে এসেছিল সে কথা আগেই বলেছি। সেই গ্লানি সত্ত্বেও র‍্যানেইসঁসের সৌন্দর্যবোধের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনার মুখে ফেলে দেবার কথা আগে ভাবা হয়নি। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষদিকে এবং পরবর্তী কয়েকবছর সে কথাও ভাবা হল। এই নতুন বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী একটা সাময়িক ব্যতিক্রমমাত্র নয়। এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিজেই একটি ধারা; এবং খুব সক্রিয় ধারা। প্রায় দুশ বছর বাদে ব্রাউনিং-এর (Robert Browning ১৮১২-৮৯) 'আমার বিগত স্ত্রী' (My Last Duchess) কবিতাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগের 'রহস্য নাটকের' (Mystrics) উপর ধর্মের প্রভাব প্রথম থেকেই ছিল। এমন কি এ-ও বলা চলে ধর্মাচরণের ভিতর থেকেই ইংরাজী নাটকের উদ্ভব। তবে ধীরে ধীরে ব্যবধান বাড়তে থাকে। ধর্মসংঘ ও নাটকের ভিতরে পরস্পরেব বিরোধিতা ক্রমশঃ খোলাখুলি প্রকাশ হতে থাকে। একাদশ শতাব্দীর 'Quem Quaeritis'-এর (Whom do you look for—তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ?) কালে যে নাটক ছিল ধর্মাচরণের অনুষঙ্গী, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝখানে ওয়েবস্টার (Webster) এবং মার্সটনের (Marston) হাতে তার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্কই রইল না। সপ্তদশ শতাব্দীর

পবিত্রতাবাদীরা (Puritans) শিল্পের এই অপচরিত্রকে সম্পূর্ণ হটিয়ে দিতে চাইলেন। ১৬৪২ সালে সরকারী আদেশে নাট্যশালাগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

ধর্ম ও নাটকের এই বিরোধিতার ইতিহাস ;—একদিনের ঘটনামাত্র নয়। অনুভবের যে গভীরতা দিয়ে নাটকের স্বতন্ত্র মর্যাদা বজায় বাখা যেত তা ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূণ্য হয়ে আসছিল। শুধু উচ্চনিনাদী আলঙ্কারিক কথা দিয়ে সে অভাব পূরণ করা যায় না। কাজেই মাত্রাতিরিক্ত ধর্মনিষ্ঠা ও শিল্পবিরোধিতা কিছুদিনের জন্য প্রাধান্য পেয়েছিল।

নাটকের সমারোহ, অবনতি, অন্তর্ধান ও পুণঃপ্রকাশের সমস্ত স্তরের ভিতর দিয়ে যে মানুষটি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন উইলিয়ম ডেভন্যান্ট (Sir William D'Avenant ১৬০৬-১৬৬৮)। পরবর্তী নিও-ক্লাসিক যুগের ছবি তাঁর নাটকেই প্রথম ধরা পড়ে। অবশ্য ডেভন্যান্ট বড় নাট্যকার ছিলেন না ; এবং নাটকের ভাষাও সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজাতে পারেন নি।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাটকের স্বাভাবিক স্ফূরণ ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে, নাটক-দর্শনার্থী মানুষেরা শক্তিশালী পার্লামেন্টের অনুগামীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন, ১৬৪২ সালে নাট্যমঞ্চগুলি বন্ধ হয়ে যায়,—এবং এ' সমস্তই জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রগতির বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য একটি ব্যাপারও বিবেচনা করতে হয়। শেক্সপীয়রের আমল থেকে চলে আসা নাট্যকার ও পৃষ্ঠপোষকদের রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কের অবসানেরও দরকার ছিল। রাজা প্রথম জেমসের সিংহাসনারোহনের দিন শেক্সপীয়রও 'সম্মানিত' হয়েছিলেন রাজকীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের অধিকার পেয়ে। যাই হোক, এখন ঘটনাচক্রের পরিণতিতে যা দাঁড়াল তা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। একদিকে রাজনীতিগত (বা এমনকি ধর্মনীতিগত) গণতন্ত্র এবং অন্যদিকে জনপ্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতি—পরস্পরের বিরুদ্ধে চলে গেল। ষাটের দশকে রাজানুগ্রহ আবার যখন সাংস্কৃতিক ধারার মুখ খুলে দিল তখন কিন্তু সেই নতুন আদর্শের সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগ আর রইল না। নথীভুক্ত সাহিত্যের যে ইতিহাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা প্রাধান্য দিলাম, তা হল অভিজাত সাহিত্য। সৃজনশীল সাহিত্যের পরিমণ্ডলে জনসাধারণের আর সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা রইল না। ছ'শো বছর আগে এই প্রবণতার শুরু হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা সম্পূর্ণ হল। লাভক্ষতির হিসাব আলাদা। এখন থেকে জনসাধারণ হয়ে রইলেন শুধু পাঠক আর সমাদরকারী, —সৃষ্টিকর্তা নন। সাহিত্যের চরিত্রের পরিবর্তনের থেকে এ পরিবর্তন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তবে লেখক সম্প্রদায় ইংরাজী চরিত্র বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। ইংরাজের চরিত্রের স্থায়ী লক্ষণের প্রতিফলন সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিক থেকেই দেখা গেল। অতি-উৎসাহ, শুষ্ক এবং তীক্ষ্ণ মতামত প্রকাশ, আপোষে গররাজী চরম কোন অভিব্যক্তি এখন থেকে আর পরিণত বুদ্ধির সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হল না! মতামত এবং পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা প্রকাশে সামঞ্জস্যই হয়ে দাঁড়াল একটা স্থায়ী আদর্শ। চরমভাবে মতামত প্রকাশকে আর কখনও তেমন আমল দেওয়া হয়নি। বরঞ্চ বলা চলে তাকে অপরিণত মনের প্রকাশ হিসাবে ধরা হল, এবং আজও ধরা হচ্ছে। সব কিছুকে কমবেশী

মেনে নেওয়াই হয়ে দাঁড়াল পরিণত মনের ও বুদ্ধির প্রকাশের গ্রহণযোগ্য ভঙ্গী। আধুনিক কালের সাহিত্য এই ধরনের অভিব্যক্তিকেই অনুসরণ করছে।

সহজবোধ্য প্রাঞ্জলভাষাই এর পর থেকে আদর্শ ভাষা বলে গৃহীত হল। সংক্ষিপ্ত আয়তনে সঠিক প্রকাশ মর্যাদা পেল। কষ্টকল্পনার থেকে স্বাভাবিক ভঙ্গী ইংরাজী ভাষা প্রয়োগের স্থায়ী আদর্শ বলে বোঝা গেল।

এই সব স্থায়ী পরিবর্তন ছাড়াও তাৎক্ষণিক পরিবর্তনগুলিও লক্ষ্য করার মত। সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে কৃচ্ছ্রসাধনার থেকে আড়ম্বর, গুরুগম্ভীর নিষ্ঠার বদলে আলঙ্কারিক কিন্তু শিথিল ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা, রোম্যাণ্টিক স্বাধীনতার থেকে ক্লাসিক নিয়মবদ্ধতা, স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাসের বদলে প্রাচীন আদর্শের বিশ্বস্ত অনুসরণ ইত্যাদি হয়ে এল নতুন যুগের সাহিত্যের অভূতপূর্ব চরিত্র। এগুলি সাহিত্যস্রষ্টাদের সামনে স্বস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে উপস্থিত হল।

এই সব কিছু যে ঐতিহাসিক ঘটনার সমান্তরালে প্রকাশ পেয়েছিল, বা যে ঘটনার উপর নির্ভর করে অনেক নতুন আদর্শ স্থায়ীত্ব পেয়েছিল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে তার নাম 'রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠা' বা সংক্ষেপে 'পুণঃপ্রতিষ্ঠা' (Restoration)। ১৬৬০ সালে ইংল্যাণ্ডের ষ্টুয়ার্ট বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম জেমসের নাতি দ্বিতীয় চার্লসকে ফ্রান্স থেকে ডেকে আনা হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির রদবদল হয়ে গেল। ড্রাইডেন হলেন রাজার সভাকবি। তাঁর কাব্যের রাজকীয় মহিমা আগেকার আনাড়ম্বর কবিতাকে পিছনে ফেলে প্রবলগতিতে এগিয়ে গেল।

'কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।' —[বিষ্ণু দে]।

অবশ্য পূর্ববর্তী 'পবিত্রতাবাদীদের' (Puritans) কার্যকলাপের কিছুই অবশিষ্ট রইল না তা' নয়। সেই অবশিষ্টাংশের সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন মহাকবি মিলটন। আপোষহীন সংগ্রাম, আদর্শের প্রতি চরমতম নিষ্ঠা মিলটন তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় চার্লসের রাজসভা তাঁর আদর্শ নেয়নি, কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেছিল। ক্যাথলিক হয়েও যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে দ্বিতীয় চার্লস রাজত্ব করেছিলেন। শক্তিশালী উদারনৈতিকরা কখনো প্রকাশ্যভাবে তাঁর বিরোধিতা করবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। তাঁর রাজত্বকালে ক্যাথলিক বা অন্য যে কোন ধর্মমতের চেয়ে ফরাসী প্রভাবিত অভিজাত সংস্কৃতি সমাজের উপরমহলে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। ব্যাপকভাবে জনসাধারণের সঙ্গে—বিশেষ করে সাধারণ পাঠকদের সঙ্গে—সাহিত্যের যোগাযোগ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর পরে।

গ্রন্থের এই অংশের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

G. B. Harrison : Introducing Shakespeare
J. Dover Witson : The Essential Shakespeare
Allardice Nicoll : British Drama
Edward Dowdon : Shakespeare—His mind and Art
Vivian De Sola Pinto : The English Renaissance
A. Compton-Rickett : A History of English Literature
Legouis and Cazamian : History of English Literature
W. H. Hudson : An Introduction to the Study of Literature
A. C. Baugh : Literary History of England
A. C. Bradley : Shakespearean Tragedy
F. E. Halliday : A Shakespeare Companion
S. C. Sengupta : Shakespearean Comedy
F. S. Boas : Shakespeare and his predecessors
U. M. Ellis Fermor : Jacobean Drama
U. M. Ellis Fermor : Christopher Marlow
A. Nicoll : Theory of Drama
W. J. Courthope : Combridge History of English Literature

[আধুনিক যুগ দ্বিতীয় পর্ব এখানে শেষ হল।]

ইংরাজী সাহিত্যের আলোকধারা

দ্বিতীয় ভাগ

আধুনিক যুগ

[তৃতীয় পর্ব]

নীতি—যুক্তি—গণসামীপ্য

[১৬৫১—১৮০০]

সূচীপত্র

আধুনিক যুগ [তৃতীয় পর্ব]

নীতি—যুক্তি—গণসামীপ্য [১৬৫১—১৮০০]

।। নীতি—যুক্তি—গণসমীপ্য ।।

১৬৫১—১৮০০

ভূমিকা

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ শেষ হবার আগেই ধর্মতত্ত্ব ও রাজনীতির বাইরে মানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার একটা পারিবেশের উদ্ভব হয়েছিল। ফ্লোরেন্সে গ্যালিলিও (Galileo Galilei ১৫৬৪-১৬৪২), ফ্রান্সে দেকার্তে (Rene Decartes ১৫৯৬-১৬৫০), ইংল্যাণ্ডে বেকন (Francis Bacon ১৫৬১-১৬২৬) ও হবস (Thomas Hobbes ১৫৮৮-১৬৭৯) দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা দিকে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। রয়্যাল সোসাইটির (প্রতিষ্ঠা-১৬৬২) প্রথম ঐতিহাসিক বিশপ স্প্র্যাট (Bishop Sprat) বলেছিলেন, ধর্মতত্ত্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কি দরকার আছে। বরং যে সব অজ্ঞাত রহস্যের সমাধান তখনও হয়নি সেগুলির আলোচনা আরও বেশী বেশী করে হোক। ইংল্যাণ্ডে এই নতুন দর্শনের (New Philosophy) ক্ষেত্র যাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডঃ ওয়ার্ড (Dr. Ward) এবং প্রথম ইংরেজ অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়ম পেটি (Sir William Petty)। 'রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার' ঠিক আগেই অক্সফোর্ডে নানা বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা চলছিল 'অক্সফোর্ড সোসাইটির' (Oxford Society) মারফৎ। রাজতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠার (১৬৬০) সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনেও নতুন নতুন চিন্তা ও কাজ শুরু হয়ে গেল। রাজা দ্বিতীয় চার্লস (Charles II) নিজে নানা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কাজে উৎসাহ দেখালেন। বাকিংহামের ডিউক পদ্য রচনা, মদ্যপান ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের দিকেও মন দিলেন। কবি ড্রাইডেন (John Dryden ১৬৩১-১৭০০) এবং কাউলে (Abraham Cowley ১৬১৮-৬৭), বিশিষ্ট সভাসদ ডিগবি (Sir Kenelm Digby) এবং মুরে (Robert Murray) যখন নতুন বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলনকারীদের দলে যোগ দিলেন তখন সমর্থনের চিহ্নস্বরূপ রাজা এঁদের সমবেত সংস্থার নাম দিলেন 'দি রয়্যাল সোসাইটি (The Royal Society)। প্রথম সভাপতি হলেন লর্ড সোমারস (Lord Somers)।

দেশে এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে বিদেশাগত নানা বিশ্বাস ও দর্শন যুক্ত হল। ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্তের (Rene Decartes ১৫৯৬-১৬৫০) যুক্তিবাদ (Rationalism) 'আবেগময় স্বজ্ঞার' (Emotional Intuition) উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর মতে 'অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান' (Empiric Knowledge) এই 'স্বজ্ঞা'-র মাধ্যমেই মানুষ পেতে পারে। ১৬৫০ সালে যখন তিনি মারা যান তখন তাঁর এই বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) সারা ইউরোপে পরিচিত হয়ে গেছে।

ইংল্যাণ্ডের পিউরিটান আমলে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে সারা ইউরোপে মধ্যযুগীয় দর্শন (স্কালাসটিসিজম-Scholasticism) এবং পুরাতনের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পণ্ডিত সমাজে একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু পিউরিটানদের খাঁটি নৈতিকতা এবং মধ্যযুগীয় দর্শনের প্রভাবকে অতিক্রম করে যুক্তিবাদিতা, প্রাঞ্জলতা বা স্পষ্টতা অধিকতর গ্রহণযোগ্য এই বিশ্বাস এনে দিলেন দেকার্তে। তবে চূড়ান্ত যুক্তিবাদিতা এবং চূড়ান্ত অন্ধবিশ্বাসের মাঝামাঝি একটা কার্যকরীবোধ ইউরোপে প্রচলিত দর্শন বলে তখন চলছিল।

র‍্যানেইসঁসের সমস্ত পর্যায়ে—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশেও—'যুক্তিবাদিতা' ছিল, এবং তা ছিল অর্ধমগ্ন। ১৬৬০ সালে রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা' ইংল্যাণ্ডের চিন্তাধারার উপরের স্তরে ভেসে উঠল। রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদিতা রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার দরুণ সৃষ্টি হল তা নয়; এই দার্শনিকতা বরাবরের।

দেকার্তেকে অনুসরণ করে প্রাথমিক ভাবে একটা 'প্রত্যাখ্যানের' বা 'অস্বীকৃতির' (Negation) আবহাওয়া গড়ে ওঠে। এবং পরিণতিতে অধ্যাত্মবাদকেও (Spiritualism) প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনার কথা মনে আসে। এই সম্ভাবনা থাকার ফলে অভিজ্ঞতাবাদকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার একটা বাধা আসে। দেখা যায়, অভিজ্ঞতাবাদ যতটা যুক্তিপূর্ণ ততটাই রহস্য। যতটা আকর্ষণীয় ততটাই বিকর্ষণীয়। অধ্যাত্মবাদিতার স্পষ্ট অঙ্গীকার না থাকায় যেমন একদল অভিজ্ঞতাবাদকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন নি, তেমনি হবস (Hobbes) এবং অন্য কয়েকজন অধ্যাত্মবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বাস্তব যুক্তিবাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। এটি কিন্তু দেকার্তের মতবাদের পরিবর্তিত ধরন (Modification)।

টমাস হবস (Thomas Hobbes ১৫৮৮-১৬৭৯) সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইংরেজ দার্শনিক। গৃহযুদ্ধের (১৬৪২-১৬৫১) সমাপ্তির বছরে ১৬৫১ সালে হবস তাঁর যুক্তিবাদের কার্যকারিতা ব্যক্ত করে 'দি লিভিয়াথান' (The Leviathan) লেখেন। যদিও তখন থেকে দশ বছর ধরে—১৬৬০ সাল পর্যন্ত—পিউরিটান (চরম পবিত্রতাবাদী প্রোটেষ্ট্যান্ট) ক্রমওয়েল এবং তাঁর ছেলে বিচার্ডের "অভিভাবকত্বে" (Protectorate) বাধ্যতামূলক গণতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা চলছিল, তবুও 'দি লিভিয়াথান'কে আমি নতুন যুগের সূচনার দিগদর্শন বলে মনে করি।

বর্তমান প্রসঙ্গে 'লিভিয়াথানের' অর্থ প্রকাণ্ড শক্তিসম্পন্ন স্বৈরতন্ত্রী। হবস ব্যক্তিবিশেষের সার্বভৌম শাসননীতির পক্ষপাতী ছিলেন। এককভাবে ব্যক্তিহিসাবে সার্বভৌম শাসক বা রাজার যে প্রয়োজন হবস যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, সেই প্রয়োজন সার্থকভাবে মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের অধিকারের দাবীও তিনি তাঁর নিজস্ব ধরনে সমর্থন করে গেছেন। হবসের বর্ণিত এই পরিস্থিতিতে যেমন (তাঁর মতে) আদর্শ শাসনব্যবস্থা রূপায়িত করা যায় তেমনি সেই সঙ্গে একটা মুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

পিউরিটানদের দৃঢ় কর্তৃত্বের অধীনে থাকাকালীন মানুষ চিন্তার ও প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে চাইছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর চল্লিশের এবং বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে সৃষ্ট সাহিত্যের

পরিমান বলবার মত এমন বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু যে পরিবেশ ষাটের দশক থেকে রূপ পেয়েছিল তাতে র‍্যানেইসঁসের ধোঁয়াটে প্রভাবের থেকে স্পষ্ট যুক্তিবাদিতার প্রভাব বেশী। এবং সেই একই কারণে তন্ময় মুগ্ধভাবের থেকে জোরালভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং প্রতিপক্ষের প্রতি রূঢ় ব্যঙ্গোক্তি সাহিত্যের কলেবরকে ধারণ করেছিল। র‍্যানেইসঁসের সৌন্দর্যবোধের থেকে এই পরিবর্তন অনেক বেশী আধুনিক এবং সকলের ব্যবহারের উপযোগী। র‍্যানেইসঁসের বিভিন্ন অভিব্যক্তি সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়েছে; আর রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার সময় থেকে মানুষ পূর্বপরিচিত অভিব্যক্তিতে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে। অবস্থাটা আপাতদৃষ্টিতে এই রকম,—'গণতন্ত্রের' চাপে সাধারণ মানুষ নিষ্ক্রিয় থেকেছে। রাজতন্ত্রের মুক্ত পরিবেশে মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গী গ্রহণ করতে পেরেছে, এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার নমনীয়তা ভোগ করেছে।

হবসের মতে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলার অধীনে স্বয়ংপ্রধান জীবনযাপন করতে পারে। জীবনযাপনের এই পদ্ধতি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে আসছে। সমাজ-দর্শনের এই শিক্ষা (Discipline), সাহিত্যের শিক্ষাতেও (Discipline) বিকাশলাভ করেছিল। আইভর ব্রাউনের (Ivor Brown) মতানুসারে হবস আধুনিক যুগের উপযোগী মানসিকতা গঠনের প্রথম দার্শনিক। ব্যক্তিমানুষের নিজস্ববোধ এবং স্বাধীন অভিব্যক্তির সঙ্গে আধুনিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তিবাদকে মিলিয়ে দিয়ে হবস র‍্যানেইসঁস এবং 'রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার' এবং তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের সেতুবন্ধন করেছিলেন।

বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য

গ্রন্থের বর্তমান অংশের অর্থাৎ আধুনিক যুগের তৃতীয় পর্বের সময় নির্ধারিত হয়েছে ১৬৫১ সাল থেকে ১৮০০ সাল। দেড় হাজার বছরের সাহিত্যের ইতিহাসে এই দেড়শ বছর আনুপাতিক হারের থেকে বেশী সমৃদ্ধ। এই সময়ে সর্বকালের বিচারে শ্রেষ্ঠ বেশ কিছু সাহিত্যিক কাজ করেছেন। আমি অবশ্য এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিই সাহিত্যের বিস্তার, বহুমুখীনতা ও জনসাধারণের কাছে তার সহজ গ্রহণযোগ্যতার উপর। সেই বিচারে এই যুগের সাহিত্যের গতিপথ ক্রমশঃ জনাকীর্ণ এবং জনগণের পক্ষে উত্তরোত্তর রম্য হয়েছে। তা ছাড়া, পুরাতন ধরনগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন জ্যঁর (Genre) বা ধরন। সাহিত্যের কলেবর ও বৈচিত্র্য এইভাবে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং একটা লেখক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যা জনসাধারণের কোন বৃহৎ অংশ নয়, কিন্তু যাদের সঙ্গে জনসাধারণের বৃহৎ অংশের সারাক্ষণের সম্পর্ক।

আর একটা কথা। এই সময় থেকেই সাহিত্য জনসাধারণের এমন অনেক প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে যেগুলি এর আগে মেটেনি; বা এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে, যে সব প্রয়োজন বোঝাও যায়নি। এই প্রয়োজনগুলি বুদ্ধির চর্চা, নতুন নতুন কৌশল সৃষ্টির চেষ্টা, সামাজিকতা, জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক যোগাযোগ, ব্যক্তিগত অবসর বিনোদন, গভীর তত্ত্বচিন্তা, মানসিক ক্লান্তি অপনোদন, আনন্দের উপকরণ হিসাবে সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শাখার প্রতি পক্ষপাত ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই দেড়শ বছরের ভিতরই ইংরাজী নাটকের অনেক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। নভেল বা উপন্যাস নামে আধুনিক সাহিত্যের বৃহত্তম শাখার সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে গূঢ় মনস্তত্ত্ব বহুবিস্তৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক থেকে আরম্ভ করে জটিল নানা সাহিত্যকর্ম করা হয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দর্শনের প্রয়োগ হয়েছে। কাব্যে নতুন নতুন বিচিত্র ধারা সৃষ্টি হয়েছে। এই যুগেই ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য 'প্যারাডাইজ লষ্ট' (Paradise Lost—১৬৬৭) প্রকাশিত হয়েছে। ধারাবাহিক শ্লোকে বুদ্ধি ও কৌতুকের বিদ্যুৎচ্চমক ঝলকে উঠেছে (পোপের কবিতা ১৭১১-১৭৪২)। গদ্যে ইংবাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রূপক কাহিনী 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস (Pilgrim's Progress—১৬৭৮) এই যুগেই লেখা হয়েছে। প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দি ট্যাটলার' (The Tatler) প্রকাশিত হয়েছে ১৭০৯ সালে। ১৭১৯ সালে প্রথম কাল্পনিক ভ্রমনকাহিনী তথা রম্যরচনা রবিনসন ক্রুশো (Rabinson Crusce), ১৭২৬ সালে ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিদ্রুপাত্মক কাহিনী 'গলিভারের ভ্রমনকাহিনী' (Gulliver's Travels), ১৭৪০ সালে প্রথম উপন্যাস 'প্যামেলা' (Pamela), ১৭৪৭ সালে প্রথম ইংরাজী অভিধান (The Dictionary of the English Language), ১৭৪৮ সালে প্রথম সার্থক সমাজবিরোধী প্রবণতার কাহিনী বা পিকারেস্ক নভেল (Picaresuqe Novel) 'রোডেরিক র‍্যাণ্ডমের অভিযানগুলি' (The Adventures of Roderick Random), ১৭৬৪ সালে প্রথম আতঙ্কসৃষ্টিকারী নভেল বা Terror Novel

'অটরাণ্টোর দুর্গ' (The Castle of Otranto) ;—এ সবই এ যুগেই লেখা হয়। শেক্সপীয়র সম্পর্কে প্রথম স্বচ্ছ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ১৭৬৫ সালে প্রকাশ করেন ডঃ জনসন। ১৭৭৬ সালে প্রকাশ পায় ইংরাজী ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস গ্রন্থ 'রোমক সাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংস' (The Decline and Fall of the Roman Empire)। ওই একই বছরে ইংরাজী ভাষায় প্রথম অর্থনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থ 'জাতিসমূহের সম্পদ (The Wealth of Nations) প্রকাশিত হয়। ইংরেজ বিদ্বজ্জনসমাজে 'সাহিত্য চক্র'ও (Dr. Johnson's Circle) এই যুগেই প্রথম দেখা যায়। ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম জীবনীগ্রন্থ 'ডঃ স্যামুয়েল জনসনের জীবনী' (The Life of Dr. Samuel Johnson) লেখা হয ১৭৯১ সালে। কাজেই ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগের গুরুত্ব অনেক।

এই যুগে প্রথম থেকেই কাব্যেব আয়তন ও চরিত্র পূর্ববর্তী যুগের (১৫৭৫-১৬৫০—আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত) থেকে আলাদা রকমের। শুরুতেই দেখা যায ছোট ছোট কবিতা লেখার দিকে ঝোঁক এসে গেছে। বৈচিত্র প্রকাশ পেতে থাকল নতুন নতুন দিকে। রাজার স্তুতিবাদ নয় ; বিভিন্ন কবির ক্ষেত্রে খোলাখুলি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা চলতে লাগল। মিলটনের ক্ষেত্রে মহান ব্যতিক্রম ছাড়া আবেগের আন্তরিকতা এবং গভীরতা অনেকের ক্ষেত্রেই বোঝা যাযনি। চমকপ্রদ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা মানুষের প্রশংসা আদায় করে ছেড়েছে, কিন্তু মুগ্ধতা সৃষ্টি হযনি।

কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে সম্ভ্রম উদ্রেককারী, গুরুভার এবং আশ্চর্য সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা মিলটনের কাব্য এবং ড্রাইডেনের প্রাণবন্ত, পৌরুষব্যঞ্জক কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কাব্য থেকে এক অত্যন্ত স্বতন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টি করল। প্রচণ্ড স্বতোৎসারিত উৎসাহের বদলে এল প্রাচীন ক্লাসিক কবিদের অনুকরণ ; কিন্তু তা ব্যক্ত হল বিষয ও প্রকাশ ক্ষমতার সুন্দর সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে। ড্রাইডেনের কবিতায় পাওয়া গেল হালকা পলিস্তরের ঠিক নিচেই মার্বেল পাথরের সুদৃঢ় গাঁথুনি।

কবি ডনের কথা আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে। তাঁর উত্তরসূরীদের সাহিত্যের ইতিহাসে আধিবিদ্যক (Metaphysical) কবি বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এঁদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা ছড়িয়ে রযেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এধারে-ওধারে। শক্তিশালী কিন্তু সংযত দার্শনিক চিন্তা, প্রবল আবেগ, অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্মকৌশল, অভাবনীয দূরান্বিত উপমা এই সব কবিদের বৈশিষ্ট্য।

এরই সঙ্গে রয়েছে 'ক্যাভেলিযার' কবিদের কবিতা,—ইংরাজী ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সরল সুষমামণ্ডিত ছোট ছোট প্রেমের কবিতা।

পদ্যের গঠনে ধীরে ধীরে পাঁচমাত্রার আইয়াম্বিক (Iambic) ছন্দের শ্লোক প্রায় একাধিপত্য পেয়ে গেল। আবার, এই যুগেরই প্রথম দিকে গম্ভীর জলস্রোতের মত মুক্তক ছন্দের যে ব্যবহার মিলটনের কাব্যে বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল, তা ধীরে ধীরে কষ্টার্জিত, দুর্বল, একঘেয়েমিতে নিঃশেষ হয়ে গেল।

তবে আমাদের আলোচ্য যুগের শেষ পর্যায়ে কবিতা নতুন এক সাহিত্যিক মান অবলম্বন করার জন্য স্বেচ্ছায় স্থান পরিবর্তন করল। বার্নস (Robert Burns ১৭৫৯-৯৬), ব্লেক (William Blake ১৭৫৭-১৮২৭), ম্যাকফারসন (James Macpherson ১৭৩৬-৯৬) এবং চ্যাটারটনের (Thomas Chatterton ১৭৫২-৭০) হাতে পরবর্তী যুগের বিখ্যাত রোমাণ্টিক কবিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। কবিতার নতুন আদল তৈরী হতে লাগল নতুন যুগের কবিদের হাতে। আর একই সঙ্গে, এই যুগেরই শেষ দিকে, অন্ত্যমিলযুক্ত দুই দুই চরণের শ্লোক পরিত্যক্ত হতে থাকল।

গদ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু একাদিক্রমে প্রায় দুই শতক ধরে ভিন্ন ছবি পাওয়া গেল। যত দিন যেতে লাগল গদ্যের শক্তিশালী আবির্ভাব ও প্রসার তত বেশী বেশী করে বোঝা যেতে থাকল।

আগেই বলা হয়েছে গদ্যের তিন ধরনের ষ্টাইল প্রথম দিকে খুব স্পষ্ট ছিল। স্যার টমাস ব্রাউন (Sir Thomas Browne ১৬০৫-৮২) এবং জেরেমি টেলরের (Jeremy Taylor ১৬১৩-৬৭) ইংরাজী আলঙ্কারিক। এতে সুন্দর সারিবদ্ধ শব্দের একটা মোহ্ এবং গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়েছে। আইজাক ওয়ালটনের (Izaac Walton ১৫৯৩-১৬৮৩) ইংরাজী তাঁর যুগের তুলনায় বেশ সরল এবং কথোপকথনের ভঙ্গীতে লেখা। হবসের 'দি লিভিয়াথানের' ভাষা এই দুই-এর মাঝামাঝি। পরবর্তীকালের মেকলেব (Thomas Babington Macaulay ১৮০০-১৮৫৯) উচ্চনিনাদী, আবেগময় সুন্দর ভাষার উৎস কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে পাওয়া যায়নি। আবার, এই সপ্তদশ শতাব্দীতেই জন বিনিয়নের (John Bynyan-১৬২৮-৮৮) ভাষা কৃত্রিমতাবর্জিত সহজ এবং শক্তিশালী। ড্রাইডেনের গদ্য ছিল প্রাণবন্ত এবং প্রাঞ্জল।

আমাদের আলোচ্য যুগের প্রায় শেষ দিকে নভেলের উদ্ভব। স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samual Richardson ১৬৮৯-১৭৬১), হেনরী ফিল্ডিং (Henry Fielding ১৭০৭-৫৪), লরেন্স স্টার্ন (Laurance Sterne ১৭১৩-৬৮), হোরেস ওয়ালপোল (Horace Walpole ১৭১৭-৯৭), টবিয়া স্মলে (Tobias Smolett ১৭২১-৭১), এ্যান র‍্যাডক্লিফ (Ann Radcliffe ১৭৬৪-১৮২৩)—একে একে অতিকায় ও অতিজনপ্রিয় উপন্যাসধারার সৃষ্টি করলেন, যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও, শুধু ইংরাজী সাহিত্যেই নয়, সব সাহিত্যেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক পাঠককে ধরে রেখেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে স্যামুয়েল জনসন বা ডঃ জনসন (Dr. Johson ১৭০৯-৮৪) সাহিত্যের সকল অংশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। বিশেষ করে, আবেগবর্জিত, পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সমালোচনায় এবং নানা ধরনের সাহিত্য আলোচনায় তিনি এক স্তম্ভিত বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রথম ইংরাজী অভিধান প্রণেতা (Dictionary—১৭৫৫)। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এখনও বহু বানান তিনি যা করে গেছেন তা-ই রয়ে গেছে।

গদ্যে যোশেফ এডিশন (Joseph Addison ১৬৭২-১৭১৯) এবং স্যার রিচার্ড স্টিল (Sir Richard Steele ১৬৭২-১৭২৯) ইংরাজী সাহিত্যে সাময়িক পত্রিকা প্রবর্তন করে এবং সমসাময়িক বিষয়ের উপর রচনা লিখে একটা বড় ঘাটতি শুধু পূরণ করে দিলেন তা-ই নয়, বিশ্বসাহিত্যের বিশালতার একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক সৃষ্টি করে দিলেন।

শেক্সপীয়রের এবং তাঁর ঠিক আগের ও ঠিক পরের যুগের অসাধারণ রোম্যান্টিক নাটকের আদর্শ আর কোনদিন উৎসাহের সঙ্গে অনুসরণ করা হয়নি। তবে 'রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার' পর থেকে 'পুণঃপ্রতিষ্ঠার কমেডি' (Restoration Comedy) লেখা হয়েছে, অভিনীত হয়েছে এবং জনসাধারণের অনুমোদন পেয়েছে।

অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নাটকের জনপ্রিয়তা Restoration Comedy-র ধারা অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই ধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে দুজন কৌশলী নাট্যকার জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে পেরেছিলেন। এঁরা হলেন অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith ১৭২৮-৭৪) এবং রিচার্ড ব্রিন্সলি শেরিডান (Richard Brinsly Sheridan ১৭৫১-১৮১৬)।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

কবিতা

প্রথমে কবিতার কথাই ধরা যাক। আধিবিদ্যক (Metaphsical) কবি ও কবিতার সম্বন্ধে দু'এক কথা আধনিক যুগের দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে। এঁরা ছিলেন জর্জ হারবার্ট (George Herbert ১৫৯৩-১৬৩৩), টমাস ক্যারু (Thomas Carew ১৫৯৪-১৬৩৯), রিচার্ড ক্রশ (Richard Crashaw ১৬১৩-১৬৪৯), আব্রাহাম কাউলে (Abraham Cowley ১৬১৮-৬৭), অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল (Andrew Marvell ১৬২১-৭৮) এবং হেনরী ভন (Henry Vaughan ১৬২২-৯৫)। এ ছাড়া এঁদের সমসাময়িক ছিলেন 'ক্যাভেলিয়র' কবিরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজন। রবার্ট হেরিক (Robert Herrick ১৫৯১-১৬৭৪), জন সাকলিং (Sir John Suckling ১৬০৯-৪২) এবং রিচার্ড লাভলেস (Richard Lovelace ১৬১৮-১৬৫৮)। এঁদেরও নাম ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আধিবিদ্যক কবিদের নানা বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে যেটি সবচেয়ে নজরে পড়বার মত সেটি ছিল কনসিট (Conceit) বা অভাবনীয় দূরান্বিত উপমা।

অধিবিদ্যা বা মেটাফিসিক্স (Metaphysics) স্থিতি ও প্রজ্ঞাবিষয়ক দর্শন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের এই বিশেষ দর্শনের ফলিত প্রকাশ ঘটেছিল বিশেষ কয়েকজন কবির মধ্যে। এঁদের প্রেরণা ছিলেন প্রধানতঃ কবি ডন (John Donne ১৫৭৩-১৬৩১)। ডনের কথা আমরা এই আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্বে বলেছি। ধর্মীয় কবিতা ও প্রেমের কবিতায় ডনের উত্তরসূরীরা যেন এক বিশেষ সাধনায় স্বয়ং-নিয়োজিত ছিলেন। কবিতায় এঁরা এক নতুন ধরনের উপমালঙ্কারের ব্যবহার এনেছেন, যা অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ। ভাষা সরল কিন্তু গভীর তত্ত্বসমন্বিত। তত্ত্ব সত্ত্বেও কবিতাগুলির স্বাভাবিক সুষমা খণ্ডিত হয়নি। কবিতাগুলি ভাবসম্পৃক্ত হলেও বুদ্ধির বিচ্ছুরণ পাঠককে সচকিত করে। গীতিকবিতার আবেগ ও কথোপকথনের সচরাচরতা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। রোম্যান্টিক আত্মবিকাশ অ-গতানুগতিক।

এখানে আমরা তিনজন আধিবিদ্যক কবির সম্বন্ধে দু'এক কথা বলব।

জর্জ হার্বার্ট (George Herbert) ১৫৯৩-১৬৩৩

বিশিষ্ট পণ্ডিত ও রাজা প্রথম জেমসের প্রিয়পাত্র। জীবনের শেষ তিন বছর ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্মসংঘের পুরোহিত ছিলেন। কবিতা তাঁর কাছে শুধু একটি বিশেষ শিল্পকলা ছিল না,—তা ছিল ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হৃদয়ের ভক্তিরস। তাঁর ভাষা ছিল আটপৌরে ও প্রাণবন্ত। শব্দ সাজানতে নতুনত্ব ছিল। বক্তব্য বিষয়কে তিনি প্রায়ই চিত্রকল্পের মাধ্যমে উপস্থিত করতেন, যাতে করে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে তাঁর আবেদন খুব স্পষ্ট হয়।

তাঁর কবিতা সব সময়েই একজন সাধু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির পরিচয় বহন করে।

'মন্দির' (The Temple) তাঁর সব চেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। 'নৈতিক সদগুণ' (Virtue)

তাঁর আর একটি পরিচিত কবিতা। এটি চার চার লাইনের চারটি স্তবকে লেখা। প্রতিটি স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় লাইনে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে অন্ত্যমিল আছে।

কবিতাটির মূল বক্তব্য : জগতের সব সুন্দর জিনিষেরই ধ্বংস ও মৃত্যু আছে, কিন্তু নৈতিক সদগুণ বা ব্যক্তির নৈতিকতা অমর।

সুন্দর দিনের মৃত্যুতে (সমাপ্তিতে) শিশির অশ্রুপাত করে, সুন্দর গোলাপের মূল প্রোথিত আছে সমাধির অভ্যন্তরে, বসন্ত যা আলো ও ফুলের সমাবেশ তা চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু সদগুণমণ্ডিত আত্মা মৃত্যুকে পরাঙ্মুখ করে।

বর্ণনার অদ্ভুত নতুনত্ব আমাদের অবাক করে দেয়।—শিশির কাঁদে ; গোলাপের রং ক্রুদ্ধ ও সাহসী ; বসন্ত মধুর দিন এবং গোলাপকে একই ধারকে ঠাসাঠাসি করে রাখে ; পূণ্য আত্মা যেন পোড়খাওয়া সারাল কাঠের মত,—ইত্যাদি।

মেটাফিসিক্যাল কবিরা এমন কিছু এবং এমনভাবে কিছু বলতে চেয়েছেন যা তেমন ভাবে এর আগে বলা হয়নি। সে দিক থেকে হার্বাটের এই কবিতাটিতে নতুন কিছু বলা হয়নি, তবে নতুন ভাবে পুরানো কথা বলা হয়েছে।

মেটাফিসিক্যাল কবিতার আর একটি উদ্দেশ্য,—শব্দের বোধ নির্ণয়ের জন্য পাঠকের মনকে নতুনভাবে আকৃষ্ট করা। এই কবিতায় তা হয়নি ; শুধু মূল বক্তব্যকে বিশদ করে বোঝান হয়েছে। আসলে, শব্দের ব্যবহারের দিক থেকে যা হয়েছে তা হল প্রত্যাশিত স্থানের পরিবর্তন। হার্বাটের এই কবিতাটি সর্বতোভাবে মেটাফিসিক লক্ষণাক্রান্ত নয়। তা ছাড়া, 'দূরান্বিত' উপমার উপস্থাপন এই কবিতায় করা হয়নি।

পবিত্রতা এই কবিতাটির মুখ্য বিষয়।

এণ্ড্রু মার্ভেল (Andrew Marvell) ১৬২১-৭৮

এণ্ড্রু মার্ভেল ছিলেন পিউরিটান। মিলটনের মত তিনিও পিউরিটান শাসনব্যবস্থায় উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি মিলটনের হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁর পিউরিটান ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি সৌন্দর্যানুভূতি ও কাব্যসাধনা বজায় রেখেছিলেন। অন্যান্য পিউরিটানদের মত তিনি জীবন থেকে আনন্দকে বহিষ্কার করেন নি। র‍্যানেইসঁসের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ এবং ধর্মবিশ্বাস দুই-ই তাঁর চরিত্রের গঠনমূলক উপাদান। প্রকৃতি থেকে তিনি যে আনন্দ আহরণ করেছিলেন তা গতানুগতিক রাখালিয়া কবিতার (Pastoral Poems) রীতিতে নষ্ট হয়ে যেতে দেননি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর কাছে লক্ষ্যে পৌঁছানর উপায় নয়,—তা নিজেই নিজেতে সার্থক।

মার্ভেলের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনশীলতা (sensuousness) তাঁর ভিতরে যেন কীটসকে (John Keats ১৭৯৫-১৮২১) প্রত্যক্ষ করায়। কিংবা নির্মল প্রশান্তি ওয়ার্ডসওয়ার্থের (William Wordsworth ১৭৭০-১৮৫০) ধারণা এনে দেয়। স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত পিউরিটান 'পিলগ্রিম ফাদার্সদের (Pilgrim Fathers—১৬২০) শান্ত, পবিত্র সঙ্গীত যেন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। রাজনীতিতে মার্ভেল ছিলেন ক্রমওয়েলের পরম ভক্ত।

ডনের (John Donne ১৫৭৩-১৬৩১) আপাত কামনাতুর অতীন্দ্রিয় রহস্য তিনি সহজ স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে।

"লজ্জাবতীকে' (To his Coy Mistress) এরকম একটি খুব ভাল কবিতা। ৪৬ লাইনের মাঝারি দৈর্ঘের কবিতা। একটানা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ২৩টি শ্লোক।

"আমাদের জীবন চিরস্থায়ী নয়। তা যদি হত তোমার সঙ্কোচকে আমি কোন দোষ দিতাম না। আমরা আমাদের সুদীর্ঘ জীবনে যে যেখানেই থাকতাম—প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত—জানতাম যে আপাত প্রত্যাখ্যান সুদূর ভবিষ্যতে সম্মতিতে রূপান্তরিত হবে। অতি ধীর গতিতে বহুযুগ ধরে আমি তোমার হৃদয় জয় করতাম। জানতাম যে তুমি সেই প্রকাণ্ড প্রেমেরই উপযুক্ত। কিন্তু তা হয় না।

'সমুখে মরুর মরীচিকা ডাকে,
প্রলয় পয়োধি গরজে পাছে।।' —[সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

তারপর একদিন তুমি সমাধির মর্মর আবরণের নীচে শায়িত হবে। আমার গান আর তোমার কাছে পৌঁছাবে না। তখন কোথায় যাবে তোমার পবিত্র কৌমার্য। ধূলিতলে হবে ধূলি; ঘৃণ্য কীট তোমার দেহকে নিঃশেষ কববে। সমাধির সেই গোপন আশ্রয়ে কেউ তোমাকে আলিঙ্গন করবে না। ব্যর্থ হবে তোমার জীবন।

কিন্তু এখনও তোমার যৌবন আছে। এখনও প্রভাতের শিশিরের মত তোমার গাত্রবর্ণ। এখনও তোমার গাত্ররন্ধ্র থেকে আগুন বিচ্ছুরিত হয়। আমার একান্ত অনুরোধ, জীবনের দাবীকে উপেক্ষা কোরো না। সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। অনড় নিস্পন্দ থেকে কেন মৃত্যুর শিকার হব। প্রেমের তরঙ্গে জীবন স্পন্দমান হোক।"

'সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
সত্য কেবল পশুর মত মনের বালাই
ঝেড়ে ফেলে বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা।।' —[সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

আমার এই ভাবানুবাদ থেকে পাঠক সেই ক্লাসিক দর্শন, Carpe Diem,—যা হালকা সুরে বলা হয়েছে,—'হেসে নাও দুদিন বই তো নয়,' তা উপলব্ধি করবেন।

—Enjoy Love while you can

আর, সময় সংক্ষিপ্ত, প্রেমকে উপেক্ষা করো না,—এ আপ্তবাক্যেরও সন্ধান পাবেন।

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।।

আর এখানে, 'Coyness' বা সচ্চরিত্রতা বজায় রাখার জন্য আকুতির বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখান হয়েছে তা ঘুরিয়ে নায়িকার সুশীলতারই প্রশংসা। এইটিই এখানকার 'Irony' বা ত্রুটি দেখানোর ছলে বরণীয়তার স্বীকৃতি।

হেনরী ভন (Henry Vaughan) ১৬২২-১৬৯৫

হেনরী ভন ছিলেন ওয়েলসের অধিবাসী, চিকিৎসক। ঈশ্বরের সাযুজ্য, জন্মমৃত্যু, শিশুর এই জগতে আগমন, স্বর্গে তার পূর্বজীবন, এবং প্রকৃতি,—এই সব নিয়ে তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতায় অনেকেই নতুন কিছু খুঁজে পান না, বা স্পষ্ট করে বলতে গেলে তা বৈশিষ্ট্যহীন। মূল কথাটা ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস এবং তাঁর উপরে নির্ভরতা।

ঈশ্বরে ভক্তি যেমন ছিল, প্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতাও তেমনি খাঁটি। কাব্যকুশলতায় তিনি ততটা প্রসিদ্ধ নন, কিন্তু মুগ্ধ, গভীর অনুভবের ক্ষমতা তাঁর ছিল,—এবং তা-ই তাঁর কবিতাকে পবিত্র করেছিল। সাধারণ, বহুকথিত বিষয়ে তিনি নতুন নতুন চিত্রকল্প আরোপ করেছিলেন। আর, অন্যান্য মেটাফিসিক্যাল কবিদের মত তিনি আপাত অ-সংযুক্ত কথা বা বর্ণনাকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। এতে অনেক পুরানো কথা নতুন শুনিয়েছে।

তাঁর 'ফিরে যাওয়া' (The Retreat) কবিতাতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Willium Wordsworth ১৭৭০-১৮৫০) "Immortality Ode" এর আভাষ পাওযা যায়।

এই কবিতাটি পাঠক মহলে সমাদর পেয়েছে। এটি ৩২ লাইনের কবিতা। ১৬টি শ্লোক। লাইন দুটির শেষে স্বাভাবিকভাবে মিল থাকলেও অর্থ ও ভাব, এক শ্লোক থেকে আর এক শ্লোকে সঞ্চারিত হযেছে। এটি চারমাত্রার আইয়্যাম্বিক ছন্দে বা রোম্যাণ্টিক ছন্দে লেখা।

কবি মরজীবনে আসবার আগে স্বর্গে দেবশিশু হয়ে ছিলেন। মর্তজীবন যেন তাঁর দ্বিতীয় জীবন। শিশু বয়সে তিনি অল্পদিন আগে পিছনে-ফেলে-আসা ঈশ্বরের উজ্জ্বল মুখ যেন দেখতে পেতেন। প্রকৃতির নানা বিকাশের ভিতরে ঈশ্বর এবং অসীমের ছায়া দেখতে পেতেন। তারপর যত বড হয়ে উঠতে লাগলেন, সংসারের নানা কলুষ-কালিমার সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হযেছে। তবুও এক অনন্তের আস্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। এখন তিনি পুবানো রাস্তা ধরে ধরে ফিরে যেতে চান স্বর্গরাজ্যে। সেখান থেকে পামবীথি শোভিত জেরুজালেমের পবিত্র তীর্থকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এই থেকেই কবিতাটির নাম 'ফিরে যাওয়া'—The Retreat'।

আবার তিনি বলছেন,—এ জগতে দীর্ঘকাল থেকে তিনি যেন ফিরে যাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। কিছু মানুষ এই মরজগতের রাস্তাধরেই এগিয়ে যেতে চান; কিন্তু তিনি চান ফিরে যেতে। তিনি আশা করে রযেছেন এই মরজীবন শেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত নিবাসে ফিরে যাবেন।

এখানে আমরা তিনজন আধিবিদ্যক (Metaphy·ical) কবির কথা বললাম এবং তাঁদের একটি করে কবিতার আলোচনা কবলাম।

এরপরে আমরা চলে যাব মিলটনের কথায়। মেটাফিসিক্যাল কবিরা বয়সে মিলটনের থেকে কেউ বড়, কেউ ছোট।

মিলটনের গদ্য সম্বন্ধে দু'এক কথা আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং এখন ষাটের দশকের মিলটনের কথায়, বিশেষ করে তাঁর কাব্যের কথায়, এসে গেলে তবেই রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার (১৬৬০) সময়ের সঙ্গে আমার এই ধারাবাহিক বর্ণনার যোগাযোগ রাখতে পারব।

তবে মিলটনের কাব্য আলোচনার আগে আমি 'মহাকাব্য' সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে নোব।

মহাকাব্য (Epic)

ভারতবর্ষে বিশাল ও কালোত্তীর্ণ দুটি মহাগ্রন্থকে আমরা মহাকাব্য বলে থাকি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই দুটি গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত। তবে ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ এ দুটিকে মহাকাব্য বলেন নি। প্রাচীন ভারতে মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা অতি দীর্ঘ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পুরাণে বর্ণিত অতি বিখ্যাত বৃত্তান্ত এবং প্রধান কোন দেবতা, সদ্বংজাত কোন ক্ষত্রিয়, ধীর উদাত্ত গুণান্বিত কোন রাজা বা রাজবংশ অবলম্বনে কয়েকটি সর্গে বিভক্ত কাব্যের নাম হবে মহাকাব্য। এই সংজ্ঞা অনুসারে 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', এবং অনুরূপ আর কয়েকটি কাব্যকে মহাকাব্য বলা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য,—এই সবগুলির সমাহার। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত শুধু মহাকাব্য নয়,—আরও অনেক কিছু। তবে সর্বজনস্বীকৃত ভাবে ভারতবর্ষে এই দুই মহাগ্রন্থ মহাকাব্য বলেই পরিচিত।

রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির এপিকের (Epic) মিল আছে। পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকগণ রামাযণ ও মহাভারতকে 'এপিক' বলে থাকেন।

এ্যারিষ্টটল (Aristotle—মৃত্যু ৩২২খৃঃ পূঃ) এপিকের (Epic) যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে 'এপিকের' ঘটনাপ্রবাহ (Action) হবে একক, সমগ্র ও মহান (One, entire and great)। 'একক' বলতে মূল বা প্রধান বা কেন্দ্রীয় ঘটনা বোঝায়। অন্য ঘটনা এই মূলঘটনার চারধারে আবর্তিত হতে পারে, কিন্তু মূল ঘটনার সমকক্ষ হতে পারে না। ঘটনাপ্রবাহ 'সামগ্রিক' হবে বলতে বোঝায় যে এর আরম্ভ, মধ্যভাগ ও সমাপ্তি অংশ থাকবে। ঘটনাপ্রবাহ যে 'মহান' হবে তা তার প্রকৃতি ও স্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করবে।

এপিকে বর্ণিত চরিত্রগুলি হবে সংখ্যায় বেশী। তাদের নতুনত্ব থাকবে এবং বৈচিত্র থাকবে। প্রধান চরিত্রগুলি হবে ভয় ও শ্রদ্ধা উদ্রেককারী মর্যাদাপূর্ণ চরিত্র। চরিত্রগুলি হবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এপিকের ভাষা হবে সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গী থেকে আলাদা অর্থাৎ মহিমান্বিত। এই ভাষা আলঙ্কারিক হবে। এতে অন্য ভাষার বাগ্‌বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হবে। এতে প্রয়োজনমত বহিরাগত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ প্রযুক্ত বা পরিত্যক্ত বা দীর্ঘায়িত করা হবে।

এই ভাষায় প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য বজায় রেখে আবেগ ও অনুরক্তি থাকবে এবং কাব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নতমানের নৈতিক বোধ ব্যক্ত হবে।

এপিকে কোন রঙ্গ-কৌতুক থাকবে না। এপিকে ঐকান্তিকতা এবং গাম্ভীর্য থাকবে, এবং এর ভিতরে কোন ফাঁক বা শূণ্যতা থাকবে না।

এপিকের সর্বাত্মক ও সর্বকালীন আবেদন থাকবে। এপিক সমগ্র মানুষজাতির কাছে সাগ্রহে বরণীয় হবে। সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতিগত মর্যাদাবোধ তার ভিতরে প্রতিবিম্বিত হবে।

এপিকের 'নায়ক' থাকবে। নায়ক ভারতীয় আদর্শের মত উদাত্ত বা মহান হবে।

এপিকের কবির তথ্যগত পরিচয় এপিকে ব্যক্ত হবে না। বর্ণিত চরিত্রগুলির কার্যকলাপই আসল বস্তু। অবশ্য সেখানে অপ্রত্যক্ষভাবে রচয়িতার অস্তিত্ব মিশে থাকবে।

পশ্চিমী জগতের শ্রেষ্ঠ এপিক রচয়িতারা হলেন হোমার (Homer—Iliad and Odyssey), ভার্জিল (Virgil-Aeneid মৃত্যু ১৯ খ্রীঃপূঃ), দান্তে (Alighieri Dante—Divina Commedia ১২৬৫-১৩২১)

এছাড়া রয়েছে প্রাচীন এ্যাংলোস্যাকসন মহাকাব্য 'বীওউলফ' (Beowulf) এবং মিলটনের Paradise Lost।

হাডসন (W. H. Hudson) এপিককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: 'আদিম এপিক' (Primitive Epic) বা 'ক্রমবর্ধিত এপিক' (Epic of Growth) এবং 'পরবর্তীকালের এপিক' (Later Epic) বা 'শিল্প হিসাবে এপিক' (Epic of Art)।

'প্রিমিটিভ এপিক' কোনও একজন গ্রন্থকর্তার লিখিত নয়। তা বিবর্তনের এবং বহুজনের কাজের মিলিত ফল। এই ধরনের এপিকের উৎস পুরাকাহিনী এবং জনসাধারণের ভিতর প্রচলিত কবিতা ও গাথা। ওই সব কাহিনী ও কবিতাসমূহের সংগৃহীত রূপ প্রিমিটিভ এপিক।

কিন্তু 'পরবর্তীকালের এপিক'—যা ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি তাতে একজন কবিরই বিশিষ্ট শিল্পবোধ ব্যক্ত হয়েছে। মিলটনের 'স্বর্গ থেকে পতন' (Paradise Lost) এই জাতীয় এপিক। এতে ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্য ও যুগের সাহিত্যিক সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়।

জন মিলটন (John Milton) ১৬০৮-৭৪

মিলটন সুশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তিনি লণ্ডনে ও কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করেছিলেন। সাহিত্য ছাড়া তিনি সঙ্গীত এবং গণিতশাস্ত্রের চর্চাও করেছিলেন। গৃহযুদ্ধের প্রথম দিক থেকেই তিনি রাজার বিশেষ অধিকারের বিরোধিতা করেছিলেন। সকল ব্যাপারে সকল অবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। বক্তব্যের অধিকার, বিশ্বাসের অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার—সবেতেই তিনি ছিলেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী। তাঁর প্রতিটি লেখায় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ—যে কোন ভাবেই হোক—তেজস্বিতার সঙ্গে তিনি তাঁর স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করে গেছেন।

এমনকি যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক মতামতের অনুষঙ্গী তাদের মাঝখানেও তিনি ধর্মীয় মতামতে ছিলেন নিঃসঙ্গ, একক, স্বাধীন। শেষ জীবনে ক্রমে ক্রমে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তখন তিনি এরিয়ান (Arianism) মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, যাতে যীশুরও পূর্ণ ঐশ্বরিকতা মানা হয় না। ঈশ্বর আর তাঁর নিজের মাঝখানে তিনি স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাতকারী কোন ব্যবধান রাখতে চাননি।

শেষ জীবনে চরম দারিদ্র, বঞ্চনা ও হতাশার মাঝখানে তিনি পর্বতের মত অটল থেকেছেন। কোন নিন্দা কোন প্রশংসা, কোন শাস্তি কোন পুরস্কার, কোন স্বীকৃতি কোন অবহেলা,—ঈশ্বরে তাঁর লৌহদৃঢ় বিশ্বাস, সত্যে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, মানুষের মহত্ত্বের

অস্তিত্বে তাঁর অকল্পনীয় অনুভূতি থেকে তাঁকে এতটুকুও টলাতে পারেনি। মিলটন শুধু মহাকবি নন, মানবীয় মহত্ত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন।

জীবনের শেষের কয়েক বছর মানসিক যন্ত্রনা ও দারিদ্র সত্ত্বেও তিনি অবিচলিত, শান্ত, সরল জীবন যাপন করেছেন। আলিপুর কোর্টে তাঁর বিচারের সময়ে ঋষি অরবিন্দের যে শান্ত, সমাহিত মূর্তির কথা আমরা শুনেছি, মিলটন প্রসঙ্গে সেই মূর্তির কথাই আমার মনে ভেসে ওঠে।

প্রতিদিন সকালে হিব্রু বাইবেল থেকে একটি করে অধ্যায় শুনতেন। প্রায় অন্ধত্ব সত্ত্বেও দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। তারপর কিছু ব্যায়াম করতেন, কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, আবার পড়াশুনা শুরু করতেন। সন্ধ্যাবেলায় অতিথি, অভ্যাগতদের সঙ্গে গল্পগাছা করতেন। রাজতন্ত্রের সমর্থকদেরও কেউ কেউ তীর্থযাত্রীর মত তাঁর কাছে আসতেন।

১৬৭৪ সালের ৮ই নভেম্বর মহাকবি লোকান্তরিত হন।

আমরা এখানে প্রয়োজনীয় অবসর ও পরিসরের অভাবের দরুন কেবলমাত্র PARADISE LOST সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু বলব।

স্বর্গ থেকে পতন (The Paradise Lost) ১৬৫৮-১৬৬৭

ইংরাজী সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্য 'স্বর্গ থেকে পতন' (The Paradise Lost)। এই মহাকাব্যেই মিলটনের পূর্ববর্তী যুগের রোম্যান্স এবং অসম্ভব, দুরন্ত কল্পনা, গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য এবং বাইবেলের (জেনিভা বাইবেল ১৫৬০) সুউন্নত, মহিমময় শব্দসম্ভার,—সব এসে একত্রে মিলেছিল। হিব্রু পুরাকাহিনী থেকে আদি মানবের ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার সূত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই সূত্র ধরে যা তিনি লিখেছিলেন তা সর্বাংশে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তাঁর কল্পনাকে তিনি র‍্যানেইসঁসের আলোকিত পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি র‍্যানেইসঁসের শেষ বরেণ্য সন্তান। ঐতিহাসিকগণ Paradise Lost-কে পিউরিটান ধর্মবিশ্বাসের মহাকাব্য বলেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে পিউরিটানরা মানুষকে পবিত্র করতে গিয়ে নিজেরা যে গর্বোদ্ধত হয়েছিলেন তা-ই যেন ব্যক্তিরূপ পেয়েছিল Paradise Lost-এর 'স্যাটানের' (Satan) মধ্যে।

শেক্সপীয়র চেয়েছিলেন মানুষকে তার সামগ্রিক সত্ত্বায়, উজ্জ্বল মানবিকতায়, দেবতার প্রতিরূপ হিসাবে দেখাতে। মিলটনের পরিকল্পনা ছিল সকল মত, বিশ্বাস ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে মানুষকে কলুষমুক্ত করার। যে অনন্ত ভালবাসা চশার এবং শেক্সপীয়রের মহার্ঘ সম্পদ, মিলটনেরও দৃঢ় চরিত্রের ভিতর সেই ভালবাসা অন্তর্লীন হয়েছিল। ঠিক এইখানেই চশার, শেক্সপীয়র ও মিলটন একই সমতলে এসে মিলেছেন। সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যে তাই সর্বজনসম্মতভাবে এঁরা তিনজনই Great,—এঁরাই সকল তুলনার ঊর্ধে।

The Paradise Lost-এর মূল বাণী কি? এই কাব্যের মূল বার্তা তাঁর অপর এক

বিখ্যাত কাব্য 'স্যামসনের প্রচেষ্টা' (Samson Agonistes) থেকে পাওয়া যায়ঃ ঈশ্বর যা করেন তার ন্যায্যতা নতশিরে গ্রহণীয়।

[Just are the ways of God,
And justifiable to men.']

The Paradise Lost প্রকাশের প্রেরণা কি ?

মিলটন তাঁর কাব্যে কোন ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নি। ঈশ্বরের নিদের্শের রহস্যময় অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন। Paradise Lost-এর ভিতর দিয়ে তাঁর সেই অনুভবকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। এটা যুক্তির কথা নয়; ঈশ্বরের নির্দেশকে উপলব্ধি করার কথা। প্লেটোর দার্শনিক চিন্তা এই ভাবেই ব্যক্ত হযেছিল।

Paradise Lost-এর বিষয়বস্তু কি ?

সমস্ত দেবদূতের উপরে পুত্রের (The Son) স্থান নির্দেশ করায় শ্রেষ্ঠতম দেবদূত লুসিফার (পরবর্তী পরিচয় 'স্যাটান' বা 'প্রতিপক্ষ') ক্ষুব্ধ হয। সে নিজে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কলুষিত করে। প্রথম মানুষ 'আদম' প্রলুব্ধ হয়। ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেন ও পরে ক্ষমা করেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

গ্রন্থটি ১৬৬৭ সালে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৬৭৪ সালে একই গ্রন্থকে বার খণ্ডে ভাগ করে পুণঃপ্রকাশিত করা হয। মোট লাইন ১০,৫৬৫ টি। প্রথম খণ্ডে আছে ৭৯৮টি লাইন।

কাব্যটিতে পর পর লাইনগুলিতে কোন মিল নেই। পাঁচমাত্রার আইয়্যাম্বিক (Iambic) ছন্দে লেখা কাব্যটির বিভিন্ন অংশে সঙ্গীতের তালের প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য আছে। কাব্যটি সঠিকভাবে পডলে উচ্চারিত শব্দের আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম তারতম্য ধরা পড়ে। বিভিন্ন শব্দ (Word) এবং সেগুলি দিয়ে তৈরী ধ্বনির পারস্পরিক সামঞ্জস্য অত্যন্ত নিপুণ।

কাব্যটির ১২টি ভাগে কি কি আছে—

প্রথম ভাগ ঃ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে স্যাটানের (Satan)-এর বিদ্রোহ।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ষড়যন্ত্র এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।

তৃতীয় ভাগ ঃ স্যাটানের সমস্ত কাজ অন্তর্যামীর গোচরে থাকা এবং মানুষের প্রলুব্ধ হওয়ার ইঙ্গিত।

চতুর্থ ভাগ ঃ ঈশ্বরকে অমান্য করতে আদম-ইভকে প্ররোচনার পরিকল্পনা। ইভের চিন্তাকে বিপথগামী করার চেষ্টা।

পঞ্চম ভাগ ঃ আদম ও ইভের প্রাতঃকালীন প্রার্থনা। র‍্যাফেল (Raphael অন্যতম দেবদূত) কর্তৃক তাদের স্যাটান সম্পর্কিত তথ্যাদি জ্ঞাপন।

ষষ্ঠভাগ ঃ পূর্বকথাঃ কিভাবে ঈশ্বরের পুত্র বিদ্রোহী দেবদূতেদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সপ্তম ভাগ	ঃ	স্যাটানের পতনের পর ছদিনে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি।
অষ্টম ভাগ	ঃ	অ্যাডাম (Adam—আদিমানব) কর্তৃক তার সৃষ্টিবৃত্তান্ত ও আত্মজীবন বর্ণনা।
নবম ভাগ	ঃ	স্যাটান কর্তৃক ইভকে (Evc—আদিমানবী) জ্ঞান বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খেতে বিশেষ প্ররোচনা।
দশম ভাগ	ঃ	ঈশ্বরের পুত্র কর্তৃক এ্যাডাম ও ইভের বিচারের রায় ঘোষণা।
একাদশ ভাগ	ঃ	দেবদূত মাইকেল (Michacl) কর্তৃক বিচারের খুঁটিনাটি জ্ঞাপন। মহাপ্লাবনের সময় পর্যন্ত তাদের মর্তে বাস করবার আদেশ জ্ঞাপন।
দ্বাদশ ভাগ	ঃ	ঈশ্বরের পুত্রের মর্তে আবির্ভাব, এবং আদম-ইভের স্বর্গে ফিরে যাওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদবাণী।

Paradise Lost-কাব্যে মিলটনের ষ্টাইল

মিলটনের কাব্যের ষ্টাইলকে বলা হযেছে বিশাল ও মহৎ। অনেকেই একে সুউন্নীত ষ্টাইল বলে বলেছেন। কারো কারো মতে এই সুউন্নত বা Elevated (এলিভেটেড) ষ্টাইলই Paradisc Lost-এর আকর্ষণের বড কারণ। অসচরাচর শব্দ, প্রাচীন অর্থে আধুনিক শব্দের ব্যবহার, বৈচিত্রসৃষ্টির জন্য এবং বিচিত্র জগতের সম্পর্কে বিস্ময় সৃষ্টি করার জন্য ব্যক্তিনামের বহুল প্রয়োগ এবং নানা প্রাচীন বিষযের উল্লেখ,—ইত্যাদির দ্বারা মিলটন তাঁর কাব্যে এক অসচরাচর ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। নতুনত্ব এবং অপরিচিতির দরুন এই ভাষার একটা চৌম্বক আকর্ষণ সৃষ্টি হযেছিল।

একটানা একটা সুষম সঙ্গীতের মত এই ভাষা আমাদের আবিষ্ট করে।

বিষয়বস্তুর বিশালতাও মিলটনের ষ্টাইলের অন্যতম সহযোগী শক্তি।

আর শেষ কথা এই যে, এই মহাশক্তিশালী কবিব পরম নিষ্ঠা এবং এক রহস্যময প্রভাব, যা ব্যাখ্যা করা যায় না, তা-ই তাঁর কাব্যের স্টাইলের বিশেষত্ব।

আব একটি বিষযের দিকে আমি বোদ্ধা পাঠকপাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হচ্ছে ছান্দস উচ্চারণে মহৎ দেবতাত্মাদের কাছে কাব্যরচনায় সফল হওযার জন্য প্রার্থনা। এর নাম ইনভোকেশন (Invocation)। ক্লাসিক কবিরা এটা প্রচলিত রীতি হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে মহাকাব্যের কবিরা। মিলটনও সেই অনুসারে বিনীত সাহায্য প্রার্থনা দিয়ে Paradisc Lost শুরু করেছেন। তবে এই কাব্যে 'Invocation' আলাদা করে নেই। কাব্যের প্রথমভাগের প্রথম ২৬ টি লাইনেই সেই 'বিনীত সাহায্য প্রার্থনা' রয়েছে।

ইনভোকেশন (Invocation)

[পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের রীতিতে কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাহায্য প্রার্থনা]

গ্রীক কবিদের মতে মহাকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্যালিওপ (Calliopc)। তবে মিলটন ক্যালিওপের কাছে নয়,—ইউর‍্যানিয়ার (Urania) কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। গ্রীক মতে

ইউর‍্যানিয়া জোতির্বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তবে মিলটন যে ইউর‍্যানিয়ার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তিনি গ্রীকদেবী ইউর‍্যানিয়া নন ; তিনি বিজ্ঞতার (Wisdom) স্বর্গবাসী ভগিনী। মিলটনের ক্রিষ্টিয়ান (Christian) বিশ্বাস মতে ইনি সর্বোচ্চস্তরের কাব্যের দেবী।

ইজরায়েলীয়দের (Israelites) সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মোজেস (Moses) এঁর কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। মিলটন খৃষ্টপূর্বকালের গ্রীক বা ল্যাটিন ধারনার কোন দেবদেবীকে স্বীকার করেন নি। ইজরায়েলীয় ধর্মবিশ্বাস খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসের পূর্বসূরী। সুতরাং সেই প্রাচীন ধর্মকে মিলটন এই প্রার্থনাতেও স্বীকার করেছেন।

মিলটনের প্রার্থনা এই যে অদ্যাপি কেউ কখনো যা পূর্ণভাবে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি, তা তিনি করতে যাচ্ছেন। সুতরাং কাব্যের দেবী যেন তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর বিষয়বস্তু ঃ অজ্ঞানতাবশতঃ স্বর্গে মানুষ কর্তৃক ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য, বিশ্বসৃষ্টি, স্বর্গ থেকে মানুষের পতন এবং ঈশ্বরের পুত্রের করুণায় মানুষের শাপমোচন।

মিলটনের কাব্য সম্বন্ধে এই সামান্যতম আলোচনা আমি শেষ করবো উপমা বা 'সিমিলি' (Simile) সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে। The Paradise Lost-এর 'সিমিলি' (Simile) বিখ্যাত।

সিমিলির (Simile) বাংলা নাম 'উপমা'। দুটি পৃথক ধরনের বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে মিল বা সমজাতীয় গুণ এই অলঙ্কারের সাহায্যে দেখান হয়।

উপমা-অলঙ্কারের একটি বিশেষ শাখা 'মহাকাব্যে ব্যবহৃত উপমা' (Epic Simile)। যখন কবি বক্তব্য বিষয়কে অল্পক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে তুলনীয় বিষয়-দুটির মিল বা সমতা বিশদভাবে দেখাতে চান তখন তিনি এপিক সিমিলি (Epic Simile) ব্যবহার করেন। এপিক সিমিলির উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা কল্পনা উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, স্যাটানের প্রকাণ্ড দেহকে তুলনা করা হয়েছে বিশাল তিমি মাছের সঙ্গে (২০৩—২০৮ লাইনে) কিংবা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত বিদ্রোহী দেবদূতেদের ৩০২ থেকে ৩০৪ লাইনে শরতের ঝরা পাতার সঙ্গে এবং ঝড়ের পরে ভেসে যাওয়া সামুদ্রিক ঘাস বা আগাছার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

মিলটন এই জাতীয় উপমা অনেক ব্যবহার করেছেন। এতে তার কাব্যের মর্যাদা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্যামুয়েল বাটলার (Samual Butler) ১৬১২—১৬৮০

বাটলার পুরোপুরি "পুনঃপ্রতিষ্ঠার" (Restoration) যুগের কবি। তাঁর কবিতার বই হুডিব্রাস" (Hudibras) ১৬৬৩ সালে প্রকাশ পায়। 'হুডিব্রাস' ব্যঙ্গাত্মক কাব্য,—পিউরিটানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রুপ। ক্রমওয়েলের আমলে এই বই-এর জন্য হয়ত কবিকে শাস্তি পেতে হত। কিন্তু ১৬৬৩ সালে এবং তার পরেও বইটি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল।

জন ড্রাইডেন (John Dryden) ১৬৩১—১৭০০

ড্রাইডেন ছিলেন পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগের সবচেয়ে সঠিক প্রতিনিধি। তিনি শুধু যে ফরাসী আবহাওয়ায় মানুষ রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিলেন তাই নয়; পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগের বছরই ১৬৫৯ সালে ক্রমওয়েলের প্রশংসা করেও কবিতা লিখেছিলেন। ১৬৮৮ সালে স্বেচ্ছাচারী কিন্তু স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট রাজা উইলিয়াম সিংহাসনে বসলেন। ড্রাইডেন রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলেন। তবে তাঁর সাহিত্যঅনুশীলনের কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি যখন-যেমন-তখন-তেমন মনোভাবের অধিকারী ছিলেন।

এই সময়ে গ্রীক এবং ল্যাটিন ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শকে ইংরাজী কাব্যে পুরোপুরি বজায় রাখার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। এর দ্বারা কাব্যের স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাওয়ার কোন বাধা হয়নি। কিন্তু স্পষ্টভাবে দেশীয় লক্ষণাক্রান্ত কাব্যও হয়নি। তা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাহিত্যজগতের নেতৃত্ব ড্রাইডেনের হাতেই ছিল। কাব্যের নিপুণতা তাঁর সুবিধাবাদী চরিত্রের দোষ পুরোপুরি কাটিয়ে দিয়েছিল।

ড্রাইডেন ব্যঙ্গাত্মক রূপক কাব্য 'আবসালোম এবং একিটোফেল' (Absalom and Achitophel) লেখেন ১৬৮১ সালে। ১৬৮২ সালে প্রকাশিত "ম্যাকফ্লেকনো (MacFlecknoe) এই রকম আর একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গকাব্য।

এই যে 'ব্যঙ্গকাব্য' বা স্যাটায়ারের কথা আমরা বলছি, তার সম্বন্ধে অল্পকিছু গোড়াতেই জানা দরকার। প্রাচীনকালে ইটালিতে দেবী সেরেস-কে (Ceres) বছরের প্রথম নানা জাতের ফল একটি পাত্রে সাজিয়ে উপহার দেবার রীতি ছিল। এই উপহারকে বলা হত "স্যাটুরা ল্যাঙ্কস" (Satura Lanx)। এই "স্যাটুরা" মানে ছিল 'পাঁচমিশালি'। এই 'স্যাটুরা' কথা থেকেই 'স্যাটায়ার' কথাটি এসেছিল। প্রথম প্রথম কুৎসিত ব্যঙ্গকৌতুককেই স্যাটায়ার বলা হত। লেখাও হত গদ্য-পদ্য মিশিয়ে। পরে, ধীরে ধীরে, সাধারণতঃ পদ্যে এবং গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনাকে 'স্যাটায়ার' বলা হতে লাগল।

আরও পরে 'স্যাটায়ার' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সুনীতি ও নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে কোন ভুল সংশোধন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। শেষ পর্যন্ত 'স্যাটায়ার' এমন এক সমালোচনামূলক দক্ষতার ইঙ্গিত দেয় যা মানুষের দুর্বলতার দোষদর্শী, কিন্তু ব্যবহৃত হয় সৃজনশীল সংশোধনের উদ্দেশ্যে। সুতরাং 'স্যাটায়ার' সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ হিসাবে থেকেছে এবং তা থাকা উচিত।

অনেকের মতে স্যাটায়ারের পিছনে কাজ করেছে সেই মেফিষ্টোফিলিসের আত্মা যা দুনিয়ার সব কিছুকেই বিদ্বেষের চোখে দেখে বা অস্বীকার করে। তবে এটা মেনে নেওয়া যায় না।

স্যাটায়ার বটকেরা এবং বিরক্তি দুইই কাব্যের আকারে প্রকাশ করে। হাস্যকর এবং অশোভন বিষয়ের কাব্যসৌন্দর্যযুক্ত সমালোচনাই স্যাটায়ার। হিউমারের (Humour) সঙ্গে স্যাটায়ারকে এক করে দেখা চলে না। হিউমার হচ্ছে রসিকতা। স্যাটায়ারে কটুভাব থাকবেই।

স্যাটায়ার লেখকের ব্যক্তিগত ধারণা, মতামত, অনুভব ইত্যাদি ব্যক্ত করে। যদিও

এর মূল উদ্দেশ্য মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটি সংশোধন তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সরাসরি নীতিশিক্ষা দেবার জন্য লেখা নয়।

স্যাটায়ার নানা ধরণে প্রকাশ করা হয়। ব্যাজস্তুতি (Irony), কটাক্ষ (Innuendo), বক্রোক্তি (Sarcasm), তীব্র অভিযোগ (Invective), নিদারুণ অবজ্ঞা (Scorn), হাস্যকর অনুকরণ (Burlesque), ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ (Mock-heroics),—সবই স্যাটায়ারের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ আক্রমণের থেকে এই সব পরোক্ষ আক্রমণ অনেক বেশী ফলপ্রদ।

স্যাটায়ারের ইতিহাস ঃ

প্রাচীন গ্রীসের গ্রাম্য আমোদপ্রমোদের জন্য বর্বর ধরনের মজাদার নাটক হয়ত স্যাটায়ারের আদি উৎস। প্রাচীন গ্রীসের কমেডি-লেখক এ্যারিস্টোফেনিস (Aristophanes) একে ব্যঙ্গাত্মক কমেডিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সুস্পষ্ট একটি সাহিত্যিক ধরন হিসাবে এটি প্রথম প্রকাশ পায় প্রাচীন রোমের অগাস্টাস (Augustus Caesar প্রথম রোম সম্রাট) যুগে। রোম্যান স্যাটায়ার লেখকদের ভিতর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন হোরেস (Horace মৃত্যু ৮ খ্রীঃ পূঃ) এবং জুভেন্যাল (Juvenal)।

হোরেসের স্যাটায়ার বিজ্ঞবুদ্ধিযুক্ত, স্বচ্ছন্দ, গ্রাম্যতাদোষ থেকে মুক্ত এবং আনন্দদায়ক ছিল। জুভেন্যালের স্যাটায়ার ছিল কিছুটা কঠোর এবং সে কঠোরতা কোন অবস্থাতেই ক্ষমার প্রশ্রয় দেয়নি। তিনি তাঁর সময়ের সমাজে প্রচলিত ত্রুটিগুলির সমালোচনা করেছিলেন। তিনি শুধু রোম্যানদের নয়, সাধারণভাবে মানুষের অহঙ্কারী স্বভাবেরও সমালোচনা করেছিলেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী স্যাটায়ার লেখকগণ কেউ হোরেসকে, কেউ জুভেন্যালকে অনুসরণ করেছিলেন।

মধ্যযুগে স্যাটায়ার ধর্মীয় ও সামাজিক নানা বিষয়কে অবলম্বন করেছিল। সে সময়ে বিখ্যাত ফরাসী স্যাটায়ার লেখকরা ছিলেন ফ্রাঙ্কোই র‍্যাবেলাই (Francois Rabelais ১৪৮৩—১৫৫৩) এবং বোনাভেঞ্চার ডি পেরিয়ার্স Bonaventure de Periers (১৫১০—৪৪)

অনেকের মতে ইংল্যাণ্ডে প্রথম সুচিহ্নিতভাবে জনপ্রিয় স্যাটায়ার লেখক জোশেফ হল (Joseph Hall ১৫৭৪—১৬৬৫)। তিনি পিউরিটানদের বিরোধী ছিলেন। নিঃসর্ত কাব্যিক উৎসাহ এই সময় থেকেই পতনের দিকে চলেছিল। এরপর থেকে সাহিত্যে যেগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল মতিস্থিরতা, যুক্তিবাদিতা, শৃঙ্খলা, বাস্তব জীবনাভিমুখীনতা এবং এক ধরনের দোষদর্শিতা। সুতরাং মানুষও জীবনের খারাপ দিকগুলির বাস্তবানুগ সমালোচনার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

এই স্যাটায়ার ইংরাজী সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি ড্রাইডেনের হাতে আদর্শ রূপ পেয়েছিল।

ড্রাইডেনের কবিতা (স্যাটায়ার)—

১৬৬০ সাল থেকে যে নতুন উদ্যম এবং নতুন আদর্শ ইংরাজী সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল ড্রাইডেনের কবিতা। সে যুগের সবচেয়ে সুষমামণ্ডিত,

সুসম্পূর্ণ এবং নির্ভেজাল কাব্য ড্রাইডেনের হাতেই সৃষ্টি হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই মানের কবিতা সুলভ ছিল না।

কবিতার বাস্তব প্রকৃতি এবং তার কাজ সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা ড্রাইডেনের কবিতার দ্বারাই সংশোধিত হয়েছিল।

সাহিত্যের নতুন প্রবণতাও ড্রাইডেনের কবিতার দ্বারাই তখন বোঝা যেতে লাগল। ঐতিহ্যবান এবং সাময়িক,—উভয় প্রবণতারই প্রভাব ড্রাইডেন সম্পূর্ণ অধিগত করলেন, এবং সেগুলিকে কাব্যের স্তরে টেনে তুললেন।

ড্রাইডেনের কবিতাগুলি কতকগুলি উপলক্ষ্য অনুসারে সঙ্ঘটিত এবং সেগুলি যেন আধুনিক সাংবাদিকতার মত,—এবকম কথা বলা হয়ে থাকে। অথবা, সেগুলিতে যেন বাগ্‌বিতণ্ডার ধূলা উড়িয়ে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক বা গোষ্ঠিগত দলাদলির চরিত্রই প্রধান,—এরকমও বলা হয়। দ্রষ্টা (Seer) বা ভবিষ্যদ্‌বক্তার (Prophet) কোন চিহ্নই যেন তাতে দেখা যায না,—এরকম সমালোচনা অনেকেই কবে থাকেন।

কিন্তু আসলে দেখা যায়, বিষয যাই হোক তিনি যা কিছু স্পর্শ কবেছেন তাকেই শিল্পসুষমা দান করেছেন এবং একটা মানবিক বোধ তাতে সঞ্চারিত কবেছেন। তার থেকেও বড কথা, একটা সতেজ প্রাণবন্ত ভাব তাতে যুক্ত করতে পেরেছেন। রাজনৈতিক বাগবিতণ্ডার ধূলিকেও তিনি কাব্যেব স্বর্ণবেণুতে রূপান্তবিত করেছিলেন। তাঁর যুগের কবিরা তাঁর কাছ থেকেই কাব্যের আদর্শ পেযেছিলেন। তিনি দেখিযেছিলেন কি কবে কোন তুচ্ছ কল্পনা, হালকা তর্ক, লঘু বক্রোক্তি, বা সামান্য শিষ্টাচারকে কাব্যের স্তরে তুলে নেওযা যায। প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটি আব কাব্যের জগতেব মাঝখানে কোন ব্যবধান ড্রাইডেনের অভিধানে ছিল না। কবিতাকে অতিপ্রাকৃতের স্তরে তিনি নিয়ে যান নি। কবিতার অন্তর্নিহিত গূঢসত্ত্বার সম্বন্ধেও তাঁর কোন কৌতূহল ছিল না। অসীমের সন্ধানও তিনি কবেন নি। এমন হতে পারে যে জীবনের সামগ্রিকতা তাঁর অধিগত ছিল না। কিন্তু তিনি জীবনকে অনুভব করেছিলেন অবিচলিতভাবে। হযত তিনি জীবনের শুধু উপরিভাগ দেখেছিলেন, কিন্তু সেটুকুই যে কাব্যের পক্ষে অনুপযুক্ত নয তা-ও তিনি বুঝেছিলেন।

ড্রাইডেন কোন পরমানন্দের দিব্যদৃষ্টি আমাদের উপহাব দেননি। মানুষের সাধারণ কল্পনার বাইবের কোন কিছুর কথা তিনি বলেননি, পার্থিব মূর্তিকে অপার্থিবে রূপান্তরিত করেননি বা সচরাচর অভিজ্ঞতাকে গোলাপী রঙে রঞ্জিত করেননি। কিন্তু যা করেছিলেন তাতে কাব্য ছিল,—খাঁটিকাব্য। আর ছিল তাৎক্ষণিক আবেদনের শিল্পরুচিপূর্ণ আনন্দ। তাঁর কাব্যে তিনি বহিরাগত কোন পদার্থ বা নীতিউপদেশ নিয়ে অসেননি। তাঁর কাব্য আমাদের অনায়াসে নান্দনিক সংবেদনশীলতা অনুভব করায়।

যুক্তি, বুদ্ধি ও শৈল্পিক শৃঙ্খলাবোধের অভাব তাঁর কাব্যের কোন অংশেই নেই। শব্দের উচ্চারণ এবং শব্দের অর্থ, মনোগত চিন্তা ও ভাষাগত প্রকাশ আশ্চর্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংযত ও প্রগাঢ় প্যাটার্নের মধ্যে প্রতিটি শব্দ সুন্দররূপে মানানসই। তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য কখনও অস্পষ্ট নয়। ড্রাইডেনের কবিতায় যথাযথতা এবং প্রাঞ্জলতা, অজটিলতা এবং প্রত্যক্ষতা, ভারসাম্যতা এবং সামঞ্জস্য, যুক্তি এবং সৎবুদ্ধি, পবিচ্ছন্নতা এবং সুষমা,

সুনিয়ন্ত্রিত বলিষ্ঠতা এবং মার্জিত কল্পনার ত্রুটিহীন প্রকাশ দেখা যায়। ড্রাইডেনের কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে এরই নাম 'Wit'—বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার একত্র সমাবেশ। এই 'Wit' ডন (Donne) এবং আধিবিদ্যক (Metaphysical) কবিদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মতৎপরতা নয়, বা অপ্রত্যাশিত সম্পর্কের বোধ নয়,—এটি বাস্তব এবং সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য। ড্রাইডেনের যুগে 'Wit' বলতে বোঝাত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাষা ও চিন্তা, —সতেজ উপলব্ধি এবং তার প্রকাশ—পরিচিত প্রাকৃতিক সত্য।

এর পরে ড্রাইডেনের বিখ্যাত কাব্য 'আবসালোম এবং একিটোফেল' (Absalom and Achitophel)-এর সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

'আবসালোম এবং একিটোফেল' একটি স্যাটায়ার—রূপকের আকারে লেখা। এটি লেখার পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব নিযে রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ভাই এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জেমস ক্যাথলিক ছিল। ধর্মীয় কারণে জেমসকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার জন্য একটি আন্দোলন হয। পার্লামেন্টেও জেমসকে উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব আসে। ড্রাইডেন দ্বিতীয় চার্লস এবং তাঁর ভাই-এর পক্ষে ছিলেন। এবং এই পবিপ্রেক্ষিতে ১৬৮১ সালে বর্তমান স্যাটায়ারটি লেখেন। এই স্যাটায়ারে স্যাফটসবেরি (Shaftesbury) হচ্ছেন একিটোফেল (Achitophel)। তারই পরামর্শে মনমাউথ (Monmouth) সিংহাসনের দাবীদার হয়েছিল। মনমাউথ হচ্ছে কাব্যের আবসালোম (Absalom)। এই রূপক স্যাটায়ারটি মনমাউথ এবং স্যাফটসবেরির বিরুদ্ধে একটি ব্যক্তিগত ব্যঙ্গকবিতা।

এই কবিতায় মিলটনের প্যারাডাইজ লষ্ট-এর ছায়া পড়েছে। এই কবিতার স্যাফটসবেরির (বা একিটোফেল) সঙ্গে 'স্যাটান' (Satan) এর কিছুটা মিল আছে।

এটি পাঁচমাত্রার আইয়্যাম্বিক (Iambic) ছন্দে অর্থাৎ মহাকাব্যের ছন্দে লেখা।

ম্যাথু প্রায়র (Mathew Prior) ১৬৬৪—১৭২১

ম্যাথুপ্রাযর প্রধাণতঃ "পুণঃপ্রতিষ্ঠার" যুগের (১০৬৬—১৭০০) কবি। স্যাটায়ার জাতীয় কবিতায় তাঁর পরিচিতি বেশী, কিন্তু তাঁর কাব্যকৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁর ছোট ছোট গীতিকবিতায়। বড় কবিতাগুলি স্যাটাযারের প্রকৃতি অনুসরণ করেছে; কিন্তু ছোট কবিতাগুলির ভাবপ্রবণ, মধুর অনুভূতি তাঁকে তাঁর পরবর্তী যুগের কবিদের অনেকটাই কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

ড্রাইডেনের 'দি হিন্দ এণ্ড দি প্যান্থার' (The Hind and the Panther) কবিতাকে ব্যঙ্গ করে প্রায়র ১৬৮৭ সালে লিখেছিলেন 'দি হিন্দ এণ্ড দি প্যান্থার ট্র্যানসভার্সড (বিদারিত) (The Hind and the Panther Transvers'd....)। এটি তাঁর স্যাটায়ার জাতীয় কাব্যগুলির অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আমরা চলে যাব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠতম কবি পোপের কথায়।—

আলেকজাণ্ডার পোপ
(Alexander Pope) ১৬৮৮—১৭৪৪

আলেকজাণ্ডার পোপের জন্ম ক্যাথলিক পরিবারে। খ্যাতনামা কোন বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যাপারে সেটা একটা বাধা হয়েছিল। তবে তাঁর পড়াশুনার খুব চেষ্টা ছিল। ছোট বয়সে সাংঘাতিক অসুখ। সারাজীবন প্রায় পঙ্গু অবস্থায় কাটিয়েছেন। ১৭১১ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'The Essay on Criticism' প্রকাশিত হয়। এর পরে তিনি প্রতিভাবান সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি পান। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে 'শেক্সপীয়র' (Shakespeare) সম্পাদনা করেন। 'শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যে বিশিষ্ট পণ্ডিত লুই থিওবাল্ড (Lewis Theobald) ১৭২৬ সালে সেই বই-এর দোষক্রুটি দেখান। এর জন্য ক্রুদ্ধ পোপ লেখেন 'গর্দভনামা' (Dunciad) (১৭২৮)। এতে শুধু যে থিওবাল্ডকে আক্রমণ করা হযেছিল তাই নয়, তখনকার কালের Grub Street-এর (বর্তমান নাম Milton Street) নগণ্য বহুসংখ্যক কবিকেও আক্রমণ করা হয়েছিল। 'চিঠিপত্রাদি' (Epistles) কবিতাগুচ্ছ লেখা হয় ১৭৩১ থেকে ১৭৩৫ সালের মধ্যে। তাঁর নাতিদীর্ঘ স্যাটায়ারগুলি পরে একত্র করে 'হোরেসের অনুকরণ' (Imitations of Horace) নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ১৭৪৪ সালে চিররুগ্ন পোপ মারা যান।

১৭১১ থেকে ১৭৩৪ সালের মধ্যে অনেকগুলি দার্শনিক কবিতা লেখেন। 'An Essay on Man' এইগুলির অন্তর্ভুক্ত। এইসব কবিতার একত্রিত নাম 'দার্শনিক সাহিত্যপ্রচেষ্টাসমূহ' (Moral Essays)। নীতিবাগীশ (Moralist) পোপের সার্থক পরিচয় এই কবিতাগুলি।

পোপের নিজের যুগ একদিক থেকে সুসভ্য ছিল এই অর্থে যে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার দ্বারা আক্রান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাঁকে আইনানুগভাবে বিপর্যস্ত করেন নি। হয কবিতার জবাব কবিতাতেই দেওয়া হয়েছিল, আর নয়ত পোপের আক্রমণকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। কিন্তু ষাট সত্তর বছর বাদে রোম্যান্টিকদের হাতে তাঁর স্মৃতি যথেষ্ট নিগৃহীত হয়েছিল। ওয়ার্টন (Joseph Warton ১৭২২-১৮০০) থেকে কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge ১৭৭২-১৮৩৪) পর্যন্ত অনেক বিদগ্ধ মানুষই পোপের প্রসঙ্গে আদৌ কোন উচ্ছ্বাস দেখাননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আবার পোপের সম্বন্ধে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচারের দৃষ্টি ফিরে আসে। ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold ১৮২২-৮৮) পোপের কাব্যকে ক্লাসিক (Classic) আখ্যা দেননি বটে, কিন্তু সাহিত্যের অন্য বিভাগে পোপকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। লিটন স্ট্র্যাচি (Giles Lytton Strachey ১৮৮০-১৯৩২) এই সব বিচারভঙ্গীকে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন যুগে সাহিত্যিক ধারণার পরিবর্তন বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিতাকে বিচার করতে হবে তার বিচিত্র চরিত্রের কথা স্মরণ রেখেই। মিলটন কবি বলে পোপ কবি হবেন না, এ যুক্তির ভিৎ কাঁচা।

লিটন স্ট্র্যাচি এই প্রসঙ্গে 'সঠিকতা'-র (Correctness) কথাও এনে ফেলেছেন।

যদি সব জায়গাতেই 'সঠিকতা' বলতে 'অতিমাত্রায় গুরুগম্ভীর ভাব' (high seriousness) এবং 'পর্যাপ্ত জীবনবোধবিশিষ্টতা' (Adequate criticism of Life) বোঝায় তাহলে পোপ 'সঠিক' কবি নন। আবার যদি 'সঠিকতা' বলতে 'কোন এক বিশেষ কবির নিজস্ব সৃষ্টি হিসাবে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা' বোঝায় তাহলে পোপ 'সঠিক' (Correct)। তিনি ছন্দ সম্বন্ধে যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছিলেন। কবিতার গঠনের ব্যাপারে এই মূল আদর্শ ছিল সমানমাত্রার ছন্দের একটানা পুণরাবৃত্তি। এটা যদি তিনি বরাবর মেনে চলে থাকেন, তাহলে তাঁকে 'সঠিক কবি' বলতে আপত্তি কেন ?

শেক্সপীয়রের পরবর্তী যুগ থেকে এটা বোঝা যেতে লাগল যে ছন্দের এই একটানা পুণরাবৃত্তি অন্ত্যমিল যুক্ত শ্লোকের আকারেই সবচেয়ে ভালভাবে বজায় রাখা যায়। পোপের কবিতার প্রতিটি শ্লোক ঝঙ্কারের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেগুলির পারম্পর্য যেন দোলনা ঘোড়ার (rocking horse) মত। তবে এক শ্লোকের অর্থগত রেশ পরবর্তী শ্লোকে সঞ্চারিত হবার রাস্তাও খোলা ছিল। ছন্দশাস্ত্রে এরই নাম 'Heroic Couplet' পাঁচমাত্রার আইএম্বিক ছন্দের এক এক জোড়া লাইন। জোড়া জোড়া লাইনের অধিকাংশে 'বিরোধালঙ্কার' (Antithetical elements) এবং লাইনে লাইনে এত বেশী অপ্রত্যাশিত 'সদুক্তি' (maxim) আছে যে শেক্সপীয়র ব্যতীত আর কারও লেখায় প্রবচনের (Proverb) মত বহুলপ্রচারিত এত 'সদুক্তি' (maxim) নেই।

পোপের কবিতায় জটিল অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নেই। পোপের কবিতা পড়তে ভাল লাগে এবং শুনতে ভাল লাগে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক মজার কথা বহুসংখ্যক এবং সেগুলির একটা স্বয়ংক্রিয় চলমানতা আছে।

আমরা এখানে পোপের একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ নিয়ে দু'চার কথা বলতে পারছি। তার বেশী নয়। কাব্যটি 'কেশাগ্রছেদন' (The Rape of the Lock)। এটি ৫টি সর্গে (Canto) বিভক্ত (১৪৮ + ১৪২ + ১৭৮ + ১৭৬ + ১৫০) ৭৯৪ লাইনের কাব্য। এটি ১৭১২ সালে এবং পরিবর্ধিত আকারে ১৭১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

কবিতাটির প্রত্যক্ষ হেতু ছিল সাধারণ সামাজিক পরিবেশে একটি তুচ্ছ ঘটনা। হঠকারী যুবক লর্ড পেট্রে (Petre) খেয়ালের বশে কুমারী আরাবেল্লা ফার্মরের (Miss Arabella Fermor) মাথার একগোছা চুল কেটে ফেলে। কুমারী ফার্মর ক্রুদ্ধ হয় ও অপমানিত বোধ করে। তার পরিবারের লোকেরাও এটাকে গুরুতরভাবে নেয়। দুই পরিবারের ঝগড়া যখন চরমে ওঠে তখন পোপের বন্ধু বিশিষ্ট এবং অভিজাত শ্রীযুক্ত ক্যারিল (Mr. Caryll) পোপকে এই বিষয়ে খুব হালকাভাবে মজা করে একটি কবিতা লিখতে বলেন। শ্রীযুক্ত ক্যারিলের উদ্দেশ্য সাধু ছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে কবিতাটি একটি সুন্দর হাস্যরস সৃষ্টি করে উভয় পরিবারের ভিতরের শত্রুতা এবং আশান্তি মিটিয়ে ফেলতে পারবে। পোপের উদ্দেশ্যও তা-ই ছিল। তবে তিনি এই সুযোগে অন্য কয়েকজন ব্যক্তিকে উপহাসাস্পদ করে মজা পেতে চেয়েছিলেন। কার্যতঃ, এই কবিতাটি 'ফার্মর' এবং 'পেট্রে' পরিবারের ভিতরের বিবাদ মেটাতে তো পারেইনি, উপরন্তু কয়েকজন মানীলোক পোপের বিরুদ্ধেও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ফলে পোপকে অভদ্র আচরণকারী বলে মনে করা হল।

'কেশাগ্রছেদন' কাব্যটি শুধু তুচ্ছ একটি ঘটনার আপাতগম্ভীর বর্ণনা নয়; তখনকার দিনের লণ্ডনের উপরতলার সমাজের মহিলাদের চিন্তালেশহীন হালকা জীবনের প্রতিও কটাক্ষ। এই কবিতার আখ্যানভাগের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিচয়ের থেকে এর সামাজিক তাৎপর্য বেশী লক্ষ্যণীয়।

'কেশাগ্রছেদন' মহাকাব্যের গঠনে ব্যঙ্গকবিতা। একে ইংরাজী সাহিত্যে মক-হিরোইক (Mock-heroic) কবিতা বলে। 'কেশাগ্রছেদন' এই জাতীয় কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

একটা তুচ্ছ ঝগড়াকে মজা করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কপট গাম্ভীর্যের ধরনে পরিবেষণ। এটি মহাকাব্য নয়; মহাকাব্য করবার ইচ্ছাও কবির ছিল না। আমাদের বাংলায় যেমন তুচ্ছ জিনিষকে সাধুভাষায় প্রকাশ করে একধরণের মজা বা কৌতুক সৃষ্টি করা হয়, —এ হচ্ছে সেই জিনিষ।

কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ, —বিশেষ করে কাব্যটির প্রধান চরিত্র যারা তাদের আক্রমণ আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল তদানীন্তন যুগ। তখনকার কালের নিশ্চিন্ত জীবনে পয়সাওয়ালা অভিজাত মানুষেরা আরামে এড়িয়ে গড়িয়ে জীবনযাপন করতেন। বিশেষ করে মহিলারা। তিলকে তাল করে তাঁরা মনে করতেন গুরুতর একটা কিছু করা হল। ব্যঙ্গ এই অত্যন্ত অগভীর এবং আত্মসন্তুষ্ট জীবনকে লক্ষ্য করেই।

আবার বলছি, তেরিয়া মেজাজ পোপ কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্যের মূল ঘটনার পাত্রপাত্রীকে আক্রমণ করতে চাননি। মজার পরিবেশ সৃষ্টি করে তাঁদের ক্রোধ ও অপমানবোধকে কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তবে এই সুযোগ তিনি অন্য কিছু কিছু ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সেটা 'কলা বেচতে গিয়ে রথও দেখে নেওয়া',—এক সুযোগে অন্য কিছু বাড়তি কাজ করে নেওয়া, —এর বেশী কিছু নয়।

The Rape of the Lock-এর যথার্থ সমাদর করা যায় দুভাবে। একটা হচ্ছে কাব্যের কৌশল—লাইনের পর লাইন ছিটান-ছড়ান সারবান কথা (Maxim) বা তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা-সমন্বিত (Epigram) মহাকাব্যের ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করে। আর সমাদর হয় আর একভাবে।—তীব্র ব্যঙ্গোক্তি নয়; রুগ্ন শরীরেও মজা করবার অসীম ক্ষমতা অনুধাবন এবং উপভোগ করে।

প্রথমটির অন্তর্নিহিত তথ্য বা লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে—যা যেখানে সর্বতোভাবে প্রত্যাশিত বা সমঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে তার ঠিক বিপরীতধর্মী পর্যবেক্ষণ। এতে কি এই ক্লাসিক যুগের কবিব রোম্যাণ্টিক চরিত্র প্রকাশ পায়? আর দ্বিতীয়টি যা, তা কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের বড় পুঁজি;—মানুষকে আনন্দদানের ক্ষমতা।

কেশাগ্রছেদন

একটি "আরোপিত বীরত্বের কৌতুক কাব্য" (Mock-heroic poem)। কবি নিজেও এটিকে ওই রকমই নাম দিয়েছেনঃ Heroi-Comical poem। এই কাব্যে আসল ঘটনাকে কৌতুকের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়েছে। ছোট জিনিষে ব্যঙ্গ করে বড় আকার আরোপ করে দেখান হয়েছে। অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে, —ব্যক্তি এবং বিষয়কে অবজ্ঞার

দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। তবে কবি, এই কাব্যে অন্ততঃ, বিদ্বেষ মেশাননি; বরঞ্চ বলা চলে, ব্যাপারটিকে করুণার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এর দ্বারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলেও কবির মজা করার মনোভাব সেই ঔদ্ধত্যকে সহনীয় করে দিয়েছে। কবিব দৃষ্টিভঙ্গী যে সঠিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরঞ্চ তাঁকে প্রশংসা কবতে হয় এই কারণে যে তিনি ঘৃণাকে কৌতুকময় ও গ্রহণীয় করে তুলতে পেরেছেন। গঠনে মহাকাব্যের ভঙ্গী এই কৌতুকমযতা ও গ্রহণীয়তার জন্য প্রযোজন ছিল।

এই 'আরোপিত বীরত্বের কৌতুক-কাব্য' মহাকাব্যের আধারে বিদ্রুপের আধেয়। এর উদ্দেশ্য সামান্য কারণে উত্তেজনার অসঙ্গত তীব্রতা হ্রাস করা।

আধুনিক সমালোচকরা বলেছেন,—ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে মহাকাব্যের গঠনকে ব্যবহার করলে মহাকাব্যকেই ব্যঙ্গ করা হয। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের অগাষ্টান (Augustan) যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা মহাকাব্যকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছেন। তাঁরা মহাকাব্যকে নিয়ে কৌতুক করতে পারেন না। তাঁরা শুধু মহাকাব্যের গঠনকে নিয়েছেন তাঁদের কাব্যে বর্ণিত ছোট জিনিষকে কপটভাবে বড় করে দেখানর উদ্দেশ্যে। 'কেশাগ্রছেদন' কাব্যের কবিও তা-ই করেছেন। এই কাব্যকে যদি ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে অনুকরণ বা প্যারডি (Parody) বলা হয়, তবে এটা বুঝতে হবে যে সেই অনুকরণ কাব্যের গঠনের আদর্শ নিয়ে ব্যঙ্গ করা নয়, বর্ণিত বিষয়কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা। যুগোপযোগী অর্থ অনুসরণ করা দরকার। পাঠকের এই বোধ না থাকলে পোপকে নিন্দাজনকভাবে লঘুপ্রকৃতির কবি বলতে হয়। কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। অন্ততঃ, 'মহাকাব্য' নিয়ে ব্যঙ্গ করা পোপের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান।

পোপের এই কবিতাকে সামাজিক হাস্যকৌতুক-ও বলা চলে।

মোটের উপর 'কেশাগ্রছেদন'—গঠনে ও বর্ণিত বিষয়ে—একটি বার্লেস্ক (Burlesque) বা 'অনুকরণ কাব্য'। এর অনুকরণেব বিযয সমসামযিক কালের অভিজাত সমাজের অত্যন্ত অগভীর জীবনবেদ।

কেশাগ্রছেদন কাব্যে মেশিনারিজ (Machineries)

'মেশিনারিজ'-এই নাম দিয়ে এখানে একটি সুসংগঠিত অতিপ্রাকৃত ব্যবস্থা বা তন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। মহাকাব্যের কবিরা অনেকেই 'মেশিনারিজের' সাহায্য নিয়েছেন। পোপও তাই করেছেন, —মহাকাব্যের অনুকরণ করার জন্য এবং তাঁর কাব্যের বিষয়ের কপট গুরুত্ব বাড়াবার জন্য।

১৪৮৪ সালে ক্রিশ্চিয়ান রোজেনক্রুজ (Christian Rosenkreuz) একটি রহস্যময় জাদুবিদ্যার প্রবর্তন করেন। এই বিদ্যা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি সংগঠনে পরিণত হয়। এই সংঘটিকে রোজিক্রুশিয়ান (Rosicrucian) সংঘ বলা হত। এর সভ্যেরা নানারকম অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কাজে লাগাতেন। এই সব অতিপ্রাকৃত শক্তি মানুষের আগোচরে ভালমন্দ নানা কাজ করে দেয় বলে বিশ্বাস করা হত। কাব্যে এদের 'মেশিনারিজ' নাম দেওয়া হয়েছে। পোপ সম্ভবতঃ একটি ফরাসী বই থেকে এদের ধারণা পেয়েছিলেন।

বইটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা। লেখক মন্টফকন ডি ভিলার্স (Montfaucon de Villars)-এর মোহান্ত। এই বইতে বলা হয়েছে যে জল-মাটি-আকাশ-বাতাসে নানা অদৃশ্য আত্মা ছড়িয়ে রয়েছে। বাতাসে যারা আছে তাদের আকৃতি মানুষের মত, মাটিতে আছে নোমস (Gnomes) বা ফারিজ (Pharyes)। এরা ছোট ছোট প্রাণী। সিলফস (Sylphs) বা পরীজাতীয় প্রাণীদের ধারণাও এইভাবে আসে। ডি ভিলার্স এই জাতীয় সব প্রাণীকেই ভাল বলেছেন। পোপ কিন্তু এদের কারোকে কারোকে খারাপও বলেছেন। ধনসম্পদ রক্ষাকারী বামনভূত নোমদের (Gnomes) তিনি বিরক্তিকর বলে দেখিয়েছেন।

'কেশাগ্রছেদন' কাব্যের ১৭১৪ সালের সংস্করণে পোপ এই সব অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের সাহায্য নিয়েছেন। আগের সংস্করণেও এই সব প্রাণীদের অস্তিত্ব কিছু কিছু আছে। 'ভালবাসা' (Love), ঈশ্বরের মানদণ্ড (Jove's scales) ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী এবং পাপপুণ্যের ধারণাকেও ব্যক্তিত্ব আরোপ করে পোপ তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

ড্রাইডেন বলেছেন,—মহাকাব্যে বা মহাকাব্যের অনুকরণে অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলির উপস্থিতি অপরিহার্য।

খৃষ্টপূর্ব যুগের নানা ছোটখাট দেবদেবী বা গথিক আমলের 'পরী' ইত্যাদি কাব্যে ব্যবহৃত অতিপ্রাকৃত এই সব ছোট ছোট প্রাণীদের ধারণার উৎস হতে পারে। এই সূত্র ধরে পোপ শুভাকাঙ্খী বা অভিভাবক দেবদূতেদের কাজেরও সাহায্য নিয়েছেন।

মহাকাব্যে এবং কৌতুকের উদ্দেশ্যে মহাকাব্যের গঠনের ব্যবহারে কতকগুলি শক্তিশালী আসক্তি সঞ্চালিত করা হয়। এগুলিও পূর্বোক্ত রহস্যময় প্রাণীদের মত নানাধরনের কাজে কবিকে সাহায্য করে। 'কেশাগ্রছেদন' কাব্যে 'অহঙ্কার' এবং 'অসচ্চরিত্র নারীর চাতুরী' সেই জাতীয় আসক্তি।

ক্ষিতি-অপ-তেজঃ-মরুৎ এই চারটি মূল পদার্থে অবস্থিত পূর্বোক্ত অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বগুলিতে মরজগতের বাইরের শক্তি কাজ করে। সেইজন্য কাব্যের সচলতাকে বজায় রেখে কাব্যের সার্থকতা ঘটানোর উদ্দেশ্যে কবি এদের নিয়োগ করেন। এদের দ্বারাই কাব্যের বাঞ্ছিত উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। বাস্তবতায় বিশ্বাসী হয়েও পোপ তাই এদের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হননি।

কাব্যটির উৎসর্গ-অংশে কবি বলেছেন যে প্রাচীন কবিরা একদিক থেকে আধুনিক ভদ্রমহিলাদের মত। কোন ঘটনাই, তা সে যত সামান্যই হোক, তুচ্ছ নয়। প্রাচীন কবিরা যেমন ছোট অনেক ব্যাপারেই বড় কিছুর ইঙ্গিত পেতেন, আধুনিক ভদ্রমহিলারাও তুচ্ছ 'তিলকে তাল' করে সন্তোষ পেয়ে থাকেন। তা না হলে সামান্য একটু চুল কেটে নেওয়ার জন্য এত কাণ্ড ঘটে! প্রাচীন কবিরা এই সব "মেসিনারিজে"র অস্তিত্ব দেখতেন ছোটবড় অনেক ব্যাপারেই। তাঁরা কাব্যকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চাইতেন। 'রোজিক্রুশিয়ান' (Rosicrucian) বিশ্বাসের এই রহস্যময় প্রাণীরা কাব্যকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে কবিকে সাহায্য করত। পোপও এই সব সিলফস (Sylphs), নোমস (Gnomes), নিম্ফস (Nymphs) এবং সালামাণ্ডারদের (Salamanders) সাহায্য নিয়েছেন একই কারণে। আরামে-বিলাসে থেকে সামান্য কারণে আধুনিক ভদ্রমহিলারা যদি এত উত্তেজিত হন

তাহলে কবিই বা কি দোষ করেছেন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে! কবির পরিকল্পনা অনুযায়ী মেসিনারীগুলি 'কেশাগ্রচ্ছেদন' রচনাটিকে কাব্য ও স্যাটায়ার উভয়দিক থেকেই সমৃদ্ধ করেছে।

আলোচ্যযুগের গীতিকবিতা (১৬৫১—১৮০০)

ড্রাইডেন, ম্যাথুপ্রায়র এবং পোপের পরে আমরা যে সব প্রধান প্রধান কবির আবির্ভাব দেখি তাঁদের অনেকেই গীতি কবিতার কবি। আসলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশ মিলটনের মহাকাব্য এবং ড্রাইডেন ও পোপের ব্যঙ্গকাব্য এবং মহাকাব্যের অনুবাদ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ণ হয়েছিল। মাঝখানের এই পঞ্চাশ বছর বাদ দিয়ে গীতিকবিতা আবার ক্রমে ক্রমে কাব্যরচনার বেশীরভাগ ক্ষেত্র দখল করে নিতে শুরু করল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে।

আধুনিক যুগের এই তৃতীয় পর্বে কাব্যের ইতিহাস লক্ষ্য করলে পর্বটিকে পরিষ্কার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে "পুণঃপ্রতিষ্ঠার" পরিমণ্ডল। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। দ্বিতীয়, "অগাষ্টান" যুগ—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ বা তার কিছু বেশী। আর তৃতীয়টি হচ্ছে প্রাক-রোম্যান্টিক যুগ। প্রথম সুগঠিত বাবহারিক যুক্তি, প্রত্যক্ষ সামাজিক সচেতনতা, জাগতিক নীতিনির্দেশ ও স্যাটায়ার প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। এ যুগেও গীতিকবিতা ছিল, তবে তাতে পূর্ববর্তী যুগের কল্পদৃষ্টির উল্লাস ও মহিমা কোনটাই ছিল না। পঞ্চাশ-ষাট বছর পরের গীতিকবিতার সরল, স্পষ্ট মাধুর্যও তাতে ছিল না। কিন্তু তাতে কবিতার পূর্বাপর সামঞ্জস্য, সঙ্গীত, কবির একটি বিশিষ্ট মেজাজ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। আর ছিল কবিতার গঠন ও প্রকাশভঙ্গীর উপর কবির নিয়ন্ত্রণ।

তবে, আবার বলা যেতে পারে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গীতিকবিতা কাব্যসাহিত্যের প্রধান অংশ ছিল না।

লিরিক কবিতা (গীতিকবিতা) সাধারণতঃ আকারে ছোট এবং মন্ময় (Subjective)। 'পুণঃপ্রতিষ্ঠার' যুগে তত্ত্বচিন্তা গীতিকবিতার অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল। লিরিক কবিতা আবেগপ্রধান এবং তার রেশ বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। গুরুগম্ভীর চিন্তা লিরিক কবিতার পরিবেশের পক্ষে অনুপযোগী। 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' যুগে নির্দিষ্ট নীতি মাথায় রেখে কবিতা লেখা হয়েছিল। তা গীতিকবিতার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছিল। তা-ও পুরোপুরি গীতিকবিতার প্রবণতার সঙ্গে মেলে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কাব্যে চেষ্টাকৃত মাধুর্য ছিল। এবং সেই কারণেই তা গীতিকবিতার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না।

এছাড়া, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের লিরিকে পুরাতন কল্পনার জগতের যে সন্ধান পাওয়া যেত, অধিকতর মুক্ত পরিবেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তা পাওয়া যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গীতিকবিতার সমাদর করতে গেলে নতুন জগৎ ও নতুন আদর্শের কথা মাথায় রাখতে হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে হয় ব্যক্তিস্বাধীনতার বোধ, নয় রাজতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা বহু মানুষের চিন্তাজগতের উপর প্রভাব ফেলেছিল। হুইগপার্টি বা পরবর্তীকালের লিবারেল পার্টি ব্যক্তিস্বাধীনতাব পক্ষে ছিল। এই ব্যক্তিস্বাধীনতার ধাবণা দার্শনিক নীতি সংক্রান্ত ধারণা নয়, —এর পিছনে বিশ্বময় বাণিজ্যিক প্রসারের উচ্চাকাঙ্খা কাজ করেছিল। স্বভাবতঃই এই প্রবণতা তখনকার কালে প্রগতিবাদী ছিল। কিন্তু রাজতন্ত্রের সমর্থকরা পুরানো জগৎ, পুরানো ধারণা, পুরানো সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে যতটা সম্ভব ধরে রাখতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কি হবে তা শতাব্দীর গোড়ার দিকেও স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু ১৭১৪ সালে যখন সিংহাসনের ইংরাজ উত্তরাধিকারী কারোকে না পেয়ে জার্মানীর হ্যানোভার থেকে বংশপত্রিকা অনুযায়ী প্রথম জর্জকে ডেকে নিয়ে আসা হল তখন ইংরাজদের মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়ে গেল অপ্রত্যাশিত। এই সময় থেকেই মানসিক দিক থেকে ইংল্যাণ্ড সর্বতোভাবে বৃহত্তর ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এর আগে পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড যেন বাইরে থেকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখত। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যকেও এক প্রসারিত ক্ষেত্রে এনে ফেলল।

বনেদী জমিদারদের সম্মান তখনও পর্যন্ত পুরোনো জগতকে ধরে রেখেছিল। শহর এবং গ্রাম, ধনী এবং দরিদ্র, পরিতৃপ্ত ও উচ্চাকাঙ্খীর দূরত্ব তখনও তত স্পষ্ট হয়নি। সমগ্র ইংল্যাণ্ডে একটা বৃহত্তর গোষ্ঠিবোধ তখনও কাজ করেছে। সাহিত্যিক তখনও সব ইংরেজকে বা শুধুমাত্র ইংরেজকে তাঁর শ্রোতা এবং পাঠক হিসাবে ধরে রাখতে পেরেছেন। ইংরেজেব সঙ্গে ইংরেজেব একটা অন্তর্লীন আত্মীয়তা বোধ তখনও বজায় ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বোধ লঘু থেকে লঘুতর হতে শুরু করেছিল। কবিও ক্রমে ক্রমে নিজের চারপাশে গণ্ডী টেনে দিতে বাধ্য হলেন। এর পর থেকে কবিকে বৃহত্তর মানবসমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে হবে। নিজেদের পুরানো রীতিনীতি চিরকালই গর্বের বিষয়। কিন্তু তার আন্তর্জাতিক প্রচার ও স্বীকৃতির প্রয়োজনও বোঝা যাচ্ছিল। কবির উৎসাহ ও প্রেরণা ক্রমে বৃহত্তর ও যোগ্যতর বুদ্ধির সন্ধান করতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যের এবং অন্য সমস্ত সাহিত্যের পরিবর্তনের পটভূমি এইরকমই। কাব্য তার পুরানো রাস্তায় চলতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এবং যতদিন না ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক দার্শনিকতায় তা মুক্তির পথ দেখেছিল ততদিন চিন্তা, যুক্তি, বুদ্ধি ও গদ্যকে স্থান ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গীতিকবিতার উপর বেন জনসন (Ben Jonson ১৫৭৩-১৬৩৭) এবং ডনের (John Donne (১৫৭৩-১৬৩১) প্রভাব খুব বেশী ছিল। এই সময়ে প্রথম দিকে অন্তর্নিহিত উচ্ছ্বাসকে ক্লাসিক পরিচ্ছন্নতায় সংযত রাখা হয়েছিল। ক্রমে আবেগ তীক্ষ্ণতর হল কিন্তু চিত্রকল্পগুলি মনস্তত্ত্বে ভারাক্রান্ত হল। মনের উপরি স্তরে ভাসমান সহজ গ্রহণযোগ্যতা এবং তাত্ত্বিক চিন্তা,—গদ্যে দুয়েরই চর্চা করা হল ; কিন্তু কাব্য ধীরে ধীরে গভীরে ডুবে গেল আত্মানুসন্ধানে। তবে এ ভাব স্থায়ী হবার নয়। (অষ্টাদশ) শতাব্দীর শেষ দিকে আবার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সুর বাজতে লাগল। গদ্যও ধীরে ধীরে তত্ত্বচিন্তা থেকে সহজ আনন্দের গল্প উপন্যাসের নতুন রাজ্যের

সন্ধান পেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে একটা সহাবস্থানের বোধ এসেছিল। গীতিকবিতার দ্বারা সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে একটা অবারিত আনন্দ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করল।

আলোচ্য যুগের কাব্যের এই সাধারণ আলোচনার পরে আমরা কয়েকজন কবির সম্বন্ধে অল্প কিছু কিছু আলোচনা করব। এঁরা সকলেই যুগের (১৬৫১—১৮০০) প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি। মিলটন, ড্রাইডেন, ম্যাথুপ্রায়র এবং পোপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে। এরপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করবো তাঁরা হলেন টমসন, গ্রে, কলিন্স, গোল্ডস্মিথ, কাউপার, ম্যাকফারসন, চ্যাটারটন, ব্লেক এবং বার্ণস।

টমসন (James Thomson) ১৭০০-৪৮

টমসন প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির কৃত্রিম, বৈচিত্রহীন বর্ণনা তাঁর কবিতায় নেই। 'ঋতুবৈচিত্র' (The Seasons-১৭৩০) এবং 'শ্রমবিমুখতার দুর্গ' (The Castle of Indolence—১৭৪৮) তাঁর দুটি নামী কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা প্রথমটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল এবং দ্বিতীয়টি একটি কাল্পনিক, সুন্দর প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা। সেখানে গেলে ক্লান্ত মন বিশ্রাম পায়। এখানেও সেই গ্রীক পুরাকাহিনীর লোটাসের কথা। হয়ত 'ওডিসি'র (Odyssey—Homer) 'লোটোস-ইটারদের (Lotos Eater) কথা কবির মনে এসেছিল। স্পেন্সেরীয় স্তবকের কবিতা। স্তবকের প্রথম আট লাইন পাঁচমাত্রার আইয়্যাম্বিক ছন্দে ; নবম লাইনটি ছয় মাত্রার।

গ্রে (Thomas Gray) ১৭১৬—৭১

১৭৫৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর কুইবেক (Quebec) দখলের সংগ্রামে জেনারেল উলফ (Wolfe) এবং তাঁর সৈন্যেরা একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগুচ্ছিলেন। রাত্রির নিস্তব্ধতায় যখন অন্যেরা নিশ্চুপ তখন শুধু উলফের মুখে শোনা যাচ্ছিল গ্রের সেই বিখ্যাত এলিজি (Elegy...)। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন,—"কুইবেক দখল করার চেয়ে যদি আমি এইরকম একটি কবিতা লিখতে পারতাম!" গ্রের 'এলিজি'র জনপ্রিয়তা ২৫০ বছর আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে।

গ্রের জন্ম ১৭১৬ সালে লণ্ডনে এবং মৃত্যু কেম্ব্রিজে। স্টোক পজিসে (Stoke Pogis) গীর্জার প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হয়ত ওই স্থানটিই তাঁর এলিজির প্রেরণা ছিল।

গ্রে জীবনে অনেক ভাল ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তৎপর হয়ে কোন কাজে লেগে পড়া বা জড়তা কাটিয়ে ওঠা গ্রে-র ধাতে ছিল না। ১৭৫১ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'একটি গ্রামের গীর্জাসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে রচিত করুণসঙ্গীত' (Elegy written in a country Churchyard) প্রকাশ পায়। সাধারণ কথা অথচ সুন্দর করে বলার এমন উৎকৃষ্ট নমুনা খুব কমই পাওয়া যায়। এর কয়েকটি লাইন প্রবাদবাক্যের মত এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। এটি পাঁচমাত্রার আইএ্যাম্বিক ছন্দে লেখা। গ্রে নিজে অবশ্য এই এলিজিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলেননি। প্রসঙ্গতঃ এলিজি কথাটি গ্রীক এলিগস (Elegos) কথা থেকে এসেছে। এর মানে মৃত ব্যক্তির জন্য শোকের গান।

সমালোচকরা বারবার অনুযোগ করেছেন যে এত পাণ্ডিত্য এবং কবি-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গ্রে কেন এত কম লিখলেন।

গ্রে ডঃ জনসনের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য উদগ্রীব ছিলেন না। ডঃ জনসনেরও গ্রে সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

কবি ম্যাসন (Mason) গ্রে-কে প্রাচীন গ্রীক কবি পিণ্ডারের (Pindar) সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি কাউপার (Cowper) গ্রে-কে 'মহীয়ান' (Sublime) বলেছেন।

গ্রে নিজে তাঁর কাব্যের আদর্শ স্থির করেছিলেন: সংক্ষিপ্ত, অনাবিল, প্রাঞ্জল ও সঙ্গীতময়।

গ্রের বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী অনেক ছিলেন। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাঁর প্রকৃতি ছিল ডঃ জনসনের প্রকৃতির ঠিক বিপরীত।

ইংরাজীকাব্যে গ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিক যুগ এবং ওই শতাব্দীরই শেষের দিকের রোম্যান্টিক যুগের মাঝখানে রয়েছেন। তিনি রোম্যান্টিক যুগের অন্যতম অগ্রদূত।

কলিন্স (William Collins) ১৭২১—৫৯

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই কলিন্সের কবিতায় খাঁটি রোম্যান্টিক প্রেরণা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ওই শতাব্দীর প্রচলিত রীতির মধ্যেই তাঁকে কবিতা লিখতে হয়েছিল। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই 'ওড' (Ode) অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে সম্বোধন করে বড় গীতিকবিতা। তাঁর কবিতার বিষয় গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং তাকে উন্নত স্তরে ধরে রাখার চেষ্টা তাঁর ছিল। সম্ভবতঃ মনের গভীরে বিষাদের স্থায়ী অস্তিত্ব তাঁকে লঘুস্তরে নামতে দেয়নি। তবে তাঁর যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—নীতিশিক্ষাদান—তাঁর কবিতায় ছিল না। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ এবং নির্ভেজাল কল্পনা তাঁর কাব্যকে প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা দিয়েছিল। কাব্যে হোরেস (Horace—খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর রোম্যান কবি) তাঁর আদর্শ ছিলেন। মিলটনের শব্দসম্ভার তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

জড় বস্তুতে ব্যক্তিত্ব আরোপন যে যুগে খুব বেশী চলত। কলিনস বিমূর্ত গুণাবলীতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে কবিতা লিখেছিলেন। প্রতিটি কবিতায় একটিমাত্র আবেগ আগাগোড়া বজায় রাখা এবং ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করা তাঁর বিশেষত্ব ছিল।

গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith) ১৭২৮—৭৪

অলিভার গোল্ডস্মিথ আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক। ছাত্রজীবনে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেননি। একটি বাঁশি (Flute) ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন। অল্পবয়সে বাঁশিটিকেই জীবিকার উপায় করে নিয়ে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ত্রিশ বছর বয়স থেকে প্রকাশকদের নির্দেশমত ফরমায়েশী কাজ করতে থাকেন। কিন্তু এই মানুষটিই পরে স্বাধীনভাবে সাহিত্যের নানা শাখায় কাজ করে স্থায়ী এবং মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন।

এখানে কবিতার কথা বলতে গেলে, 'পথিক' (The Traveller) প্রকাশিত হয় ১৭৬৭ সালে এবং খুব বিখ্যাত একটি কবিতা 'পরিত্যক্তগ্রাম' (The Deserted Village) ১৭৭০ সালে। গ্রামের দৃশ্য তিনি যেন অনায়াস পটুতায় এঁকেছেন। আর গ্রামের মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। তাঁর কবিতায় কৃত্রিম অলঙ্কারের নানা উপায়ের প্রয়োগ সত্ত্বেও তা কোন কৃত্রিমতার বোধ আনে না। সেগুলি যেমন প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট, তেমনি সেগুলিকে অনবদ্য সরলতায় তিনি আকর্ষণীয় করে উপস্থিত করেছেন। তাঁর কাব্যের সহজ প্রকাশ একটি সুললিত সঙ্গীতের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। যে সব মানুষকে তিনি তাঁর কবিতায় এনে ফেলেছেন তারা আমাদের অতি পরিচিত জগতের বাস্তব চরিত্র।

উপদেশ দেওয়া এবং জ্ঞানবিতরণের চেষ্টার ভিতরেও তাঁর একটা অন্তর্নিহিত সরলতা ছিল যার উদার মানবিক গুণ তাঁর নিজের মানসিকতারই সঠিক বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি এমন কোন আড়ম্বরের আশ্রয় নেননি যাতে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের মাধুর্য চাপা পড়ে যায়।

গোল্ডস্মিথের প্রধান বিশেষত্ব এই যে সাহিত্যিক হিসাবে তিনি যেন ছিলেন ক্লাসিক যুগ ও রোম্যান্টিক যুগের স্বাভাবিক যোগসূত্র।

[নাটক প্রসঙ্গে গোল্ডস্মিথের কথা আবার আমরা আলোচনা করব।]

কাউপার (William Cowper) ১৭৩১—১৮০০

কাউপারের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছু নেই। পুরোহিত বংশে ধর্মাচরণের পরিবেশে তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ইভানজেলিক' (Evangelic) আন্দোলন কাউপারের জীবনে খুবই প্রভাব ফেলেছিল। বাইবেলে বর্ণিত উপদেশ-নির্দেশে প্রগাঢ় আস্থা এবং 'বিশ্বাসেই মুক্তি' এই ধারণা এই আন্দোলনের মূল কথা। পিউরিটান কঠোরতা, 'পুণঃপ্রতিষ্ঠার' যুগের নৈতিক শিথিলতা, 'মেথডিষ্ট' আন্দোলনের সংস্কারধর্মিতার পরে এই আন্দোলনই 'চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের' প্রতিষ্ঠাকে ধরে রেখেছিল। হয়ত এই আন্দোলনেই 'ইংরাজ' মানসিকতা সবচেয়ে বেশী করে প্রকাশ পেয়েছিল। আর শ্রীযুক্ত ই. এম. ফর্স্টারের (E. M. Forster) মতে কাউপার সর্বতোভাবে "ইংরাজ" ছিলেন।

মুখচোরাভাব এবং বিষাদগ্রস্ততা কাউপারের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি যে জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারবেন, এরকম ধারণা কেউই করেননি। তবে বেশী বয়সে এই সব প্রভাবের বশবর্তী হয়েও তিনি কিছু ভাল স্তোত্র, নির্দেশাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, প্রকৃতি সম্পর্কিত সুন্দর গীতি কবিতা ও কিছু হালকা মেজাজের এবং কিছু সম্পূর্ণ কল্পনাশ্রিত কবিতা লিখেছিলেন। অতি জনপ্রিয় কবিতা 'আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক' (Alexander Selkirk) ১৭৮২ সালে এবং বিখ্যাত ব্যালাড 'জন গিলপিন' (John Gilpin) ১৭৮৫ সালে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

কাউপারের বিশেষ গুরুত্ব এই যে তিনি প্রকৃতির কবি হিসাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের

আবির্ভাবের সূচনা করেন এবং সরলসুন্দর গ্রাম্যজীবনের যথার্থ চিত্র আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

ম্যাকফারসন (James Macpherson) ১৭৩৬—৯৬

ম্যাকফারসনের জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে। 'হাইল্যাণ্ডস' (ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল) তাঁর কাছে সুপরিচিত ছিল। ১৭৬০ সালে তিনি হাইল্যাণ্ডসের নানা পুরাতন কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করলেন। ১৭৬২ এবং ১৭৬৩ সালেও এই কাজ আরও ঘনিষ্টভাবে চালিয়ে গেলেন। পরবর্তী কাজগুলি সত্যই পুরাতন কোন কবির লেখার অনুবাদ না ম্যাকফারসনের নিজেরই লেখা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ম্যাকফারসনের ঘোষণা অনুযায়ী এইগুলি নাকি প্রাচীন কেল্টিক কবি 'ওসিয়ান'-এর (Ossian) কবিতার অনুবাদ। সত্যসত্যই হাইল্যাণ্ডসের পুরাতন কবিতার অনুবাদ যদি সেগুলি হয়, তাহলে সাহিত্যের ইতিহাসে তার বিশেষ গুরুত্ব থাকার কথা।

তবে দুটি কৃতিত্ব ম্যাকফারসনকে দিতেই হয়। প্রথমটি হচ্ছে এই 'অনুবাদগুলি' গদ্য হলেও এগুলিকে সহজেই কবিতার আকার দেওয়া যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওই অঞ্চলের পুরাকাহিনীর এক বীরযোদ্ধা 'ফিঙ্গাল'-এব (Fingal) নানা অভিযানের কাহিনী আছে 'ফিঙ্গাল' নামের বইটিতে।

এ সবই নতুনত্বের দরুণ রোম্যণ্টিক কৌতূহলের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

ব্লেক (William Blake) ১৭৫৭—১৮২৭

ব্লেক ছিলেন ক্ষোদনকারী (Engraver)। লেখার সঙ্গে ছবি বা লেখাকে ছবির মত করে উৎকীর্ণ করতেন। ছোট থেকেই খুব কল্পনাপ্রবণ ছিলেন। কল্পনাপ্রসূত দর্শন তাঁর কাছে ছিল সত্য ; আর আমরা যাকে বাস্তব বলি তা ছিল তাঁর কাছে মায়া।

দৃশ্যমান বস্তুগুলি তাঁর কাছে ছিল প্রতীক। তাদের পিছনে অদৃশ্য সত্যতর বস্তু ও জগৎ। তিনি সেই কল্পনার জগতকে তাঁর দিব্যদর্শন দিয়ে প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন তাঁর কল্পনার সেই বাস্তবতা এখনকার প্রত্যক্ষ বস্তুর মতই প্রত্যক্ষ হবে ; এবং তখন এই প্রতীকি জগতের (যা আমাদের কাছে বাস্তব) আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। কল্পনা ও দিব্যদর্শন তাঁর কাছে ছিল অতীব প্রয়োজনীয়।

স্বতোৎসারিত লঘু গীতিকবিতা দিয়ে তিনি তাঁব কবিজীবন শুরু করেছিলেন এবং পরে তা এক বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তিত হয়েছিল।

বহুসংখ্যক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে দুটি সবচেয়ে বিখ্যাত সে দুটি হচ্ছে 'সারল্যের গান' (Songs of Innocence) এবং 'অভিজ্ঞতার গান' (Songs of Experience)। প্রথমটি ১৭৮৯ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথমটিতে মানবসমাজেব আদিম সরলতা শিশুর অনাবিল আনন্দের আবরণে প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে প্রকৃতির দুই বিপরীতধর্মী ছবি ফুটে উঠেছে, —সৌন্দর্য ও ভীষণতা। এই দুই মাধ্যমের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গতঃ, ব্লেক বাইবেলের খুব ভক্ত ছিলেন।

যে দার্শনিক ধারণা ব্লেক তাঁর মনে গেঁথে নিয়েছিলেন তা হল শিশু স্বজ্ঞার (বা

Intuition) শক্তির দ্বারা অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পারে ; পরিণত মানুষ পারে তার কল্পনা, দিব্যদর্শন ও স্থির বিশ্বাসের দ্বারা।

বাঘ (The Tyger)

কবিতাটি ব্লেকের "অভিজ্ঞতার গান" (Songs of Experience) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাতে কবি শিশুর সরলতা ও বয়স্কের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিয়েছেন।

Lamb বা মেষশাবক শিশুর নিরীহভাবের প্রতিনিধি। মেষশাবক শান্ত ও সরল। যীশুরই এক বিশেষ রূপ মেষশাবকের মধ্য দিয়ে আমরা দেখি। এই মেষশাবক বা শিশুর সারল্য বিশ্বসৃষ্টির আলোড়নের ভীষণতার বিপরীত। সৃষ্টির আলোড়নের মধ্যে যা ভীষণ তা শিশুর সরলতার সামনে এসে থেমে যায়। রাত্রিতে বাঘের চোখ থেকে যে তীব্র আলো অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে তা প্রভাতের আবির্ভাবে স্তিমিত হয়ে যায়। বা, অন্য কথায় বলতে গেলে, মেষশাবকের সান্নিধ্যে কোমল হয়ে যায়। যিনি তীব্র ও ভীষণ বাঘকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কোমল, শান্ত মেষশাবককেও সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়ে বাঘ যেমন শক্তি ও ভীষণতা প্রকাশ করে, মেষশাবকও তেমনি ঈশ্বরের করুণায় অধিকতর শক্তিমান হয়। ঈশ্বরের মহিমার রহস্যময় প্রকাশ এমনই।

ঈশ্বরের করুণায় শান্ত, সরল পবিত্রতা বিশৃঙ্খলাকে জয় করতে পারে। মেষশাবকের নিষ্পাপ অস্তিত্ব বাঘের ভীষণতাকেও সহযোগী করে নেয়। কবি বিস্ময় প্রকাশ করেন এই ভেবে যে কি করে আপাত দুর্বল মেষশাবক বাঘের ভীষণতার সঙ্গেও সহাবস্থান করতে পারে। ঈশ্বরের করুণায় শান্তি রুদ্রকেও পরাস্ত করে। এই কবিতায় কবি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করেছেন শক্তি ও সারল্যের সৃষ্টি ও অবস্থান পাশাপাশি দেখিয়ে।

যীশু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র শক্তি প্রকাশ করেছেন। এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অসীম সহ্যশক্তি দেখিয়েছেন। আবার, বিশ্বাসী ও বিনীত সাধারণ মানুষের কাছে তিনি মেষশাবকের মত নিরীহ।

The Tyger কবিতাটির পঞ্চম স্তবকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারাগুলির সূক্ষ্মাগ্র রশ্মি বাঘের চোখের আলোর মত অন্ধকারের অরণ্যকে বিদীর্ণ করে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, কেননা রাত্রিও অরণ্যের মত সব দিক অন্ধকার করে রাখে। কিন্তু যখন শিশু সূর্যের আলো তারাগুলিকে নিষ্প্রভ করে দেয় এবং আকাশ থেকে অশ্রুপাতের মত শিশির পড়তে থাকে তখন শিশু সূর্যেরই বিজয় ঘোষিত হয়। প্রভাত সূর্যের মত মেষশাবক রাত্রি ও বাঘের ভীষণতাকেও শান্ত করে।

'বাঘ' (The Tyger) কবিতায় প্রতীকতা (Symbolism)

ব্লেক চিত্রকর ছিলেন। তিনি গথিক শিল্প অনুসরণ করেছিলেন। গথিক শিল্প উত্তর ইউরোপের শিল্প এবং তা ছিল প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পের আত্মীকরণ। মনে রাখতে হবে যীশুর এবং যীশুর সংশ্লিষ্ট সবকিছুই প্রাচ্যদেশের। ইউরোপে এই গথিকশিল্পের সময়কাল

সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে গথদের শিল্প উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে খুবই প্রভাববিস্তার করেছিল। গথিক ভাষা খৃষ্টের বাণীপ্রচারের কাজে সবচেয়ে উপযোগী বলে বোঝা গিয়েছিল। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারের রাস্তা ধরে এই গথিক শিল্প ও গথিক ভাবপ্রবণতার সূক্ষ্মতা উত্তর ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইবেলে দক্ষতা এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল মানসিকতা ব্লেকের কবিতার উৎস। তাই ব্লেক গথিক ধরনে তাঁর প্রকাশের বিষয়কে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন। গথিকশিল্পের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের পূজাঅর্চনার পদ্ধতির মিল আছে। এবং এই ভাবেই প্রতীকতার নানা ধরন অনুসরণ করার কথা আসে। এই ধারায় সাধারণ মানুষের শিল্পপ্রকাশের চেষ্টাও এই গথিক ধরনের অন্তর্ভুক্ত।

ব্লেক বলেছিলেন,—গথিকশিল্প একটি জীবন্ত শৃঙ্খলা। এবং এই জীবন্ত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব মানুষের মনে চিরকাল আছে এবং থাকবে। প্রাচ্যের খৃষ্টান বিশ্বাসের উত্তরণবাদের (Transcendentalism) ইন্দ্রিয়ানুগ অনুভূতি এই শিল্পে আছে।—তা সে ছবিই হোক, ক্ষোদনকার্যই হোক বা কবিতাই হোক।

ব্লেকের কবিতায় প্রতীক বোঝা দুষ্কর এই কারণেই যে তাঁর কবিতার প্রতীকগুলি প্রকৃতিজাত নয়; সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অনস্তিত্বমূলক কাল্পনিক কোন কিছুকে তিনি রেখায় বা কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

'সারল্যের গানের' (The Songs of Innocence) কবিতাগুলিতে তিনি প্রতীকগুলি সৃষ্টি করতে বাইবেলের সাহায্য নিয়েছিলেন; কিন্তু 'অভিজ্ঞতার গানে' (The Song of Experience) তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিধর্মী কল্পনাকে ব্যবহার করেছিলেন। "বাঘ" (The Tyger) 'অভিজ্ঞতার গানের' (The Songs of Experience) অন্তর্ভুক্ত কবিতা। আমার মনে হয় 'বাঘ' (The Tyger) কবিতায় তিনি হয়ত তাঁর কল্পনা দিয়ে অনুভব করেছিলেন:

> পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এছাড়া আর্তকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে দমন করার জন্য ভারতীয় পুরাণের নৃসিংহের ধারণাও রহস্যময়ভাবে এই কবিতায় থেকে গেছে। আবার, যীশুও শক্তি এবং স্নেহ দুইই তাঁর জীবনে জীবন্ত করে রেখে গেছেন।

এখানে বাঘকে সমগ্র কবিতার প্রতীকতার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। বাঘ মেষশাবকের ধ্বংসকারী নয়; বরঞ্চ তার রক্ষাকর্তা। যেমনভাবে অলৌকিক শক্তির ব্যক্তরূপ নৃসিংহ বালক প্রহ্লাদের রক্ষাকর্তা।

বাঘের উজ্জ্বল চোখ শক্তিকে ব্যক্ত কবছে এবং আকাশের তারাদের মত অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছে। অরণ্যের অন্ধকার বাঘের চোখের দীপ্তিকে বাধা দিতে পারে না।

রক্ষাকর্তা যেমন নির্দোষ শিশুকে রক্ষা করেন, মেষশাবককে রক্ষা করেন, শিশিরের মত অশ্রুপাতের দ্বারা তেমনি তিনি তাঁর কোমলতাকেও বিকশিত করেন।

বাঘের গঠনের সামঞ্জস্য মানুষের রোম্যান্টিক শিল্পানুভূতির সামঞ্জস্যের প্রতীক। যীশুর জীবনেও সেই সামঞ্জস্য মূর্ত। পঞ্চম স্তবকে 'জল' (Water) 'শক্তি'-র পরিপূরক এবং 'কোমলতা'র প্রতীক।

অতিলৌকিক জগতের 'অমরতা' (Immortality) [প্রথম ও ষষ্ঠ স্তবক] মানুষের কল্পনার অসীমতার পরিপূরক। 'অমর' (Immortal) বিশেষণটিও সুদূর অর্থে প্রতীকি।

রবার্ট বার্ণস (Robert Burns) ১৭৫৯—১৭৯৬

গরীব চাষীর ঘরের ছেলে। পরবর্তী জীবনে আবগারি বিভাগের কর্মচারী। তিনি তাঁর কালের স্কটল্যাণ্ডের সমাজে একধরনের বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। চার্চের ভড়ং এবং মানুষে মানুষে বিভেদের তিনি বিরোধী ছিলেন। মদের দোকান তাঁর প্রিয় জায়গা ছিল ;—মদের আকর্ষণেও বটে এবং সমাজের নিচুস্তরের মানুষের সান্নিধ্যের জন্যও বটে।

বার্ণসকে স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় কবি বলা হয়। তাঁর কবিতায় কাঁচা ঘাসের এবং ভিজে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রোম্যান্টিক কবিদের অপ্রাকৃত দূরদর্শন তাঁর ছিল না, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কাব্যের চেয়ে কম ছিল না।

১৮৭৬ সালে 'কাব্যসংগ্রহ' (Poems) প্রকাশিত হয়। পরে পরিবর্ধিত সংস্করণও বার হয়। তাঁর কবিতা স্পষ্ট, বাস্তব পটভূমিতে রচিত। খুশী আর উৎসাহ পুরোপুরি স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্য পরিবেশের। তাঁর কবিতার ভিতর দিয়েই যেন আমরা স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্য মানুষদের মনের চেহারা খুঁজে পাই। আর প্রকৃতি তাঁর কবিতায় এত স্পষ্ট ও নির্ভেজাল যে তার তুলনা পাওয়া মুস্কিল। তিনি স্কটল্যাণ্ডের ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যের পরিত্রাতা।

বার্ণস ইংরাজী কবিতায়, তাঁর নিজের স্কটল্যাণ্ডের ভাষায়, ক্লাসিক নিয়মনিষ্ঠার পরিবর্তে স্বাধীনভাবে প্রকৃতির অনুশীলন করেছিলেন। তিনি কবিতায় স্বাধীন আবহাওয়া নিয়ে এসেছিলেন। তবে তাঁর কবিতায় কলাকৌশল ছিল না, এটা বলা ভুল। ব্যক্তিসত্ত্বার বিচিত্র অনুভব এবং তার স্ফূরণ বার্ণসের কবিতাতেই বহুদিন বাদে আবার দেখা যায়। তিনি তাঁর ঠিক আগের যুগের কবিদের 'স্যাটায়ার'-কে আড়ম্বরবর্জিত এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন। সরল কৌতুকরসবোধকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

এইভাবে এক বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারা তাঁর ঠিক পরে পরেই নতুন মানসিকতার যোগে রোম্যান্টিক ধারা হিসাবে শক্তিশালী কবিদের দ্বারা সাহিত্যের বেদীতে অধিষ্ঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকের ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং অন্য কয়েকজন কবির কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার চেহারার ও পরিবেশের সাদৃশ্য খুব বেশী। এদিক থেকে তাঁর ছিল বৈতালিকের ভূমিকা। সময় হয়নি কিন্তু দেরীও আর নেই।—এই সূচনাকেই সুইনবার্ণ (Algernon Charles Swinburne ১৮৩৭—১৯০৯) বলেছিলেন,—

"ভরত পাখীর গানের থেকে অল্প একটু উঁচু স্বরের গান শোনা যাচ্ছে ; আকাশে আর তারা দেখা যায় না, আলো ফুটে গেছে'।

[A song too loud for the lark,
A light too strong for a star.]

নাটক—নাট্যকার

১৬৪২ সালে পিউরিটানদের নীতিনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ির জন্য নাট্যানুষ্ঠান প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার ফল হিসাবে। যদিও ১৬৪২ সালের আগের সময়ের নাটকই 'পুণঃপ্রতিষ্ঠার' যুগের নাটকের মূল প্রেরণা ছিল, তবুও দেখা গেল এই শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে নাটকে অমার্জিত কুরুচি অবারিতভাবে বেশ কিছুদিন বজায় ছিল। এই নাটকে ফরাসী অভিজাত সমাজের জীবনযাত্রার প্রভাব ছিল। কিন্তু নাটকের প্রাণশক্তি ছিল দেশীয় ইংরাজী নাটকের ধারাবাহিকতার মধ্যে। এবং তা গ্রাম্য ভাঁড়ামি থেকে এগিয়ে এসে শহুরে শিথিল নৈতিকতায় যুগোপযোগী পরিবর্তন অনুসরণ করেছিল।

ক্রমে কিছু শক্তিশালী নাট্যকার এতে উন্নত বুদ্ধি ও ভব্যতা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগের নাটকের সাময়িক অসংযমী চরিত্র আবার সপ্তদশ শতাব্দীরই শেষ দিক থেকে স্থায়ী ঘরোয়া রুচিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক নৈতিকতা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং দোষদর্শিতার পথ ধরেই এগিয়ে এসেছিল। বহুপরে এসেছিল সংশোধিত আদর্শের "আচার-আচরণের কমেডি" (Comedy of Manners)

পুরানো কথার আবার একটু প্রয়োজনীয় পুণরাবৃত্তি করা যাক। জগতের সমুদয় ব্যাপার প্রথম আবির্ভাবের সময় উদ্ধত এবং কমবেশী অনিযন্ত্রিত থাকে। রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগে—১৬৬০ সাল থেকে শুরু করে—নাটকে এই দোষ পুরোপুরিই ছিল। বিশেষতঃ, নাটক দর্শনেচ্ছু সাধারণ মানুষের বুভুক্ষু অবস্থা যখন প্রথম কেটে গেল তখন দর্শক ও নাট্যকার উভয়েই যদি দিশাহারা হয়ে পড়ে থাকে ত তাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বিশেষতঃ এই যুগে কয়েকজন নাট্যকার দর্শকের দাবী বিচক্ষণভাবে বুঝেছিলেন। এটা কোন নাট্যকারের ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, —দর্শকের রুচি অনুযায়ী নাটক যোগান দেওয়ার কথা। কুরুচি কিছু থাকলেও এই নাটকগুলির বেশ কয়েকটির শিল্পোৎকর্ষ অবশ্যই ছিল। এবং বিভিন্ন নাট্যকারের হাতে ক্রমে ক্রমে সুরুচিসম্মত নাটকের দিকে প্রবণতা এগিয়ে চলেছিল। ভ্যানব্রুগ (Sir John Vanbrugh ১৬৬৪—১৭২৬) এবং ফারকাবের (George Farquhar ১৬৭৮—১৭০৭) নাটক ষাট ও সত্তরের দশকের অনেক দোষ কাটিয়ে উঠেছিল। এই সব নাটকের কোন কোনটি আজও দর্শক ও শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পারে।

আবার এই সমস্ত নাটকে শ্লীলতার অভাব দেখান কয়েক দশকের ভিতরই শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য জেরেমি কোলিয়েরের (Jeremy Collier ১৬৫০—১৭২৬) ১৬৯৮ সালের 'ইংল্যাণ্ডের নাট্যমঞ্চে অনৈতিকতা ও পবিত্র বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মতামত' (A short view of the Immorality and profaneness of the English stage)।

নাট্যকারদের নাম ধরে ব্যাপারটির উল্লেখ করলে হয়ত মানসিক অনুসরণের কাজ সহজ হয়। ড্রাইডেনের (John Dryden ১৬৩১—১৭০০) কথাই প্রথমে বলি। ড্রাইডেন

কোলিয়েরের সমালোচনা মেনে নিয়েছিলেন। ড্রাইডেনের নাটকে সাহিত্যিক বা নাটকীয় ত্রুটি তেমন কিছু ছিল না। অনেকেরই ছিল না। সমালোচনা হয়েছিল অবাঞ্ছনীয় রুচির জন্য। কিন্তু সমালোচনার যোগ্য এই রুচিই পরিবর্তিত হতে হতে 'আবেগভিত্তিক নাটক' (Sentimental Drama) এবং 'আচার-আচরণের কমেডিতে' (Comedy of Manners) পরিণত হয়েছিল। কুরুচিকর হলেও শিল্পে যদি সারবস্তু থাকে, তবে তার পরিচ্ছন্ন প্রকাশ হবেই।

ড্রাইডেন অনেকগুলি ট্যাজেডি এবং কমেডি লিখেছিলেন। তার ভিতরে শ্রেষ্ঠ ছিল ১৬৭৮ সালে লেখা, 'সবই ভালবাসার জন্য' বা 'সে জগৎ হারিয়ে গেছে' (All for Love or The World Well Lost) নামে একটি ট্র্যাজেডি। এটি 'এ্যান্টনি এবং ক্লিউপেট্রার (Antony and Cleopatra) কাহিনী নিয়ে লেখা। দুঃসাহসিক কাজ। কারণ শেক্সপীয়র ওই একই বিষয় নিয়ে তাঁর সেই অসাধারণ নাটক লিখে গেছেন।

এই যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, আর যে নাট্যকার ট্র্যাজেডিতে নাম করেছিলেন তিনি নিকোলাস রোয়ে (Nicholas Rowe ১৬৭৪—১৭১৮)। তাঁর ট্র্যাজেডি 'ট্যামারলেন' (Tamerlane—১৭০২) মোটামুটিভাবে কিছু দর্শককে টেনেছিল। এই নাটকে—অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষত্ব—'মার্জিত পরিচ্ছন্নতা' প্রকাশ করা হয়েছিল।

কমেডিতে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ওয়াইচার্লি (William Wycherley ১৬৪০—১৭১৫), স্যাডওয়েল (Thomas Shadwell ১৬৪২—১৬৯২) এবং কনগ্রীভ (William Congreve ১৬৭০—১৭২৯)। এ ছাড়া গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith ১৭২৮—৭৪) এবং শেরিডানকে (Richard Brinsley Sheridan ১৭৫১—১৮১৬) আমরা গ্রন্থের এই বর্তমান অংশেরই অন্তর্ভুক্ত করছি। এঁদের নাটক যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের তবু তা যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর উপযোগী সুষ্ঠ ও সুরুচিপূর্ণ তেমনি তাতে পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগেরও (১৬৬০—১৭০০) উন্নত ও মার্জিতরূপ বজায় ছিল।

পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগের নাটকের যে সমালোচনাই করা হোক না কেন, একথা বলা যায় যে চরিত্রগুলি যেমন আদর্শ চরিত্র নয় তেমনি সেগুলি তদানীন্তন যুগের সমাজের বাইরের চরিত্রও নয়। আর, নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণের সভ্যরুচি ফিরিয়ে আনা শিল্পবোধ বা শিল্পসমালোচনা নয়, —সমাজ সেবা। শেষোক্ত কাজটি অবশ্য এখানে করা হয়নি। নাটকটি নাটক হয়েছে কিনা, —এটাই তো দেখা দরকার। পরবর্তী কালের রোম্যান্টিক সমালোচকরা এই দৃষ্টিতেই পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগের নাটককে দেখেছিলেন। নাটক আর নৈতিকতা মিশিয়ে ফেলা রোম্যান্টিক সমালোচকরা মানেন নি। ওই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন ও ক্লাসিক, অধুনা অপ্রচলিত।

সংক্ষেপে এই পুরো ইতিহাসের প্রধান প্রধান অংশ আর একবার স্মরণ করা যাক।

নানা পৃথক মৌলবিষয়ের সহযোগে পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগের কমেডি তৈরী হয়েছিল।

১৬৬০ সালে যখন নতুন করে থিয়েটার শুরু হল তখন ডেভন্যাণ্ট (Davenant)কোম্পানী বীমণ্ট (Beaumont), ফ্লেচার (Fletcher) এবং শেক্সপীয়রের নাটক চালাতে লাগল। অন্য এক কোম্পানী বেন জনসনের (Ben Jonson) নাটক নিয়ে কাজ করতে লাগল। মানুষ শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি এবং বেন জনসনের কমেডি দেখতে লাগল। জনসনের ধরনে 'হিউমার' সৃষ্টি করে বেশ কিছু নাটক শতাব্দীর বাকি দশকগুলিতে অভিনীত হতে থাকল। মানুষের চরিত্রের ত্রুটি দেখান হতে থাকল। শতাব্দীর প্রথম দিকের রোম্যাণ্টিক কমেডির তেমন প্রচলন থাকল না। অনেক কমেডি স্পেনীয় ধাঁচে তৈরী হল। নাটকে হৈচৈ, উত্তেজনা এসব খুব বেশী রকম থাকল। সামাজিক দিক থেকে বিপথগামিতা এবং তাই নিয়ে মজা করা ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের (Jean-Baptiste Poquelin—মঞ্চে ব্যবহৃত নাম Moliere—১৬২২-৭৩) আদর্শে অধিকাংশ নাটকে অনুসরণ করা হল। রোম্যান নাট্যকার প্লটাস (Plautus) এবং টেরেন্স-এর (Terrence) প্রভাবও খুব কার্যকরী ছিল।

যদিও এটা সর্বজনস্বীকৃত যে কমেডির একটা 'সংশোধনী' ভূমিকা আছে, তবু দেখা গিয়েছিল যে পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগের কমেডির মূল উদ্দেশ্য ছিল আমোদ এবং হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় এই উদ্দেশ্য আশির দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল।

এই পরিস্থিতিকে 'পিউরিটান' বাড়াবাড়ির (১৬৪০-৬০) প্রতিক্রিয়া এবং রাজসভার মনোরঞ্জন দুইই বলা চলে। যা নিয়ে হাসি তামাসা দেখান হত তা ছিল আচার আচরণ, ধরন ধারণ ;—কোন নৈতিক বিচ্যুতিকে নিয়ে হাসি তামাসা হত না।

নির্বোধলোক যদি বুদ্ধিমান বলে নিজেকে দেখাতে চায়, কিংবা গ্রাম্য জমিদার যদি শহুরে ভদ্রলোক হবার ভান করে, দুঃশীলা স্ত্রীলোক যদি অশ্লীলতার উল্লেখে লজ্জা পাবার ভান করে তাহলেই তা তখন কমেডির বিষয় হতে পারত। যা কিছু সুস্থ রুচি ও মানসিকতাকে পীড়া দেয় তা-ও তখন কমেডির বিষয়বস্তু হতে পারত। কমেডি ছিল ওই যুগের জীবনের অঙ্গব্যবচ্ছেদ, জীবনের ছক বা পরিকল্পনার উপর হালকা মন্তব্য। উদ্দেশ্য ছিল প্রদর্শিত বিষয়গুলি নিয়ে হাসি তামাসা করা। কোন সংশোধনী উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে অনুকরণ করে দর্শকদের সামনে মজার দৃশ্য ধরে দেওয়াই ছিল নাট্যকারদের কাজ। দর্শকরা মজা পেত। নাট্যকারদের প্রচ্ছন্ন সমালোচনা ও উপহাস তারা উপলব্ধি করত না।

কেলিয়েরের সমালোচনা দেরীতে হলেও নাট্যকাররা বুঝে গিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে রিচার্ড স্টিল (Sir Richard Steele ১৬৭২—১৭২৯) তাঁর নাটকে কয়েক দশক আগের নাটকের কুশ্রীতার বদলে স্বাভাবিক অনুভূতি ও নৈতিকতা এনে ফেললেন। এগুলিও দ্রুত পালটে গেল। সে জায়গায় এল আবেগপ্রবণতা এবং সততার বোধের অসম্ভব বাড়াবাড়ি। আবেগপ্রবণতা ক্রমে মানসিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হল এবং লঘুচিত্তের হাসি বুদ্ধিমানের অনুকম্পার হাসিতে উত্তীর্ণ হল। এর ফল ভাল এবং মন্দ দুইই হল। যদৃচ্ছ হাসি আর মানুষের মুখে প্রকাশ পেল না।

কিন্তু নতুন এক মানবতাবাদ, সামাজিক সমস্যাগুলিব স্বীকৃতি নাট্যশিল্পের প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়াল। এর বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল এবং এই শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত হল গোল্ডস্মিথ ও শেরিডনের নাটকে।

পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগে তিনজন নাট্যকার খুব নাম করেছিলেন। এঁরা ছিলেন ওয়াইচার্লি (Wycherley), স্যাডওয়েল (Sadwell) এবং কনগ্রীভ (Congreve)।

ওয়াইচার্লির (William Wycherley ১৬৪০—১৭১৫) চারটি নাটকের ভিতর 'গ্রামের বউ' (The Country Wife-১৬৭৪) সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই নাটকে ধূর্ততা এবং লাম্পট্যের কলঙ্কময় চিত্র ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। ওযাইচার্লি নিজের জীবনেও সততা বজায় রাখেন নি, কারণ তা হলে হয়ত রাজার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হতেন।

এর পর স্যাডওয়েল (Thomas Shadwell ১৬৪২—৯২)। স্যাডওযেলের গুরুত্ব অন্যভাবে। তিনি বহু নাটক লিখেছিলেন এবং বিশ বছর ধরে মঞ্চকে নাটক যোগান দিয়েছিলেন। তিনি সমসাময়িককালে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। নাটকের উন্নতি নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না। তিনি বেন জনসনকে অনুসরণ করেছিলেন স্থূলভাবে, কারণ তা না হলে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকত না।

এই তিনজন এবং সমসাময়িক কালের সমস্ত নাট্যকারের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত কনগ্রীভ ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

ত্রিশবছর বয়সের মধ্যেই কনগ্রীভ (William Congreve ১৬৭০— ১৭২৯) তাঁর নাটকগুলি লিখে ফেলেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'সংসারের ধারা' ((The Way of the World-১৭০০) ছাডা বাকি সবগুলিই তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আর, পরে এই নাটকটিই কনগ্রীভের শ্রেষ্ঠ পরিচয হিসাবে থেকে গেছে। পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে এটিকে চিহ্নিত করা হয। জীবনের সত্য উদ্‌ঘাটনে কনগ্রীভ ব্যস্ত হননি। দর্শককে আনন্দ দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মঞ্চকে কুরুচির উৎস বলে মনে করেননি। বরং মঞ্চই ছিল তাঁর কাছে দর্শকের কুরুচির বলি। তিনি নিম্নমানের আনন্দ পরিবেশন থেকে মঞ্চকে অনেকটাই সরিয়ে রেখেছিলেন। চরিত্রগুলির ইতরভাব অন্যদের নাটকের থেকে কম। উল্লেখযোগ্য যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ইংরাজ দর্শকের রুচি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসছিল।

এর পরে আমাদের চলে যেতে হবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। মাঝখানে উল্লেখযোগ্য কোন নাটকই নেই।

এখন আমরা গোল্ডস্মিথ এবং শেরিডনের নাটকের সম্বন্ধে অতি অল্প দু'এক কথা বলব।

অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith) ১৭২৮—১৭৭৪

গোল্ডস্মিথের খুব বিখ্যাত কমেডি ১৭৭৩ সালে লেখা 'উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে আপাততঃ অবনত হয়' (She Stoops to Conquer)। এর আর একটি নাম রয়েছে—'কোন এক রাত্রের ভুল' (The Mistakes of a night)। চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত।

নাটকটি মঞ্চসফল হবে বলে কেউই আশা করেন নি। কিন্তু দেখা গেল এটি জনপ্রিয়, এবং ইংরাজী নাটকে স্থায়ী সংযোজন। এর কাহিনী, বিভিন্ন চরিত্র এবং কথোপকথন সবগুলিই স্বাভাবিক এবং ঘরোয়া ধরনের। মাত্রাতিরিক্ত আবেগ অথবা বুদ্ধির কাঠিন্য কোনটিই এতে নেই। এর আর একটি বিশেষত্ব, প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদা করে চেনা যায়। চরিত্রগুলি স্থূলভাবে 'টাইপ' (Type) চরিত্র নয়; প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কমিক চরিত্রগুলি যুগোপযোগী 'টাইপ' চরিত্র হলেও, তাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আছে। নাটকের প্লট চরিত্রগুলির বিকাশে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়েছে। সমালোচকেরা এই নাটকে শেক্সপীয়েরীয় ঔদার্য দেখেছেন।

শেরিডন (Richard Brinsley Sheridan) ১৭৫১—১৮১৬

শেরিডনের বিখ্যাত কমেডি 'প্রতিদ্বন্দ্বীগণ' (The Rivals) ১৭৭৪ সালে, এবং 'কুৎসাপ্রচারের অনুবর্তী' (The School for Scandal) ১৭৭৭ সালে মঞ্চস্থ হয়। এ দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ নাটক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের যুগবৈশিষ্ট্যের নির্দেশক।

শেরিডন অল্প বয়সেই নাটক লেখা ছেড়ে দেন, যদিও নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সারাজীবনের। ত্রিশ বছর বয়স থেকে তিনি সরকারী অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করতে থাকেন।

শেরিডনের নাটক লেখার ৭০/৮০ বছর আগেই 'আচার আচরণের কমেডির' দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল, যদিও আগেকার ওই শ্রেণীর নাটকের দ্বারা সমাজহিতকর কোন কাজ হয়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গোল্ডস্মিথ এবং শেরিডন আবার এই ধরনের নাটক লেখায় হাত দিলেন এই কারণে যে সাধাবণ মানুষের আনন্দ আহরণের অন্য কোন জনপ্রিয় মাধ্যমের কথা তখনও ভাবা যায়নি। অভিজাত দর্শকের অবশ্য বিলাসব্যসনের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁরাও শেরিডনের নাটক পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেছেন।

জনসাধারণের অবসর-বিনোদন এবং আনন্দ আহরণের উপায় হলেও সুরুচি এবং সুষ্ঠু সামাজিক আচার-আচরণের শিক্ষা পরোক্ষভাবে নাটকে থাকার খুব দরকার ছিল। আমার মনে হয় গোল্ডস্মিথ ও শেরিডনের নাটকই যথার্থ 'আচার আচরণের নাটক'। সপ্তদশ শতাব্দীর ষাটের বা সত্তরের দশকের অনেক নাটকই নাটক হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির কোন সমাজ-সচেতক ভূমিকা ছিল না। শেরিডন এবং গোল্ডস্মিথ উভয়কেই দেখতে হয়েছিল যে নাটকে যেন তীব্র নিন্দা না থাকে, অর্থাৎ জনসাধারণ যেন ক্ষুব্ধ না হন। আরও দেখতে হয়েছিল যে দর্শক নাটক দেখতে আসবেন, পুরোহিতের নৈতিক বক্তৃতা শোনবার জন্য আসবেন না। আর একটা কথা, শেরিডনের নাটকের বড় গুণ বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক, ভাঁড়ামি নয়।

The School for Scandal-এর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এর 'কথোপকথন'। চরিত্রগুলিকে এই ধরনের কথোপকথনের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছিল। তবে সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা—কোনরকম উপশম বা ব্যতিক্রম না থাকা—একটা ত্রুটি। ইংল্যাণ্ডে তাঁর পূর্বসূরী

কনগ্রীভের কাছে যেমন, ফরাসী নাট্যকার মলিয়েবের কাছেও তেমনি শেরিডন বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তার উপযুক্ত ব্যবহারের পাঠ নিয়েছিলেন। একশো বছর আগের অভিজাত সমাজ আর শেরিডনের সমসাময়িককালের অভিজাত ও সাধারণ মানুষের সমাজের মধ্যে প্রকাণ্ড তফাৎ ছিল। মার্জিতরুচির মানুষের চাহিদাপূরণ করা দরকার এটা বোঝাবার মত বিচক্ষণতা শেরিডনের ছিল। তাঁর সাফল্যের এটি একটি বিশেষ কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও মানুষ গভীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাননি। কাজেই শেরিডন নাটকে তা রাখেননি। দর্শকের মন বুঝে চলা নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশকের বড় দায়িত্ব, —এটা কখনই ভোলা চলে না। আবার, অসংলগ্ন কিছু ধারাল কথা দিয়েও নাটক হয় না। নাটককে সুসম্বদ্ধ করার জন্য আরও কিছু দরকার। চরিত্রগুলির একাংশের ভিতর সীমাবদ্ধ কোন গুপ্ত অভিসন্ধি অর্থাৎ Intrigue(ইনট্রিগ) দর্শকের কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়ায়। শেরিডনের নাটকে এই 'ইনট্রিগের' প্রয়োজন ছিল। শেরিডন তা সঠিক অনুপাতেই রেখেছিলেন।

নানাধরনের গদ্য ও গদ্যলেখক

অষ্টাদশ শতাব্দী গদ্য ও যুক্তির যুগ। এই শতাব্দীতে আগেকার নানা ধরনের গদ্য অত্যন্ত উন্নতমানের অবস্থায় পৌঁছেছিল। নানা ধরনের নতুন গদ্যসাহিত্যের প্রবর্তন হয়েছিল। এর ভিতরে কোন কোনটি ওই শ্রেণীভুক্ত সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে সর্বযুগের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হযেছে।

এগুলিকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব।

প্রথমটি হচ্ছে প্রবন্ধ সাহিত্য, সমাজসম্পর্কিত সাহিত্য, সাময়িক পত্রিকা ও সাহিত্য বিচার। এই অংশে থাকবেন ড্রাইডেন, এ্যাডিশন, স্টিল এবং ডঃ জনসন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে চিন্তামূলক সাহিত্য, নানা দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কিত রচনা, বিদ্রুপাত্মক রচনা এবং বিশেষ তিনটি শাখার সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলন। এই তিনটি শাখা রাজনীতি, ইতিহাস ও জীবনী। এই অংশে থাকবেন জন বিনিয়ন, সুইফট, এ্যাডিশন, বার্ক, গিবন ও বসওয়েল।

তৃতীয়টি, সাহিত্যের নতুন এবং বর্তমানে বৃহত্তম শাখা অর্থাৎ উপন্যাস। এই অংশে থাকবেন ডিফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ন, স্মলে, ওয়ালপোল, র‍্যাডক্লিফ এবং গোল্ডস্মিথ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সর্বাত্মক কোমল আবেগ ও ঔদার্যের পরিবেশে সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হয়েছিল। এই সদাশয়তার মনোভাব অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সঞ্চারিত হয়েছিল। 'পুণঃপ্রতিষ্ঠার' যুগে যে আড়ম্বর ও ব্যঙ্গের পরিবেশ ছিল তা ধীরে ধীরে সদাশয়তা ও অনুকম্পার পরিবেশে পরিবর্তিত হচ্ছিল। অনুকম্পা ঠিক আগের যুগের সাহিত্যের প্রতি নয়; 'পুণঃপ্রতিষ্ঠার' যুগের সমাজসচেতনতার অভাবের প্রতি। তবু সেই যুগকে ঘৃণা করা হয়নি। শুধু নিজেদের উচ্চ মননশীলতার সম্পর্কে গর্ববোধ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে অধিকাংশ মানুষেরই ছিল। এই শতাব্দীর প্রথমে বিগত পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যিকদের মধ্যে শুধু মিলটন ও ড্রাইডেন

ছাড়া আর কারোর প্রতি শ্রদ্ধা সমাজের নেতা বা সাহিত্যিক কারোর মনেই তেমন ছিল না। যুক্তি, ন্যায্যতা ও স্পষ্ট কথার যুগ এসে যাচ্ছিল। আর একটা কথা, সব মানুষের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবেশ তৈরী হচ্ছিল। ধরে নেওয়া হচ্ছিল যে বোধবুদ্ধি সকলেরই আছে। সকলেরই একই ধরনের বোধবুদ্ধির নাম ছিল 'সকলেরই আছে এমন বোধ বুদ্ধি' (Sense Common to all) অর্থাৎ 'Common sense'। আমরা এখন এই জিনিষটিকে 'প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বুদ্ধি'—এইরকম অর্থে ব্যবহার করি। তখন তা ছিল না। যুক্তি সকলেই বুঝতে পারে এবং যুক্তি দিয়ে সবাইকেই সব কিছু বোঝান যায়, —এটাও তখন একটা স্বীকৃত তথ্য ছিল। তখন কিন্তু যুক্তি বলতে পদ্ধতি অনুসরণকারী তর্ক, —এটা বোঝাত না। যুক্তি বলতে বোঝাত স্বতঃস্বীকৃত স্পষ্টতা।

বড় বড় ফাঁকা কথা এবং ধোঁয়াটে আবেগের দিন শেষ হয়ে আসছিল। কারোর ব্যক্তিগত ধারণা যে বড় কথা নয়, এটা বোঝান হচ্ছিল। যে ধারণা সকলকে দিয়ে সহজেই মানান যায় সেটাই সঠিক। সকলের উপর এই আস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও দর্শনের ভিত্তি। একটা আদর্শ, যুক্তিসম্মত সামাজিক অবস্থা সকলের ধারণায় এসে গিয়েছিল। এর থেকে বিচ্যুতিই খারাপ এবং এর সঙ্গে মিলিয়ে চলাটাই হয়ে দাঁড়াল সঠিক মানসিকতা এবং সঠিক অভিব্যক্তি। আর যুক্তি বলতে বোঝান হয়েছিল এই কথা যে মানুষ সহজেই সব কিছু বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারে। সূক্ষ্ম তার্কিক পদ্ধাতির দরকার হয় না। তবে অত্যাধিক আবেগ, উত্তেজনা এবং তথ্যনিদর্শনহীন অন্ধবিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

একটা মূলগত সত্যকে গ্রহণ করা হয়েছিল। সেটা হল প্রকৃতি সঠিকভাবে চলছে। মানুষের উচিৎ তাব সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। কতটা সঙ্গতি হল না হল সেটাই সমালোচনার মূল সূত্র। প্রকৃতি বলতে বোঝান হয়েছিল পরিবর্তশীল জগৎ এবং মানুষের সমাজ। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা, সমস্যার স্বরূপ ও সঠিক ধারণা, বিভিন্ন বিষয়ের উপযুক্ত ও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা, প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ধরনধারণ, স্বাধীন এবং মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিল্পবিচার, —এইগুলি নিয়েই সাহিত্যের কাজ হবে। এইটাকেই জটিলতাবর্জিত চিন্তার মানুষেরা বলেছিলেন রোম্যান ঐতিহ্যের অনুসরণ।

এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থেকেই নতুন আর এক আবেগের সূত্রপাত। ডঃ জনসন এবং বার্ক এই আবেগের বশবর্তী হয়েছিলেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য নয়, —আদর্শের প্রতি চূড়ান্ত আবেগময় নিষ্ঠার দরুণ মিলটন এই যুগে আরও জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা, সত্যপরায়ণতা, সকলের গ্রহণযোগ্য মন্ময়তা (Subjectivism), আদর্শের মর্যাদা, মধ্যযুগীয় নিষ্ঠা, প্রাচ্যের জীবনদর্শন, সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক সূত্র এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিল্প বিচার, —এইগুলিই হয়ে দাঁড়াল সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith ১৭২৩—৯০) এই যুগেই তাঁর 'The Wealth of Nations' (জাতিসমূহের সম্পদ) লিখেছিলেন (১৭৭৬)।

একটি ত্রুটি ছিল। সমালোচনা সাহিত্যের বাস্তব ক্ষেত্র কি হবে সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা এ যুগে পাওয়া যায়নি। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা কারোরই —এমন কি ডঃ জনসনেরও—ছিল না।

প্রকৃতির সরাসরি অনুসরণ অর্থাৎ 'প্রাথমিক' সাহিত্যই শ্রেষ্ঠতর ছিল। অনুকরণ এবং 'অন্য কারোর লেখার সম্পর্কে লেখাকে' ততখানি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়নি। এটিকে দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্য বলে ধরা হত।

ক্রমে 'Wit' বা বুদ্ধির জায়গায় 'Genius' বা প্রতিভার কথা এল। প্রতিভা বলতে বোঝান হচ্ছিল সৃজনশীল বা মৌলিক ক্ষমতা। 'কল্পনার' (Imagination) সঙ্গে 'রুচি' (Taste) বা 'প্রবণতা' (Inclination) কথাটি একসঙ্গে ধরা হতে থাকল। এটাও স্বীকৃত হল যে যথোপযুক্ত শিক্ষা, আদর্শ ও অনুশীলনের দ্বারা প্রবণতাকেও উন্নত করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্যের তথা সামগ্রিক সাহিত্যের এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই যুগের মূল প্রবণতা ও চরিত্র যাঁরা ধরে দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন জর্জ বার্কলে (George Berkeley ১৬৮৫—১৭৫৩) এবং ডেভিড হিউম (David Hume ১৭১১—৭৬)। গিবন (Edward Gibbon ১৭৩৭—৯৪) তাঁর 'অবনতি ও ধ্বংস' (Decline and Fall—১৭৭৬)-এর ভিতর দিয়ে এই যুগের সুবিশাল অন্বিষ্টকে ব্যাখ্যা করেছেন। আর ছিলেন ডঃ জনসন (Dr. Samuel Johnson ১৭০৯—৮৪)। যুগের সামগ্রিক প্রতিভার প্রসারিত ও সর্বোচ্চ নিদর্শন। এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke ১৭২৯—৯৭) তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতা দিয়ে একটি আদর্শকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া নানা ব্যক্তিগত চিঠি এবং সাময়িক পত্রপত্রিকার ভিতর দিয়েও এই যুগের চরিত্র খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার

জন ড্রাইডেন (John Dryden) ১৬৩১—১৭০০

ড্রাইডেন আধুনিক গদ্যের আদর্শের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি সমকালীন ফরাসী গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। ড্রাইডেনের গদ্যের বিশেষত্ব ছোট ছোট বাক্য এবং বক্তব্যের সহজবোধ্যতা। তবে তাঁর গদ্যলেখাগুলিতে যথেষ্ট অপ্রাসঙ্গিক কথাও আছে।

চিঠিপত্রাদি এবং বিভিন্ন কাব্য ও নাটকের ভূমিকায় তাঁর নানা গদ্যলেখা ছড়িয়ে আছে।

ড্রাইডেনের গদ্যগ্রন্থটির নাম 'কাব্যে লিখিত নাটকের উপর রচনা' (The Essay on Dramatick Poesie)। এটি ১৬৬৮ সালে লেখা। একটি সমালোচনা গ্রন্থ। চারজন ব্যক্তির মধ্যে (একজন লেখক নিজে) আলোচনার আকারে গ্রন্থটি লেখা। সপ্তদশশতাব্দীর প্রথম দিকের নাট্যকারদের সম্বন্ধে আলোচনা। শেক্সপীয়রের নাটকের প্রথম মূল্যায়ণ।

১৭০০ সালে লেখা ফেবলস (Fables) এর ভূমিকা তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখা।

জোশেফ এ্যাডিশন (Joseph Addison) ১৬৭২—১৭১৯

রিচার্ড স্টিল (Sir Richard Steele) ১৬৭২—১৭২৯

এঁদের দুজনের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণতঃ একসঙ্গেই বলা হয়।

এ্যাডিশন পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। স্টিলও সুশিক্ষিত এবং জীবনে পোড়খাওয়া মানুষ। জীবনের অধিকাংশকাল এঁরা বন্ধু ছিলেন। শেষ দিকে বিচ্ছেদ হয়। দুজনেই বিভিন্ন বিষয়ে রচনাকার, এবং বিশেষ করে সাময়িক পত্রিকা প্রবর্তনের ব্যাপারে এঁরাই পথপদর্শক। এ্যাডিশন অধিকতর বিচক্ষণ ছিলেন। মতামত প্রকাশের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা খুব ভালই বুঝতেন। স্টিল ছিলেন আলগা প্রকৃতির এবং অধিকতর আবেগের বশবর্তী।

১৭০৯ সালের ১২ই এপ্রিল ষ্টিলের প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দি ট্যাটলার' প্রকাশিত হয়। ট্যাটলার কথার মানে 'আগডম-বাগড়ম'। এইটিই ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম সাময়িক পত্রিকা। দু'মাসের ভিতর এ্যাডিশনও এতে যোগ দেন। এ্যাডিশন নিজের নাম প্রকাশ করেন নি। ছদ্মনাম 'CLIO' ব্যবহার করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, নিন্দা হলে গায়ে লাগবে না। প্রশংসা হলে পরে নাম প্রকাশ করা যাবে। এ্যাডিশন কিছুটা মুখচোরা গোছের ছিলেন। ১৭১১ সালের জানুয়ারী মাসে ট্যাটলারের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ট্যাটলার সপ্তাহে তিনবার বেরুত।

মার্চ মাসেই স্টিল 'স্পেকটেটর' (The Spectator) নাম দিয়ে দৈনিক পত্রিকা বার করেন। 'স্পেকটেটর' মানে 'দর্শক'। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যেন সমাজ-সংসার দেখছেন এবং যা দেখছেন তা তাঁর নিজের মত করে পত্রিকায় প্রকাশ করছেন। ১৭১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি চলেছিল। এটি অসাধারণ জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল। এক এক সময় এটির দশ হাজার কপিও বিক্রি হয়েছিল।

স্পেকটেটরের জনপ্রিয়তা প্রধানতঃ এ্যাডিশনের লেখার জন্য। স্পেকটেটরে মোট ৫৫৫টি রচনা প্রকাশ পেয়েছিল। এর মধ্যে ২৭৪টিই এ্যাডিশনের লেখা। স্টিল লিখেছিলেন ২৩৬ টি রচনা। এরপরে ১৭১৩ সালে এ্যাডিশনের সহযোগিতায় স্টিল 'গার্ডিয়ান' (The Guardian) প্রত্রিকা শুরু করেন। গার্ডিযান কথাটির মানে তত্ত্বাবধাযক বা অভিভাবক। ১৭৫ সংখ্যক প্রকাশনার পর গার্ডিয়ান বন্ধ হয়ে যায়। এতে এ্যাডিশনের রচনা ছিল ৫১টি। এ্যাডিশন মোট প্রায় ৪০০টি রচনা লিখেছিলেন।

গার্ডিয়ানের পরে ১৭১৩ সালেই স্টিল 'ইংলিশম্যান' (The Englishman), ১৭১৪ সালে 'রিডার' (The Reader) এবং ১৭১৯ সালে 'প্লিবিয়ান' (The Plebian) পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্লিবিয়ান কথাটির মানে 'অতিসাধারণ নাগরিক।'

স্টিল এবং এ্যাডিশনের ভিতর কে শ্রেষ্ঠতর তা নিয়ে বিতর্ক আছে। স্টিলের কৌতুক এবং কারুণ্য দুইই সুপ্রকাশ এবং মানবিক। তাঁর রচনায় বুদ্ধির চেযে আবেগ বেশী। স্টিলের রচনা নীতিনির্দেশক এবং সমসাময়িক সামাজিক আচার আচরণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে লেখা। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার যথোপযুক্ত আচারআচরণ তাঁর রচনার একটি মুখ্য বিষয়।

আবার, এ্যাডিশনের রচনার ক্ষেত্র ছিল আলাদা। যে সমস্ত আপত্তিজনক কাজ আইনের আওতায় পড়ে না বা খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘ যে সমস্ত অপরাধ সম্পর্কে কথা বলতে চায় না, —এমন সব বিষয় নিয়ে এ্যাডিশনের লেখা। সমসাময়িক কালের মানুষের চালচলন, ভদ্র কথাবার্তা, হাসিতামাসা, ফ্যাশন ইত্যাদির উপরে এ্যাডিশন লিখেছিলেন। তিনি কট্টর

নীতিবাগীশ ছিলেন না। ছোটখাট অপরাধকেও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাননি। কোন ব্যাপারেই অতি উৎসাহ তাঁর পছন্দ ছিল না।

একটি কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে এ্যাডিশন অনেকগুলি রচনা লিখেছিলেন। এই চরিত্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল স্যার রোজার ডি কভার্লি (Sir Roger de Coverley)। এই চরিত্রটিরও প্রাথমিক ধারণা স্টিলই দিয়েছিলেন।

স্যার রোজার গ্রামাঞ্চলের একজন প্রৌঢ় মাননীয় ব্যক্তি। তিনি মাঝে মাঝে লণ্ডনের একটি কাল্পনিক ক্লাব—দি স্পেক্টেটর ক্লাবে (The Spectator Club) আসতেন। সমাজের নানা বৃত্তিব্যবসায়ের মানুষকে স্যার রোজারের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে এ্যাডিশন কয়েকটি রচনা লিখেছিলেন। এই পরিকল্পনা স্টিলের। স্যার রোজার সম্পর্কিত রচনাগুলিকে 'কভার্লি রচনাসংগ্রহ' (Coverley Papers) বলে। এ্যাডিশন যদি ছাড়া ছাড়া কৌতুকময় রচনা না লিখে রোজারের জীবন বা জীবনের একাংশ নিয়ে বড় লেখা কিছু লিখে যেতেন তবে তা হয়ত ইংরাজী সাহিত্যে নভেলের সূচনা করত, কিন্তু এত উৎকৃষ্ট, উপভোগ্য রচনা পাওয়া যেত না। রোজারকে ডিকেন্সের কোন কোন চরিত্রের আদর্শ বলা যেতে পারে।

এ্যাডিশনের রচনাগুলি সুষমা, সঙ্গতি ও ঝরঝরে ভাষার সুন্দর উদাহরণ।

এ্যাডিশন দাবী করেছিলেন যে তিনি পুঁথিপত্রের দর্শনশাস্ত্রকে চায়ের টেবিলে—রেস্তোরাঁয—কফি হাউসে এনে ফেলেছেন।

আমি আগে যে 'Common Sense'-এর কথা বলেছি, এ্যাডিশনের রচনা সেই Common Sense-এর রচনা।

এ্যাডিশন সমালোচনা বা পর্যবেক্ষণ কখনো সমাজসংস্কারক, পণ্ডিত বা সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে করেন নি।

দুঃখের বিষয় ডঃ জনসন (Dr. Johnson ১৭০৯ – ৮৪) বা ল্যাণ্ডর (Walter Savage Landor ১৭৭৫ —১৮৬৪) এ্যাডিশনকে তাঁর প্রাপ্য গুরুত্ব দেননি।

ডঃ স্যামুয়েল জনসন (Dr. Samuel Johnson) ১৭০৯—১৭৮৪

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যজগতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন ডঃ জনসন।

জনসনের বাবা ছিলেন পুস্তকবিক্রেতা। প্রথম জীবনে অখ্যাত, দারিদ্রপীড়িত। ধীরে ধীরে চেষ্টা, পরিশ্রম ও ধৈর্যসহকারে তিনি তাঁর সময়ের সাহিত্যজগতের চূড়ান্ত নিয়ামক ও নির্দেশকের স্তরে উঠেছিলেন। সেই সময়ে অন্যান্য প্রতিভাবান মানুষেরা সকলেই নানা ব্যক্তির ও নানা সাহিত্য কর্মের উপর তাঁর মতামতের গুরুত্ব দিতেন সবচেয়ে বেশী। তাঁর জীবনের শেষ কয়েক দশক ধরে তিনি ইংরাজী সাহিত্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি আশ্চর্য প্রকাণ্ড জীবনীশক্তি নিয়ে কাজ করে গেছেন। যে Common Sense-এর কথা আমি আগে বলেছি সেই Common Sense ছিল তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে।

তিনি মানবদরদী ছিলেন। ঔপনিবেশিকতার ঘোর বিরোধী। ব্যক্তিগত জীবনেও কয়েকটি

নৈতিক আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছিলেন। বয়সে বিশ বছরের বড় কুরূপা স্ত্রীর প্রতি তাঁর অসীম দরদ ছিল। স্ত্রী মারা যাওযার পরেও তিনি তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাতেন।

তাঁর দুটি কবিতা এবং একটি উপন্যাস মোটামুটি মাঝারি স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য হয়েছিল। ১৭৪৯ সালে লেখা তাঁর কবিতা 'মানুষের অভিলাষের অহঙ্কার' (The Vanity of Human Wishes) উল্লেখযোগ্য। ১৭৫৯ সালে আগের কিছু রচনার সাহায্য নিযে 'রাসেলেস' (Rasselcs) উপন্যাস লেখেন। মাযের মৃত্যুর পর পারলৌকিক কাজের খরচ সামলানোর জন্য এবং মায়ের কিছু দেনা শোধ করবার জন্য সাত দিনের মধ্যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন। ১৭৫৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অভিধান' [ইংরাজী ভাষায় প্রথম সুশৃঙ্খল অভিধান] তাঁকে একজন পথিকৃতেব সম্মান দিয়েছে। জনসন ল্যাটিনে সুদক্ষ ছিলেন।

গদ্যসাহিত্যেই জনসনের শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে বেশী করে প্রতিপন্ন হযেছে। 'Essay' বা রচনাকে জনসন বলেছিলেন: 'মনের হঠাৎ ও বন্ধনহীন দ্রুত প্রকাশ' (Loose sally of Mind)।

১৭৫০ সাল থেকে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত তাঁর নানা রচনা 'র‍্যাম্বলার' (The Rambler) পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময থেকে তাঁর মতামতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যেতে থাকল। র‍্যাম্বলার কথাটির মানে খেযাল-খুশিমত ভ্রমণকাবী। এই সব রচনাগুলিতে জনসনের নিজস্ব স্টাইলও আত্মপ্রকাশ করল। বড বড ভারী শব্দ এবং একটা গাম্ভীর্যেব পবিবেশ তিনি তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলিতে বজায রেখেছিলেন। তবে পরে এই স্টাইল তিনি পুরোপুরি বজায বাখেননি।

সোজাসুজি মতামত প্রকাশ এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য তাঁর পরবর্তীকালের রচনাগুলির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিযেছিল। মধ্যবয়সের এই সব লেখাগুলিতে লেখকহিসাবে তিনি নিজের নাম দিযেছিলেন 'The Idler' (আইডলার)। 'আইডলার' (Idler) কথার অর্থ 'এমন মানুষ যে আলস্যে দিন কাটায়।' পরবর্তীকালেব এই রচনাগুলির জোরাল ও সরাসরি মন্তব্যের শক্তি ছিল অপ্রতিহত। যেমন জীবনে তেমনি রচনায় জনসন নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন।

১৭৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর শেক্সপীয়রের সম্পাদনা তাঁর ওই বিষয়ের (শেক্সপীয়র সংক্রান্ত বিষয়ের) জ্ঞানের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ। এই বইটি পরবর্তী কালে শেক্সপীয়র সম্পর্কিত নানা বইয়ের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। তিনি ওই মহান নাট্যকারের নির্জলা প্রশংসা করেননি। ভুল হোক ঠিক হোক, জনসন তাঁর ক্রটিও দেখিয়েছিলেন। তাঁর আগের এবং তাঁর পরের শেক্সপীয়র সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে এটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই বইটির ভূমিকা ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম দিগদর্শন বলে আজও স্বীকৃত।

জনসন সমালোচনার ক্ষেত্রে কখনও কারোকে গ্রাহ্য করেন নি। এবং প্রয়োজনীয় রূঢ় কথাকে শিষ্টতার আবরণে ঢেকে রাখেননি। তিনি রুশো (Rousseau) সম্বন্ধে বলেছিলেন যে ওই দার্শনিককে সভ্যসমাজ থেকে দূর করে দেওয়া উচিৎ।

১৭৮১ সালে প্রকাশিত 'কবিদের জীবনী' (The Lives of the Poets) তাঁর শেষ শ্রেষ্ঠ রচনা। ৫২ জন কবির উপরে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। মিলটনের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাকে তিনি গ্রহণ করেননি। এই গ্রন্থেই জনসন 'আধিবিদ্যক কবি (Metaphysical Poets) কথাটি প্রবর্তন করেন। এই কাব্যালোচনায় জনসন ড্রাইডেন এবং পোপের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন।

জনসনের শক্তির মূল উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে সেখানে আছে একটি উদার মানবিকবোধ। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের আত্মাভিমানকে তিনি তাঁর নিজের মতামতের মত করে প্রচার করে গেছেন। আর ঠিক এই কারণেই তিনিও অধিকাংশ মানুষের বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি পেয়েছেন।

'কথোপকথন' (conversation) ছিল জনসনের শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তিনি যদি সাধারণ পাঠকের সমাজের কোন মঙ্গল করে থাকেন, তবে তা 'এই কথোকথনের' মারফৎ। ভবিষ্যতে বার্নার্ড শ'-এর (George Bernard Shaw ১৮৫৬-১৯৫০) প্রতিটি মতামতের যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, জনসনের কথোপকথনের মাধ্যমে মতামত প্রকাশের সেইরকম গুরুত্ব দেওয়া হত। এবং তা তাঁর পরিমণ্ডলের অতি বিশিষ্ট মানুষদের দ্বারা সার্থকভাবে প্রচারিত হত। তাঁর প্রত্যক্ষ পরিমণ্ডলকে নাম দেওয়া হয়েছিল 'সাহিত্যানুরাগীদের ক্লাব' (Literary Club)।

জন বিনিয়ন (John Bunyan) ১৬২৮—১৬৮৮

আইফর ইভ্যান্স (Sir Ifor Evans) বিনিয়নকে সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কল্পনাশ্রয়ী গদ্য লেখক বলেছেন। তিনি তাঁর যুগের পরিধি অতিক্রম করে শ্রদ্ধাভাজনতা ও মাধুর্যে ইংরাজী সাহিত্যে চিরস্থায়ী হযে আছেন।

বিনিয়ন কারিগরের ছেলে। নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি বড় হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে ক্রমওয়েলের প্রজাতান্ত্রিক সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারপর থেকে ধর্ম ও সুনীতির প্রচারক। ধর্মপ্রচারকের প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র না থাকায় ১৬৬০ সাল থেকে ১৬৭২ সাল পর্যন্ত জেলে থাকেন। ১৬৭৫ সালেও ছমাস জেলে থাকতে হয়। ১৬৬৬ সালে তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। বইখানির নাম 'উচ্ছলিত সুষমা' (Grace Abounding)। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'তীর্থযাত্রীর পথচলা' (The Pilgrim's Progress)। এটির প্রথম ভাগ ১৬৭৮ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৬৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। বিনিয়ন 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেসের' প্রথম ভাগটি জেলে বসে লিখেছিলেন। তাঁর আরও দুটি লেখা রয়েছে। 'অসৎ মহোদয়ের জীবন ও মৃত্যু (The Life and Death of Mr. Badman-১৬৮০), এবং 'ধর্মযুদ্ধ' (Holy War-১৬৮২)। শেষোক্ত বই দুটি তত বিখ্যাত নয়। কেউ যেন না মনে করেন মধ্যযুগের ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে, কিংবা মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে এ সব বই-এর কোন সম্পর্ক আছে। একথা বলবার দরকার এইজন্য যে কিছুদিন আগে কোন কোন পণ্ডিত মার্ক্সীয় দর্শনের ভিত্তিতে বিনিয়নের সমালোচনা করেছিলেন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। বিনিয়ন নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ

করেছিলেন। আত্মসমীক্ষার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চিত্তশুদ্ধি, —এই ছিল বিনিয়নের লেখার বিষয়।

একটা কথা বিশেষ করে জানবার আছে। জগতের শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষী ধর্মসংস্কারকগণের অধিকংশের মতই বিনিয়নও নিয়মমাফিক সাধারণ লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। বাইবেলই (১৬১১ সালের) তাঁর কাছে ছিল সকল জ্ঞানের মূল আধার। কিন্তু মনের মাধুরী না থাকলে বাইবেলের সেই রস আহরণ করা কোন ধর্মনেতা বা ধর্মযাজকের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাহিত্যকীর্তি হিসাবে বিনিয়নের গ্রন্থগুলির এমন এক আকর্ষণীয় সৌন্দর্য আছে যার জন্য সেগুলিকে অন্য কোন গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আশ্চর্য সুন্দর তাঁর গ্রন্থের ভাষা। যদি কেউ তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস ও সততার শিক্ষা না-ও নেন, তবু তিনি বিনিয়নের ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। তাঁর সৌন্দর্যবোধ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার থেকে আসেনি ; তাঁর মনের গঠনই তাঁকে তাঁর উপযুক্ত ভাষা উপহার দিয়েছিল।

আমরা এখন বিনিয়নের 'তীর্থযাত্রীর পথচলা' (The Pilgrim's Progress) সম্বন্ধে আলাদা করে সামান্য দু'এক কথা বলব।

'তীর্থযাত্রীর পথচলা'-কে স্বপ্নে দেখা বিষয় হিসাবে লেখক বর্ণনা করেছেন। যথার্থ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়া থেকে শুরু করে একজন মানুষ কিভাবে তার বাকি জীবনে পায়ে পায়ে পুণ্যার্জনের পথ ধরে এগিযে চলল, —এই গ্রন্থ তারই বর্ণনা। এটি একটি রূপকধর্মী রচনা। এর বিষয় খৃষ্টানের জীবনপথ পরিক্রমণ। সে তার পথ চলার নানা নির্দেশ বাইবেল থেকে নেয়। কখনো কখনো সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রকাণ্ড দৈত্যের মত তাকে থামিয়ে দেয়। 'ধ্বংসের নগরী' (City of Destruction) থেকে বেরিয়ে পড়া হচ্ছে তার খ্রীষ্টিয় আদর্শ পরিগ্রহণ। কিন্তু এতকালের পাপ বোঝার মত তার উপর চেপে থাকে। পাপের সঙ্গে তার লড়াই যেন ধ্বংসের দেবতা 'এ্যাপোল্লিয়নের' (Apollyon) সঙ্গে লড়াই। ঐশ্বরিক বাণীর ব্যাখ্যাতা ইভ্যানজেলিষ্ট (Evangelist) তার পরামর্শদাতা। এক গভীর নদীস্রোত অতিক্রম করে যাওয়াই রূপকের অর্থে মৃত্যুর পরপারে তার চলে যাওয়া।

বিনিয়নের কাহিনী রোমাঞ্চ এবং উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে ক্রিশ্চিয়ানারও (Christiana) ওই একই পথ ধরে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রগতি।

বিভিন্ন চরিত্রের গুণানুসারী নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলি যেন আমাদের পরিচিত নানা ধরনের বাস্তব মানুষের চরিত্র।

তীর্থযাত্রীর নিজের চরিত্রে পরিত্রাণের জন্য, পবিত্র হওয়ার জন্য আকুতি আমরা আমাদের নিজেদের হৃদয়ে অনুভব করি।

সমস্ত বিষয়টির স্বাভাবিক সৌন্দর্য আরও বেড়ে গেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ বর্ণনার দ্বারা। ধর্ম ও সুনীতির রূপক অভিব্যক্তিও সেই সঙ্গে স্বাভাবিক হয়েছে।

যেহেতু এতে বাইবেলের ভাষার সুনিপুণ অনুসরণ করা হয়েছে, সুতরাং অশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত সকলের কাছেই এর শক্তিশালী আবেদন রয়েছে।

বিনিয়ন নতুন কিছু বলেন নি, —না বিষয়ে, না কাহিনীবিস্তারে। এমন কি নতুন 'ভাবে' বলার কথা যদি ওঠে, সেখানেও বলতে হয়, —রাজতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার (১৬৬০) এবং সমারোহময় সাহিত্যের পুণরারম্ভের বিশ বছরের ভিতরে তিনি শুধু তাঁর নিজের কথা নয়, -—সমস্ত গরীব ধর্মভীরু মানুষের মনের কথা তাদেরই শুনিয়েছেন অনাড়ম্বর চিত্তাকর্ষক ভাষায়।

ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe) ১৬৫৯—১৭৩১

ডিফোর লেখার নিজস্ব কোন অভিজাত্য ছিল না। তিনি ফরমায়েসী লেখা লিখতেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে দরকার মত কথা লিখে দিতেন। জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। জীবন যে খুব সুশৃঙ্খল ছিল তা-ও মনে হয় না।

ডিফো বিপুল সংখ্যায় লিখেছেন। কিন্তু একটি বিশেষ বড় গল্পের জন্য তাঁর বিশ্বময় পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা। বইটি 'রবিনশন ক্রুশো এবং তার জীবন ও আজানা বিস্ময়কর অভিযানগুলি' (Life and Strange surprising Adventures of Robinson Crusoe)। বইটি ১৭১৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'রবিনসন ক্রুশো'র জনপ্রিয়তা বোধ হয় একমাত্র 'আজব দেশে এ্যালিস' (Alice in Wonderland—Lewis Carroll) ছাড়া পাশ্চাত্ত্যের আর কোন গল্পের নেই।

রবিনসন ক্রুশোর গল্প—সত্যঘটনার ভিত্তিতে গল্প—অবশ্যই কিছু কল্পনা যোগ করে। গল্প হচ্ছে সেই মাটি যার উপর নভেল নামক সাহিত্যের সবচেয়ে বড সৌধ দাঁড়িয়ে থাকে। ডিফো নভেল লেখেন নি; কিন্তু নভেলের সূত্রপাত করে গেছেন। সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক (Alexander Selkirk) নামক কোন নাবিকের দৈবদুর্বিপাকে পড়ে দুরবস্থা রবিনসন ক্রুশো গল্পের প্রেরণা। আত্মজীবনীর ছাঁদে লেখা।

সাধারণভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষের কাছে—কিংবা তার থেকেও বেশী, ছোটদের কাছে—এই অভিযানের কাহিনী খুব জনপ্রিয়। এর থেকে নীতিশিক্ষাও বার কবা হয়। চেষ্টা এবং ইচ্ছা যদি থাকে এবং ভগবান যদি সহায় হন তবে মানুষ নির্বান্ধব আজানা পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকতে পারে এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতা জয় করতে পারে।

ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকা গল্পটির গঠন এবং নানা পরিস্থিতিতে যত্র তত্র জোড়া দেওয়া এর শিল্পগত ত্রুটির লক্ষণ। অবশ্য এর জনপ্রিয়তা এবং অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষমতা অসীম। গল্পটি পড়লে নির্জনতার বিপদ এবং ভয়ের কথা তত মনে হয় না; বরঞ্চ সেগুলিই উপভোগ্য হয়।

শিল্প হিসাবে বড় ত্রুটি এই যে রবিনসনের মানসিক আবেগ ভালভাবে ফোটান হয়নি; —হয়ত ডিফোর পক্ষে তা আদৌ সম্ভব ছিল না।

ডিফো গল্প লিখেছেন গল্প বলার ভঙ্গীতে। বিবেক আর আবেগের তেমন খোঁজ তিনি রাখতেন না।

অন্যান্য লেখার মধ্যে আর একটি তাঁর বিখ্যাত কাহিনী 'খ্যাতনামা মল ফ্ল্যাণ্ডার্সের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য' (Fortunes and Misfortunes of the famous Moll Flanders)। এটি প্রকাশিত হয় ১৭২২ সালে।

এটি এবং আরও কয়েকটি 'পিকারেস্ক' ধরনের কাহিনী। স্পেনীয় ভাষায় 'পিকারো' (Picaro) শব্দটির মানে 'ভ্রাম্যমান দুর্বৃত্ত'। এর থেকে একজাতীয় নভেলের নাম হয়েছে 'পিকারেস্ক নভেল' (Picaresque Novel)।

ভাগ্যের প্রতিকূলতায় বঞ্চিত ও হতভাগ্য একটি মেয়ের বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবন, চৌর্যবৃত্তির পেশা এবং পরবর্তী জীবনে অনুতাপ, স্বচ্ছলতা ও সুখশান্তি, —এই হচ্ছে 'মল ফ্ল্যাণ্ডারস' গল্পের বিষয়। প্রধান চরিত্র একটিই। 'সত্যঘটনা' বলার ভঙ্গীতে আত্মজীবনী।

এই সব গল্পে অভিযানের থেকে নীতিমূলক কাহিনী লেখার ইচ্ছাটাই হয়ত ডিফোর বেশী ছিল।

জোনাথান সুইফট (Jonathan Swift) ১৬৬৭—১৭৪৫

ইংরাজ হলেও আয়ার্ল্যাণ্ডেই জোনাথান সুইফটের জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছিল। দুর্ভাগ্যময় জীবন। বিষন্নদর্শন মানুষ। সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধেই তাঁর যেন আক্রোশ। ছোটবেলা থেকেই এইরকম। অসম্ভব শারীরিক কষ্ট। প্রথমে কানের যন্ত্রনা, তারপরে তার থেকে মাথার যন্ত্রনা, শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। পাগল হয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই যে ব্যঙ্গ তিনি উদগার করে গেছেন তাতে যেমন তাঁর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার করুণ প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি সারা জগতের নিষ্করুণ মনোভাবও বিদ্রুপের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছে।

যাজক বৃত্তি অবলম্বন করতে হযেছিল। অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভা সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে থাকতে বাঞ্ছিত স্বীকৃতি পাননি। এই হচ্ছে জোনাথান সুইফট। ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম স্যাটায়ার-লেখক।

১৭০৪ সালে 'গ্রন্থদের লড়াই' (The Battle of the Books)—প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের তুলনা। ওই একই বছরে 'বাক্যবাগীশ যাজকের গল্প' (A Tale of a Tub), —রূপকের আকারে যাজকদের প্রতি তীব্র আক্রমণ। তাঁর নিজের ধর্মসংঘের (Church of England) যাজকরাও রেহাই পাননি। এই বইয়ের জন্যই রাজকীয় প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'গলিভারের ভ্রমণকাহিনী' থেকেও বোধহয় এই বইটির ব্যঙ্গ তীব্রতর। সামাজিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে সমালোচনার বিষয় হলেও 'বাক্যবাগীশ যাজকের গল্প' সুইফটের সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

তিনি মানুষের যে উচ্চ আদর্শ আশা করেছিলেন বাস্তবজগতে তা না পেয়ে যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন। 'গলিভারের ভ্রমণকাহিনী' এই প্রচণ্ড আপত্তিরই সাহিত্যিক রূপ। নিরীহ গল্পের আকারে জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যঙ্গসাহিত্য। হোরেস ওয়ালপোল (Horace Walpole ১৭১৭—৯৭) তাঁকে ক্ষ্যাপা জন্তু (Wild Beast) বলেছেন। কিন্তু কার্লাইল (Thomas Carlyle ১৭৮৫—১৮৯১) তাঁকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষ বলেছেন।

১৭২৬ সালে প্রকাশিত 'গলিভারের ভ্রমণকাহিনী' তাঁর বহুল পরিচিত প্রচ্ছন্ন সমালোচনার বই।

গলিভারের ভ্রমণকাহিনী (Gulliver's Travels) ১৭২৬

লেমুয়েল গলিভার (Lemuel Gulliver) একটি বাণিজ্যপোতের চিকিৎসক।

গলিভারের চারবার ভ্রমণের মধ্যে প্রথমটি ছিল ক্ষুদে মানুষদের (Lilliputians) দেশে। দ্বিতীয়টি দৈত্যদের (Brobdingnagians) দেশে। তৃতীয়টি কল্পনাবিলাসী দার্শনিকদের (Laputians) দেশে এবং চতুর্থটি বুদ্ধিমান প্রাণী ঘোড়াদের (Houyhnhnms) দেশে। মানুষের অহঙ্কার, মানুষের ক্ষুদ্রতা, মানুষের বিজ্ঞতার অন্তঃসারশূণ্যতা এবং মানুষের পশুত্বকে তিনি প্রকট করেছেন গলিভারের চারটি ভ্রমণ ও তার অভিজ্ঞতার ছদ্মবেশে। চতুর্থ ভ্রমণকাহিনীতে 'মানুষ' অর্থাৎ Yahoo-রা Houyhnhnms-দের নীচপ্রকৃতির ভূমিদাস।

গলিভারের ভ্রমণকাহিনী একাধারে কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনী, রূপক ও স্যাটায়ার।

সুইফট বলেছিলেন, "যে প্রাণীকে 'মানুষ' বলা হয় তাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।" এর দ্বারা মানুষের প্রতি ঘৃণাও যেমন বোঝায় তেমনি তার উচ্চ আদর্শও বোঝায়।

সুইফট ব্যক্তিগতভাবে কারোকে আক্রমণ করেননি। তাঁব আক্রমণ মানবপ্রকৃতিকে।

তাঁর লেখার এক প্রকাণ্ড মৌল শক্তি ছিল যা সাধারণ সমালোচনাকে শতযোজন পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল।

সুইফট যথার্থ জ্ঞানেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই জ্ঞান হতাশা ও বিষন্নতা নিয়ে আসে। কারণ মানুষের জগৎ সে জ্ঞানের উপযুক্ত নয়।

জর্জ বার্কলে (George Berkeley) ১৬৮৫—১৭৫৩

বার্কলে যাজক ছিলেন। সদাশয় পরোপকারী মানুষ। তিনি সুন্দর সাহিত্যের ভাষায় দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা করেছিলেন। আমাদের দেশের রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে।

ডেভিড হিউম (David Hume) ১৭১১—১৭৭৬

দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' (History of England) ১৭৬১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁকে ঐতিহাসিক গিবনের (Edward Gibbon ১৭৩৭—৯৪) অগ্রজ বলা যায়। হিউমের ইতিহাস ইংল্যাণ্ডের প্রথম জনপ্রিয় ইতিহাস, —যদিও তা বিশৃঙ্খল ও প্রমাদপূর্ণ।

এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke) ১৭২৯—১৭৯৭

হুইগ পার্টির নেতা চার্লস জেমস ফক্স (Charles James Fox) ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ওই দলেই ছিলেন আইরিশ বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক। ফক্স এবং বার্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। বার্ক ফরাসী বিপ্লববাদীদের বিপক্ষে ছিলেন। পার্লামেন্টে

বার্কের যুক্তির বিরুদ্ধে ফক্স বক্তৃতা দিলেন। ফরাসী বিপ্লববাদীদের নিষ্ঠুর কার্যকালাপ বার্কের মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী ছিল। ফক্স নিজের বক্তৃতার শেষে সাশ্রুলোচনে বার্ককে বললেন,—"আমি আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যাবে না।" বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ বার্ক বললেন,—"অবশ্যই যাবে।" বার্কের সঙ্গে ফক্সের চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেল। নীতির চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বার্কের কাছে বড় ছিল না। এমনই ছিলেন নিষ্ঠাবান, নীতিবাগীশ, রক্ষণশীল, ক্ষাত্রধর্মী, বৃটিশসাম্রাজ্যের আভিজাত্য ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠ সচেতক এডমণ্ড বার্ক।

১৭২৯ সালে ডাবলিনে জন্ম। সচ্ছল পরিবার। পিতা আইনজীবি, প্রোটেষ্ট্যান্ট। পুত্র ধর্মীয় ব্যাপারে উদার, পক্ষপাতহীন। মানুষহিসাবে মহৎ, অসাধারণ পরোপকারী।

বার্ক ছিলেন শ্রেষ্ঠ বৃটিশবাগ্মী। তাঁর পড়াশুনা ছিল প্রচুর। হুইগ পার্টি তাঁকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করিয়ে নিত; কিন্তু তাঁর যোগ্য স্বীকৃতি দিত না।

বার্কের রাজনৈতিক বক্তৃতা কাব্যগুণে অলঙ্কৃত থাকত। ভাষায়, চিন্তায়, শব্দবিন্যাসে, অলঙ্কারে তাঁর বক্তৃতাগুলি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা হয়ে যেত।

তাঁর সাহিত্যিক রচনা ও সাহিত্য গুণসমন্বিত বক্তৃতাগুলির মধ্যে ছিল-— "দার্শনিকের অনুসন্ধান' (A Philosophical Enquiry), 'ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ' (Impeachment of Warren Hastings), 'ফরাসীবিপ্লবের সম্বন্ধে নানা চিন্তা' (Reflections on the Revolution in France), 'রাজহত্যার মূল্যে প্রাপ্ত শান্তির বিষয়ে পত্রাদি' (Letters on a Regicide Peace), 'আমেরিকার সহিত আপস সংক্রান্ত বক্তৃতা' (Speech on Conciliation with America), 'বৃষ্টলের শেরিফদের নিকট লিখিত পত্রাদি' (Letters to the Sheriffs of Bristol) ইত্যাদি। তিনি ভারতবর্ষে কখনো আসেননি! কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন উপলক্ষ্যে তিনি অবিচারপীড়িত ভারতীয় প্রজাদের যে ছবি তুলে ধরেছিলেন, তা তাঁর কল্পনা ও সহানুভূতির শ্রেষ্ঠ সমন্বয়।

পার্লামেন্টারিয়ান এবং রাজনীতিতে সম্পূর্ণ মগ্ন বার্ক ইংরাজী সাহিত্যের এক শক্তিশালী স্তম্ভ।

এই মহান মানুষটির শেষ জীবন ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যে করুণ, রাজনৈতিক বঞ্চনায় নিষ্ঠুর।

এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) ১৭৩৭—১৭৯৪

ইতিহাস পড়ার ঝোঁক অল্প বয়স থেকেই। পড়েছিলেন নিজে নিজেই। কোন প্রতিষ্ঠনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। পড়াশুনা করে বুঝেশুনে ক্যাথলিক ধর্ম নিয়েছিলেন।

ফরাসী ভাষা শিখে, সুইজারল্যাণ্ডে বেশ কিছুদিন থেকে, প্যারিস এবং রোম পরিদর্শন করে প্রাক্ খৃষ্টান পুরাতন জগৎ থেকে কনষ্টান্টিনোপলের পতন এবং আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব পর্যন্ত ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা করেন। ১৭৭৬ সাল থেকে শুরু করে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে ভাগে ভাগে এই প্রকাণ্ড ইতিহাস তিনি লেখেন। বইটির নাম 'রোমক সাম্রাজ্যের অধোগতি ও বিনাশ' (The Decline and Fall of the Roman Empire) বা সংক্ষেপে 'অধোগতি ও বিনাশ' (The Decline and Fall)।

খ্রিষ্টানধর্মের বিকাশ ও প্রসারকে অন্ধস্তাবকতার দৃষ্টিতে না দেখে, ইতিহাসের গতিসূত্র ধরার একটা অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে তিনি মানব ইতিহাসের দূরবিন্যস্ত পথ পরিক্রমণ করে গেছেন। রোমক সাম্রাজ্যের অধোগতি ও বিনাশকে অবলম্বন করে ইউরোপ মহাদেশে মানবসভ্যতার ক্রমশঃ পরিবর্তন তিনি দেখিয়ে গেছেন এই প্রকাণ্ড বিস্ময়কর চিত্রপটে। আলোচ্য ইতিহাসের ব্যাপ্তি কালের হিসাবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

পুরাতন জগতের ধ্বংস এবং নতুন সভ্যতার আবির্ভাবকে তিনি অলৌকিক, রহস্যময় করে দেখাননি। কার্যকারণ সূত্র পরপর গেঁথে তিনি স্বাভাবিক ক্রমপরিণতি দেখিয়েছেন। খ্রিষ্টধর্মের অবির্ভাব দেখাতে গিয়ে তিনি কোন মানসিক কৈবল্যে বিহ্বল হয়ে যাননি। তিনি অবলম্বন করেছিলেন বুদ্ধি ও যুক্তি। অতীতের পর্দা ভেদ করে তিনি তাঁর দৃষ্টি দূরপ্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন।

গিবন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছে দেখিয়ে গেছেন ইতিহাস কি করে লিখতে হয়। নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসা এবং আবেগময় কবিদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে 'অধোগতি ও বিনাশ' গন্থে। সত্যের অন্বেষণে তিনি কোন অন্ধ ধর্মীয় আনুগত্যকে প্রশ্রয় দেননি।

প্রায় বার বছর ধরে এই মহাগ্রন্থের বিষয় নিয়ে তিনি সাধনা করেছিলেন, —এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন ভোররাত্রে মোমবাতির আলোয় তাঁর বাগানে বসে যখন এই লেখা শেষ করলেন তখন তিনি যেমন এক প্রকাণ্ড স্বস্তি অনুভব করলেন, তেমনি তাঁর দুঃখ হল এই ভেবে যে তাঁর এতদিনের নিত্যসঙ্গীর সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের ঘনিষ্ঠতা আর থাকল না। বিষয় ও ব্যক্তির মধ্যে এই আন্তরিক বন্ধুত্ব না থাকলে এত বড় কিছু সৃষ্টি করা যেত না।

বসওয়েল (James Boswell) ১৭৪০—৯৫

মেকলে বলেছিলেন জীবনীলেখক হিসাবে বসওয়েল সহজেই তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে টপকে যান। আবার (মেকলের কথাতেই), এই একই বসওয়েল বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে সবচেয়ে হীন। তাঁর তুচ্ছতার জোরই তাঁর বিস্ময়কর সাফল্যের আসল কারণ।

কারও কারও মতে বসওয়েল অতিমাত্রায় নির্বোধ না হলে এত বড় লেখক হতে পারতেন না। শুধু সত্যানুশীলন এবং ঘটনা ও বিষয়ের সম্পূর্ণ সঠিকতা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই লেখা যায় না। লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা থাকা চাই। সত্য এবং তথ্যের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে হয়। লেখকের ব্যক্তিত্বই তাঁর লেখাতে প্রাণসঞ্চার করতে পারে। যা দেখা যায় তা অন্যকে দেখাবার মত করতে গেলে, বিশেষ এক ধরনের মানসিক গঠনের দরকার। ব্যাখ্যেয় বস্তু এবং ব্যাখ্যাকারী (বিশেষ এক মানসিক গঠনের) লেখক, —এই দুয়ের সুষম সমন্বয়ে শিল্পসৃষ্টি। জীবনচরিত যদি শিল্প হয় তবে সেই শিল্প সৃষ্টি করবার প্রয়োজনীয় মানসিকতা বসওয়েলের ছিল।

বসওয়েল স্কটল্যাণ্ডের লোক। শিক্ষিত মানুষ। তাঁর জীবনের একটা অদ্ভুত নেশা ছিল বড় বড় মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের ছোট বড় সব কাজ লক্ষ্য করে যাওয়া।

অবশ্যই এর দ্বারা একধরনের হীনমন্যতা প্রকাশ পায়। বসওয়েলের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। হয়ত তিনি পুরোপুরি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না বলেই আমরা জনসনের সম্বন্ধে কত ছোট ছোট কথাও জানতে পারছি। আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে বড কিছু দিয়ে যাওয়ার কথা আমরা নানা প্রসঙ্গে পেয়ে থাকি। বসওয়েলও সেই শ্রেণীভুক্ত। আত্মমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন অসামান্য গ্রন্থ—'স্যামুয়েল জনসনের জীবনী' (The Life of Samuel Johnson)। বইটি ১৭৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, —জনসন মারা যাবার সাত বছর বাদে। এইটিই ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম জীবনীগ্রন্থ।

বইখানি প্রকাশিত হবার পর বসওয়েলের গর্ব ছিল, তিনি সমস্ত দেশকে 'জনসনীভূত' (Johnsonised) করতে পেরেছিলেন। সবাইকে দিয়ে জনসনের কথা বলাতে পেরেছিলেন এবং আজও পারছেন। বহুযুগ ধরে জনসন যে বেঁচে আছেন, তার পিছনে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন বসওয়েল। "তুচ্ছ" বসওয়েলের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

গ্রন্থটির মূলগত লক্ষণ, —লেখার বিষয়ের সঙ্গে লেখকের একাত্ম হয়ে যাওয়া, আত্মপ্রকাশের প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে একপাশে সরিয়ে রাখা, গ্রন্থকারের অসীম ধৈর্য, পরিশ্রম ও সহনশীলতা সত্ত্বেও লেখার সাবলীলতা অক্ষুন্ন রাখা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়কেও গুরুত্ব দেওয়া, পাঠকের মনে অনুসন্ধিৎসা বজায় রাখা, সত্যপরায়ণতা এবং যথাযথতা থেকে বিচ্যুত না হওয়া।

এর পরে আমরা বর্তমান ইংরাজী সাহিত্যের তথা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা 'নভেলের' কথায় আসব।—

।। এক ।।

ল্যাটিন 'Novellus' বা 'Novus' শব্দ থেকে ইটালিয়ান 'Novella' কথাটি এসেছিল। 'Novella' কথাটির মানে 'Storia' বা 'Story'। মূল মানে হয়ত 'গল্প'-ই হবে। ঘটনার বিন্যাসে অথবা চরিত্রের বিশ্লেষণে বিশিষ্ট এক জাতের গল্প।

সংক্ষেপে নভেলের সংজ্ঞা হচ্ছে গদ্যে লেখা কোন এক বিশেষ দৈর্ঘ্যের কল্পসাহিত্য। ই. এম. ফর্স্টার (E. M. Forster) বলেছেন দৈর্ঘ্য যেন ৫০০০০ শব্দের কম না হয়।

নভেল ব্যাপৃত থাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ব্যক্ত করার কাজে। এই কাজে নানা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, নানা উদ্দেশ্য থাকে, নানা মতামত থাকে।

যে গদ্যলেখায় প্রকৃতি একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে সেখানেও প্রকৃতির সান্নিধ্য, প্রকৃতির রূপ, প্রকৃতির অবদান মানুষের উপর কি প্রভাব বিস্তার করছে এবং প্রকৃতির পটভূমিকায় এক মানুষের আরেক মানুষের সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকছে, কি থাকতে পারে—ইত্যাদি সম্পর্কে গল্পাকারে বিবৃতি নভেলের এক বিশেষ ধরন।

মানুষে মানুষে সরাসরি সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বর্তমানের পাঠককে অতীতের মানুষের কার্যকলাপ, চিন্তাভাবনা, আশা-আনন্দের খবর দেওয়ার ইচ্ছা মানুষের মনে আসতে পারে। তখন তৈরী হয় নভেল।

দূরের মানুষের নানা কার্যকলাপ, চিন্তা এবং মানসিক আন্দোলন আমরা নভেল পড়ে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং তার দ্বারা আমরাও হয়ত প্রভাবিত হতে পারি। কিংবা সে সমস্ত কথা আমাদের শুধু ভাল লাগতে পারে, বিস্মিত করতে পারে, উৎসাহিত করতে পারে, আশ্বাস দিতে পারে।

বিভিন্ন মানুষের উপর একই নভেলের বিভিন্ন প্রভাব থাকতে পারে। আমার নিজের কথা বলতে পারি: আমি যখন সমারসেট মমের 'The Moon and Six Pence' পড়লাম আমি আমার মনের উপর খুব ভারী একটা চাপ অনুভব করলাম। টমাস হার্ডির 'The Mayor of Casterbridge' যখন পড়লাম, তখন দুশো বছর আগের এক জগতের হালকা-বিষন্ন-হারিয়ে যাওয়া ছবি আমি দেখতে পেলাম। সে জগৎ আর ফিরবে না।—

'The Stream will not flow, and the hill will not rise,

আমার এই ব্যক্তিগত বোধ নিশ্চয়ই অন্য সকলের ক্ষেত্রে এক নয়।

আবার, পাঠকের নিজের যুগে, নিজের পরিবেশের নভেলে নানা মানুষের সমাবেশে মানুষ (পাঠক) বিভিন্ন মানুষের পরস্পরের সান্নিধ্য, দূরত্ব, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অনুসন্ধিৎসা, সমতা, সামঞ্জস্য ইত্যাদি অনুভব করতে পারে।

সবচেয়ে বড় যে কথা সেটা এই যে মানুষের যে দুর্জ্ঞেয় মন, যাকে ব্যাখ্যা করেও ব্যাখ্যা করা যায় না, যার ভিতরে প্রবেশ করতে হয় কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে, সেই

মন তার ব্যক্ত বা আভাষিত কাজ, কথা, ইশারা, ইঙ্গিতের মাধ্যমে আমাদের কাছে বাস্তবের বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তখন যে সব চরিত্রের এবং মানসিকতার সান্নিধ্যে আমরা আসি সেগুলি হয়ে ওঠে খুব প্রত্যক্ষ, খুব বাস্তব। এগুলি নভেলের অন্তঃশীল উপাদান।

তারপর থাকে অতীতের, অথবা বর্তমানের হয়েও অদেখা, পরিবেশের একটা আকর্ষণ। চিন্তার বহুবিস্তৃত বিচরণ—যাকে আমরা বলতে পারি ইতিহাস-আশ্রিত সত্য অথবা কাল্পনিক কাহিনী। সত্যঘটনা বলবার মত বললে নভেল হতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনার গভীর পরিবেষ্টন বাস্তবকে ঘিরে রাখে, —এবং তখন আমরা দূরের বাস্তবকে একটা মোহের দৃষ্টি নিয়ে দেখি, এবং সেই দেখার ফলেই নভেল লেখা এবং নভেল পড়া যায়।

নভেলে যে উপাদানগুলির কাজ থাকে সেগুলি হচ্ছে কিছু মানুষ, এক বা একাধিক গল্প, বিশেষ একটি বা বিশেষ কয়েকটি পরিস্থিতি। এ সবকে এক জায়গায় নিয়ে এসে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বকে একটি অস্তিত্বের ভিতর ওতপ্রোতভাবে সংঘবদ্ধ করে রাসায়ণিক যৌগিক পদার্থের মত নতুন একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারলে তবেই নভেল সৃষ্টি হয়।

নভেল বাস্তব হয়েও বাস্তব নয়, কারণ সংহতি উপাদানগুলিকে এক নতুন অস্তিত্ব দেয়। আবার অবাস্তব হয়েও বাস্তব,—কারণ এই যৌগ পদার্থকে আমরা গ্রহণীয় বলে স্বীকৃতি দিই।

নভেলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে লেখকের কল্পনার বিস্তৃতি, সূক্ষ্মতা, বলবার ধরন, এবং মানুষকে মানুষেব কাছে উপস্থিত করবার ক্ষমতার উপরে।

হাডসন (W. H. Hudson) বলেছেন,—প্লট (অর্থাৎ ঘটনা, কার্যকলাপ এবং সেগুলির ফল), চরিত্র, কথোপকথন, স্থান, কাল, স্টাইল এবং একটি ব্যক্ত বা স্বতঃস্বীকৃত জীবনদর্শনের সম্মিলিত যৌগ রূপ পরিগ্রহণের নামই নভেল।

॥ দুই ॥

মহাকাব্য, গাথা, সত্যকাহিনী, রোম্যান্স ইত্যাদিতে গল্প ছড়িয়ে আছে নানা আকারে। নভেলও ঠিক এই রকমই গল্প বলার এক বিশেষ ধরন। ষোড়শ শতাব্দীর স্যার ফিলিপ সিডনির (Sir Philip Sidney) 'আর্কাডিয়াতে' (Arcadia—১৫৯৮) প্রথম নভেলের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। এর উপরে উইলটনের (Wilton) গ্রাম্য প্রকৃতির প্রভাব খুব . শী। 'আর্কাডিয়া' আসলে গদ্যে লেখা একটি অনবদ্য রোম্যান্স। তবে আরও আগে চশারের 'ট্রয়লাস এবং ক্রিসিড'-এ (Troilus and Criseyde—১৩৮৭) অবশ্যই গল্প পাওয়া যায়; —কিন্তু গ্রন্থটি কবিতায় লেখা। নভেল গদ্যে লেখা হওয়া চাই।

অন্যান্য গল্পের সঙ্গে নভেলের তফাৎ এই যে নভেলে গল্পের সঙ্গে চরিত্রচিত্রণ এবং সামাজিক পটভূমিকা পাওয়া যায়। শুধুমাত্র গল্পে তা পাওয়া যায় না।

কাজেই, যে ধরনের গদ্য লেখায় কোন এক যুগের পটভূমিকায় চরিত্রচিত্রণের প্রয়োজনে বিভিন্ন মানুষের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পায়, এবং নরনারী তাদের বিশেষ পরিবেশের মধ্যে নানা ক্রিয়াবিক্রিয়া ঘটায় তাকেই নভেল বলা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মধ্যবিত্ত জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার মোটামুটি প্রসার ঘটে। স্ত্রী-শিক্ষারও পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে আর্থিক সচ্ছলতার দরুণ মানুষের হাতে কিছু অবসর সময় জমা হয়। এইভাবে নভেলের চাহিদার সৃষ্টি হয়। আবার গল্প শোনার নেশা যেমন চিরকালের, তেমনি ওই সময় থেকে গল্প হাতে পাওয়ার সুযোগও এসে যেতে থাকে। এ ব্যাপারে 'চলমান পাঠাগারের' একটা ভূমিকা ছিল (Circulating Libraries)। মহিলারা দীর্ঘ শীতের অপরাহ্ন কাটানোর জন্য পড়বার মত দীর্ঘ গল্প চাইতে থাকেন। ঘটনাচক্রে এই সময় থেকে বেশ কিছু গদ্য-গল্পকারের আবির্ভাব হতে থাকে। কাজেই চহিদার উপযোগী যোগানের অভাব হয় না। এইভাবেই গদ্যগল্পের—এবং বিশেষ ধরনের বড় গল্প অর্থাৎ নভেলের আবির্ভাব হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে রিচার্ডসনের (Samuel Richardson ১৬৮৯—১৭৬১) 'প্যামেলা'কে (Pamela, or Virtue Rewarded—১৭৪০) প্রথম নভেলের গৌরব দেওয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার আগেই যাঁরা নভেল লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম—রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ণ, স্মলে, গোল্ডস্মিথ, ওয়ালপোল ও র‍্যাডক্লিফ।

এঁদের সম্বন্ধে দু'এক কথা আমরা এখানে বলব।

স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson) ১৬৮৯—১৭৬১

প্রথম জীবনে ছাপাখানায় শিক্ষানবিসি করেছিলেন। পরে মুদ্রাকরের কাজেই অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন।

রিচার্ডসনের উপন্যাসিক হওয়ার পিছনে একটা কাহিনী আছে। তের বছর বয়সেই তিনজন লেখাপড়া না-জানা স্ত্রীলোকের বিশ্বাসভাজন হয়ে তাদের চিঠিপত্র লিখে দিতেন। এই করতে করতে ভাষা, মনস্তত্ত্ব, মানুষের স্বভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ভাল ধারণা এসেছিল। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ জীবনে খুব কাজে লেগেছিল।

রিচার্ডসন কাহিনীকে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা এবং মনস্তাত্ত্বিক নানা ব্যাখ্যা দিয়ে অযথা বাড়িয়ে দিতেন। এখনকার কাল হলে সম্ভবতঃ ওরকম কিছু চলত না। তবে নানা মানুষকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার ঝোঁক তাঁর খুব ছিল। ভদ্র এবং নৈতিক আচার আচরণের শিক্ষা দেওয়া তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। রিচার্ডসনের প্রধান চরিত্রগুলি নানা আবেগময় পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সুস্থির জীবনের সন্ধান পেত অথবা পাঠককে সেই সন্ধান দিয়ে যেত। রিচার্ডসনের দরদী মন ছিল। তিনি সুনীতিকে খুব মানতেন।

১৭৪০ সালে তিনি তাঁর নিজের লেখা বই প্রকাশ করেন। এই বইটির নাম 'প্যামেলা বা ধর্মের জয়' (Pamela or Virtue Rewarded)। বইটিতে কতকগুলি চিঠি পরপর সাজিয়ে একটা কাহিনীর ধারণা দেওয়া হয়েছে। প্যামেলার করুণ জীবন; তবে ধীরে ধীরে সে বিপদআপদ কাটিয়ে উঠল। —এ সবের আবেদন তখনকার সরলপ্রকৃতির মহিলাদের কাছে খুব বেশী ছিল।

রিচার্ডসনের উপন্যাসগুলি খুব দীর্ঘ হত। সহ্যশক্তি, আত্মদান, —এই সব গুণ রিচার্ডসন খুব বড় করে দেখিয়েছেন।

রিচার্ডসনের দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ক্ল্যারিসা হার্লো (Clarissa Harlowe—১৭৪৮)। এতেও নৈতিক সততার কথা। প্রচণ্ড নৈতিক সততার দরুণ ক্ল্যারিসাকে প্রাণ দিতে হ'ল। কাহিনী নাটকীয় হোক চাই না হোক লেখার ধরন জায়গায় জায়গায় নাটকীয়। ক্ল্যারিসা অত্যাচারিত, কিন্তু তার মর্মান্তিক পরিণতি অত্যধিক সরল ধর্মবিশ্বাসের দরুন। নারীর চারিত্রিক শুদ্ধতা আজকের দিনে খুব কম ইংরাজ মহিলাই এতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখা একান্ত উচিৎ বলে মনে করবেন।

'প্যামেলা'-তে রিচার্ডসন নিম্ন মধ্যবিত্ত চরিত্রকে সাহিত্যে যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা ইংরাজের গণতান্ত্রিক বোধের ভিতর সহজেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

হেনরি ফিল্ডিং (Henry Fielding) ১৭০৭—১৭৫৪

পেশায় আইনজীবি ছিলেন। টাকাপয়সা করতে পারেননি। এই কাজে থাকায় অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। জীবনে আশা করবার মত, বড় হবার মত তেমন কিছু সামনে পাননি।

১৭৪২ সালে জোশেফ এণ্ড্রুজ (Joseph Andrews), ১৭৪৯ সালে টম জোনস (Tom Jones)—এই দুখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ নভেল।

ফিল্ডিং-এর নভেলে বাস্তব জগতের আচার-আচরণ, কিছুটা কৌতুকময়তা, কিছুটা গভীরতা এবং সর্বোপরি একটি গতিশীল প্রাণশক্তিসম্পন্ন পৌরুষব্যঞ্জক গল্পের এবং গদ্যের দেখা পাওয়া যায়। ফিল্ডিং পর্যবেক্ষণকারী। সহানুভূতির কোমলতায় জড়িয়ে পড়ে পর্যবেক্ষণের গতিকে তিনি আটকাতে চান না।

ফিল্ডিং সামগ্রিকভাবে মানবচরিত্র নিয়েই তাঁর উপন্যাস লিখেছেন। ফিল্ডিং-এর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কখন ভাল, কখন মন্দ। বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি চরিত্রের প্রকৃতি যদি ভাল, তবে সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই চরিত্রটি ভাল। অন্য পরিস্থিতিতে সেই চরিত্র ভাল না-ও হতে পারে। আমরা জগতে বিপুলসংখ্যক মানুষের সংস্পর্শে আসি। তাদের কারুকে ভাল কারুকে মন্দ বলে যে চিহ্নিত করি, সেটা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই মানুষটির পরিচয় যা ব্যক্ত হয়, সেই অনুসারে। এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে সত্য আছে; কিন্তু সেই সত্য অবিচলিত বা চিরস্থায়ী নয়। আবার, একটি মানুষ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খারাপ কাজ করে এবং যদি দেখা যায় যে সেই কাজের পিছনে তার কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা সাময়িকভাবে কাজ করেছে, তবে তার কাজকে আমরা এক কথায় খারাপ বলে চিহ্নিত করতে পারি না।

সাধারণ নৈতিকতা নয়; মানুষের দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেই মানুষের কাজের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই কারণ যেখানে চরিত্রটির দ্বারা স্বীকৃত সেখানে

নৈতিকতা আছে; যেখানে তা স্বীকার করা হয় না সেখানে নৈতিকতা নেই। এই দিক থেকে ফিল্ডিং-এর নৈতিকতার ধারণা বাস্তব, ব্যাপক ও স্থায়ী। ফিল্ডিং-এর নৈতিকতা আমাদের এক ধরনের দিব্যদৃষ্টি দেয় যা আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয়।

ফিল্ডিং-এর 'টম জোনস'
(The History of Tom Jones, a Foundling)) —১৭৪৯
বা
কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে টম জোনসের ইতিহাস

ব্লুমসবেরী হাসপাতাল (Bloomsbury) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে 'ছেলে কুড়িয়ে পাওয়া' প্রায়ই গল্পের বিষয় হত। টম জোনস সেইরকম একটি নামগোত্রহীন ছেলে। তাকে তার পরিচয় খুঁজে বের করতে হয়েছিল নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে। দেবার মত পরিচয় যে তার ছিল তা সে প্রমাণ করে ছেড়েছিল। টম জোনসের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ছোটবেলার অভিজ্ঞতা, এই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। গ্রন্থটির সমাপ্তি আনন্দদায়ক।

গ্রন্থটিতে ১৮টি ভাগ (Books) আছে। প্রত্যেকটি ভাগের ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাগুলি উৎকৃষ্ট গদ্য।

লরেন্স স্টার্ণ (Laurence Stern) ১৭১৩—৬৮

শিক্ষিত যাজকের পেশা নিলেও যাজক বৃত্তি মনের মত ছিল না।

১৭৬৭ সালে 'মাননীয় শ্রীযুক্ত ট্রিসট্র্যাম স্যাণ্ডি মহাশয়ের জীবন ও মতামত' (The Life and opinions of Tristram Shandy, Gent.) প্রকাশিত হয়।

অভাবিত কৌতুকরসসৃষ্টি স্টার্ণের বিশেষত্ব। সঠিকভাবে বলতে গেলে, শুধু কৌতুক নয়, কৌতুকপ্রবণ কিছু চরিত্র ইংরাজী সাহিত্যকে তিনি উপহার দিয়েছেন। আমার মনে হয়, যে সমস্ত ইংরাজ লেখক কৌতুকরসসৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁরা যদি অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন না হন তাহলে ইংরাজ পাঠকও তাঁদের নিজেদের লোক বলে মানতে পারেন না। স্টার্ণের লেখা মানুষ আগ্রহ করে পড়েছিল। কৌতুকবোধ ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখার সর্বত্র। কিন্তু তাঁর কাহিনীগুলির বাস্তবভিত্তি অত্যধিক ভাবপ্রবণতায় সিক্ত, এমনকি তাতে কোথাও কোথাও সামঞ্জস্যবিহীন কারুণ্য রয়ে গেছে যার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেওয়া যায়নি। এই ভাবপ্রবণতা কৃত্রিমভাবে পরিকল্পিত নয়। স্টার্ন মানুষটাই ছিলেন ভাবপ্রবণ। কিন্তু তাঁর কৌতুকবোধ সেই আবেগকে একঘেয়েমি থেকে রক্ষা করেছে।

স্টার্ণের ত্রুটি ছিল। চরিত্রগুলি আলাদা আলাদাভাবে পূর্ণাবয়ব হলেও তাঁর গল্প সুগঠিত রূপ পায়নি। এখানেও তাঁর সহজ কৌতুকবোধ তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে রেখেছে।

টবিয়া স্মলে (Tobia Smollett) ১৭২১—৭১

'পিকারেস্ক' নভেলের কথা আমরা ইতিপূর্বেই ড্যানিয়েল ডিফো প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। ইংরাজী সাহিত্যে এই পিকারেস্ক (Picaresque) নভেলের শ্রেষ্ঠ লেখক টবিয়া স্মলে। প্রথম জীবনে শল্যচিকিৎসকের সহকারী ছিলেন। ওই কাজেই পরে যুদ্ধজাহাজে নিযুক্ত হন। কিছু কিছু সামরিক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সমুদ্র ভ্রমণের নিত্যনতুন অভিজ্ঞতাও তিনি পেয়েছিলেন। নানা ভূখণ্ড, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গেও চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল। বৈচিত্রময় সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা তিনি নিজে যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি পাঠককেও দিয়ে গিয়েছিলেন পড়বার মত এক নতুন ধরনের গল্প। এই অবদান স্মলের বিশেষত্ব।

১৭৪৮ সালে 'রোডেরিক র‍্যাণ্ডমের অভিযান সমূহ' (The Adventures of Roderick Random) প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সাহিত্যকর্মে বাকি জীবন কাটান।

'রোডেরিক র‍্যাণ্ডম' কাহিনীর নায়ক জলদস্যু। তার জীবন দুঃসাহসিক অভিযানে পূর্ণ। এই 'পিকারেস্ক' জাতীয় গল্পের সূচনা হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে টমাস ন্যাসের (Thomas Nash ১৫৬৭-১৬০১) হাতে। সেই হিসাবে ন্যাসের 'হতভাগ্য পথিক বা জ্যাক উইলটনের জীবন' (The Unfotunate Traveller, or the life of Jack Wilton—১৫৯৪) ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম 'পিকারেস্ক' কাহিনী।

এই বইটির (রোডেরিক র‍্যাণ্ডম) পরেও স্মলে একই ধরনের আরও কয়েকটি অভিযান ও সাহসিকতার কাহিনী লিখেছিলেন। এগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। স্মলেই প্রথম ঔপন্যাসিক যাঁর লেখায় দুর্দান্ত সামুদ্রিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith) ১৭২৮—৭৪

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতা ও নাটক-প্রসঙ্গ আমরা ইতিপূর্বে গোল্ডস্মিথের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। গোল্ডস্মিথ প্রচুর লিখেছিলেন। তাঁর 'ওয়েকফিল্ডের পল্লীযাজক' (The Vicar of Wakefield—১৭৬৬) শুধু একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য নভেল।

'ওয়েকফিল্ডের পল্লীযাজক' গ্রন্থে গোল্ডস্মিথ একটি জীবন-দর্শন তুলে ধরেছেন যাতে 'পল্লীযাজক' যেন একটি বাস্তব জীবনসত্তা পেয়েছেন, যাদও তিনি তাঁর স্রষ্টার জীবনদর্শনের উপর নির্ভরশীল বা স্রষ্টার মুখপাত্র। পল্লীযাজকের হৃদয়ের অনুভূতি গোল্ডস্মিথেরই অনুভূতি, কিন্তু তা সর্বসাধারণেরও। দ্বিতীয়তঃ, পাঠকের মনে কোমল অনুভূতি সঞ্চারিত হোক আর না-ই হোক 'পল্লীযাজক' নিজে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক কোমল অনুভূতিতে সিঞ্চিত। সুতরাং এই চরিত্র শুধু পরিচিত নয়, আমাদের দুঃখ-মধুর গার্হস্থ্জীবনের চরিত্র। এই চরিত্র মঙ্গলময়ের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত নয়। এই জীবনে দারিদ্রের অভিমান আছে; কারণ সততা আছে, আস্থা আছে। এই উপন্যাসে বহু মনে অধিষ্ঠিত জীবনবোধের যে আস্বাদ পাঠক পাবেন, তার সঙ্গে কর্কশতা ও উন্মার্গের কোন বনিবনা নেই। অবশ্য তা তর্কের আকারে বলার দরকার হয় না। এই স্থিত দর্শন আপনিই পাঠকের মনকে স্পর্শ করে।

হোরেস ওয়ালপোল (Horace Walpole) ১৭১৭—১৭৯৭

ওয়ালপোল নভেল-লেখক হিসাবে খুব যে গুরুত্বপূর্ণ তা নন, কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভাষার উপরে তাঁর স্বাভাবিক দখল ছিল এবং কল্পনাশক্তি ছিল। সমসাময়িক বাস্তবতাময় জীবন অপেক্ষা মধ্যযুগের জগতের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই তাঁর নভেলকে 'গথিক' নভেল বা মধ্যযুগীয় নভেল বলা হয়। তাঁকে নভেলের একটি নতুন ধারার প্রবর্তক বলা চলে। তাঁর বিশেষ মানসিক গঠন ও লেখার বিষয় অনুসারে এই ধারার নাম দেওয়া হয়েছে 'আতঙ্ক নভেলের ধারা' বা 'টেরর স্কুল' (Terror School)। এই ধারা শুরু হয় তাঁর 'অটরাণ্টোর দুর্গ' (The Castle of Otranto) নামক নভেল থেকে। এটি প্রকাশিত হয় ১৭৬৪ সালে।

প্রচণ্ড ভয়াবহতা এবং অতিপ্রাকৃত ধরনের কার্যকলাপ দেখানোর জন্য ওয়ালপোল নানা ছবি, ঘটনা ও পরিস্থিতি আমদানি করেছিলেন। তিনি মধ্যযুগীয় রোম্যাণ্টিক রহস্যময়তাকে যেন নতুন ছাড়পত্র দিলেন। নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে এই ধারার নভেল এখন খুবই জনপ্রিয়। রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীতে অনেকটাই, এমনকি আধুনিক ডিটেকটিভ কাহিনীতেও কিছুটা, এই ধারার প্রভাব স্পষ্টভাবে রয়ে গেছে।

এ্যান র‍্যাডক্লিফ (Mrs. Ann Radcliffe) ১৭৬৪—১৮২৩

মিসেস র‍্যাডক্লিফের 'আতঙ্ক-নভেলের' পরিকল্পনা কিছুটা আলাদা রকমের। তিনি ভয়াবহ এবং রহস্যময় যা কিছু উপস্থিত কবতেন সেগুলিকে সেইভাবেই যদি শেষ পর্যন্ত বাখতেন, তবে পাঠক অনেক জল্পনাকল্পনার সুযোগ পেতেন। কিন্তু গল্পের শেষে র‍্যাডক্লিফ রহস্য ফাঁস করে দিতেন। তার জন্য গা শিরশর-করা পরিবেশ নিরীহগোছের হালকা হয়ে যেত। গল্পকারের এই ধরনের অভিপ্রায়ের কারণ হয়ত এই রকম ছিল যে প্রোটেস্ট্যাণ্ট হিসাবে তিনি অসৎ আত্মা ইত্যাদির সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় রোম্যান ক্যাথলিক ধারণার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি জানতেন ওই সব জিনিসের সহযোগিতায় আকর্ষণীয় গল্প তৈরী করা যায়, —তাই সেগুলিকে ছাড়তেও পারেন নি।

ভৌতিক দুর্গ, অদৃশ্য শিকলের ঝমঝম শব্দ, রহস্যময় পাণ্ডুলিপি, আলখাল্লাপরা বিষন্নদর্শন মানুষ, —এ সব র‍্যাডক্লিফের নভেলের অত্যাবশ্যক উপাদান ছিল। এ ছাড়া তিনি গল্পের স্থান নির্বাচন করতেন ইংল্যাণ্ড থেকে বহুদূরে ইটালি, ফ্রান্স, পিরেনিজ পর্বতমালা ইত্যাদি জায়গায়। দূরত্বও একটা মোহ সৃষ্টি করত। মিসেস র‍্যাডক্লিফের তৎকালীন জনপ্রিয়তার পিছনে আর একটি কারণ এই যে মানুষ তথাকথিত ভয়ের বস্তুকে মিথ্যা জেনেও ভয় করতে ভালবাসে। মানুষের সেই মোহকে কাটিয়ে দিয়ে তাদের সত্যকথা বলতে গিয়ে মিসেস র‍্যাডক্লিফ শিল্পের ক্ষতি করেছিলেন।

র‍্যাডক্লিফ অনেকগুলি 'আতঙ্ক নভেল' লিখেছিলেন। এগুলির ভিতরে ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত 'উডোলফোর রহস্যগুলি' (The Mysteries of Udolpho) সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে বহু খ্যাতনামা উপন্যাসিক এবং কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কবি মিসেস র‍্যাডক্লিফের গল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর এক ধরনের রচনা পাওয়া যায়। —'চিঠি লেখা' বা খোলা-চিঠি লেখা। এগুলির বিষয়বস্তু ঠিক যে ব্যক্তিগত হত তা নয়, বরঞ্চ এগুলি হত চিঠির আকারে রচনা। কে লিখছেন, কাকে লিখছেন, —এ সব জানার আগ্রহ অনেকের থাকত। এর জন্য, বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, এই চিঠিগুলি পাঠক মহলে আগ্রহের সৃষ্টি করত। লেখকের জীবিতাবস্থায় বা তাঁর মৃত্যুর পর এগুলি বই-এর আকারে প্রকাশিত হত এবং সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়ত।

'ছেলের কাছে লেখা চেষ্টারফিল্ডের চিঠিগুলি (Chesterfield's letters to his son) ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই চেষ্টারফিল্ড ছিলেন আভিজাত ভূস্বামী (Earl of Chesterfield ১৬৯৪—১৭৭৩)। চিঠিগুলি পড়বার আগ্রহ অনেকেরই ছিল ; এমন কি এখনও অনেকের আছে।

উপসংহার

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের ধারা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। বহু কথা, বহু ধারা, বহু নতুন চিন্তা আমরা যুক্ত করতে পারিনি। বহু লেখকের কথাও বলা হয়নি। সুতরাং তাঁদের সাহিত্যকর্মের কথাও আলোচনা করতে পারিনি। অপরিহার্য নানা পরিস্থিতি রয়েছে। সময় ও সঙ্গতির অভাব বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেও যে জিনিষটি সত্যই ভেবে দেখবার মত সেটা হচ্ছে—ইংরাজী সাহিত্যের নতুন নতুন পথনির্দেশ ও উৎসাহ যে জনসাধারণের কাছ থেকে এসেছে এবং ক্রমাগত আসছে, তাঁদের আস্থাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারা গেছে কিনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মানুষের হাতে সৃষ্টি হযনি। ইংরাজ, স্কচ এবং আইরিশরাই তা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তা তখনই ইউরোপের কোন কোন দেশে পডা হযেছে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর নানা দেশের বহু গুণীলেখক এই সাহিত্যে তাঁদের অবদান যে রাখবেন, তার সূত্র এই অষ্টাদশ শতাব্দীব ইংরাজী সাহিত্যের প্রকৃতি এবং পরিবর্ধনের প্রবণতান ভিতর পাওযা যাচ্ছে কিনা সেটা ভেবে দেখবার মত কথা।

দিন যত এগিযে চলেছে ততই বেশী বেশী করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইংরাজী বই-এর অনুবাদ হচ্ছে, এবং অন্যান্য ভাষার ভাল ভাল বই ইংরাজী ভাষায অনুবাদ করা হচ্ছে;—এই জনপ্রিয় আদান-প্রদানের সূত্র কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তা কি কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশসাম্রাজ্যের নজীরবিহীন বিশাল আয়তনেরই প্রত্যক্ষ ফল, না বৃটিশ সাহিত্যের নিজস্ব অন্তর্নিহিত কিছু শক্তি আছে যার দরুণ মানুষ পৃথিবীর নানা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা অনুসরণ করতে উৎসাহ পাচ্ছে?

অবশ্যই ইংরাজীভাষার একটা বড় অবদান রয়েছে ইংরাজী সাহিত্যের বিশ্বময প্রসারের ব্যাপারে। বাস্তব একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কাব হয়। ইংরাজী ব্যতীত অন্য ভাষার ভাল বইও পড়বার মত উৎসাহ সেই ভাষাভাষী মানুষের অনেকেরই থাকে না; কিন্তু ইংরাজীভাষায় মাঝারি গুণের বই-এরও পাঠকের কোন অভাব হয় না। এর মূলে কি একটা সস্তা আভিজাত্যবোধ কাজ করে, না ইংরাজী ভাষায় লিখিত থাকার দরুণ যে কোন বই-এর মধ্যে একটা আলাদা গুণের সঞ্চার হয়?

এই মনোভাবের সঙ্গে ইংরাজী ভাষা, ইংরাজীসাহিত্য বা ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু অন্যভাষাভাষী বহু মানুষের এই রকমের একটা অস্বাভাবিক মনোভাব যে আছে যে বিষয়ে আশা করি কোন দ্বিমত হবে না। আমার এই সব মতামতের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যাক, আবার আমরা আমাদের নির্ধারিত বিষয়ে ফিরে আসি। সাহিত্যের ইতিহাসের যে দেড়শ বছরের কথা এখানে আলোচনা করা হল তার শেষে ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজার সম্ভ্রম বজায় থাকছে, কিন্তু পার্লামেন্টের দ্বারা তা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। আবার এই পার্লামেন্টের প্রকৃতিও ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলগুলির নিয়মবদ্ধ প্রতিযোগিতার পরিচয় বহন করতে চলেছে। আগে

পার্লামেন্ট ছিল যাজক এবং অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অংশে বহু যোগ্য কিন্তু অনুচ্চস্তরের অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে পারছেন। দেখা যাচ্ছে এই সামাজিক-শাসনতান্ত্রিক নব্যরূপের সহযোগিতায় বহু সাহিত্যিক সুযোগ পাচ্ছেন এবং নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। এমন কি রাজনৈতিক দাক্ষিণ্যের উপর খুব বেশী নির্ভরশীল না হয়েও অনেক সাহিত্যিক নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করে যেতে পারছেন।

গণসাহিত্য অর্থাৎ জনগণ যাতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন এমন সাহিত্য প্রায় আটশ বছর আগে তার কাজ শেষ করে গিয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ উপভোগ করতে পারেন এমন সাহিত্য এবং সাহিত্যসন্নিহিত অন্যান্য শিল্প বিভিন্ন যুগে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যালাড, গীতিকবিতা এবং বিশেষ করে নাটক এই ব্যাপারে জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকের সম্পর্ক ঘটিয়েছে নানাভাবে নানা যুগে।

গদ্যসাহিত্যের ব্যাপক প্রচলনে সাহিত্য তার পোষাকি চেহারা পালটে আটপৌরে ধরনে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তার মানে এই নয় যে উচ্চস্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস অবহেলিত হয়েছে। বরঞ্চ বলা চলে, এই যুগে এই সব বিশিষ্ট ধরনের সাহিত্য একটানা গতিতে উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে।

নভেল সাহিত্যজগতে শুধু 'নভেল' বা নতুন কিছু নিয়ে এল তাই-ই নয়, জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগাযোগ এই নভেলের মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দী শুধু কোন যুগের প্রস্তুতিমাত্র নয়, —এটি স্বয়ংসমৃদ্ধ অতি বিশিষ্ট এক যুগ যেখানে নভেলের একটা খুব বড় ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিক পৃথিবীর গণযোগাযোগের যে মাধ্যম এখন সর্বসাধারণের কাছে প্রিয় এবং অত্যাবশ্যক, সেই সংবাদপত্রেরও অঙ্কুর এই যুগেই বিকশিত হতে শুরু করে। ১৭৬৩ সালে জর্জ গ্রেনভিল (George Grenville) প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রেসকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হননি। কিন্তু প্রেসের ক্ষমতা ধীরে ধীরে পার্লামেন্টের ক্ষমতার উপরেও উঠে গেল। প্রেসের এই 'সর্বোচ্চ আপীল আদালতের' মর্যাদা পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল জন উইলকসের (John Wilkes ১৭২৭—১৭৯৭)। উইলকসের প্রবন্ধগুলি তাঁকে স্বাধীনতার মূর্তরূপ বলে ঘোষণা করল। তখন স্লোগান হল 'Wilkes and Liberty'। গ্রাব স্ট্রিটের (Grub Street) ফরমায়েশী লেখার থেকে সাংবাদিকতার ভিতরে অধিকতর সাহিত্যিক উৎকর্ষ পাওয়া যেতে থাকল।

বক্তৃতা, যা এতদিন রাজনীতি এবং ধর্মীয় বাদানুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এডমণ্ড বার্ক তাকে সাহিত্যের উজ্জ্বল পোষাকে সজ্জিত করলেন। জীবনের ব্যাপকক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা প্রসারিত হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবেশের মুখে এই সব পরিস্থিতি এবং প্রবণতার কথা মনে রেখে এগুলি অনেক কিছুই হঠাৎ বা নতুন মনে হবে না। ব্লেক, বার্নস, ম্যাকফারসন, চ্যাটারটন, ফার্গুসদের হাতে নতুন করে রোম্যান্টিক কবিতা আবার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবার দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বহুকাল-ধরে-চলা এই স্বাভাবিক স্রোতেরই নতুন পর্ব বা পর্যায়। সাহিত্য-ধারা অবারিত।

পরিশিষ্ট

১৭৬৪ সালে হারগ্রিভস (Hargreaves) নতুন সুতাকাটার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এই কাজে আরও এগিয়ে গেলেন আর্করাইট (Arkright) এবং কম্পটন (Compton)। কার্টরাইট (Cartwright) কাপড়বোনার নতুন যন্ত্র আবিস্কার করলেন। জেমস ওয়াট (James Watt) যন্ত্র চালানর জন্য বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কার করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কুটিরশিল্পের জায়গায় কলকারখানার পত্তন হতে লাগল।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারা তখনও প্রধানতঃ গ্রামভিত্তিক। কৃষিকার্য, পশুপালন, কুটিরশিল্প, —এই ছিল তখনও দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক সমাজে মানুষে মানুষে সহজ আন্তরিক সম্পর্ক ছিল এবং মানুষ বহুল পরিমাণে জটিলতা থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু পাশাপাশি নানা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার সমাজের চেহারা পাল্টে দিচ্ছিল। লোহার খনি, কয়লার খনি এবং নতুন নতুন কেন্দ্রে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কলকারখানা সমাজের চেহারায় আমূল পরিবর্তন আনার সূত্রপাত করছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক চেহারার যে পরিবর্তন আসছিল তা কোন বহিরাক্রমণ, বা কোন যুদ্ধের জয়পরাজয়ের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। তা হয়েছিল নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগের ফলে। গ্রামীন সমাজ শহুরে সমাজে, গ্রামের মানুষ শহরের শ্রমিকে পরিবর্তিত হবার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল। ইংল্যাণ্ড হয়ে উঠতে থাকল কলকারখানা, শিল্পবাণিজ্যের দেশ। তবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ হতে কম পক্ষে একশ বছর লেগেছিল।

এই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানীবাণিজ্যের পরিমাণও হু হু করে বেড়ে চলল। ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তিও আরও বেশী সক্রিয় হল। খুব তাড়াতাড়ি ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর বৃহত্তম ও সমৃদ্ধতম শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলল। এ সবকিছুর প্রভাব ইংরাজীসাহিত্যে অবশ্যই এবং বেশ স্পষ্ট করে পড়েছিল।

পরিবহণ ব্যবস্থার হঠাৎ আশ্চর্য উন্নতি সীমাবদ্ধ এবং বিচ্ছিন্ন গ্রামীন এককগুলিকে সমগ্র দেশে প্রসারিত বৃহত্তর পূর্ণাঙ্গ সত্তায় রূপান্তরিত করতে থাকল। পরিবহণ ব্যবস্থার এই উন্নতি সম্ভব করলেন টেলফোর্ড (Telford), ম্যাকএ্যাডাম (Macadam), জেমস ব্রিণ্ডলি (James Brindley), স্টিভনসন (Stevenson) এবং আরও কয়েকজন।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মতৎপরতা অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বেড়ে গেল, কিন্তু সাধারণ মানুষের অনেকে নিজ দেশেই আরও দরিদ্র, অত্যাচারিত, মানবিক আধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকল। ধনী,দরিদ্র উভয়েরই চরিত্র পালটে গেল। বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অত্যাচার ও আর্তনাদকে আবাহন করে আনল। ধনী ও দরিদ্র মানুষ দ্রুত দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যেতে থাকল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই পটভূমিকায় ইংরাজ সাহিত্যিকগণও দুই আদর্শের কোনটি গ্রহণীয় বুঝে উঠতে পারলেন না। কেউ ঐতিহ্যগত শান্ত নিস্তরঙ্গ সমাজের পক্ষে, কেউ

অশান্ত, কর্মতৎপর বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডের পক্ষে চলে গেলেন। আবার, দ্বিতীয় দলের মানুষেরাও কেউ মধ্যবিত্ত জনসাধারণ ও শ্রমিকের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তায় দেশের সমৃদ্ধির চেহারা দেখতে চাইলেন, কেউ বা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা ভাবলেন, মানুষের কথা ভাবলেন না।

নতুন যুগের এই ঘূর্ণি যতদিন না স্থির হল ততদিন কেউ কেউ বিজ্ঞানকে অভিশাপ দিতে লাগলেন, কেউ যন্ত্রদেবতাকে পূজা দিতে লাগলেন, কেউ বা প্রতিক্রিয়া হিসাবে আরও বেশী করে ধর্মের দিকে ঝুঁকলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে সাহিত্য ও সমাজ নতুন আদর্শ অবলম্বন করবার জন্য তৈরী হল বটে, কিন্তু পুরাতন প্রত্যয়ের পরিবেশ আরও অনেকদিন ধরে থেকে গেল। পরবর্তীকালে সমৃদ্ধি, গৌরব এবং স্থিতপ্রজ্ঞ দার্শনিক চিন্তা, —সব কিছুই একসঙ্গে একই সমাজে অস্তিত্বমান হয়েছিল।

গ্রন্থের এই অংশের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

A. Appadorai	:	The Substance of Politics
A. S. Cairncross (Ed.)	:	Modern Essay in Criticism
T. R. Leavis	:	The Common Pursuit
Matthew Arnold	:	Essays in Criticism
W. P. Ker	:	Pope
E. M. Forster	:	Aspects of the Novel
O. U. P.	:	English Critical Essays (20th Century)
W. H. Hudson	:	An Introduction to the study of Literature
A. C. Baugh	:	Literary History of England
Legouis and Cazamian	:	A History of English Literature
A. Compton-Rickett	:	A History of English Literature
E. Albert	:	A History of English Literature
Sir Ifor Evans	:	A Short History of English Literature

আধুনিক যুগ তৃতীয় পর্ব এখানে শেষ হল।

ইংরাজী সাহিত্যের আলোকধারা

দ্বিতীয় ভাগ

আধুনিক যুগ

[চতুর্থ পর্ব]

বিচিত্র রূপ—বিপুল বিস্তার

[১৮০১—১৯৫০]

সূচীপত্র

আধুনিক যুগ [চতুর্থ পর্ব]

বিচিত্র রূপ—বিপুল বিস্তার ১৮০১—১৯৫০

বিচিত্র রূপ—বিপুল বিস্তার

১৮০১—১৯৫০

ভূমিকা

॥ এক ॥

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যাণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল তার প্রভাব শুধু বস্তুজগতে নয়, মানুষের মনের উপরও পড়েছিল খুব বেশী রকম। ওই শতাব্দীরই শেষেব দিকে সারা পৃথিবীতে কয়েকটি খুব বড় ঘটনা ঘটেছিল। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ পলাশীব যুদ্ধে জয়ী হয়ে ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ১৭৮৮ সালে ক্যাপ্টেন কুক অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করলেন। ফ্রান্সে ভলটেয়ার ও রুশো অভিজাত সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা কবলেন এবং আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইলেন। ১৭৯২ সালে ফরাসী বিপ্লব নিষ্পন্ন হল এবং সেদেশে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ন সম্রাট হলেন। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের যুদ্ধে স্পেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। ইংরেজরা যুদ্ধে জিতলেন, কিন্তু সেনাপতি নেলসন মারা গেলেন। যুদ্ধজয় হল, সমুদ্রে ইংল্যাণ্ডের অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু নেলসনের মৃত্যু ইংল্যাণ্ডেব সর্বসাধারণের কাছে পরম দুঃখের কারণ হয়ে বইল।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ এরও পরে আবও দশ বছর ধরে চলেছিল। ইংল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করলেও যুদ্ধ থেমে যাবার পর বহু লোক বেকার হয়ে গেল। বাজার দরের সঙ্গে মানুষের আয়ের সামঞ্জস্য থাকল না। ব্যবহারিক প্রয়োজনের জিনিষ তেমন উৎপাদন না হওয়াতে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কমে গেল।

যুদ্ধজয় মধ্যযুগীয় ধরনে গৌবব বৃদ্ধি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা নতুন নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠার উৎসাহ বাড়াতে পারে, আবার সেই সঙ্গে বহু শ্রমিককের কাজে নিযুক্তির পথও বন্ধ করতে পারে। অবশ্য, এর প্রায় সবই মানসিক তৃপ্তি। আর্থিক স্বচ্ছলতা বা দৈনন্দিন জীবনধারনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা, —এ সবের কোনটিই তখন বাস্তব হয়নি, বা মানুষের নাগালের ভিতর আসে নি।

সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে কাব্যকলা সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে জনসাধারণের আনন্দের যোগ ততটা ছিল না। কারণ সেই সময়টা মানুষের সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ আনতে পারেনি। ওই সময়ের ইংরাজ কবিরা বিশ্বের চিরকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু সাহিত্যেব দরজা তখন সর্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল না। রূঢভাবে বলতে গেলে সাহিত্য জীবন থেকে তফাতে সরে ছিল।

কথাটা এই নয় যে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের সাহিত্যিকরা মানুষের কথা

ভাবেনই নি। কথাটা হচ্ছে কবিদের মানবহিতৈষী দৃষ্টি ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে ছিল, না পায়ের তলায় মাটির দিকে ছিল, —তার একটা গ্রহণযোগ্য মীমাংসা করা। অবশ্য, সাহিত্য যদি কেবল জাতির গৌরববৃদ্ধির একটা উপায়মাত্র হয়, —তাহলে অন্য কথা। তখন কিন্তু সাহিত্যের চিরাচরিত সংজ্ঞাকে পালটাতে হয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যবহারিক জগতে সমাজের একটি বিশেষ অংশের গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। সেই অংশের মানুষরা ছিলেন কলকারখানার শ্রমিক। রাজনৈতিক নেতারা ও সাহিত্যিক সম্প্রদায় তখনও কৃষকদের প্রাধান্য ও গুরুত্বের কথাই ভাবছিলেন। তার ফলে সম্পদের ন্যায্য বন্টন এবং সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্যতার বিচার একদেশদর্শী হয়ে চলেছিল। এমন কি, কবি সম্প্রদায়, শ্রমিকদের খুব একটা সুনজরেও দেখেননি। তাঁরা শুধু মানবিক মূল্যবোধ, —শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যা অবহেলিত হচ্ছিল—সেই দার্শনিক তত্ত্বটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। ভবিষ্যতের মানুষের গৌরব যাদের উপর নির্ভর করবে তাদের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তাঁরা পারেননি। তখনকার কবিরা কি সত্যই 'দ্রষ্টা' (seer) ছিলেন, না ভাবালুতার মোহে আবদ্ধ ছিলেন! আমার এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অ-গতানুগতিক, কিন্তু সম্পূর্ণই প্রাসঙ্গিক। কেউ যদি আমার এই সব কথাকে 'ধান ভানতে শিবের গীত' বলেন তাহলে তাঁকে আমি সাহিত্যের প্রেরণা, প্রভাব ও ব্যাপকতার কথা আর একবার ভেবে দেখতে বলব।

আমাদের আলোচ্য যুগের সূচনায় (১৮০১-১৯৫০) রাজনৈতিক পটভূমি ছিল শিক্ষার প্রসার, জ্ঞানালোকের বিকীর্ণ ছটা, পার্লামেন্টের প্রভুত্ব, গডউইনের (William Godwin ১৭৫৬—১৮৩৬) সমাজতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

ভূমিকা

॥ দুই ॥

সাহিত্যিক পরিস্থিতি (রোম্যাণ্টিকতা)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যে একটা কোমল ভাবপ্রবণতার আধিক্য চলছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই ভাবপ্রবণতা একটি করুণ সঙ্গীতের সুরে প্রকাশ পেয়েছিল। এই দুটি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথক দিকের রোম্যাণ্টিক পুণরুজ্জীবনের প্রস্তুতি। 'রোম্যাণ্টিক পুণরুজ্জীবন' কথাটি এই কারণে আসে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্থে সাহিত্যের ভিত্তিই ছিল রোম্যাণ্টিকতা। সে যুগে অজ্ঞাত জগতের আবরণ একটার পর একটা যখন খুলে পড়ছিল তখন এক বিস্ময়ের বন্যা বাস্তবকে অতিক্রম করে গিয়ে দূরবিস্তৃতির মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিল এবং মানুষের মনে উন্মত্ত আনন্দের সঞ্চার করছিল। সেই যুগকে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম রোম্যাণ্টিক যুগ বলা হয়। আর, দ্বিতীয় রোমাণ্টিক যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন চতুর্থাংশ।

রোম্যানণ্টিকতা

রোম্যাণ্টিকতা এমন একটি ভাবধারা যা জীবন যেমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তাকে সমর্থন না জানিয়ে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তিকে হাজির কবা। পূর্ণ শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ যে ভাবে রয়েছে তাকে সেই ভাবেই গ্রহণ না কবে একটা অভৌত আদর্শের অন্বেষণ। আমরা আমাদের ভারতীয় প্রাচীন রীতিতে এটাকে হয়ত সহজভাবে বুঝতে পারব। প্রতিদিন সূর্যোদয় হয় ; তা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা এবং পার্থিব জীবনের নানা অংশে তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু এই সূর্যতে জীবন আরোপ করে বিগলিত শ্রদ্ধাব পরিবেশে আমাদের মনে যে আনন্দময় বোধের সঞ্চার হয়—যা আমাদের প্রাচীন শ্লোকগুলিতে উচ্ছ্বাসের আকারে ব্যক্ত হয়েছে—তা-ই প্রাচীনতম রোম্যাণ্টিকতা। ইউরোপীয়বা খৃষ্টের জীবন, খৃষ্টধর্মের উত্থান ও প্রসারেব মধ্যে এক আশ্চর্য জীবনস্রোত লক্ষ্য করে গেছেন। তাঁদের রোম্যাণ্টিকতার শুরু ওইভাবে।

বোম্যাণ্টিকতা বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড অস্বীকৃতি এবং কল্পিত আদর্শ জীবনকে দুর্দম স্বীকৃতিদান।

যুক্তি ও বাস্তবতার শক্ত প্রাচীর এখানে ওখানে ভেঙ্গে ফেলে মানুষের কল্পনা চলে যেতে চায়—

"রবিহীন মনিদীপ্ত প্রদোষের দেশে,
জগতের নদীগিবি সকলের শেষে।"

এই হল রোম্যাণ্টিকতার গতি ও প্রকৃতি। স্থান, কাল, কল্পনা এবং এক অতৃপ্তিব বোধ মানুষের আকাঙ্খার পাখনায় ভর করে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় মানুষেরই সৃষ্ট এক রহস্য ও বিস্ময়ের জগতে। রোম্যাণ্টিকতা সেই জগতে পায় স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তি।

নানা পৌবাণিক উপকথা, মধ্যযুগীয় স্বর্গ-মর্ত-পাতালের ধারণা—সবই এই রোম্যাণ্টিকতার সৃষ্টি। অনেক দুরের জগৎ ; মানুষ, পৃথিবী বা আকাশের তারা ; পরিচিত বস্তুতে মানুষের মনের এক অভূতপূর্ব বোধের সঞ্চারণ ; ব্যক্তি বিশেষের নিজের নিজেব সৃষ্ট কল্পনার জগৎ ;—এগুলিতেই বোম্যাণ্টিকতা আশ্রয় পায়। এ এক নতুন সৃষ্টি। এই সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি। স্রষ্টা জগদীশ্বরও মানুষের এক রোম্যাণ্টিক সৃষ্টি।

ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতকের এই রোম্যাণ্টিকতার উৎসগুলির ভিতর পড়ে— অতীত যুগের মানুষের দ্বারা প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব আবোপন, রুশোর (Jean Jacqucs Rousseau ১৭১২-১৭৭৮) প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়াব আহ্বান, জার্মানীর 'সীমাতিক্রমনের দর্শন ('Transcendental Philosophy). প্রকৃতিতে মানুষের মনের প্রতিফলন আবিষ্কারের চেষ্টা, —ইত্যাদি।

রোম্যাণ্টিকের কাজ যখন ভৌত জগতকে নিয়ে তখন তা বিষয়মুখী বা তন্ময় (Objcctivc) রোম্যাণ্টিকতা। আর মনোজগৎকে নিয়ে যখন রোম্যাণ্টিকতার কাজ তখন তা আত্মবাদী বা মন্ময় (subjcctive) রোম্যাণ্টিকতা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর রোম্যাণ্টিকতা ছিল বিষয়মুখী বা তন্ময় (Objective) রোম্যাণ্টিকতা। উনবিংশ শতাব্দীর

রোম্যান্টিকতা আত্মবাদী বা মন্ময় (Subjective) রোম্যান্টিকতা। শেক্সপীয়রে বিষয়মুখী (তন্ময়) এবং আত্মবাদী (মন্ময়)—দু ধরনের রোম্যান্টিকতাই ছিল।

ক্লাসিক বোধ ও সৃষ্টি এবং রোম্যান্টিক বোধ ও সৃষ্টির মধ্যে তফাৎ আছে। তবে কোথাও কোনটি অপরটির ভিতরে অনুপ্রবেশ করেনি তা নয়।

সরলতা, কেন্দ্রীবদ্ধতা, পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্যবোধ—এইগুলি প্রাচীন আদর্শের (Classicism) লক্ষণ। চিত্রময়তা, বর্ণাঢ্যতা, প্রাচুর্য, উচ্ছ্বাস, অস্পষ্টতা, দূরত্ব, বিস্ময়, বিষাদ, হতাশা, অতিপ্রাকৃত এবং খেয়ালি কল্পনা, এগুলি রোম্যান্টিকতার লক্ষণ।

প্রাচীন ধর্মীয় কৃত্যাদিতে রোম্যান্টিকতা ছিল। রোম্যান্টিকতা এক ধরনের মাদকতা, স্বপ্নদর্শন এবং অর্থনীতির ভাষায় 'অবাধ নীতি' (Laissez Faire)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর 'প্রাচীন আদর্শের' নীতিতে (Classicism) যে বাস্তবতার বোধ কবিকে সংযত করে রাখত রোম্যান্টিক যুগে তা থেকে কবিরা মুক্ত হয়েছিলেন। আনন্দময় মহাবিশ্বের স্বরূপ আশ্রয় করার জন্য এ' হল মানুষের স্বাভাবিক প্রতিবাদ। এ এক প্রতিবাদী সাহিত্য।

গ্যেটে (Johann Wolfgang Von Goethe ১৭৪৯—১৮৩২) রোম্যান্টিকতাকে 'রোগ' এবং 'প্রাচীন আদর্শকে' (Classicism) স্বাস্থ্য বলেছেন। ভিক্টর হুগো (Victor Hugo ১৮০২-১৮৮৫) প্রথমে রোম্যান্টিকতাকে 'অদ্ভুত বা অসম্ভব' (Grotesque) বলেছেন। পরে তাকে 'ঔদার্য' (Liberalism) বলেছেন। স্টেনঢাল (Henri Beyle, ছদ্মনাম Stendhal ১৭৮৩ ১৮৪২) বলেছেন সমস্ত মহৎ শিল্পই প্রথমে রোম্যান্টিক থাকে, প্রাচীন হয়ে গেলে তাকেই ক্লাসিক' (Classic) আখ্যা দেওয়া হয়। হাইনে (Heinrich Heine ১৭৯৭—১৮৫৬) বলেছেন, রোম্যান্টিকতা মধ্য যুগে ছিল পুণঃর্জাগরণ। তা প্রস্ফুটিত হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ যীশুর রক্তধারায়। আর্থার সিমনস (Arthur Symons) বলেছেন একমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দী বাদ দিয়ে ইংরাজী সাহিত্যের যে কোন যুগের বড় কবিরা সকলেই রোম্যান্টিক। লেসলি এবারক্রোম্বি (Lescelles Abercrombie ১৮৮১— ১৯৩৮) বলেছেন রোম্যান্টিকতা প্রাচীন আদর্শের (Classicism) বিপরীত নয়, বরঞ্চ তা বাস্তবতার (Realism) বিপরীত। তাঁর মতে রোম্যান্টিকতা বহির্জগতের অভিজ্ঞতা (Outer experience) থেকে সরে এসে অন্তরেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতায় (Inner experience) কেন্দ্রীভূত হওয়া।

রোম্যান্টিকতা তাই যুক্তি ও বিচারের বদলে অনুভব ও কল্পনা, বা ইতিহাসের দিক থেকে কল্পনার পুণঃর্জাগরণ।

ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় রোম্যান্টিক যুগের আবির্ভাবের পিছনে লক (John Locke ১৬৩২—১৭০৪), বার্কলে (George Berkeley ১৬৮৫—১৭৫৩), হিউম (David Hume ১৭১১—৭৬), রুশো (Jean-Jacques Rousseau ১৭১২—১৭৭৮), কান্ট (Immanuel Kant ১৭২৪—১৮০৪) এবং আরও কয়েকজন দার্শনিকের অবদান রয়েছে।

আলোচ্যযুগের নানা উপবিভাগ (১৮০১—১৯৫০)

ইংরাজী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাস-প্রণেতাগণের অনেকেই আমাদের আলোচ্য যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। এর সুসঙ্গত ও যুক্তিসম্মত কারণও রয়েছে। তবে সব লেখকই যে একইভাবে এই দেড়শ বছরকে ভাগ করেছেন তা নয়। নানা জন নানা ভাবে এই নাতিদীর্ঘ কিন্তু অতি প্রশস্ত যুগে সাহিত্যের ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। আমার পক্ষে এই গ্রন্থে কোন ধরনের উপবিভাগ করা সম্ভব হয়নি। যেমন সম্ভব হয়নি বিশিষ্ট লেখকদের সকলের কথা বলা। নামমাত্র উল্লেখও কোন কোন ক্ষেত্রে করা যায়নি। অথচ এই যুগে বিশিষ্ট লেখক বেশ কয়েকশ' ছিলেন।

যত দিন যাচ্ছে, ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী সাহিত্য বিশাল মহাসমুদ্র বা মহাকাশের মত দশদিক ব্যাপ্ত করছে। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আমার এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য আজ শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, —পৃথিবীর নানা দেশে চর্চা হচ্ছে। এবং সেগুলির বেশ ভাল অংশই উচ্চমানের। আমার আক্ষেপ যে সেগুলির অধিকাংশই পাঠককে নিবেদন করতে পারছি না। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী'। তবে যে প্রচলিত উপবিভাগগুলির কথা বলা হল সেগুলির সময়-সীমা সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়ে রাখা চলে, যদিও আমি সেই সব ছোট ছোট সীমারেখা মেনে চলতে পারিনি।

১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'গীতধর্মী গাথাসমূহ' (Lyrical Ballads) প্রকাশিত হয়। ওই সময় থেকে ১৮৩২ বা ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত সময়কে 'রোম্যান্টিক বা দ্বিতীয় রোম্যান্টিক যুগ' বলা হয়। ১৮৩২ সালে ইংল্যাণ্ডে স্কট এবং জার্মানীতে গ্যেটে মারা যান। ১৮৩৪ সালে কোলরিজ মারা যান। ওই সময়ের পরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সাদে (Southey) ব্যতীত শ্রেষ্ঠতম রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে কেউই আর জীবিত থাকেন নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থও এর পরে উল্লেখযোগ্য কিছু লিখতে পারেন নি। এর পর থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত আর একটি যুগ ধরা হয়। এটিকে রোম্যান্টিক যুগের বর্ধিতাংশ বলেও বলা চলে। ১৮৯২ সালটিকে স্মরণ করা হয় এই জন্য যে ওই সালে কবি টেনিসন মারা যান। এই যুগটিকে ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাণী ভিক্টোরিযার নামানুসারে সাধারণতঃ ভিক্টোরিয় যুগ বলা হয। এর পর প্রায় দশ বৎসর সময়কে সাধারণতঃ অবনতির যুগ (Decadent Period) বলা হয়। বিংশ শতাব্দীব একেবারে গোড়ায় আবার এক প্রাণবন্ত সাহিত্যের যুগ। প্রথম দশকের এই সব কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ হয় ১৯১২ সালে। তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ। এঁরই নামানুসারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ-বারো বছরকে জর্জীয় যুগ বলা হয়। এর অল্প কিছুদিন পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪—১৮) শুরু হয়। মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার দু'একবছর আগে এবং পরে যুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষে কবিতা লেখা হয়। এ সময়টিকে যুদ্ধের যুগ বলা হয়। তারপর যুদ্ধোত্তর যুগ বা দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তী যুগ। এই সময়ে শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের চিন্তাজগতে যে প্রকাণ্ড পরিবর্তন হয়ে চলেছিল তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের আরম্ভের সঙ্গে। অবশ্য এ তুলনা শুধু আয়তন

ও তীব্রতার তুলনা। প্রেরণা ও প্রকাশের দিক থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের নতুনত্ব অভূতপূর্ব। এই সময়ে সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল অনেকগুলি মৌল বিষয়।—জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ভণ্ডামি ও শ্রেণীসংগ্রাম, ভাত-কাপড়ের অত্যন্ত প্রকট জৈবসমস্যা, মানুষের বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও মূল্যবোধের সমস্যা, পরাধীন জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ ও বণিকতন্ত্র, এমনকি ধীরে ধীরে নানা সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং আশ্চর্য মনোবিশ্লেষণ। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ; —সারা পৃথিবীর মানুষের এতদিনকার ভাবগত মূলধন এবং সযত্নলালিত বিশ্বাস, সংস্কার, যৌনবোধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সবই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এতদিনে সাধারণ মানুষও এই কথা বুঝলেন, অপরকে বোঝা দূরে থাকুক, মানুষ নিজেকেও নিজে বোঝে না।

এই সব উপবিভাগের পশ্চাদপট খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। ইংল্যাণ্ডের নৈতিক ইতিহাসের, নানা রাজনৈতিক ঘটনার, নতুন নতুন দর্শনের, বিশ্ব-অর্থনীতির নানা পরিবর্তনের, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অভূতপূর্ব নানা প্রকাশভঙ্গীর ও প্রকৃতিগত নানা বৈচিত্রের, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা পরিবর্তনের, এবং ভাল এবং মন্দের পরিবর্তনশীল নানা ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ইংরাজী সাহিত্যের উপর। দুটি মহাযুদ্ধের প্রভাব এবং সেগুলির তাৎক্ষণিক ও দূরপ্রসারী ফল মানুষের বুদ্ধিকে; প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কারকে; বিবাহ, পারিবারিক সংগঠন, যৌনবোধ, নরনারীর সম্পর্ক এবং সযত্নলালিত নানা পবিত্র মূল্যবোধকে পালটে দিয়েছে। বিংশশতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই আর্থিক সঙ্গতির বিচারে সৃষ্ট সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠছিল। আর, এই সব কিছুর দ্বারা বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যুদ্ধ ও ভণ্ডামির ছদ্মবেশ মানুষের ভিতরের পশুত্বকে বাইরে বার করে এনেছে। সৎসাহিত্যে এই সব কিছুর প্রতিফলন পড়েছে। এখন আর সাহিত্যে অস্পৃশ্য বা নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই। শুধু মহৎ উদ্দেশের দ্বারা প্রভাবিত সাহিত্যই মহৎ,—বক্তব্যের ভাষা বা বিষয় যা-ই হোক না কেন। আর আছে অবিরত-পরীক্ষা-নিরীক্ষা, —যার সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য সম্ভবতঃ এখনও নেই। সাহিত্যের পরিধি এইভাবে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই পরিবর্ধনের নানা অংশের বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কঠিন বাস্তবধর্মের আকারে সাহিত্যের মূলগত প্রকৃতিকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড করিয়ে দিয়েছে এবং সাহিত্যের চিরাচরিত ধারণাকে হতবাক করে রেখেছে।

তবুও আমাদের স্মরণ করতে ইচ্ছা হয় সেই সব সময়কে যখন মানুষ সরলভাবে প্রাণখুলে হাসতে পারত, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক অনীহা ছিল, মানুষের বিশ্রাম দুশ্চিন্তায় বিঘ্নিত হত না, গ্রামের বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল, আকাশ ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাসে ছেয়ে থাকত না, যখন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ হাতে করে ফুটপাথ ধরে হেঁটে যেতে পারতেন, যখন শ্লীলতার স্বীকৃতি ছিল, ন্যূনতম নৈতিকমান সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল, যখন মানুষের জীবনের ও সম্মানের নিরাপত্তা ছিল, যখন গরীব মানুষও সৎপথে দুমুঠো অন্ন পেত। তখন সাহিত্যও এগুলির সমধর্মী বলে বোঝা যেত। ইংরাজী সাহিত্য তথা বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্য তখনও অদ্ভুত নতুন নতুন পরিভাষায় কণ্টকিত হয়নি। তখনও

বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, উপহাস, দম্ভ মানুষে মানুষে এত বিভেদ সৃষ্টি করেনি। সাহিত্যের অনেকটাই ছিল অমলিন এবং সকলকে আনন্দ দেওয়ার মত সুন্দর। সে প্রবণতা যে সামাজিক-নৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের ফলে সম্ভব ছিল আজ তা অনুপস্থিত। বিংশ শতাব্দীর দশকের পর দশক অতিক্রান্ত হতে হতে সাহিত্য জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসেছে। সাহিত্যের এই পরিচয় সহজে বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। বর্তমানে সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গেলে মানুষকে ভূয়োদর্শী হতে হবে এবং প্রাথমিক সাহিত্য বহু মানুষের আয়ত্বের বাইরে। এখন সর্বাধুনিক হতে গেলে পরিশ্রম সহকারে চেষ্টা করে মনের চেহারা পালটে ফেলতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই আশা ও হতাশার দ্বন্দ্বে হতাশাই জয়ী হয়ে আসছে। হয়ত এমন হতে পারে যে যদি না আমরা কোন প্রাচীন বিশ্বাসে সুসম্বদ্ধ হতে পারি পৃথিবীর সাহিত্য রুগ্ন, কঙ্কালসার হয়ে যাবে। এখনই দেখা যাচ্ছে অর্থনীতিতে স্বচ্ছল দেশগুলিতে সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সব অভিজ্ঞতার শুরু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে এবং তা নানা বহিঃপ্রকাশ ও অন্তরালের মধ্য দিয়ে বরাবর চলে আসছে। তবু, যেটুকু আমাদের হাতে আছে, বা হাতে পেয়েছি, তারই সামান্য আলোচনা এবার আমরা শুরু করব।

কবি ও কাব্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কবিতাব আলোচনা ১৭৯৮ সালে "গীতধর্মী গাথাসমূহের' (Lyrical Ballads) প্রকাশনা থেকে সাধারণতঃ শুরু করা হয়। এটি ইংরাজী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দিগ্‌দর্শন এবং দ্বিতীয় রোম্যাণ্টিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ যুগের বিভিন্ন কবি ও কাব্যের আলোচনার আগে গীতিকবিতা বা Lyric সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। আমবা ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে গীতিকবিতার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা বলেছি। এখন সে সব কথার সারাংশ ও কিছু সংযোজনার সাহায্যে গীতিকবিতার মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

গীতিকবিতা (Lyric)

আখ্যা অনুসারে গীতিকবিতা বা লিরিক তারের বাদ্যযন্ত্র লিউট (Lute) বা লিয়ারের (Lyre) সঙ্গে গাইবার জন্য গান, বা পরবর্তীকালে কবিতা। কিন্তু সেই মানে ধরলে সাধারণতঃ যাকে লিরিক বলা হয় তা ছাড়া আরও নানা ধরনের কবিতাকে ওই একই নাম দিতে হয়। সুতরাং ওই সংজ্ঞা সঠিকভাবে চলে না। লিরিক তুলনামূলকভাবে সরল আকারের কবিতা। একটি লিরিকে একটিমাত্রই আবেগ ব্যক্ত হয়। নাটক বা মহাকাব্য থেকে আলাদা এই ধরনের কবিতাতে কবি প্রধানতঃ নিজেকে নিয়েই মগ্ন থাকেন। শ্রীযুক্ত হাডসন লিরিকের এই সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন হয়ত এই কারণে যে কোন্ কবিতা লিরিক তা সহজেই বুঝে নিতে পাঠকের কোন অসুবিধা হয় না। লিরিক আত্মবাদী (subjective) কবিতা। হাডসন আরও বলেছেন যে ব্যক্তিমানুষের একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে শুরু

করে সমস্ত মানুষের অর্থাৎ সার্বজনীন অভিজ্ঞতা এই লিরিকের মধ্য দিযেই প্রকাশ পেতে পারে। লিরিকের প্রসারের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত।

লিরিক পড়তে গেলে প্রথমতঃ জানতে হয় কোন্ বিশেষ আবেগ এবং প্রেরণার অনুবর্তী হয়ে একটি বিশেষ লিরিক লেখা হয়েছে এবং কিভাবে সেই আবেগ ব্যক্ত হয়েছে। লিরিকে সৌন্দর্যবিকাশের সঙ্গে থাকবে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। অনুভবের গভীরতার সঙ্গে প্রকাশের মাধ্যম ও স্তরের সঙ্গতি থাকা চাই। আবেগের ঘনীভূত প্রকাশ লিরিকের সৌন্দর্যধারণের পক্ষে খুব সাহায্য করে।

লিরিকে দেখা যায় কবি হয় নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চান, অথবা সকলের অভিজ্ঞতাকে নিজের ধরনে প্রকাশ করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লিরিক কবিকে অধিকতর জনপ্রিয় করে। প্রাচীনতম স্বতোৎসারিত মৌখিক কাব্য এই ধরনেই প্রকাশ পেয়েছিল। যেহেতু কবি নিজে প্রথমে এই ভাবকে আত্মানুভূতির রসে সিক্ত করতেন, সুতরাং তা আত্মবাদীও থেকে যেত। ইউরোপে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ খৃষ্টধর্মের প্রসারের সঙ্গে জড়িত। দলবদ্ধ সঙ্গীত, প্রার্থনা, স্তোত্র, দেশাত্মবোধক কবিতা কিন্তু সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতাকে কবির আত্মীকরণ ও ব্যক্তকরণ। প্রথমদিকে লিরিক কেবল সঙ্গীতেই ব্যক্ত হত, যেমন হত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ লিউট (Lutc) কিংবা লিয়ারের (Lyrc) ব্যবহার। এর দ্বারা ধ্বনি ও সুরের লহর একমুখী থাকত এবং শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে লিরিক কবিতা সঙ্গীত থেকে আলাদাভাবে সৃষ্টি হতে লাগল। শেক্সপীযরের নাটকের ভিতরের লিরিকগুলিকে অনেকক্ষেত্রেই সঙ্গীত ও কবিতা দুরকমভাবেই নেওয়া যায়।

সঠিক মূলপ্রেরণা যেহেতু অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, সঙ্গীতে বা কবিতায তার প্রকাশ অল্প দৈর্ঘের হলে তা মূলপ্রেরণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে লিরিকে অনেক ক্ষেত্রেই কবিকে কবিতালেখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত মূল প্রেরণাকে মনের মধ্যে ধরে রাখতে হয়। ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে কীটস নাকি নাইটিঙ্গেল কবিতার স্তবকগুলি একটানা একই সময়ে লেখেন নি। তা যদি সত্য হয় তবে আবেগ পুণরায় স্মরণ করার (Recollection of Emotion) প্রশ্নও আসে।

স্বতঃস্ফূর্ততা লিরিকের আর একটি প্রয়োজনীয় সর্ত। লিরিকের শিল্পী অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ কবিতাতেও স্বতঃস্ফূর্ততার গুণ বজায় রাখতে পারেন।

বোধহয় একমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ ছাড়া লিরিক ইংরাজী সাহিত্যে বরাবরই একটা বিশিষ্ট ধারা হিসাবে চলে এসেছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে ইংরাজী সাহিত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল একমাত্র লিরিকে। এই সময়ে লিরিকের প্রেরণা ও বিষয়ের এক সর্বব্যাপী বৈচিত্র দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাকি অংশেও লিরিকের এই একটানা স্রোত চলেছিল, কিন্তু সাহিত্যে তার একাধিপত্য আর ছিল না।

এর পরে আমরা নানা কবি, তাঁদের কাব্য, লক্ষ্য ও প্রকাশভঙ্গীর স্থায়ীত্ব ও নানা পরিবর্তনের কথায় আসব। স্বভাবতই ইংরাজী সাহিত্যের ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থকে দিয়েই শুরু করা হয়।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth) ১৭৭০—১৮৫০

ইংল্যাণ্ডের কাম্বারল্যাণ্ড (Cumberland) অঞ্চলের কোকারমাউথে (Cockermouth) এই যুগস্রষ্টা কবির জন্ম হয়। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল শুদ্ধ গ্রাম্য পরিবেশে, উপত্যকাবাসী মেষপালকদের সঙ্গে। শহরের কৃত্রিমতার প্রভাব তখনও সেখানে পড়েনি। সেই পরিবেশের ছাপ ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনে সারাজীবনের মত আঁকা হয়ে গিয়েছিল, এবং তা থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি। যুবক বয়সে ফরাসীদেশ ভ্রমণের ফলে প্রজাতন্ত্রী রাজনীতির প্রতি সাময়িকভাবে আকৃষ্ট হন ; পরে অবশ্য নিজের মূল মানসিক প্রকৃতিতে ফিরে এসে স্বস্তি পান। ১৮৩২ সাল থেকে বাকি জীবন প্রকৃতির সান্নিধ্যে এবং সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত "হ্রদ অঞ্চলে" (Lake District) প্রথমে গ্র্যাসমিয়ার(Grasmere) এবং সবশেষে রাইড্যাল মাউন্টে (Rydal Mount) কাটিয়ে দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত হন। পূর্ণ সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়ে তিনি ১৮৫০ সালে মারা যান।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ

ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ কল্পনার ও স্বজ্ঞার (Intuition) যুগ। প্রকৃতি এই যুগের কাব্যের কেন্দ্রীয় বস্তু। রুক্ষ বাস্তবতার বদলে মধ্যযুগের মদিরতার প্রতি এই যুগের অনেক কবিরই মনে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গ্রামের মানুষ—তাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন, সরল জীবনবোধ তখন মানুষজাতির প্রতি শ্রদ্ধা এনে দিতে পারত। মানুষের পক্ষে যে স্থায়ী সৌন্দর্যের আস্বাদ পাওয়া সম্ভব তা এই বিশেষ পরিবেশের আদর্শ কাল্পনিক সত্তাতেই থেকে গেছে বলে ওযার্ডসওয়ার্থ অনুভব করতেন। মন্ময়তা (Subjectivism) এবং ব্যক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও আবেগ এ যুগের কাব্যের প্রধান অবলম্বন। সাধারণ মানুষের কৃত্রিমতাবর্জিত মৌখিকভাষাই কাব্যের ভাষা হওয়া উচিৎ বলে ওযার্ডসওয়ার্থ বিশ্বাস করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এই যুগের কবিরা সাময়িক আবেগের অপসৃয়মান প্রকৃতিকে অনুভবের স্থায়ীত্বে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। মানুষের আদি ও অকৃত্রিম সত্তাকে তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সঙ্গে কোলরিজের মত কবি অতিপ্রাকৃত জগৎকে আমাদের জানা জগতের পরিধির ভিতব আনবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রীক মানসিকতার অনুসরণও এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের নানা কবিতা

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সবচেয়ে নামী কাব্যগুলির মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত "গীতধর্মী গাথাসমূহ" (Lyrical Ballads—১৭৯৮)। এই সংগ্রহের ভিতরেই আছে তাঁর টিনটার্ন এ্যাবে (Tintern Abbey), মাইকেল (Michael) এবং 'লুসি' (Lucy) কবিতাগুলি। এর পরে তিনি লেখেন 'প্রস্তাবনা' (Prelude)। অবশ্য এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ১৮১৪ সালে প্রকাশিত হয় 'পর্যটন' (The Excursion)। তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা গিয়েছিল ১৮০৭ সালে প্রকাশিত 'কাব্যসংগ্রহে'। এই সংগ্রহে 'নিঃসঙ্গ শস্যকর্তনকারিনী (The Solitary Reaper) এবং 'অমরতা' Immortality Ode) স্থান পেয়েছিল। এর পর থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিপ্রতিভার অবনতি ঘটতে থাকে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের দর্শন

ওয়ার্ডসওয়ার্থেব প্রধান পরিচয় তিনি মানুষের চিন্তাজগতের শিক্ষক। তিনি চেয়েছিলেন কবিতা মানুষকে দুঃখে সান্ত্বনা দেবে, মানুষকে সুখী করবে, আলোকিত করবে, সকলকে যথার্থ দৃষ্টিদান করবে, চিন্তা করাবে, অনুভব করাবে এবং শুদ্ধ পবিত্রতায় উন্নীত করবে। তিনি চেয়েছিলেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় এবং বস্তুতে মানুষ যেন সর্বোচ্চ সৌন্দর্যকে খুঁজে পায়। অনেকের কাছেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন দিব্যপ্রেরণাপ্রাপ্ত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের বাণী আমাদের সত্তার গভীরে প্রোথিত। স্টপফোর্ড ব্রুক (Stopford A. Brooke) বলেছেন,—ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমাধিভূমি মানুষের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও প্রকৃতি

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিগূঢ়। প্রকৃতি তাঁর নৈতিক সত্তার আত্মা, এবং তাঁর বিশুদ্ধ চিন্তার আশ্রয়। ওয়ার্ডওয়ার্থের কাছে প্রকৃতি জীবন্ত। প্রকৃতির আত্মা এবং মানুষের মন দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি আছে। প্রকৃতি মানুষের সঙ্গী ও পরামর্শদাতা। বৃহত্তর অর্থে পশুপক্ষী, বৃক্ষ, পর্বত, নদী. সমুদ্র, হ্রদ, প্রান্তর, আকাশ, এমন কি শিশু এবং গ্রামের মানুষও প্রকৃতির অংশ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও মানুষ

প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালবাসা তাঁকে চালিত করেছিল মানুষকে ভালবাসার দিকে। সহজ-সরল মানুষকে তিনি মাধুর্যে ও গৌরবে ভূষিত করেছিলেন। মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তিনি তাঁর কাব্যের বিশ্বাসের সারবস্তুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মানুষের মন দুঃখ, আঘাত এবং পরিবেশের প্রতিকূলতাকে পরাজিত করে। মানুষের মন অজেয়। সরল জীবনযাত্রা এবং উন্নত চিন্তা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। মানুষের সাধারণ গার্হস্থ্যজীবনের নীতিনিয়ম পরম পবিত্র। অমর্ত্য গৌরব থেকে মানুষের সৃষ্টি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্টাইল

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোন পৃথক স্টাইল নেই। ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) বলেছেন,—প্রকৃতি যেন নিজেই কবির হাত থেকে কলম নিয়ে এক অনাবৃত, বিশুদ্ধ, অন্তরস্পর্শী স্টাইলে তাঁর হয়ে লিখে দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর স্বাভাবিকতা এবং তার প্রতি ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশ্বস্ততা তাঁর অনায়াস স্টাইলের একান্ত নিজস্ব চরিত্র।

ইংরাজী সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্থান

কোলরিজ বলেছেন—ওয়ার্ডসওয়ার্থের কল্পনাশক্তি শেক্সপীয়র ও মিলটনের কাছাকাছি। ওই দুই মহাকবিকে বাদ দিলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাই ইংরাজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কাব্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টি আক্ষরিক অর্থে অতুলনীয়। 'অমরতার' (Immortality Ode) মত একটি মাত্র কবিতাতেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ কালোত্তীর্ণ হয়ে আছেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের ত্রুটি

ওয়ার্ডসওয়ার্থের দৃষ্টিভঙ্গীকে সত্য ও সঠিক বলে কেউ কেউ মনে করেন না। বিশাল পৃথিবীর বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ তাতে পড়েনি। কৌতুকের অভাব। নানাভাবে একটানা প্রায় একই বক্তব্য। গদ্য ও কবিতার ভাষা একরকম করাও সঠিক নির্দেশ নয়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য

কোলরিজ (S. T. Coleridge)—প্রথমতঃ, ভাষার অনাড়ম্বর বিশুদ্ধতা এবং শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে নিখুঁত যথাযথতা। দ্বিতীয়তঃ, চিন্তা ও অনুভূতির সম্পূর্ণ উপযুক্ত ভারসাম্য ও মানসিক স্থিরতা এবং তা কোন গ্রন্থপাঠের ফলে নয়, —কবির নিজের গভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা পাওয়া। এই সব চিন্তা ও অনুভূতিগুলি সতেজ এবং তাদের শরীরে সকালের শিশির লেগে আছে। দার্শনিক বেদনাবোধ এবং মানুষের প্রতি মানুষের মত সহানুভূতির দ্বারা ওয়াডসওয়ার্থ অদ্বিতীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর কল্পনাশক্তি সুসম্বদ্ধ অর্থে সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং সর্বাপেক্ষা শৈথিল্যবর্জিত।

কুইলার কাউচ (Sir Arthur Quiller Couch)—ওয়ার্ডসওয়ার্থই আমাদের দিয়েছিলেন পর্বত, হ্রদ, বনভূমি, বেড়ার ঝোপে ফুটে থাকা ফুল এবং ঊর্ধাকাশের ঝড়কে দেখার নতুন দৃষ্টি।

রাস্কিন (John Ruskin)—প্রকৃতির সৌন্দর্যের নানাদিক তিনি প্রকাশ করেছিলেন; তুচ্ছ বস্তুতে নিহিত মহত্তম সৌন্দর্যকে দেখিয়েছিলেন। ভানভণিতা ও জাঁকজমকেব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে সরল বোধ ও কুণ্ঠিত হৃদয়কে বিশ্লেষণ করে সত্যকে উদ্ঘাটিত কবেছিলেন।

সেন্টসবেরি (George Saintsbury), টিনটার্ন এ্যাবে (Tintern Abbey) এবং 'অমরতা' (Immortality Ode) জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্তর্ভুক্ত।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিভিন্ন কবিতা নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা দুটির উল্লেখমাত্র করে আমরা পরবর্তী আলোচনায় চলে যাব। প্রথমটি, "অতি শৈশবের স্মৃতি থেকে আহৃত অমরতার ইঙ্গিতসমূহ অবলম্বনে সম্বোধনমূলক গীতিকবিতা" বা সংক্ষেপে "অমরতার কবিতা" বা Immortality Ode (Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early childhood)

এটি ২০৭ লাইনের ছোটবড় এগারটি স্তবকের কবিতা। জগতের তাবৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অল্প কয়েকটি কবিতার মধ্যে গণ্য। প্রথম চারটি স্তবক ১৮০২ সালের বসন্ত এবং গ্রীষ্মে রচিত হয়েছিল। বাকি অংশ ১৮০৫ বা ১৮০৬ সালে রচিত।

কবির কথা অনুযায়ী বাল্যকালে তাঁর তেজোময় আত্মার অদম্য শক্তির প্রভাব তাঁকে মৃত্যু সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে দেয়নি। মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। শিশুর পক্ষে এই

জ্ঞান স্বতঃলব্ধ। ✓গীতায় আত্মায় সঞ্চারণশীলতার গুণ যুক্ত করে এই অবিনশ্বরতার কথাই আর একভাবে বলা হয়েছে।—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽ পরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ—
ন্যন্যানি সংজাতি নবানি দেহী॥

[✓গীতা: সাংখ্যযোগ ২২ নং শ্লোক]

মানুষের বয়স যত বাড়ে এই অবিনশ্বরতার বোধ অনুভব করবার শক্তিও মানুষ তত হারায়। কিন্তু কোন সময়ে কোন প্রচণ্ড মানসিক আঘাত আবার তাকে সেই অবিনশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দেয।

মানুষের শৈশবে এক স্বর্গীয় আলো তার চারপাশে বিরাজ করে। বড হতে হতে সে আলো যখন সে হারিয়ে ফেলে তখন তার চারপাশের নিষ্পাপ জাগতিক সৌন্দর্য দিয়ে সেই অভাব সে মিটিয়ে নিতে চায়। কিন্তু তাতে সে আনন্দ পেলেও তৃপ্ত হয় না। যে আলো সে হারিযে ফেলেছে তাকে সে স্মরণ করে।

পরে আবার সে বুঝতে পারে যে, যে সুষমার রেশ সে এই মরজগতে নিয়ে এসেছিল তা তার ভিতরে থেকে গেছে। তা হারায়নি। আমরণ সেই স্বর্গীয় সুষমা তার সঙ্গে থেকে যাবে। এই মরজগতে থেকেও সে অমর। তার আত্মা অমর। আত্মার এই অমরতা কোন কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

[✓গীতা: সাংখ্যযোগ ২৩ নং শ্লোক]

কিন্তু সেই অমর আত্মাকে এ সংসারে উপলব্ধি করা শক্ত। সে উপলব্ধি আনবার জন্য চাই তীব্র মানসিক আকুতি। যে মহাসিন্ধুর তরঙ্গাভিঘাত তাকে এই জগতে নিয়ে এসেছে তার চকিত দর্শন পেতে গেলে মানুষে মানুষে পরম সহানুভূতি নিয়ে এ জীবন কাটাতে হবে এবং কখনো বিশ্বাস হারালে চলবে না।

শিশু তার স্বতঃলব্ধ প্রজ্ঞা নিয়ে যে আনন্দের আস্বাদ পেতে পারে বয়স্ক মানুষকে তা পেতে গেলে ধ্যান, মননশীলতা একান্ত প্রয়োজন এবং এ ছাড়া, সমস্ত ব্যক্ত বস্তুতে সেই স্বর্গীয় আলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে হবে।

দ্বিতীয়টি 'ওয়াই নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহে পুণরায় ভ্রমণ করবার সময়ে টিনটার্ণ মঠের কয়েক মাইল উপরে রচিত পংক্তিগুলি, বা সংক্ষেপে 'টিনটার্ণ মঠ' (Tintern Abbey) — (Lines composed a few miles above TINTERN ABBEY, on re-visiting the banks of wye during a tour)—১৩ই জুলাই, ১৭৯৮।

'টিনটার্ণ মঠ' (Tintern Abbey) কবিতাটি 'গীতধর্মী গাথাসমূহের (Lyrical Ballads) অন্তর্ভুক্ত।

কবি টিনটার্ণ থেকে পায়ে হেঁটে ব্রিষ্টল পৌঁছে কবিতাটি লিখে ফেলেন। সঙ্গী ছিলেন তাঁর বোন ডোরেথি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পথ চলতে চলতে এই কবিতাটি তৈরী করেছিলেন। এটি ১৫৯ লাইনের কবিতা।

এটি প্রকৃতি সম্পর্কিত অনুধ্যানের গীতিআলেখ্য। প্রকৃতির সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতার ক্রমবিকাশ তাঁর জীবনে ঘটেছিল এ কবিতা তারই বর্ণনা। প্রথমে, শৈশবের আনন্দময় চঞ্চল পরিক্রমণ, —তাতে কোন গভীর তত্ত্বচিন্তা ছিল না। যৌবনের ক্ষুধাতুর কামনাও সেই প্রকৃতিকে ঘিরে। এবং পরিশেষে এক মহিমময় অচঞ্চল চেতনা তাঁর পার্থিব শরীরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তাঁর আত্মাকে জীবন্ত করে দিয়েছে। তাঁর সমগ্র সত্ত্বা এ জগতের সমস্ত ভার নামিয়ে দিয়ে শুদ্ধ নির্মল চৈতন্যে উত্তীর্ণ হয়। তাঁর রক্তপ্রবাহও সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি তাঁর শুদ্ধসত্তাকে পুণরুদ্ধার করেন। এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রকৃতির সুন্দর প্রতিভাসের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। মানবাত্মার স্থির বিমর্ষ সঙ্গীত তিনি এখন শুনতে পেয়েছেন। এই কারণেই প্রকৃতিকে তিনি তাঁর বিশুদ্ধ চিন্তার পরমস্থিতি, পরামর্শদাত্রী ও অভিভাবিকা হিসাবে বুঝেছেন। প্রকৃতির উপর একান্ত আস্থা তাঁকে ক্ষুদ্রতা, হঠকারিতা ও আন্তরিকতার অভাব থেকে মুক্ত করেছে।

স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge) ১৭৭২-১৮৩৪

১৭৭২ সালে ইংল্যাণ্ডের ডেভনসায়ারে জন্ম। ছোটবেলা থেকে অকালপক্ক। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তাঁর বিশেষত্ব বোঝা যেত। কেম্ব্রিজে পড়ার সময় রাজনীতি ও বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। অক্সফোর্ডে কবি সাদের (Robert Southey) সঙ্গে পরিচয় হয়। ব্রিষ্টলে সাদের সঙ্গে মিলে এক অদ্ভুত অবাস্তব পরিকল্পনা করেন। আমেরিকায় গিয়ে এক আদর্শ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে সব মানুষের সমান ক্ষমতা থাকবে। ব্রিষ্টলেই ১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থেব সহযোগী হিসাবে "গীতধর্মী গাথাসমূহ" (Lyrical Ballads) প্রকাশ করেন। এই যুগান্তকারী সঙ্কলনে তাঁর লেখা চারটি কবিতা ছিল। "প্রাচীন নাবিক" (The Ancient Mariner) ওই চারটি কবিতারই একটি। ১৭৯৮ সালে "কুবলা খাঁ"ও (Kubla Khan) লেখা হয় ; তবে তা অসমাপ্ত থেকে যায়। তখন প্রকাশিত হয়নি। অনেক পরে প্রকাশিত হয়। এর পর জার্মানীতে যান ও নানা দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে 'হ্রদঅঞ্চলে' (Lake District) ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছাকাছি কিছুদিন থাকেন। এর পর কেশউইকে (Keswick) থাকাকালীন 'ক্রিষ্টাবেল" (Christabel) কবিতার দ্বিতীয় অংশ রচনা করেন। সেটিও অসমাপ্ত থেকে যায়। এই সব কবিতা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর আদর্শ ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে কবিতা রচনা হচ্ছে সৌন্দর্যের মাধ্যমে আনন্দসৃষ্টি।

১৮০৪ সাল থেকে ইটালির নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। আফিমের নেশায় বারমাস অসুস্থ থাকা শুরু হয়। ইটালি থেকে ইংল্যাণ্ডে এসে এখানে ওখানে বক্তৃতা দেন। ১৮১১ সালে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন। ১৮১৬ সাল থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি লেখেন। 'সাহিত্য-জীবন' (Biographia Literaria) ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয়। গদ্যলেখা

হিসাবে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লেখা। এই গ্রন্থের শেষ দিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা সম্পর্কিত মতবাদের উপর কোলরিজের ব্যাখ্যা ও মন্তব্য এবং অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আছে। এ ছাড়া, ১৮১৯ সাল পর্যন্ত নানা সময়ে কয়েকটি বক্তৃতায় তিনি শেক্সপীয়র সংক্রান্ত যে সব আলোচনা করেছেন এবং শেক্সপীয়রের উপর নানা সমালোচকের আলোচনার উপর যে সব মন্তব্য করেছেন সেগুলি আজও পর্যন্ত শেক্সপীয়রের পাঠকদের প্রভূত সাহায্য করে ও উৎসাহিত করে।

কোলরিজ রোম্যাণ্টিক যুগের তথা সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সমালোচক হিসাবে স্বীকৃত। তবে সমালোচনাগুলির অধিকাংশই তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৬ এবং ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। যেমন তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলি তেমনি নানা গদ্যরচনা অধিকাংশক্ষেত্রেই অসমাপ্ত থেকে যায়।

এর পর 'কুবলা খাঁ' (Kubla Khan) সংক্রান্ত কিছু বলে কোলরিজের কথা শেষ করবো।

কুবলা খাঁ (Kubla Khan)

'কুবলা খাঁ' লেখা হয়েছিল ১৭৯৮ সালে, কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৬ সালে। এটিকে একটি অসমাপ্ত কবিতা বলে বলা হয়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ কবিতা বললেও ভুল হয় না।

এই কবিতাটি ফুটে উঠেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে , তাই এটি খুব বেশী হতবুদ্ধিকর। আফিমের ঘোরে দেখা স্বপ্ন এর প্রাথমিক উৎস। ৫৪ লাইনের কবিতা। যে বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ফলে 'কুবলা খাঁর' মত কবিতা লেখা সম্ভব হতে পারে তাকে বোধ্যভাষায় কোন কিছুকে প্রকাশ করবার ক্ষমতাসম্পন্ন করা দুরুহ। তা ছাড়া, পাঠক এই ধরনের কবিতা পড়ে একটা কার্যকারণেও সহজে পৌঁছাতে পারেন না। এই কবিতার প্রকাশভঙ্গীর অনুরূপ কোন বিশেষ ভঙ্গী প্রচলিত প্রকাশ ভঙ্গীর সঙ্গে মেলে না। অথচ তাকেই হয়ত কাব্যের সঠিক ভাষা এবং স্ফুরণ বলা যেতে পারে। স্বপ্নকে যদি ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা হয়, তবে তার অপ্রচলিত রূপ অবশ্যই অবোধগম্যতা সৃষ্টি করবে। যদি তা না করে তবে সেই প্রকাশিত বস্তু কৃত্রিম। 'কুবলা খাঁ' কবিতাটি, এক কথায়, স্বপ্নের বিশুদ্ধ প্রকৃতি বজায় রেখে তাকে ভাষায় রূপ দেবার চেষ্টা। এর উপযুক্ত বিশ্লেষণও পরিচিত অর্থবোধ করাতে পারে না। পরিচিত ধরনে এর অর্থবোধ করানোর চেষ্টার দ্বারা বিশুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবে, 'কুবলা খাঁ' কবিতার বিশেষ চরিত্র ক্ষুন্ন করে একটা অর্থবোধ করান যায়।—জানাডুতে (Xanadu) কুবলা খাঁর প্রাসাদ। আর আছে পবিত্র নদী আলফ (Alph)। একটি সুন্দর দৃশ্যপট এবং সেই দৃশ্যপটের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে সম্রাট কুবলা খাঁ। সৌন্দর্য সত্ত্বেও ভয়, মন্ত্রমুগ্ধতা, ভয়ানক পরিস্থিতি, অমিত শক্তি, বিস্মৃতি, মৃত্যু এবং দ্বন্দ্বের পূর্বাভাস—ইত্যাদির ভাবসম্মোহন বিভিন্ন চিত্রকল্পের দ্বারা ফোটান হয়েছে। এগুলির ঠিক পরবর্তী অবস্থায় সুন্দর দৃশ্যপট বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং এক ভয়ঙ্কর গহ্বর থেকে উঠে আসে প্রচণ্ড জলোচ্ছাস যা সেই পবিত্র নদীরই ভিন্নতর রূপ। এরপর আবার

পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় কুবলা খাঁর ঐশ্বর্যময় প্রমোদ নিকেতনে। এখন এই প্রমোদ নিকেতন সেই শাক্তিশালী জলোচ্ছ্বাস এবং সর্বাত্মক ধ্বংসের খুব কাছেই রয়েছে বলে দেখা যায়। এই দৃশ্য প্রকাণ্ড, সুন্দর কিন্তু পরিচ্ছন্ন অর্থের অভাবযুক্ত। কবিতাটির মাঝখানে দৃশ্যের হঠাৎ ভয়াবহ পরিবর্তন স্বপ্নের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এসব বর্ণনার পর কবি যেন দেখেন এবং শোনেন যে একটি আবিসিনিয়ার মেয়ে আবোরা পাহাড় (Mount Abora) সম্পর্কে গান গাইছে। প্রাচীন উপকথা অনুসারে আবোরা পাহাড়ই স্বর্গ। এখানকার দৃশ্যপট কবিতাটির প্রথমদিকের দৃশ্যপটের মত। সুতরাং সম্ভবতঃ, কুবলা খাঁর বাসস্থান স্বর্গেরই অনুরূপ। ওই সুখসৌন্দর্যের লীলাভূমি স্বপ্নদৃষ্ট। কবি যদি সজ্ঞানে থাকতেন তাহলে বলা যেত ওই স্বপ্নদৃষ্টস্থান কবির নিজস্ব আদর্শ-কল্পনার সৃষ্টি। কবির কল্পনাশ্রিত কুবলা খাঁর শক্তি ও তার প্রসাদের রহস্য এবং সামগ্রিক মন্ত্রমুগ্ধ অনুভূতি কবির একান্ত কাম্য। এই কামনার প্রকৃতি ও রোম্যান্টিকতার সংজ্ঞা হুবহু মিলে যায়।

কবিতাটির রূপায়নে স্বপ্নের বিশিষ্ট ভূমিকা কোলরিজের মতানুযায়ী প্রকৃত কবিতার উৎস। পবিত্র নদীটি কবিকল্পনার বস্তুগত প্রতিস্থাপন। এ যেন একাধারে ভয়ানক এবং সম্মোহিনী। দুঃখের বিষয়, না ব্যক্তিগত জীবনে না কবিতায় কোলরিজ তাঁর সেই দিব্যদর্শনকে প্রথাগত করেননি এবং সেই কারণেই সাধারণ্যে বোধগম্য করে তুলতে পারেন নি। মানসিকতার যে ব্যতিক্রমী চরিত্র কোলরিজের ছিল তা তাঁকে করেছে অসাধারণ স্রষ্টা কিন্তু অসম্পূর্ণ কবি।

সাদে (Robert Southey) ১৭৭৪-১৮৪৩

সাদেও ওয়ার্ডসওয়াথ এবং কোলরিজের মত হ্রদ অঞ্চলের কবি (Lake Poets) বলেই গণ্য।

রোম্যান্টিকতার সবচেয়ে প্রচলিত ক্ষেত্র অস্পষ্ট, দূরবর্তী এবং অতীত। সাদে অতীতের নানা যুগ ও নানা সভ্যতা এবং বর্তমানের বহুদূরবর্তী স্থানগুলি তাঁর কাব্যের বিচরণভূমি বলে নির্বাচিত করেছিলেন। স্বভাবতঃই এগুলি স্থান ও কালের দূরত্বের দরুণ অস্পষ্ট। অনেক কবিতাই পৌরাণিক উপকথার ভিত্তিতে লিখেছিলেন। ওইসব উপকথাগুলির কাহিনীর ঘটনাস্থল সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ড থেকে দূরে। দূরবর্তী স্থানগুলির সম্বন্ধে সাদের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় কবিতাগুলির বৈচিত্র ও আকর্ষণ তেমন ছিল না। মৌলিকতা ও গভীরতার অভাব ছিল। তবে তাঁর কবিতার সর্বত্র তাঁর যুগের পরিচয় ছড়িয়ে ছিল।

লর্ড বায়রণ (George Gordon Byron) ১৭৮৮-১৮২৪

শেক্সপীয়র ব্যতীত একমাত্র বায়রণই ইউরোপের সাহিত্যিক সমাজের অনেকের কাছেই ইংরাজী কবিতার শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ইউরোপের নানা দেশে রোম্যান্টিক যুগের ইংরাজ কবিদের সকলের উপরে বায়রণের স্থান; যদিও বায়রণের

স্বদেশে তা নয়। তবে তাঁকে অপাংক্তেয় করে রাখাও যায়নি। কবি ও ঔপন্যাসিক স্কট এবং কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর যথার্থ সমাদর করেছেন। বায়রণ তাঁর যুগের অন্যান্য বড় কবিদের মত রোম্যান্টিকতায় সম্পূর্ণ ডুবে যাননি। বাস্তব জাগতিক বুদ্ধি তিনি তাঁর জীবনে বজায় রেখেছিলেন। বাস্তবের এবং পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সজাগ ভাব তাঁকে তাঁর যুগের অন্যান্য বড় কবিদের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। তিনি ক্লাসিক যুগের (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) আলেক্সজাণ্ডার পোপের কবিতাগুলির সুসম্পূর্ণতা ও পরিশোভনতার প্রশংসা করেছিলেন। রোম্যান্টিকতা এবং ক্লাসিক গুণের সারবস্তু সমানভাবেই তাঁর চরিত্রে বজায় ছিল।

১৭৮৮ সালে প্রাচীন অভিজাত পরিবারে বায়রণের জন্ম হয়। প্রথমজীবন স্কটল্যাণ্ডের এবার্ডিনে (Aberdeen) মামার বাড়ীতে কাটিয়েছিলেন। তাঁর মায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি তাঁর বাবাই নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিষণ্ন, নাটকীয়, বনেদী চালচলন সকলের কাছেই বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বিষয় ছিল। তিনি নিজেও তা বেশ উপভোগ করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল। পায়ের আঙ্গুলের ক্রটির জন্য তাঁর অল্পবিকৃত হাঁটাচলাও তখন অনেকে ইচ্ছা করে নকল করতেন। বায়রণ সমাজের একটা বিশেষ অংশে নায়কের সম্মান পেতেন। ১৮১২ সালে 'শিশু হ্যারল্ডেব তীর্থ ভ্রমণ' (Child Harold's Pilgrimmage) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। কিন্তু কিছুটা সঠিক, কিছুটা কাল্পনিক দুশ্চরিত্রতার জন্য সমাজে তাঁর খুব নিন্দা হতে থাকে। ১৮১৬ সালে সামাজিক বিরোধিতার জন্য ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইউরোপে কয়েক জায়গায় অস্থায়ীভাবে থাকেন। গ্রীসের স্বাধীনতাযুদ্ধে গ্রীকদের পক্ষে লড়াই করেন। কিছুদিন জ্বরভোগের পর স্বদেশ থেকে বহুদূরে খ্যাতি ও অখ্যাতির তুঙ্গে উঠে মারা যান। যে ইংল্যাণ্ড তাঁকে একদিন সমাজচ্যুত করেছিল সেই ইংল্যাণ্ডেই মহাসমারোহে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়।

তাঁর বিখ্যাত কাব্যগুলির মধ্যে রয়েছে ১৮০৯ সালে লিখিত বিদ্রুপাত্মক কবিতা 'ইংরাজকবিগণ এবং স্কচ সমালোচকগণ' (English bards and Scotch Reviewers) ও ১৮১২, ১৮১৬ এবং ১৮১৮ সালে লিখিত 'শিশু হ্যারল্ডের তীর্থযাত্রা' (Child Harold's Pilgrimmage)। এটিকে তাঁর আত্মজীবনীও বলা চলে। তাঁর আরও কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক কাব্য শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে 'বেপ্পো' (Beppo—১৮১৯), 'দিব্যদৃষ্টিতে পার্থিব দোষগুণের বিচার' (The Vision of Judgment—১৮২২)। এবং 'ডন হুয়ান' (Don Juan—১৮১৯—২৪)। 'ডন হুয়ান' অবিসংবাদিতভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। বায়রণ সামাজিক নীতি-দুর্নীতির ভয় করতেন না। কিন্তু আন্তরিক দুঃখবোধও তাঁর ছিল। তাঁর চারিত্রিক দুরবস্থার জন্য তিনি নিজে যতটা না দায়ী ছিলেন, তাঁর পারিপার্শ্বিক—বিশেষ করে অভিজাত মহিলারা তার থেকেও বেশী দায়ী ছিল। ডন হুয়ান এক বেপরোয়া জীবনের কাহিনী। তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখকে তিনি ব্যক্ত করতে চাননি, কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও কোথাও কোথাও চেপে রাখতেও পারেননি।

তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নরম সুরের গীতি কবিতা 'সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে তার চলাফেরায়' (She walks in Beauty)।

শেলী (Percy Bysshe Shelley) ১৭৯২-১৮২২

কোন একজন বিশেষ কবিকে স্মরণ করতে গেলে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভাই শুধু নয়, তিনি যে ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত তার কথাও মনে রাখতে হয। ইংরাজী কাব্যের ঐতিহ্য, কবির ব্যক্তিগত প্রতিভা, তাঁর যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ, রুশোর স্বভাবজ মানবতাবোধ, জার্মানীর 'উত্তরণবাদী' (Transcendental) দর্শন এবং এগুলি থেকে আহৃত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যের প্রেরণা,—এ সবের পরিপ্রেক্ষিতেই শেলীকে এবং তাঁর কবিতাকে দেখা প্রচলিত রীতি।

কবিতার সবচেয়ে ছোট সংজ্ঞা হচ্ছে 'কল্পনাকে ভাষায় প্রকাশ'—এবং এই সংজ্ঞা এত সাধারণ যে এতে দ্বিমতের আবকাশ কম। এটিকে মতবাদ বলেও ধরা যেতে পারে। শেলির 'ভরতপাখীর প্রতি' (To a Skylark) এই মতানুসারী একটি কবিতা। শেলীর দূরেক্ষণী কল্পনার ঊর্ধ্বগামী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতপাখীও উচ্চ থেকে উচ্চতর আকাশে উঠে যায়। 'পশ্চিমী ঝোড়ো বাতাসের প্রতি' (Ode to the West Wind) কবিতাটি বৈপ্লবিক আদর্শবাদ এবং স্বভাবজ মানবতাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই কবিতাতেই শেলীর সেই দিব্যদৃষ্টি যে ভবিষ্যতে মানবতার নিয়ামক হবে বিশ্বব্যাপী ভালবাসা—তা অপূর্ব সারিবদ্ধ চিত্রময়তায ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

শেলীকে অনেকে অনেক রকম ভাবে বুঝতে ও বোঝাতে চেযেছেন। তাঁর স্কুলের সহপাঠীদের কাছে তিনি ছিলেন 'পাগলা শেলী' (mad Shelley), শিক্ষাবিভাগ এবং সমাজের অভিভাবকদের কাছে তিনি ছিলেন 'মন্দ শেলী' (bad Shelley), ম্যাথুআর্ণল্ডের কাছে ছিলেন 'অসফল দেবদূত' (ineffectual Angel), বার্নার্ড শ'-এর চোখে তিনি ছিলেন 'সমাজসংস্কারক', ব্রাউনিং-এর ভাষায তিনি ছিলেন 'প্রথম সুন্দর আপনভোলা আনন্দোচ্ছাস'। আরও অনেকের কাছে তিনি ছিলেন মহাবিপ্লবী, —মানুষের প্রতি অমানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর রণনিনাদী কণ্ঠস্বর বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। ভরতপাখীর বর্ণনায় কবির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছিল।

আবার, শেলীর কবিতা পড়েই আমাদের সেই আশা আমরা উপলব্ধি করি যে কবিতা কত কিছু করতে পারে; বা অন্যভাবে বলতে গেলে কবিতার কাছে আশা করা যায় না এমন কিই বা আছে! শেলী অভৌত জিনিষকে বিষয়ীভূত করে মানুষের বোধের সীমানার ভিতরে এনেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদকেও তিনি বর্জন করেন নি। প্লেটোর কুহেলিকাচ্ছন্ন আদর্শ সত্ত্বাকে তিনি স্পষ্ট গোচরীভূত করেছিলেন এবং সেখান থেকেই বহু কবিতার মূল অনুভূতিকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ত্রুটিবিহীন সৌন্দর্যকে তিনি সর্বপ্রযত্নে তাঁর আশা ও কল্পনার ভবিষ্যৎ জগতে সংরক্ষিত করেছিলেন।

শেলী খুব ধনীর ঘরে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবার নাম টিমথি (Sir Timothy Shelley)। ইটনে (Eton) এবং অক্সফোর্ডে কিছুদিন পড়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর

মতামত ও ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষ কারণ ছিল 'নিরীশ্বরবাদিতার প্রয়োজনীয়তা' (The Necessity of Atheism) এবং অন্যান্য কয়েকটি অনুরূপ প্রচার-পুস্তিকা। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি তৎকালীন সুবিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ William Godwin-এর মেয়ে মেরীকে বিয়ে করেছিলেন। শেলীব মানসিকতার উপরে গডউনের চিন্তার প্রভাব পড়েছিল। শেলী গণতান্ত্রিক ছিলেন। প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার ছেলেদের অভিজাত কোন স্কুলে পড়াতে চাননি।

ইউরোপে থাকাকালীন তিনি ভূমধ্যসাগবীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'মুক্ত প্রমিথিউস' (Prometheus Unbound) লেখা হয়। ১৮১৯ সালে লেখা নাটক 'সেনসি-কে' (The Cenci) অনেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন। এর পরে বহু কবিতা একের পর এক লিখতে থাকেন। আশ্চর্য, অতিমানবিক দক্ষতার সঙ্গে তিনি কাব্যে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি অসুন্দর এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে তাঁর আদর্শকে দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি এত প্রসারিত ছিল প্রত্যক্ষ বাস্তবের কুৎসিৎ মুখ পর্যবেক্ষণের আগেই অনেক দূর তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি বন্ধুবৎসল ছিলেন। কবি কীটসকে সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করানোর চেষ্টায় তিনি কীটসের সমালোচকদেব তিরস্কার কবেছিলেন। কীটসের মৃত্যুতে অসাধারণ শোকসূচক কবিতা 'এ্যাডোনাইস' (Adonais) লিখেছিলেন ১৮২১ সালে। কীটসের অকাল মৃত্যুর জন্য তিনি কীটসের সমালোচকদের দায়ী করেছিলেন এই কবিতায়। 'মেঘ' (The Cloud), 'পশ্চিমা বাতাস' (Ode to Wast Wind) এবং অন্যান্য নানা কবিতা তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরের সৃষ্টি। সমুদ্রে জলে ডুবে তিনি মাবা যান। হয়ত উদার বিশাল প্রকৃতি সরাসরি তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। দুশো বছব আগের শেলী আজও পৃথিবীর প্রতিটি সৎ ও সুন্দর মানুষের কাছে মানুষের মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ অনুসারী।

এবারে আমরা শেলীর দু'একটি কবিতার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করবো।

পশ্চিমী বাতাসের প্রতি (Ode to the West Wind)

শেলীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। সত্তর লাইনের দীর্ঘ কবিতা। ১৪টি করে লাইনের পাঁচটি স্তবক। জগৎ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইটালির ফ্লোরেন্সের কাছে কোন স্থানে লিখিত। ১৮২০ সালে প্রকাশিত।

প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী শক্তি ও সংরক্ষণের শক্তি, প্রলয় ও স্থিতি, ধ্বংস ও পুনঃর্জীবন এই কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কিন্তু মূল বিষয় কবির প্রতিক্রিয়া, সংবেদনশীলতা। অদ্ভুত নানা চিত্রময়তায় গতি ও শক্তির অসাধারণ প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। কবি প্রকৃতিতে অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় প্রাণ সঞ্চার করেছেন। বহু যুগ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই দৃষ্টি নিয়েই প্রকৃতিকে দেখেছিলেন। প্রকৃতির মহাশক্তির ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর দিয়ে কবি নতুন পৃথিবার শুভ আবির্ভাব আশা করেছেন, যার ভিত্তি হবে সত্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার।

জড়ত্ব, সামান্যতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে গতি, শক্তি ও প্রাচুর্যে মুক্তির জন্য কবির

আকুতি এই কবিতার প্রধান বিষয়। প্রকৃতির সর্ব অংশে মিশে যাওয়ার জন্য কবির একান্ত কামনা—

"—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে,
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
......................................"।

মানুষের ভবিষ্যতে কবির সুদৃঢ় আস্থা। এই কবিতার মর্মবাণী মানব-হিতৈষণার অনেক উঁচু পর্যায়ে কবিকে নিয়ে গেছে।

আর একটি কবিতা :

'আমি তোমার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠি' (I arise from the dreams of thee) কবিতাটির আসল নাম 'কবোষ্ণ ভারতীয় প্রকৃতির প্রতি' (Lines to an Indian Air)। এছাড়া অন্য আর একটি নাম আছে: 'ভারতীয় আবহাওয়ায় প্রেমিকার চিত্তবিনোদন' (Indian Serenade)।

আট লাইনের তিনটি স্তবকের কবিতা। প্রথম লাইনটি 'I arise from the dreams of thee'। শেলীর মৃত্যুর পর, ১৮২৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতাটিতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কারুণ্যের উচ্ছ্বাস এবং তার অবাধ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমাস্পদ, প্রকৃতি ও কবি যেন সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে এই কবিতায়।

প্রেমাস্পদা ও কবির মাঝখানে প্রকৃতির ব্যবধান ক্রমেই মিলিয়ে যায়। প্রকৃতির যেন মধ্যস্থতা করার আর প্রয়োজন থাকে না। তার দৌত্যের ভূমিকা সে যথাযথ পালন করেছে। প্রেমের ভাবাবেশে কবি তাঁর প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে চলে যান। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে সঞ্চারণ শেলীর গীতিকবিতায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে।

কবিতাটি আয়তনের দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের মত; ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মত এবং আবেগের ঘোষণায় শেলীরই মত।

তৃতীয় কবিতাটি :

'প্রায়ই অপবিত্র করা হয় এমন একটি শব্দ' (One Word is too often profaned)।

১৮২১ সালে ইটালির পিশায় (Pisa) থাকাকালীন রচনা। কবির মৃত্যুর পরে ১৮২৪ সালে প্রকাশিত হয়। আট লাইনের দুটি স্তবকের কবিতা। হৃদয়ের শ্রদ্ধা, শিল্পে ও কাব্যে বিশ্বাস ও সেই সংক্রান্ত অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে শেষ চার লাইনে।

'একটি শব্দ' (One word) বলতে 'ভালবাসা' (Love) এই শব্দটি বোঝানো হয়েছে। ভালবাসার যথোপযুক্ত মর্যাদা না দিয়ে তা জানানোর ভান করে তাকে অপবিত্র করা হয়। কবি তা পারেন না। কবি জানেন ভালবাসার লক্ষ্য আমাদের আয়ত্তের বাইরে, চিরকাল তাকে অনুসরণ করেও তার নাগাল পাওয়া যায় না। কবির শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুরাগ, আশা ও আকাঙ্খা সসীম ও দুর্বল হলেও তা আন্তরিক। ভালবাসাকে অন্তরে তুচ্ছ করে

বাইরে অপবিত্রভাবে তাকে ব্যক্ত করার ইচ্ছা কবির নেই। তবে সেই যথাসাধ্য এবং পবিত্র ভালবাসা সামান্য বলে কি উদ্দিষ্ট মহিলা তা গ্রহণ করবেন না?

'সিন্দুক ভরে আনিনি স্বর্ণ,
এনেছি দুমুঠি নবীন ধান্য,
ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য?'

[কবির নাম গ্রন্থকারের জানা নেই। গ্রন্থকার আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

চতুর্থ কবিতাটি :

'একটি ভরত পাখীর প্রতি' (To a skylark)। ১৮২৭ সালে প্রকাশিত পাঁচ লাইনের একুশটি স্তবক।

শেলীর ভরত পাখী কায়াহীন সুর। তার অস্তিত্ব বহুদূরে, শূণ্যে। মানুষ তাকে অনুসরণ করতে পারে সাধারণ দৃষ্টিশক্তি দিয়ে নয়,—সুরের শক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। শেলীর কবিতা এই পৃথিবীকে আরও সুন্দর বলে প্রতিভাত করায়। কবি ভরত পাখীর কাছে জানতে চান তার সুরের রহস্যের উৎস কোথায়? কি করেই বা আমাদের জীবনে সেই সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটান যায়; কি করেই বা আমরা আমাদের দুঃখ, অতৃপ্তি, সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমরা আমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্যকে দুঃখ দিয়েই ব্যক্ত করি। আমাদের মধুরতম সঙ্গীত বিষণ্নতম চিন্তাকে আতিক্রম করতে পারেনি। নিরানন্দ, অসৌন্দর্য, জরা-মরণকে আমরা কি ভারতপাখীর সঙ্গীতের সুরের মত জয় করতে পারি না? হে আনন্দ, হে সুন্দর, তুমি আমাদেরও সুন্দর করো, আমাদেরও আনন্দময় করো,—এই কবির প্রার্থনা। কবি জানেন সুন্দরের শক্তি অসীম। তিনি বলেছিলেন,—

'I looked at thy eyes,
And loved the World more'।

(আমি তোমার চোখের দিকে চেয়েছিলাম এবং পৃথিবীকে আরও বেশী ভালবেসেছিলাম।) ভরতপাখীর গান আমাদের নবজীবন দান করতে পারে।

কবি পাখীটির গানের বর্ণনায় নানা দিক থেকে উপমা দিয়ে, চিত্রকল্প সাজিয়ে বস্তুবিমুক্ত সুরকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। দ্রুতগতিশীল সারি সারি ছবি, পর্যবেক্ষণ ও মতামত কবিতাটির বিশেষ আকর্ষণ। কবি মানুষের শক্তির সীমার সঙ্গে সৌন্দর্যের অসীম বিস্তারের তুলনা করেছেন। হয়ত অন্তর্নিহিত আশা এই যে আমরা কি অমলিন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে নবজন্মলাভ করতে পারি না!

কীটস (John Keats) ১৭৯৫-১৮২১

রোম্যাণ্টিক যুগের শ্রেষ্ঠতম কবিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। মারাও গেছেন সকলের চেয়ে আগে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে।

১৭৯৫ সালে লণ্ডনের কাছেই কীটসের জন্ম। পরে হ্যাম্পস্টেডের যে বাড়ীটিতে

তিনি থাকতেন তার নাম 'ওয়েন্টওয়ার্থ প্লেস (Wentworth place)। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক লে হান্টের (Leigh Hunt) বাড়ীও হ্যাম্পস্টেডে। লে হান্টের বাড়ীতে কবির যাওয়া আসা ছিল। এখানেই কবি শেলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আজীবন তাঁদের সৌহার্দ্য ছিল। চিত্রকর হেডন (Haydon) এবং সেভার্ণের (Severn) সঙ্গেও পরিচয় লে হান্টের বাড়ীতেই। এঁরা সকলেই কবিকে নানাভাবে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তাঁর প্রকাশক জন টেলর (John Taylor)। ইটালিতে যাওয়ার খরচা টেলর দিয়েছিলেন। কবির উপর এঁদের প্রভাব নানাভাবে পড়েছিল। আর, কবিদেরও কবি (Poet of poets) স্পেন্সারের প্রভাব তাঁর উপর খুব বেশী ছিল।

বাবা মা মারা যাবার পর এক শল্যচিকিৎসকের কাছে কয়েক বছর শিক্ষানবীশ ছিলেন। এ কাজকেও তিনি কখনো ছোট মনে করেননি। তবে খুব অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যের অনুশীলন শুরু করেছিলেন। জীবনের শেষ চার বছর ক্ষয়রোগের সঙ্গে লড়াই করতে করতেও কবিতা লিখে গেছেন এবং সে সব কবিতার কোন তুলনা নেই। সেই সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতেন। ভাষায়, আন্তরিকতায়, মমত্ববোধে সে সব চিঠিরও কোন তুলনা নেই। প্রতিবেশিনী ফ্যানি ব্রনের (Fanny Brawne) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিবাহ হয়নি। কীটসের মৃত্যুর পর ফ্যানিও মর্মাহত হয়েছিলেন।

এই তরুণ কবি পরিচিত মহলের সকলের ভালবাসা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক রূঢ় সাহিত্য সমালোচকরা তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। যাঁরা তাঁর প্রতিভাকে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা নিজের নিজের পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট সব মানুষ।

কবি নিজে ছিলেন বিনীত, মিষ্টভাষী। স্কুলকলেজে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি; কিন্তু নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল।

সমালোচকদের নির্মমতা সত্ত্বেও কবি জানতেন যে তিনি একদিন গৌরবময় স্বীকৃতি পাবেন। মৃত্যুর তিনচার বছর আগে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'I Think I shall be among the English poets after my death'। তাঁর যা কিছু ভাল কবিতা তা' জীবনের শেষ চার বছরে লেখা।

কবি মারা যান রোমে। রোমেই তাঁর সমাধি। তাঁর ইচ্ছানুসারেই সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ করা আছে: 'তার নাম জলে লেখা হয়েছিল; কোথাও কোন দাগ থেকে যায়নি' ('Here lies one whose name was writ in water)। সমাধিগাত্রে যে তাঁর নাম খোদাই করা হয়নি তা-ও তাঁর ইচ্ছানুসারে। মহাকাল তাঁর অদৃশ্য নাম চিরকাল বুকে ধারণ করে রাখবে।

কীটস অসৌন্দর্যকে কখনো দেখতে পারতেন না। তিনি সৌন্দর্যকে একটা স্থায়ী নীতি হিসাবে নিয়েছিলেন। আবার বাস্তব পারিপার্শ্বিককেও অস্বীকার করেন নি। তিনি নিজেই নিজের লেখার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক ছিলেন। তাঁর ধারণায় সত্য ও পবিত্রতা সৌন্দর্যের ধারক। কীটস গভীর চিন্তার চেয়ে সংবেদনশক্তির উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। ছবি, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের সঙ্গে তিনি কবিতাকে মিলিয়ে নিতেন। স্পর্শযোগ্য প্রতিরূপের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল।

কীটসের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও কাব্যগ্রন্থগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজান যায়। সেগুলি হচ্ছে:

On first looking into Chapman's Homer; Sleep and Poetry; Endymion; Isabella; Hyperion; The Eve of St. Agnes; Lamia; Ode to Psyche; Ode on Melancholy; Ode to a Nightingale; Ode on a Grecian Urn; Ode to Autumn; La Belle Dame Sans Merci; এবং Bright Star.।

এর অল্প কয়েকটির সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। তার আগে কীটসের Ode (বড় গীতিকবিতা) সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ওড-এর (Ode) বিশেষত্ব এই যে এগুলি সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বিমূর্তভাবকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়।

কীটসের ওডগুলিতে শব্দ, চিত্রকল্প এবং ভাষা সঙ্গীতের ছন্দে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা অতুলনীয়। কীটসের কবিত্বশক্তি শ্রেষ্ঠ ওডগুলিতে সবচেয়ে বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে। ওডগুলিতে কীটসের সংবেদশীলতা (Sensuousness) একটানা, স্থায়ী, এবং চেতনার এক আচ্ছন্নভাবের দ্বারা পূর্ণনিয়ন্ত্রিত। অবসর বিনোদনের মত ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগুলির প্রভাব পাঠকের চেতনাকে অবশ করে দেয়। কিন্তু সেই বিবশমানতার ভিতরেও বুদ্ধিভিত্তিক সূত্রগুলি কাজ করে যায়। গবেষণা ও দার্শনিকতার মাত্রা সেখানে যোগ হয় না। তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করা যায় না এমন কোন বুদ্ধিভিত্তিক সত্যকে কিন্তু কাব্যগঠনপদ্ধতির ভিতর তিনি আনতে চান নি।

কীটস শিল্প ও জীবনের মধ্যে এবং শিল্প ও প্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। অবশ্যই তা পাঠকের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে না। কীটসের কবিতার আবেদন মস্তিষ্কের অনুভূতিগ্রাহী অংশের কাছে।

কীটসের কবিতায় আবেদন ব্যক্তির নিজস্ব স্বত্ত্বায় সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তির মনের রহস্য এই আবেদনকে প্রবহমান বাতাসের মত স্বাধীন রাখে। আনন্দ থেকে অন্তঃকরণের পবিত্রতা, কিংবা আনন্দ থেকে অনুশোচনা, অনুশোচনা থেকে মহিমান্বয়ন,—এইভাবে অনুভূতির ফল সঞ্চরণশীল থাকতে পারে।

কীটস কখনও কবিতার প্যাটার্ণ বা গঠন সম্বন্ধে সন্তুষ্ট বা নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। একটি সুরকে বেশীক্ষণ একভাবে ধরে রাখা যায় না, —এটা তিনি বুঝতেন। এই দুর্বলতাকে জয় করবার জন্য তিনি বরাবর চেষ্টা করে গেছেন। সুরের একটানা স্থায়ীত্বের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়নি।

ওডগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় কীটস ক্রমশঃ ধ্যান বা গভীর চিন্তার দিকে চলে যেতে চেয়েছিলেন। ক্রমশঃ পূর্ণ শৃঙ্খলা এবং মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করেছিলেন। মেজাজের স্থয়ীত্ব এবং অধিকতর মর্যাদা আনারও চেষ্টা করেছিলেন। তাই বলা যায় কীটসের ওডগুলি অনুসরণ করলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তমান অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করা যায়। এই জীবন ঘটনাগত জীবন নয়,—জীবনদর্শন, জীবনবিচার।

একটি নাইটিঙ্গেল পাখীর উদ্দেশ্যে (Ode to a Nightingale)

১৮১৯ সালের বসন্তকালে নিজের বাসস্থানে বসে রচিত। প্রত্যক্ষ উপলক্ষ্য ওয়েন্টওয়ার্থ প্লেস নামক বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যানের একটি গাছে এক নাইটিঙ্গেল পাখীর সুমধুর ডাক।

প্রথম স্তবকের প্রথমেই পাখীর সুমধুর গান শুনে কবির মানসিক অসাড়তা। তারপর বাতাসের তনুভবন (rarefaction) এবং এর জন্য আলস্যভাব। এই আলস্যময় পরিবেশে ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা কবি ভুলে যান। তিনি পাখীটির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন ; তিনি পাখীটির পরম সুখের অংশ গ্রহণ করতে পারেন। পাখিটির প্রতি ঈর্ষা আবার ফিরে আসে। কিন্তু সেটি তখন তাঁব নাগালের বাইরে, মানুষের দুঃখের সীমার বাইরে। চতুর্থ স্তবকে তিনি তাঁর উদ্যম ফিরে পান। এরপর পাখীটির সহযোগী হয়ে যান এবং পূর্ণ সৌন্দর্যকে অনুভব করেন এবং তাতেই মগ্ন হয়ে যান। এরপর মানসিক আশ্বস্তভাব কমে আসে। মৃত্যুচিন্তা এসে যায়। আর সেই নাইটিঙ্গেলের সত্ত্বা অমরতা পেয়ে যায়। ধীরে ধীরে তার পার্থিবসত্ত্বা দূর প্রকৃতিতে মিশে যায়। কবিও তাঁর সম্বিৎ ফিরে পান। কবি এই কবিতায় প্রাচীন গ্রীক পরিবেশের উল্লেখ করেছেন, আর বহু প্রাচীন ইতিহাসের স্বপ্নকল্পনাময় জগতকে এক মুগ্ধ দৃষ্টি নিযে দেখতে চাইছেন এই কবিতায়।

কবির প্রাথমিক অভিজ্ঞতা এক উৎপীড়িতের অভিজ্ঞতা, আর কবিতাটিতে তিনি এগিয়ে গেছেন এক প্রাচুর্যময় পবিবেশে ; তাঁর বর্তমানের খিন্ন জীবন ছড়িয়ে পড়ে স্থান ও কালের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে।

এই কবিতায় রয়েছে ব্যথা, দুঃখ, মৃত্যু ; সেগুলিকে অতিক্রম করার আকাঙ্খা এবং পবিশেষে সব কিছু পুনঃগ্রহণ। সহজ প্রেরণাপ্রসূত কীটসের জীবন শক্তিময়। তিনি পরিস্থিতিকে প্রশান্ত বিজ্ঞতায গ্রহণ করেন।

কীটসের গ্রীক অনুভাবন ও একটি প্রাচীন গ্রীসদেশীয় আধার প্রসঙ্গে [Keats's Hellenism and Ode on a Grecian Urn]

'হেলীনিজম (Hellenism) কথাটির মানে গ্রীক বাগ্বিধি, ভাবধারা, সংস্কৃতি বা আচরণ। কীটস তাঁর কবিতায় বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীক বাগ্বিধি ও ভাবধারা অনুসরণ করেছিলেন। তদানীন্তন সংস্কারবশতঃ প্রাচীন গ্রীকরা তাঁদের চারধারের প্রকতিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং সৌন্দর্যের যে ধারণা তাঁদের মধ্যে প্রচলিত চিল, এবং যে সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ী তাঁরা শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পবিচার করেছিলেন কীটস তাকে আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজের কবিতায় তা বিকশিত করেছিলেন। এরই নাম কীটসের 'গ্রীক ভাবনা' বা 'হেলীনিজম' (Hellenism)। কীটস তাঁর কবিতার নানা জায়গায় গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী ও নানা রোম্যান্সের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লেখ করেছেন। শেলীর দৃষ্টিতে কীটস নিজেই ছিলেন গ্রীক। 'গ্রীসদেশীয় আধার' (Grecian Urn) কবিতাটি মানসিকতায়, গঠনভঙ্গীমায়, বর্ণিত বিষয়ে এবং প্রাচীন পরিবেশের পুণরুল্লেখে পুরোপুরি গ্রীক গুণান্বিত।

গ্রীসদেশীয় আধার (Grecian Urn)

কবিতাটির ঊনশেষ লাইন—Beauty is Truth, Truth Beauty.

কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয় শিল্পের অপরিবর্তনীয়তার সঙ্গে মানুষের জীবনের অস্থায়িত্বের তুলনা। কীটস যেন বলেন: শিল্পকলাতেই সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব। আবার এই কবিতাটিরই শেষে তিনি বলেন: সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য।

কবির এই পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা তর্ক আছে। মিডলটন মুরির (Middleton Murry) মত কেউ কেউ বলেন: ওইরূপ ঘোষণায় সত্য থাকতে পারে, কিন্তু কবিতাটির বিষয় বস্তু আলাদা: শিল্পকর্মে সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব। কবিতাটির শেষ কথায় বক্তব্য থেকে সরে দাঁড়ান হয়েছে। আবার, টি. এস. ইলিয়ট অজ্ঞতার ভান করেছেন যে কবির মনোভাব তিনি যেন বুঝতে পারেন নি।

ক্লিনথ ব্রুকসের (Cleanth Brooks) মত কেউ কেউ কীটসকে যুক্তি এবং কাব্য দুদিক থেকেই সমর্থন করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে এই আরণ্য (Sylvan) পাত্রটি যেন একটি নাটকীয় চরিত্র এবং 'সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য' এই উক্তিটির ভিতর দিয়ে কবির মনোভাব খোঁজার দরকার নেই; আধার বা পাত্রটিই (Urn) ওই উক্তির জন্য দায়ী।

এ ছাড়া, পাত্রটি একটি প্রাচীন গ্রীসদেশীয় পাত্র। গ্রীকদের কাছে সৌন্দর্য ও সত্য অভিন্ন ছিল। সুতরাং, যে কবিতাটি প্রাচীন গ্রীক শিল্পকর্মকে অবলম্বন করে লেখা তার শেষাংশে গ্রীকদের বিশ্বাসের উল্লেখ করা অযৌক্তিক নয়।

আবার, এই আরণ্য আধারটি যেন একজন ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিককে সত্য কথা বলতে হয় এবং তা সুন্দরভাবে বলতে হয়। শিল্পে সৌন্দর্যের স্থায়ীত্বের কথা বলতে গিয়ে 'আধার'টি সত্যেরই জয়গান করেছে। মানুষের জীবন, এমন কি প্রকৃতি, সেই তুলনায় অ-মহৎ কারণ তা অ-ধ্রুব এবং অ-সত্য। সুতরাং কবিতাটির শেষ কথাটি কবির অযৌক্তিক আবেগমাত্র নয়; বরঞ্চ বলা চলে, এটি কীটসের এক অগতানুগতিক শিল্পাচার।

কবিতাটির গ্রীক চরিত্র

'আধার' (Urn) টিতে খোদাই করা রয়েছে প্রাচীন গ্রীসের লক্ষণসমন্বিত একটি রহস্যময় রোম্যান্স। সেই প্রাচীন রোম্যান্সের সৌরভে কবিতাটি আমোদিত। আধারটির গায়ে ক্ষোদিত চিত্রটি থেকে যেন ধ্বনি এবং গতি উদ্গত হচ্ছে। এই চিত্রটিতে উৎকীর্ণ পাহাড়, অধিত্যকা, প্রেমিকেরা, সঙ্গীতকারেরা, নিঃশব্দ রাস্তাগুলি, অশ্রুত বংশীধ্বনি, ধর্মীয় শোভাযাত্রা ইত্যাদি রোম্যান্সের মর্মকে প্রাণবন্ত করছে। কবিতাটির গ্রীক প্রসাদ এইগুলির দ্বারাই পরিস্ফুট হচ্ছে। এইভাবে কবিতাটি গ্রীকশিল্পের গুণ পেয়ে যাচ্ছে।

কবিতাটি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা

যে জীবনে সৌন্দর্যের অপচয় হয়, আবেগ অতৃপ্ত থেকে যায় সেই হতাশ্বাস জীবন সম্পর্কে গভীর চিন্তা থেকে কবিতাটির উদ্ভব। কবি চাইছেন সৌন্দর্যের চিরস্থায়িত্ব; তা

শিল্পে সম্ভব, জীবনে দুর্লভ। সুতরাং গ্রীসিয় আধারটির থেকে তিনি সেই সৌন্দর্যের আস্বাদ পেতে চান শিল্পই যাকে ধারণ করতে পারে এবং কালজয়ী করতে পারে।

শরতের প্রতি (Ode to Autumn)

এই কবিতায় শরৎঋতুকে নানাভাবে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করা হয়েছে। এই ঋতু দ্রাক্ষালতাকে ফলভারানত করে, অন্যান্য সুস্বাদু ফলকে সুপরিণত করে। তবে এই ঋতুতে আবহাওয়া বাষ্পাচ্ছন্ন থাকে। শস্য কেটে ফেলবার মত পেকে যায় এই ঋতুতে।

কয়েকটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বাস্তব চিত্র রয়েছে। বাস্তব চিত্রগুলির সঙ্কেত কবি ধরে দিয়েছেন এই কবিতায়। কবির হয়ত দুঃখবোধ আছে যে সুপরিণতির ভবিষ্যৎ মৃত্যু। কবিতাটির শেষ দিকে বিষাদ যেন পূর্ণতার পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্ণ, গতি ও সঙ্গীত যেন পরপর তিনটি স্তবকে একে একে গড়ে তুলতে চলেছে একটি পূর্ণ অবয়ব। এই কবিতায় নানা বস্তুর সমন্বয়ে একটি অভৌত কল্পমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে যা বাস্তবতার থেকে কম বাস্তব নয়। সমালোচকরা কবিতাটির বস্তুমুখিতার কথা বলেছেন, কিন্তু কল্পমূর্তি যে বস্তুগুলির সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে তার কথা বলেন নি। শস্যের খামারে, শস্য কেটে নেবার পরে মাঠে, আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায়, ছোট নদীটি হেঁটে পার হতে গিয়ে, আপেল পেশাই-এর মেশিন থেকে চুঁইয়ে পড়া রসের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে, পরিতৃপ্ত ভেড়ার ছানার অব রবীন পাখীর শ্রুতিসুখকর ধ্বনিতে শরতের যে কল্পরূপ দেখতে পাওয়া যায় তা আমাদেরই তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ।

উজ্জ্বল তারা (Bright Star)

১৮২০ সালের শরৎকালে ইটালিতে যাবার জন্য সমুদ্রযাত্রা করবার আগে শেষবারের মত কবি তাঁর চেতনা ও সৃজনশীল শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন এই কবিতায়। জীবনের শেষ আশা তিনি এই সনেটে ব্যক্ত করেছেন। 'উজ্জ্বল তারা' অর্থাৎ ধ্রুবতারাটির মত তিনি তাঁর প্রেমে অপরিবর্তিত থাকবেন, অবিচলিত থাকবেন—এই ঘোষণা তিনি করে যান। একি তাঁর প্রত্যয় না প্রার্থনা! তিনি নিজে কি করতে চান তা' রয়েছে এই কবিতায়, কিন্তু কি পেতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি কি নিশ্চিন্ত। তিনি যেন ধরেই নিয়েছেন তিনি যদি প্রেমে অবিচল থাকেন তবে তিনি তার পরিবর্তী ফল পাবেন। তিনি সেই আশায় নির্ভর করুন; তার সম্ভাব্যতা নিয়ে তর্ক করে মৃত্যুপথযাত্রীকে আর আমরা কষ্ট দোব না।

"হায় নব যুগে নওল কিশোর,
কেঁদে ফিরে গেল সারা নিশি ভোর,
মুছে গেল কালবৈশাখী মেঘে,
শিশু সূর্যের রক্ত।
এ-ও সত্য, হায় সত্য! —[বিমলচন্দ্র ঘোষ]

কবিতাটিকে অনেকে কীটসের "Swan Song" বা শেষ সঙ্গীত বলেছেন।

এই কবিতায় এক উদাত্ত সুরে কবি তাঁর জীবনের শেষ আশাকে যেন ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন করলেন, —পার্থিব প্রেম অপার্থিব স্বর্গীয় প্রেমে বিলীন হয়ে যায়। কবিও যেন এক মহাপ্রেমের আশ্বাস পেয়ে চলে যেতে যান মরজগতের প্রেমের পাথেয় সঙ্গে নিয়ে।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (Elizabeth Barrett Browning) ১৮০৬-৬১

কবি রবার্ট বাউনিং-এর স্ত্রী এলিজাবেথ নিজ গুণেই কবি খ্যাতি পেয়েছিলেন, রবার্ট ব্রাউনিং-এর স্ত্রী হিসাবে নয়। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থকে আজও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একটি "পর্তুগালের কাব্য" (Sonnets from the Portuguese-১৮৪৭) এবং অপরটি অরোরা লে (Aurora Leigh-১৮৫৭)। অরোরা মানে উষাকাল বা মেরুজ্যোতি। ইংল্যাণ্ডের নিসর্গ দৃশ্যের অতি সুন্দর বর্ণনা এবং বহু স্মরণীয় শব্দগুচ্ছের জন্য এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ।

এলিজাবেথের প্রতি মানুষের একটা সমীহ ভাব বরাবর বজায় ছিল। এর অন্যতম কারণ তাঁর পড়াশুনা। তিনি হোমার, প্লেটো, বিভিন্ন গ্রীক কবি ও হিব্রু বাইবেল,—এগুলিব মূলগ্রন্থ অল্প বয়সেই পডেছিলেন। এলিজাবেথ বায়রণ পড়তে ভালবাসতেন, তবে বায়রণের তেজস্বীতা তাঁর কাব্যে ছিল না। এলিজাবেথ পোপেরও (Alexander Pope) অনুরাগী ছিলেন।

'পর্তুগালের কাব্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সনেটগুলি অতুলনীয়। প্রেমভবে নম্র ও মহিমান্বিত নারীহৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগে রঞ্জিত এই সনেটগুলি। এই কবিতাগুলিতে নারীহৃদয়ের আবেগ, নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে ইংরাজী সাহিত্যের খুব কম মহিলা কবির কাব্যেই শুধু তা পাওয়া সম্ভব। এগুলিই তাঁকে ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবির সম্মান দিয়েছে। কবিতাগুলি তাঁর বাস্তবিক এবং ব্যক্তিগত বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবিতাগুলি শুধু কাব্যচর্চা নয়, তাঁর স্বামী রবার্টের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসার শিল্পিক স্বাক্ষর।

'অরোরা লে' কাব্যটি ক্লান্তিকর দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও সুন্দর বর্ণনা, বিজ্ঞ সদুক্তি, পরিচ্ছন্ন শব্দগুচ্ছ এবং জোরাল বক্রোক্তি দ্বারা বিশেষত্বমণ্ডিত। সহজ ও স্পষ্টভাবে ইংল্যাণ্ডের নিসর্গ দৃশ্য এতে বাহুল্যবর্জিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কবিতার দৈর্ঘ সম্বন্ধে শিল্পীর সংযত মাত্রাবোধ এলিজাবেথ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে রাখেন নি। এই ত্রুটিটুকু উপেক্ষা করলে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর কবিতাকে স্নিগ্ধ দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ এবং বিংশশতকে প্রবেশের ভূমিকা

এলিজাবেথ ব্রাউনিং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি। এই শতকের প্রথম তিন দশকে কবিতার যে অনুপ্রেরণা ছিল,—প্রকৃতি, সৌন্দর্য, বিস্ময় ও ব্যক্তিস্বাধীনতা—সেগুলি একদিকে পরিণত ও ক্ষয়িষ্ণু হতে চলেছিল আবার আর একদিকে নতুন কয়েকটি সুস্পষ্ট দর্শন, মানব ইতিহাসের অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে কবির আকর্ষণ, সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় কবির তীক্ষ্ণ, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইংরাজী সাহিত্যের গরিমায় প্রকাণ্ড সন্তোষ কাব্যের নতুন লক্ষ্য স্থির করে দিল। ঊনবিংশ শতকের কবির কাছে দুটি বড় ঘটনা খুবই ইঙ্গিতময় বলে মনে হয়েছিল। ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার—এশিয়ায় পেশোয়ার থেকে সিঙ্গাপুর—আফ্রিকায় কায়রো থেকে কেপটাউন—যখন তাদের প্রভাবের অধীনে আসতে থাকল তখন ইংরাজ কবির চিন্তাতেও ভবিষ্যতের দিব্যদর্শন ও ঐশ্বর্যের অহমিকা দুইই ফুটে উঠতে লাগল। আবার মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের রহস্যময় যুগসন্ধি কিছু কিছু কবিকে তখনও অতীতের ছায়াময় শান্তস্বপ্নে বিভোর করে রাখল। সাহিত্যে এই বিভোরভাবের বর্ণনায় হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়েরই যথাযোগ্য ভূমিকা ছিল।

অপরটি ছিল ফরাসীবিপ্লবের বাণীর দূরবিলম্বিত কিন্তু স্থায়ী অর্থোপলব্ধি। সাধারণভাবে রক্ষণশীল ইংরাজ জাতি নেপোলিয়নের ভিতর এক দানবকে প্রত্যক্ষ করেছিল; কিন্তু সেই আতঙ্ককে অনুভব করেও চিন্তাশীল কবি ও দার্শনিক ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কেউ সরাসরি বিরোধিতা কবেছেন, কেউ পাশ কাটিয়ে গেছেন, কেউ চেষ্টা করেছেন বিপ্লবের দর্শনকে উপলব্ধি করতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নতুন জগৎ সৃষ্টি হতে থাকল। বিকালের রাঙা রৌদ্রের মত কয়েকশো বছরের ধীরপ্রবাহী মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌহার্দ এই আমাদের আধুনিক জীবনের কৃত্রিম, উজ্জ্বল, কর্মব্যস্ত সন্ধ্যায় মিশে যেতে থাকল। অধিকতর জটিল, কিন্তু অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের দিকে মানুষ এগিয়ে চলল।

ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে ধর্মের প্রতিবন্ধকতা ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকল। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা নানা দিকে সৃষ্টি হতে থাকল এবং সেই সঙ্গে মানুষের বিচক্ষণতা ও সাহিত্যের বৈচিত্র্য বহু দিকে দেখা দিতে লাগল। তার সবগুলো কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হল না। দেওয়ালির রাত্রের ফুলঝুরি বা আতসবাজির সঙ্গে এর তুলনা চলে। আর, সেই সঙ্গে মনস্তত্ত্ববিদরা হয়ে উঠতে লাগলেন সাহিত্যের রাজা। গুরুতর সাহিত্য আর সাধারণভাবে আনন্দের আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা ততটা করতে চাইল না, যতটা চাইল কবিতার আকারে মনস্তত্ত্বের প্রচার করতে। কে যে খুশী হল, কার যে উপকার হল কে জানে! আর এই উত্তরাধিকার নিয়ে মানুষ প্রবেশ করল বিংশশতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও শেষ দিকের তফাৎ আশ্চর্য, অসীম। একশো বছর সময় কম নয়; সুতরাং হঠাৎ কিছু যে হয়েছিল তা-ও বলা যাবে না।

আগেই বলেছি ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে অভাবনীয় প্রাচুর্য এবং জীবনযাত্রার

সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মানের সম্পর্কে সচেতনতা সমস্ত বৃটিশ জাতির চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল। প্রাচুর্য বণ্টনের নীতি ন্যায্য ছিল কিনা তা সমাজতাত্ত্বিকের জানবার বিষয়; এখানে তার বিশদ আলোচনার দরকার নেই। তবে সকলের মনে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়ার এক বিশেষ অনুভূতি যে এসে গিয়েছিল তা' বেশ বোঝা যায়।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে বিভিন্ন আদর্শ ও নীতির সংঘাত খুব জোরদার ছিল। আর একটি গুরুতর বিষয় ছিল সমস্ত মানুষকে অভিভূত করার ব্যাপারে। সেটি ছিল ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু চতুর্থ দশকের শেষ দিক থেকে বায়রনের বা শেলীর দর্শন—যাকে একদিক থেকে অবাস্তবও বলা চলে—আর কাজ করেনি। তখন থেকে বৃটিশ নাগরিকদের আদর্শই হয়ে দাঁড়াল,—'যোগ্যতা যদি থাকে তো সারা পৃথিবী লুঠ করে নাও, বৃটিশ রাজশক্তি ও বৃটিশ নৌবহর তোমার পেছনে আছে।' অভিজাতদের ক্ষমতা অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আবার ফরাসী আদর্শে গণতন্ত্রের দরকার আছে বলেও কেউ মনে করল না।

'একগুঁয়েমির মনোভাবকে সংস্কার করো। কোন কিছুকেই বেশী গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। উদারভাবে সব কিছুকেই মেনে নাও। যা কিছু বাস্তবে প্রয়োজন শুধু তাকেই গুরুত্ব দাও।'—এই মতবাদ প্রচার করলেন জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham ১৭৪৮—১৮৩২), এবং দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করলেন তাঁর শিষ্য জেমস মিল (James Mill ১৭৭৩—১৮৩৬)। এঁদের কথা হল,—'যা কাজে লাগে তা-ই ঠিক। যা অধিকাংশ মানুষের জাগতিক উপকারে আসে তা-ই অনুসরণ করা দরকার।' এরই নাম 'উপযোগবাদ' (Utilitarianism)। এই মতবাদ ইংরাজের কাছে বেশ কয়েক দশক ধরে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। শিল্পসাহিত্যেরও উপযোগিতায় এই বুদ্ধি বহুদিন কার্যকরী ছিল। এই উপযোগবাদের দাপটে জাতির মনের মূল প্রাজ্ঞতা কিছুদিন থমকে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু এর দ্বারা কার্যকরী গণতন্ত্র এবং সকলের সমান অধিকারের নীতি ব্যাপকতা পেয়েছিল। বহু দুর্নীতি, যেমন দাস-ব্যবস্থা, মদ্যপান, ইত্যাদির বিরুদ্ধেও পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। কলকারখানায় মানবিক আইন প্রণয়নের তাগাদাও এখান থেকেই এসেছিল। এসব ব্যাপারে 'স্বাধীনভাবে ভগবদ্বাক্য প্রচারকারীদের' (Evangelists) বিশেষ হাত ছিল। আবার এই থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশের 'শালীনতার ভান' (Prudery) এবং তা মানুষের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছিল।

এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার যে মানসিকতার সৃষ্টি হল তা কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের রোম্যান্টিক কবিদের সমাজ-সচেতনতার সঙ্গে মেলে না। আবার এই আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোভাব শুধুমাত্র 'খৃষ্টান' থাকবার আদর্শের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখল। এই শতকের প্রথম দিকের কবিরা যতটা 'মানবিক' ছিলেন ততটা 'খৃষ্টান' ছিলেন না। তখন ছিল অ-খৃষ্টান মানবিক আদর্শ। তবে ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২—৮৮) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উদার মানবিকতার আদর্শে নিষ্ঠাবান ছিলেন।

আমরা এই বিচিত্র রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের শ্রেষ্ঠ কবি টেনিসনের কথা আলোচনা করব।

টেনিসন (Alfred Tennyson) ১৮০৯-৯২

টেনিসনের জন্ম লিঙ্কনসায়ারের সমার্সবিতে (Somersby)। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থে 'পদ্মভোজী' (The Lotos-Eaters), 'শ্যালটের অভিজাত মহিলা' (The Lady of Shalott) এবং 'শিল্পপ্রাসাদ' (The Palace of Art) ইত্যাদি কবিতাগুলি ছিল। ১৮৪২ সালের কাব্যগ্রন্থে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে ছিল 'আর্থারের মহাপ্রয়াণ' (Morted' Arthur), 'ইউলিসেস' (Ulysses)এবং 'লক্সলি প্রাসাদ' (Locksley Hall)। তাঁর দীর্ঘতম এবং শ্রেষ্ঠতম কবিতা 'স্মরণে' (In Memoriam) ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এই ১৮৫০ সালেই তিনি ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠকবি (Poet Laureate) হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি পান। 'মড' (Maud) প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে এবং ১৮৫৯, ৬৯ ও ৮৯ সালে প্রকাশ করেন 'রাজকাহিনী' (Idylls of the King)। এনক আর্ডেন (Enoch Arden) প্রকাশিত হয ১৮৬৪ সালে। এর পর তিনি অনেকগুলি ছোট কবিতা লেখেন। ১৮৯২ সালে মারা যান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে টেনিসন তেমন প্রশংসা পাননি। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে জীবিতকালে তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা হয়েছিল।

টেনিসন ইংরাজী সাহিত্যে ধ্বনি মাধুর্যের শ্রেষ্ঠতম তিনজনের একজন। অপর দুজন শেক্সপীয়র এবং কীটস। কিন্তু টেনিসনের জ্ঞানের প্রশংসা অনেক সুবিবেচক সমালোচকই করেননি। বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের যুগে টেনিসন সম্পর্কে বিরুদ্ধতার বোধ কেটে যায়।

যে যা-ই বলুন না কেন তাঁর ছোট কবিতাগুলির বেশ কয়েকটি আবেগে ও মাধুর্যে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত টলটল করে। সেখানে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিচারের কোন দরকার নেই। আন্তরিকতা ও শব্দ-সংযোজনাই প্রধান। অত্যন্ত ছোট আকারের কবিতা 'ঈগলেও' (The Eagle) টেনিসন যে সংযম ও চিত্রধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই সম্ভব।

টেনিসনের তিনটি কবিতা নিয়ে সামান্য দু'চার কথা এবার বলতে হয়।

পদ্মভোজী (The Lotos Eaters) ১৮৩২

১৮৪২ সালে 'ঐক্যতান সঙ্গীত' (Choric Song) যুক্ত করে এটিকে বড় করা হয়েছিল।

ট্রয়ের যুদ্ধের শেষে বাড়ী ফিরবার পর গ্রীসের অন্তর্গত ইথাকার রাজা গ্রীকবীর ইউলিসেস (Ulysses) সমুদ্রে আর এক অভিযানে বার হন। তিনি একটি দ্বীপে এসে ওঠেন। সেখানকার মানুষ পদ্মজাতীয় কোন এক ফুলের বীজ খেতে ভালবাসে এবং কর্মবিমুখ জীবন যাপন করে। ইউলিসেস তাঁর সঙ্গীদের তিনজনকে পাঠান ওই সব লোকেদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। কিন্তু তারা নিজেরাই ওই সুগন্ধ ফল বা ফুল খেয়ে বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে। ইউলিসেস জোর করে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

হোমার থেকে এই কাহিনী পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু টেনিসন তাকে রূপে রসে সঞ্জীবিত করেছিলেন। উৎস যা-ই হোক, শিল্পসৃষ্টি কবির নিজস্ব।

কবিতাটিকে ঊনবিংশ শতকের উদ্যোগী মানুষদের এবং অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের, পরিশ্রম-উত্তেজনা-উদ্বেগের জীবনের একটি প্রতিক্রিয়া বলা চলে। শান্ত, নিরুদ্বেগ জীবনের যে বিশেষ আকর্ষণ আছে তা এই কবিতাতে ফুটে উঠেছে।

> 'সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত,
> তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
> মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে
> দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ততপ্ত বায়ে
> সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।......
> ....
> এও তো জীবনের এক বৈচিত্র।

এই কবিতার ধ্বন্যাত্মক নন্দ্যতা বিশেষ লক্ষণীয়।

ইউলিসেস (Ulysses) ১৮৪২

মূল কাহিনী হোমারের। টেনিসনের কবিতার প্রত্যক্ষ উৎস দান্তের (Dante) 'পাতাল' (Inferno) কাব্যাংশের ২৬তম সর্গ। এই কবিতায় ইউলিসেস তাঁর বহুদিনের পুরান বিশ্বস্ত সঙ্গীদের উৎসাহ দিচ্ছেন, আবার অভিযানে বেরিয়ে পড়বার জন্য। মানুষের চোখে নতুনের স্বপ্ন, মনে অনন্ত কৌতূহল। ইউলিসেস সেই অপরাজেয় মানুষ যে কোনদিন থামতে শেখেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। দার্শনিক জ্ঞানে, মনের গভীরতায়, জগতের নিত্যনতুন উদ্ঘাটিত রূপের অন্বেষণে ছুটে চলেছে ক্রমাগত সামনের দিকে, —থেমে পড়ার কোন লক্ষণ নেই, পিছোবার কোন উপায় নেই, আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই প্রমত্ত প্রাণের প্রকাশ ইউলিসেসের মধ্য দিয়ে। ইউলিসেস সে যুগের, তথা চিরকালের অন্বেষী মানুষের প্রতীক, প্রতিনিধি।

এই কবিতার কয়েকটি লাইন প্রবাদের মত মানুষের মুখে মুখে ফেরে।—

> 'To follow knowledge, like a sinking star,'
> 'Tis not too late to seek a newer world'
> 'To strive, to seek, to find and not to yield'

স্মরণে (In Memoriam) ১৮৫০

'স্মরণে' ইংরাজী সাহিত্যের দীর্ঘতম বিয়োগবিধুর কবিতা (Elegy)। কবির বন্ধু আর্থার হেনরী হালামের (Arthur Henry Hallam) সঙ্গে তাঁর বোন এমিলির (Emily) বিয়ের কথা ছিল। ১৮৩৩ সালে ভিয়েনাতে হালাম মারা যান। দীর্ঘ সতের বছর ধরে এই

কবিতাটি বা কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। দৈর্ঘ্য তিন হাজার লাইনেরও বেশী। এর আরম্ভে অতি বিষন্ন সুর কানে বাজে। তারপর নানা মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার ভিতর দিয়ে গিয়ে এক বিবাহসঙ্গীতে (Prothalamium) কবিতাটি শেষ হয়। কবির সেই বোনেরই বিবাহ ছিল সমাপ্তির উপলক্ষ্য। এই কবিতাটিকে কবির অসহায়তা থেকে আশা ও সান্ত্বনার পথে যাত্রা বলেও ব্যাখ্যা করা যায়।

এই কবিতায় দুঃখ থেকে শান্তিতে কবির আত্মার অগ্রগতি অনুসরণ করা যায়। সূক্ষ্ম, সুরেলা ধ্বনিকে, প্রকাণ্ড ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের দ্বারা ভারাক্রান্ত এক মানবাত্মার চাপা স্বরের একটানা গতিকে, অভাবিত এবং অপূরণীয় শোকের আঘাতে বিচূর্ণ এক আত্মাকে এই কবিতায় অনুভব করা যায়। প্রথমে দেখা গেল অসাড়তা ও বুদ্ধির জড়তা—'Home They brought her warrior dead'—এর সেই মহিলার মত। তখন শুধু একটাই চিন্তা—'সে চলে গেছে।' ক্রিয়েস্ত বন্দর থেকে জাহাজে করে কফিন যখন আনা হচ্ছে তখন সেই জাহাজের সঙ্গে আর্থার মিলে মিশে এক হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে যখন সেই জাহাজ এসে পৌঁছায় তখন এক রহস্যময় স্বস্তি। তারপর, এত স্পষ্ট, এত ঘনিষ্ঠ মানুষটি যে নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে গেছে তা যখন স্বাভাবিক চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করা হয়, তখন বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে, 'প্রিয় বন্ধু, কোথায় ছিলে এই কদিন।' তারপর কবি নিজের সেই বেদনার প্রতিফলন যেন দেখতে পান মূক, অনড় প্রকৃতিতে। 'কত ঋতু অতিক্রান্ত হয়ে যায়, কিন্তু আমি থাকি সমাধির অপেক্ষায়'। ক্ষতবিক্ষত হৃদয় ও শিথিল স্নায়ুর সাযুজ্য খোঁজেন প্রকৃতির শান্ত নৈরাশ্যে। ঘর্ষণসৃষ্ট ক্ষতের যন্ত্রণার সঙ্গে এক অপচয়ের বোধ যুক্ত হয়। আশা ও সম্ভাবনার সেই উজ্জ্বল উৎস অকারণে নিভে গেছে। কবি বারংবার প্রশ্ন করেন এই কি শেষ! এই কি শেষ! কিন্তু কে দেবে উত্তর। জীবন হয়ে পড়ে অর্থহীন। অদূরাগত বসন্ত, গৃহের ভালবাসা মনের মরুভূমিতে জলসিঞ্চন করতে পারে না। ছাপিয়ে পড়া চোখের জল জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তবু এই শোকই বয়ে নিয়ে আসে অমরতার, পুনঃর্মিলনের আশ্বাস। আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান কবির হৃদয় প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়। অন্ধকারে পথ হাতড়ে এগোয় ঈশ্বরে পরমবিশ্বাসের লক্ষ্যের দিকে। তারপর, ক্রমে ক্রমে, তিক্ত প্রতিক্রিয়া ও অনিশ্চয়তার বন্ধুর পথ অতিক্রম করে প্রেম ও অমরতার আশ্বাসে আবার আস্থাবান হয়ে ওঠেন। যে আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে কবি চূড়ান্ত প্রত্যয়ে পৌঁছে যান তা এই কবিতার মর্মবাণীকে হৃদয়ে সঞ্চয় করে রেখেছে। শিল্পহিসাবে পবিত্র চিত্তশুদ্ধির উপরেও তার স্থান। এই কবিতার শিল্পায়ণের মুখ্য দায়িত্ব নিয়েছে অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস:

An infant crying in the night,
An infant crying for the light
And with no language but a cry.

এর থেকে অনাড়ম্বর শোকপ্রকাশ আর কে কবে কোথায় দেখেছে! বছরে বছরে মৃত্যুর দিনটি ফিরে আসে, আর কবি অন্ধকারে নিঃসঙ্গ বোধ করেন, স্নায়ু হয় বেদনাতুর এবং আকুলভাবে কবি কামনা করেন বন্ধুর অন্তরঙ্গ অস্তিত্ব। 'হে বন্ধু, কথা বলো, না হলে আমি আর বাঁচতে পারি না।'

'স্মরণে' কবিতাটিকে কেউ কেউ আবার সান্ত্বনার মহাকাব্য বলেছেন। এই কবিতা পড়ে বহু মানুষ তাঁদের দুঃখে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা পেয়েছেন। তাঁরা যেন বলেন, এই তো আর একজনের আমাদেরই মত মহাশোকের অভিজ্ঞতা হয়েছিল; আমরাই প্রথম বা ব্যতিক্রম নই। তিনি তো অন্ধকার থেকে আলোয় উঠে এসেছিলেন, মৃত্যু থেকে জীবনের বিশ্বাসে আবার বিশ্বাসী হতে পেরেছিলেন। এ কবিতার সৌন্দর্য নয়, এ কবিতার পরম আশ্বাস মানুষকে ধ্বংসের কিনারা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কোন যুক্তি, দর্শন, উপদেশ যা করতে পারে না, জীবন যে প্রত্যয় খুঁজে দিতে পারে না, 'স্মরণে' কবিতা তা পারে। 'স্মরণে' কবিতা দুঃখী মানুষের সঙ্গী।

ব্রাউনিং (Robert Browning) ১৮১২-১৮৮৯

কাব্যিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এমারসনের (Ralph Waldo Emerson ১৮০৩—৮২) মতবাদের প্রধান কথা ব্যক্তিতাবাদ (Individulism)। ব্রাউনিং-এরও মত তা-ই। এঁদের কাছে ব্যক্তিতাবাদ মানে হচ্ছে আত্মানুশীলন। এঁদের শিক্ষা: 'নিজেকে শক্তিশালী করো। ভুল করো, কিন্তু জোরের সঙ্গে করো। সবল পাপ দুর্বল পুণ্যের থেকে ভাল। ভুল যত শক্তিশালী হবে অভিজ্ঞতা তত তাড়াতাড়ি আমাদের শিখিয়ে দেবে ভুল ঠিক কোথায়।'

এমারসন এবং ব্রাউনিং এক সর্বসমন্বয়ী অদ্বৈতবাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। আমরা যদি নিজেদের উন্নত, শক্তিমান করতে পারি তাহলেই আমরা সেই সর্বসমন্বয়ী মহাশক্তির সাধনা করতে পারব, কারণ আমরাও সেই মহাশক্তির অংশ।

কিন্তু ব্রাউনিং শুধু দার্শনিক ছিলেন না, —তিনি ছিলেন জীবনের ব্যাখ্যাতা। তাঁর শিল্প ছিল মানুষের প্রকৃতির সঠিক প্রতিফলন। তিনি মন্দ চরিত্র নিয়েই বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। এই সব চরিত্রের ভিতর থেকেই তিনি তাঁর কবিতার বিষয় অহরণ করেছেন এবং তাকে নাটকীয়ভাবে ব্যবহার করেছেন, তিনি নিজে সরাসরি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ না করে এই সব চরিত্রকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন, কথা বলিয়েছেন। তাঁর কবিতায় উত্তমপুরুষ একবচনের ব্যবহার। কবিতাগুলি চরিত্রের স্বগতোক্তি। কেবল একজনের ভাষণ।

ব্রাউনিং-এর কবিতায় কাব্যের অলঙ্কার, পরিপাটি বিন্যাস, —এগুলির উপর জোর দেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের অনেক দূরত্ব, অব্যয় হয়ত বিশেষ্য বা সর্বনামের পরেই বসছে। কোন ক্রিয়া হয়ত যে বাক্যের প্রথমে বসা উচিত ছিল চলে যাচ্ছে তার শেষে। এই রকম আরও কিছু আছে। হয়ত এমনও হয় যে ব্রাউনিং -এর কোন কবিতা সাহিত্যিক অধ্যয়নের ব্যাপারে তত ভাল নয়; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক, আবেগপ্রবণ, নাটকীয় বা এমনকি দার্শনিক অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত।

ব্রাউনিং-এর কবিতার দুরূহতার আর একটি বড় কারণ দরকারি শব্দ ব্যবহার না করা। ব্রাউনিং-এর লেখায় অনেক সময় আর্টিকল, অব্যয় বা ক্রিয়া থাকেই না। এত বেশী শব্দ কল্পনা করে নিতে হয় যে মনে হয় তিনি যেন টেলিগ্রাম লিখেছেন' সরলভাবে কোন কিছু ব্রাউনিং-এর লেখায় নেই। ব্রাউনিং-এর চরিত্রগুলি তাদের স্বগতোক্তিতে যা বলে সেগুলিই আসল কথা নয়। আসল কথা আন্দাজ করে নিতে হয়।

র‍্যানেইর্সসের সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে আমরা শুধু তার ভাল দিকটাই দেখেছি, —কিন্তু তার খারাপ দিকও যে আছে তা আমাদের বোঝান হয়নি। আর এই ল্যাটিন সংস্কৃতির খারাপ দিকটা খুব বেশী করে ধরতে পারে টিউটনিক ধারার সঠিক উত্তরাধিকারীরা, কারণ তারা অনাচার সত্ত্বেও শক্তিকে বেশী শ্রদ্ধা করে। ব্রাউনিং-ও ছিলেন এই রকম একজন মানুষ।

তাঁর কবিতায় প্রথম থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদান প্রধান। মনে হয় যেন যে কোন সময়ে শিল্পসুষমা তার তলায় চাপা পড়ে যেতে পারত। বাবা ছিলেন ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কেরানি। রবার্টের ছোটবেলা থেকেই তাঁর বাবার খুব বড় ধারণা ছিল ছেলের প্রতিভা সম্বন্ধে। বার বছর বয়সের সময়েই রবার্টের বাবা ছেলের কয়েকটি কবিতা গোপনে ছাপিয়ে ফেলেন। খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসের ছোট এক বিশেষ শাখার (Dissenters) অনুবর্তী হওয়ায় এই পরিবারের ছেলে রবার্টের উচ্চশিক্ষা লাভে বেশ বাধা পড়েছিল। বাড়ীটি ছিল রুচিপূর্ণ। ব্রাউনিং ছোটবেলা থেকেই অনেক বই হাতের কাছে পেয়েছিলেন। বিদ্যার্জনের সৌরভ সারাজীবন তাঁর চারপাশে বিরাজ করত। আর সেই বিদ্যার্জন ছিল ব্যক্তিগত, স্বাধীন এবং অপ্রত্যাশিত। শোনা যায় তিনি নাকি ডঃ জনসনের 'অভিধান' পুরোপুরি আত্মস্থ করেছিলেন।

অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের উচ্চশিক্ষা পেলেও তিনি তত বড হতেন না, নিজের স্বাধীন শিক্ষার দ্বারা যত বড হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার বা মানসিকতার মৌলিকতাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ। ব্রাউনিং সাহিত্যের দিকে এসেছিলেন যেমন বাড়ীর আগ্রহে তেমনি তাঁর নিজের আগ্রহে, —অগত্যা নয়। কালক্রমে ইটালির ক্লাসিক শিল্প সম্বন্ধে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ব্রাউনিং ছিলেন আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন (Cosmopolitan)। আগেই বলেছি তাঁর কাব্যে পারিপাট্যের লক্ষণ নেই। হয়ত সেটাই তাঁর প্রতিভার বিশেষ পরিচয়।

ব্রাউনিং-এর দুটি কবিতা এবার আলোচনা করা যাক।—-

'আমার প্রাক্তন পত্নী' (My Last Duchess—১৮৪২)

১৮৪২ সালে প্রথম এটিকে 'নাটকীয় গীতিকাব্যের' (Dramatic Lyrics) অন্তর্গত একটি কবিতা হিসাবে দেখা যায়।

ব্রাউনিং-এর পদ্ধতি ছিল ঃ একটি বিশেষ চরিত্রকে একটি সঙ্কট মূহুর্তে ধরে ফেলা, তাকে কথা বলতে দেওয়া এবং শুধু তার বর্তমানের চিন্তা বা অনুভূতি নয়, তার অতীত ইতিহাসও তাকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া। এই ব্যবস্থাকে তিনি নিখুঁত একটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার 'নাটকীয় একক ভাষণের' (Dramatic monologue) মাধ্যমে।

'নাটকীয় একক ভাষণ' (Dramatic Monologue)

'নাটকীয় একক ভাষণ' কি ?

'নাটকীয় একক ভাষণ' (Dramatic Monologue) মানে নাটকীয় ঢঙে একজনের ভাষণ। এতে কোন শ্রোতা বা শ্রোতৃবৃন্দ থাকবে। কাছাকাছি আর একটি কথা আছে,— 'স্বগতোক্তি' (Soliloquy)। তাতে কিন্তু বক্তা নিজের সঙ্গে কথা বলে।

আবাব, 'নাটকীয ঢঙে একক ভাষণ' (Dramatic Monologue) এবং 'নাটকীয় গীতিকবিতা' (Dramatic lyric) একজিনিষ নয। গীতিকবিতার মত 'একক ভাষণও' আত্মবাদী, কিন্তু তা এক বিশেয ধরণের আত্মবাদিতা। যথার্থ আত্মবাদী কবিতায় কবি নিজেই আত্মভাষণ দেন। কিন্তু 'একক ভাসণের' 'আত্ম' কিন্তু কবি নন, —একটি পৃথক চরিত্র। এমনও হতে পারে একটি পৃথক চরিত্রের মাধ্যমে কবিই নিজের কথা বললেন অর্থাৎ প্রতিনিধির দ্বাবা নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করলেন। আবার তা না-ও হতে পারে। সেখানে চরিত্রটির দিক থেকে কবিতাটি 'আত্মবাদী' (Subjective) ; কিন্তু কবির দিক থেকে কবিতাটি 'বিষয়মুখী' (objective)।

'একক ভাষণে' আত্মপ্রকাশন কিন্তু খুব জটিল। এতে চরিত্রের, মনের বিভিন্ন অবস্থার এবং নৈতিক সঙ্কটের প্রকাশ অনুভূতির গভীর স্তর থেকে উঠে আসে। প্রকাশিত বস্তু হয় মনস্তাত্ত্বিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং চিন্তা ও যুক্তিভিত্তিক। 'আমার প্রাক্তন পত্নী' (My Last Duchess) কবিতায কথক (অর্থাৎ Duke) সংক্ষেপে ও সুনিপুণভাবে আত্মচরিত্র চিত্রায়িত করেছে।

'একক ভাষণ' যদি কবিরই আত্মপ্রকাশ হত তাহলে ভিন্ন ভিন্ন চবিত্রের মারফৎ ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় কবি একই কথা বলতেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র যখন যার যার নিজের নিজের কথা বলছে তখন তা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের আত্মপ্রকাশ, —কবির নয়। কবির দিক থেকে সেগুলি তাঁর সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। সেগুলি কবির মনঃবহির্ভূত 'বিষযমুখী উপাদান' (Objective)।

সুতরাং, এক কথায় 'নাটকীয় এককভাষণ' হল কবির দিক থেকে কোন আলাদা বা অধিকতর দূরবর্তী উদ্দেশ্য না নিয়ে কোন একটি বিশেষ চবিত্রের অর্থাৎ বক্তাব দ্বারা তার নিজেরই চরিত্রচিত্রণ। কবির ভূমিকা এখানে দর্শক বা শ্রোতা বা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত এমনও হতে পারে যে কবি ওই চরিত্রটির সাহায্যে আত্ম-চরিত্র প্রকাশ করতে চান। সেক্ষেত্রে ওই চরিত্রটি কবির আত্মপ্রকাশের মাধ্যম, তাঁর মুখপাত্র বা প্রতিনিধি। এই ধরনের কবিতা প্রত্যক্ষতঃ বিষয়মুখী (Objective) হলেও আসলে আত্মবাদী (Subjective)।

যাই হোক কবিতাটির কথায় আবার ফিরে আসি। [My Last Duchess]

ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর ইটালি—র‍্যানেইসঁসের ইটালি। একজন 'গথের' (Goth—জার্মান গোষ্ঠীভুক্ত প্রাচীন এক জাতির অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ) চোখে সেই যুগ, সেই দেশ যেমন দেখাত ব্রাউনিং এই কবিতার বিষয়বস্তুকে তেমন ভাবেই দেখিয়েছেন। ব্রাউনিং ছিলেন একজন গথ, যেমন কীটস ছিলেন গ্রীক।

অনুভূতিহীনতার দ্বারা বিকৃত একজন অহঙ্কারী নরঘাতীর নিখুঁত চিত্র। যে কোন যুগেই এই চরিত্র খুঁজলে পাওয়া যেত, তবে র‍্যানেইসঁসের ইটালীব যুগের তুলনায় কম।

কবিতাটির শিরোনামা প্রথমে দেওয়া হয়েছিল 'ইটালি'। পরে সেটি পালটান হয়।

এখানে যে ব্যক্তি কথা বলছে সে উত্তর ইটালির 'ফেরারা' (Ferrara) নামক স্থানের

ডিউক (অতি সম্ভ্রান্ত বনেদী জমিদার)। র‍্যানেইসঁসের যুগ। র‍্যানেইসঁসের উচ্চমানের সংস্কৃতি তখন (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) সগৌরবে বিরাজ করছে। কিন্তু মানুষের মনের কদর্যতা নানাভাবে বজায় ছিল।

যদি কাহিনীটিকে সত্য বলে ধরা হয় তবে ফেরারার এই ডিউকের নাম ছিল দ্বিতীয় আলফন্সো (Alfonso II]। ১৫৫৮ সালে সে বিয়ে করেছিল লুক্রেজিয়া ডি মেডিসি (Lucrezia de Medici) নামক এক বালিকাকে। ১৫৬১ সালে ১৭ বছর বয়সে সে মারা যায় বা তাকে মেরে ফেলা হয়। হয়ত অন্য এক ধনবতী মহিলাকে বিয়ে করবার জন্য তাকে মেরে ফেলা হয়। ডিউক তাকে সন্দেহ করেছিল। এই সন্দেহের কোন ভিত্তি থাকুক আর না-ই থাকুক, স্ত্রীকে মেরে ফেলার মত কাজ নির্দ্বিধায় যে করতে পারে, এবং পরে কোন আত্মগ্লানিতে না ভুগে সদম্ভে যে তা ঘোষণা করতে পারে, বা নরহত্যা নামক ব্যাপারটিকে তুচ্ছ বলে যে দেখাতে পারে তার মনের সংস্কৃতি নিশ্চয়ই নিচু স্তরের। আবার, ব্রাউনিং এমন ইঙ্গিতও দেননি যে মেয়েটি নির্দোষ ছিল। তারও চরিত্রের হয়ত দোষ ছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতির দিক থেকে (প্রতিনিধি মারফৎ) ব্রাউনিং-এর বক্তব্যের এই মানে করা চলে যে শিল্পসংস্কৃতির চূড়ান্ত উন্নতির যুগেও মানুষের মন (ডিউকের মন বা হয়ত ডিউকপত্নীরও) আদৌ সুসংস্কৃত হয়নি। আর, কবিতাটির উপস্থাপনের কৌশলের দিক থেকে ডিউকের চরিত্রের অন্তর্নিহিত অংশের দাম্ভিক ও বিবেকহীন স্বীকারোক্তি 'নাটকীয একক ভাষণের' অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ এই উপস্থাপনার দিকটাই ব্রাউনিং-এর কাছে মুখ্য বিষয় ছিল।

ডিউক তার প্রাক্তন পত্নীকে হত্যা করেছে। ডিউক বলছে তার প্রাক্তন পত্নী সকলেরই দৃষ্টি আর্কষণ করত। সকলেই তার মুখে সহাস্য অভ্যর্থনা দেখতে পেত। ব্যাপারটি তদানীন্তন র‍্যানেইসঁসের সংস্কৃতি সম্পন্ন ইটালিয়ান সমাজে হয়ত প্রচণ্ড গর্হিত ছিল। এবং তার জন্য পত্নীকে হত্যা করার দ্বারা ডিউক অন্যায় কিছু করেনি, —এইরকম প্রথাগত বোধ যদি সেই সমাজে না থাকত তবে ডিউক ফলাও করে তার বর্ণনা করতে যেত না।

আমার মনে হয় উপস্থাপনের কৌশলটি ব্রাউনিং-এর বিশেষত্ব হলেও, সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্রাউনিং-এর মতামতও এখানে কম উল্লেখযোগ্য নয়। কবিতাটির এই ব্যুৎপত্তির সঙ্গে 'ইটালি' শিরোনামাটির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। এখানে আরও একদিকে বক্রোক্তি সুস্পষ্ট। সে যুগের ইটালিতে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্ব ইত্যাদির গুণগ্রাহী মানুষেরাও নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে ছিল কদর্য। ব্রাউনিং হয়ত এই প্রশ্ন রেখেছিলেন: র‍্যানেইসঁস কি নৈতিক সৌন্দর্য আনতে পেরেছিল?

একত্রে অশ্বারোহনে শেষবার (The Last Ride Together)

ব্রাউনিং-এর আর একটি অতি বিখ্যাত কবিতা। এটি 'পুরুষেরা ও মহিলারা' (Men and Women) নামক কবিতাসঙ্কলনে ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

এই কবিতাটিও একটি 'নাটকীয় একক ভাষণ' (Dramatic Monologue)। এখানে কোন এক প্রেমিক তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা শোনাচ্ছে কোন একজন কল্পিত শ্রোতাকে।

এই কবিতার প্রেমিকের সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে ব্রাউনিং-এর জীবনের কোন ঘটনার হয়ত কোন মিল নেই; কিন্তু ব্রাউনিং এই কল্পিত প্রেমিকের মুখ দিয়ে নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। সেই অর্থে এই কবিতার 'প্রেমিক' প্রেমের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে কবির প্রতিনিধি। এখানে কবি নিজেই যেন এই প্রেমিক। এখানেও বক্তব্য রাখা হয়েছে উত্তমপুরুষ একবচনে। সমগ্র কবিতাটিতেই ব্রাউনিং-এর বিশিষ্ট স্টাইলের সঠিক প্রকাশ ঘটেছে।

এই কবিতাতে ব্রাউনিং-এর জীবনদর্শনের একটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ দিক প্রকাশ পেয়েছে। সচরাচরভাবে সেটিকে 'ব্যর্থতা-সম্পর্কিত দর্শন' বা 'Philosophy of Failure' বলা হয়।

ব্যর্থতাসম্পর্কিত দর্শন (Philosophy of Failure)

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।'

জীবন অনন্ত। আমাদের এই জগতে জন্ম থেকে মৃত্যুতেই তার শেষ নয়। যা কিছু এ জীবনে বাকি থেকে গেল, অপূর্ণ থেকে গেল তা পূর্ণতা পাবে, সার্থকতা পাবে অনন্ত মহাজীবনে।

তাই অপূর্ণতা, অসফলতাই কাম্য। যদি এখানেই সব পাওযা শেষ হযে গেল তবে এব পরে বাকি কি থাকবে। সেই অনন্ত জীবনে মহাপূর্ণতার জন্য কবি এই জীবনের অসফলতাকেই আবাহন করেন। এ জগতে পূর্ণ সার্থকতা চাই না; কিছু হাতে থাক। আমাদের কামনা, সাধনা, আদর্শের দিকে লক্ষ্য স্থিব রেখে এগিযে চলা, —এইটাই বজায থাকুক। এখানেই পূর্ণতা পেযে গেলে মৃত্যুর পরের মহাজীবনের আর সার্থকতা কি।

যারা এ জীবনে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেনি, তারা তা পাবে মৃত্যুর পরে সেই মহাজীবনে যেখানে ঈশ্বর তাদেব সব অভাব, সব আকাঙ্খা মিটিযে দেবেন। তাই ব্যর্থতাই কাম্য। সফলতা দিযে আমাদের সব অভাব এখানেই মিটে যাক, —তা যেন আমরা না চাই।

এরই নাম ব্রাউনিং-এর ব্যর্থতার দর্শন—Philosophy of Failure।

এ জগতে আমরা আমাদের বাঞ্ছিত, কাম্য বস্তুকে পাওযার জন্য চেষ্টা করি। আমাদের অধিকাংশই তা' পাই না। কিন্তু পাব না তা নয়। ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা থাকলে, আন্তারিকতা থাকলে, একাগ্রতা থাকলে আপাত ব্যর্থ এই জীবন সার্থকতার আশীর্বাদ পাবেই, —ব্রাউনিং এই অটল বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

কবিতাটির সারাংশ

নায়িকা প্রেমিককে গ্রহণ করেনি। প্রেমিক প্রত্যাখ্যাত। সে প্রার্থনা করে অন্ততঃ আর একবারের জন্য, শেষ বারের জন্য, তারা দুজনে একত্রে দ্রুত অশ্বারোহণে ঘুরে আসবে। প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তাদের ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলা শুরু হয়। এই শেষ বারের অশ্বারোহনে প্রেমিক এক অমর জগতের আশ্বাসে আত্মসমর্পনের ভঙ্গীতে সান্ত্বনা পায়।

সকলেই চেষ্টা করে; অনেকেই ব্যর্থ হয়। তারা মৃত্যুর পরের অমরতার জগতে পূর্ণতা পায়, সার্থক হয়। এ জগতে সার্থকতার পুরস্কার তো সামান্য। তা না পাওয়ায় কোন দুঃখ নেই। স্বর্গ সেই অপূর্ণতা বহুগুণে পূর্ণ করে দেবে। এর পরে, অশ্বারোহনে যেতে যেতে, প্রেমিক বাস্তব সময়ের হিসাবকে আর স্বীকার করে না। মহুর্তের মধ্যে সে অনন্তের আস্বাদ পায়।

সময় এক সময়ে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সীমায়িত সময় যদি অনন্ত সময়ে প্রসারিত হয়, তবে সে এই যাত্রা শেষে স্বর্গে পৌঁছে যাবে। প্রেমের পূর্ণতার দ্বারা পুরস্কৃত হবে। আপাত অসার্থক জীবন সার্থকতায় ও সাফল্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আর, এখানে ব্রাউনিং-এর শ্রেষ্ঠ লেখাগুলির শুধু নাম উল্লেখ করব।—

'পলিন' (Pauline—১৮৩৩), 'প্যারাসেলসাস' (Paracelsus—১৮৩৫), 'সরডেল্লো' (Sordello—১৮৪০), 'নাটকীয় গীতিকবিতাগুলি' (Dramatic Lyrics—১৮৪২), 'নাটকীয় রোম্যান্স এবং গীতিকবিতাগুলি' (Dramatic Romances and Lyrics—১৮৪৫), 'পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা' (Men and Women—১৮৫৫), 'নাটকীয় ব্যক্তিনিচয' (Dramatic Personae—১৮৬৪), 'অঙ্গুরীয়ক ও গ্রন্থ' (The Ring and the Book—১৮৬৮—৬৯) এবং আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ, সুপরিচিত ও বিখ্যাত কবিতা এবং কিছু নাটক ব্রাউনিং-এর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

ব্রাউনিং-এর শেষ শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অঙ্গুরীয়ক ও গ্রন্থ' (The Ring and the Book ১৮৬৮—৬৯)। এটিতে আছে ১৬৯৮ সালের একটি হত্যাকাণ্ডের কথা। বারটি অংশে বিভক্ত এই কাব্যে নয়জন ব্যক্তি তাদের নিজের নিজের জবানিতে এবং অবশ্যই নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, একই কাহিনী বলে গেছে। ফ্লোরেন্সের বাজারে সংগ্রহ করা, পার্চমেন্ট কাগজের মলাট দেওয়া একটি পুরানো বই থেকে ব্রাউনিং এই কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। শিরোনামার 'গ্রন্থ' বলতে এই বইটিকে বোঝান হয়েছে। স্বর্ণকার যেমন সোনাব আংটি তৈরী করতে গেলে খাঁটি সোনার সঙ্গে প্রথমে খাদ মিশিয়ে নেয় (যদিও পরে সেই খাদ আলাদা করে বার করে নেওয়া হয়), তেমনি কবিও মূল ওই গ্রন্থটির সঙ্গে নিজের কিছু কথা (খাদ) মিশিয়ে নিয়ে নিজের কবিতাটি তৈরী করেছেন। তাই ব্রাউনিং-এর কবিতাটি মূল গ্রন্থটি থেকে যেন একটি আংটির মত তৈরী হয়ে এসেছে। আংটি বা অঙ্গুরীয়ক নাম দিয়ে কবি এই কথাটি বলতে চেয়েছেন। উক্ত মূল গ্রন্থটিতে কাহিনীটির সঙ্গে যুক্ত নানা ওকালতি যুক্তি, উপযুক্ত শপথ নিয়ে সাক্ষ্য ইত্যাদি, মামলাটির চূড়ান্ত রায় এবং কিছু চিঠির পাণ্ডুলিপি ছিল। ব্রাউনিং এই ভাবে সম্পূর্ণ কাহিনীটি পেয়েছিলেন।

কাহিনী :

অভিজাত কিন্তু অধুনা দরিদ্র আভেজ্জোর (Avezzo) কাউন্ট গুইডো ফ্রান্সেসকিনি (Guido Franceschini) সাধারণ ঘরের মেয়ে পম্পিলিয়া কম্পারিনিকে (Pompilia Comparni) বিয়ে করে। কাউন্ট ভেবেছিল পম্পিলিয়ার অনেক টাকা আছে। আর একজন মহিলার নাম পাওয়া যাচ্ছে, —ভায়োল্যাণ্টে কম্পারিনি (Violante Comparini)।

সে প্রথমে পম্পিলিয়াকে তার মেয়ে বলে প্রচার করেছিল। কিন্তু পরে সে জানায় যে কম্পারিনিদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের প্রতারিত করবার জন্য সে এই পম্পিলিয়া নামের মেয়েটিকে নিজের মেয়ে বলে চালাতে চেয়েছিল। সব জানবার পরে গুইডো (কাউন্ট) তার নীচবংশোদ্ভূত স্ত্রী পম্পিলিয়াকে শেষ করে দিতে চাইল। কাউন্ট স্ত্রীকে অসতী বলে প্রচার করল। কাউন্ট বললে যে গিভসেপ্পে ক্যাপনস্যাক্ষি (Givseppe Caponsacchi) নামক এক যাজকের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে। গুইডো এই সব মনগড়া ব্যাপারকে চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়। পম্পিলিয়ার বিচার হয়; সে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষনা করে; কিন্তু তাকে পাপমুক্ত করবার জন্য মঠে পাঠান হয়। আর ক্যাপনস্যাক্ষিকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু পম্পিলিয়া তখন অন্তঃসত্ত্বা; তাই তাকে তার নিজের বাড়ীতে পাঠান হয়। সেখানে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। তারপর একদিন রাত্রে তার স্বামী চারজন দুর্বৃত্তের সাহায্যে তাকে এবং তার অনুমিত মাতাপিতাকে হত্যা করে। গুইডোকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার বিচার হয় এবং ধর্মগুরু পোপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

কবিতাটিতে ভূমিকার পরে আছে এই মামলার ব্যাপারে অর্ধেক রোমের অভিমত, তারপর বাকি অর্ধেক রোমের মতামত এবং তারও পরে তৃতীয় আর একপক্ষের নিরপেক্ষ মতামত। এর পরে আছে গুইডো, ক্যাপনসাক্ষি, এবং উকিলদের কথিত কাহিনী ও মতামত। তারপর আছে পোপের চিন্তাভাবনা, গুইডোর হিংস্র, বেপরোয়া উক্তি। তবে গুইডো শেষকালে মুসড়ে পড়েছিল। কাব্যটির শেষ অংশে আছে প্রাণদণ্ডর সম্পর্কে নানা কথা, মঠের দ্বারা পম্পিলিয়ার সম্পত্তি গ্রাস করার চেষ্টা, পোপের আদেশে সে প্রচেষ্টা বন্ধ হওয়া এবং পোপের ধর্মীয় আদেশ বলে পম্পিলিয়াকে নির্দোষ বলে ঘোষণা।

আগেই বলা হয়েছে, কবিতাটিতে ন'জনের আলাদা আলাদা ভাবে [নাটকীয়] 'একক ভাষণ' আছে। এই 'একক ভাষণগুলির' (Monologue) মধ্যে পোপের একক ভাষণই সর্বোৎকৃষ্ট।

ওয়ালট হুইটম্যান (Walt Whitman) ১৮১৯-৯২

এরপরে আমরা যাঁর কথা বলব তিনি ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman ১৮১৯—৯২)। তিনি আমেরিকান হলেও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট।

হুইটম্যানের কবিতায় গতানুগতিক অলঙ্কার নেই। তিনি সাধারণ মানুষের মুখের কথা দিয়েই সাধারণ মানুষের গৌরব প্রচার করেছেন।

১৮৫৫ সালের 'ঘাসের পাতা' (Leaves of Grass) এবং ১৮৬৬ সালের 'ঢোল শোহরত' (Drum Taps) তাঁর দুটি কাব্যসংঙ্কলন।

এবারে আমরা একটি সাহিত্যিক আন্দোলনের কথায় আসব। এই আন্দোলনটির সঙ্গে র‍্যাফেলের নাম জড়িত। র‍্যাফেল স্যানজিও (Raphael Sanzio ১৪৮৩—১৫২০)। র‍্যাফেলকে বলা হয়েছে 'স্বর্গের চিত্রকর' (Divine Painter)। র‍্যাফেলের সমসাময়িক

গুণগ্রাহী শিল্পী জর্জিয় ভাসারি (Giorgio Vasari) বলেছেন যে,—র‍্যাফেলের ধারণা ছিল যে সঠিক চিত্রাঙ্কনের জন্য বিষয়বস্তুটির উপযুক্ত গঠন ও অবস্থান কল্পনা করে নিতে হবে। বাস্তবে যা দেখা যাচ্ছে তা-ই সেই বস্তুর সঠিক চিত্রাঙ্কনের উপযুক্ত না-ও হতে পারে, অর্থাৎ মূলবস্তুকে প্রয়োজনীয় কল্পনার দ্বারা চিত্রাঙ্কনের উপযুক্ত করে নিতে হবে। শিল্পে অনুকরণের জন্য মূল বস্তুকে কল্পনার দ্বারা অনুকরণীয় রূপে পরিবর্তিত করে নিতে হবে। অর্থাৎ মূল বস্তুতে গুণারোপ না করে শিল্পে তার অনুকরণ করা চলে না। কিন্তু র‍্যাফেলের আগে চিত্রশিল্পের ও ভাস্কর্যের এই আদর্শ ছিল না।

এবার সাহিত্যের কথায় আসা যাক। র‍্যাফেলিয় আদর্শ সাহিত্যে তিনশ বছরেরও বেশী কার্যকরী ছিল। এই আদর্শে কল্পনার ভূমিকা খুব বেশী। সাহিত্য সাধারণভাবে কল্পনাশ্রয়ী হওয়ার জন্য অতীত যুগের অনুপ্রেরণা চায়। এই অতীতের অনুপ্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গীই বহুক্ষেত্রে সাহিত্যে রোম্যান্টিকতা বলে পবিচিত। আর, এই রোম্যান্টিক সাহিত্য লেখা হত ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত ভাষা সমূহে অর্থাৎ রোম্যানস (Romans) ভাষাসমূহে। এই সাহিত্যে কল্পনার প্রাধান্য বেশী থাকত। র‍্যাফেলের সময় থেকে সাহিত্যে এই ধারার ব্যাপকতা খুব বেশী দেখা গেল। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের অনুসন্ধানকারীবা জানালেন যে র‍্যাফেলেব সময়ের আগে একটি শিল্পীগোষ্ঠী ছিল যাব অনুবর্তীরা ছিল খুব বাস্তবমুখী। মধ্যযুগেব ধর্মীয় ভাব-ভাবনা দুর্বল হতে শুরু করাব অল্প কিছু আগে এই শিল্পীগোষ্ঠীর আবির্ভাব হযেছিল। এই গোষ্ঠী কিন্তু চিন্তার দিক থেকে গ্রীক বা পৌত্তলিক ছিল না। এই গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীরা সত্যের ভিতরেই সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা সৌন্দর্যের আগেই সত্যের এবং বহিঃপ্রভাবমুক্ত হৃদযানুভূতিব খোঁজ করতেন। বাস্তবতাকেই তাঁরা তাঁদের নৈতিকতা বলে গ্রহণ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবিষ্কার করা গিযেছিল যে র‍্যাফেলিয় মতবাদের চিত্রশিল্পীদেব থেকে ওই সব শিল্পী সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ওই আবিষ্কারেব দ্বারা প্রভাবিত শিল্প-আন্দোলন সাহিত্যেও প্রসারিত হয়েছিল। এরই নাম প্রাকর‍্যাফেলিয শিল্প সাহিত্যের আন্দোলন (Pre-Raphaelite Movement)। এই আন্দোলনের শিল্পীদের কেউ কেউ ছবিকে কলম দিয়ে এবং লেখাকে তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন।

উপরোক্ত আন্দোলনের সঙ্গে তিনজন কবির নাম বিশেষভাবে জড়িত। এঁরা হলেন—

দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি (Dante Gabriel Rossetti) ১৮২৮-৮২
উইলিয়ম মরিস (William Morris) ১৮৩৪-৯৬
এবং
এ্যালজেরনন চার্লস সুইনবার্ণ (Algernon Charles Swinburne) ১৮৩৭-১৯০৯

'প্রকার‍্যাফেলিয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ১৮৪৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এতে প্রথমে চারজন সদস্য ছিলেন। চিত্রকর উইলিযাম হলম্যান হাণ্ট (William Holman Hunt), জন এভারেট মিলাই (John Everett Millais), দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি (Dante Gabriel Rossitti) এবং একজন ভাস্কর টমাস উলনার (Thomas

Woolner)। এর পরে আরও অনেকে এই ভ্রাতৃসঙ্ঘে এবং এই আন্দোলনে যোগ দেন। এঁরা সাহিত্যকে নয়, অন্যান্য নানা শিল্পকে ঘিরেই একত্রে জড়ো হয়েছিলেন। বৃটিশ শিল্পের তখন খুব দুর্দশা। এঁদের আন্দোলন ছিল সেই দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এঁরা তারপর অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝলেন যে সাহিত্যের মাধ্যমেও এই প্রতিবাদ প্রকাশ করা দরকার। রসেটির 'আশীর্বাদপূত বালিকা' (Blessed Damozel) কবিতাতে এই চিন্তাধারারই সাহিত্যিক প্রকাশ প্রথমে ঘটল।

একই চিন্তাধারায় অভিষিক্ত হয়ে ১৮৫৮ সালে মরিস 'গিনিভিয়েরের স্বপক্ষে (Defence of Guenevere) এবং ১৮৬৬ সালে সুইনবার্ণ 'কবিতা ও গাথাসমূহ' (Poems and Ballads) প্রকাশ করলেন। পুরোপুরি 'প্রাক-র‍্যাফেলিয়' না হলেও মরিস ও সুইনবার্ণ এইভাবে রসেটির দেওয়া সঙ্কেত প্রচার করেছিলেন।

রসেটির কাব্য অতিরিক্ত রকমের ইন্দ্রিয়গত বোধের দ্বারা সৃষ্ট হলেও রাস্কিন (John Ruskin ১৮১৯—১৯০০) বলেছিলেন যে আধুনিক রোম্যাণ্টিক চিন্তাধারার (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের) প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি রসেটিই এনে দিয়েছিলেন।

দান্তের বোন ক্রিশ্চিয়ানা জর্জিয়ানা রসেটি (Christiana Georgiana Rossetti ১৮৩০—৯৪) ছিলেন বীভৎসতা ও অঘোরপন্থা থেকে মুক্ত তপস্বিনী কবি।

ইংল্যাণ্ডের নিসর্গ দৃশ্যের বর্ণনায় মরিস কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। মধযুগের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। আইসল্যাণ্ড ও নরওয়ের প্রাচীন রূপককাহিনীর ভিত্তিতে লেখা তাঁর কাহিনীমূলক কাব্য 'পৌরাণিক জার্মান বীর সিগার্ডের কাহিনী এবং নিবালুংদের পতন' (The story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Nibelungs—১৮৭৭) সুলিখিত।

সুইনবার্ণ ছিলেন কাব্য, সমালোচনা, নাটক—সব বিষয়েই সিদ্ধহস্ত। 'ক্যালিডনে আটালাণ্টা' (Atalanta in Calydon—১৮৬৫), 'কবিতাসমূহ ও গাথাসমূহ' (Poems and Ballads—১৮৬৬) এবং 'উষাসঙ্গীত' (Songs before Sunrise—১৮৭১) তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি প্রচুর বিষয়ে প্রচুর লিখেছিলেন।

'ক্যালিডনে আটালাণ্টা' একটি প্রাচীন গ্রীক ট্যাজেডির ইংরাজী ভাষ্য। 'কোরাস'—সমন্বিত এই নাটকের সংযম এবং মাত্রাবোধ কোন অংশেই মূল গ্রীক নাটকের থেকে নিম্ন মানের নয়।

ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold) ১৮২২-৮৮

হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer ১৮২০—১৯০৩), দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, তাঁর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলি লিখতে থাকেন ১৮৫১ সাল থেকে। এর ভিতরে রয়েছে 'জীবনবিজ্ঞানের নীতিগুলি' (১৮৬৪—৬৭) এবং 'সামাজবিজ্ঞানের নীতিগুলি' (১৮৭৬—৯৬)। এরপর চার্লস ডারউইন (Charles Darwin ১৮০৯—৮২) ১৮৫৯ সালে তাঁর যুগান্তরকারী গ্রন্থ 'প্রজাতির উৎপত্তি' (Origin of Species) এবং ১৮৭১

সালে 'বংশপরম্পরায় মানুষের উদ্ভব' (The Descent of Man) প্রকাশ করলেন। এতাবৎকালের মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসের মূলে সবল ঘা পড়ল। আবার ওই একই সময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, ধর্মীয় এবং মানবিক বুদ্ধি ও আচরণের বিশুদ্ধতা যাচাই করার ও নতুন পথের অন্বেষণ করার জন্য একটি আন্দোলন ভাবুক ও দার্শনিকদের মধ্যে সাড়া জাগাল। এর নাম 'অক্সফোর্ড আন্দোলন' (Oxford Movement)। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন জন হেনরী নিউম্যান (John Henry Newman ১৮০১—৯০)। নিউম্যান অবশ্য শেষ পর্যন্ত রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের ভিতরে তাঁর বিশ্বাসের আশ্রয় খুঁজে নিতে চাইলেন। এই নতুন চমকপ্রদ ধারণাগুলির সংঘাত—ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সঙ্গতির অভাব—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে খুবই ব্যতিব্যস্ত করেছিল। এর ফলে দুটি সক্রিয় চিন্তাধারার উদ্ভব হল। একটি চিন্তা গেল পুরানো সব কিছুর বিরুদ্ধে। আবার, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, আর একটি চিন্তা গেল এতাবৎকালের চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বপক্ষে।

খুব তাড়াতাড়ি তিন ধরনের মনোভাব আত্মপ্রকাশ করল। শক্তিশালী মনের কিছু লোক, যেমন ক্লিফোর্ড (Clifford) নতুন দর্শনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকলেন; তুলনায় কম মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষেরা ভীত হয়ে ধর্মের আশ্রয় খুঁজলেন। কিন্তু তৃতীয় আর একদল মানুষ, বিশেষ করে ছাত্ররা, ধর্মে গভীর আস্থা থাকা সত্ত্বেও নতুন বিজ্ঞানকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখলেন এবং তাকে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁরা দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে পুরোনো বোধ ও বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করলেন। বুদ্ধির দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সন্দেহবাদী, আবেগ ও উত্তরাধিকারের বোধের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ।

স্বাভাবিক চরিত্র এবং নতুন বিশ্বাসের সংঘাতে তাঁরা জর্জরিত হলেন। এঁদেরই ভিতরে ছিলেন আর্থার হিউ ক্লাউ (Arthur Hugh Clough)এবং ম্যাথু আর্ণল্ড (Matthew Arnold)। ম্যাথু আর্ণল্ড সারা জীবন সংগ্রাম করে গেলেন নিজের সঙ্গে নিজে,—একদিকে যুক্তি ও দায়িত্ব, অপরদিকে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ভালবাসা।

ম্যাথু আর্ণল্ডের বাবা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত 'পাবলিক' স্কুল রাগবির (Rugby) ততোধিক বিখ্যাত প্রধান শিক্ষক টমাস আর্ণল্ড (Thomas Arnold)।

ম্যাথু আর্ণল্ড কৃতি ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে 'বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের' কাজ করে অবসর নিয়েছিলেন। সমালোচনা-সাহিত্য এবং কাব্যরচনা—উভয় বিষয়েই তাঁকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ১৮৪৯, ১৮৫২, ১৮৫৩ এবং ১৮৬৭ সালে তিনি চারটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ এবং ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর সমালোচনাগ্রন্থ (Essays in Criticism) ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম দিগদর্শন। বৃটিশ তথা মানবিক সংস্কৃতির অতি বিশিষ্ট উদ্গাতা বলে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়। তাঁর উদার সাংস্কৃতিক বোধের শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁর দুটি গদ্যগ্রন্থে। এ দুটি হচ্ছে, 'সংস্কৃতি ও নৈরাজ্য' (Culture and Anarchy—১৮৬৯) এবং 'সাহিত্য ও অন্ধ মতামত' (Literature and Dogma —১৮৭৩)

আমি এখানে আর্ণল্ডের দুটি কবিতা সম্বন্ধে সামান্য দু'এক কথা বলার চেষ্টা করবো।

ডোভারের বেলাভূমি (Dover Beach)

ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে ফ্রান্সের মুখোমুখী ডোভারে সমুদ্রের উপকূলে প্রকৃতির রূপ এই কবিতার বহিরাবরণ। কিন্তু অন্তঃশীল মূল অভিজ্ঞতা তাঁর বেদনাহত শান্ত মনের এক আশ্চর্য অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

আর্ণল্ড চার্চ অব ইংল্যাণ্ডকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের চরম নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের নীতি তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে মিলত। প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় কারোর থেকে কম ছিল না। 'ডোভারের বেলাভূমি' কবিতায় যখন অনন্তকাল ধরে ঢেউ এগিয়ে আসে, পিছিয়ে যায়, অনাবৃত বেলাভূমির উপর শুভ্র চন্দ্রকিরণ মায়াজাল বিস্তার করে তখন যেন তাঁর অন্তরের গভীর বিশ্বাস মেদুর বিষণ্নতায় অভিভূত হয়ে যায়। আবার, তিনি তাঁর মহান পূর্বসূরী ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত নিস্প্রাণ সমুদ্রের পরিপূর্ণ স্থির মূর্তিতে প্রাণের প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করেন। কিন্তু এখন তা অতীত। খৃষ্টধর্মকে অতিক্রম করে দূরবিস্তৃত অতীতের চিরায়মান বিশ্বাসের পায়ে প্রাণের আকুতি উজাড় করে দেন কবি। সব বিশ্বাস, সব রীতিনীতি, বুদ্ধি, তর্ক, —সব কিছুর পরেও থেকে যায় অনন্ত ভালবাসা এবং অক্ষয় সত্যের চেতনা লাভের জন্য অন্ধকার ও অজ্ঞতার আকুল আবেদন। অনেক আশা নিয়ে কবি নিজের মনকে ব্যাপ্ত করে দেন আত্মোপলব্ধির ক্ষমতাশূণ্য এই জগতের সর্বত্র।

'Ah love, let us be true
To one anoyther !..........'

আর একটি কবিতা :

জ্ঞানান্বেষী চিরপথিক (The Scholar Gypsy)

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম একটা গল্প প্রচলিত ছিল যে বহুবছর আগে একজন জ্ঞানান্বেষী ছাত্রকে দারিদ্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। সে একটি বেদের দলে যোগ দেয়। প্রাক্তন সহাধ্যায়ী দুজন ছাত্র পরে তাকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। সে তাদের বলে যে যে বেদেদের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়েছিল তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাওয়া জ্ঞান ছিল না বটে কিন্তু তারা অন্য যে জ্ঞানের অধিকারী ছিল তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় না। এক মনে সে তাদের কাছে শিক্ষা নিচ্ছে। তাদের কাছে তার শিক্ষা তখনো সম্পূর্ণ হয়নি; যে দিন হবে সেদিন সে আবার সংসারে ফিরে এসে ওই জ্ঞান সকলকে বিতরণ করবে।

অক্সফোর্ডের চারিধারের নানা অঞ্চলের মানুষেরা কখন কখন নাকি সেই যাযাবরের দেখা পায়। সে চলে গেছে লক্ষ্যহীন, স্থৈর্যহীন, স্বল্পজ্ঞান এই জগৎ ছেড়ে নিষ্ঠাবান হৃদয়ে জ্ঞানের অন্বেষণে। ম্যাথু আর্ণল্ড এই কাহিনীকে আধুনিক জগতের অজ্ঞানতার চরিত্রের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করলেন।

যে জগতকে পিছনে ফেলে সেই জ্ঞানান্বেষী এগিয়ে গেছে সেই জগৎ যেন ঊনবিংশ

শতাব্দীর অজ্ঞান অথচ অহঙ্কারী মানুষের জগৎ। আধুনিক বিজ্ঞানের অসারতা ও অস্থিরতা স্থির প্রজ্ঞাময় জীবনের অভাব মিটাতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ—আধুনিক মানুষ—কি যে চায় তা সে নিজেই জানে না। এ জগতে স্বস্তি কোথায়, তৃপ্তি কোথায়। হয়ত সব বুঝেও আমরা যা পারি না, ওই দরিদ্র জ্ঞানান্বেষী তা পেরেছিল। সে একনিষ্ঠ; তার লক্ষ্যে সে আস্থাবান। কবি যেন তাকে বলেন,—'এখানে এসো না, এখানে ফিরো না। যদি ফেরো তবে তুমি হবে ব্রাত্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট।

সাহিত্যিক বিচার

কবিতাটিতে তাঁব সমকালীন মানুষের সম্পর্কে কবির ধারণা ও সমালোচনা ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটিকে রাখালিয়া বিয়োগবিধুর কাব্যের রূপে গঠন করা হয়েছে। বক্তব্য অতি স্পষ্ট। আধুনিক মানুষ নব-আবির্ভূত বিজ্ঞানের রূপে বিভ্রান্ত। সত্যান্বেষণের স্পৃহাও তার নেই। এতাবৎকালের বিশুদ্ধজ্ঞানের আকর্ষণ আর মানুষের কাছে নেই। মানুষ তুচ্ছ জৈব সুবিধা-অসুবিধার মোহে জ্ঞানের গভীর তত্ত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। মানুষের এই আধোগতি কবিকে ব্যথিত করে। কবি আশা করেন অক্সফোর্ডের সেই জ্ঞানান্বেষী ছাত্রের মত আমরাও যেন শুদ্ধ জ্ঞানতপস্বী হতে পারি। কবির প্রশ্ন, অমৃতের পুত্র এই তুচ্ছতায় মগ্ন থাকে কেন?

কবির বেদনা, কবির প্রশ্ন, কবির আশা মহান। কিন্তু তিনি সরল সামান্য কাহিনীর আবরণে পাঠককে সেই তত্ত্বচিন্তা উপহার দিতে চান; অথচ তাঁর বাণী যেন সকলের হৃদয়ে পৌঁছে যায়, এটাও তাঁর উদ্দেশ্য।

তিনি কাহিনীর ঘটনাগত তথ্যকে বিশ্বাসযোগ্য করবাব সহজ অনায়াসভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। কবির প্রকৃতিগত ক্লাসিক গুণ কিন্তু এই কবিতায় এতটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি।

অনেকের মতে এটিই ম্যাথু আর্ণল্ডের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

হপকিনস (Gerard Manley Hoopkines) ১৮৪৪-৮৯

[হপকিনসের কথা প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৮) পরের যুগে আলোচনা করলে তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের সময়ের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকত। এখানে কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি লেখার সময়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।]

কবি হিসাবে হপকিনসের পরিচিতির ব্যাপাবটা খুব অদ্ভুত। হপকিনস মারা যান ১৮৮৯ সালে। আর তাঁর বই প্রথম প্রকাশ পায় ১৯১৮ সালে। বন্ধু রবার্ট ব্রিজেশকে লেখা তাঁর চিঠিগুলির সঙ্গে কিছু কিছু কবিতা ছিল। ১৯১৮ সালে ব্রিজেশ ভেবেছিলেন যে এই মৌলিক কাব্যানুশীলন প্রকাশিত হওয়া দরকার। তাই সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিজেশ এইগুলি প্রকাশ করার কথা না ভাবলে হয়ত এগুলি বরাবরের মত লুপ্ত হয়ে যেত। ফলে ইংরাজী কাব্য ততটাই বঞ্চিত হত, যতটা ওই কবিতাগুলির গুরুত্ব বলে পরে বোঝা গিয়েছিল। ওই কবিতাগুলি ইংরাজ কবিদের সামনে যে জানালা খুলে দিয়েছিল তার ভিতর দিয়ে তাঁরা একশ বছর বাদেও অনেক কিছু এবং অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কবিদের

উপর একমাত্র ডন (Donne) এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) ছাড়া আর কারোর প্রভাব এত বেশী করে পড়েনি। প্রথম দিকে কেউ কেউ তাঁর কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে না বলে মনে করেছিলেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে কবি হিসাবে না দেখে সাধু-সন্ত হিসাবে দেখেছিলেন। দুটির কোনটিই ঠিক নয়।

গঠনকৌশলগত দিক এবং ভাবগত দিক, দুদিকেই কবিতাগুলির বিশেষত্ব ছিল। ছন্দ এবং অলঙ্কার সম্পূর্ণ স্বাধীন ধরনে প্রয়োজনের উপযোগী ছিল। হপকিনসের তৈরী করা যুগ্মশব্দগুলিতে যেমন অনুপ্রাসের ঘটা ছিল, তেমনি সেগুলি চেনা জিনিষকে যেন নতুন করে চেনাত। কলাকৌশলের ভিতরে কিন্তু হপকিনসের প্রতিভা গণ্ডীবদ্ধ ছিল না। বড় বিশেষত্ব বোধ হয় এইটাই দেখান যে মানুষের আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রবণতাকে কাব্যের ভাষা ও বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থানান্তরিত করা যায়। কাব্য কোন কলাকৌশলের প্রদর্শন নয়, তা কোন ভাষায় কোন ভাবে ব্যক্ত একটি মানুষের সুস্পষ্ট নিজস্ব রূপ।

প্রাচীন ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এসেছিল পুসে (Pussey) এবং নিউম্যানের (Newman) প্রভাবে। ধর্মানুগত্যে তাঁর পরিবর্তন এসেছিল যুক্তির রাস্তা ধরে নয়; এক বিশিষ্ট আন্তরিক অনুভূতিব দ্বারা চালিত হয়ে। পুরাতন ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস এবং কাব্যের অনুপ্রেরণা হপকিন্সের কাছে একই উৎস থেকে এসেছিল। যেমন ধর্মে তেমনি কাব্যে দৃঢ় এক বিশ্বাস তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

কর্ভেণ্ট্রি প্যাটমোর (Coventry Patmore) তাঁকে 'সাধুপুরুষ' (Saintly man) বলেছেন। কাব্য তাঁর কাছে ছিল ধর্মের মতই পবিত্র। কিন্তু ধর্মীয় আচার-আচরণে শুধু নয়; যেখানে যা কিছু সৎ ও মঙ্গলময় সেখানেই তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কবিতা যেন ঈশ্বরে নিবেদিত। নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রাণ এই মানুষটি নানা মতামতের পবিত্রতা স্বীকার করতেন। তাঁর কবিতা ধর্মবিশ্বাসের কবিতা; কিন্তু বিশেষ কোন ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্য নয়। ওই কবিতাগুলি পড়তে গেলে কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের দরকার নেই, অথচ সেগুলি এসেছিল হপকিনসের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস থেকেই।

হপকিনস নিজের প্রথমদিকের অনেক কবিতা নষ্ট করে ফেলেছিলেন। ১৮৭৫ সালে লিখিত 'ডয়িকল্যাণ্ডের বিনাশ' (The Wreck of the Deutschland) এবং তারপরে 'ফেলিক্স র‍্যানড্যাল' (Felix Randal) একাধারে তাঁর আধ্যাত্মিক এবং মানবিকবোধের পরম সুন্দর বিকাশ। এছাড়া, তাঁর সনেটগুলি বিষাদের খনি থেকে তোলা মহার্ঘ রত্ন।

চিত্রবিচিত্র সৌন্দর্য (Pied Beauty)

তাঁর একটি অতি পরিচিত কবিতা।

কত রঙের কত কিছুতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায়। ডোরাকাটা গরুর মত দোরঙ্গা আকাশে, রুইমাছের গায়ে তিলের মত গোলাপী ফুটকিগুলিতে, বাদাম-কাঠের লালচে রঙ্গে, সীলমাছের পাখনায়, ভাগভাগ করা পতিত জমি বা কর্ষণযোগ্য জমির ভাঁজে ভাঁজে, এবং নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত পোষাকে তাঁরই মহিমা প্রকাশ পায়।

আসল-নকল, বাতিল-নতুন, স্থায়ী-অস্থায়ী নানা চিহ্নযুক্ত, দ্রুতগতিশীল বা ধীরগতি, মিষ্ট বা অম্ল, ঝলমলে বা আবছা, অপরিবর্তনীয় নানা সৌন্দর্য তিনি সৃষ্টি করেন।

হে স্রষ্টা, তোমাকে প্রণাম।

রবার্ট ব্রিজেশ (Robert Bridges) ১৮৪৪-১৯৩০

ব্রিজেশের কাব্যগ্রন্থ 'হ্রস্বতর কবিতাগুলি' (Shorter Poems) তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। ঊনসত্তর বছর বয়সে মহাযুদ্ধের আগের বছরে যখন তিনি রাজসম্মান পান তখনও উল্লেখযোগ্য কিছু লিখতে পারেননি। কিন্তু ১৯২০ সালে 'অক্টোবর এবং অন্যান্য কবিতাগুলি' তে (October and other poems) এবং ১৯২৫ সালে 'নতুন পদ্যে' (New Verse) তাঁর গীতিকবিতাগুলি সুপাঠ্য হয়েছিল। ১৯২৯ সালে তাঁর সুদীর্ঘ দার্শনিক কবিতা 'সৌন্দর্যের সাক্ষ্য' (Testament of Beauty) প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির দ্বারা তাঁর কবি ক্ষমতা স্থায়ীভাবে স্বীকৃত হয়।

কিপলিং (Rudyard Kipling) ১৮৬৫-১৯৩৬

কিপলিং ভারতবর্ষে, মুম্বাইতে জন্মেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীর স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর কবিতায় খুব স্পষ্ট ছিল। কিপলিং সমসাময়িক কালে সারা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত বৃটিশ নাগরিকদের একটা ঘনিষ্ঠ নৈকট্যের বোধে একজোট করতে পেরেছিলেন।

কিপলিং ছিলেন জনপ্রিয়, বহুমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির প্রায় সবই নব্বই-এর দশকে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ 'সৈন্যনিবাসের গাথাগুলি' (Barrack-room Ballads—১৮৯২)। ইংরাজী কাব্যে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল যে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে যখন ইংরাজী কবিতা উপযুক্ত প্রেরণা ও প্রতিভার অভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল তখন তিনি তাতে গতি, শক্তি ও সক্রিয়তার সঞ্চার করেছিলেন। তিনি ভারতীয় ইতিহাস এবং ভারতীয় নানা বিষয়ের উপর কবিতা লিখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজমানসের বলিষ্ঠতা তাঁর কবিতায় ফুটে উঠত। স্বদেশে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

ইয়েটস (William Butler Yeats) ১৮৬৫-১৯৩৯

এই প্রচণ্ড যোগ্যতাসম্পন্ন আইরিশ কবি ও নাট্যকারের প্রতিভা বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার আগেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। ইনি এঁর সাহিত্যকর্মকে সংস্কৃতি, সমাজ ও মানুষের আশা ও সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এমন এক শক্তি হিসাবে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ইনি কাজ করে গেছেন যে আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় এঁর সমান মর্যাদা দেওয়ার মত কবি অতি অল্প কয়েকজনের বেশী পাওয়া যাবে না।

বাঙ্গালীর কাছে এঁর একটা বিশেষ পরিচয় এই যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীকে ইনিই ইউরোপীয় সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত করান। ইনি ইংরাজী গীতাঞ্জলীর যে ভূমিকা লিখেছিলেন তার দ্বারা আমরাও ইউরোপীয় দৃষ্টিকোন থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই।

ইয়েটস প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদের প্রকোপে

ওই শতাব্দীর শেষ দিকে গতানুগতিক রোম্যান্টিকতার আর নতুন কিছু দেবার ছিল না। যা ফুরিয়ে-যাওয়া শক্তি তাকে জোর করে ধরে রাখবার কোন অর্থ তিনি খুঁজে পাননি; এবং যে জিনিষটি তিনি তীক্ষ্ণ মননশীলতা দিয়ে বুঝেছিলেন তা হল এই যে প্রখর বস্তুবাদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে গেলে নতুন কিছু চাই। আর এই নতুন কিছু হল প্রায় বিস্মৃত আধ্যাত্মিকতা। তবে এই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রচলিত ধর্মের তত যোগাযোগ [illegible], যতটা থাকবে দেশ, সমাজ এবং মানুষের এক আধ্যাত্মিক রূপকল্পনার। এর দ্বারা মানুষের মনে অদ্ভুত এবং গভীর এক তীক্ষ্ণবোধ আসবে—যা ইয়েটস আনতে চেষ্টা করেছিলেন—যা মানুষের চেতনাকে আধুনিক মননশীলতার আওতায় এনে ফেলবে।

বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি ইয়েটসের চেতনাকে সূক্ষ্ম, কার্যকরী ও যুগোপযোগী করে তুলেছিল। এদের মধ্যে আইরিশ জাতীয় আন্দোলন ও প্রথম মহাযুদ্ধ প্রধান। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ইয়েটস অনুভব করতে চাইলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে যেখানে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা এবং বাস্তব জগতের নানা রূপান্তর একসঙ্গে গলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। ইয়েটস হতাশাবাদী ছিলেন না। তার সুপরিণত দিব্যদৃষ্টি তাঁর জীবনকে কর্মময় করে রেখেছিল। তিনি তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এক নতুন চেতনা, জীবনের নতুন অর্থ এবং সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয় [illegible] মানুষের জীবনে স্পষ্ট ও অর্থবহ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

ইয়েটস অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। কিন্তু শুধু বুদ্ধি দিয়ে মানুষের আরাধ্য চেতনাকে স্পর্শ করা যায় না। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার অনুশীলনের একটা পর্যায়ে অভাবিত স্বজ্ঞা (Intuition) ইয়েটসের মনকে পথ দেখিয়েছিল। প্রাচীন আইরিশ সংস্কারাচ্ছন্ন অদ্ভুত ধরনের দেশাত্মবোধের ভিতরই তিনি ভবিষ্যৎ ভাবনার অঙ্কুর খুঁজে পেয়েছিলেন। বাইরের জগতের লঘু মানসিকতা এবং বস্তুবাদী প্রচণ্ড কর্মযজ্ঞ [illegible] কোন [illegible]বিশেষ বিশিষ্ট জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে পারে না। ঠিক-বেঠিক যা-ই হোক, [illegible] চেতনার নব আবিষ্কার, যার দ্বারা আধুনিক জীবনের স্থূলতাকে শোধন করা [illegible], ইয়েটস [illegible] ই করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে কুহেলিকাচ্ছন্ন আইরিশ চেতনা, আধুনিক শিক্ষার সূত্রে সাংস্কৃতিক নব্য আন্দোলন, এবং আধুনিক জটিলতার নিবর্থকতার প্রতিবাদে সরল ও সোজাসুজি প্রতিষেধক, —এই তিনের সমন্বয়ে ইয়েটসের [illegible] চেতনা ইংরাজী [illegible]ভাষী সমাজে বা অন্যত্র কতটা ব্যাপ্ত [illegible]ছিল সেটা তর্কের বিষয়, কিন্তু তিনি তার নিজের জীবনে তাঁর ব্যক্তিতামণ্ডিত ([illegible]dividuality) চেতনার পূর্ণ সার্থকতা দেখে গেছেন। তিনি এবং তাঁরই মত কয়েকজনকে [illegible] করে নতুন যুগে আইরিশ জাগরণের উষাকাল সূচিত হয়েছিল। আবার জীবনের উত্তরকালে এই একই ইয়েটস গণ্ডীবদ্ধ আইরিশ চেতনাকে সুসমৃদ্ধ নাগরিক চেতনায় ও বিশ্বচেতনায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। সমসাময়িক ও উত্তরকালের অনেক বিশিষ্ট সমালোচক তাঁকে ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি এই আখ্যা দিয়েছেন। ইয়েটসের বিখ্যাত জীবনীকার রয় ফস্টার (Roy Foster) এই কবি ও নাট্যকারকে বলেছেন

আয়ার্ল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক সচেতনতার কণ্ঠস্বর। প্রতীকের দিক থেকে ইয়েটসের কবিতা পুরোপুরি 'আইরিশ' এবং এই সব প্রতীকের অর্থভেদ করা আইরিশ ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব নয়।

ইয়েটসের কবিতায় আয়ার্ল্যাণ্ডের মৌল অস্তিত্ব :

ইয়েটস প্রথমতঃ তাঁর দেশের সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা আইরিশ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন আইরিশ সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা তাতে ব্যাহত হবে না ; বরঞ্চ তাঁরা তাঁদের কৃত্রিম ভাবজগৎ থেকে সরে আসতে পারবেন এবং নিজেদের সত্যভাবনাকে ব্যক্ত করতে পারবেন। আইরিশদের কাছে আয়ার্ল্যাণ্ড শুধু তাদের স্বদেশ নয়,—এক অতি পুরাতন বিশ্বাসের জগৎ,—যা অধুনা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে সমাগ্রিকভাবে সাহিত্যজগৎ সমৃদ্ধ হতে পারে। তিনি আরও বুঝিয়েছিলেন, কবি-চেতনা যদি একটা দৃঢ় উত্তরাধিকারের ভিত্তির উপর দাঁড়ায় তবে তা কবির জন্য স্থায়ী স্বীকৃতি এনে দিতে পারে। এবং ওই একই ভাবনাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ একটা আন্তরিক জন্মসূত্রগত সংহতি সৃষ্টি করত পারে।

এবার ইয়েটসের একটি কবিতার আলোচনা করা যাক।

বেদনাপ্লুত আনন্দ বা এক একর ঘাস (An Acre of Grass)

এটি 'শেষকাব্য' (Last Poems) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পাঁচটি গীতকবিতার একটি সেট। প্রথমটি এই কবিতাটি।

এই কবিতার শিরোনামাটিই একটি প্রতীক। বৃদ্ধ বয়সের নিরাসক্ত প্রশান্তি,—এই অর্থে 'এক একর ঘাস' এই প্রতীকটি ব্যবহাব করা হয়েছে। এই প্রশান্তি অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায় ; কিন্তু এর জন্য তারুণ্য ও যৌবনকে পরিত্যাগ করে আসতে হয় এবং মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছাতে হয়। সুতরাং এই সুখ এবং তৃপ্তি জীবনের মূল্যে কেনা হয়। এ 'আনন্দের সঙ্গে বিষাদ এবং আক্ষেপ' মিশিয়ে থাকে।

অনেক সংগ্রামের শেষে এই অনাবিল নির্বিঘ্ন বিশ্রাম। এটি একটি সত্য। কিন্তু এই সত্যকে শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা আর নেই। যা জানা গেল, তা জানান যায় না। যখন জানান যেত, তখন জানা যায় নি।

কিন্তু এই সত্যের বাস্তব অভিজ্ঞতার আগেই তার জ্ঞান অনুভব করা যেত এবং প্রকাশ করা যেত, যদি অস্পষ্ট গুপ্ত রহস্যের সাহায্যে অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেওয়া যেত। কিন্তু তা সাধারণ চেষ্টা বা ইচ্ছা দ্বারা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই অস্বাভাবিক উন্মাদনা যা কখন কখন সাধকের রহস্যপূর্ণ আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। এ সত্য মানুষের জানা হয়ে গেলে সে মৃত্যুর রহস্যকেও ভেদ করতে পারে।

অশক্ত মনের নিরুদ্বেগ বিশ্রাম পার্থিব যে মূল্যে কেনা যায় তা দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না। সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য চাই উন্মাদনা এবং তা একাধারে সৃজন ক্ষমতাকে

অটুট রাখে এবং এক নিরুদ্বেগ প্রশান্তিতে মনকে ভরিয়ে দেয়। তাই কবির প্রার্থনা যে তিনি যেন এক নতুন শক্তিতে আবার প্রাণবন্ত হন এবং সত্যকে অর্জন করবার ক্ষমতা এই বৃদ্ধ বয়সেও যেন তাঁর ফিরে আসে।

ইয়েটসের পরে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সময়ের কথা আলোচনা করে নিতে পারি। এই সময়ের কথা বলতে গেলে যাঁর কথা আমাদের প্রথমে বলতে হয় তিনি হলেন ওয়ালটার হোরেসিও পেটার(Walter Horatio Pater ১৮৩৯—১৮৯৪)। এই ওয়ালটার পেটারকে আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের বা সৌন্দর্যশাস্ত্রের (Aesthetics) আলোচনাকারীদের মুখপাত্র বলা হয়।

ওয়ালটার পেটারকে অনুসরণ করে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে একটি কাব্যিক পরিমণ্ডল গঠনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই চেষ্টার কোন স্থায়ী বা যথার্থ প্রভাব ইংরাজী কাব্যে পড়েনি। তবে প্রসঙ্গক্রমে, সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'একটি কথা এখানে বলা যুক্তিযুক্ত। শ্রীযুক্ত হার্বার্ট রিড (Herbert Read ১৮৯৩—১৯৬৮) সৌন্দর্যের যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার ভিতরে আপাততঃ যেটি আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে, আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নানা অবধারণার বাহ্যিক সম্পর্কগুলিব মধ্যে ঐক্যই সৌন্দর্য। ওয়ালটার পেটারও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই কথাটি বুঝিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যতত্ত্বের ধারণা অনুযাযী শিল্পবস্তুর গুণাগুণ বিচারের জন্য বস্তুর বা শিল্পবস্তুর ভৌতগুণাবলী প্রথমে উপলব্ধি করা দরকার। এই ভৌতগুণাবলীর পরিধির ভিতর যেমন রং বা শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি সঙ্কেত, ইশারা এবং নানা ধরণের দৈহিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর ক্ষমতাও থাকে। শ্রীযুক্ত আই. এ. রিচার্ডস (I. A. Richards ১৮৯৩—১৯৭৯) তাঁর 'সাহিত্যসমালোচনার নীতিসমূহ' (Principles of Literary Criticism) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সব উপলব্ধ তথ্যের পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও ব্যবস্থাপনা সৌন্দর্য সমাদরের জন্য, বোঝা দরকার। ওয়ালটার পেটার আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে সৌন্দর্য আনুধাবনের এই সব তথ্য বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কয়েকজন কবি কেবলমাত্র তাঁদের নিজেদের ধরনে কবিতার আঙ্গিক প্রসাধনেই নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা কবিতার মূল সত্ত্বা এবং বার্তা কোনটির দিকেই মনোযোগ দেননি। এই সময়টিতে ইংরাজী কাব্যে স্থায়ীভাবে কিছুই যুক্ত হয়নি।

এই প্রায় নিষ্ফলা যুগের পরেই এসেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। এই দশককে ক্ষতিপূরণের বা অভাব সম্পর্কে সচেতনতার এক যুগ বলতে পারা যায়। এই যুগে বেশ কয়েকজন কবি সরলভাবে দ্রুত অপসৃয়মান গ্রাম্য ইংল্যাণ্ডের সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। 'সরলভাবে' কথাটি এই কারণেই বলা হল যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সবটা জুড়েই যে সব শক্তিশালী কবি দাপটে রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা এঁদের অনেকেরই ছিল না। আর, গ্রাম্য-ইংল্যাণ্ড প্রসঙ্গে আগ্রহ এবং নিস্পৃহতা দু'এর কথাই আসে। আগ্রহ এই কারণে যে শত শত বছর ধরে যে ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্য সৌন্দর্য মানুষের পরম তৃপ্তি ও শান্তির বিষয় ছিল তা যে দ্রুত অন্তর্ধান

করছে এ বিষয়ে এঁরা সজাগ ছিলেন এবং এঁদের কবিতায় শেষবারের মত সেই ছবি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কবি এডওয়ার্ড টমাস (Edward Thomas ১৮৭৮—১৯১৭) সারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সব জাতের পাখীর নাম জানতেন। আর, নিস্পৃহতার কথা এই কারণে বলছি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই (১৭৬৪ সাল থেকে) যে শিল্পবিপ্লব সারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, মানবিক মূল্যবোধ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতা, এমন কি দেশের মানুষের মূল মানসিকতা পালটে দিতে শুরু করেছিল, যার বিরুদ্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে আরম্ভ করে বহু কবি ও দার্শনিক মত প্রকাশ করেছিলেন, বা যাকে একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী সমাজবিপ্লব বলে প্রচণ্ডভাবে বোঝা যাচ্ছিল তার কোন উল্লেখ বিংশ শতাব্দীর প্রথমে তেমন স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। অথচ এই যুগেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবি এমন সব কবিতা লিখেছিলেন যেগুলিকে স্থায়ীভাবে ইংরাজী সাহিত্যে বজায় রাখার সম্পর্কে কোন মতান্তর নেই।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন কবিকে ইংরাজী কবিতার ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে মেলাতে পারা যায়।

ওয়ালটার ডি লা মেয়ার (Walter de la Mare) ১৮৭৩-১৯৫৬

ডি লা মেয়ার যে তিরাশি বছর বেঁচে ছিলেন তার ভিতরে পড়ে সাহিত্যের নানা যুগ, নানা বৈচিত্র, নানা পরিবর্তন। একটি শতাব্দীর শেষ এবং অন্য আরেকটির আরম্ভ, দুটি মহাযুদ্ধ, দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তী সময় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় সব কিছুর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল এবং নানা যুগে পরের পর লেখা তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন। একটা অত্যন্ত গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সাহিত্যে এতকাল ধরে লেখার ক্ষমতা বজায় রাখাটাই একটা আশ্চর্যের কথা। একটানা পঞ্চাশ বছরেরও বেশী ডি লা মেয়ার কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'শৈশবের গান' (Songs of Childhood—১৯০২), 'শ্রোতাগণ ও অন্যান্য কবিতা' (The Listeners and other poems ১৯১২), 'কাব্যসঞ্চয়ন' (Collected Poems—১৯৪২), 'ছড়া ও পদ্যসংগহ' (Collected Rhymes and Verses ১৯৪৪), 'জ্বলন্ত কাঁচ' (Burning Glass—১৯৪৫) এবং 'পথিক' (The Traveller—১৯৪৬) বিখ্যাত।

ডি লা মেয়ার শিশুদের স্বপ্নের জগৎ এবং নিজের শৈশবের কল্পনা নিয়ে কবিতা শুরু করেন এবং সেইটাই ছিল তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র। আবার আর একদিকে 'শ্রোতৃবৃন্দ' (The Listeners)-এর মত কবিতায় মৃত্যুর পরের নিঃশব্দ রহস্যের জগৎ এবং আমাদের ঐহিক জগতের সম্পর্ক নিয়েও লিখেছেন। ব্যক্তিজীবনের আর পুরানো রোম্যাণ্টিক জগতের স্মৃতি তিনি মিশিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতায়। ডি লা মেয়ার গীতিকবিতার শব্দের ঝঙ্কার, কোলরিজীয় রোম্যাণ্টিকতা, দৃশ্য ও শব্দের আশ্চর্য সমন্বয়ী চিত্রকল্প, সঙ্গীতধর্মিতা এবং অর্ধোস্ফুট ইঙ্গিতময়তার সমন্বয়ে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইংরাজী সাহিত্যকে অনেকগুলি সুন্দর কবিতা দিয়ে গেছেন।

সমসাময়িক কালের আর একজন নামী কবির কথাও এখানে উল্লেখ করা চলে।

মেসফিল্ড (John Masefield) ১৮৭৮-১৯৬৭

মেসফিল্ড ছিলেন সমুদ্রের কবি। ১৯০২ সালে 'লোনাজলের গাথাগুলি' (Saltwater Ballads) তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। আবার, সমকালীন কাব্যের অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি কবিতা লিখলেন 'চিরস্থায়ী করুণা' (Everlasting Mercy—১৯১১)। তাঁর অনেক কবিতাতেই প্রকৃতির মধুব বর্ণনা পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্যপ্রকৃতির মোহময বর্ণনা পাওয়া যায় ১৯৪৩ সালের 'স্থলভূমির শ্রমিকেরা' (The Land Workers) গ্রন্থে।

মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জগৎ যে ভাবে চলে আসছিল তার বিশ্বস্ত বর্ণনা মেসফিল্ডের কবিতায় পাওয়া যায। এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কাব পরেও বিগত শতাব্দীর শান্ত সুন্দর কাব্যের যে কি বিশাল জনপ্রিয়তা ছিল তা বোঝা গিয়েছিল ১৯২৩ সালে প্রকাশিত মেসফিল্ডের 'কবিতাসঞ্চয়নের' (Collected Poems) অসাধারণ সমাদর দেখে। সূক্ষ্ম সমালোচনার দিক থেকে যদি মেসফিল্ডকে বিগতকালের কবি বলা হয়, জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে কিন্তু 'আধুনিক' এই আখ্যা দিতে হয়।

মেসফিল্ড সর্বতোভাবে ইংরাজ ছিলেন। আধুনিকতার এবং বিশ্ববৈচিত্রের নানা উপাদান তাঁর কবিতায় থাকলেও মেসফিল্ড ছিলেন একজন ঐতিহ্যবাহী ইংরেজ। 'ইংল্যাণ্ড' এবং 'ইংবাজী' এই কথা দুটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে সংরক্ষিত জাতীয় চেতনার উত্তরাধিকারকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন।

এব পরে ইংরাজী সাহিত্যের অগ্রগতির রাস্তায় আমাদের একটা মোড় ঘুরতে হবে। নতুন একটা রাস্তা পাওয়া যাবে। এর নাম 'স্পষ্ট বর্ণনাবাদ' (Imagism)।

গতানুগতিক কবিতা সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে কয়েকজন কবি এই 'স্পষ্ট বর্ণনাবাদের' (Imagism) দিকে ঝুঁকলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন টি. ই. হিউম (T. E. Hulme—১৮৮৩—১৯১৭)। সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। তিনি কাব্যে অপ্রয়োজনীয় আবেগপ্রবণতার বিরোধী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে কাব্য মানুষের মনকে আধুনিক যুগোপযোগী আশ্রয় দিতে পারবে। তিনি ব্যক্তিমানসের যদৃচ্ছ স্বাধীনতার বদলে নীতিশাস্ত্রগত শৃঙ্খলার প্রয়োজন বেশী করে অনুভব করতেন। হিউম বলেছিলেন,—যে কাব্যে ব্যবহৃত কল্পমূর্তিগুলি (Images) পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক হওয়া উচিৎ। হিউমের পরিকল্পিত এবং অনুশীলিত কবিতা যে মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তার নাম 'স্পষ্টবর্ণনাবাদ' (Imagism)। 'স্পষ্টবর্ণনাত্মক' (Imagist) কবিতায় বিষয়বস্তু তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরত্বপূর্ণ কল্পমূর্তির (Image) সরাসরি, সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার উপস্থাপন এবং প্রয়োজনের উপযোগী ছন্দ পরিকল্পনা। এই আন্দোলনের কবিরা মিশ্র ছন্দের (Vers Libre) সুপারিশ করেছিলেন।

এজরা পাউণ্ড (Ezra Pound ১৮৮৫—১৯৭২) ছিলেন এই আন্দোলনের অতি বিশিষ্ট অনুসরণকারী। হিউমের মত এজরা পাউণ্ডও চেয়েছিলেন অন্ততঃ তাঁদের যুগে

মিশ্র ছন্দের (Vers Libre) প্রভৃত ব্যবহার হোক। এঁরা বলেছিলেন প্রতিটি যুগ তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কাব্যের নতুন গঠনশৈলী বাছাই বা আবিষ্কার করে নিক। এঁরা বলেছিলেন সত্য অপরিবর্তনীয নয়, বরঞ্চ তা হবে যুগানুসারী। কাব্য হবে অন্তদর্শনমূলক, এবং তার চেষ্টা হবে কবির মনের মূহুর্তকাল স্থায়ী চকিত কোন পর্বকে লিখিত ভাষায় ধরে রাখা। কবিতা এখন থেকে আর আবৃত্তির আকারে পড়া যাবে না, কেননা তাতে অন্তদর্শনের একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

'স্পষ্টবর্ণনাত্মক' (Imagist) কবিতাসঙ্কলন ১৯১৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হযেছিল, কিন্তু এর আদর্শ বহুদিন ইংরাজী সাহিত্যে বজায় ছিল। নানা পরিস্থিতিতে নানাভাবে এর সংস্কার হলেও মূল শিক্ষা কোন না কোন ভাবে আজও ভিতরে ভিতরে বজায় আছে। তবে এর বড় ত্রুটি ছিল বিষয়বস্তুকে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে কাব্যিক কৌশলের উপর বেশী জোর দেওয়া।

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু এবং শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং বলাই বাহুল্য ওই অত্যন্ত শক্তিশালী ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী মানুষের মনোজগতে যতখানি পরিবর্তন এনেছিল ততখানি পরিবর্তনের কথা কেউ কখনও ভাবতে পারেনি।

যুদ্ধচলাকালীন এবং অব্যবহিত পরে যে শ্রেণীর কবিতা সবলে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকে 'যুদ্ধ-কবিতা' (War Poems) বলা হয়।

যুদ্ধের প্রকাণ্ড হতাশা, বিভ্রান্তি এবং লক্ষ্যহীনতা মানুষের মনকে অধিকার করল। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি ইলিয়ট।

তারপর দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের কবিতায নতুন আদর্শ এবং নতুন মূল্যবোধের সমাগম হল।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানুষের মনের যথার্থ পরিচয নতুন করে আবিষ্কার করতে হল।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি। ক্লান্ত মানুষ অন্বেষণ করে নতুন আশ্রয়ের, নতুন বিশ্বাসের। মানুষ কি পেল, কি পেতে পারত বিংশ শতাব্দীর শেষেও তা স্পষ্ট করে বোঝা গেল না।

আমরা এই সব পর্বগুলির কিছু কিছু আলোচনা করে ইংরাজী কবিতার ধারা সম্বন্ধে কথা শেষ করবো।

যুদ্ধ কবিতা (War Poems)

১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু কবি যুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁদের সমস্ত মনোভাব উজাড় করে দিয়েছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের কবিতার গঠন শৈলীতে অবশ্যই বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু এঁরা সকলেই—যাঁরা যুদ্ধের পক্ষে তাঁরা একদিকে, যাঁরা বিপক্ষে তাঁরা আর একদিকে—দুটি মূল সুর ধরে রেখেছিলেন। কেন্দ্রবস্তু বা উৎস কিন্তু সেই বিশ্বযুদ্ধ। ওই যুদ্ধে সংযত হিসাব ধরলেও এক কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলেন, এবং তার দ্বিগুণ আহত হয়েছিলেন। বহু কবিও এই যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন

দিয়েছিলেন। আন্তরিক স্বদেশপ্রেম ইংরাজ সৈনিককবি সকলের ভিতরেই ছিল। কেউ দেশের জন্য প্রাণবিসর্জনের মধ্যে গৌরব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কেউ নির্বুদ্ধিতা ও নিরর্থক অপচযের জন্য স্বদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখেছিলেন। কেউ যুদ্ধবাজদের ভণ্ডামিতে বহুযুগের এক আদর্শকে কলুষিত হতে দেখেছিলেন, কেউ বা সরল মানুষদের প্রাণভরা আবেগকে চক্রান্তকারীদের দ্বারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থের লোভে অপব্যবহৃত হতে দেখেছিলেন। এঁদের স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি অথবা সরল তেজোদৃপ্ত আবেগের অপব্যবহারে আক্ষেপ এই সব কবিতার উৎস। এঁদের কেউ খোলাখুলি উচ্ছ্বাসে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, কেউ বা তির্যক ব্যঙ্গের ভাষায় দুঃখ ও আক্ষেপের সঙ্গে সত্যকে ঘোষণা করে গেছেন। এঁরা সকলেই জীবনের চরম পরীক্ষায় সৌন্দর্যের প্রশংসাপত্র পেয়ে গেছেন। কিন্তু সাহিত্য তো শুধু সততার ঘোষণা নয়, তাকে ছাড়পত্র পেতে গেলে শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা অধিগত করতে হয়। তাই সব কবি স্থায়িত্ব পাননি।

এই যুদ্ধকে ঘিরে যেসব কবিতা বিভিন্ন গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল সেই সব কবিতার কবিরা অধিকাংশই ছিলেন সৈনিক। মনোভাব যাঁর যাই থাক অধিকাংশ কবিই গঠনশৈলীতে কোন নতুনত্বের অনুশীলন করেননি। এর ফলে সেই সব কবিতা পড়লে তাঁদের বেদনা, উচ্ছ্বাস, ক্রোধ, ঘৃণা, সত্যদর্শন, কিংবা উল্লাস, আত্মবিসর্জন, ত্যাগ ও গৌরববোধ খুব স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে এবং তাঁদেরই মারফৎ এ যুগের যন্ত্রণা, অভিশাপ, বিষাদ ও মোহমুক্তির বোধ আজও আমাদের হৃদয স্পর্শ করে।

আমরা এই সব কবিদের মাত্র তিনজনের সম্বন্ধে আলাদা করে উল্লেখ করছি। এঁরা হলেন সাসুন, ওয়েন এবং ব্রুক।

সিগফ্রিড সাসুন (Seigfried Sassoon) ১৮৮৬-১৯৬৭

সাসুন ছিলেন সৈনিক কবি। আদর্শের অনুসরণে তিনি তাঁর মনোভাবকে নিযোজিত করেছিলেন, কিন্তু মোহমুক্তি ঘটতে দেরী হয়নি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে যুদ্ধবাজদের গোপন ঘৃণ্য পরিকল্পনা তাঁর দেশের মানুষদের কাছে উদ্ঘাটিত কবে দেওয়া তাঁর কর্তব্য।

১৯১৮ সালে কবিতাসঙ্কলন 'প্রতি-আক্রমণ' (Counter Attack) প্রকাশ করে তিনি তাঁর বিবেকের কাছে দায়মুক্ত হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম কবি যিনি যুদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট অতিবাস্তব অবস্থাগুলির ব্যাপারে সমাজের শক্তিশালী অংশের নিস্পৃহতা ও নিষ্ঠুরতাকে প্রকাশ করে দিযেছিলেন। শুধু পথিকৃৎ হিসাবে নয়, সত্যভাষণ ও সৎ সাহসের জোরে আজও তিনি খ্যাতিসম্পন্ন। ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয় 'যুদ্ধ-কবিতা' (War Poems), এবং ১৯২৬ সালে 'বিদ্রুপাত্মক কবিতা' (Satirical Poems)।

যুদ্ধের যা বড় ক্ষতি—মানুষের মনের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেওয়া—তার কাছে সাসুন নতিস্বীকার করেন নি। তাঁর এই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রয়ে গেছে ১৯২৮ সালের 'হৃদয়ের যাত্রা' (The Heart's Journey) এবং ১৯৩৫ সালের 'সতর্ক জাগরণ' (Vigils) কাব্যগ্রন্থ দুটিতে।

উইলফ্রেড ওয়েন (Wilfred Owen) ১৮৯৩-১৯১৮

ওয়েন মহাযুদ্ধে পদাতিক সৈন্যদলে যোগ দেন ১৯১৫ সালে। মারা যান ১৯১৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর। পঁচিশ বছরের জীবনের প্রথম দিকে গতানুগতিক রোম্যান্টিক ঐতিহ্যের কবিতা লিখেছেন। পরে ১৯১৭ সালে সিগফ্রিড সাসুনের সঙ্গে পরিচয় তাঁর দৃষ্টিকে বাস্তবধর্মী করে তোলে।

কামান, পরিখা, কাঁটাতার, বীভৎস মৃত্যু, আর প্রচণ্ড আতঙ্কের মাঝখানে থেকে যুদ্ধ করতে করতে বাস্তব পরিস্থিতি অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁর মনকে সুপরিণত করে তুলল। ব্যর্থতা, আতঙ্ক, হতাশা এবং একঘেযেমির অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি আধুনিক যুদ্ধের মত বাস্তব ভয়ঙ্কর ঘটনার অন্তরালে একশ্রেণীর মানুষের ভণ্ডামি ও হৃদয়হীনতার যে স্পষ্ট চেহারা দেখতে পেলেন তা মানুষের একটি অংশের সম্যক এবং চারিত্রিক পরিচয়। সেই সঙ্গে আদর্শবাদী এবং সার্থক জীবনের সম্ভাবনাযুক্ত বহু মানুষের বঞ্চনা, বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তা তিনি এত বেশী করে অনুভব করলেন যে একজন সৎমানুষের স্বাভাবিক, প্রচণ্ড দুঃখবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত হলেন।

এমনকি তিনি যুদ্ধের প্রতিও করুণা প্রদর্শন করলেন (The Pity of War)।

যুদ্ধ তো মানুষের সমাজে চিরকাল ধবে আছে—ন্যায়যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ, দেশের জন্য যুদ্ধ, মহান আদর্শের জন্য যুদ্ধ—এর জন্য গৌরব আছে, এ ত্যাগ স্বীকারে আনন্দ আছে। কিন্তু মানুষের মনের এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে কিছু নীচ স্বার্থান্বেষী মানুষ (বা অমানুষ) সহজ বিশ্বাসপরায়ণ মানুষকে কাজে লাগাল। ফলে যুদ্ধ এতকাল ধরে যে গৌরবের বেদীতে আসীন ছিল তা থেকে স্থানচ্যুত হল, ভ্রষ্ট হল। মানব-সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত, বহুক্ষেত্রে পবিত্র কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত যুদ্ধের এই অধঃপতনের জন্য ওযেন তাকেও করুণা করেন। গৌরবের সিংহাসন থেকে যুদ্ধের অবলুণ্ঠন তাঁর কবিতার এক সম্পূরক প্রণোদন। My subject is War, and the Pity of War. The poetry is in the pity.। এই করুণার সঙ্গে অসংখ্য প্রাণের অপচয, মানুষের জন্য দুঃখবোধ এবং তাদের অসহায়তার প্রতি সহানুভূতি মিশিয়ে দিয়ে কবি এক সর্বাত্মক, প্রগাঢ় বেদনার সঞ্চার করেন পাঠকের মনে। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়েন যুদ্ধবাদীদের কুক্রিয়ার অপপ্রভাবকে অনুভব করেছিলেন। ওয়েনের অন্তর্ভেদী দর্শনেই নিহিত আছে তাঁর বিশেষত্ব ও বজ্রকঠিন দিগ্‌নির্দেশ।

ওয়েনের কবিতা সংখ্যায় কম। ১৯২০ সালে সেগুলি একত্রিত করে প্রকাশ করেন সিগফ্রিড সাফুন, এবং ১৯৩১ সালে অধিকতর সুসম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন এডমাণ্ড ব্লানডেন (Edmund Blunden)। তাঁর কবিতাগুলিতে রয়েছে শব্দচয়নে বিচক্ষণতার পরিচয়। ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য, প্রতিটি শব্দের পৃথক পৃথক উচ্চারণ, বিষয় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শব্দের আশ্চর্য নিপুণ ব্যবহার কবির বোধশক্তির, বিশেষ করে শ্রবণশক্তির, দক্ষতার প্রমাণ। বিভিন্ন স্তবকের বিশেষ বিশেষ লাইনের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্তবকের লাইনের অন্ত্যমিল পরবর্তীকালের অনেক কবিই অনুসরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজে লাগিয়েছেন।

ওয়েন রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তাঁর মায়ের সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'যাবার দিন' কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ আবৃত্তি করেন :

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।

এবারে ওয়েনের একটি কবিতার কথা বলা যাক।

আশ্চর্য সাক্ষাৎকার (Strange Meeting)

কবি স্বপ্নে দেখেন যে তিনি মারা গেছেন। আগের দিন যে জার্মান যুবকটিকে তিনি হত্যা করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর অদ্ভুতভাবে দেখা হয় এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে। আসলে তিনিও আজ মারা গেছেন, —পাতালে (নরকে) চলে গেছেন। সেই মৃত সৈনিকটি প্রশ্ন তোলে তাকে বাঁচতে দেওয়া হয়নি কেন। বেঁচে থাকলে তো সে মানুষের কাজে লাগতে পারত। এই প্রকাণ্ড অপচয়, অযথা মৃত্যু, যুদ্ধোন্মাদনার নির্বুদ্ধিতা,—এ সবের কথা সে বলে। এগুলি আসলে কবির নিজেরই কথা। এই দুর্বুদ্ধিতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য, মানুষ আর এগোতে পারে না, পিছিয়ে পড়ে। বিবেচনাহীন মানুষ যে দুর্গে আশ্রয় নেয় তার কোন সুরক্ষার বন্দোবস্ত নেই। কিন্তু সুবুদ্ধি থাকলে মানুষ বাঁচতে পারত; যুদ্ধের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারত। যখন যুদ্ধের রথচক্র মানুষের রক্তে ভেজা মাটিতে বসে যাবে, তখন হয়ত চেতনা ফিরবে। অপেক্ষা করতে হবে ততদিন ; ভবিষ্যতে মানুষের সুবুদ্ধি ফিরে আসবে। দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধের বুলি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর বীভৎসতাকে চেপে দেওয়া যায় না। যারা বেঁচে থাকবে তারাও বুঝবে যে যারা মারা গেল তারাই বা কেন বাঁচতে পারল না।

রিউপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke) ১৮৮৭-১৯১৫

রিউপার্ট ব্রুক মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগ দেন। ১৯১৫ সালেই মারা যান। তাঁর কবিতা-সঙ্কলনগুলির নাম 'কবিতাগুলি' (Poems—১৯১১), '১৯১৪ এবং অন্যান্য কবিতা' (1914 and other poems—১৯১৫) এবং 'কবিতাসংগ্রহ' (Collected Poems—১৯১৮)।

প্রথম দিকে প্রকৃতি এবং জীবনের ছোটখাট হাসিখুশীর কথা নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। কোন দিনই জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে কবিতা লেখেননি। প্রথমদিকে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করার সময় তিনি পাননি। তাই হয়ত তিনি যুদ্ধের গৌরব, বীরসৈনিকের বীরত্বগাথা, দেশাত্মবোধ, দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার গৌরব,—এই সব নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

যুদ্ধের সম্পর্কে গতানুগতিক রোম্যান্টিক ধারণা ব্যক্ত করার জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা তাড়াতাড়ি কমে যায়। আধুনিক মানুষ আধুনিক যুদ্ধকে যখন চিনতে পারে তখন তারা আর রিউপার্ট ব্রুকের পুরানো বিশ্বাস গ্রহণ করতে চায় না।

এডিথ সিটওয়েল (Edith Sitwell) ১৮৮৭-১৯৬৪

এডিথ সিটওয়েল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের অত্যন্ত শক্তিশালী কবি হযেও বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি না হতে চাওয়ার দরুণ ব্যাপক স্বীকৃতি পেতে অপারগ হয়েছিলেন। তাঁর বংশের আভিজাত্য এবং নিজেও ছোটবেলায যেটুকু দেখেছিলেন তার বাইরে সমাজ ও সাহিত্যের আদর্শ তিনি খুঁজে পাননি। কিন্তু সে আদর্শ যুগ এবং ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। বাস্তবতা-পরাঙ্মুখ সে আদর্শ ব্যাপক স্বীকৃতি পেতে পারে না।

সিটওযেল জর্জীয়ান কবিদের (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক) আদর্শের বিপক্ষে গিয়েছিলেন। জর্জীয়ান কবিরা নতুন কিছু বলেননি। তাঁরা সরলভাবে ইংরাজী কবিতার ধীর ও পরিচ্ছন্ন গতিকে অনুসরণ করেছিলেন ; কোন অভিজাত রক্ষণশীল রীতিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেননি। তাঁরা সাদাসিধা ছন্দচাতুর্য এবং সরল বর্ণনার মধ্যে তাঁদের চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। এইখানেই ছিল সিটওয়েলের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ।

সিটওয়েল শব্দের বিচিত্র ব্যঞ্জনা এবং তার নানা ধরনেব সম্ভাবনার উপর জোর দেবার কথা বলেছিলেন। হয়ত তাই দিয়ে তিনি ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য ঘটাতে চেযেছিলেন। কিন্তু চিন্তা ও অনুভবের গভীরতায় না প্রবেশ করে শুধু বহিরঙ্গের সাজসজ্জা দিয়ে স্থায়ী আদর্শ সৃষ্টি করা যায না, এটা তিনি অনুভব করেন নি।

এডিথ ও তাঁর দুই ভাই রূপসজ্জা ও শব্দ চাতুর্যকে মুখ্য আদর্শ করে এবং বিগত যুগের সামাজিক পরিবেশের ধারণা নিয়ে 'চক্র' (Wheels) পত্রিকা প্রকাশ করেন ও কয়েক বছর চালিযে যান। সাহিত্যে সৌন্দর্য ও সুরুচি বজায় রাখা তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে তিনি তাল মিলিয়ে চলতে পারেন নি। 'শৈশবকাল' ও 'শিল্প' এই দুয়ের ভিতর তিনি আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি যুগের শূণ্যতা ও নিষ্ফলতাকে যথেষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন সময়ে শূণ্যতা ও ভোঁতাবুদ্ধি সাধারণ মানুষের চেতনাকে যে অসাড় করে দিয়েছিল তা-ও তাঁর চোখে সম্যক ধরা পড়েছিল।

'Still Falls the Rain' কিংবা 'Three Poems of the Atomic Age'-এর কবি কিন্তু যুদ্ধের অপচয় এবং মনুষ্যত্বের অমর্যাদা বুঝতে অপারগ ছিলেন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায়ও তাঁর জানা ছিল না। প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার করতে তিনি চাননি। তাই তাঁর শক্তি কোন সঙ্কটমোচনে সাহায্য করতে পারেনি। সিটওয়েল কলাকৌশলের কবি। বিপন্ন যুগের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মিক যোগাযোগ ছিল না।

১৯১৮ সালের 'বিদূষকদের গৃহ' (Clowns' Houses), ১৯২০ সালের 'পৌরাণিক ঘোড়া, কিন্তু কাঠের' (The Wooden Pegasus), ১৯২৩ সালের 'কিছু গ্রাম্য কমেডি' (Bucolic Comedies) এবং ১৯২৬ সালের 'নকল চেহারা' (Facade) তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

এক সময়ে তাঁকে কবি ইলিয়টের সমান প্রতিভাসম্পন্ন বলে কোন কোন মহলে মনে করা হয়েছিল।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশক—মহাযুদ্ধোত্তর দিনগুলি

এগিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের দিনগুলির সামান্য খতিয়ান নিয়ে নেওয়া দরকার।

এই দশকে মানুষের মনে আশা ও নৈরাশ্য দুইই একসঙ্গে দেখা গেল। এইচ. জি. ওয়েলস (H. G. Wells—১৮৬৬-১৯৪৬) সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলবার কথা তুললেন। যদি তখনি নতুন করে কোন পরিকল্পনা না নেওয়া হয় মানুষের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আনা যেতে পারত তা' আনার আর সম্ভাবনা থাকবে না। ঠিক তখনই কাজে পরিণত করার জন্য এইরকম তৎপর চিন্তাকে ওযেলস সাহিত্যের পোষাকে সাজিযে মানুষের সামনে ধরেছিলেন।

মানুষের মনে আস্থা ফিরিযে নিয়ে আসার জরুরী দরকার ছিল। কিন্তু কিছুতেই তাকে কোন কিছুর উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীলতার স্তরে নিয়ে আসা যাচ্ছিল না। চারিদিকে যে নিষ্ফলতা, বন্ধ্যাত্ব এবং সর্বাত্মক ধ্বংসের চিত্র—বর্তমানের ও ভবিষ্যতের—মানুষের চোখে আর সব কিছুকেই নিরর্থক করে দিয়েছিল তা থেকে বেরিয়ে আসবার রাস্তা কেউ দেখাতে পারছিলেন না। বা বলা চলে যাঁরা চিন্তা করেন, কল্পনা করেন, তাঁবাও দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। বাস্তব, তাৎক্ষণিক দৃশ্যপটের পরে আরও নতুন দৃশ্য থাকতে পারে এরকম বিশ্বাস করবার শক্তিই চিন্তানায়করা হারিয়ে ফেলেছিলেন। খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসে পূর্ণ আস্থা এবং তাকেই নতুন করে আঁকড়ে ধরার চেষ্টার ভিতরে কোন মহত্ত্ব বা ভবিষ্যদ্-দর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরা এক কথা; আর মানুষের উপর বিশ্বাস রেখে ভবিষ্যতের দিগনির্দেশ করা আর এক কথা। এ যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী ইংরাজ কবিও তা করতে পারেননি।

ক্ষতি যা হযেছে তার কথা অনেক বলা হল। কিন্তু রোগের ওষধ কি? পুরোনো জীবনের স্বপ্নে ডুবে থাকা, না সংসার পরিত্যাগ, না বিপন্ন হয়ে ধর্মসংঘে আশ্রয় নেওয়া? কোন্‌টা?

অর্থনৈতিক সঙ্কট, অতি-বাস্তব নিরাপত্তার চিন্তা, মূল্যবোধের পরিবর্তন, —এ সবই মহাযুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফল। অবশ্যই মানুষ যুদ্ধের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাকে ভুলতে চেয়েছিল; কিন্তু তা' অত্যন্ত অবাস্তব আশা এবং ওই পর্যন্তই। নতুন পৃথিবী গড়ার পরিকল্পনার কথা ব্যাপকভাবে ভাবা হয়নি। কয়েকজন চিন্তানায়ক হয়ত ভেবেছিলেন; কয়েকজন রাজনীতিক হয়ত 'জাতিসংঘ' (Leaque of Nations) গড়েছিলেন। কিন্তু তার পরে? বাস্তব কাজের সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরার যে প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশী করে ছিল, তা তেমনভাবে অনুসরণ করার কথা খুব বেশী মানুষ ভাবেননি। যেমন জগৎ, যেমন সমাজ, তেমনি সঠিক বিজ্ঞ চিন্তার দিক থেকেও এই যুগটি ছিল অনুর্বর, নিষ্ফলা। আসলে, যা তখনও পড়ে ছিল তা দিয়ে অনেক কিছু করা যেত; শক্ত বনিয়াদের উপর নতুন পৃথিবী গড়ার আদর্শগত

চেষ্টা বাতুলতা হত না। সমস্যাকে বড় করে, স্পষ্ট করে দেখার চেয়েও বেশী জরুরী ছিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।

যারা মানুষের সততায় বিশ্বাস করে ঠকেছিল তাদের আবার সৎ মানুষের উপর আস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার দরকার ছিল। যারা নির্বিচারে মৃত্যু ও ধ্বংস, লোভ ও ভণ্ডামির দিকটা দেখেছিল তাদের দেখায় ভুল ছিল না। কিন্তু তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার কাজ, ক্ষতিপূরণের কাজ, বিভ্রান্তি এবং অবমাননার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার কাজটা ছিল খুব জরুরী। সে দিকে ততটা মন দিতে কেউই তেমন পারেন নি। এই সম্মান বা মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কোন কল্পনামাত্র নয়। যদি সাহিত্যের মারফৎ সমাজকে নতুন করে দাঁড় করাতে হয়, তবে যাদের যুদ্ধ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি তাদেরও জানাতে হবে যুদ্ধ কি। যুদ্ধ থেকে যে সমস্ত সৈনিক বেঁচে ফিরে এসেছে তারা কি করে নতুন জীবন শুরু করবে তা তাদের জানাতে হবে। এখনও সব ফুরিয়ে যায়নি, নতুন উদ্যমে আবার সব শুরু করা যেতে পারে, ——এ কথা তাদের বোঝাতে হবে।

এই চেতনা, এই বোধ, এই উৎসাহ এনে দেওয়া সাহিত্যেরই কাজ। আবার, বয়স্ক এবং অল্পবয়স্কের ভিতর প্রজন্মগত যে দূরত্ব থাকতে পারে তাকে ঠিকমত চালনা করা, ——এ-ও সাহিত্যেরই কাজ। তৃতীয় দশকের সাহিত্যিকরা এ সব কাজ করতে চেয়েছিলেন কি না সাহিত্যের ইতিহাসে এটা খুবই প্রাসঙ্গিক কথা।

এই দশকটি খুবই জটিল। এইচ. জি. ওয়েলস শুভ বুদ্ধিযুক্ত মানুষের মত তখনও পরিকল্পিত অর্থনীতির ভিত্তিতে ভবিষ্যতের নিরাপদ ও সমৃদ্ধ সমাজের কথা ভেবে চলেছিলেন। এই ছিল পটভূমি। এরই উপর নির্ভর করে এলিয়টের সাহিত্যিক কাজের অর্থ এবং তার গুরুত্বের কথা বিচার করতে হবে।

টমাস স্টার্ণস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot) ১৮৮৮-১৯৬৫

এলিয়টদের পূর্বপুরুষ ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। পরে তাঁরা আমেরিকায় চলে যান। এলিয়ট আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন এবং বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি নানা ভাষায় ও সাহিত্যে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

বহু ইংরাজ সাহিত্যিক ও সমালোচক তাঁকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইংরাজ কবি বলে মনে করেন। কবিতা ছাড়াও বহু চিন্তামূলক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং কয়েকখানি নাটক তিনি লিখেছিলেন। আমরা অবশ্য এখানে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পটভূমিতে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করবো।

বিখ্যাত পণ্ডিত আরভিং ব্যাবিটের (Irving Babbitt) কাছেও তিনি কিছুদিন পড়েছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রোম্যাণ্টিকতা-বিরোধী। শ্রীযুক্ত আর্থার সাইমনস (Arthur Symons) ফরাসী প্রতীকি কবিদের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ১৮৯৯ সালে 'সাহিত্যে প্রতীকধর্মী আন্দোলন' (The Symbolist Movement in Literature) বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটি পড়ে এলিয়ট ফরাসী প্রতীকধর্মী কবি জুলে লাফর্গ (Jules Laforgue ১৮৬০—৮৭), পল ভেরলেন (Paul Verlaine ১৮৪৪—৯৬), রিমবড (J. A. Rimbaud ১৮৫৪—৯১) প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। এ ছাড়া তাঁর উপরে দান্তে (Alighieri Dante ১২৬৫—১৩২১), ডন (John Donne ১৫৭২—১৬৩১) এবং বদলেযারেরও (Charles Baudelaire ১৮২১—৬৭) প্রচুর প্রভাব পড়েছিল। আমেরিকার এজরা পাউণ্ডের (Ezra Pound ১৮৮৫—১৯৭২) উপর তাঁর কবিতার ভাল-মন্দ বিচারের ব্যাপারে এলিযটের অনেকটা নির্ভরশীলতা ছিল। আধুনিক নগর-জীবনের শূণ্যতা ও অবক্ষয় বদলেয়ারই প্রথম তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেন এবং তা বিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবীর বহু কবিকেই আধুনিকতার সঠিক প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করেছিল। বিশিষ্ট দার্শনিক ফ্রান্সিস হার্বার্ট ব্রাডলির (Francis Herbert Bradley ১৮৪৬—১৯২৪) দ্বারাও এলিয়ট খুব বেশী রকম প্রভাবিত হয়েছিলেন। এলিয়টের মানসিক ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল এঁদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে।

১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জে. আলফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমের গান ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ' (The Love song of J. Alfred Prufrock and other observations)। প্রুফ্রক একজন আধুনিক কালের নাগরিক। যৌবন অতিক্রান্ত। সব কাজ একটু ভেবেচিন্তে করেন। এঁর নানা অবদমিত ইচ্ছা এবং কার্যকলাপ নিয়ে কবিতাটি। লোকটির দৃঢতা ও তৎপরতার অভাব আছে! নিজের স্বরূপ প্রকাশে দ্বিধা এবং সঙ্কোচ! এই চরিত্রটির কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে খানিকটা নাটকীয়ভাবে। ভাষা আপাত দৃষ্টিতে সাদামাঠা। এই ধরনের ভাষা ইচ্ছা করেই রাখা হয়েছে। ছোটখাট সাধারণ জিনিষের উল্লেখগুলিই একটা ইঙ্গিতবহ। এই সব উল্লেখের মারফৎ আমরা অনেক বড কথা, বড় বিষয় স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বোঝাতে পারি। এতদিন গম্ভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ কথা বোঝাতে গিয়ে আমরা তাকে অনেক কৃত্রিম করে ফেলতাম। সেগুলির কিছু ধ্বনিমাধুর্য ছাড়া আর তেমন কিছুই মনের ভিতর পর্যন্ত পৌছাত না। আমরা সাহস করে জীবন্ত ভাষাকে এর আগে তেমন করে ব্যবহার করিনি। পাঠকের বোধশক্তির আওতায় আনার জন্য এখন বিষয়টিকে যেন লঘু করে দেখান হল। ফল হল আশাতীত। পাঠক একই সঙ্গে বক্তব্যকে সহজভাবে বুঝল এবং বিষয়টির তাৎপর্য তার অজান্তেই তার মনে গেঁথে গেল। সে আগ্রহী হল, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিল এবং এই নিয়ে ভাবতে পারল বলে একটা সন্তোষ পেল। চিত্রকল্পগুলি অভাবিত। মানুষ একটু ভেবে যে যার মত তাৎপর্য নিয়ে নিতে পারল। এমনকি শ্লেষোক্তি তার বুদ্ধিকে স্পর্শ করল। এবং সেগুলি অনেকক্ষেত্রেই হল বেশ মজাদার। আধুনিক সভ্যতা যে সব সুবিধাসুযোগ দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে সেগুলিই শ্লেষোক্তির লক্ষ্য। এই ভাবে কবির সঙ্গে এবং বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের যখন ঘনিষ্ঠতা এসে গেল তখন গূঢ় বক্তব্যের অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হলেও পাঠক তাকে মেনে নিল এবং ভাবতে শুরু করল। পাঠকের মনের সঙ্গে কবির

উচ্চমার্গের দৃষ্টি অদ্ভুতভাবে সমস্তরে এসে গেল। এই হল এলিয়টের কৌশল। কবির ভাবনাটাই শুধু বড় নয়; পাঠককে সহজভাবে ভাবতে পারানটাও বড কথা। নাটকীয় 'এককভাষণ' (Monlogue) পাঠকের কাছে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়, এমন কি নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও হয়ত কিছুটা মিলে যায়। পাঠক এক ধরনেব সমানুভূতি নিয়ে কবিতাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আধুনিক কবিতাটির উপর এই বইটির শুধু তত্ত্বকথার নয়, বক্তব্য বলার ভঙ্গীরও খুব প্রভাব পড়েছিল।

এরপর ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় 'নানাকবিতা' (Poems)। এর সুইনি (Sweeney) কবিতায় আছে চার চার লাইনের মিলযুক্ত স্তবক। মিলের পরিকল্পনা abcb। আধুনিক মানুষের দ্বিধা ও একই মানুষের ভিতর দুটি পৃথক সত্ত্বার অস্তিত্ব এতে দেখান হয়েছে। 'জেরোনসন' (Geronson) এই গ্রন্থেরই একটি কবিতা।

'জেরোনসন' একজন বৃদ্ধ, প্রাক্তন নাবিক—দৃষ্টিহীন, নিঃসঙ্গ। এখন আর তার জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে যাবার ক্ষমতা নেই। সে আছে একটা মরুময় দেশের একটি ভাঙ্গা ঘরে। সে বৃষ্টি চায়। সে নিজের সঙ্গে কথা বলে। সে জল চায়, প্রাণ চায়, শান্তি চায়। এই চাওয়া বিংশ শতাব্দীর সব মানুষের চাওয়া।

এরপর 'অব্যবহার্য জমি' (The Waste Land)। ১৯২২ সালে প্রকাশিত।

এতে আছে কবির দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতার চেহারা। শুধু ধ্বংস ও যুগের অবক্ষয়ের জন্য দুঃখবোধ নয়, —মানুষের পতন, ভবিষ্যদ্দর্শন এবং একটা সমাধানের রাস্তা।

এটি 'আর্থার' চক্রের ধীবর রাজার কাহিনীর সূত্রে লিখিত কাব্য। শুরুতে মূল বক্তব্য মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের ধ্বংস ও হতাশা।

কবিতাটিতে পাঁচটি পর্ব। এই পর্বগুলির নাম ও পরিচয়।—

[এক] প্রথম পর্বটির নাম 'মৃতের সমাধি' (The Burial of the Dead)।

'মৃতের সমাধি' বলতে কবি আধুনিক নিষ্প্রাণ জগৎ বুঝিয়েছেন।

যুদ্ধোত্তর লণ্ডন মহানগরী মহাকবি দান্তের নরক বা পাতালের (Inferno) প্রতিরূপ।

এই ক্ষারময়, মরুময, লবনাক্ত, অনুর্বর দেশেও বসন্তের আগমন কবি আশা করতে পারেন। এখানেও লাইলাক ফুল ফোটার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এদেশের অতীত ছিল পুষ্পময়; ভবিষ্যতও হয়ত বসন্তকালীন বর্ষার ফলে আবার পুষ্পময় হবে। কিন্তু বর্তমান ঊষর মরুভূমি। প্রখর সূর্যালোক, মৃতগাছ, শুষ্কপ্রস্তররাজি। এখানে জল অদৃশ্য। এগুলিই কবিতাটির অন্তর্ভুক্ত ভগ্নচিত্রকল্প।

[দুই] দাবাখেলা (A Game of Chess)।

আধুনিক জগতের মানুষ মগ্ন থাকে তুচ্ছতায়। আধুনিক জগতে প্রেম শুধু দেহগত ব্যাপার—আবেগ-উত্তেজনাবিহীন নির্বিকার। এই জীবনে যে যৌনতাবোধ থাকে তাতে ক্ষয় ও মৃত্যুর লক্ষ্মণ স্পষ্ট। এই যৌনতাবোধকে বোঝানোর জন্য প্রতীক হিসাবে ক্লিওপেট্রার

উল্লেখ করা হয়েছে। আবার, এই পর্বের শেষের অংশে দেখান হয়েছে রেস্তোঁরায় মামুলি কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় মানুষ কত হালকা, অগভীর জীবন যাপন করে চলেছে। মানুষ গভীর চেতনা হারিয়ে বসে আছে। মানুষের মনের ক্ষেত্রে আর কোনও উর্বরতা নেই। এখানকার ভাষা ও ছন্দ কৌতুকছলে কবির আহত মানসিক বোধ ফুটিয়ে তুলেছে। দীর্ঘ লাইন, এবং আত্মকথন।

[তিন] অগ্নিবাণী (The Fire Sermon)

আধুনিক জীবনের বিকৃতি। শীত ও জড়তা। অবৈধ, অসামাজিক, নীতিবোধবর্জিত ভালবাসা। পদস্খলনের জন্য কোন অনুতাপ নেই, জীবনের কোন গভীর বোধ নেই। মানুষকে সচেতন করার জন্য ভগবান বুদ্ধের অগ্নিবাণীকে স্মরণ করেন কবি। মানুষের এই অতি অগভীর জীবন চেতনা কবিকে ক্ষুব্ধ করে। কবি কি সংসার পরিত্যাগেই শান্তি এবং মুক্তি বুঝেছেন, নাকি তা-ই চাইছেন।

[চার] জলের ধারে মৃত্যু (Death by Water)

সুস্থজীবন যদি 'জল' হয় তো মানুষ তার অন্বেষণ করে। কিন্তু জল সে পায় না। জল তো শুধু তার কামনা-বাসনা নির্বাপিত করবে না, তাকে নতুন জীবন দেবে। জলেব কিনারা পর্যন্ত গিয়েও জল সে পায় না। তার চেতনা আবার অসাড় হয়ে যায়। অসুস্থ জগতে কোন সুস্থ মানুষের বাঁচার উপায় নেই।

[পাঁচ] বজ্রঘোষণা (What the Thunder Said)

এই পর্বের বিষয় অন্য এক জলপ্রবাহ। জীবনস্বরূপা এক ভিন্ন নদী। এই পর্বের শুরুতে তৃষ্ণায় আকুল মানুষের মন। মরু পাহাড়েরও দাঁত ক্ষয়ে যায়, নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতেও পারে না; জল সে দেবে কোথা থেকে! এই পর্বের শুরুতে যন্ত্রণা ও আর্তি; খৃষ্টের মৃত্যু ও মরণাপন্ন মনুষ্যজন্মের কথা। আর, অভিশপ্ত শুষ্কদেশ অবক্ষয়িত মৃতপ্রায় ইউরোপ।

দান্তের নরক, পাপস্খালন ও স্বর্গের কথা (Inferno, Purgatorio এবং Paradiso) এখানে স্মরণ করা হয়েছে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলে এই অবস্থার পরেও শান্তি আসবে। বজ্রনির্ঘোষে তাঁর বাণী কান পেতে শুনতে হবে। দত্ত, দয়ধ্বম, দম্যত। উপনিষদের বাণীতেও সেই শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, শান্তি শান্তি শান্তি।

প্রতীকগুলি 'খরা' ও 'বন্যা'—মৃত্যু ও পুণর্জন্ম। বিশ্লিষ্ট সভ্যতাকেও খরার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

টাইরেসিয়াস (Tiresius) চরিত্রের পুণঃপুণঃ উপস্থিতি পাঁচটি কবিতাকে পরস্পর সংলগ্ন করে রেখেছে।

'অব্যাবহার্য জমি' বা The Waste Land-এর প্রভাব যেমন বিংশ শতাব্দীর কবিতার উপর তেমনি সারা পৃথিবীর মানুষের চিন্তা ও কল্পনার উপর এত বেশী করে পড়েছিল যে এই বইটিকে যুগের চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

কবিতার ভাষায় অতি গভীর অর্থবহ শব্দ এবং নেহাতই তুচ্ছ আধুনিক শব্দকে এক আশ্চর্য পরিকল্পনায় মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। এই আপাতদৃষ্ট অগভীর শব্দগুলিকে আভ্যন্তরীণ এমন এক অনন্যপূর্ব ধবনে ব্যক্ত করা হয়েছে যে সেগুলির অন্তর্নিহিত গভীর দ্যোতনায় অস্তিত্বে সকলেই বিশ্বাসী এবং আগ্রহী হয়। কালাসঙ্গতি (anachronism) যা অন্য ক্ষেত্রে দোষাবহ হতে পারত তা এখানে সহজেই স্বীকৃতি পেয়েছে। অতীত ও বর্তমানের বহু কাল এখানে সহজেই স্বীকৃতি পেয়েছে। অতীত ও বর্তমানের বহু কাল এখানে একসঙ্গে মিশে গেছে। তা ছাড়া, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ, ইতিহাস ও দর্শনের এমন বিশাল ও বিচিত্র উৎসের ব্যবহার এখানে দেখা যায় যে কবির স্তান ও পাণ্ডিত্য মানুষকে অভিভূত করে। তা সত্ত্বেও এই বৃহৎ কবিতার কাব্যগুণ কোনভাবে নষ্ট তো হয়ই নি, বরং নতুন প্রকাশভঙ্গী ও ভাষায় মানুষ চমৎকৃত না হয়ে পারে না।

কবিতাকে কবিতা হিসাবেই নেওয়া ভাল। কোন নীতি বা দার্শনিক উপদেশ এখান থেকে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

কবির পক্ষে এটি শ্লাঘার বিষয় যে জীবিতকালে কোন কবি কখনো তাঁর কাব্যের উপর এত বেশী আলোচনা দেখেন নি। এই কাব্যের উপর অসংখ্য টীকাটিপ্পনী লেখা হয়েছে। তবু আমরা পাঠককে বলতে পারি যে অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে তিনি যেন নিজের কল্পনাকেই এই কাব্যের যথার্থ উপলব্ধির জন্য বেশী করে ব্যবহার করেন।

১৯২৫ সালে এলিয়টের আগেকার 'নানা কবিতার' (Poems) সঙ্গে 'ফাঁপা মানুষ' (The Hollow Men) কবিতাটি যোগ করে নতুনভাবে ওই একই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'ফাঁপা মানুষ' (The Hollow Men) কবিতায় আধুনিক জগতের হতাশা ও শূন্যতা ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতাটির দ্বারাই শতাব্দীর চতুর্থ দশকের তরুণ কাবরা সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবিতাটি ভয়াবহতার নিম্নতম বিন্দুতে আমাদের পৌঁছে দেয়।

১৯২৭ সালে কবি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ধর্মসংঘে যোগ দেন। এর পরেই তিনি লেখেন 'জ্ঞানী মানুষদের নবজাতকের দর্শনের উদ্দেশে যাত্রা' (Journey of the Magi) কবিতাটি। এই কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি পুরাতন জগতের ধ্বংস এবং নতুন জগতের শুভারম্ভে তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন।

এরপর, ১৯৩০ সালে লেখেন 'ভস্মশুদ্ধি' (Ash Wednesday) ও 'মেরিনা' (Marina)।

'ভস্মশুদ্ধি' বা Ash Wednesday বলতে ফেব্রুয়ারী মাসের সেই বুধবারটিকে বোঝায় যে দিন থেকে খ্রিষ্টের পুণরুত্থানের পরের দিন (শনিবার) পর্যন্ত ৪০ দিন ও রবিবারগুলি জনশূণ্য স্থানে খ্রিষ্টের উপবাসকে স্মরণ করে উপবাস ও অনুতাপে কাটান হত। ওই দিনে অনুতাপীদের মাথায় ভস্ম ছিটিয়ে দেবার প্রথা ছিল।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা—সংসার পরিত্যাগ থেকে আরম্ভ করে নবজীবনের আশা পর্যন্ত ধর্মীয় উপলব্ধি এতে ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতায় ধর্মকে অবলম্বন করে জীবনকে বোঝার চেষ্টা রয়েছে। এটি গীতিকবিতা হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থবান।

এই কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ বাইবেলের। হতাশা ও নৈরাজ্যের অবসান হয়েছে। ব্যঙ্গ নয় আর। বিশ্বাস ও নম্রবিনয়ের কণ্ঠ। সংযত, উদাত্ত, বিনীত, নৈর্ব্যক্তিক আত্মোপলব্ধি। কবিতা প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের স্তরে।

এতে ব্যবহৃত শ্বেতচিতা, গোলাপ, জুনিপার গাছ প্রভৃতি রূপক ও চিত্রকল্প কবি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

এই কবিতাটির উপর দান্তের প্রভাব খুব বেশী।

মেরিনা (Marina)

মেরিনা প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এই কবিতাটির সঙ্গে যে কাহিনীটিব সম্পর্ক রয়েছে তা আছে শেক্সপীয়রের পেরিক্লেশ (Pericles) নাটকে।

মেরিনাকে সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। সমুদ্রেই সে হারিয়ে যায়। আবার তাকে ফিরে পাওয়া যায়।

মেবিনাকে সমুদ্র থেকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটি সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নতুন জীবনের একটা চিত্রকল্প হিসাবে কাজ করে।

'মেরিনা' জীবন ও মৃত্যুর রহস্যের কবিতা। এলিয়টের কবিতায় পেরিক্লেশের কাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে পুণরুদ্ধার ও নবজন্মের রূপক হিসাবে। আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে জাত কন্যা মেরিনার সমুদ্রেই হারিয়ে যাওয়া এবং আবার তাকে ফিরে পাওয়া নতুন আশা ও সম্ভাবনার প্রতীক হিসাবে দেখা দেয়।

এলিয়ট ১৯৪৩ সালে লেখেন **'কাব্য চতুষ্টয়'** (Four Quartets)।

এই কবিতাগুলিতে কাবির জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা এবং ইতিহাসের কথাও যেমন আছে, তেমনি আছে ঘটনাসম্পর্করহিত অনুভবের মাধ্যমে স্থির সত্যের উপলব্ধির জন্য ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা যে সব চিন্তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তা এফ. এইচ. ব্রাডলির (F. H. Bradley) দর্শনের দ্বারা পরিচালিত।

কাব্যচতুষ্টয়ের নাম দেওয়া হয়েছে: বার্ণ্ট নর্টন (Burnt Norton), ইষ্ট কোকার (East Coker), ড্রাই স্যালভেজেস (Dry Salvages) এবং লিটল গিডিং (Little Gidding)।

ধর্মীয় অনুভব এই কাব্যগুলিতে প্রগাঢ়। ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদের (Mysticism) সঙ্গে কবির মানসিকতার সাযুজ্য এখানে দেখা যায়।

কবিতাগুলির মর্মে রয়েছে সময়প্রবাহ এবং শাশ্বত অনন্তের মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি। কবির শান্ত, গম্ভীর যাত্রা অনন্তের অভিমুখে, সত্যের অভিমুখে। সময় বিষয়ক কূটাভাষ ব্যক্ত হয় যখন অনন্ত সময় ও সীমাবদ্ধ সময়কে একসঙ্গেই উপলব্ধি করা হয়।

বার্ণ্ট নর্টন (Burnt Norton) কবিতায় কবি তাঁর গোলাপবাগানে সময় সম্পর্কিত নানা চিন্তায় লুকানো বাস্তবতার সীমাহীন অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন।

কবিতা এখানে স্বচ্ছ। কবিতা বলে কিছু বোঝাবার উপায় নেই। কবিতার মধ্য দিয়ে

যা দেখতে চাই তা-ই যেন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কোন কিছুকে ফেলে যাওয়ার উপায় নেই। সব কিছুকে নিয়েই অসীমের পথে যাত্রা।

ইষ্টকোকার (East Coker)—এতে আছে সমারসেটের যে গ্রাম থেকে কবির পূর্বপুরুষরা আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন সেই গ্রামের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা। অতীত সময়ের বোধ।

দি ড্রাই স্যালভেজেস (The Dry Salvages)—ম্যাসাচুসেটস (Massachusetts) -এর উপকূল থেকে অল্প দূরে পর্বতসঙ্কুল কতকগুলি দ্বীপ।

আমেরিকায় কবির অতীত জীবন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা।

লিটল গিডিং (Little Gidding)—যুদ্ধের সময় যখন ইংল্যাণ্ডে বোমা পড়ছে সেই সময়কার একটি গ্রামের অতীত জীবন সম্পর্কে কবিতাটি। এই গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি ক্যাথলিক ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল এবং তাদের গীর্জা ছিল। ক্রমওয়েলের (Cromwell) সৈন্যরা সেই গীর্জাটিকে ধ্বংস করেছিল।

এ সব যদিও কবির চিন্তার প্রত্যক্ষ উপলক্ষ্য, কিন্তু কবির চিন্তাভাবনা এগুলিকে পেরিয়ে বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল।

এলিয়টের প্রকাণ্ড প্রভাব বিংশ শতাব্দী জুড়ে রয়েছে। তিনিই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিতার পুরোগামী।

এর পরে আমরা ত্রিশের দশকের সেইসব কবিদের কথায় আসতে পারি, যাঁদের জন্ম এবং মৃত্যু দুইই এই বিংশ শতাব্দীর ভিতরে পড়েছে। অর্থাৎ এঁরা বড় দুটি মহাযুদ্ধ দেখেছিলেন এবং সেগুলির আগের এবং পরের অবস্থারও পরিচয় পেয়েছিলেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে মাত্র চারজন কবির কথাই এখানে তুলব। এঁরা হচ্ছেন—

সিসিল ডে লুই (Cecil Day Lewis) ১৯০৪—৭২

লুই ম্যাকনিস (Louis Macneice) ১৯০৭—৬৩

ওয়াইস্টান হিউ অডেন (Wystan Hugh Auden) ১৯০৭—১৯৭৩

স্টিফেন স্পেণ্ডার (Stephen Spender) ১৯০৯—৯৫

এঁদের কথা বলবার আগে ত্রিশের দশকের সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। সিসিল ডে লুই এ যুগের কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীকে খুব স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে যে যুদ্ধ পরবর্তী (প্রথম মহাযুদ্ধ) কাব্য ধ্বংসের মাঝখানেই সৃষ্টি হয়েছিল। হপকিন্স, ওয়েন এবং এলিয়ট (Hopkins, Owen এবং Eliot) ছিলেন এই নতুন কাব্যের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ। এই নতুন কবিরা বৃটেনের পাবলিক স্কুলগুলির বিরুদ্ধে এবং সেখানকার শিক্ষার ফল হিসাবে সাম্রাজ্যসৃজন নীতির প্রতি বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে সেগুলি আধুনিকতার আদর্শের বিরোধী।

ত্রিশের দশকের এই সব উল্লেখযোগ্য কবিরা এটা ধরে নিয়েছিলেন যে কবিদেরও রাজনীতিতে কোন না কোন পক্ষ নিতে হবে এবং কবিতাতেও রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করতে হবে। এই সব কবিরা প্রধানতঃ বামপন্থী ছিলেন। এঁরা সব বুঝে শুনেই 'সর্বহারার'

পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের অনেকেই এবং ইউরোপের নানা দেশের তরুণ কবিরা স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিজেরা উপস্থিত থেকে জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এঁরা যেন এলিয়টের 'অব্যবহার্য পোড়ো জমিকে' (Wasteland) সংশোধন করতে চেয়েছিলেন।

কাব্যের যুগোপযোগী নবায়ণের দিকে এঁরা অত্যন্ত মনোযাগী হয়েছিলেন। এঁরা কবিতার নতুন ভাষা ও নতুন ছন্দের কথা বলেছিলেন। এঁবা বলেছিলেন চিত্রকল্পগুলি যেন আধুনিক জীবন থেকে নেওয়া হয়, এবং কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ যেন সমসাময়িক মানুষের কথ্যভাষার কাছাকাছি হয়। কবিতার ছন্দ যেন স্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গীর থেকে দূরে সরে না যায়। এঁরা বলেছিলেন কবি যেন পাঠকের রসাস্বাদনের ক্ষমতার সঙ্গে অত্যধিক আবেগের যোগাযোগ না ঘটান। বরঞ্চ কবির উচিৎ হবে পাঠকের বুদ্ধির সামনে কবিতাকে হাজির করা। কবিকে আধুনিক কালের সমস্ত রকমের জ্ঞান অধিগত করতে হবে। পুণরুক্তি হলেও আবার বলছি, এঁরা কাব্যগুণের সমৃদ্ধির আদর্শ খুঁজেছিলেন হপকিনস (Hopkins), ওযেন (Owen) এবং এলিযটের ভিতবে।

এলিযট যে অব্যবহার্য জমির (Waste Land) কথা বলেছেন এঁরা তাকে 'ব্যবহার্য' করে তুলতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। এঁদের চেতনায হতাশার কোন স্থান ছিল না। এঁরা অনেকেই কার্ল মার্ক্সের অনুবর্তী এবং কমিউনিষ্ট হয়েছিলেন। যদিও পরে এঁরা অনেকেই মত পালটে ছিলেন, কিন্তু ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে এঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ভুলে যাবার নয়। নিন্দা, দোষদর্শিতা, বিষন্নতা (Cynicism) এবং বেদনাবোধহীন উদাসীনতা (apathy) থেকে কবিতাকে এঁরা সরিযে আনতে পেরেছিলেন।

সিসিল ডে লুই (Cecil Day Lewis)

সিসিল ডে লুই-এর কবিতা এবং সাহিত্য সম্পর্কিত মূলতত্ত্ব আলোচনা জীবনের শেষ পর্যায পর্যন্ত চলেছিল। তিনি বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ত্রিশের দশকে সাহিত্যের নতুন দিক খুলে দেওয়ার কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁরই 'পরিবর্তনের যুগের কবিতা' (Transitional poems ১৯২৯) দিয়ে নতুন যুগ শুরু হয়েছিল। এরপব চলতে থাকে তার প্রকাশনের ধাবা। —'পালক থেকে লোহা' (From feathers to Iron), 'চৌম্বক পর্বত' (The Magnetic Mountain), 'মৃত্যুর প্রারম্ভ' (Overtures to Death), 'সর্বোপরি ঘোষণা' (Word Over all) এবং অনেক কিছু (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের লেখা)।

সাহিত্য-আলোচনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা 'কাব্যের উপরে আশা' (Hope for Poetry), 'যেখান থেকে শুরু' (Starting Point) এবং 'কাব্যিক চিত্রকল্প' (The poetic Image)। এবং 'কাব্যিক চিত্রকল্প' (The poetic Image)।

সিসিল ডে লুই ছিলেন হপকিনস, মার্ক্স এবং এলিয়টের এক আশ্চর্য সমন্বয়।

লুই ম্যাকনিস (Louis Macneice)

লুই ম্যাকনিস আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক। উচ্চশিক্ষিত, বিশেষ করে ক্লাসিক সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, —ত্রিশের দশকের এবং যুদ্ধ-পরবর্তী (দ্বিতীয মহাযুদ্ধ) যুগের বিশিষ্ট কবি। সাহিত্যে নতুন পথের যাত্রী হলেও রাজনীতি নিয়ে তেমন

মাতামাতি করেন নি। কিন্তু অন্যদের মতই সাহিত্য ও সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তাঁর ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে কৌতুকবোধ বজায় রেখেছিলেন। এবং শিল্পী হিসাবে অন্যদের মতই বা অন্যদের থেকে বেশী, আধুনিক কবিতার স্টাইল এবং আঙ্গিক সর্বতোভাবে অনুসরণ করেছিলেন। কবিতাগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট গীতিকবিতা।

১৯৩৫ সালের 'কবিতাগুলি' (The Poems), ১৯৩৮ সালের 'এ পৃথিবী বাধ্য করে' (The Earth Compels), ১৯৩৯ সালের 'শরতের রোজনামচা' (Autumn Journal), ১৯৪১ সালের 'গাছ ও অলীকমূর্তি' (Plant and Phantom), ১৯৪৪ সালের 'স্প্রিংবোর্ড' (Springboard), ১৯৪৮ সালের 'আকাশে ছিদ্র' (Holes in the Sky) এবং ১৯৪৯ সালের 'কাব্যসংগ্রহ' (Collected poems) ম্যাকনিসের শ্রেষ্ঠ কাব্যসঞ্চয়ন।

ওয়াইষ্টান হিউ অডেন (Wystan Hugh Auden)

অডেন ছিলেন ত্রিশের দশকের কবিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জোটের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাগুলি' (Poems)। ১৯৩৮ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'স্পেন' (Spain) প্রকাশিত হয়। এই কবিতার সূত্র ধরেই অডেনের তখনকার পরিচয় হয়েছিল 'আমিই স্পেন' (I am Spain)। ১৯৬৬ সালে যখন নতুন করে তাঁর কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয় তখন তিনি 'স্পেন' কবিতাটি সেই সংগ্রহ থেকে বাদ দিয়েছিলেন। যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পরবর্তী জীবনের পরিবর্তিত প্রত্যয়ের সঙ্গে 'স্পেন' কবিতাটি বেমানান।

ত্রিশের দশকে বা তার কিছু আগে থেকেই ইংরাজী কবিতা যে বিবর্ণ, ভাবলেশহীন, অলস ভাবালুতায় ডুবে গিয়েছিল তারই প্রতিবাদ হিসাবে অডেন কম্যুনিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর তখনকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগান। কিন্তু ১৯৩৯ সালে তিনি রাজনৈতিক তীব্রতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। তিনি আমেরিকায় চলে যান। সেখানেও তিনি অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেগুলি আমেরিকান সাহিত্য হিসাবে গণ্য। মার্ক্স এবং ফ্রয়েডকে পরিত্যাগ করে অডেন খৃষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আলঙ্কারিক নিপুণতা আরও বাড়িয়ে তোলেন। এলিয়টের অধ্যাত্মদর্শনকেও বহুল পরিমানে অনুসরণ করেন। বিশ্বাস ও মনোভাবের পবিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর সৃজনশীল কবিত্বশক্তি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

অডেনের প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থের নাম 'কবিতাগুলি' (Poems—১৯৩০); 'বক্তাগণ' (The Orators—১৯৩২); 'কবির জিহ্বা' (The Poet's Tongue —১৯৩৫); 'হে আগন্তুক, দেখ' (Look Stranger—১৯৩৬); 'হালকা পদ্যের অক্সফোর্ড সংস্করণ' (Oxford Book of Light Verse—১৯৩৮) এবং 'অন্যদিন' (Another Time—১৯৪০)।

স্টিফেন স্পেণ্ডার (Stephen Spender) ১৯০৯—১৯৯৫

স্পেণ্ডার অডেনের মতই কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী হয়েছিলেন। তিনিও স্পেনে গিয়েছিলেন এবং সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বামপন্থী বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি

সব সময়ে এক অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মসমীক্ষা বজায় রেখেছিলেন। এর ফলে তাঁর কবিতায় প্রায় কোন ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দীপনা প্রকাশ পায়নি। গোষ্ঠীগত স্বার্থপ্রণোদিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়েই ছিলেন, কিন্তু কবিতায় শিল্পসচেতনতা বজায় রাখাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালে 'কবিতাবলী' (Poems), ১৯৩৪ সালে 'ভিয়েনা' (Vienna), ১৯৩৯ সালে 'স্থির কেন্দ্র' (Still Centre), ১৯৪২ সালে 'ধ্বংশ ও দিব্যদৃষ্টি (Ruins and Visions), ১৯৪৬ সালে 'উৎসর্গের কবিতা' (Poems of Dedication), এবং আরও কিছু কবিতা তিনি লিখেছিলেন।

ডাইল্যান টমাস (Dylan Thomas) ১৯১৪—৫৩

ডাইল্যান টমাস দক্ষিণ ওয়েলসের সোয়ানসিতে (Swansea) জন্মেছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে, সংবাদপ্রচারক সংস্থার কর্মী হিসাবে, রেডিও এবং সিনেমার জন্য নাটকের লেখক হিসাবে, নানাভাবে তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন।

১৯১৪ সালে জন্মেছেন। কাজেই প্রথম মহাযুদ্ধের কোন ধারণা তাঁর থাকার কথা নয়। কিন্তু দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে জীবিকার সঙ্কট, বিশ্বাসের সঙ্কট এবং সাহিত্যের বিমূঢ় অবস্থা তিনি দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন। তিনি কিন্তু এলিয়টের 'অব্যবহার্য জমিকে' (Waste Land) ব্যবহার্য করবার জন্য তত প্রয়াসী হননি। অন্তর্বর্তী সময়ের পরিস্থিতিও তাঁর কাছে সম্পূর্ণ হতাশার পরিস্থিতি নয়। তিনি সেই অবস্থাতেও কবিতার উদ্বর্তনের (survival) শক্তিকে বুঝেছিলেন। তাই তাঁর আক্ষেপ ততটা ছিল না, যতটা ছিল কবিতাকে টিকিয়ে রাখবার আন্তরিক ইচ্ছা।

এই ইচ্ছার অনুসরণে ডাইল্যান টমাস এবং তাঁর সমকালীন কয়েকজন কবি স্যারিঅ্যালিজম এর ধারায় চলে এসেছিলেন। এটি একটি ফরাসী সাহিত্যিক আন্দোলন। ইংরাজী সাহিত্যে এই ধারার প্রবর্তক স্যার হরবার্ট এডওয়ার্ড রিড (Sri Herbert Edward Read ১৮৯৩—১৯৬৮)। বাস্তবক্ষেত্রে স্যারিঅ্যালিজম-এর (Surrealism) মানে হচ্ছে এই যে যা আমাদের মনের ভিতর থেকে উদ্গত হয়ে আসতে চায় তাকে সচেতন নিয়ন্ত্রনে না রেখে বা কোনরকম বাছবিচার না করে সাহিত্যে প্রকাশ করা। কাজে কাজেই ডাইল্যান টমাসের কবিতা যে কিছুটা বিশৃঙ্খল দেখাবে এটা খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, চিত্রকল্পের (Image) কথা বলতে গেলে বাইবেলের চিত্রকল্প এবং যৌন-বিষয়ক চিত্রকল্প তাঁর কবিতায় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

ডাইল্যান টমাস এ্যাপোক্যালিপটিক (Apocalyptic) অর্থাৎ 'রহস্যোদ্ঘাটন' বা অর্ধপ্রকাশিত অর্ধআচ্ছাদিত রহস্যময় প্রকাশের আন্দোলনের পুরোধা। এই আন্দোলনে ব্যক্তি বা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুপ্ত স্বরূপের রহস্যময় প্রকাশ কবিকে চমৎকৃত করে। এই আন্দোলন সাধারণতঃ কবির নিজের স্বরূপসম্পর্কিত। এটি এক ধরনের আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন যেহেতু কবির নিজের কাছেই সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট নয়, তাই এই ভাবের কবিতাতে সুষ্ঠু শৃঙ্খলা থাকতে পারে না।

স্বল্পজীবনের মধ্যেই ডাইল্যান টমাস গুণী মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এডিথ

সিটওয়েল তাঁকে বলেছিলেন 'সর্বতোভাবে মহান কবি।' স্টিফেন স্পেণ্ডার তাঁকে বলেছিলেন 'প্রতিভা'। হার্বার্ট রিড তাঁর কবিতাকে বলেছিলেন 'গুণাতীত' (Absolute)।

আবার, বিরুদ্ধ কথাও কিছু আছে। ডাইল্যান টমাসের লেখায় একটানা একই ভাবের অনুসরণ নেই, কোথাও কোথাও এলোমেলোভাবে বক্তব্যকে রাখা হয়েছে।

তবে স্টিফেন স্পেণ্ডার ডাইল্যান টমাসের ১৯৪৬ সালের 'মৃত্যু ও প্রবেশ' (Deaths and Entrances) কাব্যগ্রন্থে যে কৌশল ও ভাবের সমাঞ্জস্য দেখেছিলেন তার শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করেন।

বুদ্ধির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার এবং যেন বুদ্ধিমানের জন্যই কবিতা এই ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন টমাস। বলা চলে যে তিনি এবং তাঁরই মত অপর কয়েকজন পঞ্চাশের দশকে রোম্যাণ্টিকতাকে কবিতায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আর ওয়েলসের মানুষের, ভাবে ও ভাষায়, রোম্যাণ্টিক না হয়ে উপায়ই বা কি ছিল!

১৯৩৪ সালের '১৮টি কবিতা' (18 poems), ১৯৩৬ সালের '২৫টি কবিতা' (25 Poems), ১৯৩৯ সালের 'প্রেমের মানচিত্র' (The Map of Love) এবং ১৯৪৬ সালের 'মৃত্যু ও প্রবেশ' (Deaths and Entrances) ডাইল্যান টমাসের প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থ।

জীবিতকালে রূপকথার নায়ক ডাইল্যান টমাসের অমর উক্তি পুণর্ঘোষণা করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি—

'নেই কোন অধিকার মৃত্যুর'
(Death shall have no dominion)।

আমরা এখানেই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরাজী কবিতার ধারা অনুসরণ শেষ করলাম। সংক্ষিপ্ত এবং অতিমাত্রায় অসম্পূর্ণ। কত বিষয়, কত ধারা, কত কবি, কত কবিতা বাদ রয়ে গেল তার ইয়ত্বা নেই। যেমন, প্রকৃতিসংক্রান্ত আধুনিক কবিতা। উইলিয়ম হেনরী ডেভিসের (William Henry Davies ১৮৭১—১৯৪০) নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই আসে। এই 'মহাপথিকের' (Super Tramp) 'কবিতাসমগ্র' (Collected Poems) প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। ইনি প্রকৃতির কলেবরকে প্রকৃতির আত্মার থেকে কম দর্শনীয় মনে করেন নি। অথবা এডওয়ার্ড টমাস (Edward Thomas ১৮৭৮—১৯১৭)। ইংল্যাণ্ডের পল্লী অঞ্চলকে তিনি প্রাণ ঢেলে ভালবেসে ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ইংল্যাণ্ডের পল্লী অঞ্চলের যে শান্ত সৌন্দর্য ছিল—সচরাচর নানা দৃশ্য, মানুষ, পাখী—এ সব কিছু—স্বচ্ছ স্ফটিকের মত তাঁর কবিতাতে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই রকম আরও অনেক কিছু আমার লেখায় রাখা যায়নি। আক্ষেপ থাকলেও যদি পাঠক আমার বিবরণের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রণোদিত হয়ে আরও জানবার, আরও পড়বার ইচ্ছা করেন, তবেই পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

এরপরে আমরা আসব নভেল বা উপন্যাসের কথায়। আমাদের আলোচ্য সময় ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

এব আগেব পবে অর্থাৎ আধুনিক যুগের তৃতীয পর্বে (১৬৫১—১৮০০) আমরা উপন্যাসেব বিশেষত্ব, ইংবাজী সাহিত্যে তাব স্থান, তার সূচনা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাস সম্বন্ধে কথা বলেছি। সেখানে পূর্ব-ইতিহাস ছাড়াও স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯--১৭৬১), হেনরী ফিল্ডিং (১৭০৭—১৭৫৪), লরেন্স স্টার্ণ (১৭১৩ ১৭৬৮), টবিযা স্মলে (১৭২১—১৭৭১), অলিভার গোল্ডস্মিথ (১৭২৮ ১৭৭৪), হোবেস ওযালপোল (১৭১৭—১৭৯৭) এবং এ্যান র‍্যাডক্লিফেব (১৭৬৪— ১৮২৩) সম্বন্ধে আলোচনা কবেছি।

স্যাব ওযাল্টাব স্কট (১৭৭১—১৮৩২) এবং জেন আস্টিনের (১৭৭৫—১৮১৭) সম্বন্ধে সেখানে আলোচনা করা হযনি; কাবণ এঁদের উপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীতেই প্রকাশিত হযেছিল। এদেব কথা এই পর্বে বলা হবে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প (Novel and Short Story)

স্যার ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott) ১৭৭১-১৮৩২

ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক ওয়ালটার স্কট ১৭৭১ সালে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরাতে জন্মেছিলেন। প্রথম দিকে তিনি কবিতা লিখতেন। ওই সময়ের কবিতাগুলির মধ্যে আছে ১৮০৫ সালে লেখা 'শেষ গায়কের গান' (The Lay of the Last Ministrel) এবং ১৮০৮ সালের 'মারমিয়ন' (Marmion), ১৮১০ সালের 'হ্রদের অধিষ্ঠাত্রী' (The Lady of the Lake) এবং অন্যান্য কবিতা।

১৮১৪ সাল থেকে তিনি কবিতা লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। ১৮১৪ সালেই স্কট 'ওয়েভারলি' উপন্যাস লেখেন (Waverly)। এরপর থেকে তিনি একের পর এক উপন্যাস লিখতে থাকেন। ১৮১৮ সালে লেখেন 'এডিনবরার জেলখানা' (The Heart of Midlothian) এবং ১৮১৯ সালে 'ল্যামারমুরের কনে' (The Bride of Lammermoor)। ১৮২০ সালে লেখেন 'আইভ্যান হো' (Ivan Hoe), ১৮২১ সালে 'কেনিলওয়ার্থ' (Kenilworth) এবং ১৮২৮ সালে লেখেন 'পার্থের সুশ্রী মেয়ে' (The Fair Maid of Perth)।

স্কট ছিলেন একজন সুনিপুণ গল্প লেখক। গল্পগুলি প্রায়ই অতীতের (ছশো বছর সময়ের মধ্যে) নানা মানুষকে নিয়ে। কিন্তু স্কট তাদের প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক পরিবেশের কথা কোথাও বলতে ভোলেননি। স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণের সীমান্ত অঞ্চলের প্রচলিত অনেক কাহিনী তাঁর গল্পের বিষয় হয়েছিল। সেগুলিতে ঐতিহাসিকতা হয়ত সঠিক অর্থে থাকেনি—কারণ ঐতিহাসিক এবং উপন্যাসকার এক নন—কিন্তু যুগ ও পরিবেশেব বর্ণনায় তিনি সাহিত্যিক সত্যতা বজায় রেখেছিলেন। অতীত যুগকে এবং সে সব সময়ের মানুষকে ছবির মত সুন্দর করে সাহিত্যে ধরে রাখার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না।

অতীত ইতিহাস যে শুধু দলিল-দস্তাবেজ, প্রমান-নিদর্শন, সন্ধি-বিগ্রহ নয়,— তা যে জীবন্ত মানুষের অস্তিত্বে প্রাণবন্ত তা স্কট তার উপন্যাসগুলিতে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সত্যকারের ইতিহাস, সত্যকারের ঐতিহাসিক উপন্যাস হচ্ছে তা-ই যা অতীতের মানুষ এবং তাদের কার্যকলাপকে স্পষ্টতায় ও সজীবতায় আমাদের চোখের সামনে আবার হাজির করাতে পারে।

স্কটল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বকে তিনি সাহিত্যের সীমানায় ধরে রেখেছেন। বা অন্যভাবে বলতে গেলে, —দুটি দেশের অতীত রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসকে তিনি সাহিত্যের আদর্শে তাঁর নানা উপন্যাসে পুণর্গঠিত করেছেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও তিনি মধ্যযুগকে তাঁর পাঠকের উপযোগী করে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বর্ণিত কালের দূরত্বকে তিনি ব্যবহার করেছেন রোম্যাণ্টিকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায়। তাই তিনি একজন রোম্যাণ্টিক ঔপন্যাসিক।

স্কট চরিত্রগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেননি। ঘটনার স্রোত এই সূক্ষ্মতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, —স্কট তা জানতেন। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও এইটাই। স্কটের উপন্যাসগুলির আরও একটি বড় আকর্ষণ বীরত্বপূর্ণ নানা ঘটনাকে প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহাব এবং সেগুলির রোম্যান্টিক বর্ণনা।

আজ প্রায় দুশো বছর বাদেও যেমন কবিতায় বায়রণ তেমনি উপন্যাসে স্কট, ইংল্যাণ্ডের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিচারে, তাঁদের নিজেদের যুগের ইংরাজী রোম্যান্টিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। খোদ ইংল্যাণ্ডে কিন্তু তাঁদের এইভাবে দেখা হয় না।

আমাদের বর্তমান যুগের যান্ত্রিকতা এবং অসাড়তার মধ্যে এখনও প্রাণসঞ্চার করতে পারে স্কটের উপন্যাসের শক্তি ও মাধুর্য। স্কটের উপন্যাসের মত ঐতিহাসিক, সুন্দর, প্রাণবন্ত সাহিত্য আমাদের যেন স্মরণ করিয়ে দেয়, আমরা বহুযুগ ধরে বেঁচে আছি; সুন্দর হয়ে বেঁচে আছি।

জেন অস্টেন (Jane Austen) ১৭৭৫-১৮১৭

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে উপন্যাস লেখার চেষ্টায যেটুকু যা লেখা হযেছিল বা হচ্ছিল তাকে গল্পের সঙ্গে প্রচুর আবেগ মিশিয়ে এক ধরনের গদ্য লেখা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। বর্তমান কালের উপন্যাসের সঙ্গে তার খুব বেশী মিল ছিল না। তবে সেগুলিকে মর্যাদা দেওয়া হয প্রধানতঃ তিনটি কারণে। —[১] সেগুলি প্রথম দিকের লেখা, [২] কিছু না কিছু গল্প লেখার প্রচেষ্টা, এবং [৩] বুভুক্ষু পাঠকপাঠিকাদের কাছে অনেকক্ষণ সময কাটানোর মত হালকা ধরনের কিছু গদ্য লেখা। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কিছুটা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির উপর ওই সব বইয়ের উপযোগিতা নির্ভর করত। ওই সব বইয়ের স্বকীয় মূল্য তেমন কিছুই ছিল না।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে জেন অস্টেনের লেখার ভিতরে ক্লাসিক সংযম ও শৃঙ্খলা, শক্ত ভিত্তি এবং কাঠামো, আর বেশ স্পষ্ট চরিত্রচিত্রণ পাওয়া গেল। নাটকীয নিয়মবদ্ধ গঠনের মত কিছু, বিশেষ করে কথোপকথনের প্রত্যাশিত স্বাভাবিকতা, যা তাঁর উপন্যাসগুলিতে পাওয়া গেল তা দিয়ে উদ্দেশ্যের সরাসরি অনুসরণ এবং লেখিকার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ বেশ জোরালভাবে বোঝা গেল। জেন অস্টেনকে বলা হয়েছিল 'নারীসুলভভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর লক্ষণবিশিষ্ট' বা ক্লাসিক। তাঁর উপন্যাসে গ্রামাঞ্চলের মোটামুটি বর্ধিষ্ণু অংশের সামাজিক, পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র সঠিকভাবে ফুটে উঠেছিল। ওই সব উপন্যাসেই প্রথম উদ্দীপ্ত মানুষিক হৃদয়ের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু তিনি দরিদ্রের জন্য লেখেননি। সরল বা আদিম কোন কিছু উপাদান তাঁর লেখায় নেই। সমসাময়িক কালের দার্শনিক চিন্তাও তাঁর লেখায় ব্যক্ত হয় না। কিন্তু তাঁর চরিত্রগুলি তাঁর যুগেরই এবং নিজের অভিজ্ঞতার যেটুকু তিনি তাঁর লেখায় রেখেছিলেন তা সুসংবদ্ধ এবং অধিকাংশ মানুষের চরিত্রের সঙ্গে মানানসই।

জেন অষ্টেনের প্রথম লেখা উপন্যাস 'অহমিকা ও প্রতিকূল ধারণা' (Pridc and Prejudice) ১৮১৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা' (Sense and

Sensibility) পরে লেখা হলেও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১১ সালে। এরপর ১৮১৪ সালে 'ম্যানসফিল্ড পার্ক' (Mansfield Park), ১৮১৬ সালে 'এম্মা' (Emma), এবং ১৮১৮ সালে 'প্রবৃত্তকরণ' (Persuasion) প্রকাশিত হয়। তাঁর উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটিতে রয়েছে আত্মশিক্ষণ এবং আত্মসংশোধন।

জেন অস্টেনের উপন্যাসগুলির চটক তেমন নেই, কিন্তু অন্তর্নিহিত সারবস্তু রয়েছে। সেগুলির স্বীকৃতি পেতে কিছু দেরী হয়েছিল ; কিন্তু তা পাওয়ার পরে আর তাদের সমাদরের ওঠাপড়া কিছু হয়নি।

জেন অষ্টেনের একটি উপন্যাসের কাহিনী সংক্ষেপে এখানে বলব।

অহমিকা ও প্রতিকূল ধারণা (Pride and Prejudice)

এই উপন্যাসটি ১৭৯৬ সালে শুরু করা হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'মনের উপরে প্রথম ছাপ' (First Impressions)। সেই লেখাটি পাওয়া যায় না। প্রথম লেখাটি পুনরীক্ষণ করে বর্তমান আকারে আনা হয়েছিল। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৩ সালে। গল্পটি এইরকম :—

বেনেট দম্পতি এবং তাঁদের পাঁচ কন্যা হার্টফোর্ড সায়ারের লংবোর্ণে থাকে। পুরুষ উত্তরাধিকারী কেউ না থাকায় আইনানুযায়ী ভূসম্পত্তি উইলিয়ম কলিন্স বলে এক কুটুম্বের হাতে চলে যাবে।

কেন্ট প্রদেশে ওয়েষ্টার্ণহামের নিকটে রোসিংস নামক স্থানের প্রতিপত্তিশালিনী কিন্তু অহঙ্কারী মহিলা লেডি ক্যাথাবিনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই উইলিয়ম কলিন্স কাছাকাছি একজন গ্রাম্য যাজকের অধীনে থাকবার সুযোগ পেয়েছিল। লেডি ক্যাথারিনের ভাগ্নে ধনী অবিবাহিত যুবক চার্লস বিংলি ল্যাংবোর্ণের কাছে নেদারফিল্ড পার্ক বলে একটি বাড়ী কেনে। সেখানে সে তার দুই বোন এবং বন্ধু ফিজউইলিয়ম ডার্সিকে নিয়ে আছে। বেনেটদের বড় মেয়ে জেনের সঙ্গে বিংলির ঘনিষ্ঠতা হয়। আবার ডার্সির কাছে জেনের পরের বোন এলিজাবেথের আকর্ষণ ছিল ; কিন্তু ডার্সির উন্নাসিকতাব দরুণ এলিজাবেথ তার প্রতি বিরূপ হয়। স্থানিক সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার উইকহাম ডার্সির সম্বন্ধে ভুল তথ্য দেওয়ায় এলিজাবেথের এই বিরূপতা আরও বেড়ে যায়। মিসেস বেনেট এবং তাঁর ছোট মেয়েদের ব্যবহারের দরুণ বিংলি ও জেনের সম্পর্কও বেশী দিন টেকে না। লেডি ক্যাথারিন কলিন্সকে বিয়ে করতে বলায় সে সততার সঙ্গেই সেই আদেশ পালন করতে যায় এবং এলিজাবেথের কাছে প্রস্তাব করে। এলিজাবেথ সে প্রস্তব নাকচ করে দেয়। সে তখন এলিজাবেথেরই বান্ধবী শার্লো লুকাসের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, এবং শার্লো তাতে সম্মতি দেয়। বিয়ের পর তারা গীর্জাসন্নিহিত বাসভবনেই থাকে।

এলিজাবেথের সঙ্গে ডার্সির আবার যোগাযোগ ঘটে। কিন্তু এবারেও ডার্সির কথাবার্তা সুবিধাজনক ছিল না। সুতরাং যথাবিহিত এলিজাবেথ ডার্সির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এলিজাবেথ জানায় যে জেন এবং বিংলির সম্পর্কে ফাটল ধরানোর জন্য ডার্সিই দায়ী। উইকহামের সঙ্গেও ডার্সি দুর্ব্যবহার করেছিল এরকম কথা এলিজাবেথই ওঠায়। চিঠি

লিখে ডার্সি দুটি আভিযোগেরই জবাব দেয়। এরপর এলিজাবেথ পেমবার্লিতে যায় মামার বাড়ীতে। এই পেমবার্লিতে ডার্সিরও বাড়ী। সেখানে ঘটনাচক্রে এলিজাবেথদের সঙ্গে ডার্সির দেখা হয়ে যায়। ডার্সি এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে এবং নিজের বোনের সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এই সময় খবর আসে যে এলিজাবেথের আর এক বোন লিডিয়া উইকহামের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। ডার্সি এদের খুঁজে বার করে এবং এদের বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিংলির সঙ্গে জেনের সম্পর্ক আবার ভাল হয়ে যায় এবং তারাও পরস্পরের বাগদত্ত হয়। অন্য দিকে লেডি ক্যাথারিনের উদ্ধত ব্যবহারের দরুণ এমন এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় যার জন্য ডার্সি এবং এলিজাবেথও বাগদত্তা হয়। জেন এবং এলিজাবেথেব বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়ে গল্পটি শেষ হয়। লেডি ক্যাথারিনও সব কিছু মেনে নেন।

উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে (William Makepeace Thacheray) ১৮১১-১৮৬৩

উইলিয়মের বাবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ২৪ পরগণার কালেক্টর ছিলেন। উইলিয়ম থ্যাকারে কলকাতার ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিটের (বর্তমান নাম মির্জা গালিব ষ্ট্রিট) একটি বাড়ীতে জন্মেছিলেন। থ্যাকারের প্রথম বই 'স্নবদের কথা (The Book of Snobs) ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। স্নব (Snob) সেইরকম লোককে বোঝায় যে গরীবকে অবজ্ঞা করে এবং বড়লোকদের খুব প্রশংসা করে। ১৮৪৭ সালে থ্যাকারের সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'অসার দম্ভের মেলা' (Vanity Fair)প্রকাশিত হয়। বই হিসাবে প্রকাশিত হবার আগে এটির একটি উপ-শিরোনামা ছিল, —'কলম এবং পেন্সিল দিয়ে তৈরী ইংরাজী সমাজের নক্সা' (Pen and Pencil sketches of English Society)। পরে এই উপ-শিরোনামটি পালটে দেওয়া হয। তখন বলা হয় এটি একটি 'নায়কহীন উপন্যাস' (A novel without a Hero)। পরে আরও যে সব উপন্যাস প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হেনরী এসমণ্ড (Henry Esmond—১৮৫৫)।

থ্যাকারে তাঁর লেখকজীবনের আরম্ভ থেকেই প্রখর পর্যবেক্ষণ, কৌতুকবোধ, ব্যঙ্গ, কারুণ্য এবং আরও অনেক গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। খুব ভাল গদ্য লেখার শক্তিও যেমন তাঁর ছিল, তেমনি তাঁর কবিসুলভ গুণও ছিল।

থ্যাকারে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও চরিত্রগুলির আত্মসমীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীকেও উপলব্ধি করতেন। একদিক থেকে থ্যাকারে ছিলেন বিষণ্ন ও দোষদর্শী; থ্যাকারে 'স্নব' (Snob)-দের কথা বেশী বলেছেন কারণ তিনি ছিলেন বাস্তববাদী ও নীতিবাদী। সম্মান এমন একটা জিনিষ যা প্রতিটি মানুষের নিজের চরিত্রের ভিতর থেকেই আসতে পারে, বাইরের কোন সাজান উপকরণ থেকে নয়। তাঁর সময়ের ইংরাজদের অনেকের ভিতর 'সম্মান' সম্বন্ধে এই সঠিক ধারনার অভাব থ্যাকারে দেখেছিলেন। তিনি তাদের ওই সচেতনতা আনিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনেক চরিত্রকে যে হাস্যকর করে দেখিয়েছেন তা মানুষকে ছোট করবার জন্য নয়, বরঞ্চ আঘাত করে তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য।

থ্যাকরের লেখা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য সুপরিণত ও সুদক্ষ লেখা। তাঁর পরিণত লেখাগুলির পিছনে মক্‌শ করার এবং অনুশীলন করার ধৈর্যশীল চেষ্টা ছিল। অভিজ্ঞতা এবং সুপরিণত চিন্তা উপন্যাসের বক্তব্য এবং গঠনশৈলীর পিছনে কাজ করে। সাহিত্য একটা শিল্প এবং প্রতিটি শিল্পেই শিক্ষানবিশীর দরকার। থ্যাকারের সাহিত্যিক জীবনে তা ঠিকঠিকই ঘটে গিয়েছিল।

এই সব বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা থ্যাকারের 'অসারদম্ভের মেলা' (Vanity Fair) উপন্যাসটির আলোচনা করতে পারি।

অসারদম্ভের মেলা—(Vanity Fair—১৮৪৭)

'অসার দম্ভের মেলা' (Vanity Fair) উপন্যাসে লেখার স্টাইল এবং লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও বিজ্ঞতা সকলেরই নজরে পড়ে। লেখকের বিশেষ অধিকার সর্বক্ষেত্রেই এইটাই যে তিনি তাঁর চরিত্রগুলির গোপন ও প্রকাশিত অস্তিত্বের সবটাই জানেন। কাজেই সৎ লেখক এবং সুবিবেচক লেখক তাঁর কোন চরিত্রকেই সর্বতোভাবে নিখুঁত করবেন না। এই বিশেষ বিজ্ঞতার অনুবর্তী হলে দেখা যাবে যে কারোকেই সর্বতোভাবে অনিন্দ্যনীয় চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় না। এই যুক্তিটাই 'অসার দম্ভের মেলা'-র উপ-শিরোনামা—নায়ক ছাড়া উপন্যাস' (Novel without a hero) দেওয়ার ব্যাপারে কাজ করেছে। থ্যাকারে বলেছেন (হয়ত সর্বাংশে কথাটি ঠিক নয়) : 'বিজ্ঞ যে সে কত দুর্বল ; বৃহৎ যে সে কত ক্ষুদ্র!' খুব বড রকমের দুটি একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মানুষই সাধারণ—দোষগুণ সকলেরই আছে—প্রকাণ্ড বা মহত্তম প্রায় কেউই নয়। থ্যাকারের উপন্যাস পড়তে গেলে এটা মনে রাখতে হবে।

থ্যাকারে রোম্যান্স এবং ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই তিনি স্কট এবং ডিকেন্সের বিরুদ্ধেও যেন এক শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া।

তবে এটাও ঠিক 'অসার দম্ভের মেলা' উপন্যাসে সমস্ত জগৎকেই ব্যঙ্গ করা হয়নি। একটা বিশেষ যুগের, বিশেষ সমাজের মানুষের সমালোচনাই তিনি করেছেন, —তার বাইরের মানুষের নয়। থ্যাকারে এও বলেছেন যে মানুষ যখন স্বচ্ছন্দে লোভ, জাঁকজমক এবং আত্মতুষ্টির জগতেই বাস করছে তখন সেখানে ঈশ্বরকে টেনে নিয়ে আসা বেমানান এবং ভণ্ডামি। সুন্দর হও, উপযুক্ত হও, —তবেই ঈশ্বরের কথা বোলো।

থ্যাকারের একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে যে তিনি বিপরীত পরিস্থিতি এবং চরিত্র সৃষ্টি করে সমালোচনা করেন নি। তিনি একটা দিকই দেখেছেন এবং অবশ্যই সেদিকটা ভালভাবেই দেখেছেন।

থ্যাকারে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না ; বরঞ্চ তাঁকে সমাজের 'শিক্ষক' বলা চলে। তিনি নির্দেশ দেননি ; তিনি শুধু বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেছেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল কৌতুক করে দোষ ধরিয়ে দেওয়া।

কাহিনী

উপন্যাসটি দুটি স্পষ্ট করে আঁকা চরিত্রের বৈপরীত্য দেখিয়েছে। একটি রেবেকা শার্প বা বেকি শার্প, এবং দ্বিতীয়টি এমেলিয়া সেডলি। রেবেকা বা 'বেকি' চালাক, অবিবেকী

এবং সাহসী। তার বাবা ছিলেন কপর্দকহীন শিল্পী এবং মা ছিলেন ফরাসী অপেরা-নর্তকী। আর অপর মেয়েটি এমেলিয়া সেডলি, —মোটামুটি সুন্দরী, শান্ত, কথা বলে একটু বোকা-বোকা ধরনে। তার বাবা ধনী ব্যবসায়ী, —রাসেল স্কোয়্যারে বাড়ী। মিসেস পিঙ্কারটনের স্কুলে এরা একসঙ্গে পড়েছিল। বেকি এখানে তার পড়াশুনা ইত্যাদির জন্য টাকা না দিয়ে ছাত্রীদের ফরাসী শেখাত। বেকি প্রথমে এমেলিয়ার ভাইকে বশীভূত করতে চাইল এবং পরে যখন সার পিট ক্রলির বাড়ীতে সে গৃহস্থালীর কাজকর্ম দেখাশোনা করবার জন্য নিযুক্ত হল তখন সে স্বয়ং পিট ক্রলির উপর এবং তাঁর ধনী ভগিনী মিস ক্রলির উপরে প্রভাব বিস্তার করল। স্যার পিট ছিল একজন নোংরা, গোমড়ামুখো বৃদ্ধ। সে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর বেকিকে বিয়ে করতে চাইল, কিন্তু বেকি ইতিমধ্যে গোপনে সার পিটের মেজ ছেলে রডনকে বিয়ে করে বসে আছে। রডন তার পিসীর খুব প্রিয়পাত্র। একথা জানাজানির পর রডনের বাবা এবং পিসী দুজনেই রেগে গেল এবং পিসী রডনকে কিছু দিয়ে যাবে না বলে ঘোষণা করল।

ওদিকে আবার এমেলিয়ার বাবার ব্যবসায়ে খুব ক্ষতি হয়ে গেল। তার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল জর্জ অসবোর্ণের। কিন্তু অসবোর্ণের বাবা এখন গরীব ঘর থেকে মেয়ে আনতে অসম্মত হল। এমেলিয়া মনে খুব আঘাত পেল। কিন্তু জর্জ অসবোর্ণের সহযোগী আর একজন অফিসার ক্যাপটেন ডবিন তাকে বুঝিয়ে সুঝিযে এমেলিয়াকে বিয়ে করতে রাজি করাল। জর্জের বাবার অমতেই বিয়ে হল। এরপর ওয়াটার্লুর যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে জর্জ মারা গেল। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে সে বেকির সঙ্গে একটি সম্পর্কে এসে গেল। বেকির নাম এখন মিসেস রডন ক্রলি।

এরপর ক্রমে ক্রমে বেকি সমাজের আরও উপরতলায় উঠে গেল। দারিদ্র এবং জন্মসূত্রে নিচুঘরের মেয়ে হয়েও বুদ্ধিকৌশল বলে সে প্রথমে প্যারিসের এবং পরে লণ্ডনের অভিজাত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হল। বেকির লোভের এবং উচ্চাকাঙ্খার সীমা ছিল না। সে প্রায়ই দুশ্চরিত্র বৃদ্ধ লর্ড স্টেইনের কাছ থেকে টাকা নিত; তার স্বামী এটা জানত না। বেকির স্বামী রডনের নানা দোষ ছিল, কিন্তু তার সম্মানবোধও ছিল, এবং স্ত্রীকে সে ভালোও বাসত। এখন সে বাধ্য হয়ে বেকির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করল।

ইতিমধ্যে, স্বামী মারা যাওয়াব পর এমিলিয়া তার বাপের বাড়ীতেই থাকত। তার বাপ-মাও নিরুপায়। এমিলিয়াকে মনোকষ্ট, দারিদ্র, অপমান সবই সহ্য করতে হচ্ছিল। তার স্বামীর বন্ধু ডবিন কিন্তু তাকে গোপনে সাহায্য করত এবং সান্ত্বনা দিত। এমেলিয়া তার শিশুপুত্রকে তার ঠাকুরর্দার কাছে রেখেছিল, —যদি তিনি কিছু সাহায্য করেন এই আশায়। ডবিন ভারতবর্ষে ছিল। দশ বছর বাদে সে দেশে ফিরল। কিন্তু এমেলিয়া যদিও ডবিনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, তবু সে তাকে বিয়ে করতে পারল না। তার মৃত স্বামীর কথা মনে করে।

এদিকে বেকির এখন সমাজে খুবই অখ্যাতি। সে হঠাৎ একসময়ে এমিলিয়ার কাছে তার মৃত স্বামী জর্জ অসবোর্ণের তার প্রতি অবিশ্বস্ততা প্রকাশ করে দিল। এমেলিয়া মনে খুব আঘাত পেল। এখন আর ডবিনকে বিয়ে করতে তার কোন আপত্তি থাকল না।

আসল কাহিনী এইখানেই শেষ। অন্যান্য বহু চরিত্র এবং তাদের নানা কার্যকলাপ নিয়ে বেশ জমজমাট গল্প।

চার্লস ডিকেন্স (Charles Dickens) ১৮১২-১৮৭০

ইংরাজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের খ্যাতি জগদ্‌ব্যাপী। আজ একশ বছরের উপর হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সেকালেও যেমন ছিল আজও তেমনই আছে।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য এবং ভ্রমণকারীদের আকর্ষণের জন্য গ্রেটবৃটেনের নানা জায়গায় বাৎসরিক উৎসব হয়। এ ব্যাপারে উত্তর কেন্টের রোচেষ্টারের (Rochester) নাম করা চলে সকলের আগে। এখানেই তিনি বড হয়েছিলেন। তাঁর নানা উপন্যাসের কাহিনীও গড়ে উঠেছিল এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গতঃ, ডিকেন্স পোর্টসমাউথে (Portsmouth) জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন সেখানকার জাহাজঘাটায় নৌবিভাগীয় কর্মচারী। ডিকেন্স হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় বৃটিশ ঔপন্যাসিক। তাঁর অনুপ্রেরণা ছিলেন টবিয়া স্মলে (Tobias Smollett ১৭২১—৭১)। এর আগের পর্বে আমরা স্মলের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ১৮৩৭ সালে পিকউইক পেপার্সের (Pickwick Papers) প্রকাশনা থেকেই ডিকেন্সের খ্যাতি শুরু হয়েছিল।

প্রথমদিকের উপন্যাসগুলি স্মলের উপন্যাসের ধারায় ভ্রমণ, অভিযান ও যাযাবরের মত স্থান পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে নানা ঘটনায় গাঁথা গল্প। অতি জনপ্রিয় উপন্যাস 'ডেভিল কপারফিল্ড' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

১৮৫২—৫৩ সালে লেখা 'নিরানন্দপুরী' (Bleak House) থেকে নতুন পর্যায় শুরু। কেন্ট প্রদেশে 'ব্রডস্টেয়ার্স' (Broadstairs) বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে একটি টিলার উপরের একটি বাড়ীকে উপলক্ষ্য করে সেই জায়গাতেই ডিকেন্স 'নিরানন্দপুরী' (Bleak House) লিখেছিলেন। বাড়ীটি এখনও আছে। এই ব্রডষ্টেয়ার্সেরই আর একটি বাড়ীকে দেখান হয় এই বলে যে সেখানেই 'ডেভিড কপারফিল্ডের' বেটসি ট্রটউড (Betsey Trotwood) থাকতেন।

প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে যেমন ব্যক্তি বা চরিত্রগুলিই ছিল কাহিনীর বিভিন্ন অংশের যোগসূত্র, দ্বিতীয় পর্যায় থেকে কিন্তু সুসংলগ্ন প্লট (Plot) বা আখ্যানের সুপরিকল্পিত ধারাবাহিকতা ভিত্তি ও যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে।

প্রথম জীবনে ডিকেন্স 'মর্নিং ক্রনিকল' (Morning Chronicle) পত্রিকার একজন রিপোর্টার ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর কিছু কিছু লেখাও ছাপা হত। তাঁর লেখকজীবন এইভাবে শুরু হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'স্কেচেস বাই বজ' (Sketches By Boz) খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'পিকউইক পেপার্সেরও' (Pickwick Papers) সূত্রপাত ১৮৩৬ সালে।

১৮৩৭ সালে প্রকাশিত হয় 'অলিভার টুইস্ট' (Oliver Twist)। তারপর একে একে আসে 'নিকোলাস নিকলবি' (Nicholas Nickleby—১৮৩৮), 'দি ওল্ড কিউরিঅসিটি শপ' (The Old Curiosity Shop—১৮৪০), 'বার্ণাবি রুজ (Burnaby

Rudge—১৮৪১), 'মার্টিন চাজ্‌লইট (Martin Chuzzlewit—১৮৪৩), 'এ ক্রিসমাস ক্যারল' (A Christmas Carol—১৮৪৩), 'ডম্বে এণ্ড সন' (Dombey and Son—১৮৪৬) এবং 'ডেভিড কপারফিল্ড (David Copperfield—১৮৪৯)।

এরপর তাঁর লেখক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। এই সময়ে তিনি লেখেন 'ব্লিক হাউস' (Bleak House—১৮৫২), 'হার্ড টাইমস (Hard Times—১৮৫৪), 'লিটল ডরিট (Little Dorrit—১৮৫৫), 'এ টেল অব টু সিটিজ (A Tale of Two Cities—১৮৫৯), 'গ্রেট এক্সপেকটেসনস (Great Expectations—১৮৬০) এবং 'আওয়ার মিউচুয়্যাল ফ্রেণ্ড' (Our Mutual Friend—১৮৬৪)।

এই সব গ্রন্থের প্রত্যেকটিই অতিশয় জনপ্রিয়। এখানে নাম করা হল না এরকম আরও কয়েকটি গ্রন্থও ছিল। মৃত্যুকালেও তাঁর 'দি মিষ্ট্রি অব এডউইন ড্রুড' (The Mystery of Edwin Drood) মাসে মাসে প্রকাশিত হয়ে চলছিল। তবে সেটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বা তারও পরে ডিকেন্স ছিলেন ইংরাজী উপন্যাসের প্রাণপুরুষ। ওই যুগে পাঠকের চাহিদা মেটানোর জন্য একজন লেখককে একাধারে দার্শনিক, কৌতুক রসবিদ্, মনস্তাত্তিক, শিল্পী এবং সর্বোপরি গল্পকার হতে হত। তাই সে যুগে পাঠক যা চাইত তা-ই তিনি লিখেছিলেন তা নয়, পাঠক যা চাইত তা তিনিও চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ পাঠক তাঁর কাছে যেন দেবতার মত ছিল। 'সাধারণ' কথাটির মানে 'কিছুটা হীন'—এটা কোনভাবেই তাঁর চিন্তায় ছিল না। কথাটির মানে তাঁর কাছে ছিল 'সকলে' বা 'সকলের প্রতি প্রযোজ্য'। কাজেই তিনি সাধারণ মনের মানুষ ছিলেন না ; ছিলেন সকলের মনের মানুষ। আর এই 'সাধারণ' বা 'সকল' মানুষের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত। এই মধ্যবিত্তরা কিন্তু বিগতযুগের গ্রামীন সংস্কৃতিকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেননি। এই মধ্যবিত্ত পাঠক অনেক কিছু বুঝতেন, অনেক কিছু চাইতেন, —কিন্তু সে সবের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, করতে চাইতেনও না।

ডিকেন্স, থ্যাকারে এবং সে যুগের অন্য ঔপন্যাসিকদেরও গণ্ডীবদ্ধবুদ্ধির পাঠকদের নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। এই সব পাঠকদের কতকগুলি অলিখিত নীতি নির্দেশ ছিল লেখক বা ঔপন্যাসিকের উপর। এটা ছিল একাধারে তাঁদের দুর্বলতা এবং তাঁদের অধিকার। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিককে এগুলি মেনে চলতে হত।

ডিকেন্সের গদ্য স্টাইলের মধ্য থেকে বর্ণিত বিষয়ের ছবি খুব স্পষ্ট দেখা যেত। কথা বলবার, বিষয়ের অবতারণার বা চরিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিকেন্স যে নাটকীয় কৌশল অবলম্বন করতেন তা তৎকালীন পাঠকের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হত। ডিকেন্সের স্টাইলের একটা বড় গুণ ছিল গতিশীলতা। এমনকি, বহুক্ষেত্রে পাঠক একটা জিনিস বুঝতে না বুঝতেই তিনি তরতর করে এগিয়ে যেতেন। তাতে তিনি পাঠকের কোন রকম বিরুদ্ধতা পেতেন না, বরঞ্চ পাঠকের মানোযোগ বেশী করে আকর্ষণ করতেন। এ ছাড়া যে গুণের দরুণ তিনি মহৎ হয়ে আছেন তা তাঁর অপার সহানুভূতি, অফুরন্ত করুণা এবং এক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি।

এ বিষয়ে কথা ফুরোয় না। আমাকে অবশ্যই এক জায়গায় থামতে হবে। আর এতবড় প্রতিভার সবদিক আলোচনা করবার ধৃষ্টতাও আমার নেই।

এবার আমরা ডিকেন্সের লেখা উপন্যাস নিয়ে কথা বলব। প্রথমেই অবশ্য 'পিকউইক পেপার্সের' কথা আসে।

পিকউইক ক্লাবের সম্পর্কে মরণোত্তর নানা কাহিনী
(The Posthumous papers of the Pickwick Club) ১৮৩৬-৩৭
বা সংক্ষেপে 'পিকউইক পেপার্স'

পুস্তক-প্রকাশক সংস্থা 'চ্যাপম্যান এণ্ড হল' (Chapman and Hall) একটা অভিনব পরিকল্পনা করলেন। সাময়িক পত্রিকার ধরনে ছবির মাধ্যমে গল্প তাঁরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবেন। গল্পটি খানাপিনা আমোদ আহ্লাদ নিয়ে হালকা মেজাজের হবে। অবশ্য ছবিই হবে প্রধান। সঙ্গে ছবির পরিচিতি হিসাবে অল্প কথায় গল্পও থাকবে। এই পরিকল্পনা দিয়েছিলেন রবার্ট স্মিথ সুরটিজ (Robert Smith Surtees)। ঠিক হয়েছিল যে জনপ্রিয় ব্যঙ্গচিত্রকর সেমুর (Seymour) ছবি আঁকবেন, আর মন্তব্য লিখবেন চার্লস হোয়াইটহেড (Charles Whitehead)। হোয়াইটহেড দ্রুত একটানা লেখা দিতে পারবেন না বলে মনে করলেন। তিনি তাঁর বন্ধু ডিকেন্সের নাম প্রস্তাব করলেন। ওদিকে প্রথম সংখ্যাটি বেরুনোর পরেই সেমুর আত্মহত্যা করলেন। ছবি আঁকার ভার পড়ল আর একজন চিত্রকর হ্যাবল্ট কে. ব্রাউনের (Habbolt K. Browne) উপর। কিন্তু ডিকেন্সের গল্প এত জনপ্রিয় হল যে ক্রমে সেটাই প্রধান হয়ে উঠল। তবে ব্রাউন, যিনি এই কাজের জন্য 'ফিজ' (Phiz) এই নাম নিয়েছিলেন, তাঁর কাজ বাতিল হয়নি। 'পিকউইক পেপার্স' এর পুরানো সংস্করণে গল্পের সঙ্গে 'ফিজের' আঁকা ছবি দেখা যাবে। শ্রেষ্ঠতম ইংরাজ ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তার সিংহদ্বার পেরনোর এই ছিল পশ্চাদপট।

'পিকউইক পেপার্স' একটি হাস্যরসাত্মক রোম্যান্স শ্রেণীর গল্প। অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ। 'পিকউইক ক্লাবের' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত পিকউইক মহাশয় এবং তাঁর ভৃত্য স্যাম ওয়ালার (Sam Waller) উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল পিকউইক সুন্দর স্বভাবের একজন চমৎকার ভদ্রলোক। ক্লাবের সদস্যদের আনন্দে রাখবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর ভৃত্য স্যাম ওয়ালার নানা পরিস্থিতিতে উপস্থিত-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ক্লাবের সদস্যদের নানা অস্বাচ্ছন্দ্যমূলক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে দিত। কোন অবস্থাতেই পরিস্থিতি গুরুগম্ভীর হয়ে উঠত না। হাস্যরসের ফোয়ারার মুখ খোলাই থাকত।

তবে চরিত্রচিত্রণ বা কৌতুকাবহ ঘটনার জন্য পিকউইক পেপার্সের গুরত্ব নয়, এর গুরুত্ব অন্য কারণে। এইটিই ইংরাজী সাহিত্যে সম্ভবতঃ প্রথম উপন্যাস যাতে সমাজের নীচুতলার এবং মধ্যবিত্তের জীবন এবং ধরনধারণের প্রথম সাহিত্যিক চিত্র পাওয়া যায়।

পিকউইক পেপার্স গল্পের বা গল্পধারার একটি বড় বিশেষত্ব এই যে এটি কোন পরিকল্পিত কাঠামোর লেখা নয়। ডিকেন্স এখানে স্বাধীন ভাবে লিখেছেন। আর সেই কারণেই, অনেকের মতে, এইটিই ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠ রচনা। (অপর আর এক মতে 'ডেভিড কপারফিল্ড' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।) আর যেহেতু পিকউইক পেপার্স-এর গল্প লণ্ডন শহরেই যেন ঘটেছিল, তাই ডিকেন্সকে লণ্ডনের নাগরিক জীবনের প্রথম কাহিনীকার বলা হয়।

আবার এও বলা হয় যে পিকউইক পেপার্স ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম হাস্যরসাত্মক উপন্যাস।

ডেভিড কপারফিল্ড (David Copperfield) ১৮৪৯

ডিকেন্স নিজে ডেভিড কপারফিল্ডকে তাঁব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছেন। এর কাহিনী অংশ পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেবই কাছে জানা। সুতরাং কাহিনী-অংশ আর এখানে লেখা হল না।

এই উপন্যাসটি বহুলাংশে ডিকেন্সের আত্মজীবনী। তাঁর বাস্তবজীবনের সঙ্গে ঘটনাগত মিলের থেকে বেশী প্রণিধানযোগ্য যা তা হচ্ছে এই যে তিনি এই উপন্যাসে তাঁর জীবনকে পুণর্গঠন করেছেন। এইভাবে সুসংস্কৃত তাব বিগত জীবনকে দেখতে তাঁর ভাল লেগেছে।

তবে ডিকেন্সের স্ত্রী এবং তাঁর ছেলে উপন্যাসটি আত্মজীবনী এই ধারণাব প্রতিবাদ করেছেন। তাঁবা বলেছেন, কিছু কিছু ঘটনাব মিল আছে, কিন্তু আত্মজীবনী নয। আসলে হযত, যেহেতু ডেভিড কপারফিল্ড চবিত্রটি আমাদের চোখে একজন সত্যকারের মানুষের মত হয়ে উঠেছে, সুতরাং আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন চরিত্রটির পিছনের বাস্তব উৎস পেতে চেয়েছে।

ডেভিডের জীবনের নানা সুখদুঃখ, ভালমন্দের নানা অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু যে জিনিষটি পাঠকের মনে ধরবে তা হচ্ছে এই যে সুখের বর্ণনায়, দুঃখের বর্ণনায়—সবেতেই জীবনের এক শুভ্র সৌন্দর্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। অনিষ্টকারী একটি চরিত্র (উরিয়া হিপ) এবং দু'একটি দুঃখজনক ঘটনা থাকা সত্ত্বেও এতে কোন নৈতিকতা প্রচারের চেষ্টা নেই, অতিনাটকীয়তা নেই।

বেটসি ট্রটউড (ডেভিডের বাবার পিসী) যেখানে ডেভিডকে উপদেশ দিচ্ছেন,—'জীবনে কখনো নীচ হয়ো না, কখনো মিথ্যাচরণ করো না, কখনো নিষ্ঠুর হয়ো না' তখনো আমরা কোন প্রকট নীতিনির্দেশ দেখি না। যা দেখি তা অপার স্নেহ এবং সুন্দর একটি মন।

এইরকম সুন্দর, সহানুভূতিশীল আব একটি খুব 'ভাল' চরিত্র পেগটি (Peggotty)। 'ভাল' ছাড়া আর কোন বিশেষণই আরও ভাল বলে আমার মনে পড়ছে না।

এ ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে অতিনাটকীযতা সত্ত্বেও একটি অতি সুন্দর, নির্মল, বিদ্বেষহীন, সৎ, আশাবাদী চরিত্র অফুরন্ত আনন্দের উৎস হয়ে আছে। সে চরিত্রটির নাম 'মিকবার'

(Micawber)—ডিকেন্সের কৌতুকপ্রবণতার এক মূল্যবান ফসল। জগতের তাবৎ সাহিত্যের সবচেয়ে কৌতুকময় চরিত্রগুলির মধ্যে এটি একটি। হয়ত সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ আদর্শমাত্রাবিশিষ্ট 'ফলষ্টাফ' (Falstaff) চরিত্র এটি নয়, কিন্তু এই দ্বিমাত্রিক চরিত্র-চিত্রটি যে অসাধারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিকবার নিজে কৌতুক করেন না, পাঠকের কৌতুকবোধকে সঞ্জীবিত করেন। ডিকেন্স এখানে দক্ষ চিত্রকরের মত মোটা তুলি দিয়ে অনায়াসভঙ্গীতে চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এ ছবির মর্যাদা দীর্ঘস্থায়ী।

ডিকেন্সের হয়ত অনেক ত্রুটি ছিল। তাঁর উপন্যাস শুধু কতকগুলি চরিত্রকে একজায়গায় জড়ো করা ; তাঁর ব্যঙ্গ কষ্টকল্পিত ; তাঁর রাজনীতি অবাস্তব ; তাঁর প্লট অকারণে জটিল। কিন্তু তবু মানুষ ডিকেন্স পড়ে এবং বারবার পড়ে। তাঁর উদার মানবিকতা এবং তাঁর বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতা অতুলনীয়।

নানা উপন্যাসে, বিশেষ করে ডেভিড কপারফিল্ডে তাঁর সংযতভাব, মর্যাদাবোধ, কৌতুকসৃষ্টি, সহজসৃষ্ট নানা চরিত্র এবং গল্প বলার অনায়াস দক্ষতা তাঁকে অমর কথাশিল্পী করে রেখেছে।

বড় আশা (Great Expectations) ১৮৬০

এটি প্রথমে 'সারাবছর ধরে' (All the Year Round) পত্রিকায় ১৮৬০—৬১ সালে বেরিয়েছিল এবং তারপরে এটি বই হিসাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

কাহিনীটি একটি গ্রাম্য বালক সম্পর্কে। এর নাম ফিলিপ পিরিপ (Philip Pirrip) বা সংক্ষেপে 'পিপ' (Pip)। সে তার দিদির কাছে মানুষ হয়েছিল। দিদিটি ছিল প্রচণ্ড ঝগড়াটে। তার স্বামী কর্মকার। নাম জো গারগেরি (Joe Gargery)। জো ছিল ভদ্র, শান্ত, দয়ালু এবং রগুড়ে। পিপকে অবস্থাপন্ন মহিলা কুমারী হ্যাভিস্যামের (Miss Havisham) বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। কুমারী হ্যভিস্যাম একটু মাথা খারাপের মত ছিল। বিয়ের দিনেই তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তাতেই একটা বিকৃতি আসে তার মনে। সে সমস্ত পুরুষমানুষের উপর বদলা নিতে চাইত। এই বদলা নেবার ধরনটাও ছিল অদ্ভুত।

সে এস্টেলা (Estella) বলে একটা মেয়েকে মানুষ করতে থাকল। সমস্ত পুরুষমানুষকে শাস্তি দেবার জন্য এই মেয়েটিকে সে কাজে লাগাত। যাই হোক, এর পরে পিপের সঙ্গে এস্টেলার ঘনিষ্ঠতা হল। পিপ চাইল যে এস্টেলাকে অবলম্বন করে সে ভদ্রলোকের স্তরে উঠবে। রহস্যময় কোন অজানা উৎস থেকে পিপ টাকাকড়ি পেয়ে যাচ্ছিল এবং আরও সম্পদলাভের ইঙ্গিতও পাচ্ছিল। পিপের ধারণা হয়েছিল যে সেগুলি কুমারী হ্যাভিস্যামেরই কাজ। তারপরে সে লণ্ডনে যাওয়ার সুযোগ পেল। শহুরে সমাজে মিশতে পারল। এখন সে শহুরে বাবু, তাই জো গারগেরির সঙ্গে সম্পর্ক তার কাছে লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল। তার সেই মানসিক দৈন্যে জো মনে খুব আঘাত পেল।

এর পরে ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ হল। সে আরও জানতে পারল তার সেই অজানা উপকারী বন্ধু জেল-পালান কয়েদী এ্যাবেল ম্যাগউইচ (Abel Magwitch)। এই এ্যাবেলকে সে ছোটবেলায় সাহায্য করেছিল। এ্যাবেল জেল থেকে পালিয়ে এসে কিছুদিন গারগেরিদের বাড়ীর কাছাকাছি লুকিয়ে ছিল। সেই সময়ে পিপ তার কয়েদীর বেড়ী কাটবার জন্য তার ভগিনীপতি গারগেরির কামারশালা থেকে উকো এনে দিয়েছিল। পিপ তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতেও দিত। এ্যাবেল এই উপকারের কথা কখনো ভোলেনি।

পিপের জীবনের উজ্জ্বল আশা দ্রুত ফিকে হযে আসতে লাগল। সে কপর্দকহীন হয়ে পড়ল।

এস্টেলা (Estella) এদিকে বিয়ে করে বসল বিটলি ড্রামলকে (Beatly Drummle)। গোমড়ামুখো ড্রামল ছিল পিপের শত্রু। এটাও পিপের পক্ষে মোটেই শুভসংবাদ ছিল না। ড্রামল এস্টেলার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছিল।

পিপের এখন সবদিকে দুর্দশা। সে আবার জো গারগেরির কাছে ফিরে এল। জো আগেও যেমন, এখনও তেমনি, সৎ, পরিশ্রমী, গরীব মানুষ। এষ্টেলাও তার ভুল বুঝেছিল। পিপ এবং এস্টেলার আবার আগের সম্পর্ক ফিরে এল।

এই বইয়ের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আছে জো-এর এক কাকা, নির্লজ্জ, জোচ্চোর বুড়ো পাম্বলচুক; দক্ষ উকিল জ্যাগারস; জ্যাগারসের সহৃদয় কেরানী ওয়েমিক (Wemmick) এবং পিপের লণ্ডনের বন্ধু হারবার্ট পকেট (Herbert Pocket)।

গল্পটি পিরিপ (Pirrip) বা পিপের (Pip) জবানীতে লেখা।

এণ্টনি ট্রোলোপ (Anthony Trollope) ১৮১৫—৮২

ট্রোলোপ থ্যাকারে ডিকেন্সের সমসাময়িক। তিনি সুশিক্ষিত, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে সুনাম অর্জন করবেন এমন কথা কেউ প্রথমে ভাবেননি। তাঁর লেখার পিছনে উচ্ছ্বাস ছিল না, কিন্তু ধৈর্য, পরিশ্রম এবং যত্ন অবশ্যই ছিল।

আইরিশ পরিবেশের গল্প দিয়ে তিনি তাঁর লেখকজীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসের একটি সাধারণ নাম দেওয়া হয়: 'বারসেটসায়ার উপন্যাস' (Barsetshire Novels)। বারসেটসায়ার একটি কাল্পনিক দেশ বা অঞ্চল। এই দেশেতেই তাঁর কাহিনীগুলি যেন ঘটেছিল। এই বারসেটসায়ারের গীর্জা বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে 'বারচেষ্টার'। কাহিনীগুলির মূল ঘটনাস্থল এই বারচেষ্টার।

ট্রোলোপের উপন্যাসে যাঁদের কথা আছে তাঁরা মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত। এঁদের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনের যথার্থ প্রতিরূপ ট্রোলোপের উপন্যাসে ফুটে উঠেছিল।

যাজক জীবন সম্পর্কিত তাঁর বৃত্তান্ত বিংশ শতাব্দীতে সমাদর পেয়েছে। তাঁর স্টাইল ছিল সহজ, সাবলীল। ট্রোলোপ প্রচুর লিখেছিলেন এবং মধ্যবয়স থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত একটানা দ্রুতগতিতে লিখেছিলেন।

ট্রোলোপ উচ্চমানের লেখার থেকে লেখার পরিমাণের উপর বেশী জোর দিতেন। প্লটের পরিকল্পনার থেকে চরিত্রসৃষ্টির উপর তাঁর বেশী নজর ছিল।

ট্রোলোপ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে আদর্শরীতি ও গঠনের ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি বলেছিলেন, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে 'বীরত্ব' বা 'দুর্বৃত্ততা' কোনটিরই তেমন প্রয়োজন নেই। সুমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষ এবং সমাজ, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং নরনারীর প্রেম, —এগুলিকে অবলম্বন করলেই উপন্যাস লেখা যায়।

'বারচেষ্টার টাওয়ার্স' (Berchester Towers) সম্ভবতঃ ট্রোলোপের শ্রেষ্ঠতম রচনা।

এমিলি ব্রণ্টি (Emily Bronte) ১৮১৮-৪৮

এমিলি এবং তাঁর বড় বোন শার্লো (Charlotte) এবং ছোট বোন এ্যান (Anne) ইংরাজী উপন্যাসে নতুনত্ব এনেছিলেন। মানুষের বাইরের চেহারা, কার্যকলাপ, বা এমনকি তার ভাসা-ভাসা ভাবনাচিন্তা নয়, তার অন্তরের যে চেহারা প্রচ্ছন্ন আছে তাকেই উপন্যাসের কাঠামোয় অবারিত করে দেওয়া একটা নতুন ধরনের কাজ। কে'ন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর, বা প্রতিনিধিস্থানীয় কোন ব্যক্তির, বা সমচিন্তাবিশিষ্ট অনেক মানুষের বাস্তব ছবি এর আগে শক্তিশালী ঔপন্যাসিকরা এঁকেছেন। কিন্তু ব্যক্তিমানুষের স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট চেহারা যা তার মনের গভীরে প্রোথিত রয়েছে তাকে প্রকাশ করা শক্ত কাজ এবং সাহসের কাজ। কল্পনাকে এখানে সাবধানে যুক্ত করতে হয় সত্যের সঙ্গে। আলাদা করে একটি বিশেষ মানুষের সত্যতম ব্যক্তিপরিচয় প্রকাশ করার চেষ্টা এর আগে কোন উপন্যাসে ঠিকমত হযনি। ব্রণ্টি ভগিনীরা উপন্যাসের অট্টালিকায যেন নতুন একটি কক্ষ সংযুক্ত করলেন।

এমিলি ব্রণ্টির একমাত্র এবং খুবই বিখ্যাত উপন্যাস 'বাতাহত বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা'— উথারিং হাইটস—(Wuthering Heights)। উথারিং হাইটস যেন গদ্যে লেখা গীতি-কবিতা। উথারিং মানে বাতাহত বা ওয়েদারওর্ণ (Weather-worn)। 'উথারিং,' 'ওযেদার ওর্ণ' শব্দের এক আঞ্চলিক প্রতিশব্দ।

এমিলি ব্রণ্টি 'এলিস বেল' (Ellis Bell) ছদ্মনামে কাহিনীটি লেখেন। কাহিনীটির উগ্র দৃশ্যাদি নিশ্চয়ই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মানুষের রুচিকে খুবই আঘাত দিযেছিল। কোন কোন জায়গায় এই প্রতিহিংসাত্মক কাহিনীর তীব্রতা মানুষকে বিপর্যস্ত করে।

কাহিনীটি একটি বাস্তবরূপবাদী শক্তিশালী রোম্যান্স। ঘটনাস্থল উত্তর ইংল্যাণ্ডের জনশূণ্য প্রান্তরাঞ্চল। ঘটনার কাল ১৭৫০ সাল থেকে ১৮০২ সাল পর্যন্ত। এর সবচেয়ে দুর্দান্ত চরিত্র এবং প্রধান চরিত্র হিথক্লিফ (Heathcliff)। হিথক্লিফ (Heathcliff) কথাটির মানে উষর প্রান্তরে দুরারোহ পাহাড়।

হিথক্লিফ একটি স্বজন-পরিত্যক্ত অনাথ বেদের ছেলে। গ্রন্থের অন্য আর এক চরিত্র আর্ণশ মহাশয় (Mr. Earnshaw) তাকে লিভারপুলের রাস্তা থেকে ধরে এনেছিলেন, এবং সন্তানতুল্য স্নেহে নিজের বাড়ীতে রেখে লালন-পালন করেছিলেন।

কাহিনীর নায়িকা ক্যাথারিনের (Catherine) মাধ্যমে নারীহৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগের কঠিনতম গোপন ভিত্তির অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক উদ্ঘাটন দেখান হয়েছে।

'উথারিং হাইটস' ১৮৪৭ সালে লেখা।

এই অনবদ্য কাহিনীটি নানা ঘটনায় সমৃদ্ধ। পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের পটভূমিতে লোভ, হিংস্রতা, প্রতিশোধ এবং কালের অনুসরণে কোমলতায় পরিবর্তিত ব্যক্তিমানুষের রুক্ষতা-মসৃণতার মানসিক ইতিবৃত্ত।

জর্জ ইলিয়ট (George Eliot) ১৮১৯-১৮৮০

লেখিকাব আসল নাম মেরি অ্যান ইভানস (Mary Ann Evans)। ইলিয়ট এবং মেবিডিথ ব্রন্টিভগিনীদের ভাবনার উত্তরসূরী।

বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের মানসিক সংঘাত ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, তীব্র আত্মসচেতনতা এবং মনঃসমীক্ষণ বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এগুলি শুরু হয়েছিল এমিলি ব্রন্টি, ভর্জ ইলিয়ট এবং জর্জ মেরিডিথের উপন্যাস থেকে।

এখানে ইলিযটের 'এ্যাডাম বিড' (Adam Bede) উপন্যাসটির কাহিনী সংক্ষেপে দেওয়া হল।

অ্যাডাম বিড (Adam Bede) ১৮৫৯

উপন্যাসটির প্লটের ভিত্তি ছিল যে কাহিনীটি সেটি লেখিকার পিসীমা এলিজাবেথ ইভ্যানস লেখিকাকে বলেছিলেন। এই এলিজাবেথ ইভ্যানস এ্যাডাম বিড উপন্যাসটির ডিনা মরিস (Dinah Morris) চরিত্রের আদি রূপ। এলিজাবেথ ছিলেন মেথডিষ্ট সম্প্রদাযভুক্ত ধর্মপ্রচারিকা। জেলের কয়েদী একটি মেয়ে তাঁর কাছে একটি শিশুহত্যা সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি করেছিল।

মার্টিন পয়জার (Martin Poyser) একজন অমায়িক প্রকৃতির চাষী। হেটি সরেল (Hetty Sorrel) তার ভাগিনেয়ী। হেটি দেখতে সুশ্রী, তবে অহঙ্কারী ও স্বার্থপব। অ্যাডাম বিভ গ্রামের ছুতোর—কঠোরভাবে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। অ্যাডাম বিড হেটি সরেলকে ভালবাসে। হেটি সরেল ভ্রান্তপথে চালিত হল। সে আশা করল যে গ্রামের যুবক জমিদার আর্থার ডোনাইথর্নের (Arthur Donaithorn) সঙ্গে বিয়ে হয়ে সে উঁচু সামাজিক মর্যাদা পেতে পারবে। আর্থার তাকে প্রলুব্ধ করল। অ্যাডাম বিড তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। আর্থার তারপর হেটিকে পরিত্যাগ করল। ভগ্নহৃদয় হেটি অ্যাডামকে বিয়ে করতে সম্মত হল। বিয়ের আগে হেটি বুঝতে পারল যে সে সন্তানসম্ভবা। আর্থারকে খুঁজে বার করবার জন্য সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। খুঁজে পেল না। তারপর শিশুহত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার হল এবং দোষী সাব্যস্ত হল। দীর্ঘ কারাবাসে দণ্ডিত হল।

এদিকে অ্যাডাম জানতে পারল যে ডিনা মরিস তাকে ভালবাসে। ডিনা গভীরভাবে ধর্মভাবাপন্না অল্পবয়স্কা মেথডিষ্ট প্রচারিকা। এর পরিচ্ছন্ন প্রভাব সমস্ত কাহিনীটিতে ছড়িয়ে আছে। অ্যাডামের ভাই ভদ্র শান্ত শেঠ (Seth) কিন্তু ডিনাকে ভালবেসে এসেছে। সে

ডিনার দিক থেকে কোন সাড়া পায়নি। এখন সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরভাবে ডিনার দিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিল।

কাহিনীটি খুব নতুন কিছু নয়। কিন্তু চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত প্রকৃতি যে ভাবে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে, তা নতুন ও বিশেষত্বমণ্ডিত। অন্যান্য কারণ ছাড়াও দুই ভাই-এর সুন্দর চরিত্রের দরুণ উপন্যাসটি আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে আছে। ডিনা এবং হেটি, বাক্যবাগীশ পয়জার গিন্নী, দয়াবান পল্লীযাজক, আরউইন মহাশয় (Mr. Irwinc), ক্ষুরধারজিহ্বা স্কুলমাষ্টার ম্যাসি, —এদের সকলেরই যথেষ্ট অবদান রয়েছে উপন্যাসটিকে স্থায়ীভাবে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে। সুন্দর দৃশ্যের, বিশেষ করে পয়জারের খামারের বর্ণনা উপন্যাসটিকে সব দিক থেকে সার্থক করেছে।

জর্জ মেরিডিথ (George Meredith) ১৮২৮-১৯০৯

ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে দুরুহ ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের নানা দিকে তাঁর প্রতিভা প্রসারিত। কবিতা দিয়েই তাঁর লেখকজীবন শুরু ; কবি হিসাবে তাঁর পূর্ণ স্বীকৃতি আজও আছে। কমেডির উপর তাঁর রচনা 'Essay on Comedy' (১৮৭৭) তাঁকে ওই সময়ে ওই বিষয়ের বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলে প্রমাণ করেছিল। 'আত্মবাদী' (The Egoist) উপন্যাসের সূচনাতেই 'হাস্যরসাত্মক উদ্দীপনা' (Comic Spirit) সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর ওই বিষয়ে সংক্ষেপে সারকথা।

মেরিডিথের উপন্যাস চরিত্র চিত্রণে সমৃদ্ধ। তাঁর এই চরিত্রচিত্রণ আপাত ঘটনা-বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তাঁর সমস্যা অন্তর্মুখী, —আত্মিক সমস্যা। ঘটনা বা পরিস্থিতি তাঁর কাছে শুধু প্রেক্ষাপট। তাঁর অন্তর্মুখীনতা স্বচ্ছবুদ্ধি সম্পন্ন এবং কল্পনাদৃষ্টি সমন্বিত। তাঁর স্বজ্ঞা সম্পূর্ণ বহিঃপ্রভাববর্জিত বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মেরিডিথের উপন্যাসকে সমস্যা-উপন্যাস (Problem Novel) বলা যায়। 'আত্মবাদী' (The Egoist) উপন্যাসের সমস্যা হচ্ছে, ব্যক্তির জন্মগত প্রকৃতি কি ভাবে এবং কতখানি তার জীবনকে রূপায়িত করবে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মালেই মানুষের জীবন সঠিকভাবে প্রভুত্বব্যঞ্জক না-ও হতে পারে। অপরের দেওয়া সম্মানার্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল জীবনের প্রতি তার করুণা আসতে পারে ; বা অন্য কথায় বলতে গেলে স্বচ্ছল দুশ্চিন্তাহীন জীবন পাওয়ার দরুণ সে নিজেকে ধিক্কার দিতে পারে ; জন্মগত অনুকূল পরিবেশকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে 'আত্মবাদী' নিজেকে সম্পূর্ণ নিজের হাতে তৈরী করতে পারে এবং সেইভাবেই যে তার সত্যপরিচয় দেওয়া যেতে পারে তা সে বুঝতে পারে।

ইংরাজী উপন্যাস জগতে মেরিডিথ একক, স্বতন্ত্র। মেরিডিথের ধাঁচে উপন্যাস সৃষ্টিতে মস্তিষ্কের উপর এত চাপ পড়ে যে অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা সেই কষ্টকর প্রচেষ্টায় যেতে চান না।

মেরিডিথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের নব্য রোম্যান্টিক ভাবধারার মানুষ ছিলেন। ব্যক্তির মনে উদ্ভূত নানা নতুন ধারণাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। অপরদিকে নির্বুদ্ধিতা,

অজ্ঞতা এবং প্রচলিত প্রথার যান্ত্রিক অনুসরণকে তিনি তুচ্ছ করতেন। স্বাধীন মানসিকতায় পরিপুষ্ট জ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। বুদ্ধিপ্রয়োগ না করে প্রচলিত প্রথা ও ধারণাকে নিশ্চিন্তে গ্রহণ করাকে তিনি ঘৃণা করতেন।

তাঁর উপন্যাসে একই মানুষের অন্তরের নানা সূক্ষ্ম বৈচিত্র ও গভীরতা তিনি অনুশীলন করেছেন। তাঁর বিশিষ্ট আধ্যাত্মিকতা বস্তুভিত্তিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'আত্মবাদী' (The Egoist) উপন্যাসে তিনি সেই বিশিষ্ট দর্শনকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন।

আত্মবাদী (The Egoist) ১৮৭৯

এটি গদ্যে গল্প বলার ধরনে কমেডি। কেন্দ্রীয় চরিত্র স্যার উইলোবি প্যাটার্ণ (Sir Willoughby Patternc)। তিনি ধনী, মনোহরদর্শন, সমাজে খুব উঁচু পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর স্বার্থপরতার মাত্রা নেই। তিনি বিচারবুদ্ধিবর্জিত আত্মাভিমানী। লেটিসিয়া ডেল Laetitia Dale) দরিদ্র, লাজুক প্রকৃতির বুদ্ধিমতী মহিলা। উইলোবিকে ঘিরে এই মহিলা বহুদিন ধরে রোম্যান্টিক আশা পোষণ করতেন। উইলোবিও এ ব্যাপারে তাঁকে নিরুৎসাহ করেন নি। কিন্তু উইলোবি কনস্ট্যানসিয়া ডারহ্যাম (Constantia Darham) নামের এক মহিলার কাছে প্রস্তাব করেছেন ; তিনিও উইলোবিকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। বুদ্ধিমতী এক প্রতিবেশিনী কনষ্ট্যানসিয়ার নাম দিয়েছিলেন 'রেসের গাড়ী'। এই প্রতিবেশিনীর নাম মাউন্ট স্টুয়ার্ট জেনকিনসন। তিনি লোকের নতুন নতুন নামকরণ করতে ওস্তাদ ছিলেন। কনষ্ট্যানসিয়া শীঘ্রই উইলোবির সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে গেলেন। তিনি হুজারদলের (লঘুভার অশ্বারোহী সৈনিকের দল) এক অফিসারের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। এই হল উইলোবির প্রথম অপমান। এর পরে উইলোবি ক্লারা মিডলটনের ভিতর তার স্ত্রী হবার উপযুক্ত গুণাবলী দেখতে পেলেন। ক্লারা ভোগবিলাসে অভ্যস্ত এক অধ্যাপকের মেয়ে এবং মাউন্ট স্টুয়ার্টের ভাষায় 'রঙচঙে চীনামাটির পুতুল'। যাই হোক, ক্লারা মিডলটনের সঙ্গে উইলোবির ঝটপট বিয়ে হয়ে গেল। উইলোবির হাত থেকে ক্লারার মুক্তি পেতে বেশ সময় লেগেছিল। কনস্ট্যানসিয়া তাড়াতাড়িই মুক্তি পেয়েছিলেন। এর কারণ কনস্ট্যানসিয়ার চেয়ে ক্লারা অনেক বেশী মার্জিতরুচিসম্পন্না ছিলেন। আর তাছাড়া, দ্বিতীয়বার যাতে প্রত্যাখ্যাত হতে না হয় সেজন্য উইলোবিও খুব চেষ্টা করেছিলেন। উইলোবি বুদ্ধি খরচ করে ক্লারার বাবার সমর্থন আদায় করেছিলেন। তিনি ক্লারার বাবার বিলাসব্যসনে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন।

এর ভিতরে আর দুটি চরিত্র এসে গেল। একজন ভার্ণন হুইটফোর্ড (Vernon Whitfod)। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। একসময়ে উপবাস করে করে সূর্যদেবতা যেমন ভিক্ষু সন্ন্যাসীর মত কৃশ হয়ে পড়েছিলেন, লেখাপড়া করে করে ভার্ণনও সেইরকম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছে যুবক ক্রশজে প্যাটার্ণ (Crossjay Patterne)। এর বাবা নৌবিভাগের একজন কর্মচারী এবং উইলোবিদের দূরসম্পর্কেব গরীব আত্মীয়। এঁর দীনদরিদ্র সাজপোষাকের দরুণ উইলোবি এঁকে যথেষ্ট অপমান করেছিলেন। ক্রশজে ছেলেটি আমুদে

এবং শেষ পর্যন্ত এই ছেলেটিই ক্লারার মুক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। ক্লারা উইলোবিকে সহ্য করতে পারছিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রশজে একদিন শুনতে পেল যে ক্লারার নিস্পৃহ ব্যবহারের দরুণ উইলোবি আবার লেটিসিয়ার দিকে ঝুঁকেছেন। ক্লারারও এ খবর জানতে বাকি রইল না। উইলোবির আগের ব্যবহারের দরুণ লেটিসিয়া এবারে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। সুতরাং এবারে উইলোবি দ্বিগুণভাবে অপমাণিত হলেন, —ক্লারার দিক থেকে এবং লেটিসিয়ার দিক থেকে। পরিশেষে অবশ্য অনিচ্ছুক লেটিসিয়া নাছোড়বান্দা উইলোবিকে গ্রহণ করতে রাজী হলেন। ক্লারা বিয়ে করলেন ভার্নন হুইটফোর্ডকে।

কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস লাভ পীকক (Thomas Love Peacock ১৭৮৫—১৮৬৬) এবং লেসলি স্টিফেন যথাক্রমে অধ্যাপক মিডলটন এবং ভার্নন হুইটফোর্ড চরিত্রের আদিরূপ।

টমাস হার্ডি (Thomas Hardy) ১৮৪০-১৯২৮

শ্রীযুক্ত বনামি ডব্রির (Bnamy Dobree) অনুসরণে হার্ডি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলার চেষ্টা করা যাক।

হার্ডির নৈরাশ্যবাদ বিষাদময় সমবেদনার দ্বারা সমৃদ্ধ। এই সমবেদনা বিষাদের অনুভূতিকে এক বৃহৎ বিস্তৃতিতে প্রসারিত করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের এক গভীর অন্তর্দৃষ্টিও প্রদান করে। এই মানসিক অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যা দিয়েছেন শেক্সপীয়র—

"খামখেয়ালী ছোটছেলেদের কাছে যেমন মশামাছি, আমরা মানুষেরা দেবতাদের কাছেও তেমনি। তারা খেলার ছলে আমাদের হত্যা করে।"

শেক্সপীয়র কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন যে যদিও এটাই অতি নিষ্ঠুর সত্য তবু মানুষ, সব কিছু বুঝেও, যে ভাবে তার জীবন চালিয়ে যায় সেইভাবে চলাটাই ভাল। রহস্যময় সেই নিষ্ঠুরতার মুখোমুখী নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা যে নির্বুদ্ধিতা তা জেনেও এক ধরনের জীবন যে অন্য আর এক ধরণের জীবনের থেকে ভাল তা আমরা বুঝি। ওথেলো ইয়াগোর থেকে উন্নততর মানুষ, কিংবা কর্ডেলিয়ার সৌন্দর্য যে তার মৃত্যুতেই পূর্ণপ্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, —তা আমরা খুব সহজেই স্বীকার করি। মহাবিশ্বের প্রকাণ্ড ভীষণতার সামনাসামনি অসহায়তা ও সামান্যতা সত্ত্বেও মানুষের মর্যাদা ঘোষণা করাই ট্র্যাজেডির লক্ষ্য। যে বিষাদময়তার পঙ্ক থেকে কোন সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না তা ট্র্যাজেডি নয়। টমাস হার্ডির ট্র্যাজিকবোধ এই প্রজ্ঞারই কাছাকাছি। অনুভূতির এই পটভূমিকায় হার্ডি তাঁর অনাড়ম্বর জীবনবোধকে উপস্থাপিত করেছেন।

টমাস হার্ডি লর্ড এ্যাডমিরাল নেলসনের নৌবাহিনী অন্তর্ভুক্ত ক্যাপটেন হার্ডির বংশধর। তাঁর বাবা ছিলেন পাথরের অট্টালিকা নির্মানের স্থপতি। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তা। হার্ডি ছ'বছর বয়সেই তাঁর বাবার কাছে বেহালা বাজান শিখতে শুরু করেন। আবার পাথরের বাড়ী তৈরীর কাজও শিখতে শুরু করেন ষোল বছর বয়সে। হার্ডি গল্প শুনতে

ও বই পড়তে ভালবাসতেন। বই পড়ার নেশা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মা। অল্প বয়সেই তিনি গ্রীক, ল্যাটিন এবং আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের অনেক কিছু পড়েছিলেন।

ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর জগৎজোড়া সুখ্যাতি হলেও কবিতাই তাঁর কাছে সারাজীবন অধিকতর প্রিয় ছিল।

ফরাসী ঔপন্যাসিক ও গল্পকার বালজাক (Honore de Balzac ১৭৯৯—১৮৫০), ফ্লবার্ট (Gustave Flaubert ১৮২১—৮০), জোলা (Emile Zola ১৮৪০—১৯০২) এবং মোপার্শার (Guy de Maupassant ১৮৫০-৯৩) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। আধুনিক সমাদরকারীরা আফ্রো-আমেরিকান মহিলা কবি টনি মরিসন (Tony Morrison) এবং টমাস হার্ডির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের পূর্ণ পক্ষপাতী দুজনেই। ওয়ার্ডসওযার্থ তো নিজেই কবিতাতে গ্রামের মানুষের ভাষা এবং সংস্কারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং ইংরাজী-ভাষাভাষী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (অন্ততঃ যতখানি হার্ডির জানা ছিল) একটা ছাপ হার্ডির লেখাতে পড়েছিল। এটা শুধু বিশেষ এক স্টাইলের কথা নয়—হার্ডি সরাসরি কোন স্টাইল তৈরীর চেষ্টা করেননি—ইংরাজী তথা যে কোন ভাষারই অন্তর্নিহিত ভাবপ্রকাশের শক্তির সামগ্রিক অনুধাবন।

হার্ডির উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় এই যে মানুষের বেঁচে থাকার অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়,— বরঞ্চ এটা বোঝা যে নিয়ন্ত্রণকর্তা তার ভাগ্য বা নিয়তি। যারা ছিল, যারা আছে এবং চলে যাবে তাদের সকলের সম্মিলিত জীবনবোধ এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক ও মানবিক পরিবৃত্তের ভিতর হার্ডি ধরে রাখতে চেযেছিলেন। নিকট-অতীতের সীমাবদ্ধ ইতিহাস এবং চিরকালীন মানুষের টানাপোড়েন দিযে তিনি স্বল্প গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ দৃষ্টি এবং বৃহৎজীবনের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রনার বোধকে তাঁর উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন।

১৮৭২ সালে 'সবুজ গাছের ছায়ায' (Under the Greewood Tree) গ্রন্থেই হার্ডি প্রথম পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭৩ সালের আহত মনের বিদ্রুপাত্মক প্রকাশ 'এক জোড়া নীল চোখ' (A Pair of Blue Eyes) তাঁর খ্যাতি আরও বাডিয়ে দিল। ১৮৭৪ সালে প্রকাশ পেল 'খেপা মানুষদের থেকে অনেক দূরে' (Far From the Madding Crowd)। এই উপন্যাস স্থায়িত্বে স্বীকৃতি সহজেই পেয়েছিল। গ্রামের মানুষের আবেগের গভীরতা এবং সেই কারণেই বিবেচনাহীন নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি রাখা হয়েছে স্থির, শান্ত, নিঃস্বার্থ অনুরক্তি। গ্রামের পটভূমিকা যেমন মানুষকে সর্বাংশে সুন্দর করতে পারেনি, তেমনি ওই একই পটভূমিকা মানুষকে শান্ত, নির্বিরোধী সৌন্দর্যে ভূষিত করতে পারে।

১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর অতি বিখ্যাত উপন্যাস 'ঘরে ফেরা' (The Return of the Native)। এই উপন্যাসে সর্বশক্তিমান ভাগ্যের চরম বিদ্বেষের সামনাসামনি অসহায় মানুষকে দাঁড় করান হয়েছে। আর সেই ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক দুই অপরাজেয় মানব-মানবী-ক্লিম ইয়োব্রাইট (Clym Yeobright) এবং ইউসট্যাসিয়া ভাই (Eustacia Vye)। আর আছে জীবন্ত প্রকৃতির চিরকালীন অস্তিত্বের এক প্রতিনিধি— 'এগডনের

পোড়ো ডাঙ্গা' (Egdon Heath)। এই চরিত্র শুধু যে চেতনাসম্পন্ন তা-ই নয়, শত শত বছরের মানুষের কার্যকলাপের অতন্দ্র দ্রষ্টা।

ক্লিম ইয়োব্রাইট এখানকারই অধিবাসী। সে কিছুদিন প্যারিসে ছিল। সেখানে হীরা কেনাবেচার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এ কাজ তার ভাল লাগল না। সে দেশে ফিরে এল। উদ্দেশ্য স্কুলমাষ্টার হবে। জ্ঞানান্বেষণ তার উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানান্বেষণে সাগ্রহে সে ব্রতী হল। জ্ঞানান্বেষণ দুঃখ নিয়ে আসে ; কিন্তু ক্লিমের ছিল এক উন্নত জীবনদর্শনের প্রতি আকর্ষণ। তার ইচ্ছা সকলে আপাত-সুখকে পরিত্যাগ এই উন্নত জীবনদর্শন অনুসরণ করুক। সে খুব পড়াশুনা করল। কিন্তু চোখে আর সে ভাল দেখতে পেল না। পড়াশুনা করা আর সম্ভব হল না। তার আকাঙ্খা তৃপ্ত হল না। এখন থেকে সে এগডনের পোড়ো ডাঙ্গায় গিয়ে একজাতীয় কাঁটাগুল্ম কেটে আনার কাজ করতে শুরু করল।

এদিকে ইউসট্যাসিয়া ভেবেছিল ক্লিমকে বুঝিয়ে আবার প্যারিসে পাঠান যাবে এবং সেই সঙ্গে সে নিজেও প্যারিসে বাস করতে পারবে। কিন্তু ক্লিম প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়াতে আর তার সে আশা পূরণ হল না। এখন সে আবার তার পুরানো প্রেমিক ডামন ওয়াইলডিভের (Damon Wildeve) সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল। ইউসট্যাসিয়া সুন্দরী, মনের কোন গভীরতা নেই, স্বার্থপর। এখানেও টমাস হার্ডি তাঁর নিজের এক সত্যদর্শন প্রয়োগ করলেন। 'যারা বাইরে সুন্দর তারা অন্তরে কুৎসিৎ ; যারা বাইরে কুৎসিত তারা অন্তরে সুন্দর।'

ডামন এদিকে ইউসট্যাসিয়ার সঙ্গে প্রণয়ে ব্যর্থ হয়ে ক্লিমের বোন টমাসিনকে (Thomasin) বিয়ে করেছিল। এরপর ক্লিমের মা মারা গেলেন। এ ব্যাপারে ইউসট্যাসিয়ার কিছুটা দায়িত্ব অবশ্যই ছিল। তার অজ্ঞাতে এবং অন্যমনস্কতার দরুণই হয়ত ক্লিমের মা মারা গেলেন। ক্লিম মনে খুব আঘাত পেল। কিন্তু সে শান্ত নির্বিরোধী মানুষ।

এরপর ইউসট্যাসিয়া এবং ডামন পরিকল্পনা করল যে তারা পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালানোর পথে জলে ডুবে দুজনেই মারা গেল।

তখনকার কালে ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে গেরিমাটিজাতীয় লালরঙের একধরনের ধূলোমাটি কাপড়জামা রং করবার জন্য ব্যবহৃত হত। ঠেলাগাড়ীতে করে যারা এগুলো বাড়ী বাড়ী নিয়ে বিক্রী করতো তাদের বলা হত রেডলম্যান (Reddleman)। ওই মাটির নাম ছিল রূডল বা রেডল। ভাল মানুষ ডিগরি ভেন (Diggory Venn) ছিল এইরকম একজন রেডলম্যান। সে অনেকদিন ধরে টমাসিনকে ভালবাসত। তার সঙ্গে এখন টমাসিনের বিয়ে হয়ে গেল।

নিঃস্ব, অসহায় ক্লিমের জীবনে আর কিছু চাইবার বা পাবার ছিল না। সে স্বাধীনভাবে এখানে ওখানে ঘুরে মানুষকে ধর্মের কথা, নীতির কথা শোনাতে লাগল। এ ব্যাপারে তার উপযুক্ত শিক্ষা ছিল না, বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনও ছিল না। সে জ্ঞানের কথা বলতে পারত না। কিন্তু তার সহজ বিশ্বাস, সাদাসিধা কথা এবং একান্ত নিষ্ঠা তাকে এক পবিত্র মানুষে পরিণত করেছিল।

১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় 'ভেরীবাদক মেজর' (Trumpet Major)। গ্রাম্য পরিবেশে, ইতিহাসের পটভূমিকায় দুই ভাই, জন লাভডে (John Loveday) এবং রবার্ট লাভডের (Robert Loveday) পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক এবং নিঃশব্দ ত্যাগের অনবদ্য আন্তরিক কাহিনী।

১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় 'ক্যাষ্টারব্রিজের মেয়র' (The Mayor of Casterbridge)। এ এক অসাধারণ উপন্যাস। চরিত্রের পৌরুষ, রুক্ষতা ও বেপরোয়াভাব নায়ক হেঞ্চার্ডের (Henchard) সারাটা জীবনে প্রচণ্ড ও একনিষ্ঠ অনুশোচনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড মানুষের তীক্ষ্ণ মর্মভেদী হাহাকার পাঠকের মনকে আবেগে আপ্লুত করে দেয়। এখানেই সেই আশ্চর্য সত্যদ্রষ্টার ঘোষণা: মানুষের জীবন ব্যথা-বেদনার নাটক; সুখের মুখ সেখানে ক্বচিৎ কদাপি দেখা যায (....happiness was but the occasional episode in a general drama of pain)।

এরপর ১৮৮৭ সালে 'কাননবিহারী' (The Woodlanders)। সেখানে আছে গ্রাম্য পরিবেশে দুটি সুন্দর চরিত্র: গাইলস উইনটারবোর্ন (Giles Winterbourne) এবং মার্তি সাউথ (Marty South)। বিষাদ, বিষাদ, ––অনন্ত বিষাদ।

তারপর হার্ডির শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস দুটি। 'ডারবারভিলসের টেস' (Tess of the D'Urbervilles) এবং 'প্রভাহীন জুড (Jude the Obscure)। প্রথমটি ১৮৯১ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। 'টেস' সবচেয়ে সার্থক উপন্যাস, 'জুড বহুবিতর্কিত। নীতিবাগীশ ভিক্টোরিয় মানসিকতা এই বই-এর অবারিত সাহসিকতা সহ্য করতে পারেনি।

পুরাতন ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণপশ্চিম অংশে ওয়েসেক্স (Wessex) অঞ্চলই হার্ডির উপন্যাসের ঘটনাস্থল।

হেনরী জেমস (Henry James) ১৮৪৩-১৯১৬

জন্মসূত্রে আমেরিকান, পরে ইউরোপে চলে আসেন। মৃত্যুর একবছর আগে বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। তাঁর প্রথম জীবনের ও শেষ জীবনের উপন্যাসগুলি আমেরিকান ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির তুলনার পটভূমিকায় লেখা।

হেনরী জেমসের বর্ণনার ক্ষমতা অন্যান্য বহু লেখকের থেকে অনেক বেশী। বর্ণনার বিশেষত্বের একটি নজরে পড়বার মত লক্ষণ ছিল ভাষার উপরে তাঁর সযত্ন নিয়ন্ত্রণ। সঠিক শব্দ, সঠিক চিত্রকল্প, উচ্চারণ ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষ অর্থের স্পষ্ট ধারণা দেওয়া, —এগুলির উপর তিনি খুব জোর দিতেন।

উপন্যাস লেখায় তিনি যে সমস্ত কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন তার ভিতরে একটি ছিল যে পাঠকের সঙ্গে তিনি নিজে সরাসরি সহযোগিতা করছেন এটা না দেখিয়ে পাঠককে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যেন একটি বিশেষ চরিত্রকে দিয়ে দেওয়া। যে সব চরিত্রকে বোঝা পাঠকের দিক থেকে দরকার সেগুলির বৈশিষ্ট্য তিনি ওই বিশেষ চরিত্রটির

দ্বারা পাঠককে ধরিয়ে দিতেন। এতে করে বোধ হয় পাঠকের একটা অহমিকা তৃপ্ত হত যে লেখক তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখতে চাইছেন না। তা ছাড়া পাঠক এটাও দেখেন যে চরিত্রগুলি তাদের নিজের নিজের পরিমণ্ডলে আত্মবিশ্লেষণ করে যাচ্ছে। লেখকের কাজ যেন সেগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখা এবং এটা দেখা যে এই সম্মিলিত কাজের তত্ত্ব পাঠক যেন এমনভাবে উপলব্ধি করেন যে তাঁর বুদ্ধি চরিত্রগুলির অন্তনির্হিত রূপ বুঝতে সমর্থ হয়।

হেনরী জেমস তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্নিহিত দিকটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি গল্প বলার বরাবরের ধরণ পালটে দিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রগুলি যুক্তি ও অনুভূতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্রিয়াশীল হতে প্রেরণা পায়। বিভিন্ন চরিত্রের এই সব ক্রিয়াশীলতা পরস্পরের সমর্থনে বা বিরুদ্ধে গিয়ে ঘটনার পারম্পর্য সৃষ্টি করে। তবে হেনরী জেমসের উপন্যাস ঘটনাপরম্পরার বর্ণনা নয়, —চরিত্রগুলির সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধান। চরিত্রগুলি নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু পাঠক তাদের সচেতন অস্তিত্ববানতার পিছনের শক্তি এবং প্রেরণা খুঁজে পেতে চাইবেন এটা জেমস জানতেন। আসলে হেনরী জেমসের উপন্যাসের উদ্দেশ্য পাঠককে এই অনুসন্ধানে উৎসাহিত করা।

আর একটি কথা। হেনরী জেমস কবিতা লেখেন নি। গদ্যে কবিতা লিখতে চাননি। অথচ পরিণত বয়সে গদ্য যা লিখেছেন তা পাঠকের মনে যে অনুভূতি জাগায় শ্রেষ্ঠ কবিতাতেও সেই একই অনুভূতি আসে। অর্থাৎ তাঁর লেখায় আপাত নীরস গদ্যের আড়ালে পারস্পরিক সংবেদশীলতা লেখক ও পাঠকের মধ্যে কাজ করে। তিনি মানুষের হৃদয়কে যুক্তি ও সম্ভাবনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তা হয়েছে সাবলীল ও কবিত্বগুণমণ্ডিত। তিনি স্মৃতির সাহায্যে পুণঃর্জাত অতীতকে বর্তমানের পৃথক আধারে নতুন করে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

হেনরী জেমসের বিষয়বস্তুগুলির নির্বস্তক সারাংশ হচ্ছে একজন আমেরিকানের চোখে প্রাচীনতর ইউরোপের বিমূর্ত সত্ত্বার অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের জন্য তিনি যে সাহায্যকারী উপাদানকে অবলম্বন করেছিলেন তা হচ্ছে তাঁর সমকালীন ইউরোপের মানুষ। হয়ত প্রাচীন ইউরোপকে তিনি সেখানে খুঁজে পাননি। কিন্তু কিছু কৃত্য, কিছু পুরাতন সংস্কার, কিছু স্থানমাহাত্ম্য, বা স্থানে স্থানে আপাত নিরর্থকভাবে উর্দ্বতীত কিছু কিছু স্মৃতি এবং অধর্তব্য অবশিষ্টাংশ বা বর্তমানের মানুষের চরিত্রে অলক্ষিত আর এক আন্তঃশীলরূপ তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের ধারণা তৈরী হয়েছিল আধুনিক সভ্যতার দ্বারা স্বল্পাচ্ছাদিত কিন্তু বহুযুগের অনুমোদিত ঐতিহ্যের দ্বারা।

এক মহিলার প্রতিকৃতি (The Portrait of a Lady) ১৮৮১

এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদী উপন্যাস। ঘটনার কাল ১৮৭৫ সালের কাছাকাছি। ঘটনার স্থান: ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি।

এই উপন্যাসে ইউরোপীয় পরিবেশে নানা আমেরিকান চরিত্রের সন্নিবেশ দেখান হয়েছে।

এই কাহিনীর 'Lady' বা 'ভদ্রমহিলা' ইসাবেল আর্চার (Isabel Archer)—সুন্দরী এবং বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী। সে ইউরোপে এসেছে। তার সঙ্গে রয়েছে বয়স্ক এবং শান্তপ্রকৃতির আত্মীয় ব্যাঙ্কমালিক টাচেট (Touchett), তার বিরক্তিকর স্ত্রী, তাঁদের অশান্তিকর, সুদর্শন, চালাকচতুর (রুগ্ন) ছেলে র‍্যালফ। ইংরাজী জীবনযাত্রা যেন র‍্যালফকে পেয়ে বসেছে। আর আছে আমেরিকান মহিলা সাংবাদিক হেনরিয়েটা স্ট্যাকপোল (Henrietta Stackpole), —পুরোপুরি আমেরিকান, একবিন্দুও অন্য ধরণ ধারণ নেই। বনেদী ইংরাজ পরিবারের বিশিষ্ট ভদ্রলোক লর্ড ওয়ারবার্টন (Lord Warburton) ইসাবেলকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ইসাবেল সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সে ক্যাসপার গুডউডের (Caspeı Good wood) প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। ক্যাসপারকে বুলডগের মত দেখতে। সে আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ডের লোক। ইসাবেল এদের বদলে গিলবার্ট অসমণ্ডকে মনোনীত করল। এই বিয়ে সে করে বসল মাদাম মার্লের (Madame Merle) প্ররোচনায়। মাদাম মার্লে ইসাবেলের বন্ধু এবং অসমণ্ডের প্রাক্তন প্রণয়িণী। মাদাম মার্লে একাধিক জাতির ভাবধারা সমন্বিতা মহিলা। মানুষের ক্ষতি করার তার একটু আধটু ঝোঁক ছিল। গিলবার্ট অকর্মার ধাড়ি, বিদ্বেষপরায়ণ স্বভাবের। আমোদ আহ্লাদে দিন কাটায়। গিলবার্ট ইসাবেলকে বিয়ে করল তার টাকাপয়সার লোভে। সে ইসাবেলের জীবনটা মাটি করে দিল। ইসাবেল অল্পদিনেই গিলবার্টের হীনস্বভাবের পরিচয় পেল। তবু সে গিলবার্টের প্রতি বিশ্বস্ত রইল।

হেনবী জেমসের প্রথম দিকের ভাল উপন্যাসগুলির মধ্যে এটি একটি। এক ইংরাজ ওয়ারবার্টন ছাড়া, আমেরিকান চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই ইউরোপীয় পটভূমিকায় যে যার নির্ধারিত ভাগ্যের দিকে এগিয়ে গেল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় উচ্চমনা ইসাবেলের জীবনে, ভাগ্যে এবং চরিত্রে। ইসাবেলের মানসিক বিবর্তনের মধ্যে সাবধানে অনুপ্রবেশ করে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে এবং কেন সে অপদার্থ গিলবার্টকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারল। এই বিয়ের ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। সেগুলিরও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক নিজের বিশিষ্ট ধরনে এবং সুনিপুনভাবে। একজন ব্যক্তির (এক্ষেত্রে ইসাবেল আর্চার) মনের প্রকৃতি অনুসরণ করে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অগ্রসরণের সেইসব ধাপগুলি যেগুলির শেষে সে গিলবার্টকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটাই বিশেষ করে হেনরী জেমসের নিজস্ব পদ্ধতি পরিগ্রহণ।

স্টিভেনসন (Robert Louis Stevenson) ১৮৫০—৯৪

স্কটল্যাণ্ডের লোক। প্রথম জীবন থেকে ক্ষয়রোগের প্রবণতা ছিল। ১৮৮৮ সালে রোগের যন্ত্রণা কমানোর জন্য সামোয়ার (প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া দ্বীপ Samoa) মৃদু আবহাওয়াতে চলে যান। সেখানেই মারা যান।

অন্যান্য রচনার মধ্যে যে সব জনপ্রিয় রোম্যান্সের জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন সেগুলি হল 'রত্নদ্বীপ' (Treasure Island—১৮৮৩), 'ডঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের অদ্ভুত কাহিনী (The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde—১৮৮৬)। এ ছাড়া ছিল 'আরব্য রজনী—নতুন পর্য্যায' (The New Arabian Nights —১৮৮২)।

আজানা দেশে অভিযান, জলদস্যু, বিপদসঙ্কুল সমুদ্র, আতঙ্ক, রহস্য ইত্যাদি নিয়ে তাঁর লেখা আজ একশ বছরের উপর হয়ে গেল আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই কাছে প্রবল আকর্ষণের জিনিষ হয়ে আছে। সামোয়ার লোকেরা স্টিভেনসনের নাম দিয়েছিল 'টুসিটালা' (Tusitala) অর্থাৎ 'গল্পবলিয়ে'।

বেশী কথা এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার থেকে এগুলির দ্রুতগতিশীল ঘটনাবহুল কাহিনী সকলের কাছে খুব প্রিয়।

জোশেফ কনরাড (Joseph Conrad) ১৮৫৭-১৯২৪

জোশেফ কনরাডের বাবা পোল্যাণ্ডের একজন দেশপ্রেমিক—স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। জোশেফের জন্ম ইউক্রেনে। নাবিক হবার খুব সাধ ছিল। ১৮৭৪ সালে ফরাসী পণ্যবাহী জাহাজের কাজে যোগ দেন। চার বছর বাদে বৃটিশ নৌবাণিজ্য বিভাগে নিযুক্ত হন। জাহাজে জাহাজে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বিশ বছর ঘুরেছিলেন।

নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রথম দিকের লেখাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল ১৯০০ সালের 'লর্ড জিম—একটি গল্প' (Lord Jim: A Tale)। এই গল্পটিতে দেখান হয়েছে, একজন অল্পবয়স্ক ইংরাজ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে একটি ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মবলিদানের মাধ্যমে সে তার হৃত সম্মান পুণরুদ্ধার করে।

পরবর্তীকালের পরিণত লেখাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'টাইফুন' (Typhoon—১৯০৩) এবং 'নস্ট্রোমো—সমুদ্রোপকূল অঞ্চলের একটি গল্প' (Nastromo—A tale of the sea-board—১৯০৪)।

আজানা দেশের এবং অজানা সমুদ্রের পটভূমিতে তাঁর গল্পগুলিকে স্থাপন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য, নতুন কোন পরিবেশ বা অপরিচিত মানুষ—যাকে যখন যে দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন তাকে উপস্থিত করেছেন সেইভাবেই। যার ফলে তিনি গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বিভিন্ন মানুষের চারিত্রের অদেখা দিক তিনি তাঁর রচনায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন, এবং বহুলাংশে সক্ষম হয়েছেন।

জীবনের দুঃখবেদনার দিকগুলিই ছিল তাঁর বেশী আগ্রহের বস্তু। তাঁর চরিত্রগুলির দুঃখ-বেদনা-হতচকিত বোধ মাঝে মাঝে যখন অতি তীব্র হয়ে ওঠে তখনই যেন তিনি

তাদের ধরে ফেলেন এবং তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী দিয়ে বেঁধে ফেলেন। এই হঠাৎ প্রকাশিত তীক্ষ্ণপর্যবেক্ষণগুলির সমবায়ে তাঁর চরিত্রগুলির পূর্ণগঠন বোঝা যায়। মানুষের বিভিন্ন অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ বুদ্ধিগ্রাহ্য করাই তাঁর উপন্যাসের বিশেষ লক্ষ্য। আধুনিককালের রোম্যাণ্টিক গদ্যসাহিত্যকারদের মধ্যে জোশেফ কনরাড শ্রেষ্ঠ। বিস্তৃতক্ষেত্রে সমান্তরাল সাহিত্যের কথা না তুলেও অন্ততঃ বিচিত্র অভিজ্ঞতার দিক বিবেচনা করে আমাদের বাংলা সাহিত্যের সমরেশ বসুর সামগ্রিক সত্যানুসন্ধানের সঙ্গে কনরাডের তুলনা করা যায় কিনা ভবিষ্যতের সাহিত্য-সমালোচকরা হয়ত ভেবে দেখবেন।

গলসওয়ার্দি (John Galsworthy) ১৮৬৭-১৯৩৩

'সম্পদশালী মানুষ' (The Man of Property—১৯০৬), 'একজন ফরসাইটের জীবনে শরতের শেষভাগ' (Indian Summer of a Forsyte—১৯১৭), 'মালিকানা স্বত্ববিষয়ে বিচারাধীন' (In Chancery—১৯২০), 'জাগরণ' (Awakening —১৯২০) 'সহ্য করা' (To Let ১৯২১), এবং এই সবগুলিকে একত্রিত করে 'ফরসাইট পরিবারের কাহিনী' (The Forsyte Saga—১৯২২) গলসওয়ার্দির বিখ্যাত উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পরিবর্তনশীল সমাজে শহুরে, সম্পদলোভী উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের এক সুনিপুণ জীবনালেখ্য।

ব্যক্তিবিশেষ নয়, শ্রেণী এবং সামাজিক পরিবেশ ছিল গলসওয়ার্দির উপন্যাসের ব্যাখ্যাত বস্তু।

এর পরেও অনুরূপ বিষয়ে আরও উপন্যাস যা লিখেছিলেন সেগুলি ছিল 'সাদা বানর' (The White Monkey), 'রূপোর চামচ' (The Silver Spoon—১৯২৬) 'নীরব মিনতি' (A Silent Wooing—১৯২৭), 'যারা চলে যায়' (Passers By—১৯২৭), 'শেষ গান' (Swan Song—১৯২৮), এবং এগুলির একত্রিত রূপ 'আধুনিক কমেডি' (A Modern Comedy—১৯২৯)।

গলসওয়ার্দি জানতেন যে তিনি যে অপসৃয়মান জগতের কথা লিখে গেলেন তার জন্য কারোর দুঃখবোধ নেই। বিংশ শতাব্দী যতই এগিয়ে যাবে মানুষ ততই কিছু পাবার জন্য চেষ্টা করে যাবে, কিন্তু সেই 'কিছু' যে কি তা সে জানবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও একটা উন্নতিশীল সমাজ ও সমৃদ্ধি মানুষের স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তারপর দশকের পর দশক অতিক্রান্ত হতে থাকল, তবু মানুষ কোন সুস্থ পরিণতিতে আসতে পারল না। বিচ্ছিন্নতা, অসংলগ্নতা এবং লক্ষ্যহীনতা মানুষকে আর সুস্থির হতে দিলে না।

গলসওয়ার্দি ব্যক্তির চরিত্রের গতানুগতিক অর্থলিপ্সার থেকে সৌন্দর্য যে মহত্তর তা কিন্তু সামাজিক পরিবেশের বড় রকমের বর্ণনার ভিতরেও দেখিয়েছেন।

নাট্যকার হিসাবে গলসওয়ার্দি খুবই কৃতকার্য হয়েছিলেন।

সমারসেট মম (William Somerset Maugham) ১৮৭৪-১৯৬৫

সমারসেট মম বিংশ শতাব্দীর খুব জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। নামী উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'ল্যামবেথের লিজা' (Liza of Lambeth—১৮৯৭), 'মানুষে মানুষে বন্ধন' অথবা স্টিফেন কেরির 'শিল্পীজনোচিত মেজাজ' (Of Human Bondage or the Artistic Temperament of Stephen Carey—১৯১৫), 'চাঁদ ও ছয় পেন্স' (The Moon and Six Pence—১৯১৯), 'পানভোজন' (Cakes and Ale—১৯৩০), 'একান্ত ব্যক্তিগত' (Strictly Personal—১৯৪২) এবং 'ক্ষুরধার' (The Razor's Edge—১৯৪৪)।

সমারসেট মমের প্রথম জীবন ছিল বিচিত্র ও বিপজ্জনক। চিকিৎসক, সেবাব্রতী, এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনীর গোয়েন্দাবিভাগের কর্মচারী। প্রথম জীবনে কথা বলার ব্যাপারে একটা জড়তা ছিল—সহজভাবে কথা বলতে পারতেন না। এজন্য খুব লজ্জিত থাকতেন। এই দুর্বলতা হয়ত লিখিত আকারে বক্তব্য প্রকাশ করার ব্যাপারে একটা জেদ এনে দিয়েছিল।

সমারসেটে মমের উপর ফরাসী প্রভাব, বিশেষ করে এমিল জোলা (Emile Zola ১৮৪০—১৯০২) এবং মপার্শার (Guy De Maupassant ১৮৫০—১৮৯৩) প্রভাব খুব বেশী পড়েছিল। ফরাসী প্রভাব মানে হল খুবই বেশী রকমের খোলাখুলি বাস্তবতা। তবে ফরাসী প্রভাবের অন্য দিকও ছিল। সেই প্রভাব পড়েছিল মমের উপন্যাসের গঠন ও প্রকাশভঙ্গীর উপর।

প্রথম জীবনে মমের চারিত্রিক দুর্বলতা বাড়াবাড়ি রকমের ছিল এবং সেটাকে কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টাও ছিল প্রাণান্ত। এই সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি ছিল 'মানুষে মানুষে বন্ধন' (Of Human Bondage—১৯১৫)। এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির মত আছে কাহিনীর বর্ণনা ও অকথিত মন্তব্য। অন্যান্য উপন্যাসে আবার বর্ণনার বৈচিত্র্য বজায় রেখেই তিনি একজন গম্ভীর, তত্ত্বদর্শী, বিষণ্ন, অভিজ্ঞ মানুষের মত দূর থেকে যেন তার বিষয়বস্তুকে দেখেছেন।

ই. এম. ফর্স্টার (Edward Morgan Forster)

ফর্স্টার হচ্ছেন এমন একজন সাহিত্যিক যিনি নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে সমভাবেই মুক্ত, স্বচ্ছন্দ ও উদারনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত এফ. আর. লিভিস (F. R. Leavis) ফর্স্টার সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি ফর্স্টারকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রদ্ধা জানান এই কারণে যে ফর্স্টার ঐতিহ্যের অনুসরণ ও চিন্তার স্বাধীনতা দুই-ই তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ফর্স্টারের উপন্যাসে মূল ঐতিহ্যের অনুসরণ ছিল, কিন্তু তিনি গতানুগতিকতার বিরোধী ছিলেন।

যে জগৎ ফর্স্টারের উপন্যাসের পটভূমি তা ১৯২০ সালের পরের জগৎ অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের স্থায়ী প্রভাব যখন বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই সময় থেকেই ইংরাজের জীবন এবং সাহিত্য বিশিষ্টতার প্রভাব অনুভব করতে শুরু করেছিল।

ফর্স্টারের আধুনিকতা যে বিশেষ মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল তা ছিল সমসাময়িক মানবসভ্যতায় আত্মার অস্বাচ্ছন্দ্য।

ফর্স্টার একটি ধারণার উপর খুব জোর দিতেন। সেটি ছিল এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের সঠিক ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারণা। বুদ্ধি, সংস্কৃতি এবং অন্তরের জাগরণের উপর ফর্স্টারের আস্থা ছিল।

তাঁর উপন্যাস পাঁচটির নাম 'যেখানে দেবদূতেরাও পা ফেলতে ভয় পায়' (Where Angels Fear to Tread—১৯০৫), 'দীর্ঘতম ভ্রমণ' (The Longest Journey—১৯০৭), 'যে ঘর থেকে দেখা যায়' (A Room with a View—১৯০৮), 'হাওয়ার্ডস এণ্ড' (Howards End—১৯১০) এবং 'ভারতযাত্রা' (A Passage to India—১৯২৪)।

ফর্স্টারের লেখায় ম্যাথু আর্ণল্ডের (Matthew Arnold) 'মাধুর্য ও আলো' (Sweetness and Light), মানুষ মানুষে ভালবাসা ও মহৎ সংস্কৃতি ছাড়াও রয়েছে রুক্ষ পৌরুষতা যা 'যেখানে দেবদূতেরাও পা ফেলতে ভয় পায়' গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে, বা 'দীর্ঘতম ভ্রমণে' গ্রাম্য, প্রাণবন্ত, চাকচিক্যবিরহিত ভাব, অথবা 'যে ঘর থেকে দেখা যায়' গ্রন্থে নগ্ন মানবশরীরের সাহায্যে স্বাভাবিক জীবনের প্রতীকি উপস্থাপন। 'হাওয়ার্ডস এণ্ড' গ্রন্থে রয়েছে জীবনের নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের সঠিক সংবেদনশীল অনুভব এবং, যা আমরা সহজভাবে বুঝি, মানবতাবোধ সম্বলিত সফল জীবনের আদর্শ।

শেষ উপন্যাস 'ভারতযাত্রা'-তে রয়েছে হিন্দুর ধর্মীয় উৎসবের পিছনের অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক বিশ্বাসকে সম-অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা। খৃষ্টধর্মের পরিধির বাইরেও সেখানে তাঁর চিন্তাজগৎ ছড়িয়ে গেছে।

ডোরেথি রিচার্ডসন (Dorothy Richardson) ১৮৭৩-১৯৪১

ডোরেথি রিচার্ডসন উপন্যাস লেখার এক নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি একলা নন। জেমস জয়েস এবং ভার্জিনিয়া উলফও একই ধরনে চিন্তা করেছিলেন। কৌশলটি ছিল 'সচেতনতার ধারা' (Stream of Consciousness)। এই নতুন কৌশল অনুযায়ী লেখক তাঁর বক্তব্যকে বোঝানোর জন্য কোন চরিত্রের অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্বগতোক্তিকে ব্যবহার করেন। চরিত্রটি এই স্বগতোক্তি বাইরে প্রকাশ করে না। তার মনের ভিতরেই তা থেকে যায়। মনের অভ্যন্তরের এই ধারাবাহিক স্বগতোক্তি পরিশেষে একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে বাইরে প্রকাশিত হয়: একটিমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চারিত স্বগতোক্তির মারফৎ। একে পারম্পর্যযুক্ত অনেক সচেতনতার পরিণতিতে লব্ধ সচেতনতাও বলা যায়।

চরিত্র উপস্থাপনের এই নতুন কৌশলের বড় উপযোগিতা এই যে মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে সব সম্ভাবনার কথা আগে ভাবা যায়নি সেগুলি লেখকের সামনে, এবং লেখকের মারফৎ পাঠকের সামনে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এর অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, পাঠককে খুবই মনোযোগ দিয়ে লেখকের দ্বারা ব্যক্তিকৃত এই কৌশল অনুসরণ

করে যেতে হয়। এই অন্তর্নিহিত সচেতনতার কোন কালানুসারী পারম্পর্য থাকে না। বক্তব্যের অসংলগ্নতাও একটি বিশেষ অসুবিধা। এমন কি, ভাষা ও বর্ণনার সমাদরের চেয়ে শুধু বক্তব্য বিষয়ের সম্বন্ধে কৌতূহলটুকুই প্রধান হয়ে যেতে পারে। পাঠকের কাছে প্রাঞ্জল হওয়ার জন্য লেখক ছোটখাটো ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিতেও উৎসুক হতে পারেন।

এই কৌশল অবলম্বন করে ডোরোথি তেরটি উপন্যাস লেখেন। এর অনেকগুলি ১৯৩৮ সালে 'তীর্থযাত্রা' (Pilgrimage) নাম দিয়ে একটি সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়।

এই 'সচেতনতার ধারা' কৌশলটি বাংলা সাহিত্যের লেখকরা তেমন পছন্দ করেন নি। বুদ্ধদেব বসু এ' নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ('রুপালি পাখী') ; তবে মনে হয় তেমন সফল হননি।

জেমস জয়েস (James Joyce) ১৮৮২-১৯৪১

জেমস জয়েস আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক—ডাবলিনে জন্ম। শেষ জীবন অন্য দেশেই কেটেছিল। রোম্যান ক্যাথলিক বংশ। পরে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। সমস্ত জীবনটাই প্রচণ্ড অস্বাভাবিক।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি নাম 'ডাবলিনেব লোকেরা' (Dubliners—১৯১৪) ; 'শিল্পীর যৌবনের একটি স্পষ্ট বর্ণনা' (A Portrait of the Artist as a young Man—১৯১৬) ; ইউলিসেস (Ulysses—১৯২২) এবং 'ফিনেগানের জাগরণ' (Finnegan's Wake—১৯৩৯)।

'ডাবলিনের লোকেরা' গ্রন্থে আছে ডাবলিনের বস্তী-অঞ্চলের মানুষদের হীন জীবনের চিত্র।

শিল্পীর যৌবনের একটি স্পষ্ট বর্ণনার ভিত্তি সম্ভবতঃ তাঁর আত্মজীবন।

'ইউলিসেস' হোমারের ওডিসির (Odyssey) আদর্শে লেখা, তবে ডাবলিনের বস্তি অঞ্চলের দারিদ্রপীড়িত পরিবেশে এটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাচীন ওডিসির সঙ্গে গঠনগত ও অন্যান্য কিছু কিছু সাদৃশ্য বজায় রাখা হয়েছে। হোমার ইউলির্সেসকে নানা স্থানে ঘুরিয়ে এনেছেন, কিন্তু জয়েস লিওপোল্ড (Leopold) এবং মিসেস ব্লুমকে (Mrs. Bloom) চব্বিশ ঘণ্টায় শুধু মানসিক পরিভ্রমণ করিয়েছেন ডাবলিনের পরিসীমার ভিতরে। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন। প্রাচীন যুগের ভিন্ন আদর্শের জীবনের সঙ্গে বর্তমানের সীমাবদ্ধ আকাঙ্খার তুলনার কথা মনে আসে।

এখানে 'সচেতনতার ধারা' (Stream of Consciousness) এবং 'অন্তর্লীন স্বগতোক্তির' রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। 'ইউলিসেস' গল্পটি এত স্পষ্ট, অনাবৃতভাবে লেখা হয়েছে যে তা অশ্লীলতার অপরাধে নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'ফিনেগানের জাগরণ' গ্রন্থেও আরও বেশী করে 'সচেতনতার ধারা' ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যক্ষতঃ অসংলগ্ন স্বপ্নের ভিতব দিয়ে। একেবারে গোড়া থেকে মানবেতিহাসের ধারার বর্ণনায় ওই বিশেষ ধরন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিজের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, সমস্ত মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের সম্পর্ক জয়েসের লেখার বিষয়। লেখার ভাষা, তাঁর তৈরী করা নতুন শব্দ, অন্যভাষা থেকে নেওয়া শব্দ, যতিচিহ্নের কযেকটিকে বাদ দেওয়া বা অন্য রকমের ব্যবহার এবং মনো-বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁর লেখা শেষের দিকে এত জটিল হয়ে গেছে যে জায়গায় জায়গায় মানে করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কিন্তু লেখার এক ধরনের কাব্যগুণ, লেখকের আন্তরিকতা, দৃঢ়বিশ্বাস এবং ভাবগম্ভীরতা বারবার মনে করিয়ে দেয় বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ঔপন্যাসিকের প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসনের কথা।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ক্ষণস্থায়ী এবং অস্পষ্ট মানবিক বোধগুলিকে ধরে রাখার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

বর্তমান যুগের ঔপন্যাসিকদের নানা সমস্যার ভিতরে প্রধান হচ্ছে, বর্তমানের মানুষের উভয় সঙ্কটের মানসিকতা বর্ণনা করবার জন্য এমন কি নতুন কৌশল অবলম্বন করা যায় যা পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যাপারে জযেস যেন পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন।

জয়েস বক্তব্যের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এত স্বচ্ছন্দে এবং অতর্কিতে বিচরণ করেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কথা বোঝা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

তাঁর অনেক ছোটখাট লেখাকে তাঁর মৃত্যুর পরে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি কিছু কিছু লেখা ২০৫০ সালের আগে প্রকাশ করা হবে না বলেও সরিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আরও অনেক গোপনীয় কথা হয়ত থেকে গেছে।

চেতন এবং অবচেতন উভয়বিধ স্বত্তাকে একত্র করে জয়েস একটি সম্পূর্ণ জীবনের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর কথামত, স্থান ও কালের একটা কৃত্রিম ধারণা নিয়ে আমরা চলেছি। অতীত এবং বর্তমান, একস্থান এবং অন্যস্থান সবই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একই স্থানে এবং একই সময়ে আমরা নানা কালে এবং নানা স্থানে অবস্থান করছি। এটা বোঝানোর জন্য তিনি ভাষার সাধারণ গঠনভঙ্গিমা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। ভাষাকে সর্বাবস্থিতির (স্থানে ও কালে) বাহক হিসাবে ব্যবহার করার দরুণ তিনি অসাধারণভাবে আগতানুগতিক হয়েছিলেন। জগৎ অসংগঠিত হয়ে গেছে। তিনি তাকে পূর্ণ, সুসংগঠিত, এককেন্দ্রিক অবস্থানে আনতে চেয়েছিলেন।

একমাত্র ডি. এইচ. লরেন্স (D. H. Lawrence) ছাড়া জেমস জয়েসই এ যুগের সবচেয়ে মৌলিক ঔপন্যাসিক।

ভার্জিনিয়া উলফ (Virginia Woolf) ১৮৮২-১৯৪১

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতমা নেতৃস্থানীয়া মহিলা উপন্যাসিক। সূক্ষ্মবুদ্ধিদীপ্ত, উচ্চমানের সংস্কৃতিসম্পন্না এই মহিলা জীবনের—দর্শন-শ্রবণ-চিন্তার—কোন কিছুকেই উপন্যাসের আওতা থেকে বাদ দেননি। সাধু এবং উদার মানবিকতার অত্যন্ত সহজবোধসম্পন্ন রাশিয়ান ঔপন্যাসিকরাও যেমন, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকগণ, জীবনের

বৈচিত্রে পুলকিত ও শিহরিত ইংরাজ ঔপন্যাসিকগণও তেমনই উপন্যাসের বিরাট সৃজনশীল ক্ষেত্রে একই অধিকার নিয়ে বিচরণ করেন। বিষয় একটিই—মানুষের বহির্জীবন এবং তার অন্তর্লীন জীবন।

উলফের উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'জ্যাকবের ঘর' (Jacob's Room—১৯২২), 'মিসেস ড্যালোওয়ে' (Mrs. Dalloway—১৯২৫), 'বাতিঘরের দিকে' (To the Lighthouse—১৯২৭), 'অরল্যাণ্ডো—একটি জীবনী' (Orlando—A Biography—১৯২৮), 'ঢেউগুলি' (The Waves—১৯৩১), 'ঝলক' (Flash—১৯৩৩) এবং 'বছরগুলি' (The Years—১৯৩৭)।

'বাতিঘরের দিকে' সম্ভবতঃ উলফের সবচেয়ে সুন্দর উপন্যাস। 'ঢেউগুলি' যেন গদ্যে লেখা কবিতা। এটি প্রতীকি বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত লেখা। 'অরল্যাণ্ডোতে' একটি জীবনকে কয়েক শতাব্দী ধরে নানা মানুষের ভিতর দিয়ে অনুসরণ করা হয়েছে। এমনকি, একটা পর্যায়ে তার নারীজীবনে রূপান্তরের কথাও আছে।

ভার্জিনিয়া উলফ অন্তর্মুখী বাস্তবতার ব্যাখ্যাতা। 'সচেতনতার ধারাব' (Stream of Consciousness) কৌশলের তিনি অতি বিশিষ্ট প্রবক্তা। (ডোরোথি রিচার্ডসনের সম্পর্কে আলোচনার ভিতর 'সচেতনতার ধারার' ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হযেছে।)

ভার্জিনিয়া উলফ প্রচলিত রাজনীতিতে যোগ দেননি। জীবনের সর্ব অংশে সৌন্দর্যের সন্ধানে এবং আদর্শ সত্যের অনুসন্ধানে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাঁকে খুব আঘাত দিয়েছিল। এর আগেও অনেকবার তাঁর স্নায়ুর উপর আঘাত এসেছিল। তিনি স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হয়েছিলেন। উন্মাদ হযে গেলে তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পডবেন এই ভয় তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'আমরা একটা ভবিষ্যৎহীন জীবন যাপন করছি; এটা বড অদ্ভুত ব্যাপার। একটা বন্ধ দরজায় আমরা আমাদের নাক চেপে ধরেছি।'

এরপর কমপক্ষে অন্ততঃ একখানি বইয়েব আলোচনাও করা দরকার।—

বাতিঘরের দিকে (To the Lighthouse)

'বাতিঘরের দিকে' উপন্যাসটি ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয। এটি মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতামূলক উপন্যাস। এর ঘটনার সময় মোটামুটি ১৯১০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। স্থান: হেব্রাইডিস (Hebrides) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত 'স্কায়ি' (Skye) দ্বীপ। এর চরিত্রগুলি হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক র‍্যামসে (Mr. Ramsay), তাঁর স্ত্রী (Mrs. Ramsay), তিন ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলেদের দুজনের নাম এণ্ড্রু (Andrew) এবং জেমস (James), এবং মেয়েদের দুজনের নাম প্রু (Prue) এবং ক্যামিলা (Camilla)। এ ছাড়া পারিবারিক বন্ধু, অতিথি অভ্যাগত ইত্যাদি। অতিথিদের মধ্যে আছেন টসলি (Mr. Tausley); তিনি র‍্যামসের বন্ধু। আর আছে শিল্পী লিলি ব্রিসকো (Lily Briscoe), কবি কারমাইকেল (Mr. Carmichael) এবং আরও দুএকজন। স্কায় দ্বীপে র‍্যামসেদের গ্রীষ্মাবাস। এইখানেই কাহিনীর শুরু এবং শেষ। মাঝখানের অংশ অন্য জায়গায়।

কাহিনী

র‍্যামসে গৃহিনী তাঁর সাত বছরের ছেলে জেমসকে বলে রেখেছেন পরের দিন তাঁরা নৌকা করে বাতিঘর দেখতে যাবেন। শ্রীযুক্ত র‍্যামসের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবাকে খুব একটা পছন্দ করে না। তিনি তাদের সম্বন্ধে প্রায়ই বক্রোক্তি করেন। টসলিকেও তারা দেখতে পারে না। তাদের নানা দুর্বলতা নিয়ে তিনি খুব পরিহাস করেন।

যাই হোক, ওই দিন দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকাল গড়িয়ে গেল। র‍্যামসে গৃহিনীর মনে এটা ওটা নানা কথা এল, গেল। এ সব ছোটখাট ভাবনা তাঁর নিজস্ব। বলার মত কিছু নয়; আবার আপনিই কত কথা মনে হয়। এই কাহিনীর আসল লোক এই র‍্যামসে গৃহিনী। দুঃখ-সুখ মিলিয়ে তাঁর সংসার ছবির মত, কবিতার মত, হালকা বাতাসের মত। তিনি জীবনের শিল্পী। জীবনকেও গুছিয়ে গাছিয়ে সাজিয়ে রাখতে চান। খাওয়া দাওয়ার পরে তিনি ছেলেমেয়েদের ঘরে গেলেন, তারপর লাইব্রেরীতে গিয়ে বসলেন। তাঁর স্বামীও সেখানে সন্ধ্যাবেলাটা কাটিযে দেন। সন্ধ্যার পর থেকে ঝোড়ো হাওয়া দিতে থাকল। পরের দিন বাতিঘর দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা বাতিল করে দিতে হল। দিনের পর দিন কোন না কোন অসুবিধা দেখা দিল। গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে গেল। বাতিঘর দেখা হল না। সবাই বাড়ী ফিরে গেলেন। বাডী দেখাশোনার দায়িত্ব থেকে গেল ওখানকারই লোক মিসেস ম্যাকনাবের (Mcnab) উপর।

এর পর অনেক ঘটনা ঘটে গেল। মিসেস র‍্যামসে মারা গেলেন। মেয়েদের একজন প্রু-র (Prue) বিয়ে হল; সে মারা গেল। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল। ছেলেদের একজন মারা গেল যুদ্ধে। স্কায়ির বাডী, বাগান, ঘরদোর দিনের পর দিন মলিন, শ্রীহীন হতে থাকল। সেখানে আর এদের যাওয়া হয না। যুদ্ধ থামল। এরপর আবার র‍্যামসে-রা সেখানে গেলেন। আগেকার কেউ আছে, কেউ নেই।

আর একবার চেষ্টা হল বাতিঘর দেখতে যাওয়ার। শ্রীযুক্ত র‍্যামসে, ছেলে জেমস, মেয়ে ক্যামিলা শুধু এই তিনজন। শিল্পী লিলি ব্রিসকো বাড়ীতে থেকে গেল। অসম্পূর্ণ এই বাড়ীটার ছবি সে এবার শেষ করবে। যখন ছবিটি আরম্ভ হয়েছিল তখন র‍্যামসে গৃহিনী বেঁচে ছিলেন।

নৌকায় করে যাবার সময়েও জেমস বাবার সামনে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক হতে পারছিল না। নৌকা যখন বাতিঘরের দ্বীপে গিয়ে পৌঁছাল প্রৌঢ় শ্রীযুক্ত র‍্যামসে লাফিয়ে নৌকা থেকে নামলেন। ছেলে মেয়েদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, আর জেমসের নৌকা চালানোর বাহাদুরির খুব তারিফ করলেন।

মন্তব্য

হেব্রাইডিস দ্বীপপুঞ্জে বিন্যস্ত এই গল্পটিতে যেন একটা অন্যজগতের ছবি। কি এক ধরনের! বাস্তব বটে, কিন্তু প্রচলিত অর্থে গল্প নেই। প্রায় সকলেরই, বিশেষ করে মিসেস র‍্যামসের, মনে ছোটখাট কত চিন্তাভাবনা। বইটির গঠনও আগেকার দিনের

উপন্যাসের মত নয়। 'সচেতনতার ধারা' খুব গভীরে না গেলেও, সমস্ত কাহিনীটিকে ধরে রেখেছে। পাঠকের মনে একটা ধীর এবং স্থায়ী প্রভাব পড়ে। অতীতের প্রভাব পড়েছে বর্তমানে : আর অতীত-বর্তমান সব মিলে মিশে যাওয়ায় বইটির ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স (David Herbert Lawrence) ১৮৮৫-১৯৩০

লরেন্স ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন, আধুনিকতম মানসিকতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভা সবচেয়ে বেশী সার্থক হয়েছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ অপ্রভাবিত নিজস্ব চিন্তার মানুষ।

লরেন্সের বাবা ছিলেন একজন খনি-শ্রমিক। খনির বস্তি অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন এবং কাছাকাছি গ্রামের কৃষকদের জীবন, —সবই তিনি তাঁর আশ্চর্য চেতনা দিয়ে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট চিত্রকর ছিলেন। অন্ততঃ চারটি ভাষা জানতেন। ঐতিহ্যের বোধ ছিল এবং অসাধারণ বিজ্ঞতা ছিল। কোন কোন মতে ডি. এইচ. লরেন্স এ যুগের একমাত্র প্রতিভা।

লরেন্স অর্থগৃধ্নুতা এবং তথাকথিত আধুনিক জীবনযাত্রাকে ঘৃণা করতেন। ওগুলিকে তাঁর মনে হয়েছিল মনেব কাছে শরীরের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া। তিনি সজীবতা-বর্ধনের পক্ষে ওকালতি করেন নি। তিনি কোন উপদেশ দেননি। তার লক্ষ্য ছিল, পাপবোধের দ্বারা মানুষের সচেতনতা কলঙ্কিত হবার আগে এবং পুরুষ নারীভাবাপন্ন হওয়ার আগে প্রাথমিক পর্যায়ে ইডেন উদ্যানে অবস্থান কালে আদিম নরনারী যখন অপাপবিদ্ধ ছিল তখনকার মৌল শক্তিতে মানুষকে আবার অভিষিক্ত করা।

লরেন্সের মতে সুসভ্য নারী পুরুষের কাছ থেকে টেনে নেয তার পুরুষত্ব, তার পৌরুষ। তাই লরেন্সের লেখায় নারীবিরোধী একটা প্রবল উন্মাদনা দেখা যায।

আমাদের মত সীমাবদ্ধবোধের মানুষের তুলনায বিস্ময়কর স্বচ্ছদৃষ্টি লরেন্সের ছিল। আর, এই স্বচ্ছদৃষ্টির জন্য প্রেম ও ঘৃণার, সৃষ্টি ও ধ্বংসের নৈকট্য তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

লরেন্স ছিলেন পুণরভ্যুদয়ী পবিত্রতাবাদী। কিন্তু একসময়ে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছিল লম্পট বলে। যৌনবোধের মধ্যে যে সৃজনশীল শক্তি রয়েছে তার প্রচণ্ড গুরুত্ব সম্বন্ধে নরনারীকে তিনি সচেতন করতে চেয়েছিলেন। কেবলমাত্র আমোদপ্রমোদপূর্ণ প্রেমের মূল্য তিনি কখনো স্বীকার করেন নি।

জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত প্রণয়পীড়িত স্ত্রীলোককে লরেন্স মনে করতেন 'হার্পি' (Harpy—অর্ধনারী অর্ধপক্ষী পৌরাণিক দানবী)। সে যাকে ভালবাসে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে ; তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে ; তার সমস্ত অস্তিত্বকে আত্মসাৎ করে ফেলে। এই কারণে লরেন্সের পুরুষদের ভিতর একটা অদ্ভুত প্রবণতা আসে। ওই সব নারীদের সঙ্গে যেমন তাদের ভালবাসার সম্পর্ক, তেমনি প্রচণ্ড শত্রুতারও সম্পর্ক।

নারী-পুরুষের এই তিক্ত বিরোধিতা সীমিত পরিসরে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু লরেন্স এই বিরোধিতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন! তাঁর প্রধান এবং অটল উদ্দেশ্য ছিল যৌন বিষয়ের প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন। তিনি মানুষকে সেই লজ্জাচ্ছন্নতা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন যা যৌন বিষয়কে ইতর বিষয় বলে দেখাতে চায়। তিনি চেয়েছিলেন নারী ও পুরুষ উভয়েই যেন পূর্ণভাবে, সমগ্রভাবে, সৎভাবে ও পরিচ্ছন্নভাবে যৌনবিষয় সম্পর্কে ভাবতে পারে।

লরেন্স চেয়েছিলেন যৌনতা হোক শুদ্ধ, কেন্দ্রীয় জীবনাগ্নির উৎস। মন এবং দেহের, মস্তিষ্ক এবং রক্তের মাঝখানে বাধার প্রাচীর তোলার আধুনিক দ্বৈতবাদের অস্তিত্বে তিনি দুঃখবোধ করেছেন। ধূসর মনুষ্যদ্বেষিতা মনের কারাগারে শরীরকে বদ্ধ করে রেখেছে। তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন।

লরেন্সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকগুলি হচ্ছে—'সাদা ময়ূর' (The White Peacock—১৯১১), 'অনধিকার প্রবেশকারী' (The Trespassers—১৯১২), 'সন্তানেরা ও প্রেমিকেরা' (Sons and Lovers—১৯১৩), 'রামধনু' (The Rainbow—১৯১৫), 'প্রণয়াসক্ত স্ত্রীলোকেরা' (Women in Love—১৯২১), 'দীর্ঘ সরল পুষ্পবৃন্ত বিশিষ্ট আরণ বৃক্ষ' (Aaron's Rod--১৯২২), 'ক্যাঙ্গারু' (Kangaroo—১৯২৩) 'ঝোপের ভেতরের ছেলেটা' (The Boy in the Bush—১৯২৪), 'পালকপরা সরীসৃপ' (The Plumed Serpent—১৯২৬), এবং 'লেডি চ্যাটার্লি'র প্রেমিক' (Lady Chatterley's Lover—১৯২৯)।

শ্রীযুক্ত এফ. আর. লিভিস (F. R. Leavis) বলেছেন,—লরেন্স শেক্সপীয়র ছিলেন না, কিন্তু প্রতিভা তাঁর ছিল। তাঁর প্রতিভা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে অন্তর্নিহিত সত্ত্বার অস্তিত্বকে অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দ্রুত চেতনা ও ধারণার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্বোপার্জিত ক্ষমতার মাধ্যমে।

ই. এম. ফর্স্টার (E. M. Forster) বলেছেন,—লরেন্স হচ্ছেন আজকের দিনের একমাত্র দিব্যপ্রেরণাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বক্তা ঔপন্যাসিক। তিনিই একমাত্র ঔপন্যাসিক যিনি সঙ্গীতপ্রধান কাব্যপ্রসাদে আবিষ্ট, যাঁকে সমালোচনা করা অর্থহীন। তিনি মানবধর্মের উৎসাহী উপদেষ্টা। তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা এবং দুরূহতার অভিযোগকে তুচ্ছ করাই ভাল।

অল্ডাস হাক্সলি (Aldous Huxley) ১৮৯৪-১৯৬৫

অল্ডাস লিওনার্দ হাক্সলি পিতার দিক থেকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টি. এইচ. হাক্সলির এবং মায়ের দিক থেকে ম্যাথু আর্ণল্ডের (Matthew Arnold) উত্তর পুরুষ। দুই ধারারই প্রভাব তাঁর ভিতর ছিল। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। ডি. এইচ. লরেন্সের সাহসিকতা তাঁর ভিতরেও ছিল। তাঁর লেখায় চরিত্র ভিত্তিগতভাবে কমিক ও ব্যঙ্গাত্মক। উপন্যাসে নতুনতর গঠনরীতির প্রয়োগ এবং মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের বৈশিষ্ট্য হাক্সলিকে একজন সফল ঔপন্যাসিক ও গদ্যলেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের

ইউরোপের ইতিহাসের প্রকৃতি তাঁর চিন্তামূলক গদ্যলেখা ও উপন্যাসগুলির পিছনে কাজ করেছে।

হাক্সলি অনেকগুলি উপন্যাস এবং মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'জ্বলন্ত চক্র' (The Burning Wheel,—১৯১৬। 'যৌবনের পরাজয়' (The Defeat of Youth—১৯১৮), 'লেডা' (Leda—১৯২০), 'ক্রোম ইয়েলো (Crome Yellow—১৯২১), 'এ্যান্টিক হে' (Antic Hay—১৯২৩), 'সেই নিষ্ফল ছুটিগুলি' (Those Barren Leaves—১৯২৫), 'যুক্তি পাল্টা যুক্তি' (Point Counter Point—১৯২৮), 'নতুন সাহসী পৃথিবী' (Brave New World—১৯৩২), 'গাজাতে চক্ষুহীন' (Eyeless in Gaza—১৯৩৬), 'অনেক গ্রীষ্মের পর' (After Many a Summer—১৯৩৯), 'সময়কে এক জায়গায় থামতেই হবে' (Time must have a stop—১৯৪৪) এবং 'চিরকালের দর্শন' (The Perennial Philosophy—১৯৪৬)।

বিভিন্ন উপন্যাসে হাক্সলি আধুনিক সভ্যতায় যে সুস্থতার অভাব রয়েছে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন, এবং একটা সমাধান চেয়েছেন। হাক্সলির সমস্যা হচ্ছে সুস্থ মানবিক সভ্যতা ফিরিয়ে নিযে আসতে গেলে কি জাতীয় মানুষ দরকার তা জানা এবং জানানো। হাক্সলির কথা হচ্ছে বুদ্ধিকে সাধারণ মানুষের বোধগম্যভাবে ব্যবহারিক করা হোক, প্রাণবন্ত করা হোক। তা যতদিন না করা যায় ততদিন হাক্সলি আধুনিক সভ্যজগৎকে ব্যঙ্গ করে যাবেন।

এবার আমরা 'গাজাতে চক্ষুহীন' (Eyeless in Gaza) উপন্যাসটি প্রসঙ্গে অল্পকিছু আলোচনা করব।

'গাজাতে চক্ষুহীন' (Eyeless in Gaza)

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে।

উপন্যাসের প্রকৃতি নিয়ে 'যুক্তি পাল্টা যুক্তিতে' (Point Counter Point) আলোচনা আছে। সেই আলোচনা, ডারউইন তত্ত্ব এবং আধুনিক জগৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত একটা বিশেষ ধরনের খাতে প্রবাহিত ও প্রসারিত করে 'গাজাতে চক্ষুহীন' (Eyeless in Gaza) লেখা হযেছে। উপন্যাসটি লেখার উদ্দেশ্যও পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

হাক্সলির মতে ব্যক্তিজীবনের গৌরবের পুণরভ্যুদয়ের মাধ্যমেই সভ্যতাকে বাঁচান যায়। এই মত প্রচার করাটাই তাঁর উদ্দেশ্য। 'গাজাতে চক্ষুহীন' উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি এই উদ্দেশ্য সার্থক করতে চেয়েছেন।

বিভিন্ন উপন্যাসে—'গাজাতে চক্ষুহীন' উপন্যাসেও—হাক্সলির চরিত্রগুলি টাইপচরিত্র।

সামগ্রিকভাবে মানুষ জাতির কথা যেখানে বলতে হচ্ছে সেখানে বক্তব্য বোঝানোর জন্য টাইপচরিত্রই কাযকরী।

'গাজাতে চক্ষুহীন' উপন্যাসের গঠনের বৈশিষ্ট্য খুবই উল্লেখযোগ্য। ওই দিক থেকেও এই উপন্যাসটিকে হাক্সলির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলা যায়।

কাহিনীটিকে সময়ের হিসাবে তিন স্তরে রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে একটি

ডায়েরীর প্রত্যক্ষ সময়। এন্টনি বিভিসের (Anthony Beavis) ডায়েরী—১৯৩৪ সালের। তার নিচে রয়েছে ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসের কয়েকটি ঘটনা। ওই ঘটনাগুলি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত ডায়েরীর সময়কেও অতিক্রম করে গেছে। এরও নিচে রয়েছে এন্টনি এবং তার বন্ধুবান্ধবদের অনেক আগেকার জীবন। সেই আগেকার জীবনকেও আবার তিনটি স্তরে দেখান হয়েছে। একটি ১৯০২ থেকে ১৯০৪ সালের ভিতর, তার পরেরটি ১৯১২ থেকে ১৯১৪ সালের ভিতর এবং তৃতীয়টি ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ সালের ভিতর।

কিন্তু সঠিকভাবে কালানুক্রমিক বিবরণ উপন্যাসটিতে নেই। স্তরগুলিকে তাসভাঁজার মত করে যেন ভেজে নেওয়া হয়েছে। এরকম করার ইঙ্গিতও লেখক আগে থেকেই দিয়েছেন। আমাদের সকলের ভিতরেই যেন এক একটি পাগল রয়েছে। আমাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের মনের ভিতরের ফটোগুলিকে সে সবসময়েই উলটে পালটে দিচ্ছে। সুতরাং স্মরণে-আনা ছবিগুলিকে আমরা পরপর সাজিয়ে রাখি না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সেগুলিকে সব সময়ে আমরা অবিন্যস্ত করে দিই। তবে উপন্যাসের লেখক এই অবিন্যাসকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখেন। এ্যালবামে পুরানো ছবিগুলি দেখতে দেখতে এন্টনির মনে ওই ছবিগুলির সঙ্গে জড়িত নানা ঘটনা ও অনুভূতি এসে ভীড় করতে থাকে। এগুলি যে পরপর সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে তা নয়। এই হচ্ছে বাস্তবজীবনের স্বাভাবিক প্রতিফলন, কৃত্রিম পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজান নয়।

একটা সত্য এই যে বহুসংখ্যক এই স্মৃতি—ঘটনাগত, বস্তুগত ও চিন্তাগত—আমরা সকলেই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বর্তমানের মনে নিয়ে আসি, এবং এগুলিকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতের কথাও ভাবি। চলমান জীবনের এই হচ্ছে যথার্থ প্রতিচ্ছবি। অতীত বর্তমানের মধ্যে থেকে গেছে, এবং এই বর্তমানে ভবিষ্যতের নানা ছবি তৈরী হতে থাকে। এখনি, এই মূহুর্তে, আমরা একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভিতরে বেঁচে রয়েছি।

জর্জ অরওয়েল (George Orwell) ১৯০৩-১৯৫০

জর্জ অরওয়েল ছিলেন পুরুষালী প্রকৃতির লেখক। মানুষের জীবনের যে দিকটি জনসম্পর্কযুক্ত সেই দিকটির সঙ্গেই তার উপন্যাসগুলি সংশ্লিষ্ট। নরনারীর জীবনের নানা ঘটনা, ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ, —এগুলি তাঁর উপন্যাসের প্রধান বিষয় নয়। তীব্র বিদ্রুপের সুর তাঁর উপন্যাসে। আবার অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষের সমর্থনে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে আবেগের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি তাঁব নিজস্ব ধরনে মানবসমাজের সংস্কারের পথ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছেন। সেই সেঙ্গে তিনি তার স্বদেশ ইংল্যাণ্ডকে সর্বান্তঃকরণে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছিলেন।

অরওয়েলের শেষ উপন্যাস '১৯৮৪' (1984), ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাসে ব্যঙ্গ ও সহানুভূতির পথ ধরে লেখক আতঙ্কজনক ভবিষ্যত সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। ওসিয়ানিয়া নামক একটি কাল্পনিক দেশে একটি অদ্ভুত বিকৃত সমাজ রয়েছে। সে দেশে টেলিভিসনের মাধ্যমে মানুষের ভিতর আতঙ্ক

সৃষ্টি করা হয়। প্রতিটি মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ, ধাপ্পাবাজি, সাধারণ মানুষের ভিতর মানসিক বিষাদজনিত উত্তেজনা, —এগুলিও রয়েছে। চিন্তার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রয়েছে পুলিসী ব্যবস্থা। সর্বোপরি রয়েছে সর্বশক্তিমান ভয়ঙ্কর রহস্যময় নেতা 'বড ভাই' (Big Brother)। এতখানি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র কল্পনাতেই সম্ভব। হয়ত অরওযেল তাঁর বক্তব্য বোঝানোর জন্য কিছুটা আধিক্যের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভাষা ও ব্যঙ্গ সৃষ্টি করার ক্ষমতা অসাধাবণ।

অরওয়েলেব এই উপন্যাসের পিছনে হয়ত ফরাসী বিপ্লবের সমসামযিক বিমর্ষতাবাদী লেখক মার্কুইস ডি সেডের (Marquis de Sade) প্রভাব বযেছে।

অরওয়েলের এই লেখাকে অনেকে সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে ভুল করেছেন। অরওযেল সারাজীবন বৃটিশ শ্রমিক পার্টির (Labour Party) কট্টর সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত রাজীনীতি ও বিশ্বাসকে যাচাই কবে নিতে চেযেছিলেন। তিনি নিজের চিন্তার স্বাধীনতাকে কখনও অবদমিত হতে দেননি। তাঁর নৈতিকতা ও সততা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল।

গ্রাহাম গ্রীণ (Graham Greene) ১৯০৪-১৯৯১

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে যাঁরা ইংবাজী উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে গ্রাহাম গ্রীণের স্থান উপরের দিকেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের বিষয আত্মস্বরূপ উদ্ঘাটন, মানসিক সংঘাত, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং বোধশক্তির নিষ্ক্রিয়তা। গ্রাহামের উপন্যাসগুলির মধ্য দিযে আধুনিক জগতের যে পরিচয আমরা পাই তা আমরা না চাইতে পারি ; কিন্তু তাকে অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে ; তাকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করা যাবে না। বিদ্রোহ করার প্রচ্ছন্ন একটা লক্ষ্য যেন সামনে ধরা হয়—সত্যের সন্ধানে মানবাত্মার বিদ্রোহ।

কিন্তু বুদ্ধি ও বিজ্ঞতা দিযে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জোরই বা আমাদেব কোথায়! জীবনের মূল নোঙর যে আমাদের ছিঁড়ে গেছে।

গ্রাহাম গ্রীণ আধুনিক জীবনের সমস্যার কোন পরিষ্কাব সমাধান দেখাতে পারেন নি। কিন্তু তিনি বর্তমান জগৎ ও জীবনকে তির্যকভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে গেছেন। উপন্যাস স্থগিত রেখে তিনি উপদেশ দিতে বসেননি। ঘটনার ব্যাখ্যা তিনি প্রায় পুরোপুরি পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন!

গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাসগুলিব মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

'ভিতরের মানুষটি' (The Man Within—১৯২৯), 'কর্মশক্তি প্রয়োগের নাম' (The Name of Action—১৯৩০), 'দিনের শেষে পাঁচজনের কথা' (Rumour at Nightfall—১৯৩১), 'এক লড়াইয়েব ময়দান' (It's a Battlefield—১৯৩৪), 'আমাকে তৈরী করেছে ইংল্যাণ্ড' (England Made Me—১৯৩৫), 'ব্রাইটনে বেড়ানর জায়গা' (Brighton Rock—১৯৩৮), 'বিশ্বস্ত প্রতিনিধি (The Confidential

Agent—১৯৩৯), 'শক্তি ও গৌরব' (The Power and the Glory—১৯৪০), 'ভীতিপ্রদ সরকারী বিভাগ' (The Ministry of Fear—১৯৪৩), এবং 'পদার্থের অন্তরে' (The Heart of the Matter—১৯৪৮)।

উপন্যাসের কথা শেষ করা গেল। বহু বিশিষ্ট লেখকই বাদ পড়ে গেলেন।

ছোটগল্প (Short Story)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে 'ছোটগল্প' তার নিজস্ব ধরনে এবং উপন্যাস থেকে আলাদাভাবে ইংরাজী সাহিত্যে প্রকাশ পেতে থাকে।

এরও আগে, ইংল্যাণ্ডের বাইরে, বেশ কিছু উচ্চমানের ছোটগল্প দেখা গিয়েছিল ফ্রান্সে, আমেরিকায় এবং রাশিয়ায়। ফ্রান্সে বালজাক (Honore de Balzac ১৭৯৯—১৮৫০), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এডগার এলান পো (Edgar Allan Poe ১৮০৯—১৮৪৯) এবং রাশিয়ায় গোগোল (Nikolai Gogol ১৮০৯—১৮৫২) এবং টুর্গেনিভ (Ivan Turgenev ১৮১৮—৮৩) ছোট গল্প লিখেছিলেন।

ছোটগল্পের আলাদা অস্তিত্ব, জনপ্রিয়তা এবং প্রসারের পিছনে ছিল দ্রুত ধাবমান আধুনিক জীবন, সাময়িক পত্রিকাগুলির উপযোগিতা অনুধাবন এবং সেগুলির প্রচার।

এডগার এলান পোর কথা উদ্ধৃত করে শ্রীযুক্ত হাডসন (W. H. Hudson) ছোট গল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং তার নিজস্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন

ছোটগল্প গদ্যে লেখা কাহিনী যা পড়তে আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা, কি বড়জোর দুঘণ্টা সময় লাগতে পারে। অথবা, একটু অন্যভাবে বলা যায়, ছোটগল্প হচ্ছে এমন মাপের কাহিনী যা একজায়গায় বসে একটানা পড়ে ফেলা যায়।

ছোটগল্পের লক্ষণ সম্বন্ধে সকলেই বলেছেন, ছোটগল্প ক্ষুদ্রাকারে উপন্যাস নয়। ছোটগল্পের বিষয়কে সীমিত পরিসরের ভিতরেই যথোপযুক্তভাবে পরিবর্ধিত করতে হয়। ক্লাসিক নাটকের স্থান, কাল ও ঘটনার 'ঐক্যের' মত ছোটগল্পেরও প্রেরণা, উদ্দেশ্য ও ঘটনাপ্রবাহ থাকা চাই। ছোটগল্পকে আর একটি যোগ্যতা বজায় রাখতে হয়। সেটি হচ্ছে পাঠকের মনে প্রভাব বিকাশনের ক্ষমতা।

ঘটনা একটি না-ও হতে পারে, কিন্তু এক বা একাধিক ঘটনা ঘটানোর লক্ষ্য একটিই থাকবে। উদ্দেশ্য এবং সফল উদ্দেশ্যের ফলপ্রদতা একই থাকবে। কোন ভাবেই তার ঘনসন্নিবিদ্ধভাব বাহুল্যের দ্বারা হালকা বা তরল করা যাবে না।

ছোটগল্পের গঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আর. এল. স্টিভেনসন তিন রকমের আদর্শের কথা বলেছেন। লেখক প্রথমে ধারাবাহিক ঘটনার একটা খসড়া করে নিতে পারেন। অথবা, তিনি একটি চরিত্রের পরিকল্পনা করে নিয়ে নানা পরিস্থিতি ও নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে তাকে এমনভাবে চালিত করতে পারেন যে চরিত্রটির একটি সাহিত্যিক

প্রভাব পাঠকের মনের উপর পড়ে। কিংবা, আর একভাবে, তিনি মনে মনে একটা পরিস্থিতির ধারণা করে নেন। বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের নানা কাজ এই পরিস্থিতিকে যেন সুপরিস্ফুট করে এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি গল্পটিকে লিখতে পারেন।

ইংরাজ ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে প্রথম দিকে যাঁরা এর প্রচলন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম করতে হয। সঙ্গত কারণেই ওয়েলস এর নাম এখানে প্রথমেই মনে পড়ে।

মিসেস এলিজাবেথ ক্লেগহর্ণ গ্যাসকেল (Mrs. Elizabeth Cleghorn Gaskell ১৮১০—৬৫)। এঁর লেখা ছোটগল্প 'My Lady Ludlow' (১৮৫৮) এবং 'Cousin Phyllis' (১৮৬৩—৬৪)।

এণ্টনি ট্রলপ (Antony Trollope ১৮১৫—৮২)। এঁর লেখা গল্পসংগ্রহ 'After Dusk'। জর্জ এলিযটের (George Eliot বা Mary Ann Evans ১৮১৯—৮০) নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এবপর রযেছেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন (Robert Louis Stevenson ১৮৫০—১৮৯৪)। ছোটগল্পের জনপ্রিযতার হিসাবনিকাশ এঁর লেখা উপন্যাস ও গল্প থেকেই প্রথম সঠিক ধারণা করা যায।

'বোতলের ভিতরের শযতান' (The Bottle Imp) তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প। ১৮৮২ সালের 'আরব্য রজনীর আরও গল্প' (The New Arabian Nights) থেকেও ছোটগল্পের সুন্দর ধারণা পাওয়া যায। তাছাড়া, "রত্নদীপ" (Treasure Island—১৮৮৩) এবং 'ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের অদ্ভুত কাহিনীও' (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde—১৮৮৬) পরবর্তীকালের ছোটগল্পের প্রেরণা হয়েছিল। শেষোক্ত দুটি বই-এর কথা আমরা উপন্যাসপ্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করেছি।

এর পর স্যার আর্থার কোনান ডযেলের নাম করতে হয (Sir Arthur Conan Doyle ১৮৫৯—১৯৩০)। ইনিই সেই বিশ্ববিখ্যাত গোযেন্দা 'শার্লক হোমসের' স্রষ্টা। বইটির নাম 'শার্লক হোমসের দুঃসাহসিক অভিযানসমূহ" (The Adventures of Sherlock Holmes—১৮৯১)। গল্পগুলি ছোটগল্পের সুন্দর এবং সুখপাঠ্য দৃষ্টান্ত।

এরপর থাকছেন রাডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling ১৮৬৫—১৯৩৬)। এঁর বহুগল্প ও কবিতা আমাদের দেশে পাঠ্য হিসাবেও ব্যবহার হয়। ১৮৮৮ সালের ভিতরে যে সব গল্প লিখেছিলেন তার কয়েকটির নাম: Plain Tales of the Hills, Soldiers Three, In Black and White, Under the Deodars, The Phantom Rickshaw, Wee Willie Winnkie। এছাডাও ছিল ১৮৯১ সালে 'Life's Handicap', ১৮৯৩ সালে 'Many Inventions', ১৮৯৪ সালে 'The Jungle Book', ১৮৯৫ সালে 'The Second Jungle Book', ১৮৯৯ সালে 'Captain Courageous', ১৮৯৮ সালে 'The Day's Work', ১৮৯৯ সালে Stalky & Co., ১৯০২ সালে 'Just-so Stories', ১৯০৬ সালে 'Puck of Pook's Hill' এবং ১৯১০ সালে 'Rewards and Fairies'।

এর সবগুলিই যে সঠিকভাবে ছোট গল্প তা নয়, কিন্তু ছোটগল্পের উদ্দেশ্য প্রায় সবগুলিতেই কার্যকরী করান হয়েছে।

এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত গল্পের উল্লেখও করতে হয়।

এনক আর্ণল্ড বেনেট (Enoch Arnold Benett ১৮৬৭—১৯৩১) ঔপন্যাসিক হিসাবেই খ্যাতিমান। তাঁর লেখা 'Tales of the Five Towns'(১৯০৫) এবং The Grim smile of the Five Towns (১৯০৭) সুন্দর গল্পসংগ্রহ।

জন গলসওয়ার্দির (John Galsworthy ১৮৬৭—১৯৩৩) গল্পসংগ্রহের নাম 'Caravan'। এটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

সামারসেট মমের (Somerset Maugham ১৮৭৪—১৯৬৫) গল্পসংগ্রহের নাম 'The Trembling of a leaf'—১৯২১।

ই. এম. ফর্স্টার 'The Celestial Omnibus' নাম দিয়ে ১৯১১ সালে ছটি গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

১৯১৪ সালে 'Dubliners' গ্রন্থে নতুন ধরণের ছোটগল্প লিখলেন জেমস জয়েস (James Joyce ১৮৮২—১৯৪১)।

ওই একই বছরে ডি. এইচ. লরেন্সের (D. H. Lawrence ১৮৮৫—১৯৩০) 'The Prussian Officer' প্রকাশিত হয়।

ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড (Katherine Mansfield ১৮৮৮—১৯২৩) অনেকগুলি অতি উচ্চমানের ছোট গল্প লিখেছেন। ১৯১১ সালে তাঁর গল্পসংগ্রহ In a German Pension প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে Bliss and Other Stories, ১৯২২ সালে The Garden Party এবং ১৯২৩ সালে 'The Dove's Nest' প্রকাশিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট এবং খ্যাতিমান লেখক হার্বার্ট আর্নেষ্ট বেটস (১৯০৫—১৯৭৪)। এঁর গল্পসংগ্রহের নাম 'Seven by Five' (১৯৬৩)।

স্বাভাবিক কারণেই বহু ছোটগল্পকার এবং তাঁদের গল্পের নাম বাদ পড়ে গেল। তবে, আশা করি, পাঠক মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছেন। ছোটগল্পের ভিত্তি যাঁরা প্রথম থেকেই সুদৃঢ় করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Herbert George Wells (১৮৬৬—১৯৪৬)। ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে লিখিত তাঁর বৈজ্ঞানিক রোম্যান্সগুলি পরবর্তীকালের ছোটগল্পের অফুরান উৎস। প্রথমদিকে আধুনিক ইংরাজী ছোটগল্পের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছিলেন ফরাসী সাহিত্যিক মঁপাশাঁ (Guy de Maupassant ১৮৫০—১৮৯৩) এবং রাশিয়ান সাহিত্যিক চেকভ (Anton Chekhov ১৮৬০—১৯০৪)। মঁপাশার গল্প চরিত্র-প্রধান। চরিত্রগুলি সাদাসিধা ও আন্তরিক। চেকভের গল্পে চরিত্রগুলির সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ রয়েছে। এঁদের উভয়েই কাহিনী বা গল্পের সূত্র খুব সুন্দরভাবে ধরে রেখেছেন। পরে ধীরে ধীরে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এবং শেষের দিকে, ইংরাজী ছোটগল্প শুধু যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে তা নয়, ইউরোপের অন্য যে কোন ভাষার থেকে ইংরাজী ভাষাতেই সর্বাধিক সংখ্যক ছোটগল্প লেখা হচ্ছে।

নাটক

শেক্সপীয়রের যুগ এবং তার অব্যবহিত পরের যুগের নাটকের কথা আমরা আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্বে (১৫৭৬—১৬৫০) রেখেছি। এর পরে আধুনিক যুগের তৃতীয় পর্বে (১৬৫১—১৮০০) নাটকের তেমন প্রসার ঘটেনি। প্রথমদিকে পিউরিটানদের বিরোধিতা ছিল এবং তারপরে, মৌলিক এবং শ্রেষ্ঠ নাটক তেমন কিছু না হলেও প্রায় সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে রোম্যান্টিক নাটকের অতি মূল্যবান সমালোচনা ও সমাদর হয়েছে। আসলে তখন উৎকৃষ্ট নাটক সৃষ্টি করবার মত নাট্যপ্রতিভাসম্পন্ন মানুষও ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা ধরনের গদ্যের এত সর্বময় ব্যাপ্তি ছিল যে নাটক সেখানে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ওই দেড়শ বছরেও অবশ্য কয়েকজন প্রতিভাবান নাট্যকারের দেখা পাওয়া যায়।

নিকোলাস রো্য় (Nicholas Rowe ১৬৭৪—১৭১৮), ওয়াইচার্লি (William Wycherley ১৬৪০—১৭১৫), টমাস স্যাডওয়েল (Thomas Shadwell ১৬৪২—১৬৯২), কনগ্রীভ (William Congreve ১৬৭০—১৭২৯), অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith ১৭২৮—১৭৭৪) এবং শেরিডানের (Richard Brinsley Sheridan ১৭৫১—১৮১৬) নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে বিভিন্ন সময়ে এঁরা নাট্যমঞ্চকে যথাসাধ্য আলোকিত করে গেছেন, এবং বিভিন্ন মানসিকতার দর্শককে আনন্দ দিয়ে গেছেন।

তারপর আমরা আমাদের এই গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আধুনিক যুগের চতুর্থ পর্ব শুরু করছি। এই শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নাটক আবার পূর্ণ উদ্যমে সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে অসামান্য প্রতিষ্ঠা পেল। এই সময় থেকে নাটক জীবনের গভীর ও বাস্তবচিন্তাকে অবলম্বন করে লেখা হতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের অত্যন্ত শক্তিশালী সাহিত্যপ্রতিভা হিসাবে বার্ণার্ড শ' আত্মপ্রকাশ করলেন।

তবে সংখ্যায় কম হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং মাঝামাঝি সময়ে কিছু কিছু স্থায়ী মূল্যের ও উন্নত মানের নাটক লেখা হয়েছিল। যেমন শেলীর 'মুক্ত প্রমিথিউস' (Prometheus Unbound ১৮১৮—১৯) বা 'সেন্সি' (Cenci—১৮১৯), কিংবা সুইনবার্ণের 'ক্যালিডনে আটালান্টা' (Atalanta in Calydon ১৮৬৫)। এগুলির উল্লেখ যথাস্থানে করা হয়েছে। এগুলি কবিতায় লেখা এবং সম্ভবতঃ অভিনয়ের জন্য লেখা হয়নি।

আবার, ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে এবং এমনকি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য এমন নাটক লেখা হয়েছিল যেগুলি ঠিক সেই সময়ে প্রচলিত প্রধান নাটকীয় ধারার থেকে আলাদা। যেমন, ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয় অস্কার ওয়াইল্ডের (Oscar Wilde ১৮৫৪—১৯০০) 'আর্ণেষ্ট হওয়ার গুরুত্ব'। নাটকটি

মজার। 'আর্নেষ্ট' মানে যেমন 'আন্তরিক' তেমনই এই নাটকের একটি চরিত্রের নামও আর্নেষ্ট। এই দুটি অর্থেরই সার্থকতা এই নাটকে দেখান হয়েছে। এটি ওয়াইল্ডের একটি সর্বাংশে সুসঙ্গত এবং সার্থক কমেডি।

আবার ঔপন্যাসিক গলসওয়ার্দির (John Galsworthy ১৮৬৭—১৯৩৩) নাটক 'বিবাদ' (Strife—১৯০৯) এবং 'ন্যায়পরতা'-র (Justice—১৯১০) উদ্দেশ্য সমাজসংস্কার। এগুলিকে 'সমস্যাসংক্রান্ত' নাটক (Problem Play) বলা যায়। এগুলির জনপ্রিয়তা ছিল, এবং অভিনীত হওয়ার যোগ্যতা পুরাপুরি ছিল।

অস্কার ওয়াইল্ডের কমেডি সম্বন্ধে অল্প কিছু এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আধুনিক নাটকে 'নাটকের কাল' সম্বন্ধে আমরা যদি সজাগ থাকি তাহলে দেখব যে যদি নাটকটি একটি বিশেষ কালে (Period) সন্নিবিষ্ট হয় এবং সেই 'কাল' আমাদের 'কাল' নয়, তখন নাটকটির অবাস্তবতার কথা আমাদের মনে আসে, এবং নাটকটির সম্বন্ধে আগ্রহের ব্যাপারে আমাদের মানসিকতা প্রভাবিত হয়। ওয়াইল্ড এ বিষয়ে সাবধান হয়েছেন। 'কাল' সম্পর্কিত এই অসুবিধা অস্কার ওয়াইল্ডের নাটককে স্পর্শ করেনি।

তবে নাটককে অবশ্যই একটা সময়সূচক অবস্থান নির্দিষ্ট করতে হয়। ওয়াইল্ডের 'আর্নেষ্ট হওয়ার গুরুত্ব' নাটকটি তাঁর নিজের যুগের প্রথম দিকেই বসান হয়েছে। এতে সুস্থ, সরল, হালকা, রুচিসম্পন্ন কৌতুক আছে। নাটকটি এখনও জনপ্রিয়। এই নাটকের প্রধান কৌশল আপাত বিরোধিতা দেখিয়ে কৌতুক সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে ওয়াইল্ড যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন তা নাটকটির জনপ্রিয়তা দেখে বোঝা যায়। একশ বছর পরেও এই নাটকটির আকর্ষণ কমেনি। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সকলের পক্ষে দর্শনযোগ্য নাটক করা বিশেষ ক্ষমতার পরিচয়।

আলোচনার কালানুসারিতা বজায় না রেখে এরপর আমরা আর একটি নাটকের উল্লেখ করব। নাট্যকার কবি টি. এস. এলিয়ট (T. S. Eliot ১৮৮৮—১৯৬৫)।

'গীর্জায় নরহত্যা' (Murder in the Cathedral) ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মীয়-ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে প্রধানতঃ কাব্যনাট্য। এটিও আলাদা ধরনের নাটক।

ইংল্যাণ্ডে দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় হেনরীকে মানসিক স্বস্তিদানের উদ্দেশ্যে তাঁর অধীনস্ত চারজন যোদ্ধা ক্যান্টারবেরির গীর্জায় প্রধান পুরোহিত টমাস বেকেটকে হত্যা করে। এই কাহিনীর ভিত্তিতে নাটকটি লেখা হয়েছে। নাটকের কাহিনীর সময় ১১৭০ সাল। এটি ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে গ্রীক নাটকের অনুকরণে 'কোরাস' রাখা হয়েছে।

এই নাটকে রাজনৈতিক শক্তি বা ধর্মীয় শক্তি কোনদিকেই বেমানান ভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়নি। আর্চবিশপ টমাস বেকেটকে দেখান হয়েছে তিনি যেন স্বেচ্ছাবৃত কষ্টভোগ এবং পদাধিকারজনিত কঠিন দায়িত্ব পালন এই দুয়ের অনুসরণে মানসিকভাবে জর্জরিত। তিনি কোন ভীতি অথবা অনুশোচনার দ্বারা হীনতাপ্রাপ্ত নন। আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের কঠিন দৃষ্টান্ত। ঘটনা ও মনোভাবের ব্যাখ্যা কোরাস যথারীতি করে গেছে। আর্চবিশপের ধর্মোপদেশ গদ্যে বিবৃত। হত্যাকারী নাইটদের বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎও গদ্যেই রাখা হয়েছে। নাটকটি বহুসমাদৃত।

এরপরে এবং বার্নার্ড শ'-এর কথা বলবার আগে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইবসেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। Henrik Ibsen (১৮২৮—১৯০৬)। ইবসেনের নাটক প্রসঙ্গে ইউরোপীয় নাটকের সর্বাধুনিক অবস্থার কথা আসে।

ফরাসী বিন্যাস—ব্যাখ্যা ও বর্ণনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বের ক্রমবর্ধন, প্রধান দৃশ্য এবং জটিলতা উন্মোচন—ইংরাজী নাটকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। তার মধ্যেই আশির দশকে ইবসেনের আদর্শে নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইবসেনের সঙ্গে ইংরাজ নাট্যকার ও দর্শকদের প্রথম পরিচয় ঘটালেন এডমণ্ড গস (Edmond Gosse ১৮৪৯—১৯২৮)। তিনি সত্তরের দশকে ইবসেনকে নিয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা লিখেছিলেন, এবং ইবসেনের 'সম্রাট ও গ্যালিলীবাসী'-র (Emperor and Galilean) অনুবাদও করেছিলেন। ১৮৮০ সালে উইলিয়ম আর্চার (William Archer ১৮৫৬—১৯২৪) 'সমাজের স্তম্ভগুলি'র (Pillars of Community) অনুবাদ করলেন। ১৮৮৪ সালে 'পুতুলের বাড়ীর' (A Doll's House) অযথা সংশোধনের কাজে সহযোগিতা করলেন হেনরী আর্থার জোনস (Henry Arthur Jones ১৮৫১—১৯২৯)। ইবসেনের সম্পর্কে আগ্রহী এইসব এবং অন্যান্য নাট্যকাররা পুরানো প্রথা থেকে কখনো বেরিয়ে আসেননি। কিন্তু ১৮৮৯ সালে আর্চার 'পুতুলের বাড়ীর' (A Doll's House) যথাযথ অনুবাদ করলেন। এর পরেই ইবসেনের আদরা গুরুতরভাবেই ইংরাজী নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করল। নাট্যসমালোচক ক্লিমেণ্ট স্কট (Clement Scott), বিখ্যাত অভিনেতা স্যার হেনরী আরভিং (Sir Henry Irving ১৮৩৮—১৯০৫) এবং আরও কয়েকজন এই নাট্যআন্দোলনের বিরোধিতা করলেন। ১৮৯১ সালে লর্ড চেম্বারলেন ইবসেনের 'প্রেত' (Ghosts) মঞ্চস্থ করতে অনুমতি দিলেন না। আর এই ১৮৯১ সালেই বার্ণার্ড শ' লিখলেন 'ইবসেনের মতাদর্শের বিশুদ্ধ সারাংশ' (The Quintessence of Ibsenism)। তাঁর এই বক্তৃতার ভিতর দিয়ে তিনি যে শুধু ইবসেনের নতুন আদর্শের কথা বললেন তা-ই নয়; গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতির কথা বললেন এবং বাস্তবের ধোপে টেঁকে না এমন গতানুগতিক ধারণার বিপক্ষেও যুক্তি দেখালেন। ১৮৮৭ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন নাট্যকৌশলের (Theatre Libre) অনুরূপ লণ্ডনেও ১৮৯১ সালে 'স্বাধীন নাট্যশিল্প' (Independent Theatre) প্রতিষ্ঠিত হল। এই নতুন নাট্য আন্দোলন ১৮৯২ সালে 'Hedda Gabler' (হেড্ডা গ্যাবলার) নাটক মঞ্চস্থ করল। এটিতে ইবসেনের ছাঁচে ঢালা নাটক এবং নাট্যপরিবেষণা দেখান হল। ইংল্যাণ্ডের নাট্যমঞ্চে ইবসেনের প্রথম দিকের কাব্যনাট্য এবং শেষ দিকের প্রতীকি নাটকের চেয়ে মধ্যবর্তী সময়ের সামাজিক নাটকগুলি বেশী সমাদর পেল। এর কারণ ছিল এই সময়ে (উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে) ইংল্যাণ্ডে সমস্যামূলক উপন্যাস লেখা হয়েছিল এবং সামাজিক বিষয়সমূহের সম্ভবনাসম্পর্কিত নানা চিন্তার সমাগম হয়েছিল। নরওয়ের এই 'নিরানন্দ' নাট্যকার (ইবসেন) যেন মধ্যবিত্ত সমাজের সামাজিক অচেতনতার বিরুদ্ধে বৃটিশ নাট্য আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন। এ' পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল এমন নানা বিষয়ে নাটক লেখা হতে লাগল। বংশপরম্পরাক্রমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদির পুণরাবৃত্তি এবং বিবাহগত সম্পর্ক যে নানাবিধ

যৌনসম্পর্কে পর্যবসিত হয়, সেগুলিকে ইবসেন এবং তাঁর মতাদর্শী নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে উপস্থিত করলেন। এই সত্যদৃষ্টির সঙ্গে একধরনের নৈরাশ্যবাদও প্রাধান্য পেল।

কিন্তু ইবসেনের মতবাদের গভীরতর বক্তব্য আছে।

ইবসেন ইউরোপের নাট্যজগতে নতুন এক লক্ষ্য এবং পরিবেষণার নতুন এক ধরন আমদানী করালেন, এবং নতুন বাস্তববাদী পথে চলতে প্রেরণা দিলেন। এই বাস্তববাদ বলতে মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বহিরঙ্গের অনুকরণ বোঝায় না। যা বোঝায় তা হচ্ছে ব্যক্তির সেই সব নিজস্ব গোপন সমস্যার অনুশীলন যা এতাবৎকালের কোন নাটকীয় উদ্ঘাটনের মাধ্যমে প্রকাশ করার বা সমস্যা হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি। এ পর্যন্ত মানুষ কেঁদেছে, হেসেছে, উৎসাহিত হয়েছে, গর্ববোধ করেছে, —কিন্তু সেগুলি তার স্থায়ী সমস্যার সঙ্গে যুক্ত নয়। এটা সত্য কথা যে মানুষেব মনের গভীরে প্রোথিত স্থায়ী সমস্যাকে নাটকে উপস্থাপনের ভিতর দিয়ে মেটান যায় না; কিন্তু নাটকে সেগুলিকে যথোপযুক্ত স্থান দিলে দর্শকের যে উপলব্ধি আসে প্রত্যক্ষ ও সঠিক অর্থে তা বাস্তবতার উপলব্ধি। কোন বিশেষ ঘটনার সাধারণ উপস্থাপনের দ্বারা আমাদের মনে সহানুভূতি এবং যুক্তিগত সমর্থন বা বিরোধিতার বোধ আসে। সেগুলি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওই ঘটনার উপস্থাপনার ভিতর দিযে নাটকীয় চরিত্র যখন নিজের গোপন সত্ত্বার প্রতিফলন ঘটায় তখন দর্শকের সঙ্গে সেই চরিত্রের যে ঘনিষ্ঠ সমানুভূতির সম্পর্ক এসে যায়, তাকেই আমরা বলতে পারি বাস্তবতা।

অন্তরেন্দ্রিয়ের বাস্তব সমস্যার বিশ্বস্ত প্রতিফলনের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত বয়েছে নতুন নাটকীয় উপস্থাপন-কৌশল। এই নাটকে 'স্বগতোক্তি' এবং 'একান্তে' বলে আর কিছু থাকল না। পরিষ্কার কথোপকথনের ভিতর দিয়েই মনোভাব প্রকাশ করা হবে। এই নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে বুঝতে হবে যে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটাই তার কথাবার্তার প্রধান লক্ষ্য হবে। দর্শক উপলক্ষ্যমাত্র এই চিন্তা বাতিল করতে হবে। চরিত্রের অন্তর্মুখিতার প্রকাশন যদি আন্তরিক হয়, তবে তা দর্শকের অন্তরকেও স্পর্শ করবে। ঘটনার অগ্রগতি তত প্রয়োজনীয় নয়; চিন্তাকে ব্যক্ত করার মাধ্যমে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবের উদ্ঘাটন বেশী গুরুতর। নিভৃতে যদি কোন চরিত্র দর্শকের কাছে আবেদন রাখে তবে তার সমস্যার প্রতি দর্শকের সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করাই ইবসেনীয় নাটকের কাজ। নতুন নাটকে পুরাতন অর্থে 'নাটকীয়তা' কমই থাকবে।

বার্ণার্ড শ' ছিলেন ইবসেনের ভাবধারায় সমৃদ্ধ ও তাঁব চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

জর্জ বার্ণার্ড শ (George Bernard Shaw) ১৮৫৬-১৯৫০

বার্নার্ড শ আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠতম এবং সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার।

ডাবলিনে আইরিশ পরিবারে জন্ম। গতানুগতিক শিক্ষা তেমন কিছু হয়নি। তাঁর মায়ের শিক্ষাতেই তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। যুবক বয়সেই লণ্ডনের 'ফেবিয়ান সোসাইটি' (Fabian Society) নামক বিখ্যাত সংস্থার সভ্য হন। এই সোসাইটির লক্ষ্য ছিল ধীরে

ধীরে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ঘটান। সংবাদিক হিসাবে, বিশেষ করে সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে খুব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এর পরে তাঁর খ্যাতি আরো বেড়ে যায় নাট্যসমালোচক হিসাবে। তারপর নিজেই নাটক লেখা শুরু করেন। নাট্যকার হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি পান ইংল্যাণ্ডের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে এবং আমেরিকা থেকে।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁব স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৯২৯ সাল থেকে তাঁর নামে বাৎসরিক নাট্যউৎসব শুরু হয়। ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই তিনি এ যুগের সর্বাধিক পরিচিত বৃটিশ নাগবিক হিসাবে খ্যাতিমান হন। শেষজীবনে তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা জনশ্রুতির একেবারে কেন্দ্রে ছিলেন। শানিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ সমালোচনা, অসাধারণ কৌতুক রসবোধ এবং স্বনির্বাচিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা তাঁকে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। মৃত্যুর কযেক দশক আগে থেকেই তাঁর সামান্যতম কথা ও মন্তব্যকে মানুষ অসাধারণ গুরুত্ব দিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরামিষাহারী, মদ্যপানবিরোধী, সঙ্গীতবোদ্ধা এবং বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। নারীজাতিকে তিনি কখনই কোন রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পারেন নি। প্রতিটি নারীকেই তিনি তার স্বাভাবিক স্থানে প্রতিষ্ঠা করতেন কার্যকারণের বিচারে এবং আত্মপ্রবঞ্চনাকারী নির্বুদ্ধিতাজাত কপটতার থেকে মুক্ত করে এনে। সেখানে তিনি কোন আধিক্য বা তুচ্ছতার মনোভাব অবলম্বন করতেন না। যে রোম্যাণ্টিকতা সত্যকে আচ্ছন্ন করে তাকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দেননি।

বার্ণড শ-এর নাটকে কোন আদর্শ পুরুষ (Hero) নেই বা বা কোন অতি দুর্বৃত্ত লোকও (Villain) নেই। অফুরন্ত বুদ্ধি, বা বুদ্ধি-সমন্বিত রসিকতা, বা কোন ক্ষেত্রে তীব্র পরোক্ষ ব্যঙ্গ তাঁর নাটকগুলির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হালকা থেকে শুরু করে সুগম্ভীর কৌতুকে ভরপূর তাঁর নাটক। তিনি তাঁর ধারণা বা আদর্শগুলি পরিবেষণ বা ব্যক্ত করতে গিয়ে দর্শকদের সামনে অভিনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নাট্যকৌশল বজায় রাখার ব্যাপারে কখনো অমনোযোগী হননি।

তাঁর নাট্যরীতির একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল দীর্ঘ ভূমিকা (Preface) এবং মঞ্চসজ্জার বিস্তারিত নির্দেশ। কোন কোন নাটক তিনি নিজেই পরিচালনা করেছিলেন।

বার্ণাড শ রচিত নাটকগুলির কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করবো।—

'বিপত্নীকদের বাড়ীগুলি' (Widowers' Houses—১৮৯২), 'প্রণয়ের ভানকারী অসচ্চরিত্র ব্যক্তি' (The Philanderer—১৮৯৩), ওয়ারেন মহাশয়ার বৃত্তি (Mrs. Warren's Profession—১৮৯৪), 'অস্ত্রশস্ত্র ও মানুষ' (Arms and the Man—১৮৯৪), 'ক্যাণ্ডিডা' (Candida—১৮৯৫), 'মানুষ ও মানুষের ভাগ্য' (Man of Destiny—১৮৯৫) এবং 'এত নিশ্চিৎ হয়ো না' (You Never Can Tell—১৮৯৭)।

এই সাতটি নাটককে একত্রে 'সুখকর ও অসুখকর নাটক' (Plays: Pleasant and Unpleasant) নাম দিয়ে ১৮৯৮ সালে প্রকাশ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ, শ' নাটককে 'গুরুতর

নাটক ও হালকা নাটক' (Tragedy ও Comedy) এই ভাবে ভাগ করেননি। তিনি 'সুখকর' (Pleasant) এবং 'অসুখকর' (Unpleasant)—এই দুরকম ভাগে ভাগ করেছিলেন।

এরপরে তিনি লেখেন 'শয়তানের শিষ্য' (The Devil's Disciple—১৮৯৭), 'সিজার ও ক্লিওপেট্রা' (Caesar and Cleopatra—১৮৯৮), 'ক্যাপটেন ব্র্যাসবাউণ্ডের পরিবর্তন' (Captain Brassbound's Conversion—১৮৯৯)। এই তিনটিকে একত্রিত করে 'পিউরিটানদের জন্য তিনটি নাটক' (Three Plays for Puritans) নাম দিয়ে ১৯০১ সালে প্রকাশ করা হয়।

১৯০৩ সালে প্রকাশ পায় 'মানুষ ও অতিমানুষ' (Man and Superman)। এর পর ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় 'জনবুলের অপর দ্বীপ' (John Bull's Other Island)।

তারপর 'মেজর বারবারা' (Major Barbara—১৯০৫), 'ডাক্তারের উভয় সঙ্কট (The Doctor's Dilemma—১৯০৬) এবং 'বিবাহিত হওয়া' (Getting Married—১৯০৮) একে একে প্রকাশিত হয়।

১৯০৯ সালে 'ব্ল্যাঙ্কো পসনেটকে স্পষ্টভাবে দেখান' (Showing up Blanco Posnet), ১৯১০ সালে 'অবাঞ্ছিত বিবাহ' (Misalliance) এবং 'সনেটগুলির কৃষ্ণকায়া মহিলা' (The Dark Lady of the Sonnets) প্রকাশিত হয। এর পরেই আসে ১৯১১ সালের 'ফ্যানির প্রথম নাটক' (Fanny's First Play) এবং ১৯১২ সালের 'এণ্ড্রোক্লিস ও সিংহ' (Androcles and the Lion)।

১৯১২ সালে 'পিগম্যালিযন' (Pygmalion) নাটকটিও প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় 'হতাশাখিন্ন পরিবার' (Heartbreak House)।

'দীর্ঘায়ু কুলপতি মেথুসেলার যুগে ফিরে যাওয়া' (Back to Methuselah) ১৯২১ সালে এবং 'সন্ত যোয়ান' (St. Joan) ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয।

'সন্ত যোয়ানের' (St. Joan) পরে লিখেছিলেন ১৯২৯ সালে 'বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত পরিকল্পনা' (The Apple Cart), ১৯৩২ সালে 'এত সত্য যে ভাল হতে পারে না' বা 'সত্য হওয়ার পক্ষে বড় বেশী ভাল' (Too True to be Good), ১৯৩৩ সালে 'ঘাটতি' (On the Rocks), ১৯৩৪ সালে 'ক্যালের ছয়জন' (The six of Calaix) এবং 'অপ্রত্যাশিত দ্বীপগুলির অতিরিক্ত সাদাসিধা লোক' (The simpleton of Unexpected Isles), ১৯৩৬ সালে 'কোটিপতি মহিলা' (The Millionairess), ১৯৩৮ সালে 'জেনেভা' (Geneva), ১৯৩৯ সালে 'রাজা চার্লসের ঐশ্বর্যমণ্ডিত দিনগুলিতে' (The Good King Charles's Golden Days) এবং ১৯৪৯ সালে 'প্রাণবন্ত শতকোটি' (Boyant Billions)।

মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে ৯৩ বছর বয়সেও লিখে যাওয়ার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা বার্নাড শ-এর ছিল।

এর পরে বার্নার্ড শ-এর তিনটি বহুলপরিচিত নাটক সম্বন্ধে অল্প দু'এক কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।—

অস্ত্রশস্ত্র ও মানুষ (Arms and the Man) ১৮৯৪

দুটি গতানুগতিক ধারণা এবং বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে রোম্যান্টিকতা বহুকাল ধরে মানুষের মনে থেকে গেছে এই নাটকে বানার্ড শ সে দুটির সমালোচনা করেছেন।

একটি হচ্ছে যুদ্ধ সম্পর্কিত রোম্যান্টিক ধারণা। সে সম্পর্কে শ-এর বক্তব্য এই যে সৈনিকের পক্ষে ব্যক্তিগত বিশেষ সাহস দেখাতে যাওযার বাহাদুরির থেকে বোকামি আর কিছু নেই। যুদ্ধ দ্বারা ব্যক্তির বীরত্বের কোন পরিচয় পাওযা যায় না। একজন সৈনিকের পক্ষে, বিশেষ করে সে যখন হেরে যাওয়ার দলে, অস্ত্রের চেয়ে খাদ্যের বেশী প্রয়োজন। আহাম্মকি না করে মানে মানে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শত্রু যখন দুর্বল অবস্থায় থাকে কেবলমাত্র তখনই তাকে আক্রমণ করাটাই যুদ্ধের যথার্থ কৌশল। কিন্তু একথা আমাদের কানে এত বেসুরো ঠেকে যে কেউ কেউ এই জাতীয মন্তব্যকে অপমানজনক বলেও মনে করতে পারে। অথচ আসলে এই ব্যাপারে এর থেকে বাস্তবানুগ পর্যবেক্ষণ আর কিছু নেই।

আর দ্বিতীযটি হচ্ছে,—বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন মহিলারা অলীক রঙ্গীন কল্পনাকেই আদর্শ বলে মনে করে; এবং সেই ধারণা বজায রাখবার জন্য আত্মবঞ্চনা করে ও অভিনয় করে। তাকে যখন সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় তখনই সে স্বস্তিবোধ করে এবং অনর্থক আত্মবঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পায়।

মানুষ ও অতিমানুষ (Man and Superman) ১৯০৩

এই নাটকে শ' সমাজে প্রচলিত বহু ভুল ধ্যান ধারণার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। ওই সব ধারণার প্রতি নাট্যকার অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। মানুষের মধ্যে প্রচলিত বোধ ও বুদ্ধির ক্রমোন্নতি একটি অনিঃশেষ পথ; —এই পথে চলতে চলতে মানুষ তার বর্তমান ক্ষুদ্রত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে। আর, এই পথে মানুষকে চলতেই হবে, না হলে তার ধ্বংস অনিবার্য। এই নাটকে নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী বানার্ড শ সমাজজীবনে আনবার চেষ্টা করেছেন, তা গ্রহণ করবার মত সাহসিক মনোবৃত্তিকে মানুষ এখনও সর্বতোভাবে বিশ্বাস করতে ও গ্রহণ করতে পারেনি। শ' একটা অত্যন্ত বৈপ্লবিক চিন্তা মানুষের সমাজে এনে ফেলেছেন। একে গ্রহণ করা শক্ত; কিন্তু শ'-এর যুক্তির যাথার্থ্য এখন সকলেই উপলব্ধি করতে পারেন। মহাশক্তির অংশ হিসাবে যে সৃষ্টি ক্ষমতা নারীর মধ্যে রয়ে গেছে পুরুষ তার সহযোগী মাত্র।

সন্ত জোয়ান (Saint Joan) ১৯২৩

সন্ত জোয়ান বাণার্ড শ'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এটি মধ্যযুগীয় ইতিহাস-ভিত্তিক ধর্মীয় বিষয়ের নাটক। একদিকে ক্যাথলিক ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজকীয় ক্ষমতা এবং অন্যদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের প্রতিভূ হিসাবে জোয়ান অব আর্ক। প্রোটেষ্ট্যান্ট মতবাদের উদ্ভবের আগেই এটিকে প্রোটেষ্ট্যান্ট বনাম ক্যাথলিকের দ্বন্দ্ব হিসাবেও বলা যায়।

সেন্ট জোয়ানের বাস্তব ঘটনা বহুকাল আগের (১৪৩১), এবং সেই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশেরও কোন অবশিষ্টাংশ আজ নেই। শ' সেই অতীত ঘটনার ও অতীত মানসিকতার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে আধুনিক জগতের এবং আধুনিক মানুষের চিন্তা ও অনুভবের মাঝখানে ফুটিযে তুলতে চেয়েছেন। এর জন্য কালের পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং আধুনিক মানুষের পরিবর্তিত অনুভবের চরিত্রকে মনে রাখতে হয়েছে। আধুনিক দর্শকের কাছে নাটকটিকে গ্রহনীয় করান শ'-এর নাট্যকৌশলের অন্তর্গত। জোযানকে আধুনিক যুগে এনে বসাতে হয়েছে এবং তাকে কালানুসারী অনুভূতি, বিশ্বাস এবং মনোভাব ফুটিযে তোলার আধুনিক রীতির দ্বারা সজ্জিত কবতে হযেছে।

আবার, জোযানকে নিযে নাটক লেখার ক্ষেত্রে শ'-এর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী খুব কার্যকরী হযেছে। জোয়ান যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে যেমন জনসমর্থন পেয়েছিল, তেমনি নানাভাবে নানা জনে তার বিরোধিতাও করেছিল। আজকের যুগেও জোয়ানকে নিঃসর্তে সর্বতোভাবে মেনে নেওয়ার বিপক্ষেও যুক্তি রয়েছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি এই যে জোয়ানকে যদি সমর্থন করা না-ও যায়, তবু এটা মানতে হবে যে তার বিশ্বাস ছিল, সরলতা ছিল এবং উন্মুক্ত আকাশের মত প্রকাণ্ড আশা ছিল। আজকের যুগের মানুষের এই বিচারবুদ্ধির উপর শ' অবশ্যই নির্ভর করেছেন।

যে কারুণ্য ও সহানুভূতি চিরকাল মানুষের চরিত্রেব এক মহৎ লক্ষণ, আজকের দিনেও সেই মানুষের বিচারে জোয়ান দর্শনীয় ও অনুভবনীয়।

বার্ণার্ড শ-কে মাঝখানে রেখে এবারে আমাদের আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। বিষয় :

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের নাট্যধারা ও একাঙ্ক নাটক

অল্প কথায় নাটকের একেবারে গোড়ার দিকেন দু একটি বিষয়ের উল্লেখ করে বা পুণরুল্লেখ করে আমরা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের নাটকের একটা সামগ্রিক চেহারা ধরবার চেষ্টা করব।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর 'রহস্যময় নাটক' (Mystery Plays) এবং 'অলৌকিক নাটক' (Miracle plays), পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ভ্রাম্যমান নাটক' (Wandering plays) এবং ষোড়শ শতাব্দীর 'ক্ষুদ্রায়তন নাটিকা' (Playlets) এবং 'গর্ভনাটিকাব' (Interludes) কথা গ্রন্থের প্রথম ভাগে (৬৫০—১৫৭৫) বলেছি। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লক্ষ্য করেছেন যে ওইগুলির মধ্যে বর্তমান যুগের একাঙ্ক নাটকের বীজ সুপ্ত ছিল।

তখনকার কালে এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে ধর্মীয় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে অথবা ওই উপলক্ষ্যে ইহলৌকিক এবং জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে গেলে

বর্তমান একাঙ্ক নাটকের অনুরূপ কোন কিছু যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। এর অব্যবহিত পরে কিছু কিছু লোকনাট্যও এই একই দিক নির্দেশ করেছিল। একে একে বিভিন্ন ধর্মীয় কৃত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মবিষয়ের সূত্র ধরে হালকা ধরনের, হাস্যোদ্রেককারী, মূকাভিনয়ের মত কোন কিছু (Mummery)। এই ধরনের নাট্যপ্রয়াসের আদিরূপ হয়ত প্রাক-খৃষ্টান যুগেও খুঁজলে পাওয়া যাবে।

তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে এবং পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে প্রকাণ্ড প্রাণবন্ত রোম্যাণ্টিক নাট্যধারা প্রবাহিত হয়েছিল। সেখানে অবশ্য একাঙ্ক নাটকের মত কিছু তার নিজস্ব লক্ষণ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নাটক তৈরী হয়েছিল তার বেশীর ভাগই হালকা সুরের প্রহসন এবং অনুকরণের সাহায্যে কৌতুকসৃষ্টিকারী ব্যঙ্গনাটক (Farce এবং Burlesque)। সেগুলিতে একাঙ্ক নাটকেব চরিত্রের তেমন প্রকাশ ঘটেনি। জেনে রাখা ভাল যে একাঙ্ক নাটককে গুরুভার অথবা হালকা, —এরকমভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও প্রথমদিকে একাঙ্ক নাটকের মত কোন কোন কিছুর চর্চা হলেও সেগুলির অনুষ্ঠান ছিল সুনাম হানিকর। তুচ্ছার্থে সেগুলিকে মূল নাটকের পূর্বে অভিনীত ক্ষুদ্র নাটিকা (Curtain-raiser) বলা চলত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নাটক তেমন জমেনি। তবে শেষার্ধে ধীরে ধীবে নাটক আবার নতুন করে পরিবর্তিত কাল, পরিবর্তিত সমাজ, পরিবর্তিত দর্শকের মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং নতুন, শক্তিশালী, জনপ্রিয় প্রতিযোগীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখা নয়, —এক নতুন শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। 'অন্যকথা, অন্যদিন, অন্যপথ' ধরে নাটক চলতে চাইল।

[মাঝে আমরা আইরিশ জাতীয় নাট্যআন্দোলনের এবং রিপার্টরি থিয়েটারের কথা বলে আবার একাঙ্ক নাটকের কথায় ফিরে আসব।]

আইরিশ জাতীয় নাট্য আন্দোলন ও 'রিপার্টরি' আন্দোলন

নতুন যুগোপযোগী বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধুনিক সমস্যামূলক নাটকের সঙ্গে দর্শকরা পরিচিত ছিলেন না। সুতরাং সেগুলির উপর নির্ভর করে নাট্যসংস্থা চালান যায়নি। কাজে কাজেই সেগুলিকে কিছু কিছু পুরানো নাটকের মাঝে মাঝে রাখা হতে থাকল। এইভাবেই 'রিপার্টরি' আন্দোলনের শুরু হয়েছিল।

'রিপার্টরি' (Repertory) কথাটির মানে টুকরো টুকরো অংশকে এমনভাবে মজুদ করে রাখা যে যখনি প্রয়োজন হবে তখনই তার কিছু কিছু সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত করা যাবে ; তবে অবশ্য কোন দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ হবে না।

১৯০৪ সালে কুমারী এ. ই. এফ. হর্নিম্যান (Miss. A. E. F. Horniman —১৮৬০-১৯৩৭) ইয়েটস (W. B. Yeats ১৮৬৫-১৯৩৯), লেডি গ্রেগরী (Lady Gregory ১৮৫৯—১৯৩২) এবং সিঞ্জ-এর (John Millington Synge ১৮৭১—১৯০৯) হাতে ডাবলিনের এ্যাবে থিয়েটার (Abbey Theatre) তুলে দেন। সেখানেই আইরিশ জাতীয় নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। কুমারী হর্ণিম্যানকে বিংশ শতাব্দীর

নব্যনাট্য আন্দোলনের জননী বলা হয়। আইরিশ নাট্য আন্দোলন অবশ্য শুরু হয়েছিল ১৮৯২ সালে।

আইরিশ জাতীয় নাট্য আন্দোলনেব মাধ্যমে যেমন নতুন যুগের উপযোগী নাট্যকৌশলের আবিষ্কার ও অনুশীলন সম্ভব হয়েছিল, তেমনই সেই আন্দোলন রহস্যময় আইরিশ স্বাদেশিকতার গভীর ও আন্তরিক প্রকাশনার সঙ্গেও যুক্ত ছিল।

আইরিশ নাট্য আন্দোলন শুরু হবার অল্প কিছুদিন পরেই ইংল্যাণ্ডেও নতুন আন্দোলন শুরু হয়। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকে আয়ার্ল্যাণ্ডে এবং ইংল্যাণ্ডে ইংরাজী নাটকের পুণরভ্যুদয় ঘটেছিল।

ইংল্যাণ্ডে রিপার্টরি আন্দোলন প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে প্রয়োজনীয়তা এবং জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে রিপার্টরি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ স্বাদেশিকতার ভূমিকা ছিল।

রিপার্টরি আন্দোলন (Repertory Movement)

আইরিশ নাট্য আন্দোলন যেমন ১৮৯২ সালে শুরু হযেছিল, তেমনি ইংল্যাণ্ডেও ওই সালে বার্ণার্ড শ'-এর (তিনিও আইরিশ) 'বিপত্নীকদের বাড়ীগুলি'-র (Widowers' Houses) অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রিপার্টরি থিয়েটারের শুরু হয়েছিল। এতে বার্ণার্ড শ নিজেও অভিনয় করেছিলেন।

১৯০৪ সালে কুমারী হর্ণিম্যানের বদান্যতায় ডাবলিনের এ্যাবে থিয়েটারে 'আইরিশ জাতীয় নাট্যসংস্থা' (Irish National Theatre Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সেই সময়ে বহু একাঙ্ক নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডেও ১৯০৪ সাল থেকে লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে গ্রেণভিল বার্কারের পরিচালনায় এবং ১৯০৭ সাল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের মিডল্যাণ্ড থিয়েটারে (Midland Theatre) কুমারী এ. ই. এফ. হর্ণিম্যানের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থায়ীভাবে রিপার্টরি থিয়েটারের কাজ চলতে থাকে। নাট্য আন্দোলন সম্প্রসারণে হর্ণিম্যানের আরও দান ছিল।

রিপার্টরি থিয়েটারে ব্যক্তিগত মালিকানার দাপট মেনে নেওয়া হয়নি। অভিনেতাগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরাই রিপার্টরি থিয়েটারের মালিক হয়ে দাঁড়ালেন। কোন এক ব্যক্তিকেই অভিনয়ের ব্যাপারে একক প্রাধান্য দেওয়া হল না। অর্থের প্রয়োজন থাকলেও শুধু সেদিকে তাকিয়েই এই সব অভিনেতা নাটক মঞ্চস্থ করতেন না। এঁরা এঁদের পছন্দসই এবং উন্নতমানের নাটক মঞ্চস্থ করতেন।

মিডল্যাণ্ড থিয়েটারেব রিপার্টরি আন্দোলনের প্রভাব ওই একই শহরের অর্থাৎ ম্যাঞ্চেষ্টারের কুমারী হর্ণিম্যানের নিজস্ব নাট্যমঞ্চ 'গেইটি থিয়েটারের' (Gaiety Theatre) উপরও পড়েছিল। অন্যান্য প্রাদেশিক শহরেও মহাযুদ্ধের আগেই রিপার্টরি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই সব রিপার্টরি থিয়েটারে অনেক একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করা হত। এই রিপার্টরি থিয়েটারের কাছে একাঙ্ক নাটক বহুলপরিমানে ঋণী। বহুসংখ্যক একাঙ্ক নাটক রিপার্টরি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছে মজুদ থাকত। নাটকের অভাব হত না।

একাঙ্ক নাটকের বিশিষ্ট প্রকৃতি

উপরোক্ত একাঙ্ক নাটকের নতুনত্ব ও বিশেষত্ব আমাদের জানা দরকার।

একাঙ্ক নাটক একটিমাত্র নাটকীয় পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে এবং একটিমাত্র কার্যফল সৃষ্টি তার লক্ষ্য।

একাঙ্ক নাটকে প্লট (নাটকের ঘটনাপরম্পরার খসড়া) এবং কথোপকথন সম্বন্ধে নাট্যকারকে খুব সাবধান হতে হয়। প্রথম থেকেই দর্শকদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হয়। এই আগ্রহ যাতে বরাবর বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখতে হয়। কথোপকথন স্বাভাবিক হওয়া দরকার, এবং তা যেন চরিত্রগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। চরিত্রগুলিকে স্পষ্টভাবে আঁকতে হবে। একটি চরিত্র সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে। অন্য ধরনের নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রের ক্রমপরিণতি দেখান হয়; কিন্তু একাঙ্ক নাটকে একটি বিশেষ পর্যায়ে চরিত্রকে ধরে রাখতে হয়।

একাঙ্ক নাটক অল্প সময়ের ভিতর অভিনীত হবে। নাটকীয ঐক্য এবং সংক্ষিপ্ততা খুব বেশী দরকার। একটি মাত্র বিষয় উপস্থাপিত ও ক্রমোন্নত হবে এবং অল্প আয়োজনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে।

এই শিল্পকর্মের নাটকীয় ফল যাতে সবচেযে বেশী করে পাওয়া যায় নাট্যকার সে বিষয়ে নজর রাখবেন। নাটক সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুণ কোন ত্রুটি এসে গেলে সেটাকে যে শুধরে নেবার সুযোগ পাওয়া যায় না, একথা মনে রাখতে হবে।

বহুসংখ্যক চরিত্র এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা একাঙ্ক নাটকে থাকবে না। কোন চরিত্রই অপ্রয়োজনীয়ভাবে কিছু বলবে না বা করবে না।

একাঙ্ক নাটকের গঠনে সূচনা, মধ্যভাগ ও পরিণতি থাকবে। সূচনা পর্যায়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়েই ইতিমধ্যে (নাটক আরম্ভ হওয়ার আগেই) যা ঘটে গেছে তার ধারণা দেওয়া হবে।

মধ্য পর্যায়ে দর্শকের আগ্রহকে আরও বাড়িযে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিণতি কি হবে বা হতে পারে সে সম্বন্ধে দর্শকের কৌতূহল এই পর্যায়ের অভিনয়ের সময়েই সৃষ্টি হয়ে যাবে।

এরপর নাটক শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং মাঝখানে থাকবে ক্রাইসিস (Crisis) বা সন্ধিক্ষণ।

সাধারণতঃ একাঙ্ক নাটকে ক্লাসিক আদর্শ এসে যায়. সময়, স্থান ও ঘটনাপ্রবাহের ঐক্য বজায় রাখতে হয়। সকলের উপরে থাকবে দর্শকের মনের উপর প্রযুক্ত প্রভাবের কেন্দ্রীবদ্ধতা।

বিংশ শতকের নাটক

প্রথম মহাযুদ্ধের অল্প কয়েক বছর পরে দেখা গেল নাটকের অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ নয়। বার্ণার্ড শ-এর নাটকও বেশ কযেক বছর স্থগিত ছিল (১৯১৩ ১৯২০)। অথচ যুদ্ধের সময়ে, বিশেষ করে শেষ দিকে, ছুটিতে বাড়ীতে এসে, কিংবা যুদ্ধ শেষ হয়ে

গেলে পাকাপাকিভাবে বাড়ী ফিরে এসে, সৈন্যরা কিছু হালকা নাটক দেখতে চেয়েছিল। সে চাহিদার ঠিকমত যোগান দেওয়া যায়নি। আবার ওই সময়ে নাটকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সিনেমার আবির্ভাব হল। কোন কোন নাট্যকার সিনেমা যে আলাদা একটা শিল্প এটা ভালভাবে উপলব্ধি না করে সিনেমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলেন। সেটা শিল্পবিচারের ভুল। থিয়েটারকে টিকে থাকতে গেলে তার নিজের শিল্পচাতুর্যকে যুগোপযোগী করতে হবে। এবং সেই একই সঙ্গে এগিয়ে চলা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমসাময়িক থিয়েটারের অনুন্নত মানকে কাটিয়ে এগিযে যেতে হবে। কিছু বাস্তব পরিস্থিতি নাট্যকারদের তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে যেন অবহিত করাল। এখানে যেটি বিশেষ করে মনে রাখার দরকার হয়েছিল সেটি ছিল যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষের চাহিদা।

সাধারণ মানুষ যখন সিনেমা কিংবা রেডিওর নাটক ঘরে বসে দেখতে বা শুনতে পেলেন, তখন নাটকও সিনেমা এবং রেডিওর উপযোগী করে তৈরী হওযার দিকে একটা নতুন রাস্তা পেল। একে একে বেশ কিছু তৎপর নাট্যকার ওই পথেই তাদের শিল্পসৃষ্টির দরজা খোলা রযেছে বলে মনে করলেন। কিন্তু সেটাও সঠিক রাস্তা নয়। সিনেমা বা রেডিওর নাটক সকলের পক্ষে সব জাযগায দেখা বা শোনা সম্ভব হয়নি। আর তা ছাড়া, জীবন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী দর্শকের চোখের সামনে মঞ্চে নাট্যাভিনয় দেখাচ্ছেন, —এটা কিন্তু সিনেমা বা রেডিওর আওতার বাইরে থেকে গেল। এই সময়ের দুটি ব্যাপার বিশেষ করে নজরে পডবার মত।—একটা হচ্ছে, অল্প সময়ের নাটকের প্রয়োজনীয়তা সকলেই বুঝতে পারলেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে 'সখের যাত্রার' দলে থেকে এই অভিনয়-শিল্পকে বাঁচিযে রাখলেন, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, —বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী—রেডিওর, সিনেমার বা শহরের বাঁধামঞ্চের সুযোগের বাইরেই অভিনয-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন।

রিপার্টরি থিয়েটার এবং তৎসংশ্লিষ্ট একাঙ্ক নাটক এখন গ্রেট বৃটেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বের সর্বত্র এখন একাঙ্ক নাটকের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা। বস্তুতঃ বলা যায়, এখন সারা পৃথিবীতে নানান নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্যে একাঙ্ক নাটকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ভিতর দিয়েই বর্তমানের এবং হয়ত ভবিষ্যতের নাটকের ধারা অব্যাহত থাকবে।

এবারে আমরা বিংশশতকের প্রথম দিকের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নাট্যকার সম্বন্ধে কিছু বলব। প্রথমেই লেডি গ্রেগরীর কথা বলতে হয়।

ইসাবেলা অগাস্টা গ্রেগরী (Isabella Augusta Gregory) ১৮৫৯-১৯৩২

আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষের, বিশেষ করে চাষীদের, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, ধরনধারণের উপর তিনি অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। জীবনের সম্পূর্ণ বিষাদময় ছবি তাঁর নাটকে নেই। তিনি প্রধানতঃ হালকা কমেডির লেখিকা। তবে কোন কোনটিতে, যেমন 'চন্দ্রোদয়' (The Rising of the Moon—১৯০৯)—দেশপ্রেমিকের সাহস, বিচক্ষণতা ও

আদর্শের পরিচয় দিতে গিযে তিনি উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লেডি গ্রেগরী তাঁর চরিত্রগুলিকে কতখানি বাস্তবানুগ করতে পেরেছেন, সেটা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু এটা ঠিক যে যে আইরিশ চাষীদের জীবন তিনি তাঁর নাটকে অনুকরণ করেছেন তাদের তিনি আন্তরিকভাবে ভালবেসেছেন। লেডি গ্রেগরী জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে আইরিশ এবং আইরিশ ছাড়া অন্য কিছু ছিলেন না।

এবং একথাও ঠিক যে তাঁব নাটক অতিশয় উন্নতমানেব না হলেও দর্শকরা তা প্রাণভরে দেখেছেন। তিনি তাঁর নিজেব হৃদযে শিল্পী ও মানুষ দু'এব ভিতবে সার্থক সামঞ্জস্য আনতে পেরেছিলেন।

আযার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে লেডি গ্রেগরীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রযেছে।

তাঁর বহু নাটকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি হচ্ছে 'মুইরথেমনের কুচুলেন' (Cuchulain of Muirthemne— ১৯০২), 'দেবতারা এবং যুদ্ধমান মানুষেরা (Gods and Fighting Men—১৯০৪) এবং 'চন্দ্রোদয' (The Rising of the Moon—১৯০৯)।

ইয়েটস (William Butler Yeats) ১৮৬৫-১৯৩৯

আইরিশ জাতীয় নাট্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ইযেটসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সর্বজনস্বীকৃত।

তবে নাট্যকার হিসাবে তিনি তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করেন নি। তাঁর মূল শক্তি কবিত্বে। কুচুলেন (Cuchulain) এবং অন্যান্য আইরিশ উপকথার নাযকদের নিযে তাঁর নাটক। তবে সেখানে কবিতাই প্রাধান্য পেযেছে বেশী।

জে. এম. সিঞ্জ (John Millington Synge) ১৮৭১-১৯০৯

আযার্ল্যাণ্ডের পশ্চিমদিকে রুক্ষ, দারিদ্রপীড়িত, বিষণ্ন দ্বীপ 'এ্যাবান বা আরান' (Aran)। এই আবান দ্বীপে জে. এম. সিঞ্জ বহুকাল কাটিযেছেন এবং সেখানকার সহায়সম্বলহীন ধীবরদের কঠোর ভযাবহ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তিনি নিজে আইরিশ; আযার্ল্যাণ্ডেব গ্রাম্য মানুষের নানা কুসংস্কারের সঙ্গে ইয়েটসের মত তিনিও পরিচিত ছিলেন। এই সব কুসংস্কারের সঙ্গে মেশান এক ধরনের রহস্যমষ সরলতা ও সৌন্দর্যের বোধ অন্যান্যদের মত তাঁর ভিতরেও ছিল।

সহানুভূতি এবং অনুসন্ধিৎসা তাঁকে যেমন অভিজ্ঞ ও বেদনাপীড়িত করেছে, তেমনি তাঁর নাটকীয় দক্ষতা ও স্তব্ধ সংযম তাঁকে সর্বোচ্চ নাট্যশিল্পীর স্তরে তুলে দিয়েছে। জে. এম. সিঞ্জ শ্রেষ্ঠ আইরিশ নাট্যকার এবং জগতেব নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক প্রচণ্ড, বিস্ময়জনক শক্তি।

সিঞ্জ ছিলেন প্রধানতঃ কবি, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। হিংস্র, বিষণ্ন, দুর্দান্ত সমুদ্রের পটভূমিকায় গরীব মানুষদের কঠোর জীবন ও পরিবেশকে অবলম্বন করে তিনি এক অসামান্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাটকে।

কথোপকথনে, ভাষার ভঙ্গীমায় শেক্সপীয়র ও বার্ণার্ড শ'-এর পরেই ইংরাজী সাহিত্যে নাট্যকার হিসাবে তাঁর স্থান।

প্রকৃতি—সমুদ্র—যেন তাঁর নাটকের প্রধান অভিনেতা।

জে. এম. সিঞ্জের নাটক সংখ্যায় ছটি। 'উপত্যকার ছায়ায়' (In the Shadow of the Glen—১৯০৩) একটি কমেডি।

'যারা সমুদ্রের দিকে যায়' (Riders to the Sea—১৯০৪) একটি ট্র্যাজেডি। এই নাটকটিকে অনেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম একাঙ্ক নাটক বলে থাকেন।

'সাধুদের নিরাময় ক্ষমতার উৎস' (The Well of the Saints—১৯০৫) একটি কমেডি।

'পশ্চিমী জগতের আমুদে ছেলে' (The Playboy of the Western World—১৯০৭) একটি কমেডি। এটি খুব জনপ্রিয়। সম্ভবতঃ এটিই তাঁর সবসেরা নাটক (Masterpiece)।

'কেটলিমেরাতকারীর বিয়ে' (The Tinker's Wedding—১৯০৭) পরিচিত জনপ্রিয় কাহিনীভিত্তিক নাটক।

এবং 'গেলিক উপকথার রূপসী নায়িকা দুঃখিনী ডিরড্রে (Deirdre of the Sorrows—১৯০৯) একটি ট্র্যাজেডি। ১৯০৯ সালে ক্যান্সার রোগে তাঁর মৃত্যুতে নাটকটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমরা এখানে 'যারা সমুদ্রের দিকে যায়' (Riders to the Sea) নাটকটির সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলব।

যারা সমুদ্রের দিকে যায় (Riders to the Sea)

নাটকটি ১৯০৪ সালে মঞ্চস্থ হয় এবং বই হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে।

কাহিনীর সারাংশ

আয়ার্ল্যাণ্ডের পশ্চিমে আরান (Aran) দ্বীপ। জেলেদের একটি সংসার। এই নাটকের প্রধান চরিত্র মারিয়া (Maurya), বৃদ্ধা জেলেনী। তার স্বামী এবং সংসারের পুরুষ অভিভাবকরা সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। ছয় ছেলের পাঁচজনই সমুদ্রেই মারা গেছে। পঞ্চম ছেলে মাইকেলের (Michael) মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায়নি। শবাধার তৈরী। মৃতদেহ ভেসে এলেই তাকে কবর দেওয়া যাবে। শেষ ছেলে বার্টলি (Bartley)। সে-ও মায়ের কথা না শুনে লাল ঘোটকিতে চড়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। নৌকা করে সে ঘোড়ার মেলায় যাবে। তার পিছনে পিছনে গেল সদ্য নিখোঁজ মাইকেলের ধূসর রঙের টাট্টুঘোড়া। বার্টলি খাবার ফেলে গিয়েছিল। 'মারিয়া' তাকে খাবার পৌঁছে দিতে গেল। দূর থেকে মারিয়া দেখল বার্টলি এবং তার লাল ঘোটকির পিছনে ধূসর টাট্টুঘোড়ার পিঠে মাইকেলের আবছা চেহারা, —মাইকেলের প্রেতাত্মাই হবে। সমুদ্রের কাছে মাইকেলের টাট্টুঘোড়া পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বার্টলিকে জলে ফেলে দিল। দূর থেকে সেই রকম কিছু দেখে

মারিয়া বাড়ী ফিরে এল। ইতিমধ্যে দুই মেয়ে ক্যাথলিন (Cathleen) এবং নোরা (Nora) তখন জলে-ডুবে-যাওয়া কোন মানুষের জামাকাপড পরীক্ষা করে দেখছে, —সেগুলি মাইকেলের কিনা। তা যদি হয় তো নিশ্চিৎভাবেই জানা যাবে যে মাইকেল সত্যসত্যই জলে ডুবে মারা গেছে। মারিয়া দূর থেকে আবছা মাইকেলের প্রেতাত্মা এবং বার্টলিকে দেখে ফিরে আসে। মারিযার শেষ পুত্রসন্তানটিও মারা গেল। মারিযার সেই শোক, যে শোকের শেষ নেই। মারিযা তবু বেঁচে থাকে। সর্বশক্তিমান দুর্ধর্ষ হিংস্র প্রকৃতির বিরুদ্ধে অমর মানব জীবন। মানুষেব চিরঞ্জীব শক্তির অমর মর্যাদা প্রকাণ্ড সংযমেব সঙ্গে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। মারিযার আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার কিছু নেই; সমুদ্র আর তার কোন ক্ষতি করতে পাববে না। তার জীবনের সব উদ্বেগ, সব দুশ্চিন্তা শেষ হয়ে গেল। এখন বিশ্রাম-বিশ্রাম-বিশ্রাম। সবাই কাঁদছে। আর মারিয়া বলছে, কেউ তো চিরকাল বাঁচে না। এটাই তো নিযতি।

সীন ও' কেসি (Sean O' Casey) ১৮৮৪-১৯৬৪

জে. এম. সিঞ্জ যেমন আযার্ল্যাণ্ডের গ্রামের মানুষ ও দরিদ্র ধীবরদের কথা তাঁর নাটকের মারফৎ সাবা বিশ্বকে জানিযেছেন, সিন ও' কেসি তেমনি আযার্ল্যাণ্ডের শহরের (বিশেষ করে ডাবলিনের) বস্তি অঞ্চলের মানুষদের কথা জানিযেছেন। শহরের এই অতি দরিদ্র মানুষদের প্রতি সিন-ও'-কেসির কোমল, সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে সমর্থ করেছে তাদের অন্তরের ব্যথা উদ্ঘাটন করতে।

সিন. ও' কেসি ট্র্যাজেডি-কমেডির পুরান পার্থক্য বজায় রাখেননি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি হচ্ছে 'বন্দুকধারীদের ছাযা' (The Shadow of Gunmen—১৯২৩), 'জুনো এবং পেকক' (Juno and the Paycock—১৯২৪), 'লাঙ্গল ও নক্ষত্র' (The Plough and the Stars--১৯২৬), 'রুপোর কাপ' (The Silver Tassie—১৯২৯)।

'জুনো এবং পেকক' তাঁর শ্রেষ্ঠতম নাটক।

নাটকগুলি স্বাধীনতাকামী আইরিশদের সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা।

এরপর আমরা একজন নাট্যকার, নাট্যপরিচালক এবং নাট্যসংগঠকের নাম উল্লেখ করব বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যিনি সারা বিশ্বের নাটকের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে রয়েছেন। এঁর নাম বার্টল্ট ব্রেখট।

বার্টল্ট ব্রেখ্ট্ (Bertolt Brecht) ১৮৯৮-১৯৫৬

ব্রেখট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত।

জার্মানীতে জন্ম, ১৯৩৩ সালে স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। আভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং স্পষ্ট নাট্যজ্ঞানসমম্বিত প্রতিভাবান এই মানুষটি আধুনিক পৃথিবীর নাটক ও নাট্যশিল্পের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছেন। ইংরাজী নাটকে এবং আমাদের দেশেরও আধুনিক নাট্যচর্চায় এঁর প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। এঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক 'তেজস্বিতা, তুমিই জননী' (Mother Courage)। এঁর মৃত্যুর বহু বছর পরেও পৃথিবীর নানা দেশে এঁর নাট্য-আদর্শের প্রতিফলন অনুভব করা যাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তারপরে নাটকের পরিণতি

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা দেশে নাটকের জনপ্রিয়তা আবার বেড়ে গেল। এ ব্যাপারে দুটি প্রতিষ্ঠানের খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। সঙ্গীত ও কলাশিল্পকে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান Council for the Encouragement of Music and the Arts বা সংক্ষেপে CEMA, এবং জাতিকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে গঠিত আর একটি প্রতিষ্ঠান— Entertainment National Service Association বা সংক্ষেপে ENSA। এই দুটি প্রতিষ্ঠান নাটকের প্রচারের এবং তার সক্রিয় অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেছিল। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি পরে গ্রেটবৃটেনের কলাসংস্থায় (The Arts Council of Great Britain) রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বৃটিশ নাট্যসংঘ' (The British Drama League)। নাট্যসংস্থা 'The Old Vic'-ও নাট্যকলা সম্প্রসারণে ব্রতী হয়েছিল এবং খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। নাট্যচর্চা ও প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আদর্শের সন্ধানও চলতে থাকে। কাব্যনাটকে টি. এস. এলিয়ট (T. S. Eliot) এই নতুন আদর্শের সন্ধান দিলেন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে কয়েকজন নবীন নাট্যামোদী ইংরাজী নাটককে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হিসাবে ক্রিষ্টোফার ফ্রাই-এর নাম করতে হয়।

ক্রিষ্টোফার ফ্রাই (Christopher Fry)

১৯০৭ সালে ব্রিষ্টলে এক কোয়েকার পরিবারে জন্ম। বাবা ছিলেন আদর্শবাদী, আত্মত্যাগী, সেবাপরায়ণ, সাধুপ্রকৃতির মানুষ। ক্রিষ্টোফারের ছোটবেলা খুবই কষ্টে কেটেছিল। বড় হয়ে বিভিন্ন নাট্যোৎসবে নাটক দেখানর সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে ইংল্যাণ্ডের ধর্মীয় নাট্যসংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম নাটক ছিল, —'একটি ছেলে যার ঠেলাগাড়ী আছে' (A Boy with a Cart)। এই নাটকটি তাঁকে বৃহত্তর দর্শকমণ্ডলীর কাছে প্রথম পরিচিত করায়।

এ ছাড়া, বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে যুক্ত নাটকও তিনি লিখেছিলেন। যেমন, 'ফিনিক্সপাখী যখন-তখন' (A Phoenix too Frequent)। এই সব নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। ক্রিষ্টোফারের বিশেষত্ব হচ্ছে যে তাঁর নাটক অভিনীত হতে দেখলেই তার স্বাভাবিক উৎকর্ষ বোঝা যায়। বই পড়ে ততটা বোঝা যায় না।

'ফিনিক্সপাখী যখন-তখন' (A Phoenix too Frequent) সম্বন্ধে একটি আলোচনা।

এটি ঋতুসম্পর্কিত কমেডি। একে গ্রীষ্ম ঋতুর কমেডি বলা চলে। এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৬ সালে। নাটকের প্লট পেট্রোনিয়াসের (Petronius) 'প্রবীণা, বিবাহিতা, এফিসিয় স্ত্রীলোকের' (Ephesian Matron) কাহিনী অবলম্বন করে গঠিত হয়েছে।

অপরাজেয়, অবিনশ্বর ভালবাসার শক্তিকে বোঝানোর জন্য নাট্যকার কিংবদন্তীর সেই

ফিনিক্সপাখীর কথা তুলেছেন। আরবের মরুভূমির কথা এসেছে কেননা সেখানে চিরগ্রীষ্ম ; —পশ্চিমী শীতের দেশের মানুষের কাছে পরম কাম্য। ফিনিক্স আবার জীবনের অনিঃশেষ শক্তিরও প্রতীক।

এই নাটকে প্রধান নারীচরিত্র ডাইনামিনে (Dynamene) স্বামীর প্রতি ভালবাসায় পরম নিষ্ঠাবতী। সে এখন বিধবা। কিন্তু তার স্বামীর প্রতি ভালবাসা থেকে সে বিচ্যুত হয়নি। একইভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে সে এখন আত্মনির্যাতন করে চলেছে। কিন্তু সে নিষ্ঠার যাথার্থ্য এখন আবেগের অন্ধ কুহকে যান্ত্রিকতায় পরিণত। প্রাণবন্ত এক যুবক, গ্রীষ্মকালীন রাত্রি এবং অতীতের স্মৃতি একসঙ্গে মিলে তাকে তার আত্মঘাতী ভালবাসা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে জীবনের অমর শক্তিতে পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করল। ভালবাসা, আলিঙ্গন ও সন্তানের জন্মদানকে ক্রিস্টোফার একত্রে দেখেছেন। কিন্তু এই ত্রয়ী কোন জান্তব লালসা বোঝায় না। ক্রিস্টোফার একাধারে আদিম এবং জটিল এক জীবনধর্মকে বোঝাতে চেয়েছেন। দেহগত বাঞ্ছা ও শুদ্ধপ্রেমকে তিনি সমস্তরে আনতে চেযেছেন। দেহগত কামনাকে নিযন্ত্রণ করে রহস্যময় আত্মা। সুতরাং দেহগত কামনাকে আত্মার এক ব্যবহারিক পরিচয়, এবং শুদ্ধ জীবনসত্ত্বাকে কামনার পরিচালক হিসাবে দেখার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন নাট্যকার ক্রিস্টোফার ফ্রাই।

যত দিন যাচ্ছে জগৎ তত যান্ত্রিক এবং বস্তুগত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল হযে উঠেছে। ক্রিস্টোফার জীবনের এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। এর জন্য তিনি রহস্যমযতারও আশ্রয় নিতে পারতেন। তবে তিনি এটা অবশ্যই বুঝতেন যে আমাদের যুগের নীতি বহুলাংশে প্রয়োজনীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি মতামতের ক্ষেত্রে একটা রফা করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর যুগকে চিহ্নিত করেছিলেন, 'যে যার খুশীমত স্বাধীন ইচ্ছার যুগ' বলে। নিজের ইচ্ছা অনুসারে তিনি তাঁর নাটকে মূলগত সত্যবস্তু উপস্থিত করলেও তাকে কেবলমাত্র অনুকরণের স্তরে বদ্ধ রাখেননি। দার্শনিকতা এবং রহস্যময়তা তাঁর নাটকে থেকে গেছে।

ভাষার দিক থেকে বলা চলে, তিনি কবিতাকে নাট্যমঞ্চে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

নানা ধরণের গদ্য লেখা ও লেখক

আমাদের আলোচ্য যুগে (১৮০১-১৯৫০) অসংখ্য গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থকারদের কেউ বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি, কেউ বা জগতের নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এঁদের চিন্তা, ভাবনা, দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, বিশ্লেষণক্ষমতা, ধারণা, যুক্তি, প্রকাশক্ষমতা, সাবলীলতা, দুরূহতা এবং ভাষার ও বিষয়ের বৈচিত্র্য রহস্যময়, আনন্দদায়ক ও বিস্ময়কর।

এই দেড়শ বছরে সাহিত্যের নানা যুগ একের পর এক অতিক্রান্ত হযেছে। ধর্মীয়, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক নানা ধারণা পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে, সহযোগিতায়, এগিয়ে গেছে, রূপান্তরিত হয়েছে, বাতিল হয়েছে, পুনর্গৃহীত হয়েছে বা নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছে।

মানুষের চিন্তা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে ; বহির্বিশ্বেরও নানা ধারণার কত পরিবর্তন ঘটেছে। এ সবকে অবলম্বন করে সাহিত্য কত বিস্তৃত হয়েছে, বিচিত্র হয়েছে, কত শাখা-পাশাখা বিস্তার করেছে।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের কত নতুনত্ব ঘটেছে, বন্ধু পর হয়েছে, পর বন্ধু হয়েছে, দূর নিকট হয়েছে, নিকট দূর হয়েছে। পারিবারিক-সামাজিক বন্ধন কত বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, আত্মানুশীলন ও আত্মবেদিতা কত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। সবেরই ছাপ পড়েছে এই বিশাল গদ্যসাহিত্যে।

পৃথিবীর ইতিহাসের এবং মানুষের পরিচয়ের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে এই দেড়শ বছরে। বড় বড় কত ঘটনা ঘটেছে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (সিপাহী বিদ্রোহ), রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, বৃটিশ গৌরব ও বৃটিশ পরাক্রমের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নতি এবং ধীরে ধীরে তার পতন, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আওতা থেকে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের মুক্তি, রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধন, জাতিসঙ্ঘের ও জাতিসম্মেলনের প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যের মারফৎ মানুষে মানুষে নৈকট্য, সাক্ষরতার অভিযান, শিক্ষার অভাবনীয় বিস্তার সবই এই যুগেই ঘটেছে। ধর্মীয় উদারতা ও সঙ্কীর্ণতা এবং তজ্জনিত রাজনৈতিক বোধের কত বিবর্তন ঘটে গেছে এই দেড়শ বছরে।

দুটি মহাযুদ্ধে মানুষের কত গোপন পরিচয় নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, কাজ ও আদর্শের মূল্যমান কত ভাবে প্রভাবিত হয়েছে, দার্শনিক-রাজনৈতিক কত চিন্তা, ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক কত চেতনা মানুষের মনের উপর কি গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। নিষেধের কত অলঙঘনীয় অনুশাসন পরিত্যক্ত হয়েছে, সাদরে অভ্যর্থিত কত ব্যবস্থাকে বাতিল করতে হয়েছে, ধনী-দরিদ্রের পুরান সংজ্ঞাকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে, জীবনযাপনের ধরনধারণে কত পরিবর্তন এসেছে। আমাদের আলোচ্য-যুগের গদ্যে তার প্রতিবিম্ব পড়েছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্যই এই পরিবর্তন সম্ভব করেছে। তাই এই সাহিত্য বিশালতায়, বৈচিত্র্যে, বিস্ময়ে, নতুনত্বে সমৃদ্ধ।

এই দেড়শ বছরের গদ্যসাহিত্যের পরিচয় মানুষের পরিচয়। সেই মানুষ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে কখনো দৃঢ় পদক্ষেপে, কখনো সন্তর্পনে, কখনো অতীতের এ্যালব্যাট্রশকে ঘাড় থেকে ফেলে দিয়ে, কখনো তারই জন্য করুণ বেদনা হৃদযে বহন করে মানুষ চলেছে, চলেছে, চলেছে। ইংরাজী সাহিত্যের এই বিশেষ অংশটুকুতে অবশ্যই তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

নানা দিক থেকে আমাদের এই গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই জিজ্ঞাসু মানুষের সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না ; অতৃপ্ত থেকে যাবে পাঠকের মন। তবু সমুদ্রে পাদ্যার্ঘপ্রদান আমাদেরই সৃষ্ট রীতি, আমাদেরই তৈরী করা নিয়ম। তাই সহৃদয় পাঠকের কাছে অক্ষমতা প্রকাশ পেলেও তাতে লজ্জার কিছু নেই, —এই যুক্তিতে আলোচ্যযুগের গদ্যের সামান্য একটু আলোচনা গ্রন্থের এই শেষাংশে আমি করে নোব।

অল্প কয়েকজন লেখককে স্মরণ করে এবং তাঁদেরই সাহিত্য-কর্মের উল্লেখ করে আমরা এই আলোচনা গ্রথিত করবো। বর্ণনা, মতামত, রম্যরচনা, সমালোচনা এবং আরও নানা শাখায় এই সব গদ্যলেখা এই সময়ের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা মোটামুটিভাবে লেখকদের অনুসরণ করব কালানুক্রমিত ধারায়।

ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকদের কাছে অতি প্রিয়, ইংরাজী গদ্যরচনার রাজকুমার (The Prince of English Essayists) চার্লস ল্যাম্বকে দিয়ে এই আলোচনা শুরু করব।

চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb) ১৭৭৫-১৮৩৪

চার্লস ল্যাম্বের কথা সাধারণ পাঠকমহলে অনেকেরই মনে থাকে একটি বিশেষ কারণে। চার্লস এবং তাঁর বোন মেরির যুগ্মপ্রচেষ্টায় লেখা 'ল্যাম্বকৃত শেক্সপীয়রের নাটকের কাহিনীসমূহ' (Tales from Shakespeare—১৮০৭) অনেকের কাছেই উপভোগ্য গ্রন্থ। তবে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় 'ইলায়ার রচনাগুলি' (The Ess: of Elia—১৮২৩) এবং 'ইলাযার শেষ রচনাগুলি' (The Last Essays of Elia—১৮৩৩)। এই রচনাগুলিতে তিনি 'ইলায়া' (Elia) এই ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। বিবৃতিকারক হিসাবে তিনি কথা বলেছেন উত্তম পুরুষে। এই গ্রন্থ দুটির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

শেক্সপীয়রের সমসাময়িককালের নাটকের যে রোম্যাণ্টিক সমালোচনা ল্যাম্ব করেছিলেন তার গুণগত সারবত্ত্বা আজও অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করা হয়। ওই সব রচনার উচ্চমান আজ প্রায় দুশ বছব পরেও বহুল প্রশংসিত। শেক্সপীযরের রোম্যাণ্টিক সমালোচনার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি রচনাকে গণ্য করা হয়।

'ইলাযার রচনাগুলি' গ্রন্থেব উৎসর্গপত্রে ল্যাম্ব তাঁর নিজস্ব ধরনে 'রচনা'র (Personal Essays) অতি সুন্দর সংজ্ঞা দিযে গেছেন। তিনি রচনাকে বলেছেন : সান্ধ্যভোজনের পর বন্ধুবান্ধবদেব মধ্যে আরামে বসে হালকা চালে কথাবার্তা। কথাগুলি সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হবার দরকার নেই। ভেবে চিন্তে বলতে হবে এমনও নয়।

তিনি আশা করেছেন, কেউ সেগুলির চূড়ান্ত সাহিত্যিক উদ্দেশ্য যেন খুঁজতে না যান।

(......after-dinner conversation; allowing for the rashness and necessary incompleteness of first thoughts;......The author wishes....... a candid interpretation to his most hasty words and actions.....)।

সহজ-সরল এই হালকা লেখাগুলির সমতুল্য কোন মন্ময় হালকাচালের রচনা আজও পর্যন্ত কোন ইংরাজ লেখক লিখতে পারেননি। এগুলির আশ্চর্য শক্তির উৎসের সঠিক ব্যাখ্যাও কেউ দিতে পারেননি।

লেখাগুলির ভিত্তি তাঁর সহজ জীবনবোধ, বা সহজ কথায় 'তাঁর আত্মজীবন'। তিনি চোখের জল চেপে রেখে মানুষকে হাসিয়ে গেছেন। আশ্চর্য, অসামান্য সুন্দর কৌতুকবোধ তাঁর বহু লেখার ছত্রে ছত্রে থেকে গেছে।

তাঁর অনায়াসসিদ্ধ কৌতুকবোধ তাঁর জীবনানুভূতিরই স্বচ্ছ প্রকাশ। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মানুষটা ছিলেন ভাল্মানুষ। ওয়ার্ডসওযার্থ এবং অন্য:ন্যরা তাঁকে স্নেহ করেছেন, ভালবেসেছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্যক কদর করেননি।

তিনি সংসারী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি তা' আনুমোদন করেনি। অসুস্থ বোনের ভার তিনি স্বেচ্ছায় এবং সাহসের সঙ্গে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 'নীরব বীর' (Silent Hero)। চার্লস ল্যাম্বের লেখা বিচারের জন্য নয় ; তা' পড়তে হয় করুণ, সহজ, সহানুভূতিময় কৌতুকের মনোভাব নিয়ে।

আমরা এখানে তাঁর দুটি রচনা নিয়ে সামান্য আলোচনা করব।

অবসরপ্রাপ্ত মানুষ (Superannuated Man)

চার্লস ল্যাম্ব 'সাউথ সি হাউস' কোম্পানীতে চোদ্দ বছর বয়সে কেরানির চাকরিতে ঢোকেন। সতের বছর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি পান। সেখানে একটানা ছত্রিশ বছর সুনাম ও মর্যাদার সঙ্গে কাজ করে চাকরি থেকে অবসর নেন। মোটা পেনসনও ধার্য হয়। এরকম চাকরি এবং পেনসন সম্পর্কে সাধারণতঃ কারোর কোন অভিযোগ থাকে না; ল্যাম্বেরও ছিল না। কিন্তু ল্যাম্ব ছিলেন জাত-সাহিত্যিক। কাজেই অবসর পেয়ে বা অবসর নিয়ে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

প্রথম দু'চারদিন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। কুখ্যাত ফরাসী জেলখানা ব্যাষ্টিল থেকে হঠাৎ কেউ যখন ছাড়া পেত তার অবস্থা যেমন হত ল্যাম্বের (ইলায়ার) অবস্থাও তাই হল। তিনি যেন মাপা সময় থেকে আমাপা সময়ের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। এত বছর ধরে লণ্ডনের বা আরও কয়েকটি বড় বড় জায়গার কোন কিছুই তিনি ভাল করে দেখতে পর্যন্ত পারেননি। কারণ, রবিবার দিনে ছুটি থাকলেও দেখবার যা কিছু সব বন্ধ থাকে। এখন তিনি স্বাধীন, —যদৃচ্ছ ঘোরাফেরা কবতে পারেন।

দীর্ঘকাল চাকরির সময়টা তিনি জীবন থেকে বাদ দিতে চান। কাজেই এখন নিজেকে যেন অনেক অল্পবয়স্ক বলে মনে হয়।

প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে যান, কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সেই তার ছিঁড়ে গেছে। বুঝতে পারেন, আগেকার সেই অন্তরঙ্গতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জীবনের সঙ্গে মনের সেই ফাঁকা অবস্থাকে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে।

এতকাল ধরে জীবনকে যে বাঁধা লাইনে গড়িয়ে দিয়েছিলেন. এখন আর সে অবস্থা নয়। এখন কোন সময়েই বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকতে হচ্ছে না; —যখন যা খুশি তাই করতে পারছেন। আজ সপ্তাহের কোন দিন বা এটা কোন মাস তা-ও এখন ভাবতে হচ্ছে না। তখন সোমবারটা ছিল খুব নিরানন্দের দিন, —সপ্তাহান্তিক ছুটির পরে সেদিন কাজে যোগ দিতে হত। এখন সেরকম ভাবনা আসে না।

সাংসারিক মানুষ হলে অবসর নিয়ে এত স্বাধীন থাকতে পারতেন না। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব যে তাঁর নেই সেটা সুখের, না কি গভীর বেদনার!

সত্যই, এসব বর্ণনার ভিতরে একটানা একটা বেদনা থেকে যায়। তাঁর এখন কোন কাজের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি এখন এমন একজন মানুষ যার কোন কিছুই করবার নেই, —NOTHING TO DO। তাঁর যদি একটি ছেলে থাকত তিনি তার নাম দিতেন NOTHING TO DO। এ বেদনা কোন কৌতুক দিয়ে ঢাকা যায় না। ল্যাম্ব সেই অমানুষিক চেষ্টা করে গেছেন, —আশ্চর্য সুন্দর কৌতুকের ভাষায় তিনি দেখাতে গেছেন যে তিনি বেশ ভালই আছেন।

রচনার ভিতর কত পরোক্ষ উল্লেখ (allusion) করেছেন, কত ভাল সব উপমা দিয়েছেন, নিটোল মুক্তোর মত কত সুন্দর করে রচনাটি লিখেছেন, কোন কৌশল অবলম্বন না করে সবচেয়ে ভাল কৌশল তৈরী করে গেছেন; —এই হচ্ছেন চার্লস ল্যাম্ব। এর ভিতরে জ্ঞানের কিছু রাখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; কষ্টকল্পনা কিছু নেই। তাঁর সমসাময়িক কালের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৌতুক এবং কারুণ্যের এক অসাধারণ মিশ্রণ।

স্বপ্নে দেখা সন্তানেরা : অলীক কল্পনা
(Dream Children : A Reverie)

'স্বপ্নে দেখা সন্তানেরা' এই রকম আর একটি বিখ্যাত রচনা।

এখানে লেখক (ইলায়া) তাঁর কাল্পনিক পুত্র এবং কন্যাকে নিয়ে আপাতকৌতুকময় গল্পের আড়ালে নিজের অতি করুণ ব্যক্তিগত জীবনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

'স্বপ্নে দেখা সন্তানেরা' রচনার বিবৃতি ও বর্ণনার কিছু কিছু অংশ এখানে রাখা যেতে পারে।—

শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে। বড়রা যখন ছোট ছিল তখনকার গল্প। আমার ছোট দুটি ছেলেমেয়ে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার কাছে এসে বসল তাদের বাবার দিদিমা মিসেস ফিল্ডের গল্প শুনতে। তিনি থাকতেন নরফোকের একটি প্রাচীন বনেদী পরিবারের বাড়ীতে। আমার ছেলেমেয়েরা এবং তাদের বাবা এখন যে বাড়ীতে রয়েছে তার থেকে একশ' গুণ বড় বাড়ী। মিসেস ফিল্ড ওই বাড়ীটি দেখাশোনা করতেন। ওই বাড়ীটাকে ঘিরে অনেক দুঃখের কাহিনী ছিল। সে কাহিনীতো তারা শুনেছে। 'বনের শিশুরা' (Children in the Wood) পল্লীগীতিতে যে কাহিনীর কথা আছে। এ'ছাড়া আরও একটা কাহিনী ছিল। তবে সে পুরানো বাড়ীটি ভেঙ্গে সেখানে নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে।

এ কথা শুনে আমার মেয়ে এলিসের (Alice) মুখের ভাব তার মায়ের মুখের মত বড় কোমল, বেদনার্ত হয়ে এল। তবে তাতে কোন ভর্ৎসনার ছাপ পড়ল না।

মিসেস ফিল্ডের সযত্ন তত্ত্বাবধানে যে আভিজাত্যপূর্ণ অট্টালিকাটি ছিল সেটি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার পুরানো কালের শিল্পকাজগুলি মালিকের নতুন বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আধুনিক ধরনের নতুন বাড়ীতে সেগুলি বেমানান হয়ে রইল। গল্পের এই জায়গায় আমার ছেলে জন (John) বলল, নতুন জায়গায় সেগুলিকে আনাটা বোকার মত কাজ হয়েছিল।

মিসেস ফিল্ড খুব ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ধর্মগ্রন্থের অনেক কিছু তাঁর মুখস্থ ছিল। এখানে এলিস তার দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে অনেক কিছু বোঝাতে চাইলো। আমি আরও বললাম, আমার দিদিমা অল্পবয়সে খুব ভাল নাচতে পারতেন। এখানে এলিসের ডান পা নাচের ভঙ্গীতে নড়েচড়ে উঠল।

পুরানো বাড়ীটির সম্বন্ধে গল্পে দুজন শিশুর কথা ছিল। তাদের কাকা তাদের হত্যা করিয়েছিল। তারা ওই বাড়ীতে বাতদুপুরে খেলা করত। মিসেস ফিল্ড বলতেন, 'ওরা নির্দোষ শিশু ; ওরা আমার কোন ক্ষতি করবে না।'

ওই বাড়ীতে ছুটিছাটায় আমি যখন যেতাম, একলা একলা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতাম, মার্বেল পাথরের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আস্তে আস্তে তারা যেন জীবন্ত হয়ে উঠত।

বিশাল বাড়ী, —বড় বড় ঘর, দালান—সেগুলিতে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল

লাগত। সে বাড়ীর পুরানো বিশাল বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। আমার খুব ভাল লাগত একা একা সেই পুরানো জনশূণ্য রহস্যময় আগানে-বাগানে। গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে আমি খেতাম না। আমার ছেলে জন প্লেট থেকে এক গোছা আঙ্গুর তুলেছিল, —আস্তে আস্তে আবার প্লেটে নামিয়ে রাখল।

নাতিদের মধ্যে আমার দিদিমা আমার দাদা জনকে (John) অর্থাৎ আমার ছেলেমেয়েদের জেঠামশাইকে, সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। আমার পায়ে একবার আঘাত লেগেছিল। আমার ছেলেমেয়েদের জেঠামশাই জন আমাকে পিঠে করে কয়েক মাইল বয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি যখন মারা গেলেন, ঘণ্টাখানেক পরেই আমার মনে হয়েছিল তিনি কতদূরে চলে গেছেন। জীবন আর মৃত্যুর দূরত্ব বড বেশী। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল তাঁকে ভুলে যেতে পারব, কিন্তু দেখা গেল, কোনদিনই আমি তাঁকে ভুলতে পারব না। ডাক্তারে তাঁর শরীরে মৃত্যুর আগে যখন অস্ত্রোপচার করেছিল তখন কি যন্ত্রণাই তিনি পেয়েছিলেন! আমার ছেলেমেয়েরা কেঁদে ফেলল। বললে, 'বাবা, জেঠামশাই-এর কথা আর বোলো না। বরঞ্চ আমাদের মা—যিনি মারা গেছেন—তাঁর কথা বলো।'

আমি তাদের মত করে বললাম, সাত বছব ধরে আমি তাদের মাকে বিযের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। হঠাৎ আমার মেযে এলিসের দিকে আমার চোখ পডে গেল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, আমি কাকে দেখছি! আমার মেয়েকে, না তাদের মা এলিসকে। কত মিল দুজনের মুখেচোখে। আমি একদৃষ্টে তাকিযে রইলাম।

তারপর ধীরে ধীরে আমার ছেলেমেয়েদের চেহারা ঝাপসা হয়ে এল। তারা দূরে, আরও দূরে সরে যেতে লাগল। শুধু দুটি বিমর্ষ অবয়ব বহু দূরে দেখতে পেলাম। তাদের মুখে কোন কথা নেই। তারা তাদের নীরব বেদনার্ত ভাষায় আমাকে জানাল: আমরা এলিসের ছেলেমেয়ে নই, আমরা তোমারও ছেলেমেয়ে নই, আমরা কিছুই নই, —শূণ্য, স্বপ্ন। আমরা শুধু 'যা হতে পারতো'। আমরা মরজগতের ওপারে, বিস্মৃতির স্রোতধারার পাশে শতসহস্র বছর অপেক্ষা করব, যদি তারপরে আমরা অস্তিত্ব পাই, নাম পাই, পরিচয় পাই।

....

এর পরে আমি জেগে উঠলাম। অবিবাহিতের ব্যবহারযোগ্য আমার এই আরামকেদারায় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর (Walter Savage Landor) ১৭৭৫-১৮৬৪

ল্যাণ্ডর জন্মেছিলেন ইংরাজী সাহিত্যে রোম্যান্টিক পুণর্জাগরণ হবার আগে; মারাও গিয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ মারা যাবার ১৪ বছর বাদে। তাঁর নিজের যুগের বা, ধরতে গেলে, অন্য যে কোন যুগের লেখকদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন। ল্যাণ্ডর বলেছিলেন যে তিনি সাহিত্যজগতে নিঃসঙ্গ, এবং তিনি স্থায়ী সাহিত্যিক সুনামের আশাও করেন না।

কবি ও নাট্যকার হিসাবে কিছুটা সার্থক হলেও তাঁর গদ্যরচনা 'কাল্পনিক কথোপকথনের' (Imaginary Conversations) উপরই তাঁর যশ প্রতিষ্ঠিত। এই কথোপকথনগুলি ১৮২৪ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত হেনরী হ্যাভলক এলিসের (Henry Havelock Ellis—১৮৫৯-১৯৩৯) দ্বারা নির্বাচিত সংগ্রহে ৩২টি 'কথোপকথন' আছে। এ ছাড়া আছে বোক্কাসিও-র (Giovanni Boccaccio—১৩১৩-১৩৭৫) 'ডেকামেরণের' (Decameron) অর্থাৎ দশদিনে কথিত শতকাহিনীপূর্ণ গ্রন্থের অনুকরণে 'পেন্টামেরণ' (Pentameron) অর্থাৎ 'পাঁচদিনের কথোপকথন'। এটি নেপলসের লোককাহিনীর সঙ্কলন নয়। এতে পেত্রার্ক (Francesco Petrarca ১৩০৪—১৩৭৪) এবং বোক্কাসিও-র পাঁচদিনের কথোপকথন আছে। ১৮৩৭ সালে এটি প্রকাশিত হয়। 'পেন্টামেরণ' ল্যাণ্ডরের কাল্পনিক কথোপকথনের সবচেয়ে ভাল অংশ। প্রসঙ্গতঃ, এই পেন্টামেরণ লেখার পরেই ল্যাণ্ডর বোক্কাসিও-র গ্রামস্থ প্রাচীন বাসভবনটি অধিকার করেন।

যে ৩২টি 'কথোপকথন' হ্যাভলক এলিস তাঁর গ্রন্থে সঙ্কলন করেছেন তাতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের দুজন দুজনকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক কথোপকথন রাখা হয়েছে। যেমন, 'দান্তে এবং বিযাত্রিচে' (Dante and Beatrice),'চীনসম্রাট এবং সিং-তি' (The Emperor of China and Tsing-Ti) অথবা 'ডায়োজিনিস এবং প্লেটো' (Diogenes and Plato) বা 'অষ্টম হেনরী এবং এ্যান বোলিন' (Henry VIII and Anne Boleyn)।

ল্যাণ্ডর ইংরাজী ভাষাকে হালকাভাবে ব্যবহার করেননি। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল 'অভিজাত প্রজাতন্ত্রীর' ভাষা। তিনি বড শিল্পী ছিলেন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ পরিধির ভিতর তাঁর লেখার বিষয়কে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এমনও বলা যায় যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজবোধ্যভাবে তিনি লিখতে পারেননি। তবুও কিন্তু তাঁর বিজ্ঞতা, বুদ্ধি এবং ঘৃণা ও ক্রোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ আজও মানুষ স্মরণ করে।

উইলিয়ম হ্যাজলিট (William Hazlitt) ১৭৭৮-১৮৩০

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অর্থাৎ দ্বিতীয় রোম্যাণ্টিক যুগের অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে হ্যাজলিটের তফাৎ এই যে তিনি প্রকৃতি এবং মানুষের আদর্শরূপ নিয়ে তত মাথা ঘামাননি, যতটা তিনি তাঁর যুগের মানুষের এবং মানুষের সমাজের মূল চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ, সমালোচনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনুষ্যবিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু যে ধরনের রুচি ও ধারণা তাঁর চিন্তার উৎস ছিল তা সবসময়ে সাধারণভাবে গৃহীত রীতিনীতির সঙ্গে মিলত না। নিয়মমাফিকভাবে দেখতে গেলে তিনি কেতাদুরস্ত সমালোচক ছিলেন না, কিন্তু অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ব্যক্তিগত মতামত এত স্পষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন যে তাঁর বক্তব্যের জোর সকলকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

সমালোচক হিসাবে তিনি বরাবর খুবই খ্যাতিমান। ভাষার উপর তাঁর সম্পূর্ণ দখল ছিল। ছোট ছোট বাক্যে তাঁর সরাসরি ও জোরাল মন্তব্য দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হত। তাতে

কোন বিরুদ্ধ মনোভব সৃষ্টি হত না, বরঞ্চ কথোপকথনের উপভোগ্যতা থাকত। হ্যাজলিটের স্টাইল হ্যাজলিটের চরিত্রের মত সৎ, সরল ও পৌরুষব্যঞ্জক। মানুষের চরিত্রের এবং মানুষের সমাজের অনেক অদেখা জিনিষকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাঠককে দেখিয়ে দিয়েছেন বা ধরিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের রচনায় তাঁর মন্তব্যগুলির গুরুত্ব এবং বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার করেন।

তাঁর রচনাসংগ্রহগুলির মধ্যে রয়েছে—'শেক্সপীয়রের নাটকের বিভিন্ন চরিত্র' (Characters of Shakespeare's Plays ১৮১৭), 'গোলটেবিল' (The Round Table—১৮১৭), 'ইংবাজ কবিগণ' (The English Poets—১৮১৮), 'হাস্যরসের ইংরাজ লেখকগণ' (The English Comic Writers—১৮১৯), 'এলিজাবেথের যুগের নাট্যসাহিত্য' (The Dramatic Literature of the Age of Elizabeth—১৮২০), 'পাঁচমিশালী আলোচনা, অথবা মানুষ এবং মানুষের আচার-আচবণ সম্পর্কে মৌলিক রচনা' (Table Talk; or, Original Essays on Man and Manners ১৮২১-২২), 'যুগের মানসিকতা অথবা সমসাময়িককালের কিছু চরিত্র' (The Spirit of the Age; or, Contemporary Portraits—১৮২৫)।

টমাস ডি কুইন্সি (Thomas De Quincey) ১৭৮৫-১৮৫৯

ডি. কুইন্সির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে ম্যাকবেথের (Macbeth) বিখ্যাত 'দ্বাররক্ষীর দৃশ্যের' 'Porter Scene' দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) সূক্ষ্ম, রোম্যাণ্টিক, কৌতূহল উদ্রেককারী আলোচনার মাধ্যমে। দ্বিতীয় রোম্যাণ্টিক যুগের গদ্যে এঁর স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রচুর পৈতৃক অর্থ হাতে পেয়েও ডি কুইন্সি অবুঝের মত খরচ করে খুব আর্থিক অসুবিধায় পড়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। সারাজীবন অসুস্থ থাকার দরুণ প্রতিভাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেননি। অসুস্থতা সত্ত্বেও লিখেছিলেন অনেক। স্নায়বিক রোগের যন্ত্রণার সাময়িক উপশমের জন্য অল্পবয়সেই আফিম ধরেছিলেন।

ডি কুইন্সির সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'একজন ইংরাজ আফিমখোরের স্বীকারোক্তি (Confessions of an English Opium Eater—১৮২১)। তাঁর আর একটি বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থ 'ইংল্যাণ্ডের ডাকগাড়ী' (The English Mail-Coach—১৮৪৯)।

ডি-কুইন্সির লেখাগুলি আসলে ব্যক্তিগত স্মৃতিকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করে পাঠকের সামনে ধরে দেওয়া। তাঁর লেখার অগতানুগতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আধো ঘুমের ভিতরে তিনি যেন অনেক কিছু দেখেছেন এবং স্মৃতিরোমন্থন করেছেন, —এবং তাকে সুন্দর গদ্যরূপে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর চেতনা অধিকাংশ সময়েই স্বপ্নের ঘোরে অর্ধমগ্ন থাকত। তবে প্রকাশের ধরনে কোন অস্পষ্টতা থাকত না। উপস্থাপিত বিষয়, ব্যক্তি ও অবস্থাকে বাস্তবরূপে দেখানোরও তিনি চেষ্টা করেছেন।

তাঁর গদ্যে যেন সঙ্গীতের চাপা সুর কানে আসে।

টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) ১৭৯৫-১৮৮১

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষিত ইংরাজ মানস যে মানুষটির প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে গৌরবান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হযেছিল তাঁর নাম টমাস কার্লাইল, —স্কটল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের গরীব ঘরের মানুষ। সীমাবদ্ধ এই বস্তুভূত জগতের বাইরে যে অনন্ত মহাজীবন প্রসারিত রয়েছে তার কাছাকাছি আমাদের ক্ষুদ্র উপলব্ধিকে যিনি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি ছিলেন দিব্যপ্রেরণাপ্রাপ্ত চিন্তানাযক টমাস কার্লাইল।

তিনি প্রচলিত অর্থে দার্শনিক ছিলেন না ; কিন্তু প্রচলিত দার্শনিক কূটকৌশলকে পিছনে ফেলে তিনি এগিযে গিযেছিলেন এমন জায়গায় যেখানে প্রচলিত দর্শন পরম আত্মোপলব্ধিতে সার্থকতা লাভ করতে পারে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মতে কার্লাইলেব 'সার্টর রিসার্টাসের' (Sartor Resartus) সঙ্গে ভারতীয বেদান্তদর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায। কার্লাইলের ব্যক্তিত্ব সার্টর রিসার্টাসে ব্যক্ত অনুভূতির উপরই যেন প্রতিষ্ঠিত। 'সার্টর রিসার্টাস' তাঁর অন্তরের যন্ত্রণাদাযক অভিজ্ঞতা। মনে হয় কার্লাইল পুস্তক প্রণয়নের আগেই নিজের মানসিক গঠন সম্পূর্ণ করে নিয়েছিলেন।

কার্লাইলের সবচেযে বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হচ্ছে গ্যেটের 'উইলহেলম মিইষ্টারের শিক্ষানবিশীর' অনুবাদ (The Apprenticeship of Wilhelm Meister—১৮২৪), 'হের টিউফেলসড্রখের জীবন ও মতামত' (The Life and opinion of Herr Teufelsdrockh ১৮৩৩—৩৪) 'সার্টর রিসার্টাস' (Sartor Resartus—১৮৩৬ ; লেখা শেষ হয়েছিল ১৮৩১) ; —এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এরপর 'ফরাসী বিপ্লব' (The French Revolution—১৮৩৭), 'অতীত ও বর্তমান' (Past and Present ১৮৪৩), 'বীরগণ, বীরপূজা এবং ইতিহাসে যা বীরত্বপূর্ণ' (On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History—১৮৪১) এবং 'প্রুশিযার দ্বিতীয ফ্রেডেরিকের ইতিহাস' (The History of Frederick II of Prussia, called Frederick the Great ১৮৫৮—৬৫)।]

তাঁর লেখায় পরপর তিনটি স্টাইল লক্ষ্য করা যায। প্রথম দিকে তুলনামূলকভাবে কলাকৌশলহীন জার্মান আদর্শের স্টাইল, তারপরে পরিণত ও সংযত ধরন এবং শেষ দিকে গীতিকবিতার আত্মনিষ্ঠ স্টাইল। সমস্ত লেখা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় ঔজ্জ্বল্য, সাহসিকতা, যথার্থ অলঙ্কার প্রয়োগ, চিত্রময়তা, ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তীক্ষ্ণতা, এবং বর্ণনায় আধিক্যের প্রয়োগ তাঁর স্টাইলের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ।

জার্মান উত্তরণবাদের (Transcendentalism) প্রভাব কার্লাইলের উপর খুব বেশী ছিল। শ্রীযুক্ত হিউ ওয়াকার (Hugh Walker) বলেছেন, —কার্লাইল জার্মানীকে ইংল্যাণ্ডের কাছে প্রকাশ করেছিলেন ; আর জার্মানী কার্লাইলকে কার্লাইলের কাছে প্রকাশ করেছিল।

কার্লাইলের, অন্ততঃ প্রথম দিকের, ভাষার প্রাণবন্ত দুর্দমনীয় শক্তি এসেছিল স্কটল্যাণ্ডের

গ্রামাঞ্চলের রুক্ষ কৌতুক, জ্বালাময়ী ব্যঙ্গ এবং প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে বিরুদ্ধ ধারণাকে নস্যাৎ করার প্রবণতা থেকে।

মানুষের অনেক প্রচলিত ধারণাকে তাঁর নিজের মত সংস্কার করে কার্লাইল আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। যেমন, মানুষের যা চাওয়া উচিৎ তা সুখ নয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

সমালোচনার ক্ষেত্রে কার্লাইল শুধুমাত্র নিন্দা বা শুধুমাত্র প্রশংসার পক্ষপাতী ছিলেন না। সমালোচনার জন্য যা সবচেয়ে বেশী দরকার তা হল বিষয়বস্তুর সম্যক উপলব্ধি এবং সহানুভূতি। কার্লাইলের সমালোচনার মূল লক্ষণ তিনটি: গভীর মানবিকবোধের সম্প্রসারণ, বিষয়বস্তুর অন্তরে প্রবেশ এবং বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অনুধাবন।

ব্যক্তির জীবনী তাঁর কাছে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখমাত্র নয়; —সেই ব্যক্তির ভিতর থেকে বহির্জগতে কি প্রকাশ পাচ্ছে। জাতির ইতিহাসও তাই। অসংখ্য মানুষের নানাভাবে প্রকাশিত জীবনদর্শনের সমবায়ই জাতির ইতিহাস।

কার্লাইল শক্তিকে গণ্য করেছেন, সাফল্যকে নয়।

কার্লাইল বিশ্বজগতের অপরিবর্তনীয় নিয়মে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। এবং এই নিয়মকেই তিনি সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে সমার্থক করে দেখেছেন। এই সত্য থেকে তিনি কখনও কথায় বা কাজে বিচ্যুত হননি। শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে এই ছিল কার্লাইলের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay) ১৮০০-১৮৫৯

'ভারতীয় দণ্ডবিধির' (১৮৩৮) প্রণেতা এবং পশ্চিমী আদর্শে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারক মেকলে ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রেখে গেছেন। তাঁর নানা রচনা, চিঠি, ডায়েরি ইত্যাদিতে প্রচুর পড়াশুনার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাগ্মিতা তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির প্রধান ভিত্তি। তাঁর ভাষা শক্তিশালী, আবেগময় ও অলঙ্কারপ্রধান।

ঐতিহাসিক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে মেকলে ক্লাসিক লেখক হিসাবে গণ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'রচনাবলী' (The Essays) এবং 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' (History of England)। 'রচনাবলীর' অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলি কয়েক বছর ধরে একের পর এক 'দি এডিনবরা রিভিউ' (The Edinburgh Review) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাগুলিই তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্য-নিদর্শন।

জন রাস্কিন (John Ruskin) ১৮১৯-১৯০০

রাস্কিন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্পের নানা শাখায়—চিত্রাঙ্কণে, বিশেষ করে নিসর্গচিত্রে, ও স্থাপত্যশিল্পে—এবং অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, নৈতিক দর্শনে—নানা গুরুত্বপূর্ণ এবং আধুনিক সংস্কার এনে ফেলেছিলেন।

শিল্পে এবং মানুষের জীবনে সৌন্দর্যের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল।

তাঁর রচিত নানা গ্রন্থের ভিতর সবচেয়ে বিখ্যাত 'আধুনিক চিত্রশিল্পীরা' (Modern Painters ১৮৪৩—৬০), 'স্থাপত্য শিল্পের সপ্তপ্রদীপ' (Seven Lamps of Architecture—১৮৪৯) এবং 'শেষাভিমুখে' (Unto This Last—১৮৬০)।

বাইবেলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে তিনি আদর্শের ও সৌন্দর্যের নতুন নতুন মাপকাঠি প্রস্তুত করেছিলেন। মানুষের জীবনের নৈতিকতার বিষয়েও তিনি নতুন আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন। নানা সামাজিক বিষয়ে ও অর্থনীতিতে তিনি তাঁর ধাবণা ও আদর্শের পক্ষে জোরাল যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

স্থাপত্যশিল্পে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁর বাবা তাঁকে নানা উদাহরণ ও নিদর্শন দেখিযে পরিণত করে তুলেছিলেন। বাস্কিন আধুনিক নন্দনতত্ত্বেব অন্যতম পথপ্রদর্শক।

নতুন শিল্পনীতির প্রতিষ্ঠাতা রাস্কিন জীবনের শেষার্ধে প্রধানতঃ সমাজসংস্কারক হিসাবে কাজ করেছেন। সেই সময তিনি তাঁর স্থিব বিশ্বাসের অনুসরণে উচ্চতম চিন্তা ও দর্শনের আলোচনায় অতিবাহিত করেছেন। প্রথম স্তরে 'আধুনিক চিত্রশিল্পীরা' যেমন শিল্পে তাঁর দক্ষতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে, দ্বিতীয় স্তরে তেমনই 'শেষাভিমুখে' উন্নত মানবিক আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ও মতামত ব্যক্ত করে।

তাঁর ধারণা অনুযাযী মানুষের আচরণীয় ক্রিয়া ও ধর্মকে তিনি অর্থনীতি ও সামাজিক সমস্যাতেও প্রসারিত করেছিলেন।

'শেষাভিমুখে'তে (Unto this Last) ব্যক্ত তাঁর মতামতের প্রচণ্ড বিরোধিতা হযেছিল ; কিন্তু রাস্কিন অর্থনীতি ও সমাজনীতির প্রচলিত চরিত্রকে মেনে নেননি। 'শেষাভিমুখে'তে ব্যক্ত রাস্কিনের মতামত গান্ধীজীর বিশেষ অনুপ্রেরণা ছিল।

ম্যাথু আর্ণল্ড (Matthew Arnold) ১৮২২-৮৮

ম্যাথু আর্ণল্ডের গদ্যের সম্বন্ধে বলতে গেলে তাঁর যুগের কথা অবশ্যই এসে পড়ে। এটি ছিল ডারউইন ও স্পেন্সারের যুগ। বিবর্তনবাদী দর্শন এই যুগে শিক্ষিত সমাজের এতকালের সমস্ত পুরানো ভাবনাচিন্তাকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। আত্মপ্রসাদপূর্ণ পুরানো বিশ্বাসের ভিৎ নাড়িযে দিয়েছিল। ধর্ম ও দর্শনের দিকে এটি ছিল অক্সফোর্ড আন্দোলনের যুগ। ইংল্যাণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসংগঠন (Church of England) দারুণভাবে সন্দেহের মুখোমুখি হয়েছিল। ধর্ম এবং দর্শনের নতুন আন্দোলন শিক্ষিত ও দূরদর্শী মানুষদের তত্ত্ববোধের দিক থেকে খুবই উত্তেজিত করে তুলেছিল। নতুন ধর্মীয় মতামত চিন্তাশীল মানুষদের অনেককেই বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল। নতুন ধারণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁরা দুটি বিপরীতমুখী পথ দেখতে পেয়েছিলেন। পুরানো সমস্ত ধারণা, চিন্তা, অনুভূতি ধ্বংস করার এক পথ। আর অপর পথটি ছিল রক্ষণশীলতার পক্ষে এক দৃঢ় প্রতিক্রিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বুদ্ধি ও বিশ্বাসের এই দুটি পথে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এই দুই চরম পথের মাঝামাঝি আর একটি তৃতীয় বা মধ্য পথও তৈরী হয়েছিল।

শক্তিশালী মনের মানুষেরা পুরোপুরি নব্যদর্শনের দিকে ঝুঁকলেন। কম শক্তিশালী মানুষেরা ভীত হয়ে পুরাতন ধর্মদর্শনের ছত্রচ্ছায়ায় মাথা বাঁচাতে চাইলেন। অল্পবয়স্ক ছাত্ররা ছিলেন ধর্মপরায়ণ। কিন্তু নতুন জ্ঞানকেও যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, —এই বোধ তাঁদের মধ্যে কার্যকরী ছিল। নতুন ধারণার ভিত্তি আধুনিক বিজ্ঞান। সেই ধারণাকেও দুঃখ এবং বেদনার সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। দুঃখ এবং বেদনা এইজন্যই

যে যুক্তিপরায়ণ হতে গেলে এতদিনকার পরিচিত ধর্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে হয়। ম্যাথু আর্ণল্ড মধ্যপথ অবলম্বন করেছিলেন। অন্তর যা চায় না বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই দ্বন্দ্ব কর্তব্য এবং যুক্তির সঙ্গে স্বাভাবিক প্রবণতা ও মাধুর্যের দ্বন্দ্ব। ম্যাথু আর্ণল্ড অন্তরের মাধুর্য এবং বুদ্ধির আলোক দুটিকেই একসঙ্গে তাঁর জীবনে ও সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত করেছিলেন।

ম্যাথু আর্ণল্ডের গদ্য মূল বক্তব্য এবং আলোচনার ধরন এই উভয় দিক থেকেই সমালোচনার লক্ষণাক্রান্ত। এই সঙ্গে এমনও বলা হয় যে ইংরাজী সমালোচনা ম্যাথু আর্ণল্ডের হাতেই আদর্শ রূপ এবং পূর্ণতা পেয়েছিল। এর আগে এদিক-ওদিক হাতড়ান হয়েছিল। আর ম্যাথু আর্ণল্ডের পরে সমালোচনা সাহিত্য বিশৃঙ্খল অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। আজও পর্যন্ত তা' শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা মূল আদর্শ-সমন্বিত নয়।

আগেই বলা হয়েছে সমালোচনা-গ্রন্থগুলিই ম্যাথু আর্ণল্ডের সর্বোৎকৃষ্ট গদ্য রচনা। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'রচনার আকারে সমালোচনা' (Essays in Criticism ১৮৬৫ এবং ১৮৮৮)। এতে সাহিত্য অনুশীলন সম্পর্কিত অতি মূল্যবান প্রথম রচনাটি (The Study of Poetry) ছাড়াও আটজন কবি ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আর্ণল্ডের সমস্ত গদ্যগ্রন্থের ভিতর এটিই সবচেয়ে ব্যাপকভাবে এবং সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাবশালী। জ্ঞান ও সহানুভূতির এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ অদ্যাবধি খুব কম সমালোচনা গ্রন্থেই দেখা গেছে।

আর একটি গ্রন্থ, 'সংস্কৃতি ও নৈরাজ্য' (Culture and Anarchy, ১৮৬৯)—রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা।

ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক বদ্ধমূল ধারণা' (Literature and Dogma ১৮৭৩)।

আর্ণল্ড সমালোচনার ক্ষেত্রে কূপমণ্ডুকতার সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার ইউরোপীয় আদর্শের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

ওয়ালটার পেটার (Walter Horatio Pater) ১৮৩৯-১৮৯৪

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের কাছে ওয়ালটার পেটার নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। তাঁর মতে আধুনিক জগতের অর্থাৎ বর্তমানের যুগোপযোগী শিল্পের ব্যাখ্যাতেই কল্পনাভিত্তিক গদ্য নিয়োজিত থাকবে। আধুনিক জগতে আছে বিশৃঙ্খল বৈচিত্র এবং আকর্ষণীয় নানা জটিলতা। এ ছাড়া আছে সর্বব্যাপী স্বাভাবিকতা। এই বৈচিত্র, জটিলতা ও স্বাভাবিকতাকে সর্বতোভাবে মেনে নিয়ে তাকে সাহিত্যে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে।

পেটারের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়—'র‍্যানেইসঁসের ইতিহাস অনুশীলন' (Studies in the History of the Renaissance—১৮৭৩), 'প্রমোদপ্রিয়, রুচিবাগীশ মেরিয়াস' (Marius the Epicurean—১৮৮৫), 'কাল্পনিক প্রতিকৃতিসমূহ' (Imaginary Portraits, ১৮৮৭), এবং 'প্রশংসনীয় বলিয়া উপলব্ধি' (Appreciations—১৮৮৯)। 'মেরিয়াস' একটি নভেল, অন্যগুলি প্রবন্ধ।

পেটার বলেছেন,—'যা তোমার বলবার আছে, বা যা তোমার বলতে ইচ্ছা করে তা সহজতমভাবে, সবচেয়ে সোজাসুজিভাবে এবং যতদূর সম্ভব সঠিক ধরনে বল।'

রোমান্টিক এবং ক্লাসিক বিষয়গুলির মূল পার্থক্য তিনি খুব সুন্দর করে ধরে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন রোম্যান্টিকতার সারমর্ম হবে কৌতূহল এবং সুন্দরকে ভালবাসা; আর ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ হচ্ছে মনোরম শৃঙ্খলা।

তিনি আরও বলেছেন সমস্ত সৎ শিল্পই তার নিজেব যুগে রোম্যান্টিক। তবে তিনি সমস্ত সুন্দর শিল্পের উপর তাঁর মতানুযায়ী ক্লাসিক গুণ—মনোরম শৃঙ্খলা—আরোপ করতে চেয়েছেন।

তাঁর মতে গ্রীক নিযমানুবর্তিতাকে বুঝে নিযে আধুনিক কালের রোম্যান্টিক শিল্পে যদি তা প্রয়োগ করা যায় তা হলেই আদর্শ সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে পারে।

জর্জ সেণ্টসবেরি (George Saintsbury) ১৮৪৫-১৯৩৩

জর্জ সেণ্টসবোরি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকদের অন্যতম। অগাধ পড়াশুনা এবং অগাধ স্মৃতিশক্তি। 'এলিজাবেথের যুগের সাহিত্য' (Elizabethan Literature ১৮৮৭), 'ইংরাজী ছন্দঃপ্রকরণের ইতিহাস' (History of English Prosody ১৯০৬—১০) এবং 'ইংরাজী সমালোচনাব ইতিহাস' (History of English Criticism—১৯১১) তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যপ্রীতির পরিচয বহন করে।

এ. সি. ব্রাডলি (A. C. Bradley) ১৮৫১-১৯৩৫

শেক্সপীয়রীয় সাহিত্য এবং পরবর্তী সাহিত্যের উপর অমূল্য গ্রন্থদ্বযের প্রণেতা। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রদের কাছে পরিচিত এবং অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দুটি।

'শেক্সপীযরের ট্র্যাজেডি' (Shakespearean Tragedy—১৯০৪) এবং 'সাহিত্য সম্পর্কিত অক্সফোর্ড বক্তৃতা' (Oxford Lectures on Poetry—১৯০৯)।

ব্রাডলি শেক্সপীয়রের চারখানি ট্র্যাজেডির উপর চরিত্রভিত্তিক অতিশয সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো ও কিং লিয়ার আমাদের সামনে যেন স্পষ্ট মানবিক মূর্তি ধারণ করে।

ডব্লু. পি. কের (W. P. Ker) ১৮৫৫-১৯২৩

বিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয ও আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনাকে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁব রচিত গ্রন্থগুলির ভিতর নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—

'মহাকাব্য ও রোম্যান্স' (Epic and Romance—১৮৯৭), 'অন্ধকার যুগ' (The Dark Ages—১৯০৪), 'মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর রচনাবলী' (Essays on Medieval Literature—১৯০৫), 'কাব্যের শিল্পগুণ' (The Art of Poetry—১৯২৩) এবং 'কাব্যের গঠনবিন্যাস ও রচনাশৈলী' (Form and Style in Poetry—১৯২৮)।

বার্ণার্ড শ (George Bernard Shaw) ১৮৫৬-১৯৫০

ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা এই নাট্যপ্রতিভার রাজনীতি, ধর্ম, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, নাটক, সুপ্রজনন, শিক্ষা, অর্থনীতি, নিরামিষাহার, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে গদ্যরচনাও মৌলিক ও উৎকৃষ্টমানের। তিনি ওই সব বিষয় সম্পর্কে মতামত এত সরাসরি, স্পষ্টভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন যে সেগুলি পড়ামাত্রই পাঠক তাঁর ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। বিভিন্ন নাটকের ভূমিকাগুলিও অতি সুন্দর ও জোরাল গদ্য।

গদ্যরচনায় তিনি যেমন তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছেন তেমনি আবার পাঠকের সঙ্গে প্রয়োজনীয ও বিধিসঙ্গত দূরত্বও বজায় রেখেছেন। তাঁর গদ্যে কোন অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব দেখা যায না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ বর্তমানে দুর্বল, কিন্তু সে একদিন মহান ও উন্নত স্তরে আরোহন করবে।

তাঁর গদ্যে আনন্দময় প্রাণপ্রাচুর্য আছে।

তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে কযেকটির এখানে উল্লেখ করা হল।—

'ইবসেনের মতাবাদের অপরিহার্য সারাংশ' (The Quintessence of Ibsenism—১৮৯১), 'নাটকের ব্যাপারে মতামত ও ওই সংক্রান্ত রচনা' (Dramatic Opinions and Essays—১৯০৭), 'সমাজতন্ত্রের পথে বুদ্ধিমতী মহিলার যাত্রপথের নির্দেশ' (The Intelligent Woman's guide to Socialism—১৯২৮) এবং 'যার যে রকম রাজনৈতিক আচার আচরণ' (Everybody's Political What's What—১৯৪৪)।

স্যার ওয়াল্টার রলে (Sir Walter Raleigh) ১৮৬১-১৯২২

রলের গ্রন্থগুলি কিছুটা পণ্ডিতী তত্ত্বমূলক হলেও সুখপাঠ্য এবং প্রযোজনীয নানা তথ্যসমন্বিত। ওই গ্রন্থগুলিতে সর্বোচ্চস্তরের সাহিত্যিকদের কয়েকজনের সম্পর্কে অতি মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে। ওইগুলি তৎকালীন অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের আনন্দবিধানে সমর্থ হয়েছিল। গ্রন্থগুলির নাম—

'মিলটন' (১৯০০), ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৯০৩), শেক্সপীয়র (১৯০৭) এবং 'জনসন সম্পর্কে ছটি রচনা' (Six Essays on Johnson—১৯১০)।

স্যার ই. কে. চেম্বারস (Sir Edmund K. Chambers) ১৮৬৬-১৯৫৪

ই. কে. চেম্বার্সের 'মধ্যযুগীয় মঞ্চ' (The Mediaeval Stage—১৯০৩) এবং 'এলিজাবেথীয় মঞ্চ' (The Elizabethan Stage—১৯২৩) গ্রন্থ দুটি প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য। এগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়।

পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সাধারণ সাহিত্যরসিক পাঠক উভয়েই স্যার চেম্বার্সের বই পড়ে আনন্দ পেতে পারেন।

'শেক্সপীয়রকে ব্যাপকভাবে নিরীক্ষণ' (Shakespeare, a Survey—১৯২৫) তাঁর আর একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

এ ছাড়া, Oxford History of English Literature—এর অংশ হিসাবে চেম্বার্সের লিখিত 'মধ্যযুগেব অবসানের সময়ে ইংরাজী সাহিত্য' (English Literature at the close of the Middle Ages—১৯৪৫) সাহিত্যের ইতিহাসে এক মূল্যবান সংযোজন।

এইচ. জি. ওয়েলস (Herbert George Wells) ১৮৬৬-১৯৪৬

এইচ. জি. ওয়েলস বিংশ শতাব্দীর এক অতি বিস্ময়কর প্রতিভা। বহুকাল ধরে চলে আসা সমাজের পাকাপোক্ত গঠনকে পরিবর্তন করে নতুন পৃথিবী ও নতুন মানুষেব উদ্ভবের সম্ভাবনা তিনি তাঁর উপন্যাসে ও গদ্য রচনায ব্যক্ত করে গেছেন।

ওয়েলস ছিলেন সমাজতন্ত্রী ও সমাজতত্ত্ববিদ। সমাজের ও ব্যক্তির মূল প্রকৃতিকে পরিবর্তনের আশা নিযে তিনি যা কিছু লিখেছেন তা শুধু সম্পূর্ণ মৌলিকই নয়,—সেগুলিতে ব্যক্ত তাঁর কল্পনা সমসামযিক কালে এবং অব্যবহিত পরের যুগে নানা বিষয়ে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল।

তিনি লিখেছেন প্রচুর এবং সেই সব লেখা বিষয় ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে সর্বতোভাবে নতুন ও আধুনিক।

ইতিহাস, যন্ত্রবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, বিবর্তন, মানষের মানসিক গঠনের যথার্থ চরিত্র এবং প্রযোজনমত তার রূপান্তরযোগ্যতা, —সমস্তই তিনি তাঁর চিন্তার আওতায় এনেছিলেন। উপন্যাস, উদ্ভট ও বিস্ময়কর কল্পনা এবং নানা গদ্যরচনার ভিতর দিয়ে সেগুলিকে তিনি পাঠকের সামনে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এত বৃহৎ পরিমণ্ডলে তিনি ঘোরাফেরা করেছেন যে কোথাও কিছু তথ্যের ভুল বা বিশ্বাসের অপরিপক্কতা যদি থেকেও গিয়ে থাকে তবে তা তুচ্ছ, —গণ্য করবার মত নয়। হয়ত তিনি কোন ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না ; কিন্তু বুদ্ধি ও কল্পনার এমন এক তুঙ্গে তিনি উঠেছিলেন যেখানে তথ্য ও ঘটনার বৈজ্ঞানিক সত্যও তত প্রয়োজনীয় হয় না।

তাঁর মতে বিজ্ঞানের শুধু উন্নত থেকে উন্নততর হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় ; মানুষজাতির ভিতরে তার মঙ্গলময় প্রসারই বেশী দরকারী কথা। তিনি চেয়েছিলেন দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষ যেন প্রচলিত সামাজিক বিন্যাসের শিকার হয়ে চিরকাল না থাকে।

তাঁর সময়ের বাস্তব জাগতিক ঘটনাগুলিকে তিনি লক্ষ্য করে গেছেন এবং তাঁর অনেক লেখাই সেই সব ঘটনা ও পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া।

তিনি মহাবিশ্বজগতে এই পৃথিবীর মানুষের প্রসার সম্পর্কে ভবিষ্যদবাণী করে গেছেন।

ওয়েলসের লেখার পরিমাণ ও লিখিত বই-এর সংখ্যা অবিশ্বাস্য। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মনে হয় তাঁর সমস্ত চিন্তা যেন একজোট হয়েছিল মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সারা পৃথিবীর মানুষের ঐক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির থেকে বৃহত্তর একক হিসাবে সমগ্র মানুষজাতির নতুন এক রূপ বোধহয় তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে এসে গিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়নের ভিতর হয়ত এই বোধ কাজ করেছিল যে মানুষের পরিচয় হোক সামগ্রিকভাবে 'মানুষ' ; —ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন কোন পরিচয় যেমন অতীতেও মানুষের ছিল না, ভবিষ্যতেও তা যেন না থাকে।

ওয়েলসের লেখায় প্রাণপ্রাচুর্য এবং উচ্ছ্বাস সমভাবেই বর্তমান। গুণ, দোষ, অবস্থার বর্ণনায় সংযতমাত্রার থেকে বেশী কিছু তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সে সব তাঁর আন্তরিক আবেগই ব্যক্ত করে। আমরা অনেক সময়ে অভিভূত হয়ে তাঁর লেখার থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলি। তবে এই গুরুত্ব পাওয়ার যথার্থ অধিকার তাঁর ছিল।

এখানে এইচ. জি. ওয়েলসের অল্প কয়েকটি বই এর নাম করা হল:

চিন্তা ও গবেষণা মূলক গদ্যগ্রন্থাদির মধ্যে রয়েছে 'মানুষের জীবন ও চিন্তার উপর যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রতিক্রিয়ার পূর্বাভাস' (Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought—১৯০১)।

'নির্মীয়মাণ মনুষ্যজাতি' (Mankind in the Making—১৯০৩)।

'সমাজতন্ত্রবাদ ও পরিবার' (Socialism and the Family—১৯০৬)।

'পুরাতনের পরিবর্তে নূতন নানা সমাজ' (New Worlds for Old—১৯০৮)।

'একজন ইংরাজের চোখে পৃথিবী' (An Englishman looks at the World—১৯১৪)।

'যুদ্ধবিলোপের যুদ্ধ' (The War that will end War—১৯১৪)।

'পুনর্গঠনের মূলসূত্রগুলি' (The Elements of Reconstruction—১৯১৬)।

'অনুজ্জ্বল রাশিয়া' (Russia in the Shadows—১৯২০)।

'মগ্ন সভ্যতার উদ্ধার' (The Salvaging of Civilization—১৯২১)।

'ওয়াশিংটন এবং শান্তির আশা' (Washington and the Hope of Peace —১৯২২)।

বিতর্কমূলক সমস্যা সম্পর্কে রচনা

[কয়েকটির নাম মাত্র এখানে উল্লেখ করা হল]—

'কাজ, সম্পদ ও মানুষের সুখ' (The Work, Wealth and Happiness of Mankind—১৯৩১)।

'গণতন্ত্রের পরে' (After Democracy—১৯৩২)।

'নৈরাশ্যের ব্যবচ্ছেদ' (The Anatomy of Frustration—১৯৩৬)।

গভীর চিন্তামূলক রচনা

'আধুনিক মানবগোষ্ঠির ভাগ্য' (The Fate of Homo Sapiens—১৯৩৯)।

'নতুনভাবে বিন্যস্ত জগৎ' (The New World Order—১৯৪০)।

'মানুষের অধিকার সমূহ' (The Rights of Man—১৯৪০)।

'সহজ বুদ্ধিতে যুদ্ধ ও শান্তি' (The Commonsense of War and Peace—১৯৪০)।

'বিজ্ঞান ও বিশ্বমানস' (Science and the World Mind—১৯৪২)।

শিক্ষামূলক গ্রন্থ—

'ইতিহাসের সীমারেখা' (The Outline of History—১৯২০)।
'সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস' (A short History of the World—১৯২২)।

আত্মজীবনী—

'আত্মজীবনী প্রসঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা' (Experiment in Autobiography—১৯৩৪)।

উপরোক্তগুলি ছাডাও আরও বহু গ্রন্থের প্রণেতা হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস।

ম্যাক্স বিয়ারবম (Sir Max Beerbohm) ১৮৭২-১৯৫৬

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশককে স্পষ্টভাবে কোন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের যুগ বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। বড কবি-সাহিত্যিক অনেকেই এই যুগে কাজ করেছেন। তাঁরা নিজের নিজের মত নানা আদর্শ খুঁজে নিয়েছেন বা অতীতের কোন কোন আদর্শকে জাগিয়ে তুলতে চেযেছেন। এই যুগ সাহিত্যে সমৃদ্ধ হলেও সমগ্রভাবে এর নির্দিষ্ট কোন বিশিষ্ট রূপ নেই।

সমসাময়িক বিষযবস্তু নিযে যে সুনিপুণ রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম ছিল তা আবার যাঁরা এই যুগে অনুশীলন করলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন ম্যাক্স বিয়ারবম।

স্যার ম্যাক্স বিযারবম ছিলেন রচনাকার। বিদ্রুপাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত। তবে ব্যঙ্গের তীব্রতা তাঁর নাগরিক শালীনতার দ্বারা মার্জিত ছিল। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং নিজস্ব বিশিষ্ট স্টাইলের লেখক। বৃটিশ বেতারে তিনি যে সব রচনা পাঠ করেছিলেন সেগুলির সংগৃহীত গ্রন্থ বহুকাল ধরে পাঠযোগ্য ও আনন্দদায়ক ছিল। তাঁর গদ্য ছিল ত্রুটিশূণ্য ও সুষমামণ্ডিত।

'ম্যাক্স বিয়ারবমের সাহিত্যকর্ম' (The Works of Max Beerbohm—১৮৯৬), 'আরও' (More—১৮৯৯), 'তবু আবার' (Yet Again—১৯০৯), 'এমনকি এখনও' (And Even Now—১৯২০), এবং বিভিন্ন সময়ে বেতারে পঠিত রচনা 'প্রধানতঃ বেতারে' (Mainly On the Air—১৯৪৬)—তাঁর রচনাসংকলন।

বিয়ারবম ভাষায় হাস্যোদ্রেককারী অতিরঞ্জনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাঁর আঁকা একটি বিভ্রান্ত যুবকের ছবি ওই সময়কার বৃটিশযুবকদের মনের অবস্থা খুব সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) ১৮৭২-১৯৭০

বিংশ শতাব্দীর আর এক আশ্চর্য প্রতিভা বার্ট্রাণ্ড রাসেল। দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, সমাজসচেতন রাসেল আমাদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। সমসাময়িক ইংরাজ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরের বাস্তব

সমস্যাগুলি তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা বিশ্ববন্দিত।

তাঁর দর্শন বাস্তববাদী কিন্তু পুরোপুরি প্রয়োগবাদী নয়। তিনি যুক্তিবাদী, কিন্তু স্পষ্ট সহজবুদ্ধিকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার, ধর্মীয় সংস্কার এবং আবেগপ্রবণতাকে তিনি যাচাই করে নিতে চান।

রাসেল বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে সমাগ্রিকভাবে মানুষকে দেখেছেন। বিচ্ছিন্ন, একক ব্যক্তির সম্পর্কে তাঁর কোন আকর্ষণ বা পক্ষপাতিত্ব নেই।

তাঁর গদ্যলেখা সহজ, যথাযথ, প্রাঞ্জল, প্রাণবন্ত এবং সরস কৌতুকপূর্ণ। ছকে বাঁধা যুক্তি অনুসরণ করে তিনি লেখেননি। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব তাঁর লেখায় পরিস্ফুট। রাসেলের লেখা আধুনিক ও প্রগতিশীল।

গ্রেট বৃটেনে তিনি ছিলেন অতি সম্মানিত নাগরিক। আধুনিক ও গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন হওয়ায় নামের সঙ্গে বংশানুক্রমিক 'লর্ড' উপাধি ব্যবহার করেননি।

তাঁর লিখিত বই-এর সবগুলির নাম উল্লেখ না করেও তাঁর বুদ্ধির গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

১৮৯৬ সালে জার্মান সামাজিক গণতন্ত্রের (German Social Democracy) উপর তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল শান্তিবাদী। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তা মনঃপূত হয়নি।

১৯০০ সালে লিখিত 'লিবনিজের দর্শন' সম্ভবতঃ দর্শন বিষয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ। লিবনিজ (Gottfried Wilhelm Von Leibnitz ১৬৪৬—১৭১৬) ছিলেন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মাণ যুক্তিবাদী দার্শনিক।

এরপর ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় গণিতবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গণিতের নীতিসমূহ' (The Principles of Mathematics)।

'দার্শনিক রচনাসমূহ' (Philosophical Essays) প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। এরপরে ১৯১২ সালে ও ১৯১৪ সালে লেখেন যথাক্রমে 'দর্শনের সমস্যাগুলি' (The Problems of Philosophy) এবং 'বার্গশঁর দর্শন' (Philosophy of Bergson)। হেনরী বার্গশঁ (Henry Bergson ১৮৫৯—১৯৪১) যান্ত্রিকতাবিরোধী এবং স্বতঃলব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাসী দার্শনিক। তিনি বহু ঔপন্যাসিকেরও প্রেরণা ছিলেন।

রাসেলের সমাজসচেতনতামূলক প্রথম বাস্তববাদী নীতি ও পরামর্শ ব্যক্ত হয়েছে 'সামাজিক পুণর্গঠনের নীতিসমূহ' নামক গ্রন্থে (Principles of Social Reconstruction—১৯১৭)।

এরপরে নিম্নলিখিত চারটি দর্শনসম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশ পায়।—'অতীন্দ্রিয়বাদ ও ন্যায়শাস্ত্র' (Mysticism and Logic—১৯১৮), 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা' (Introduction to Mathematical Philosophy—১৯১৯), 'মনোবিশ্লেষণ' (The Analysis of Mind—১৯২১) এবং 'দর্শনের সীমারেখা' (The Outline of Philosophy—১৯২৭)।

এরপরে সমসাময়িক রাজনীতি বিষয়ে লিখলেন,—'বলশেভিক মতবাদের নীতি ও কার্যপ্রণালী (The Practice and Theory of Bolshevism—১৯২০)।

এই সময়েই লেখা হয়েছিল শিক্ষা সম্পর্কে গ্রন্থ 'শিক্ষা সম্পর্কে: বিশেষ করে অতি শৈশব অবস্থায়' (On Education: Especially in early Childhood—১৯২৬)। কয়েক বছর বাদে শিক্ষাসম্পর্কে আরও লিখলেন,—'শিক্ষা ও সমাজবিন্যাস' (Education and Social Order—১৯৩২)।

এরই মাঝখানে লিখলেন বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও পারিবারিক গ্রন্থ।—'বস্তুর বিশ্লেষণ' (The Analysis of Matter—১৯২৭), এবং 'বিবাহ ও নৈতিকতা' (Marriage and Moral—১৯২৯)।

১৯২৭ সালেই লিখলেন ধর্মসংক্রান্ত জবানবন্দী: 'কেন আমি খৃষ্টান নই' (Why I am not a Christian)।

এরপরে লেখা হল সকল মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গ্রন্থদ্বয়—'তৃপ্তি অর্জন' (The Conquest of Happiness—১৯৩০) এবং 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' (The Scientific Outlook—১৯৩১)।

এর পরে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখলেন 'স্বাধীনতা ও সংগঠিত প্রতিষ্ঠান' (Freedom and Organisation 1814—1914 —১৯৩৪) এবং 'শাসকগোষ্ঠী ও ব্যক্তিসত্ত্বা' (Authority and the Individual—১৯৪৯)।

তারপর আবার দুটি দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থ: 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস' (History of Western Philosophy— ১৯৪৬) এবং 'মানুষের জ্ঞান, তার বিস্তৃতি ও সীমারেখা' (Human Knowledge, its scope and Limits—১৯৪৮)।

এত গুরুগম্ভীর গ্রন্থাদির মাঝখানে দুটি ছোটগল্পের সঙ্কলন বেরিয়েছিল। সেগুলি ছিল 'উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলসমূহে শয়তান' (Satan in the Suburbs—১৯৫৩), এবং 'খ্যাতনামা ব্যক্তিদের দুঃস্বপ্নগুলি' (Nightmares of Eminent Persons—১৯৫৪)।

এরপরেও ছিল তিনখণ্ডে বিভক্ত আত্মজীবনী (Autobiography):

প্রথম, ১৮৭২ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত।

দ্বিতীয়, ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত।

এবং তৃতীয়, ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত।

এ ছাড়া, ১৯৫০ সালে একটি রচনাসংগ্রহ বেরিয়েছিল: 'অ-জনপ্রিয় রচনাগুলি' (Unpopular Essays)।

মৃত্যুর অল্প কয়েকমাস আগে পর্যন্ত তিনি সৃজনশীল গ্রন্থকর্তা হিসাবে সক্রিয় ছিলেন।

উইনস্টন চার্চিল (Sir Winston Churchill) ১৮৭৪-১৯৫৬

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বিখ্যাত সেনাপতি মার্লবরোর ডিউক জন চার্চিলের (John Churchill, Duke of Marlborough) উত্তর পুরুষ, লর্ড র‍্যানডলফ চার্চিলের (Lord Randolf Churchill) পুত্র উইনস্টন ছিলেন সাংবাদিক, সৈনিক, রাজনীতিজ্ঞ,

সাহিত্যিক এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী। ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী ও চরম ভারতবিদ্বেষী। সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

পাঁচ খণ্ডে বিন্যস্ত 'বিশ্বসঙ্কটের (The World Crisis) এবং ছয় খণ্ডে বিন্যস্ত 'আসন্ন ঝড়' ও ধারাবাহিক অন্যান্য গ্রন্থের (The Gathering Storm and Others ১৯৪৮—১৯৫৪) প্রণেতা। প্রথম ধারাটি প্রথম মহাযুদ্ধকে এবং দ্বিতীয় ধারাটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে লেখা। এ ছাড়া নিজের জীবনী, কয়েকজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির জীবনী এবং মার্লবরোর জীবনী লিখেছেন।

ওই সব লেখা তাঁর দক্ষতা, প্রামাণিকতা, রক্ষণশীলতা এবং ইংরাজী ভাষার গাম্ভীর্যময় মর্যাদাকে দৃঢতার সঙ্গে ঘোষণা করে। এই বইগুলি রাজনীতি, ইতিহাস ও গদ্যসাহিত্যের একত্রীভূত রাজকীয় নিদর্শন।

বিশ্ব রাজনীতি প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য নানা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলিও পৌরুষব্যঞ্জক ইংরাজী ভাষার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

লিটন স্ট্র্যাচি (Giles Lytton Strachey) ১৮৮০-১৯৩২

স্ট্র্যাচি প্রধানতঃ জীবনীকার। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত "খ্যাতিমান ভিক্টোরিয়গণ" (Eminent Victorians—১৯১৮)। তিনি জীবনীগ্রন্থের আধুনিক ধরনের আদর্শ ইংরাজী সাহিত্যে এনে ফেলেছিলেন। ভিক্টোরিয় যুগের বড বড মানুষদের সম্পর্কে ভ্রান্ত শ্রদ্ধা থেকে সাধারণ মানুষদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই শুধু দেখান হয। সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে সবদিক থেকে দেখান হয়না। স্ট্র্যাচি সেই সব মানুষদের চরিত্রের এবং কার্যকলাপের তুচ্ছ, হাস্যকর কিন্তু স্বাভাবিক দিকগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বড় বড় মানুষদের এই সব পরিচয়গুলি সাধারণতঃ ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয। স্ট্র্যাচি সেই আবরণ খুলে দিয়ে তাদের যেন স্বস্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর এই চেষ্টার জন্য আলোচিত চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ করে বোঝা গেছে। এটা নিন্দা করা বা প্রশংসাহ মানুষকে ছোট করার ব্যাপার নয়। এটা হল স্বাভাবিকভাবে কোন মানুকে পাঠকদের সামনে হাজির করা।

কোন মানুষের জীবনের শুধু উজ্জ্বল দিকটা দেখানোর মানে হচ্ছে তাঁকে আধাআধি করে দেখান, এবং সেটা তাঁর প্রতি অবিচার। অন্ধ স্তাবকের প্রশংসার থেকে নিরপেক্ষ মানুষের বিচার অধিকতর মানবিক বিচার। স্ট্র্যাচির কাজ ছিল যুক্তিযুক্ত মানবিক বিচার।

'খ্যাতিমান ভিক্টোরিয়গণ' গ্রন্থে ভিক্টোরিয যুগের (উনবিংশ শতকের শেষ তিন-চতুর্থাংশ) যে চারজন অতি বিখ্যাত মানুষের কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন কার্ডিন্যাল নিউম্যান (Cardinal Newman ১৮০১—১৮৯০), ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (Florence Nightingale ১৮২০—১৯১০), টমাস আর্ণল্ড (Thomas Arnold ১৭৯৫—১৮৪২) এবং জেনারেল গর্ডন (General Gordon)। তাঁরা যথাক্রমে 'অক্সফোর্ড আন্দোলনের' অন্যতম নেতা ও বিশিষ্ট যাজক, প্রথম নারী শুশ্রূষাকারিণী, রাগবির পাবলিক স্কুলের বিখ্যাত প্রধান শিক্ষক (এবং ম্যাথু আর্ণল্ডের পিতা), এবং

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সুদানে প্রচণ্ড সাহসিক কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত ধার্মিক সামরিক ব্যক্তি।

এঁদের সম্পর্কে যে অতিরঞ্জিত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন, ধারণা চলে আসছিল স্ট্র্যাচি তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আধিক্যবর্জিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

স্ট্র্যাচি জীবনীগ্রন্থ লেখার ভারসাম্যযুক্ত এবং আবেগবর্জিত আদর্শের সূত্রপাত করেছিলেন।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'রাণী ভিক্টোরিযা' (Queen Victoria—১৯২১) এবং 'এলিজাবেথ ও এসেক্স' (Elizabeth and Essex—১৯২৮) বিখ্যাত।

প্রথমোক্ত বইটিতে শ্রদ্ধা ও বশ্যতা, এবং দ্বিতীয় বইটিতে রোম্যান্টিকতার প্রভাব দেখা যায়। এ দুটির কোনটিই 'খ্যাতিমান ভিক্টোরিয়গণের' ছাঁচে লেখা নয়।

'খ্যাতিমান ভিক্টোরিয়গণ' গ্রন্থে লিটন স্ট্র্যাচি আগেকার যুগের কোন মানুষকে সাধারণ মানুষের ঊর্দ্ধে কেবলমাত্র কল্পনাসৃষ্ট আদর্শ হিসাবে দেখাতে চাননি। তিনি কোন মানুষকে ছোট করার উদ্দেশ্যে কিছু লেখেননি, যেমন নির্ভেজাল বড বলেও কারোকে সরাসরি প্রশংসাপত্র দেননি। তাঁর প্রতিবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবনীগ্রন্থ লেখার প্রচলিত ধরনের বিরুদ্ধে।

লিটন স্ট্র্যাচির নিজের কথায় : সৎ জীবনীসাহিত্য লেখা সৎ জীবনযাপন করার মতই শক্ত। লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তার ছায়া অবশ্যই রচিত জীবনীব উপর পডবে, এবং তাতেই জীবনী হয়ে ওঠে সাহিত্য এবং শিল্প, নতুবা তা নিছক ঘটনাপঞ্জী বা অযৌক্তিক স্তাবকতা।

জন ডোভার উইলসন (John Dover Wilson)

ডোভার উইলসন তাঁর 'শেক্সপীয়র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি' (The Essential Shakespeare—১৯৩২) গ্রন্থে এ যুগের পাণ্ডিত্যের আলোকে শেক্সপীয়র সম্পর্কিত নানা প্রয়োজনীয় তথ্যকে আলোকিত করেছেন। গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং শেক্সপীয়র সম্পর্কে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ধারণা তৈরী করার পক্ষে অতিশয় উপযোগী।

ডোভার উইলসনের অন্য দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'হ্যামলেটে কি ঘটেছে' (What Happens in Hamlet—১৯৩৫) এবং 'ফলস্টাফের ভাগ্য' (The Fortunes of Falstaff)। গভীর মনস্তত্ত্ব প্রসূত গ্রন্থ দুটি শেক্সপীয়র-পাঠকদের কাছে একাধারে প্রীতিপ্রদ ও প্রয়োজনীয়।

জন মিডলটন মুরি (John Middleton Murrey) ১৮৮৯-১৯৫৭

মিডলটন মুরি বিংশ শতাব্দীর অতি বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক। 'কীটস ও শেক্সপীয়র' (Keats and Shakespeare,—১৯২৫) এবং 'কীটস সম্পর্কিত আলোচনা' (Studies in Keats—১৯৩০) তাঁর দুটি মনোজ্ঞ সমালোচনাগ্রন্থ। শেক্সপীয়র সম্পর্কে তাঁর আলোচনাও অতি মূল্যবান। তিনি কল্পনাপ্রবণ ও অনুভূতিশীল। তাঁর সাহিত্যকর্মের ভিত্তি ধর্মতত্ত্ব, নৈতিকতা, নন্দনশাস্ত্র এবং আলোচিত সাহিত্যিকদের সম্পর্কে নানা তথ্য।

টি. এস. এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot) ১৮৮৮-১৯৬৫

এলিয়ট বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইংরাজ কবি। তাঁর কবিতা ও নাটক সম্বন্ধে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। গদ্যসাহিত্যেও তাঁর অবদান অসামান্য। গদ্যে তাঁর খ্যাতি সাহিত্যসমালোচক হিসাবে। তিনি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-সমালোচক। সমগ্র ইংরাজীসাহিত্যে সব দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর স্থান বোধ হয় ডঃ জনসন এবং ম্যাথু আর্ণল্ডের পরেই। তাঁর পড়াশুনাও অসাধারণ। যেমন কাব্যে তেমনি গদ্যে তিনি তাঁর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন।

সাহিত্যালোচনাসম্বলিত তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—'পবিত্র অরণ্য' (The Sacred Wood—১৯২০), 'নির্বাচিত রচনাসমূহ ১৯১৭—১৯৩২' (Selected Essays 1917—1932, 'কাব্যের ও সমালোচনার উপযোগিতা ও প্রয়োগ' (The Use of Poetry and the use of Criticism—১৯৩৩), 'অজানা দেবতাদের সন্ধানে' (After Strange Gods—১৯৩৪), 'ক্লাসিক কি?' (What is Classic?—১৯৪৫) এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ।

'পবিত্র অরণ্যের' প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথমটির নাম 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা' (Tradition and Individual Talent)। এটিতে প্রবন্ধকারের চিন্তার অভিনবত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত কিছু পর্যবেক্ষণ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

প্রত্যক্ষ পূর্বসূরীদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য বা দুর্বল বশ্যতা ঐতিহ্য নয়। এর তাৎপর্য প্রশস্ততর। উত্তরাধিকারসূত্রে বা শুধু প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলেই ঐতিহ্যকে অধিগত করা যায় না। ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস-সচেতনতা। ঐতিহ্যবোধ শুধু অতীতের অতীতত্বের বোধ নয়, —বর্তমানেও অতীতের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

ইতিহাস-সচেতনতা লেখককে শুধু যে তাঁর নিজের যুগকে তাঁর নিজের ভিতরে অনুভব করতে বাধ্য করে তা-ই নয়, সমগ্র ইউরোপের সম্পূর্ণ সাহিত্য যে একই সময়ে তাঁরই সমকালে অস্তিত্ববান তা-ও তাঁকে অনুভব করায়। সময়ের এই অসীম ও সসীমগুণের একত্রে অবস্থানের বোধ লেখককে ঐতিহ্য-চেতনাসম্পন্ন করে তোলে এবং সময়ের সুদীর্ঘ অস্তিত্বের ঠিক কোন অংশে তাঁর নিজের অবস্থান অর্থাৎ তাঁর সমসাময়িকত্ব কি সে সম্বন্ধেও তাঁকে সচেতন রাখে।

একক এবং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে নিজের সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যের বোধকে বিনষ্ট করার পদ্ধতি, এবং সেই পদ্ধতির সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনার সম্পর্কের কথাও এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

এখানে আরও বলা হয়েছে যে শিল্পবোধের আবেগ নৈর্ব্যক্তিক। যে কাজ তাঁর করণীয় তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করে কবি এই নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন না। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমরা এখন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিত হতে পারি যে এলিয়টের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি ইংরাজী সাহিত্যে গৌরবময় সংযোজন এবং ক্লাসিক হিসাবে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত।

আমাদের আলোচ্য যুগে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে তিনজনের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করব।

ডারউইন (Charles Robert Darwin) ১৮০৯-১৮৮২

ডারউইন বিবর্ধনতত্ত্বের (Evolution) আবিষ্কর্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর তত্ত্ব সারা ইউরোপে আলোড়ন তুলেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষেও তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাব পৃথিবীর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের কাছে ভিত্তিমূলক সত্য ও গ্রহণযোগ্য।

তাঁর গ্রন্থগুলির নাম 'শিকারী কুকুরের সুদূরে যাত্রা (The Voyage of the Beagle—১৮৩৯), 'প্রজাতির উৎপত্তি বিষয়ে' (On the Origin of Species—১৮৫৯) এবং 'মানুষেব উদ্ভব' (The Descent of Man—১৮৭১)।

স্যার জেমস জিনস (Sir James Jeans) ১৮৭৭-১৯৪৬

জ্যোতির্বিদ স্যার জেমস জিনসের লেখাগুলি জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয়। তাঁর লেখা বইগুলির নাম 'আমাদের চারিধারের বিশ্বজগৎ' (The Universe Around Us—১৯২৯), 'রহস্যময় বিশ্বজগৎ' (The Mysterious Universe—১৯৩০) এবং 'নিজের নিজের গতিপথে নক্ষত্রগণ' (The Stars in their Courses—১৯৩১)।

জে. বি. এস. হ্যালডেন (John Burdon Sanderson Haldane) ১৮৯২-১৯৬৪

জে. বি. এস. হ্যালডেন এ যুগের এক ভূয়োদর্শী বৈজ্ঞানিক। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম—'সম্ভাব্য জগৎগুলি' (Possible Worlds—১৯২৭), 'বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র' (Science and Ethics—১৯২৮), 'বিবর্ধনের কারণগুলি' (The Causes of Evolution—১৯৩৩), 'বিজ্ঞান ও প্রাত্যহিক জীবন' (Science and Everyday Life—১৯৩৯) এবং 'বিজ্ঞান এগিয়ে চলে' (Science Advances—১৯৪৭)।

অলডাস হাক্সলি (Aldous Leonard Huxley) ১৮৯৪-১৯৬৫

ঔপন্যাসিক হাক্সলি কয়েকটি প্রবন্ধ সঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন। 'পরলোকের সীমান্ত' (Limbo—১৯২০), 'মানবজীবনের খাটুনি ও ঝঞ্ঝাট' (Mortal Coils—১৯২২), 'কিনারায়' (On the Margin—১৯২৩), 'রগুড়ে পাইলেট' (Jesting Pilate—১৯২৬), 'পুরানো ও নতুন রচনাগুলি' (Essays New and Old—১৯২৬) এবং 'জলপাইগাছ এবং অন্যান্য রচনা' (The Olive Tree, and other Essays—১৯৩৬) বইগুলিতে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর রচনা আছে।

স্যার হার্বার্ট রিড (Sir Herbert Read) ১৮৯৩-১৯৬৮

আধুনিক কালে নানা সুকুমার শিল্পে বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত স্যার হার্বার্ট রিড ইংল্যাণ্ডে অধিবাস্তববাদ (সারিঅ্যালিজম—Surrealism) আন্দোলনের একজন শক্তিশালী

উদ্গাতা। অধিবাস্তববাদ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইউরোপে প্রচলিত একটি দার্শনিক-শৈল্পিক আন্দোলন। ১৯৩০ সাল থেকে এই আন্দোলন ইংল্যাণ্ডের কবি ও শিল্পীদের কাছেও পরিচিত হয়। এই আন্দোলনে যুক্তি, নিয়ম ও বাস্তবের থেকে অবচেতন মনের প্রকাশকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

স্যার হার্বার্ট রিডের গদ্যগ্রন্থগুলির কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হল।—

'পশ্চাদপসরণে' (In Retreat), 'গৌববের চেতনা' (The Sense of Glory), 'যুক্তি ও রোম্যাণ্টিকতা' (Reason and Romanticism), 'এক পোষাকে অনেক রং' ((A Coat of Many Colours), 'ওয়ার্ডসওযার্থ' (Wordsworth), 'শেলির হ'য়ে' (In Defence of Shelley), 'শিল্পের অর্থ' (The Meaning of Art), 'এখনকার শিল্প' (Art Now) 'শিল্প ও সমাজ' (Art and Society), 'শিল্প ও কলকারখানা' (Art and Industry), 'অরাজনীতিকের রাজনীতি' (The Politics of the Unpolitical), 'কাব্য ও নৈবাজ্যবাদ' (Poetry and Anarchism), 'শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা' (Education through Art), 'শিল্পের মূলস্তর' (The Grass Roots of Art), 'ইংবাজী কাব্যের পর্বগুলি' (Phases of English Poetry), 'অনুভূতির শুদ্ধসুর' (The True Voice of Feeling), 'মূর্তি ও বিমূর্তধারণা' (Icon and Idea) এবং 'ভাস্কর্যশিল্প' (The Art of Sculpture)।

এছাড়া রয়েছে তাঁর আত্মজীবনী 'অনভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার ঘটনাবিবরণী' (Annals of Innocence and Experience)।

আই. এ. রিচার্ডস (I. A. Richards) ১৮৯৩-১৯৭৯

আই. এ. রিচার্ডস সাহিত্য উপলব্ধির নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার ব্যাখ্যাতা বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে স্থাযী মনোবৃত্তিগুলি থেকে উদ্ভূত আটটি রসের কথা বলেছেন। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। জগতের তাবৎ সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে সাহিত্য উপলব্ধির মোটামুটি একই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রিচার্ডস সাহিত্য পাঠের নতুন পদ্ধতির প্রস্তাবের মাধ্যমে সেই প্রাচীন উপলব্ধিব কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই সব রস-পরিণতির ফল স্বরূপ সাহিত্যিক উপলব্ধিতে যেমন মানসিক পরিবর্তন আসে, তেমনই শারীরিক পরিবর্তনও আসে। এই রস পরিণতিই সাহিত্য-উপলব্ধির চরম বিকাশ।

রিচার্ডস এই পরিণতিগুলির প্রয়োগীয় দিকের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তাঁর ধারণা অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীতে কাব্যবোধের অবনতি ঘটেছে। তিনি কারণ দেখিয়েছেন, শব্দের (Word) অর্থ ঠিকমত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না। তিনি আরও বলেছেন যে আগেকার দিনের সাংস্কৃতিক আসঞ্জন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সাংস্কৃতিক বোধের পরস্পর-সংলগ্নতা, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এর প্রতিকারের দরকার।

কাব্যের সঠিক অনুধাবন ব্যক্তির ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে সাহিত্যানুভূতি পেয়েছিলাম তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

রিচার্ডস এক সাহিত্য-মানসিকতা নতুন করে প্রচার করতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি কাব্যকে ব্যবচ্ছেদ করে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কোন একটি বিশেষ কবিতার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে, যে বোধগুলির সমবায়ে ওই অর্থ সম্পূর্ণ হয় সেগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের দ্বারা কাব্যের আনন্দদায়ক ফল পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয় কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

শ্রীযুক্ত এই. এ. রিচার্ডসের বইগুলির নাম এখানে দেওয়া হল।—

'অর্থের অর্থ' (The Meaning of Meaning—১৯২৩), 'সাহিত্য আলোচনার নীতিসমূহ' (Principles of Literary Criticism—১৯২৪), 'বিজ্ঞান ও কাব্য' (Science and Poetry—১৯২৫), 'সাহিত্য সম্পর্কে ব্যবহারিক আলোচনা' (Practical Criticism—১৯২৯), এবং 'কল্পনা সম্পর্কে কোলরিজ' (Coleridge on Imagination—১৯৩৪)।

জে. বি. প্রিস্টলি (John Boynton Priestly) ১৮৯৪-১৯৮৪

প্রিস্টলির গদ্যলেখায় উদার মানবিকতা, জীবনযাপনের প্রকৃত তাৎপর্যের যথার্থবোধ, মানুষের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা এবং সুন্দরভাবে কৌতুক সহযোগে লেখার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাহিত্য ভালবাসতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পড়াশুনা ছিল খুব বেশী। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ রেডিওতে সরকারের আস্থাভাজন বক্তা ও ঘোষক হিসাবেই তিনি উপরমহলে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তাঁর লেখা কয়েকখানি বই-এর নাম এখানে দেওযা হল। এগুলি সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ও অন্যান্য রচনা :—

'মনোযোগ একটু আধটু ভিন্নমুখী করা' (Brief Diversions—১৯২২), 'জর্জ মেরিডিথ' (George Meredith—১৯২৬), 'ইংরাজী সাহিত্যের কয়েকটি কৌতুক চরিত্র' (The English Comic Characters—১৯২৬), 'টমাস লাভ পীকক' (Thomas Love Peacock—১৯২৭), 'ইংরাজী উপন্যাস' (The English Novel—১৯২৭), 'স্বনির্বাচিত রচনাগুলি' (Self-selected Essays—১৯৩২), 'গোপন স্বপ্ন' (The Secret Dream—১৯৪৬), 'আনন্দদায়ক বিষয়গুলি' (Delights—১৯৪৯), 'সাহিত্য ও পশ্চিমী মানুষ' (Literature and Western Man—১৯৬০), 'মুহূর্তগুলি এবং অন্য কিছু কিছু' (The Moments and Other Pieces—১৯৬৬), এবং 'পাঁচদশকের রচনা-সংগ্রহ' (Essays of Five Decades—১৯৬৯)।

এফ. আর. লিভিস (Frank Raymond Leavis)

এফ. আর. লিভিস বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বিশেষভাবে গণ্য। তিনি সবচেয়ে বিতর্কিত সমালোচকও বটে। সাহিত্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন

এবং ওই বিষয়ে তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী ও চরম নীতিবাগীশ। তাঁর সাহিত্য-উপলব্ধির ক্ষমতা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের।

এখানে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম করা হল—

'গণসভ্যতা ও সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি' (Mass Civilization and Minority Culture—১৯৩০), 'ইংরাজী কাব্যে নতুন হালচাল' (New Bearings in English Poetry—১৯৩২), 'অবিরাম প্রবাহের জন্য' (For Continuity—১৯৩৩), 'পুনর্মূল্যায়ন' (Revaluation—১৯৩৬), 'জর্জ এলিয়ট, জেমস এবং কনরাড—অতি বিশিষ্ট ঐতিহ্য' (The Great Tradition: George Eliot, James and Conrad—১৯৪৮), 'সর্বাভিসরণ' (The Common Pursuit—১৯৫২) এবং 'ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স' (D. H. Lawrence: Novelist—১৯৫৫)।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে আরও যাঁরা সাহিত্য সমালোচনা ও অন্যান্য গদ্যলেখায় সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁরা নতুন নতুন দিকে তাঁদের সাহিত্যপ্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। শেক্সপীয়র সংক্রান্ত আলোচনা বরাবরের মত আজও অব্যাহত রয়েছে। নানা আলোচনায় বহু নতুন কথা জানা যাচ্ছে। আমরা এখানে গদ্য রচনাকার হিসাবে আর কযেকজনের নাম উল্লেখ করে বর্তমান পর্যায় শেষ করছি। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রয়েছেন

স্যার ই. কে. চেম্বারস (Sir E. K. Chambers)।

রবার্ট লিণ্ড (Robert Lynd)।

জি. বি. হ্যারিসন (G. B. Harrison)।

উইলসন নাইট (Wilson Knight)।

এ. ডব্লিউ পোলার্ড (A. W. Pollard)।

উইলিয়ম এম্পসন (William Empson) এবং আরও অনেকে।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে গ্রেটবৃটেনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কবিতা অনেককাল আগের মত নিজের নিজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের পথ খুঁজতে চেয়েছে। ওয়েলসের ডাইল্যান টমাসের (Dylan Thomas ১৯১৪—১৯৫৩) কথা আগেই বলা হয়েছে। এডউইন মুইর (Edwin Muir ১৮৮৭—১৯৫৯) এবং হিউ ম্যাকডায়ারমিড (Hugh Macdiarmid) স্কটল্যাণ্ডের কবি। এডউইন মুইর আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যুগের ইংরাজী কবিতাকে মেলাতে চেয়েছেন। সামগ্রিকভাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যায় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ইংরাজী ভাষাভাষী এবং ইংরাজী যাঁদের মাতৃভাষা নয় এমন কবিরা ইংরাজী সাহিত্যের মূল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্যিক ঝাঁঝ (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, কটুতা) থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কবি রয় ক্যাম্পবেল (Roy Campbell ১৯০১—১৯৫৭) কিংবা নাইজিরিয়ার সোয়িঙ্কা (Akinwade Oluwale Soyinka), আফ্রিকান-আমেরিকান টনি মরিসন (Tony Morrison) বা জন্মসূত্রে ওয়েলস-অষ্ট্রিয়ান স্টিফেন নাইট (Stephen Knight) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এবং দুই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝিতে ইংরাজী কবিতায় যে জটিলতা ছিল পরিবেশ এবং অনুভূতির পার্থক্য সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ইংরাজী কবিতায় ক্রমে ক্রমে তা কমে আসছিল। অনুভূতির তীব্রতা অন্তর্মুখী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে আসছিল। তিনের দশকের শেষ দিকে এবং চারের দশকের প্রথম দিকে (মোটামুটি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪২) শক্তিশালী কবিদের খাঁটি আন্তরিকতা সত্ত্বেও কবিতা অল্পসংখ্যক লোকের কাছেই জনপ্রিয় ছিল। কবিতার সেই ক্ষীয়মান জনপ্রিযতা ষাটের দশক থেকেই স্বাভাবিক জনপ্রিয়তায় ফিরে এসেছে। কবিতা পড়ার বা উপভোগ করার সামর্থ্য সকলের থাকেনি, কিন্তু কবিতার আবেদন ক্রমে খুব স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। এই স্বচ্ছতার বিশেষ দৃষ্টান্ত জন বেটজেমান (John Betjeman)। এই স্বচ্ছতা সামনে থাকায় দুটি কাব্যসংগ্রহে—রবার্ট কঙ্কোয়েস্টের (Robert Conquest) 'নতুন ধারা' (New Lines—১৯৫৬ এবং ১৯৬৩) এবং এ. আলভারেজের (A. Alvarez) 'নতুন কবিতা' (The New Poetry—১৯৬২)—উপলব্ধির যে সহজ ভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা খুবই আশাপ্রদ।

এই ধারার কবিতার জনপ্রিয়তা বেটজেমানের কবিতা থেকেই সবচেয়ে বেশী করে বোঝা গিয়েছিল। তাঁর কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে।

ষাটের দশকের কবিতার আর একটি বিশেষত্ব ছিল যে কবিরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং তাঁদের কবিতার ভাষা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর মত স্পষ্ট ও সহজ। জটিল শব্দ ও জটিল বাচনভঙ্গীর প্রশ্রয় তাঁরা দেননি। উচ্চশিক্ষিত মানুষের কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবশ্যই থাকবে। কিন্তু কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আমি এইরকম স্পষ্ট ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। অলঙ্কারের ঘনঘটা যেমন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে তেমনি

তা' আবার সাধারণ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের পথে বাধাও হয়ে দাঁড়ায়। ওই সময়ের কবিতায় সে রকম কিছু রাখা হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথায় আর একবার আসা যাক। ওই যুদ্ধে নির্বিচারে গণহত্যা হয়েছিল এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল। কূটনীতির নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। বৃহৎ শক্তিগুলি নানা দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে কেন্দ্র করে বিবদমান ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, এবং বেসামরিক নাগরিক জীবনেও তার স্থায়ী ছাপ পড়েছিল। ওই যুদ্ধের ফলে সামাজিক মূল্যবোধের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছিল। সুনীতি বলে যা কিছু এতদিন মেনে আসা হয়েছিল তার উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়েছিল। যৌনজীবন ও যৌনসম্পর্ককে সমস্ত বাধা নিষেধের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিষ্ঠুরতার প্রবৃত্তিদায়ক যৌনবিকৃতি খুবই ছড়িয়ে পড়েছিল। পতিতাদের প্রতি আকর্ষণ হয়ে পড়েছিল ব্যাপক। সমাজের পূর্ব-স্বীকৃত গণ্ডীর ভিতবেও অর্থ ও লালসার গ্রহণ-বিতরণের ব্যাপারে সমস্ত নিষেধকে তুচ্ছ করা হয়েছিল। দুরারোগ্য নানা রোগ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য অতীতের নৈতিকতার আদর্শ গর্বের সঙ্গেই লঙ্ঘন করা হয়েছিল। অতি-আধুনিক জীবনযাত্রা আগ্রহের সঙ্গে অনুকরণ করা শুরু হয়েছিল, এবং সেই অনুকরণের ভিতরই বহু মানুষ অগ্রগামিতার আদর্শ দেখেছিলেন। এই অবস্থায় যাঁরা পুরানো সম্পর্কের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে পারেননি তাঁরা কেউ বিমূঢ় হয়ে রইলেন, অন্য কেউ বা অনড় গোঁড়ামি দিয়ে স্বচ্ছ দর্শন ও মুক্ত আচরণ থেকে সম্পূর্ণ সরে থাকলেন।

এই সব কিছু প্রতিফলিত হল পঞ্চাশোত্তর উপন্যাস সাহিত্যে অসংলগ্নতা, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার রূপে। অতীতের শুচিতার আদর্শের প্রতি অসম্মানের প্রচ্ছন্ন সমালোচনা নতুন উপন্যাসের ভিৎ তৈরী করল। উদ্বর্তনের (survival) নতুন পথ দেখান হল, এবং মর্যাদার নতুন সংজ্ঞা মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল বিচারের জন্য। উপন্যাস এগুলিকে প্রকাশ করল নিরপেক্ষভাবে, যদিও তাতে আকাঙ্খিত ফল পাওয়ার আশা কেউই কবলেন না।

নতুন নীতি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা শুরু হল। কোন কোন মানুষ ব্যথিত হলেন, অন্য কেউ কেউ চেতনাকে পুনর্গ্রথিত (Recomposed) করার চেষ্টা করলেন। সেই আন্তরিক চেষ্টাকে উপন্যাস নিজের কলেবরের অন্তর্ভুক্ত করল।

কিন্তু লোভ ও বঞ্চনাব যাঁরা শিকার হলেন তাঁদের অনেকে আগেকার নিয়মে অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতে চাইলেন না। হয় সরাসরি প্রতিবাদ জানালেন, বিদ্রোহ করলেন, আর না হয় সব কিছু মেনে নিলেন। উপন্যাস কিন্তু হাল ছাড়েনি। উপন্যাস যে এগুলির সরাসরি নিন্দা করতে চাইল না বা সব ক্ষেত্রে পাল্টা আদর্শ পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করল না তারও যুক্তিসঙ্গত কারণ বোঝান হল। নতুন নিয়মের ভিতর মানুষ নিজের পুনর্বাসন যেন খুঁজে নেয়, এই রকমই একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল। উপন্যাস হাল ছেড়ে দেয়নি।

ক্রমে নতুন এক ধরনের বাস্তবধর্মী উপন্যাসের সৃষ্টি হল। এতে বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক, আমলাতান্ত্রিক মানুষকে নিয়ে আসা হল। এঁদের নিজের নিজের পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনায় সক্রিয় কবে দেখান হল। অর্থাৎ, নতুন উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত চরিত্রসংগ্রহের উৎস পরিবর্তন করা হল। চরিত্রগুলির এই আধুনিকীকরণ এবং তাদের সক্রিয়তার যথাবিহিত ক্ষেত্র নির্ধারণের দ্বারা উপন্যাসের অন্ততঃ বাইরের চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হল। এই ধরনের প্রচেষ্টার ঔপন্যাসিক হিসাবে নিগেল বেলচিন (Nigel Belchin), সি. পি. স্নো (C. P. Snow) এবং এঙ্গাস উইলসনের (Angus Wilson) নাম করা যেতে পারে।

আর একদল ঔপন্যাসিক দেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবস্থাকে পটভূমি করে উপন্যাস লিখলেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসিকরা, কিংসলি এমিস (Kingsley Amis) এবং জন ওয়েন (John Wain) প্রভৃতি, লিখে চললেন শতাব্দীর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে।

এই সমস্ত ঔপন্যাসিক উপন্যাস লেখাটাকেই তাঁদের লক্ষ্য হিসাবে নেননি। বরঞ্চ বলা চলে তাঁরা এটাকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় বলে নিয়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল নানা নতুন ধারণাকে ব্যক্ত করা, সমালোচনা করা, মতামত দেওয়া এবং প্রস্তাব দেওয়া। সরাসরি এই সব কাজের দ্বারা ঔপন্যাসিক আধুনিক উপন্যাসকে সমাজ-সচেতনতা ব্যক্ত করার কাজে লাগাচ্ছেন। তাতে করে সাহিত্যিক উপযোগিতার বাইরেও উপন্যাসের বৃহত্তর উপযোগিতার ক্ষেত্র হযত তৈরী হচ্ছে।

দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন সময় থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরেও সারা বিংশ শতাব্দী জুড়ে উপন্যাসের পাশাপাশি নানা আধুনিক ছোটগল্পও প্রকাশ পেয়ে আসছে। নামী লেখকদের মধ্যে আগে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও রয়েছেন—

জন কাউপার পোইস (John Cowper Powys ১৮৭২—১৯৬৩), থিওডোর ফ্রান্সিস পোইস (Theodore Francis Powys ১৮৭৫—১৯৫৩), লেওয়েলিন পোইস (Llewelhyn Powys ১৮৮৪—১৯৩৯), এলিজাবেথ বোএন (Elizabeth Bowen), জেমস হেনলি (James Hanley), লেসলি পোলস হার্টলি (Leslie Poles Hartley) অলিভিয়া ম্যানিং (Olivia Manning), এঙ্গাস উইলসন (Angus Wilson) এবং অন্যান্যেরা।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, ধর্মীয় এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, অস্তিত্বের চিরকালীনতার বোধ এবং এইরকম আরো অনেক ভাব ও ভিত্তির উপর এই গল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত। অনেক ক্ষেত্রে চলমান এই জগৎ থেকে গল্পগুলি যেন বিবিক্ত। তবে প্রকাশের ভাষায় কোথাও কোন জটিলতা নেই।

অন্যান্য গদ্যরচনা সম্বন্ধে বলা যায় যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যালোচনা এবং নানা তথ্য ও কল্পনাশ্রিত গদ্য লেখা চলছে। এই সব গদ্য লেখার ভিতরে রয়েছে

স্মৃতিকথা, রম্যরচনা এবং বিবিধ প্রবন্ধ। তবে, যেমন আশা করা গিয়েছিল, সাহিত্যালোচনাই বেশী। গদ্য লেখকদের ভিতর আগে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও রয়েছেন সিরিল কনোলি (Cyril Connolly), জন লেহম্যান (John Lehmann), কলিন উইলসন (Colin Wilson) এবং অন্যান্যেরা।

পঞ্চাশোত্তর যুগে যাঁরা নাটক লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

ডেনিস জনস্টন (Denis Johnston), এমলিন উইলিয়মস (Emlyn Williams). টেরেন্স র‍্যাটিগান (Terrence Rattigan), পিটার ইয়াটস (Peter Yates), নরম্যান নিকলসন (Norman Nicholson), রোনাল্ড ডানকান (Ronald Duncan), পিটার উস্টিনভ (Peter Ustinov), জন অসবোর্ণ (John Osborne) এবং অন্যান্যেরা।

এঁদের ভিতর সকলের থেকে বেশী নাম করেছেন জন অসবোর্ণ। এঁর নাটকগুলির নাম :

'জর্জ ডিলনের সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি' (Epitaph for George Dillon—১৯৪৬), 'সরোষে ফিরে তাকাও' (Look Back in Anger—১৯৫৬) 'চিত্তবিনোদক' (The Entertainer—১৯৫৭), 'পল স্লিকির জগৎ' (The World of Paul Slickey—১৯৫৯), 'অগ্রহনীয় সাক্ষ্য' (Inadmissible Evidence—১৯৬৫), 'চুক্তি পালিত হয়েছে' (A Bond Honoured—১৯৬৬), 'কাল-বর্তমান' (Time Present—১৯৬৮), এবং 'আমষ্টারডামের হোটেল' (The Hotel in Amsterdom—১৯৬৮)।

অসবোর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক 'সরোষে ফিরে তাকাও' (Look Back in Anger)। এই নাটকেরই একটা উক্তি থেকে বহু-ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছটির সৃষ্টি হয়েছে— Angry young men ('ক্রুদ্ধ যুবকেরা')। এই নাটকে দেখা গেল অসবোর্ণের উচ্চাকাঙ্খা অপরিমিত। তিনি শুধু বৃটিশ সভ্যতার ধর্মীয় ভিত্তিকে ধূলিসাৎ করতে চেয়েছেন তাইই নয়, আধুনিক 'ভদ্রলোকের' এবং প্রতিবেশীর কেতাদুরস্ত আচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং অবজ্ঞা করেছেন। তিনি এককালের বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকেও ভুলতে চান।

এ এক নতুন ধরনের নাটক যাতে বাস্তব পরিস্থিতির নিষ্প্রাণ অনুকরণ নেই, আছে কষ্টকর কিন্তু যথার্থ উপলব্ধি। যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডের অভাবগ্রস্ত কিন্তু বেপরোয়া মনোভাব ও আশাহতের ক্ষোভ এতে ফুটে উঠেছে প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মসন্তুষ্ট সমাজকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থের এই শেষ পর্ব ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছর পর পর্যন্ত টানা হয়েছে। এর পরেই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। শেষোক্ত এই অর্ধশতাব্দী বৈচিত্র্য ও প্রসারণে বিশাল। এই সময়ের অল্পকিছু কথা উপসংহার অংশে বলা হয়েছে।

এই অর্ধশতাব্দী মানুষেব অতিবাস্তব এবং সর্বাধুনিক পরিস্থিতি নিয়ে মশগুল। এই অবস্থায় কোন সাহিত্য কতখানি সময়ের ধোপে টিকে যাবে বলা মুস্কিল। আমরা যদি বলি মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাহিত্য স্থায়িত্বের গুণান্বিত তাহলে কিন্তু কথাটা খুব পরিস্কার হয় না। ভাললাগা-মন্দলাগা এবং তৃপ্তি-অতৃপ্তির বোধ বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এমনকি তা একই সমাজভুক্ত মানুষের নানা শ্রেণীর কাছে নানা রকম। সুতরাং, কার, কি অবস্থায়, সাহিত্য-প্রীতি কি ভাবের হবে, বা সাহিত্যসম্পর্কিত কৌতূহল ও চাহিদা কত কম বা কত বেশী হবে তা কোন একটিমাত্র নিয়ম দিয়ে বোঝান যায় না।

মানুষের জীবনে সাহিত্যের প্রয়োজন ভাত-কাপড়-রুটি-রুজির পরে; —এগুলির সঙ্গে সমানভাবে তো নয়ই। কিন্তু সেখানেও কথা থেকে যায়। কিছু মানুষ অল্পমাত্র জৈব ও পার্থিব প্রয়োজন মিটলেই সন্তুষ্ট, —অন্যরা নন। এই দ্বিতীয় দলই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এ ব্যাপারে আরও কতকগুলি নিয়ামক নীতি রয়েছে। বহু মানুষ উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠাতেই তৃপ্ত থাকতে চান। যেমন, উত্তেজনাপূর্ণ নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলা আজকের দিনে অনেক মানুষেরই অভাববোধের তীব্রতা হ্রাস করে দেয়। তাঁদের অনেকেই ওইভাবে মানসিক তৃপ্তি পেয়ে যাওয়ায় সাহিত্য সম্পর্কে তেমন আগ্রহবোধ করেন না। সাহিত্য সেক্ষেত্রে তুচ্ছ এবং অবান্তর হয়ে যায়। আবার অনেকের কাছে কর্মজীবনে উন্নতি করার ব্যাপারে (Career-making) সাহিত্য যতটুকু সাহায্য করে ততটুকুই তার আকর্ষণ। কর্মজীবনে উন্নতিলাভে আগ্রহশীল এই সব ব্যক্তি (Careerists) সাহিত্যকে তাঁদের কর্মজীবনের বাইরের বস্তু বা পরিত্যাজ্য বস্তু হিসাবে দেখেন। এগুলি সত্যকথা এবং বাস্তব ঘটনা।

তবু 'এখনও বিকেল আসে চুপি চুপি কলকাতায়, এখন বিকেল' —[বুদ্ধদেব বসু]।

অনেক মানুষই এখনও অবসর সময়ে কিছু কিছু গল্প পড়েন, কিংবা গান বা আবৃত্তি শুনতে চান। এগুলি সাহিত্য বা সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট শিল্প। তবে এ নিয়ে বেশী মেতে থাকার লোক কম। কারণটা কোন দিকে খুঁজব? আধুনিক মানসিকতার দিকে, না সাহিত্যের অক্ষমতার দিকে?

যদি মানুষের মনে সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণকে স্থায়ী রাখতে হয় তবে এই কঠিন জীবনযুদ্ধের মাঝখানে মানুষের মস্তিষ্কের উপর বেশী চাপ দেওয়া চলে না। তার মানে এই নয় যে সাহিত্যকে চেষ্টা করে খেলো করে দিতে হবে। সাহিত্যিককে তাঁর নিজের যুগে অধিকাংশের দ্বাবা স্বীকৃত শুদ্ধ এবং আনন্দদায়ক সাহিত্যসৃষ্টির দিকেই মনোযোগ দিতে হবে।

একথা খুব বেশী করেই বলা হয় যে জগতের জটিলতার সঙ্গে সাহিত্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। কিন্তু তা যদি শুদ্ধচিত্ত পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য না হয় তো সেই সাহিত্যসৃষ্টিতে কি লাভ! মানুষকে এবং মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতাকে সাহিত্যিককে মানতেই হবে। না হলে সেই সাহিত্যিক এবং তাঁর কৃত সাহিত্য ধ্বংস হয়ে যাবে। নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে ; এমনকি সাহিত্যের নতুন নতুন ধরণ বা জ্যঁর (Genre) আবিষ্কার করতে হবে। উপন্যাস আগে ছিল না ; ছোটগল্প, একাঙ্ক নাটক ছিল না। এখন আছে। এই রকম কত কি হতে পারে। সাহিত্যকে জনপ্রিয় করা খোশামুদি নয়, —প্রয়োজন ও পরিবর্তনকে স্বীকার করা। ইংরাজী সাহিত্যে এসব অনুসন্ধানের চেষ্টা আছে ; —অন্য সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত কম।

আমি এই গ্রন্থের প্রথম থেকে গণতন্ত্র ও গণচেতনার উপর জোর দিয়েছি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাহিত্য এই অর্থে আরও বেশী করে গণমুখী হয়েছে যে বহুমানুষ লিখছেন, এবং তা পড়ছেনও বহু মানুষ। শিক্ষার প্রসার খুবই একটা বড় কথা। তবে সাহিত্যের এই গণমুখিনতার কথা বলতে গেলে অনেক কিছুই বিবেচনা করতে হয়। ইংরাজী সাহিত্য এখন আর শুধু ইংরাজের নয় ; ইংরাজী যাঁদের মাতৃভাষা শুধু তাঁদেরও নয়। সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের শিক্ষিত মানুষেরা এখন ইংরাজী শিখতে চান, ইংরাজী পড়তে চান, এবং ইংরাজীতে লিখতে চান। ইংরাজীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ যে সব দেশে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল তার বাইরেও আরও বহু দেশে ইংরাজী ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও মধ্য আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চলে ইংরাজী পড়া এবং ইংরাজী সাহিত্য রচনার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ ইউরোপে এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইংরাজীর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে। ইংরাজী শাসন শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই বহুদেশ থেকেই অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু ইংরাজীর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এখন ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী সাহিত্য শুধু ইংরাজের নয়, —পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের নিজস্ব সম্পদে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এর একটা খারাপ দিকও আছে। বহু দেশে ইংরাজী-শিক্ষিত মানুষেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্রুত অধিকার করে নিচ্ছেন এবং সে দেশের মূল ভাষা অনুকম্পার বিষয় না হলেও অবহেলিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মানসিকতা অন্যক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিনিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। কিন্তু এটা সর্বতোভাবে সত্য যে দেশের মানুষের মূল নিজস্ব ভাষাতেই গণচেতনা আরও বেশী করে ছড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে আজ থেকে একশ বছর আগে ইংরাজী-জানা এবং ইংরাজী-না-জানার মধ্যে যে শ্রেণী-বৈষম্য ছিল, তা কিন্তু আজকে নেই।

এই সমতা নিয়ে আসার অন্যতম কারণ এবং সমতাবোধের উদাহরণ হিসাবে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা লক্ষ্য করবার মত। সংবাদপত্রগুলির জনপ্রিয়তা দাবানলের মত বিস্তার লাভ করছে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের পাশাপাশি ইংরাজী সংবাদপত্রেরও গ্রাহকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। সংবাদপত্রগুলির মারফৎ নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে মানুষ পরিচিত হচ্ছেন এবং সেগুলি ব্যবহার করা সুবিধাজনক বলে বোধ করছেন।

এই সঙ্গে আমরা নানা উন্নত সাহিত্যের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারটিও লক্ষ্য করতে পারি। কোন কোন শব্দ এমন রয়েছে যেগুলি কোন এক বিশেষ সাহিত্যেই স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছিল। কিন্তু এখন সেগুলি অন্য সাহিত্যেও স্বচ্ছন্দে এবং সুসংগতভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। যেমন পালি ও সংস্কৃত শব্দের ইংরাজী সাহিত্যে ব্যবহার—

'দত্ত, দযধবম, দম্যত'
শান্তি, শান্তি, শান্তি' —[বজ্রনির্ঘোষ—টি. এস. এলিয়ট]।

খাস বাংলাতেও এমন উদাহরণ রয়েছে।—

'হা হতোস্মি! সড়কে বেঁধেছি ডেবা,"—[সুভাষ মুখোপাধ্যায়]।

লাইনটি পুরোপুরি বোধগম্য বাংলা। অথচ 'হা হতোস্মি' সর্বতোভাবে সংস্কৃত; 'সড়ক সংস্কৃত 'সরক' অথবা আরবি 'শরক' থেকে এসেছে এবং 'ডেরা' হিন্দী।

আমার বক্তব্য বিভিন্ন ভাষার ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আপনা থেকেই হয়ে আসছে। এতে যেমন বক্তব্য বলার সুবিধা হচ্ছে, তেমনি ওই সব বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরা অধিকতর নৈকট্য অনুভব করছেন।

সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়ের কথা বলি। নামী সাহিত্যিক এখন ধনী নাগরিক। সব দেশেই, ইংল্যাণ্ডেও যেমন এদেশেও তেমনি। প্রশ্ন হচ্ছে, সাহিত্যিকের কাজ কি? —সম্পদশালী হওয়া না নতুন কিছু বলা এবং সমস্ত মানুষের একত্রীবদ্ধ ভাবজগতে নেতৃত্ব দেওয়া? শেষোক্ত কাজটি করা দরকার আন্তরিকতা সহকারে। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা নয়। কিন্তু সে কাজ যদি ভণ্ডামি সহকারে করা হয়, তাহলে সেই সাহিত্যিক তো দেউলে; —বড় কিছু দেবার মন তাঁর নেই। টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পিস' তো জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু টলস্টয যেচে দুঃখ বরণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শেষে বা একবিংশ শতাব্দীতে পা দিতে গিয়ে আমরা কি কিছু ভণ্ড কিন্তু ক্ষমতাবান সাহিত্যিকের পাল্লায় পড়বো? আমরা অবশ্যই আশা করবো সৎ, জ্ঞানবান এবং কর্তব্যপরায়ণ সাহিত্যিকদের আরও বেশী সংখ্যায় আবির্ভাব ঘটুক।

এখানে আর একটি কথা বলি। বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতি বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠির নিজস্ব সম্পদ। এই সংস্কৃতি সাহিত্যে প্রকাশ করতে গেলে ওই ওই ভাষায় লেখা কবিতার মাধ্যমেই তা সঠিকভাবে করা যায়। ভাল গদ্য লেখা অন্য ভাষাতেও সম্ভব। আমার মনে হয় ইংরাজী জানা অন্য ভাষাভাষী মানুষদের উচিৎ কবিতা লেখার বেলায় নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করা এবং ইচ্ছা থাকলে, গদ্যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা। এর দ্বারা বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে যোগাযোগও যেমন বৃদ্ধি পেতে পারে, তেমনি অন্য জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরাজ বা ইংরাজী-জানা অন্যান্য মানুষের কৌতূহলও মেটে। এতে শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সকলের একযোগে উন্নতি সঠিক এবং সহজ হতে পারে।

শেষে, অনুবাদের সম্পর্কে দু'এক কথা বলি। ইংরাজীতে লেখা বই বেশ কিছু মানুষ বুঝতে পারেন। অন্য ভাষায় ভাবানুবাদ হলে আরও বেশী সংখ্যক মানুষের বোঝার সুবিধা হয়। আবার অন্য ভাষায় লেখা বই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ হলে সেই ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষের কিছুটা পরিচয় ঘটে। তবে দেখতে হবে উদ্দেশ্যটা যেন

আভিজাত্য-অর্জন না হয়। অনুবাদের বিশিষ্ট প্রয়োজন উপলব্ধি করেও বলা যায় অনুবাদগ্রন্থ পড়ার থেকে সরাসরি বিভিন্ন ভাষায় লেখা বই পড়বার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তবেই মানুষে মানুষে যোগাযোগের সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী হয়। তা না হলে সব ব্যাপারটা একপেশে হয়ে থাকে। আমরা যখন ইংরাজী ছোটগল্প পড়ি তখন কি একথা মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' বা বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' যাঁরা বাংলাতে পড়তে পারলেন না তাঁরা কি ছোটগল্পকে সব দিক থেকে দেখতে পেয়েছেন? আবার এও ভাবতে হয়, অন্যভাষাভাষী মানুষ যখন ভাল ইংরাজী ছোটগল্প ইংরাজীতে পড়তে পারেন না তখন তিনি কি পরিমাণ বঞ্চিত হন। কিন্তু বাধা উৎরানোর রাস্তাই বা কি?

এ ব্যাপারে আরও দেখা যাচ্ছে এক ভাষাভাষী মানুষ অন্যভাষার সাহিত্য সরাসরি পাঠ করলে নতুনত্ব পান, তুলনা করতে পারেন এবং বিচিত্র আনন্দ পেতে পারেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে ইংরাজী সাহিত্যের একটা বিশেষত্বও আছে। ঠিক আজকের অবস্থায় অন্য ভাষাভাষী মানুষ বেশী করে ইংরাজী পড়লে প্রায় সারা জগতের অভিজ্ঞতা এক জায়গায় পেতে পারেন। ইংরাজী সাহিত্যে সঞ্চিত এই ভাবের ভাণ্ডারকে তুচ্ছ করা চলে না। আমার শেষ কথা এই যে রাজনীতি-অর্থনীতির যা-ই তফাৎ থাকুক না কেন, ভাবের ভাণ্ডার যেন ভাগাভাগি না হয়।

গ্রন্থের এই শেষ পর্বের জন্য যে যে বই-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

Matthew Arnold : Essays in Criticism
C. H. Herford : The Age of Wordsworth
A. C. Baugh : Literary History of England
A. Compton Rickett : A History of English Literature
Lefcadio Hearn : Appreciations of Poetry
Legouis and Cazamion : A History of English Literature
Hugh Walker : Literature of the Victorian Era
Bhabatosh Chatterjee : The poetry of W. B. yeats
E. Albert : A History of English Literature
Sir Ifor Evans : A short History of English Literature
T. S. Elliot : The Sacred Wood
A. S. Collins : English Literature of the Twentieth Century
W. H. Hudson : An Introduction to the Study of Literature
Frank N. Magill (Ed.) : Masterpieces of World Literature